বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্র-সূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র



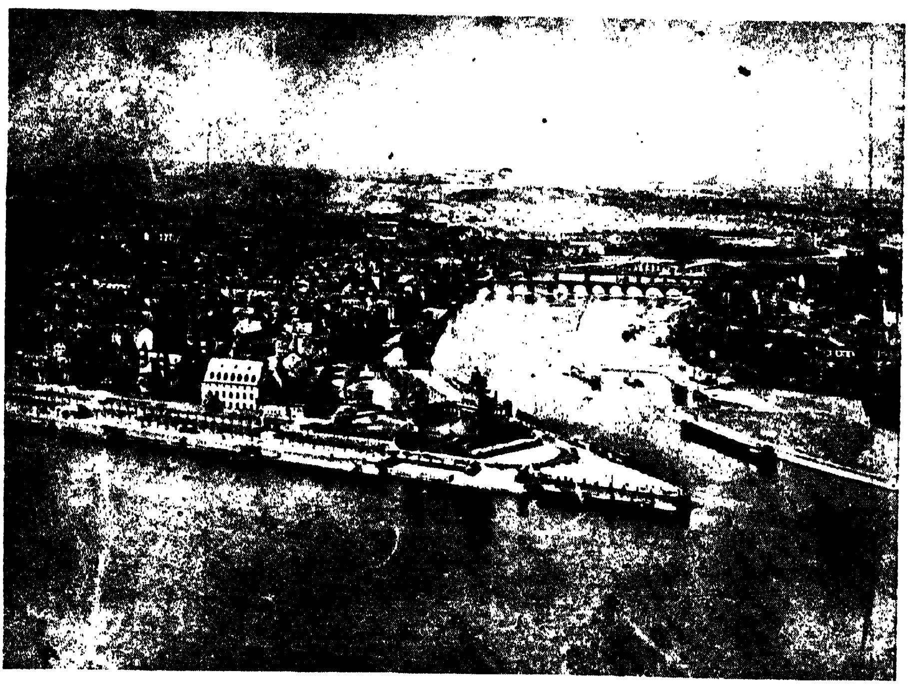
কর্ণ ও কুন্তী

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



ইয়াল্টা প্রাসাদে মার্শাল ষ্টালিন ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট



রাইন এবং মোজেল নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কবলেঞ্জ নগরীর যুদ্ধের পূর্ব্বেকার দৃশ্য

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৫২

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কাপড়ের দুর্ভিক্ষ

কাপড়ের দুর্ভিক্ষ সমানভাবেই চলিতেছে। কমে নাই, কমিবার কোন লক্ষণও নাই। চোরাই কারবার বন্ধ হয় নাই, বাংলা হইতে তিব্বতের পথে চীনে কাপড় রপ্তানী এখনও হইতেছে বলিয়া অভিযোগ উঠিতেছে। পয়সা ও সুযোগ যাহাদের আছে কাপড়ের অভাব তাহাদের হয় নাই, দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের বিবস্ত্র হইবার উপক্রম হইয়াছে। কাপড়ের অভাব ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও হইয়াছে, কিন্তু বাংলাতেই উহা সর্বাপেক্ষা অধিক তীব্র এবং বাংলাতেই কাপড়ের চোরাই কারবার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী—ইহা শুধু লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত বাঙালীরই মনের কথা নয় বোম্বাইয়ের মিলওয়ালা, ভারত-সরকারের বাণিজ্যসচিব লীগের অন্যতম নেতা সর মহম্মদ আজিজুল হক এবং খোদ বাংলা-সরকারের ডিরেক্টর-জেনারেল অফ এনফোর্সমেণ্ট মিঃ গ্রিফিথসেরও ইহাই অভিমত। বোম্বাইয়ের কমার্স পত্রিকা লিখিয়াছেন যে বাংলার এই তীব্র বস্ত্রাভাব ও চীনে কাপড় রপ্তানির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বাংলা-সরকার। কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে সর আজিজুল বলিয়াছেন, "ভারতের সর্বত্র কাপড়ের চোরাই কারবার চলিতেছে এবং ইহার জন্য প্রধানতঃ পাইকারেরা দায়ী। বাংলাদেশে কাপড়ের ব্ল্যাক মার্কেট সব চেয়ে বেশী এবং পাইকারী ও খুচরা সর্বশ্রেণীর ব্যবসায়ীরাই ইহার জন্য সমান দায়ী।" রোটারী ক্লাবের এক বক্তৃতায় মিঃ গ্রিফিথস বলিয়াছেন, "পৃথিবীর সব দেশেই চোরাই কারবার আছে। অন্যান্য দেশে উহা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম আর বাংলায় উহাই স্বাভাবিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভার পরিচালনাধীনে এবং সরবরাহ মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর তত্ত্বাবধানে এই ব্ল্যাক মার্কেট গড়িয়া উঠিয়াছে এবং জগদ্দল পাথরের ন্যায় বাঙালীর বুকে চাপিয়া বসিয়াছে।

মিঃ সুরাবর্দ্দী বাংলার জন্য বরাদ্দ কাপড়ের কোটা লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও বোম্বাইয়ের মিলওয়ালাদের সহিত বিবাদ করিয়া যথেষ্ট সময় নষ্ট করিয়াছেন। ইহা নিরর্থক। যুদ্ধের পূর্বে বাংলায় যত কাপড় বিক্রয় হইত, বাংলাকে প্রায় সেই পরিমাণ কাপড়ই দেওয়া হইয়াছে। পাইকারদের গুদামে এই কাপড় আটকা না পড়িলে বস্ত্রাভাব কিছুতেই এত তীব্র হইতে পারিত না। গবর্ন্মেণ্ট প্রথম হইতেই স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি রোধ করিতে চাহিয়াছেন। ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে আনাড়ীদের উপর কাপড় বিক্রয়ের ভার দিয়া এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা গোপনতার অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়া চোরা ব্যবসায়ীদের উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়াছেন। মিঃ গ্রিফিথস ও মিঃ টুলী কাপড় বিক্রয়ের যে নূতন বন্দোবস্ত করিতেছেন তাহাতেও চোরাই কারবার বন্ধ হইবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কলিকাতায় মহল্লা কমিটি গঠন করিয়া কাপড় বিক্রয়ে কমিটির সাহায্য লাভের জন্য তাঁহারা আবেদন করিয়াছেন, প্রকাশ, মধ্য কলিকাতায় এরূপ কমিটি গঠিতও হইয়াছে। কিন্তু মিঃ গ্রিফিথসের বক্তৃতায় বুঝা যায় কমিটি চোরা ব্যবসায়ীদের ধরিবার কাজে তাঁহাদিগকে সাহায্য করুন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। কাপড় বিতরণের অথবা দোকান নির্বাচন ও কাপড় বিক্রয় পরিদর্শনের দায়িত্ব কমিটির হাতে ছাড়িয়া দিতে তিনি অনিচ্ছুক। অর্থাৎ কমিটি চোরা ব্যবসায়ী ধরিবার কাজে পুলিসের গুপ্তচরের কাজটুকু বিনা পয়সায় করিয়া দিক ইহাই তাঁহার আসল ইচ্ছা। মধ্য কলিকাতা কমিটি গঠনের সংবাদ প্রকাশের পরই জানা গিয়াছে ঐ অঞ্চলের বহু দোকানকে কমিটির সহিত পরামর্শ না করিয়াই কাপড় বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণের দুর্দশা মোচনে বাংলার গত মন্ত্রীমণ্ডলের আন্তরিকতার অভাব পদে পদে ধরা পড়িয়াছে। ইহাদের উপর বাঙালীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বিন্দুমাত্র আজ আর অবশিষ্ট নাই। মিলগুলিকে নিজ নিজ দোকান খুলিয়া খুচরা কাপড় বিক্রয়ের অনুমতি দিলে অথবা স্থানীয় ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক গঠিত কমিটির হাতে কাপড় বিক্রয়ের দায়িত্ব অর্পণ করিলে চোরা কারবার এত তীব্র হইতে পারিত না ইহা নিশ্চিত।

ম্যানচেষ্টারের কাপড় আমদানীর পথ প্রশস্ত করিবার জন্য ভারত-সরকার কাপড়ের যে অভাব সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা-সরকার তাহারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীমণ্ডলের পক্ষপুটাশ্রয়ে ফাঁপতি টাকার মালিকদের কৌশলে কাপড়ের চোরাই কারবার বাংলাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। ভারত-সরকারের টেক্সটাইল

কমিশনারের 'পরামর্শে' কয়লা অভাবের অজুহাতে অনেকগুলি কাপড়ের কল কিছু দিন বন্ধ ছিল। ফলে আড়াই কোটি গজ কাপড় কম তৈরি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রশ্ন করিয়া ভারত-সরকারের নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছেন যে, কাপড়ের দুর্ভিক্ষের দিনে কাপড়ের কল ভিন্ন চটকল প্রভৃতি অন্য কোন মিলকে কয়লার অভাবে কাজ বন্ধ রাখিতে বলা হয় নাই এবং যে পরিমাণ কাপড় ইহাতে কম উৎপন্ন হইল তাহার সবটাই জনসাধারণের প্রাপ্য হইতে কাটা যাইবে, সরকারী প্রাপ্য অথবা রপ্তানি হইতে উহার একাংশও বাদ যাইবে না।

তারপর কাপড় রেশনিং। ইহাতেও ব্ল্যাক মার্কেটেরই সহায়তা হইবে। বাংলা-সরকার এখানেও মুড়ি মিছরির এক দর কষিয়াছেন, ধনী দরিদ্র মধ্যবিত্ত সকলের জন্য বৎসরে দশ গজ কাপড় বরাদ্দ করিয়াছেন। জনপ্রতি দশ-বার বা আঠার গজ কাপড়ের হিসাব লইয়া যে কলহ ও আন্দোলন চলিয়াছে তাহা শুধু নিরর্থক নয়, দুরভিসন্ধিপ্রসূত বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। ভারতবাসীর দৈনিক আয় দশ পয়সা, ইহার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক ভারতবাসীরই আয় দশ পয়সা। ঠিক তেমনি ভারতে উৎপন্ন মোট কাপড় জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে গড়পড়তা দশ গজ পড়ে বলিয়াই এ কথা বলা চলে না যে সকলেই দশ গজ কাপড় ব্যবহার করে। সমাজের উচ্চস্তরের লোকে দশ গজের অনেক বেশী এবং নিম্নস্তরের লোকে অনেক কম কাপড় ব্যবহার করে। তাহা ছাড়া তাঁতের কাপড়ের কোন সঠিক হিসাব আজও নির্ধারিত হয় নাই, সুতরাং দরিদ্র দেশবাসী কয় গজ মিলের ও কয় গজ তাঁতের কাপড় ব্যবহার করে তাহারও হিসাব পাওয়া অসম্ভব। এই অবস্থায় সকলের জন্য সমানভাবে দশ গজ বরাদ্দ শুধু মূর্খতার পরিচয় নয়, প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট কাপড় চোরাবাজারে কিনিবার জন্য ইহা প্রত্যক্ষ আমন্ত্রণ। সাহেবদের সুট, রাত্রিবাস, অন্তর্বাস প্রভৃতির জন্য বৎসরে মোট দশ গজ কাপড় বরাদ্দ করিবার কথা নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীমণ্ডল কল্পনাও করিয়াছিলেন কি? গ্রিফিথস সাহেব সম্প্রতি লাট পরিচালিত বাংলায় কাপড় বিলির ভার লইয়াছেন তিনি স্ব সম্প্রদায়ের জন্য এই বরাদ্দ করিবেন কি?

ব্রিটেনের খাদ্য-বরাদ্দ

গত পাঁচ বৎসর ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কি ভাবে দেশবাসীকে খাদ্য সরবরাহ করিয়াছেন তাহার বিবরণের সহিত এদেশে খাদ্য-বরাদ্দ প্রথার তুলনা করিলে স্বাধীন ও পরাধীন দেশের গবর্মেণ্ট ও সরকারী কর্মচারীদের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। সুস্থ শরীর গঠন, অসুস্থ শরীরের পুনর্গঠন, কর্মশক্তি সঞ্চয় ও রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা রক্ষা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ব্রিটেনের বরাদ্দ খাদ্যের তালিকা তৈরি করা হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে পেটও যাহাতে ভরে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় একটা সুফল এই হইয়াছে যে, শরীরের পুষ্টির জন্য অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যগুলি ব্রিটেনের জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমাণে পাইতেছে। ব্রিটেনের দরিদ্র জনসাধারণ স্বাভাবিক সময়েও যে পুষ্টিকর খাদ্য পাইত না এখন তাহারা তাহা পাইতেছে।

সাবমেরিণ যুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে বিদেশ হইতে আমদানী খাদ্য প্রায় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইয়াছিল। বরাদ্দ করিবার সময় কাহার জন্য কি রকম খাদ্য অধিক প্রয়োজন তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। প্রসূতি, শিশু ও ছাত্রছাত্রীগণকে বেশী করিয়া দুগ্ধ ও শরীর গঠনকারী খাদ্য দেওয়া হইয়াছে।

দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিও প্রথম হইতেই যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের আগে যে পরিমাণ গম ও আলু ব্রিটেনে উৎপন্ন হইত, ১৯৪৩-এ তাহার দ্বিগুণ উৎপন্ন হইয়াছে। যুদ্ধের আগে যেখানে ব্রিটেনের জনসাধারণ প্রত্যেকে গড়ে সপ্তাহে ৩০।৪০ আউন্স তাজা মাংস, ৬.৫২ আউন্স তাজা মাছ ও ৮.৪০ আউন্স শুষ্ক মাংস পাইত সেখানে ১৯৪৩-এ প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও তাহারা পাইয়াছে ২২.১৮ আউন্স তাজা মাংস, ৪.৫৬ আউন্স তাজা মাছ ও ৫.৭৮ আউন্স শুষ্ক মাংস। খাদ্যতালিকায় প্রোটিন জাতীয় বস্তুর অভাব এই ভাবে ঘটিতেছে দেখিয়া পনীরের পরিমাণ বাড়াইয়া শরীরের পুষ্টিরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যুদ্ধের আগে সপ্তাহে ২.৭১ আউন্স পনীর প্রত্যেকে খাইত, ১৯৪৩-এ উহা বাড়াইয়া গড়ে ৩.৬৩ আউন্স করা হইয়াছে। পনীর বরাদ্দ বিষয়েও অল্প ও অধিক পরিশ্রমী লোকদের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। অল্প পরিশ্রম যাহারা করে তাহাদিগকে সপ্তাহে ৩ আউন্স পনীর দেওয়া হইয়াছে কিন্তু কৃষক ও শ্রমিককে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া ১২ আউন্স হিসাবে পাইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেনে প্রত্যেক সপ্তাহে ৭.৬৩ আউন্স মাখন পাইত, ১৯৪৩-এ পাইয়াছে ২.৩৪ আউন্স। এই অভাব পূরণ করা হইয়াছে মার্গারিণ বা কৃত্রিম মাখন দিয়া। যুদ্ধের আগে মার্গারিণ সাধারণতঃ রান্নাতেই ব্যবহৃত হইত, এখন লোকে সপ্তাহে গড়ে ৫.২৬ আউন্স হিসাবে উহা খাইতেছে। কাজেই ব্রিটিশ খাদ্যতালিকায় স্নেহজাত দ্রব্যের অভাব আদৌ ঘটে নাই।

ডিম বরাদ্দে শিশুদের দাবি আগে মিটান হয়, বয়স্কেরা পায় পরে। ছয় হইতে আঠারো মাসের শিশুদের জন্য অতিরিক্ত ডিম বরাদ্দ করা হইয়াছে। যুদ্ধের আগে প্রত্যেকে সপ্তাহে ৩.২৬টি ডিম পাইত, এখন পায় মাত্র ১.৪৫টি। শিশু ভিন্ন রোগী এবং আসন্নপ্রসবা নারীদের জন্য অতিরিক্ত ডিম বরাদ্দ হইয়াছে।

দুগ্ধ বরাদ্দের সময়েও শিশু ও আসন্নপ্রসবা জননীদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশু এবং আসন্নপ্রসবা জননীরা দৈনিক এক পাইণ্ট দুধ পান। সস্তা দামে অথবা অবস্থা বিবেচনায় বিনামূল্যে এই দুধ দেওয়া হয়। পাঁচ হইতে সতর বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য বরাদ্দ দৈনিক আধ পাইণ্ট। বয়স্কদের ভাগ্যে খুব কম জুটিলেও রোগী শিশু ও আসন্নপ্রসবা জননীরা যথেষ্ট দুধ পাইতে-ছেন।

তাজা ফল বিদেশ হইতে আমদানি হইত, উহা বন্ধ হওয়ায় আলু ও শাকসব্জীর দ্বারা ফলের ভিটামিন সি-র অভাব পূরণ করা হইয়াছে। ভিটামিন সি-র অভাবে শিশুরা যাহাতে রুগ্ন না হইয়া পড়ে সেজন্য বিদেশ হইতে কিছু পরিমাণে ফলের রস আমদানী করিয়া পাঁচ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুদিগকে

দেওয়া হয়। আলুতে ভিটামিন সি অল্প পরিমাণ থাকিলেও প্রচুর পরিমাণে আলু খাওয়ায় এই অভাব অনেকাংশে পূর্ণ হইতেছে।

একমাত্র চিনির বেলাতেই উহার অভাব সম্পূর্ণ পূরণ করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য উহার পরিমাণ খুব বেশী কমেও নাই। আগে লোকে যেখানে সপ্তাহে যে পরিমাণ চিনি পাইত তাহা অপেক্ষা মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কম পাইতেছে।

ব্রিটেনে গবর্মেণ্ট এবং বৈজ্ঞানিকদের সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারাই এই অসাধ্য সাধিত হইয়াছে। ব্রিটিশ দরিদ্র জনসাধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় যে পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই, যুদ্ধের মধ্যে নির্বিবাদে ও নির্ঝঞ্ঝাটে তাহারা উহা ভোগ করিতেছে।

ভারতে খাদ্যবরাদ্দ

ব্রিটেনের সহিত ভারতের খাদ্য বরাদ্দব্যবস্থা-তুলনা করিতে গেলে স্বাধীন ও পরাধীন গবর্মেণ্টের বিরাট পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। এ দেশে খাদ্যবরাদ্দ-ব্যবস্থায় বোম্বাই আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংলায়, বিশেষতঃ কলিকাতায়, উহা অসীম লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছে। ১৯৪৩ সালে লোকে যেখানে পঞ্চাশ টাকা দিয়াও চাউল সংগ্রহ করিতে পারে নাই, সেখানে ১৬৷০ আনা দরে আজকাল চাউল মিলিতেছে ইহাকেই অনেক সময় কলিকাতার রেশনিঙের সার্থকতা বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সরকারী কৃতিত্ব খুব বেশী নাই। গত দুই বৎসরে অপর্যাপ্ত ধান জন্মিয়াছে বলিয়াই কলিকাতাবাসী খাদ্য পাইতেছে এবং কলিকাতার বাহিরে যে চাউল ১০।১২ টাকা মণ, তাহাই ১৬৷০ দরে কিনিতে বাধ্য হইতেছে। চিনির বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম, ডাল অখাদ্য এবং আটা ময়দার অবস্থাও তদ্রূপ। চাউলও নিত্য পরিবর্তনশীল। চাউলের উৎকর্ষের প্রতি কোন দিনই লক্ষ্য রাখা হয় নাই, কয়েক মাস পূর্বেও কলিকাতাবাসীকে যে জঘন্য চাউল গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল তাহাতে সহরশুদ্ধ লোক নানাবিধ অসুখে ভুগিয়াছে। তীব্র আন্দোলনের ফলে ঐ চাউল দেওয়া আপাততঃ বন্ধ হইয়াছে। শিশু, রুগ্ন ও প্রসূতি প্রভৃতির জন্য ব্রিটেনের ন্যায় স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হয় নাই। রেশনের দোকানে যে শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য এখানে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সুস্থ ও সবল লোকেরই স্বাস্থ্যরক্ষা করা বহু ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নাই। দুধ বা দেহপুষ্টিকর খাদ্য সর্বসাধারণের জন্য বরাদ্দ করা ত দূরের কথা শিশু, রোগী ও প্রসূতিদের জন্যও উহার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ব্রিটেনে গবর্মেণ্ট শিশু, রোগী, প্রসূতি, ছাত্র, বালকবালিকা, কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া ৪ কোটি লোকের খাদ্য বরাদ্দ করিয়াছেন, আর এখানে বাংলা-সরকার ৪০ লক্ষ লোকের জন্য শুধু চাউল, আটা, চিনি ও ডাল বরাদ্দ করিতেই গলদঘর্ম হইয়াছেন। ব্রিটেনে গবর্মেণ্ট সকলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন; এ দেশে গবর্মেণ্ট রেশনিঙের নামে নাম মাত্র বন্দোবস্ত করিয়াই লোককে ধমকাইয়া নীরব রাখিতে চাহিয়াছেন, অতি কদর্য্য খাদ্য গ্রহণে আপত্তিও এখানে কেহ শোনে নাই। তারপর রেশনিঙের বাহিরের খাদ্য—সরিষার তৈল, ঘি প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য একে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য, তদুপরি ভেজাল। ভেজাল নিবারণের চেষ্টামাত্র গবর্মেণ্ট করেন নাই, এবং না করিয়া অসাধু ব্যবসায়ীদের প্রকারান্তরে উৎসাহই দিয়াছেন। সরকারী দোকানেই চাউল ও আটায় নির্বিবাদে ভেজাল চলিয়াছে, প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্মেণ্ট তাহার প্রতিকার করেন নাই, কর্পোরেশন ভেজাল নিবারণে অগ্রণী হইলে তাহাকে বাধা দিয়াছেন, দোকানের লোককে রক্ষা করিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নিজের দেশে জনসাধারণকে সেবা করিয়াছেন, এ দেশে তাঁহাদেরই শাখা গবর্মেণ্ট স্বভাবসিদ্ধ আমলাতান্ত্রিক ঔদ্ধত্যের সহিত জানাইয়াছেন যাহা করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, ইহারই জন্য দেশবাসীকে ধন্য ও চরিতার্থ বোধ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যের জন্য জনপ্রতি ব্যয় ৫ আনা: আমেরিকায় ৫৪ টাকা

অল-ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথের অধ্যক্ষ ডাঃ জে বি গ্রাণ্ট উক্ত প্রতিষ্ঠানের পাঁচ বৎসরের কার্য্যাবলীর বিবরণ প্রদান কালে এক সাংবাদিক সভায় ভারতবর্ষে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা ও তাহা উন্নত করিবার কয়েকটি উপায় বিবৃত করেন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৪ পর্যন্ত ইনষ্টিটিউটের কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া ডাঃ গ্রাণ্ট বলেন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের জনসাধারণের স্বাস্থ্য অতিশয় মন্দ। ভারতবর্ষের আর্থিক দুরবস্থাই এই স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম কারণ। জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে আমেরিকায় যে স্থলে জনপ্রতি ৫৪ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে, সেস্থলে ভারতবর্ষে মাথাপিছু ব্যয় ৫ আনা মাত্র। ইহাতে কোন সুফল লাভ হইতে পারে না। যদি ভাল ফল পাইতে হয়, তবে ব্যবস্থা ও প্রণালীর পরিবর্তন করিতে হইবে। যে সকল পদ্ধতি ও ব্যবস্থায় ফললাভ হইতে পারে সেগুলি কার্যতঃ প্রয়োগ করাই অল-ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথের সর্বপ্রথম কার্য্য।

ডাঃ গ্রাণ্ট কতকগুলি বাস্তব পন্থার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যদি কার্য পরিচালনার জন্য কোন পরিকল্পনা রচিত না হয় ও সেই অনুসারে কার্য্য না করা হয় তবে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কাগজপত্রেই নিবদ্ধ থাকিবে। কি ধারায় কার্য করিতে হয়, সিঙ্গুর চিকিৎসা সমিতি তাহা হাতে-কলমে করিয়া দেখাইয়াছেন। গবেষণা-লব্ধ ফল উভয়তঃ শহরের ও গ্রামের লোকের উপর প্রয়োগ করিবার জন্য ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঐ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (১) সাধারণ স্বাস্থ্য ও ম্যালেরিয়া দমন, (২) যক্ষ্মা ও যৌনব্যাধিসহ সংক্রামক রোগ দমন, (৩) প্রসূতি ও শিশুর পরিচর্যা, (৪) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান ও (৫) জন্ম-মৃত্যুর হিসাব গ্রহণ করা—এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত স্থানের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করাই ঐ সমিতির লক্ষ্য। তাঁহাদিগের পরীক্ষাকার্যের প্রধান লক্ষ্য এই যে, তাঁহারা গ্রাম্য স্বাস্থ্য কমিটি হইতে য়ুনিয়ন স্বাস্থ্য কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র আত্মনির্ভরশীল দলসমূহ গঠন করিতে চাহিতেছেন। সিঙ্গুরে অবলম্বিত পদ্ধতি দেশের সর্বত্রই প্রচলিত হইতে পারে। দ্বিতীয় প্রধান বিষয় এই যে, কার্য্যকরী

পদ্ধতি উদ্ভাবন করিলেই চলিবে না, লোককে ঐ পদ্ধতিগুলি প্রয়োগের কৌশলও শিক্ষা দিতে হইবে। যদি যথেষ্টসংখ্যক প্রয়োগনিপুণ ব্যক্তি না থাকেন তবে কোন দেশেরই উন্নতি হইতে পারে না।

শিক্ষার ন্যায় স্বাস্থ্যের জন্যও এ দেশে একটা লোকদেখান বিভাগ আছে। ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি প্রতিষেধযোগ্য রোগে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোককে মরিতে দেখিয়াও এ দেশের গবর্মেণ্ট তাহার প্রতিকারের যথাযোগ্য আয়োজন করা প্রয়োজন মনে করেন না। দেশবাসীর সাধারণ স্বাস্থ্যের ভাল মন্দের প্রতিও তাঁহারা একেবারে উদাসীন। গ্রামগুলিতে ডাক্তারখানার নামে কয়েক বোতল মিকশ্চার রাখিয়া দিয়াই গবর্মেণ্ট গ্রামবাসীদের প্রতি কর্তব্য সমাপন করিয়া থাকেন। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ শিশু ও প্রসূতিকে মরিতে দেখিয়াও তাঁহাদের কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয় না। ডাঃ গ্রাণ্টের ন্যায় একজন বিশিষ্ট আমেরিকান জনস্বাস্থ্যরক্ষায় এ দেশের গবর্মেণ্টগুলির অবহেলা লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। পরাধীন ভারতবর্ষের বিদেশী গবর্মেণ্টের যে-সব কীর্তি-কলাপ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া গেলেন, আমরা আশা করি দেশে ফিরিয়া আমেরিকাবাসীকে তিনি তাহার যথার্থ বিবরণ জ্ঞাপন করিবেন।

ম্যালেরিয়ায় ৯০ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু

সাংবাদিক সভায় অল-ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ হেলথ এণ্ড হাইজিনের রিপোর্ট আলোচনা করিবার অব্যবহিত পরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রশ্নোত্তরের নিম্নলিখিত যে সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে ডাঃ গ্রাণ্ট নিশ্চয়ই তাহা দেখিয়াছেন। সংবাদটি এই:

নয়াদিল্লী, ২৯শে মার্চ:—আজ কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে একটি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ টাইসন বলেন যে, ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে আনুমানিক ৯০৭২৪১৮ জন লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়।

বাংলা, আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারে মহামারী আকারে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। অপরাপর অঞ্চলেও এই রোগের আক্রমণ চলে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বাংলা ও পঞ্জাবের ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার যুদ্ধের পূর্বকালের গড়পড়তা হারকে ছাড়াইয়া যায়।

অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে মিঃ টাইসন বলেন যে, যুদ্ধের পূর্বে গড়ে আনুমানিক দুই লক্ষ দশ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হইত, বর্তমানে কুইনাইনের পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড ঔষধ বাজারে আমদানি করা হইয়াছে।—ইউ. পি.

যে আমেরিকা পানামা অঞ্চলের ভয়াবহ ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ রূপে বিতাড়িত করিয়াছে সেই দেশের লোকেরা ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে ছয় বৎসরে প্রায় এককোটি লোককে মরিতে দেখিয়া ভারতে ব্রিটেনের ট্রাষ্টিগিরি সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করে ডাঃ গ্রাণ্ট তাহা জানাইলে মন্দ হইত না।

পাকিস্থান দাবির অসারতা সম্বন্ধে সর সুলতান আমেদ

ভারত-সরকার এবং মুসলিম লীগ উভয় মহলেই সর সুলতান আমেদের প্রতিষ্ঠা সুবিদিত। কিছুদিন পূর্বে "ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সন্ধি" নামক একটি পুস্তকে পাকিস্থান সম্বন্ধে তিনি খোলা-খুলি ভাবে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথমেই তিনি দেখাইয়াছেন যে পাকিস্থানের কোন মানচিত্র রচনা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই এবং এই মানচিত্র আঁকিতে গেলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সমাধান কিরূপ হইবে তাহার প্রশ্নও তুলিয়াছেন:

(১) শিখেরা আত্মনিয়ণের অধিকার দাবি করিলে তাহাদের বেলায় কি হইবে? হিন্দুস্থানের মধ্যে থাকিতে চাহিলে তাহাদের বাসের জন্য কোন্ অঞ্চল নির্দিষ্ট হইবে?

(২) অম্বালা ও জলন্ধর বিভাগ কি পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে? করিতে চাহিলে তাহার যুক্তি কি?

(৩) অমৃতসর কি পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে?

(৪) উত্তর-পূর্ব পাকিস্থানের সরকারী ভাষা কি হইবে?

(৫) উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানের সহিত উত্তর-পূর্ব পাকিস্থানকে কি করিডোরের দ্বারা সংযুক্ত রাখা হইবে? রাখিলে কোন্ যুক্তিতে?

(৬) কলিকাতা পাকিস্থানের বাহিরে অথবা ভিতরে থাকিবে?

(৭) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানেরা যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগ করিয়া পাকিস্থানের বাহিরে থাকিতে চায় তাহা হইলে কি হইবে?

এই সব ভৌগোলিক সমস্যার আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে আরও একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। হিন্দু প্রদেশগুলিতে যে সব অল্পসংখ্যক মুসলমান থাকিবে তাহারা যাহাতে সেখানে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার পায় তাহার ব্যবস্থা কি হইবে? পাকিস্থান পরিকল্পনায় সেরূপ কোন বন্দোবস্ত ত হয়ই নাই, অধিকন্তু মুসলমানেরা হিন্দু-গরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দৌলতে যে সব-অতিরিক্ত সুবিধাভোগ করিতেছে সেগুলিও হারাইবে। সর সুলতান স্পষ্টই বলিতেছেন: "পাকিস্থান পরিকল্পনায় দুইটি স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হইয়াছে কিন্তু তাহাতে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

পাকিস্থানে মাইনরিটি সমস্যা

সর সুলতান আমেদ অতঃপর পাকিস্থানের মাইনরিটি সমস্যা সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ আলোচনা করিয়াছেন। পাকিস্থান সমর্থকেরা বলিয়া থাকেন যে স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রদ্বয়ে হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে, তাহাদের মুখ চাহিয়া হিন্দু-গরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি সদাচরণ করিতে বাধ্য হইবে। সর সুলতান দেখাইয়াছেন এই যুক্তি অসার। ভার্সাই সন্ধির পর ইউরোপে বলকানে মাইনরিটি সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধরণের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমস্যা আরও তীব্র। সীমান্তপ্রদেশ, বেলুচিস্থান, পঞ্জাব ও সিন্ধুতে মুসলমানের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬২ ভাগ। এই সংখ্যাধিক্যকেই কি ভারত বিভাগের দাবিরূপে গণ্য করা যায়? এই প্রশ্ন তুলিয়া সর সুলতান নিজেই বলিতেছেন যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের অনুপাত বিবেচনা করিলে দেখা যায় এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন মূল্য নাই। এই কয়টি প্রদেশের সহিত কাশ্মীর যোগ দিলে এবং অম্বালা বিভাগ বাদ দিলেও মুসল-

মানের সংখ্যানুপাত ৬৮% বেশী হয় না। উত্তর-পূর্ব পাকিস্থানে তো মুসলমানের সংখ্যানুপাত শতকরা মাত্র ৫৪ ভাগ

হিন্দু ভারতের মুসলমানেরা তথাকার পুরুষানুক্রমিক বাসস্থান তুলিয়া দিয়া পাকিস্থানে চলিয়া আসিবে সর সুলতানের মতে ইহা উৎকট কল্পনার পরিচায়ক, এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবারও কোন প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন না। মিঃ জিন্না নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা অসম্ভব। কেহ কেহ অবশ্য গত যুদ্ধের পর তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে নিজ নিজ জাতির লোক বিনিময়ের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যে সব গ্রীক আনাতোলিয়ায় এবং যে সব তুর্কী গ্রীসে গিয়া সবেমাত্র বসবাস সুরু করিয়াছিল শুধু তাহাদিগকেই স্বস্ব দেশে ফিরাইয়া আনা হয়। সর সুলতান দেখাইয়াছেন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে বহু শতাব্দী যাবৎ হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করিয়াছে. তাহাদিগকে পুরুষানুক্রমিক পৈত্রিক আবাস হইতে উচ্ছেদ করা অসম্ভব। ইহা ছাড়া অন্য সমস্যাও আছে। গ্রীস ও তুর্কীর মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ গ্রীক ও ৫ লক্ষ তুর্কীর বিনিময় হইয়াছিল। একমাত্র গ্রীসকেই নবাগত লোকদের নূতন ঘরবাড়ী তৈরি করিয়া দিবার জন্য এক কোটি পাউণ্ডেরও বেশী খরচ পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা করিতে গেলে তিন কোটি মুসলমানকে সরাইতে হইবে, মানুষের তৈরি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা অসম্ভব বলিয়া সর সুলতান মনে করেন।

এই সমস্যার আরও একটি দিক আছে। সর সুলতান লিখিতেছেন, "থিওরীর দিক দিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি সর্বজনগ্রাহ্য কিন্তু নিকৃষ্ট রাজনীতি ও নিকৃষ্টতর অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার কোন সার্থকতা থাকে না। কতকগুলি অঞ্চলে মুসলমানের সংখ্যানুপাত ৫৪ বা ৬২ বলিয়াই সেগুলিকে মুসলমানের পৈত্রিক নিবাস বলিয়া দাগিয়া দিলেই আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে না। আত্ম-বঞ্চনা কতকদূর পর্যন্ত মন্দ লাগে না, কিন্তু যথাসময়ে উহার প্রতিবিধান না করিলে মারাত্মক ফল ফলে। বিহারী মুসলমানের মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং কৃষ্টি ও জাতির দিক দিয়া তাহারা চট্টগ্রামের মুসলমানের সহিত অভিন্ন, বিহারী হিন্দুর সহিত তাহাদের সম্পর্ক নাই; তেমনি লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানের পৈত্রিক আবাস সিন্ধু বালুচিস্থান সীমান্তপ্রদেশ অথবা পশ্চিম পঞ্জাব, কৃষ্টি ও জাতি হিসাবে তাহারা বালুচি অথবা সীমান্তের পাঠানের সহিত অভিন্ন, যুক্তপ্রদেশের হিন্দুর সহিত তাহাদের কোন যোগ নাই—এই সব যুক্তি সকলে গ্রহণ না করিতেও পারে, অনেকে ইহাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়াও মনে করিতে পারে।"

পাকিস্থানের কোন কোন সমর্থক বলিয়া থাকেন যে "হোষ্টেজ নীতি" অনুসারে হিন্দুস্থানকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হইবে। শুধু সর সুলতান নহেন, পৃথিবীর যে কোন সভ্য লোকই ইহাকে বর্বরের রাজনীতি বলিয়া অভিহিত করিবে। হিন্দুস্থানের অধিবাসী কোন মুসলমানের উপর অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হিন্দুর উপর তাহার প্রতিশোধ লওয়া হইলে হিন্দুস্থানও হয়ত আবার পাল্টা জবাব দিবে। এই ভাবে হয় অনন্ত কাল এই বর্বরতা চলিতে থাকিবে নয়ত পাকিস্থানের হিন্দু এবং হিন্দুস্থানের মুসলমান মরিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে। হিন্দুস্থানের মুসলমানের "রক্ষার" জন্য যাঁহারা এই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন তাঁহারা শুধু মুসলমানের নয় মানবতার শত্রু। কোন বুদ্ধিমান সুবিবেচক মুসলমান নেতা ইহাতে সায় দেন নাই, দেওয়া সম্ভবও নয়।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্য

হিন্দুতে হিন্দুতে প্রভেদ, মুসলমানে মুসলমানে প্রভেদ এবং হিন্দুতে মুসলমানে প্রভেদ আমাদের দেশে চিরকালই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু এই প্রভেদ কোন দিনই পরস্পর হানাহানির কারণ হইয়া উঠে নাই। দীর্ঘ আট শতাব্দী যাবৎ হিন্দু মুসলমান ভারতবর্ষে পাশাপাশি বাস করিয়াছে এবং পরস্পরের সমাজ, কৃষ্টি ও ভাষা পরস্পরের মিলনে সমৃদ্ধ হইয়াছে। আমরা বহুবার ইহা দেখাইয়াছি সর সুলতান আমেদও তাঁহার নবরচিত গ্রন্থে ইহা বলিয়াছেন। এ দেশে মুসলমান শাসকেরা বিদেশাগত হইলেও ভারতবর্ষকেই মাতৃভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, বিদেশী ইংরেজের ন্যায় ভারতবর্ষকে বাহির হইতে শোষণের ক্ষেত্র করিয়া রাখিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। ইংরেজই প্রথম মুসলমানকে শিখাইতে আরম্ভ করে যে ভারতবর্ষ তাহার স্বদেশ নয়, আরব তাহার মাতৃভূমি; ভারতের মাটি হইতে মুসলমানকে উপড়াইয়া ফেলিয়া ইংরেজই তাহাকে নিজের ন্যায় বিদেশী আগন্তুকে পরিণত করিবার জন্য আরব ও তুরস্কের পানে তাহার দৃষ্টি ফিরাইবার চেষ্টা সুরু করে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি। এই ভেদনীতি প্রবর্তনের জন্য ধর্মপরায়ণতাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার ইংরেজের পক্ষে নূতন নয়, পূর্বে আয়র্লণ্ডে উহা ভালরূপেই করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদানকারী কর্কের মেয়র টেরেন্স ম্যাকসুইনীর অভিজ্ঞতাপ্রসূত একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা হইতে দেখা যাইবে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি ভারতে ও আয়র্লণ্ডে ঠিক একই ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। ম্যাকসুইনী তাঁহার স্বাধীনতার মূলনীতি নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন: "আয়র্লণ্ডে ধর্মবিরোধ নাই। আন্তরিক ধর্মপরায়ণতা আছে। দেশটিকে বিভক্ত করিবার জন্য ইংরেজ রাজনীতিবিদেরা উত্তর-আয়র্লণ্ডের লোকদের ক্যাথলিক প্রাধান্যের ভয় দেখাইয়া তাহাদের মন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এরূপ কোন বিপদের সম্ভাবনা পূর্বেও ছিল না, এখনও নাই; কিন্তু আমাদের শত্রুরা আইরিশ ঐক্য নষ্ট করিবার জন্য উত্তর-আয়র্লণ্ডে ধর্মবিরোধের বীজ বপন করিয়াছেন। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে ১৭৯৮ সালের প্রথম প্রজাতান্ত্রিক বিদ্রোহে উত্তর-আয়র্লণ্ডের প্রটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকরা সম্মিলিত ভাবে যোগ দিয়াছিল। আয়র্লণ্ডে প্রজাতন্ত্রবাদের অভ্যুদয়ের প্রথম কেন্দ্র বেলফাষ্ট। আয়র্লণ্ডকে পদানত রাখিবার জন্য বর্তমান অস্বাভাবিক ধর্মবিরোধ আমাদের শত্রুরাই সৃষ্টি করিয়াছে, দেশ স্বাধীন হইলেই উহা দূরীভূত হইবে।" ম্যাকসুইনীর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই; উত্তর-আয়র্লণ্ডের ব্রিটিশ পাকিস্থান ভিন্ন স্বাধীন আয়র্লণ্ডে আজ আর ধর্মবিরোধের চিহ্নমাত্র নাই। স্বাধীন ভারতেও ইহার ব্যতিক্রম হইবার কারণ নাই।

সর ফিরোজ প্রথমেই বলিয়াছেন তাঁহারা ভারত-সরকার হইতে কোন প্রকার নির্দেশ পান নাই। ১১ জন ভারতীয় ও ৪ জন ইউরোপীয় দ্বারা গঠিত "আমাদিগের সরকার" হইতে নির্দেশ পাইয়াছেন। ভারত-সরকার হইতে এই "আমাদিগের সরকার" ভিন্ন ইহা স্বীকার করিয়াও সর ফিরোজ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে তিনি ও তাঁহার বন্ধু "স্বাধীন জাতির" প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের মতানুসারে ভারতের উন্নতিবিধায়ক যাবতীয় কার্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া সানফ্রান্সিস্কো সম্মিলনে যাইতেছেন।

সানফ্রান্সিস্কো সম্মিলনের কথা বলিতে গিয়া সর ফিরোজ উৎসাহের আতিশয্যে "আমাদের সরকারে"র প্রকৃত বর্ণনা দিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সানফ্রান্সিস্কো সম্মিলন সম্পর্কে আমার একটি মানুষের কথা মনে পড়িতেছে, যিনি একটি ঝুড়ির মধ্যে বহু ব্যাঙ পুরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং সকল ব্যাঙই ঝুড়ির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে চাহিলে তিনি সকলকেই ভিতরে পাঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমার মতে সানফ্রান্সিস্কো সম্মিলনে ঠিক তাহাই ঘটিতে চলিয়াছে।"

বিশ্বভুবনে মানুষ আপন চিত্রেরই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। ব্যাঙের সংখ্যা এখানে বহু নহে, এগারোটি এবং উহাদের রক্ষক চারিজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ।

বিহারের বাঙালী সমিতি

বিহার-প্রবাসী বাঙালী সমিতির অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন পুরুলিয়ায় হইয়া গিয়াছে। সপ্ত কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে হওয়ায় সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত পি আর দাশ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত দাশ অভিভাষণে বলেন:

"বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রক্ষা করিবার জন্য আমরা প্রাণান্ত চেষ্টা করি। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি যে আজ ধ্বংসের মুখে তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? বাংলার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, বাংলার অর্থনৈতিক বনিয়াদ ভাঙিয়া গিয়াছে। গ্রামগুলি আজ শ্মশান এবং সেই শ্মশানে আজ মুনাফার তাণ্ডব নৃত্য। এই সর্বনাশ বিহারেও আসিতে পারে।

"বস্ত্রসঙ্কট এখানেও দেখা দিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতিরোধের জন্য আমরা কি করিতেছি? আমরা উচ্চ মধ্যবিত্ত লোকেরা চোরাবাজার হইতে চড়া দামে কাপড় কিনিয়া নিশ্চিন্ত আনন্দে গর্বানুভব করিতেছি, কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্তের কথা ভুলিয়াও একবার স্মরণ করিতেছি কি? সত্য কথা বলিতে কি, এখন নিম্ন মধ্যবিত্ত বলিয়া কোন শ্রেণীই নাই। নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা এখন মজুর-শ্রেণীতে নামিয়া গিয়াছে। তাহারা স্ত্রীপুরুষে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। বিহারে বাঙালী সমাজের প্রধান কর্তব্য এই দরিদ্র বাঙালীদিগকে বাঁচাইয়া রাখা। বাংলার সংস্কৃতিতে এই দরিদ্র বাঙালীরই দান সবচেয়ে বেশী।"

মধ্যবিত্ত বাঙালীর ধ্বংস সাধনের জন্য যাহা কিছু করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, নাজীমুদ্দীন মন্ত্রীমণ্ডলের সহায়তায় তাহা করা হইয়াছে। দুর্ভিক্ষে তাহাকে কোন প্রকার সাহায্য করা হয় নাই। দুর্ভিক্ষে বিপর্যস্ত পর্যুদস্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী যাহাতে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে পারে তৎপ্রতি দৃকপাত মাত্রও করা হয় নাই। বরং কয়লা, সরিষার তৈল প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের অভাব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আরও বিপদগ্রস্ত করা হইয়াছে। চাউলের দর কমিবার সঙ্গে সঙ্গে শাকসব্জী মাছ মাংসের দর চতুর্গুণ চড়িয়াছে, মরিয়াছে মধ্যবিত্ত বাঙালী। গবর্মেণ্ট পূর্ববৎ নির্বিকার রহিয়াছেন। তারপর তাঁহাদেরই সৃষ্ট বস্ত্রাভাবে মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে ঘরের বাহির হইয়া কর্তব্য কার্যে যোগদান অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। কণ্ট্রোলের দৌলতে রেশনের দোকানে, ঔষধের দোকানে, কয়লার দোকানে এত সময় তাহাকে নষ্ট করিতে বাধ্য হইতে হয় যে নিত্যকার বাঁধা কাজের পর অতিরিক্ত কোন কাজ করিয়া দু'পয়সা অতিরিক্ত আয়ের সময় তাহার থাকে না। লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা তো উপরিপাওনা। স্বল্প এবং অপুষ্টিকর আহারে ও তীব্র অভাবে লাঞ্ছনায় ও অপমানে বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারে যে তরুণ তরুণী আজ বাড়িয়া উঠিতেছে দেশের পক্ষে তাহার পরিণাম খুব সুখকর হইবে না। মধ্যবিত্ত বাঙালীর এই সর্বনাশ রোধ করিতে না পারিলে সমগ্র বাঙালী জাতির ধ্বংস অনিবার্য, ধনী ও শিক্ষিত বাঙালীরা যদি আজও তাহা না ভাবেন তবে ইহাদের সহিত তাঁহাদিগকেও ধ্বংসের অতল গহ্বরে নামিয়া আসিতে হইবে।

নূতন বাঙালী এফ-আর-এস

বিলাতের রয়েল সোসাইটির ফেলো হওয়া পৃথিবীর বিজ্ঞান-জগতে খুব বড় সম্মান। সংবাদ আসিয়াছে যে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এই সম্মান লাভ করিয়াছেন। সংখ্যা-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। এদেশে সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিক ও সুপরিকল্পিত গবেষণার উন্নতি তাঁহার দ্বারাই হইয়াছে। অধ্যাপক মহলানবীশ রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হওয়ায় ভারতবাসী গৌরব বোধ করিবে।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজের পঞ্চম মৃত্যু-বার্ষিকী

গত ২২শে চৈত্র দীনবন্ধু এণ্ডরুজের পঞ্চম মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এণ্ডরুজ খ্রীষ্টান পাদ্রিরূপে এদেশে আগমন করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে নির্দিষ্ট কার্য পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কর্ম গ্রহণ করেন। তিনি খাঁটি মানব-প্রেমিক ছিলেন। এই মানব-প্রেমই তাঁহাকে দুর্গত ভারতবাসীর সেবার দিকে টানিয়া আনে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। শান্তিনিকেতন তাঁহার প্রিয় কর্মস্থল ছিল। কিন্তু তাঁহার কর্ম এ স্থানেই নিবদ্ধ ছিল না। দক্ষিণ-আফ্রিকা, ফিজি ও অন্যান্য বহু স্থলে যেখানেই ভারতবাসীদের উপর উৎপীড়ন-নিপীড়ন হইত সেখানেই তিনি গমন করিতেন এবং তন মন তাহাদের সেবায় নিয়োজিত করিতেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষে যে-সব ইংরেজ এযাবৎ আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সেবা-ধর্মে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ শুধু কর্মবীর ছিলেন না, তিনি চিন্তাবীরও ছিলেন। তিনি সেবাধর্মে প্রণোদিত হইয়া বহু পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া তিনি

কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, পরে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর পঠনীয়। জাতিতে তিনি ইংরেজ, ধর্মে তিনি খ্রীষ্টান, কিন্তু সেবাধর্মে তিনি সমগ্র বিশ্বের। তাই ভারতবাসীকে তিনি এরূপ আপন করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সপ্রু কমিটির রিপোর্ট

সপ্রু কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটি দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে তাঁহারা পাকিস্থানের বিরোধী। কোন প্রদেশের পক্ষে ভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদানের অধিকারও অস্বীকৃত হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে ভারতের একতা, অখণ্ডতা ও যুক্ত নির্বাচন প্রথা মানিয়া লইলে মুসলমানেরা ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বর্ণহিন্দুদের সহিত সমান আসন পাইবেন। মুসলমানেরা এই সর্ত্তে সম্মত না হইলে হিন্দুরা তাহাদিগকে সমান সংখ্যক আসন দিতে বাধ্য থাকিবেন না। কমিটির সিদ্ধান্তের এই ধারাটি লইয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক বাদানুবাদ হইবে ইহাই স্বাভাবিক, হইয়াছেও তাই। রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভার ১৫ জন নেতা এক বিবৃতে হিন্দু মুসলমানে সমান আসন ভাগের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে জাতিকে প্রগতির পথে রাখিতে হইলে সম্প্রতি কিছুকালের জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে হইবেই। কিন্তু সে ত্যাগস্বীকার ফলপ্রদ একমাত্র যুক্তনির্বাচনেই হইবে। সপ্রু কমিটীর মূলমন্ত্র যুক্তনির্বাচন। যুক্তনির্বাচন না থাকিলে এই সমস্ত ব্যবস্থা দেশের ও জাতির পক্ষে ভীষণ অনিষ্টকর হইত।

সপ্রু কমিটি ভাবী শাসনতন্ত্রে দেশকে হিন্দু, মুসলমান, তপশীলী, শিখ, এংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদকেই সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির মূল দেশে থাকিয়াই যাইবে। এই ভাবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে দেশকে বিভক্ত করা ভারত-সাম্রাজ্য কায়েম রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনই প্রথম করিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে এই প্রথা ভারতবর্ষে তো ছিলই না, তাঁহাদের শাসন আরম্ভ হইবার গোড়ার দিকেও উহা ছিল না। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার দাবী প্রবল হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভেদনীতির প্রয়োগ ক্রমাগত চলিয়াছে। একটির পর একটি শাসনতন্ত্রে অধিকতর অধিকার দানের নামে এই ভেদনীতিকেই পাকা করিয়া আনা হইয়াছে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতে পর্যন্ত যুক্তনির্বাচনের স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে দেশকে বিভক্ত করিয়া পৃথক নির্বাচন প্রবর্তিত হইয়াছে। সপ্রু কমিটি কর্তৃক সাম্প্রদায়িক ভাগ কেবলমাত্র যুক্তনির্বাচন পুনঃ-প্রবর্তনের জন্য সাময়িক ভাবে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে।

শাসনতন্ত্র রচনা কমিটির আসন ভাগের যে হিসাব কমিটি দিয়াছেন কেন্দ্রীয় পরিষদের আসন নির্দ্ধারণও সেই অনুপাতেই তাঁহারা করিতে চাহিয়াছেন। হিসাবটি এই: কমিটিতে মোট ১৬০ জন সদস্য থাকিবেন, তন্মধ্যে হিন্দু ৫১, মুসলমান ৫১, তপশীলী হিন্দু ২০, ভারতীয় খ্রীষ্টান ৭, শিখ ৮, পার্বত্য জাতি ৩, এংলো-ইণ্ডিয়ান ২, ইউরোপীয়ান ১ এবং শিল্প, বাণিজ্য, জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক ও নারীপ্রতিনিধি ১৬। তিন-চতুর্থাংশ সদস্য উপস্থিত থাকিয়া ভোট না দিলে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না।

এই ভাবে আসন ভাগে মুসলমানেরা মোট আসনের শতকরা ৩২টি পাইয়াছেন এবং হিন্দু তপশীলী ও শিখ সদস্যেরা একযোগে পাইয়াছেন শতকরা ৫০। শিখেরা সাধারণ ভাবে হিন্দু সমাজের বাহিরে ছিল না, তাহাদের মধ্যে সম্প্রতি পৃথক হইবার যে চেষ্টা মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে তাহা রোধ করিবার জন্য এখন হইতেই শিখকে হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গণ্য করা কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এইরূপে ধরিয়াও হিন্দু আসন ন্যায্য প্রাপ্যের অনেক কম হইয়াছে, কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনে যুক্তনির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিলে যুক্তনির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের জন্য হিন্দুর পক্ষে এই ত্যাগ স্বীকার ব্যর্থ হইবে না। প্রতিক্রিয়াশীল লোকের হাতে ক্ষমতা অর্পণে শুধু হিন্দু কেন প্রগতিশীল মুসলমানেরাও ঘোর আপত্তি করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্বাচন ব্যবস্থা না থাকিলে প্রতিক্রিয়াশীল দলকে প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখা যায় না বলিয়াই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক এ দেশে পৃথক্ নির্বাচন প্রবর্তিত হইয়াছে। যুক্তনির্বাচন প্রথায় নির্বাচন হইলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমপ্রভাবে দেশের স্বার্থরক্ষায় ব্রতী লোক বা দলই নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সেখানে হিন্দু বা মুসলমান যে কেহ সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইলে হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাহা মানিয়া লয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতাই বর্তমানক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচ্য নয়, স্বদেশের মঙ্গলের প্রতি নিষ্ঠাই এখানে প্রধান। বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদের কথাই ধরা যাউক। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে হিন্দুরা বঙ্গীয় পরিষদে ন্যায্য প্রাপ্যের অনেক কম আসন পাইয়াছেন। বর্ণহিন্দুর সংখ্যা মাত্র ৫০। ইংরেজ ভাবিয়াছিল এই ৫০ জন বর্ণহিন্দুর বিরুদ্ধে ১১৯ জন মুসলমানকে দাঁড় করাইবে। ইঁহাদের মধ্য হইতে কতক লোক হিন্দুদের সহিত যোগদান করিলেও নিজেদের হাতে যাহাতে ক্ষমতা থাকে সেজন্য সর সামুয়েল ২৫টি ইউরোপীয় আসনের ব্যবস্থা করিয়াদম্ভভরে বলেন: "বাংলায় প্রগতিশীল মন্ত্রীসভা গঠন পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ারই ন্যায় অসম্ভব ব্যাপার হইবে।" কিন্তু পৃথক্ নির্বাচন সত্ত্বেও বাংলায় পাহাড় ধ্বসিয়াছে, ইউরোপীয়-দল-নিরপেক্ষ হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রগতিশীল মন্ত্রীসভা দেশ শাসন করিয়াছে। এই মন্ত্রীদলকে চক্রান্ত করিয়া সরাইয়া প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীদল গঠন করিয়াও দুই বৎসরের অধিককাল তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। পুনরায় ইউরোপীয়-দল-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রগতিশীল দল গঠিত হইয়াছে। ব্যালান্স অব পাওয়ার ইউরোপীয় দলের হাত হইতে সরিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশ জনের মধ্যে তিন জন ভিন্ন কোন বর্ণহিন্দুকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিয়া দলে টানা প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বাংলার যুক্তনির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হইলে প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

বাংলায় ৯৩ ধারা

প্রকৃতির প্রতিশোধ বোধ হয় এমনি করিয়াই আসে। যে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রীসভা অন্নাভাবে অর্দ্ধকোটি বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের মৃত্যু ঘটাইয়া কাপড়, কয়লা, সরিষার তৈল, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি একটির পর একটি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ ঘটাইয়া বাঙালীকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, নিজের দলের লোকেই তাহা শেষ পর্যন্ত সমর্থন করিতে পারিল না। নাজিমদলের প্রায় কুড়িজন সদস্য বিরোধী দলে যোগদান করিয়া বাংলার অপযশের কারণ এই মন্ত্রীমণ্ডলের পতন ঘটাইয়াছেন। সিভিল সাপ্লাই ও এ. আর. পি. প্রভৃতিতে অনাবশ্যক কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ, নৌকা নির্মাণে পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ, মন্ত্রী সাহাবুদ্দীনের জঙ্গলে কাঠ খুঁজিবার জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ এবং চাউল ক্রয়-বিক্রয়ে প্রায় ১৫ কোটি টাকা লোকসান বরাদ্দ প্রভৃতিতে রাষ্ট্রনৈতিক ঘুষের মাত্রা হাজার ছাড়িয়া কোটিতে পৌঁছিতে দেখিয়াই লোকে ভাবিয়াছে, এতটা সহিবে না, প্রকৃতি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেই। নাজিম মন্ত্রীসভার ধারক ও পরিচালক শ্বেতাঙ্গদলের পক্ষেও এতটা অনাচার সমর্থন করা সম্ভবপর হয় নাই।

ব্যবস্থা-পরিষদের ভোটকে সর নাজিমুদ্দিন আকস্মিক ভোট বলিয়াছেন। যুক্তি দিয়া বিচার করিলে ইহাকে কোনক্রমেই আকস্মিক ভোট বলা চলে না। ঐদিনই প্রাতে সংবাদপত্রে বিরোধী দল কর্তৃক চরম শক্তি পরীক্ষার সম্ভাবনার কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তা ছাড়া সর্বপ্রধান কথা এই যে, মন্ত্রীদলের ১৮ জন সদস্যের দলত্যাগেই বিরোধী দল জয়লাভ করিয়াছেন এবং ইঁহাদের দলত্যাগের সংবাদ প্রধান মন্ত্রী রাখেন নাই। এক দিনে কেহ দলত্যাগ করে না, ইহাদের অসন্তোষের কথা প্রধান মন্ত্রীর অজানা ছিল ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তিনি তাহার প্রতিকার করেন নাই বা করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শক্তি পরীক্ষার ইঙ্গিত সর নাজিমুদ্দীন পান নাই ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

নাজিম মন্ত্রীমণ্ডলীর পরাজয়ের পর দিন স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলি যে কারণে পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখিয়াছেন বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে তাহা এক বিশিষ্ট অধ্যায় রূপে পরিগণিত হইবে। মন্ত্রী নিয়োগ গবর্ণর করিয়া থাকেন ইহা সত্য, কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের আস্থাভাজন ব্যক্তিদেরই তিনি শুধু মন্ত্রী নিয়োগ করিতে বা মন্ত্রিত্বে বহাল রাখিতে পারেন ইহা গণতন্ত্রের মূল কথা এবং ভারত-শাসন আইন অনুসারে গবর্ণরদের যে উপদেশপত্র দেওয়া হয় তাহাতেও এই কথাই বলা হইয়াছে। মন্ত্রী নিয়োগ সম্বন্ধে গবর্ণর পরিষদের অভিমত গ্রহণ করিতে বাধ্য—নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির ইহাই মূল নীতি। ৯৩ ধারা অনুসারে বাংলা শাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের সময় মিঃ কেসি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি এই মূল নীতি সম্বন্ধে হাঁ বা না কিছুই বলেন নাই।

সর্ব্বদলীয় মন্ত্রীসভা ও গণতন্ত্র

বাংলায় আবার সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের কথা উঠিয়াছে, পূর্বের ন্যায় পুনরায় মৌলবী ফজলুল হক সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তাহা সমর্থন করিয়াছেন। সর্বদলীয় মন্ত্রীসভার সহিত গণতন্ত্রের সম্পর্ক কতটুকু তাহার আলোচনা হওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির অপর নাম দলগত শাসন। এক দল শাসনের ভার বহন করে। অপর দল তাহার বিরোধিতা করে, মন্ত্রীমণ্ডলের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করিয়া তাহাকে সতর্ক রাখে। প্রকাশ্য সমালোচনার ভয়ে মন্ত্রীদল কর্তব্য পালনে অবহিত থাকেন, অন্যান্য কাজ বা কর্তব্যে অবহেলা কোনটিই তাঁহারা করিতে সাহসী হন না। মন্ত্রীমণ্ডল কর্তব্যভ্রষ্ট হইলে মন্ত্রীদলের সৎ ব্যক্তিগণ বিরোধী দলে আসিয়া যোগদান করেন, তাঁহাদের শক্তিবৃদ্ধি হয় ও মন্ত্রীমণ্ডলের পতন ঘটে। বিরোধী দল তখন শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করেন। গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির ইহাই মূল নীতি। আমেরিকা ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশ এই পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে। সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিলে বিরোধী দল থাকে না, ফলে মন্ত্রীদলকে কর্তব্য পালনে সতত জাগ্রত রাখিবার কেহ থাকে না। ইহাতে গবর্মেণ্টের পক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে, জনসাধারণেরও স্বার্থ হানি হয়।

"যুদ্ধের সময় ব্রিটেন সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল দলের সর্বদলীয় মন্ত্রীমণ্ডল হইতে যতই সরিয়া আসিতে চাহিতেছে প্রতিক্রিয়াশীল চার্চিল দল তাঁহাদিগকে ততই জোরে আঁকড়াইয়া ধরিতে ব্যগ্র হইতেছেন। প্রতিক্রিয়াপন্থী দলের পক্ষে কোয়ালিশনের সুবিধা এই যে তাহাদিগকে প্রগতিপন্থী প্রোগ্রামের যতটুকু মানিতে হয়, প্রগতিশীল দলকে নিজ কর্মধারা ও আদর্শ তদপেক্ষা অনেক বেশী ছাড়িতে হয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত এইভাবে প্রগতিশীল দল মিলিতে গেলে দেশের উন্নতি অনেক পিছাইয়া যায়। বিলাতের শ্রমিক দল ইহা বুঝিয়াছেন তাই পার্লামেন্টের আগামী নির্বাচনের কথা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক নেতা বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলের শ্রম-মন্ত্রী মিঃ বেভিন তীব্র ভাষায় সর্বদলীয় মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন শ্রমিক দল ইহাতে কিছুতেই রাজি হইবে না। দেশের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক উভয়বিধ নীতি সম্বন্ধেই এই যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে শ্রমিক দল নিজ আদর্শ ও কর্মপন্থা রচনা করিয়াছেন, সাম্রাজ্যবাদী দলের সহিত একযোগে চলিবার খাতিরে নিজেদের আদর্শবাদ তাঁহারা কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না।"

বাংলাতেই এই কথাই প্রযোজ্য। মন্ত্রিত্ব চাকুরী নহে, পাঁচ জনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করাই উহার সার্থকতা নয়। মন্ত্রিত্বের অর্থ দেশসেবা, দেশের স্বার্থ রক্ষায় সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাই মন্ত্রিত্বের উদ্দেশ্য। এক আদর্শ ও এক কর্মপন্থায় অনুপ্রাণিত এক অবিচ্ছেদ্য দলের পক্ষেই শুধু ইহা সম্ভব। আপোষের ক্ষেত্র ইহা নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা দলগত শাসনে দুই বৎসরে দেশের যেটুকু উন্নতি করিতে পারিয়াছিল বাংলা ও আসামের কোয়ালিশন মন্ত্রীদল সাত বৎসরে তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে নাই, ইহা আজ সর্বজনবিদিত সত্য।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইউরোপে মিত্রপক্ষ পশ্চিম যুদ্ধপ্রান্তে এবং রুশসেনা পূর্ব্বপ্রান্তে শেষনিষ্পত্তির জন্য প্রচণ্ড সংগ্রামে রত। যুদ্ধের বর্ত্তমান গতিপথ যে ভাবে চলিয়াছে তাহাতে দুই প্রান্ত সংযুক্ত হইয়া জার্ম্মানী দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এদিকে জার্ম্মানীর উত্তর-পশ্চিম ভাগে রুর অঞ্চল মিত্রপক্ষের বেড়াজালে আবদ্ধ যাহার অর্থ এই যে জার্ম্মানীর বৃহত্তম অস্ত্রনির্ম্মাণ কেন্দ্র দুইটির মধ্যে একটি এখন দেশের অন্য অংশের সহিত যোগরহিত। মার্কিন বর্ম্মবাহিনীগুলির মধ্যে একটি এখনও অপ্রতিহত ভাবে দক্ষিণ ঝুঁকিয়া পূর্ব্বমুখে চলিতেছে, সে পথেও জার্ম্মানীর কয়েকটি ছোটবড় অস্ত্রনির্ম্মাণকেন্দ্র রহিয়াছে। ফলত এখন জার্ম্মান রণপরিষদ উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছে। অস্ত্রকেন্দ্র বাঁচাইতে গেলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সেনা লই[illegible] প্রচণ্ড শক্তিপরীক্ষায় পড়িতে হয়, এবং তাহা না করিলে অস্ত্রের অভাবে সৈন্যদের যুদ্ধশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সুতরাং বর্ত্তমানে যুদ্ধের পরিস্থিতি যেরূপ তাহাতে মিত্রপক্ষের শেষনিষ্পত্তির চেষ্টায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়িতেছে। মিত্রপক্ষের প্রধান বক্তা মিঃ চার্চ্চিল ইতিমধ্যেই বলিয়াছেন যে জয়লাভ দৃষ্টির সীমার মধ্যেই পৌঁছাইয়াছে। সোভিয়েটের বক্তাদিগের মতে তাহা আগামী গ্রীষ্মের মধ্যেই আসিয়া যাইবে।

জার্ম্মান রণপরিষদ এখন কেবলমাত্র প্রতিরোধ চেষ্টায় ব্যস্ত এবং তাহাতেও যুদ্ধের গতিবেগ কমা ভিন্ন অন্য কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যুদ্ধ এখন যে ভীষণ রূপ ধারণ করিয়াছে তাহাতে এরূপ প্রচণ্ড সংগ্রাম দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে। হয় আর অল্প কিছুদিনের মধ্যে জার্ম্মান রক্ষীদল ছত্রভঙ্গ হইবে নহিলে মিত্রপক্ষের আক্রমণের তেজে কিছু সাময়িক মন্দা পড়িতে বাধ্য। সেই সন্ধিক্ষণ এখন বেশী দূরে নাই, সুতরাং এখন যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে উভয় পক্ষই প্রাণপণ লড়িতেছে এবং উভয়েরই শক্তির শেষ সীমা পর্য্যন্ত সমরপ্রান্তে নিয়োজিত হইয়াছে। এখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যে সকল সংবাদ আসিতেছে তাহাও বিশেষ ভাবে সংক্ষিপ্ত কেননা কোন পক্ষই অন্য পক্ষকে কোনও সন্ধান দিতে প্রস্তুত নহে।

মিত্রপক্ষের আক্রমণের মধ্যে ব্রিটিশ ও কানাডিয় সেনার অগ্রগতি প্রবল প্রতিরোধচেষ্টার উপর দিয়া চলিতেছে। মণ্টগোমেরীর সৈন্য অগ্নিপ্লাবন বহাইয়া পদে পদে বিপক্ষের বাধা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইতেছে। এরূপ যুদ্ধে দুই পক্ষেরই ক্ষয়ক্ষতি ও ক্লান্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলে এবং সে ব্যাপারে জার্ম্মান দলের সেনা, সংখ্যায় ও অস্ত্রবলে বহু লঘিষ্ঠ হওয়ায়, হটিয়া যাইয়া রক্ষাব্যূহ ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই পশ্চিম প্রান্তের ঐ অংশের উপর মিত্রপক্ষের দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ। রুর অঞ্চলে এক বিরাট্ অবরোধ-পর্ব্ব যাহাতে না দাঁড়ায় সেই চেষ্টায় মার্কিন সেনানী এখন অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে যুদ্ধ চালাইতেছে। এসেনের শহরের রক্ষণ-ব্যবস্থা ছেদ করিয়া মার্কিন সেনা ভিতর মুখে লড়িয়া চলিতেছে যাহাতে এই অবরোধ-পর্ব্ব অল্প দিনেই শেষ হয়। আরও দক্ষিণে মার্কিণ সেনা বিরাট্ অনুপাতে বর্ম্ম ও কামান ব্যবহার করিয়া আগে চলিতেছে, তবে যুক্ত অভিযানের অন্য অংশকে বেশী পিছনে রাখিয়া তাহারা দ্রুত ঝটিকাযুদ্ধ চালায় নাই। এই এক অংশে মিত্রপক্ষের অভিযান সম্পূর্ণ স্থানযুক্ত ও সচল।

পূর্ব্ব প্রান্তে রুশ সেনা এখন নূতন পথে জার্ম্মানীর রক্ষাব্যূহ ধ্বংসের চেষ্টা দেখিতেছে। উত্তরের যুদ্ধ অনেক ক্ষেত্রেই স্থলবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, সেখানে কোনও দ্রুত নিষ্পত্তির চিহ্ন এখন দেখা যায় না। নীচে ভিয়েনার মুখে এখন রুশ সেনা প্রবল আক্রমণ চালাইতেছে এবং তাহার কিছু উত্তরে অন্য এক বাহিনীও প্রচণ্ড যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এখন আর কোথাও পূর্ব্বেকার ঝটিকাযুদ্ধের রূপ দেখা যাইতেছে না, এখন প্রবল ঘাতপ্রতিঘাতের উপর দিয়া বিপক্ষকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলিতেছে। পূর্ব্ব-ইউরোপে শীত ঋতু বিদায় লইয়া বসন্তের আগমনীর আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তুষার দ্রবের পঙ্ক প্লাবনও এখন চলিতেছে। সম্ভবতঃ ইহারই দরুন সোভিয়েট সেনার আক্রমণ এখন স্থলবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য বলা যায় না যে যুদ্ধের এইরূপ গতি কোনও পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সমরকৌশল অনুযায়ী কিনা। যদি তাহাই হয় তবে তাহাও অল্প দিনের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

ইটালীতে সম্প্রতি উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই, অন্ততঃ পক্ষে পশ্চিম ও পূর্ব্ব প্রান্তের যুদ্ধের তুলনায় বলিবার মত সেখানে কিছু হয় নাই। ইউরোপের দক্ষিণ অঞ্চলকে মিঃ চার্চ্চিল ইউরোপের "নরম উদরস্থল" (soft underbelly) আখ্যা দিয়া সেখানকার আক্রমণের উপর অনেক কিছু আশা করিয়াছিলেন এবং ইটালীর পতনে সে আশা আরও বাড়িয়াছিল। বর্ত্তমানে সেখানে কোনও বিশেষ কিছু সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। নিকট ভবিষ্যতে ইউরোপের মহাসমরে কোনও নিষ্পত্তি হইলে তাহার সম্ভাবনা পূর্ব্ব বা পশ্চিম যুদ্ধ প্রান্তেই হইবে বলিয়া মনে হয়।

জার্ম্মাণীর পতন কত দূরে এবং তাহা কি ভাবে হইবে সে সম্বন্ধে অল্পে অল্পে মিত্রপক্ষের অধিকারীবর্গ মতামত প্রকাশ করিতেছেন। সোভিয়েটের মুখপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে রুশ অধিকারীবর্গ মনে করেন জার্ম্মাণী শেষ পর্য্যন্ত উত্তর জার্ম্মাণীতে লড়িয়া যাইবে এবং সেখানেই শেষ পর্য্যন্ত "গরম জলের কেটলীতে সিদ্ধ" হইয়া হিটলার প্রমুখ সকলকে লইয়া নাৎসী দল ধ্বংস হইবে। অন্য দিকে আইজেনহাওয়ার মনে করেন যে হয়ত ব্যূহবদ্ধ যুদ্ধ শেষ হইলে প্রখর গরিলা যুদ্ধ জার্ম্মাণী ছাইয়া চতুর্দ্দিকে জ্বলিতে থাকিবে। বলা বাহুল্য এসকল মতের বিচার সম্ভব নহে, কেননা, বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার পরিণতি অনিশ্চিত। জার্ম্মান রক্ষাব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইলে—যাহা এখনও কোথাও হয় নাই—তাহার ফল একরূপ হইবে অন্য দিকে তাহা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াও যদি অবিচ্ছিন্ন থাকে তবে অন্যরূপ হইবে।

মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগর অভিযান জাপানের বাস্তুভূমির চৌহদ্দীর ভিতর হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং জাপানের উপর বোমাক্ষেপণের কার্য্যও বাড়িয়াছে, কিন্তু এখনও তাহা সেরূপ ধ্বংসকারী মূর্ত্তি ধারণ করে নাই। ঐরূপ বোমাক্ষেপণে জাপানের যুদ্ধচেষ্টায় সাময়িক বাধার সৃষ্টি হইতে পারে বটে,

কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ক্ষতি হইয়া জাপানের শক্তি কমাইবার, এমন কি শক্তিবৃদ্ধি রোধ করিবার কার্য্য অগ্রসর এখনও হইতেছে কিনা সন্দেহ। জাপানের নৌবহরের শক্তি বিষম আঘাত পাইয়াছে এবং পাইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেখানেও ক্ষতির পরিমাণ কতটা তাহা বলা সম্ভব নহে। প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিন অভিযানের সকল প্রগতির কারণে জাপানের মন্ত্রীপরিষদে কয়েক মাসের মধ্যেই দুই বার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন হইতে নানা দৈবজ্ঞ নানারূপ ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাহা বুঝা যায় তাহাতে মনে হয় যে জাপান বুঝিতে পারিয়াছে যে চরম শক্তিপরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে এবং সেই অবস্থার জন্য সে সকল দিকে প্রস্তুত হইতেছে। মার্কিন নৌ অভিযান এবং স্থল অভিযান যাহার প্রধান অংশ এখনও ফিলিপিনে আবদ্ধ—যেরূপ দৃঢ়ভাবে এবং ক্ষতির দিকে দৃকপাত না করিয়া চালিত হইতেছে তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক ও প্রশংসার্হ সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

বিস্ময় ও প্রশংসার কথা ছাড়িয়া এসিয়ায় যুদ্ধ নিষ্পত্তির কথা পাড়িলে দেখা যায় যে প্রশান্ত মহাসাগরের খণ্ড অভিযানগুলি এসিয়ার চরম মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্বের অংশমাত্র। জাপানের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধপ্রিয় জাতির পক্ষে এই আঘাত ও ক্ষতি যে সাংঘাতিক নহে ইহা বলা বাহুল্য। বরঞ্চ ইহা দ্রষ্টব্য যে জলে প্রায় শক্তিশূন্য এবং আকাশে হটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাহার যুদ্ধদানের সংকল্পে কিছুমাত্রও প্রভেদ ঘটে নাই। সুতরাং জাপান যে হঠাৎ অস্ত্র ছাড়িয়া আত্মসমর্পণ করিবে এবং এসিয়ায় যুদ্ধ সহজেই মিটিয়া যাইবে একথা ভাবাও ভুল এবং সে বিষয়ে মার্কিন যুদ্ধচালকগণ তাঁহাদের দেশকে বারংবার সতর্ক করিয়াছেন। জাপানের নৌবহরই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং বিশেষ সময় না পাইলে এবং আকাশে জাপানী বিমানবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি না হইলে তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন না হওয়াই সম্ভব। জাপানী আকাশবাহিনীও মার্কিন আকাশঅভিযানের সম্মুখে হটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্প্রতি সে ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার সম্যক ভাবে যুদ্ধদানের চেষ্টা জাপান করিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় স্থলে স্থাপিত আকাশবাহিনী মার্কিন নৌবাহিত আকাশবাহিনীকে হটাইবার জন্য রিউচু ও ওকিনাবা অঞ্চলে অতি দৃঢ়ভাবে আক্রমণ চালাইতেছে। ইহার ফলাফলের উপর মার্কিন জাপান-বিরোধী অভিযানের গতি ও গন্তব্যপথ দুইয়েরই অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে; স্থলযুদ্ধের হিসাবে জাপানের ক্ষতি এখনও সামান্যই হইয়াছে। তাহার কতকগুলি সুশিক্ষিত এবং নিপুণ সৈন্যবাহিনী মরিয়া হইয়া লড়িয়া যাহার মার্কিন নাম "আত্মঘাতী যুদ্ধ"—শেষ সৈন্য পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহার ফলে তাহার ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অন্য দিকে জাপান সময় পাইতেছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরও ক্ষতি করিতেছে। ক্ষতির পরিমাণও এতদিন সাংঘাতিক হয় নাই, কেননা, ক্ষতি যাহা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক নূতন সৈন্য জাপান প্রতি বৎসর ভর্ত্তি করিয়া সুশিক্ষিত করিতেছে। জাপানের প্রধান সমস্যা সময় একথা বহুবার লিখিত হইয়াছে এবং মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্যই জাপান যাহাতে সেই সম নির্ব্বিবাদে না পায় তাহার ব্যবস্থা করা। জাপান প্রায় তি বৎসর সময় পাইয়া গিয়াছে এবং আরও কিছু পাইবে মনে হয় কেননা, ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ না হইলে মিত্রশক্তির সম্পূ ক্ষমতা জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইতে পারে না। মি পক্ষের সৌভাগ্যক্রমে মিঃ চার্চ্চিলের "এশিয়া অপেক্ষা করুক এই মহামূল্য বাণী মার্কিন রণনায়কগণ সময় থাকিতে অগ্রা করেন এবং প্রশান্ত মহাসাগর অভিযান সবলে চালিত করেন।

রুশ-জাপান যুদ্ধ-নিবারক সন্ধি বিচ্ছেদ করার এক বৎসরে বিজ্ঞপ্তি দান করার পর সোভিয়েট জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধার করিবে কিনা এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার মূল কারণ জাপানে শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধির প্রমাণ ক্রমে প্রকাশিত হওয়া। যে বিরা শক্তি মার্কিন প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানে জলে আকাশে ও স্থলে প্রযোজিত রহিয়াছে তাহার পরিচয় জনসাধারণ অল্পে অল্পে পাইতেছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে কেহ ভাবে নাই যে জাপান ঐরূপ প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেও পারিবে। এখন দেখা যাইতেছে যে জাপানের সঙ্গে শেষ নিষ্পত্তির সময় উহা অপেক্ষা কয়েকগুণ অধিক শক্তি না প্রযুক্ত হইলে এশিয়ার যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অত্যন্ত ক্ষয় সাপেক্ষ হইবে। যদি সোভিয়েট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে তবে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী না হওয়াই সম্ভব এবং সেইজন্যই মিত্রপক্ষের সাধারণের ঐ বিষয়ে এত উৎকণ্ঠা। জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান কেবলমাত্র জলপথে প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম জলরাশি বাহিয়া ছোট ছোট দ্বীপমালার পথে চালিত হইলে তাহা কত দিনে কত দূর অগ্রসর হইতে পারিবে তাহা বলা যায় না। সুতরাং এসিয়ার মূল ভূমিখণ্ডে মিত্রপক্ষের ঘাঁটি স্থাপন করিয়া জলপথে ও স্থলপথে চতুর্দ্দিক দিয়া জাপান আক্রমণের কথা উঠিয়াছে এবং সেরূপ ব্যবস্থায় সোভিয়েটের সাহায্য মিত্রপক্ষের নিকট নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।

সোভিয়েটের সাহায্য না পাইলে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান চালনার পথ চারিটি। প্রথম পথ যে দিক দিয়া বর্ত্তমান অভিযান চলিয়াছে সেই পথে, অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া সলোমন, মারিয়ানা, ফিলিপিন, বোনিন রিউচু দ্বীপমালাগুলিতে ছোট বড় ঘাঁটি স্থাপিত করিয়া নৌবহরের সাহায্যে জাপানের বাস্তভূমির উপর চড়াও করা, যাহা অত্যন্ত অনিশ্চিত এবং কঠিন ব্যাপার। যদি কোনওক্রমে মার্কিন নৌবহর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে তবে সমস্ত এসিয়ার অভিযান বিপদ্গ্রস্ত হইতে পারে। দ্বিতীয় পথ প্রশান্ত মহাসাগর বাহিয়া ফিলিপিন হইয়া দক্ষিণ চীনে যুদ্ধ প্রান্ত গঠন। এখান হইতে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা বিশেষ সময়সাপেক্ষ, কিন্তু জাপানের নৌবহরের এবং স্থলস্থাপিত আকাশবাহিনীর কেন্দ্র দূরে থাকায় অভিযানের সঙ্কট অপেক্ষাকৃত কম। তৃতীয় পথ বর্ম্মারোড ও চুংকিং হইয়া, সে পথ সঙ্কীর্ণ এবং বিশেষ সময় সাপেক্ষ, কেননা, সবকিছুই অল্পে অল্পে করিতে হইবে। চতুর্থ পথ ব্রহ্মমালয় ইন্দোচীন হইয়া দক্ষিণ চীনের পথে, সে পথের শেষ অতিদূরে এবং সময় হিসাবে তাহার অন্ত নাই বলিলেই চলে যদি কেবল এই পথেই অভিযান চালিত হয়।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীবিমলাচরণ দেব

পূর্ব প্রবন্ধে [আশ্বিন, ১৩৫১] বিদ্যাদানের কথা বলিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিদ্যাগ্রহণের কথা বলিতেছি।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, দান করা সহজ, গ্রহণ করা সহজ নয়। বিদ্যা সম্বন্ধে এই নিয়ম বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। এইজন্যই বোধ হয় বলে—"গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক।" যত দূর দেখা যায়, এই অবস্থা প্রাচীন কালেও ছিল। কারণ কাঠকোপনিষৎ-এ দেখি—

"আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ"

এই বিষয়ের "কুশল বক্তা," অর্থাৎ যিনি খুব পরিষ্কার ভাবে বিষয়টি বুঝাইতে পারেন, পাওয়া খুবই শক্ত। তাহার চেয়েও শক্ত—এইরূপ কুশল বক্তা দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া সেই উপদেশ সম্পূর্ণ ও যথোপদিষ্ট ভাবে গ্রহণ করিতে পারে, এমন লোক। যেমন একটা উদাহরণ দিই—সূর্য্য বা চন্দ্র নিজ নিজ রশ্মি দিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু সেই রশ্মি সকলে গ্রহণ করিতে পারে না। পারে কেবল সূর্য্যকান্ত বা চন্দ্রকান্ত মণি। অতি দুর্লভ।

এই রকম কথাই আছে—"চরক সংহিতা"তে—যেখানে বলা হইতেছে, মহর্ষি কৃষ্ণাত্রেয়ের শিষ্যরা সকলে সমান হইলেন না কেন? তাহার উত্তর—"বুদ্ধের্বিশেষস্তত্রাসীন্নোপদেশান্তরং মুনেঃ" (চরকসংহিতা, ১, ১, ১২), অর্থাৎ শিষ্যদের বুদ্ধির অর্থাৎ গ্রহণ ধারণ শক্তির ইতরবিশেষ ছিল, মহর্ষি কোনও শিষ্যকে ভাল করিয়া ও কোনও শিষ্যকে খারাপ করিয়া পড়াইয়াছিলেন, তাহা নয়। (এখানে মনে পড়ে—হাতে রাখিয়া ও পক্ষপাত করিয়া পড়াইবার দুর্নাম দ্রোণাচার্য্যের ছিল, কিন্তু অর্জুন নিজ প্রজ্ঞার জোরে সে সমস্ত কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন।)

প্রজ্ঞা থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে পড়া শুনা সমস্তই বৃথা। এই কথা মহাভারত ২, ৫৫, ১ (চি)তে আছে—

"যস্য নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলং তু বহুশ্রুতঃ।
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্বী সূপরসানিব॥"

প্রজ্ঞা শুধু থাকিলে হইবে না, প্রজ্ঞাকে বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক—চরক সংহিতা, ১, ৯, ১৮তে আছে—

"শস্ত্রং শাস্ত্রাণি সলিলং গুণদোষপ্রবৃত্তয়ে।
পাত্রাপেক্ষীণ্যতঃ প্রজ্ঞাং চিকিৎসার্থং বিশোধয়েৎ॥"

এখানে আমার বোধ হয় "চিকিৎসা" অর্থে "সম্যক্ প্রকার জানিবার ইচ্ছা।" সম্যক্ প্রকারে কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইলে নিজ প্রজ্ঞাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তাহা না হইলে জ্ঞান সম্যক্ রূপে চিত্তে প্রতিফলিত হয় না। যে জ্ঞান সম্যক্ নয়, তাহা অজ্ঞানের অপেক্ষাও অপকারী। এই কারণে, প্রজ্ঞা বিশুদ্ধ হইলে তবে মানুষ জ্ঞানার্জনের উপযুক্ত পাত্র হয়। শস্ত্র, শাস্ত্র ও সলিলের দোষ গুণ তাহারা যে পাত্রকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করে।

এই রূপে গুরু ও শিষ্য উভয়েই বিশুদ্ধপ্রজ্ঞাযুক্ত হইলেই ঠিক হয়। কারণ তখন এক জন উপদেশ দিতে ও অপর জন সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হন। এই কথাই ম, ভা, ১২, ১২০, ৯১ (চি) তে আছে—

"বক্তা শ্রোতা চ বাক্যং চ যদা ত্ববিকলং নৃপ।
সমমেতি বিবক্ষায়াং তদা সোঽর্থঃ প্রকাশতে॥"

বক্তা, তাহার বাক্য ও শ্রোতা, এই তিন অ-বিকল হইলে, অর্থাৎ কোনও রূপ বৈকল্য দোষযুক্ত না হইলে, অর্থ সম্যক্ প্রকাশ পায়। এই তিনের একটিরও বৈকল্য সম্যক্ অর্থ প্রকাশের পরিপন্থী।

যদি গুরু "আশিষ্ঠ" হন এবং শিষ্যও সম্যক্ গ্রহণধারণক্ষম হয় তাহা হইলেই গুরু শিষ্য সম্পর্ক সাফল্য লাভ করে ও অশেষ কল্যাণের কারণ হয়। এই আশা করিয়াই শান্তি পাঠ—গুরুশিষ্যের সংযুক্ত প্রার্থনা—

"সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥"

এ রকম না হইলে বিপদ, অর্থাৎ গুরু যদি ঠিক বুঝাইতে না পারেন বা শিষ্য যদি ঠিক গ্রহণ করিতে না পারে, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। "তয়োরন্যতরো মৃত্যুং ("তয়োরন্যতরঃ প্রৈতি") বিদ্বেষং বাঽধিগচ্ছতি"। জ্ঞানই জীবন, "পরমা প্রশান্তি"। অসম্যক্ জ্ঞানই মৃত্যু। অসম্যক্ জ্ঞান হইতে মানসিক অশান্তি, অতৃপ্তি ও বিদ্বেষ, এবং বিদ্বেষ হইতে মৃত্যু উৎপন্ন হয়। এই জন্য গুরু ও শিষ্য উভয়েরই প্রজ্ঞা থাকা দরকার এবং তাহা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া দরকার।

যিনি গুরু হইবেন, তাঁহার সম্বন্ধে বলা আছে—"অসংশয়ঃ সংশয়চ্ছিন্নিরপেক্ষো গুরুর্মতঃ"। অর্থাৎ তিনি নিজে "অসংশয়", তাঁহার কোনও সংশয় নাই, সমস্তই সুনিশ্চয়ভাবে জানেন। নিজেই যে শুধু "অসংশয়" তাহা নহে, তিনি "সংশয়চ্ছিদ", অর্থাৎ যদি কাহারও মনে কোনও বিষয়ে সংশয় হয় ও সে তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত করে, তিনি তাহা ছেদন করিতে সমর্থ,—যে কথা লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ১.১.৭ এ "বাগ্মী" শব্দ ব্যাখ্যা করিতে অগ্নিস্বামী বলিয়াছেন—"যো হি পৃষ্টঃ সন্ ন্যায়েন প্রতিবচনং প্রদদাতি, স বাগ্মী, মতিদ্বৈধে উৎপন্নে সংশয়চ্ছেত্তা"। এরূপ লোক কাহার বা কিসের অপেক্ষা রাখিবেন? কাজেই নিরপেক্ষ। বলা বাহুল্য, "অসংশয়", "সংশয়চ্ছিদ", "নিরপেক্ষ", ইহার কোনটিই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবান্ ব্যতীত আর কেহই হইতে পারেন না। এই অর্থেই নারদ সম্বন্ধে মহাভারত ১২.২৩০.১৭ (চি)তে বলা আছে—"অতীর্ণসংশয়ো বাগ্মী"।

গুরু ও শিষ্য উভয়েই প্রজ্ঞাবান্ হইলেই হয় না—আরও একটি কথা থাকে—সময়। বিদ্যাদান ও গ্রহণে কতখানি সময় লাগিবে, বিদ্যা যে অসীম ও জীবন সসীম, ইহা সর্বকালে সর্বত্রই জ্ঞানপিপাসুদের আক্ষেপের বিষয়। ল্যাটিনে প্রবাদ আছে—Ars longa, vita brevis এই আক্ষেপই পাণিনি ব্যাকরণের পাতঞ্জল মহাভাষ্যে পাই—

"বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তেন্দ্রশ্চাধ্যেতা দিব্যং বর্ষসহস্রং

কালো ন চান্তং জগাম। কিং পুনরদ্যত্বে যঃ সর্বথা চিরং জীবতি স বর্ষশতং জীবতি। চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈর্বিদ্যোপযুক্তা ভবত্যাগমকালেন স্বাধ্যায়কালেন প্রবচনকালেন ব্যবহার-কালেনেতি। তত্র চাগমকালেনৈবায়ুঃ পর্য্যুপযুক্তং স্যাৎ"।

প্রবক্তা (অর্থাৎ আচার্য্য বা গুরু) যে সে লোক নহেন, স্বয়ং বৃহস্পতি। অধ্যেতা (বা শিষ্য) যে সে লোক নহেন, স্বয়ং ইন্দ্র। অধ্যয়নকালও বড় কম নয়—দিব্যবৎসরের এক সহস্র। তাহাতেও পড়া শেষ হইল না। এখনকার কালে লোকে যদি খুবই দীর্ঘজীবী হয়, ত একশত বৎসর। কিন্তু বিদ্যা "ব্যবহৃত" হয় চারি রকমে—

প্রথমেই "আগম" (অর্থাৎ গুরুর নিকট গ্রহণ), তাহার পরেই "স্বাধ্যায়" (অর্থাৎ নিজে নিয়মপূর্বক অধ্যয়ন), তাহার পর "প্রবচন" অর্থাৎ উপযুক্ত শিষ্যকে উপদেশ), তাহার পরে "ব্যবহার" (অর্থাৎ সেই বিদ্যার প্রয়োগ)। এখন দেখি, প্রথমটি অর্থাৎ "আগম"এ বা বিদ্যা গ্রহণ করিতেই আয়ুঃ কাটিয়া যায়। বাকি তিনটার সময় পাওয়া যায় না।

এই প্রকার "আগম" বা বিদ্যাগ্রহণমাত্র যে খুব সময় ও শ্রমসাপেক্ষ, বলা বাহুল্য। বস্তুতঃপক্ষে, ষোল আনা জ্ঞানের মধ্যে, শিষ্য গুরুর নিকট এই "আগম"এর দরুণ, মাত্র চারি আনার জন্য ঋণী।

ম. ভা. ৫.৪৪.১৬ (চি) নীলকণ্ঠ টীকাতে পাই—

"আচার্য্যাৎ পাদমাদত্তে পাদং শিষ্যঃ স্বমেধয়া।
কালেন পাদমাদত্তে পাদং সব্রহ্মচারিভিঃ॥"

শিষ্য আচার্য্যের নিকট হইতে "আগম"এর আকারে জ্ঞানের এক পাদ বা চতুর্থাংশ পায়, অর্থাৎ গুরুর নিকট প্রাপ্ত "আগম" দ্বারা জ্ঞানের পত্তন হয়। আর এক পাদ পায় নিজ মেধার দ্বারা। শিষ্যের মেধা না থাকিলে গুরুর উপদেশ ঐ পর্য্যন্তই রহিয়া গেল। এই পর্য্যন্ত হইল দুই পাদ। তৃতীয় পাদ শিষ্য পায় কালের দ্বারা, অর্থাৎ গুরুর উপদেশ শিষ্য নিজ মেধা সাহায্যে অনেকটা বুঝিতে পারে, বলা বাহুল্য। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তৎপরে কালাতিক্রম হইলে সেই অতিক্রান্ত সময়ে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা সাহায্যে শিষ্য যদি গুরূপদেশ আবার মনন করে তখন দেখিতে পায় যে, সে পূর্বে যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছিল তাহার অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সময়ে সময়ে ঐ পরিবর্ত্তন বহুলাংশে আবশ্যক মনে হয়। এই পর্য্যন্ত শিষ্য নিজ মেধা দ্বারা ও কাল-ক্রমার্জ্জিত অভিজ্ঞতা সাহায্যে মনন দ্বারা বহুদূর অগ্রসর হইতে পারে। এইরূপে শিষ্য গুরুর চারি আনা, নিজ মেধা দ্বারা চারি আনা ও কালক্রমার্জ্জিত অভিজ্ঞতা সাহায্যে চারি আনা, মোট বার আনা পায়। বাকি চারি আনা পায় নিজ বহির্ভূত এক স্থান হইতে—উহা "সব্রহ্মচারী", অর্থাৎ সতীর্থগণের সহিত সম্ভাষা দ্বারা। এরূপ বহু স্থলে দেখা যায় যে, কোনও বিষয় বেশ বুঝিয়াছি মনে হইতেছে, কিন্তু কোনও সতীর্থের সহিত আলাপে বুঝিলাম, বিষয়টি কোনও এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে সে দেখিয়াছে, কিন্তু সে দৃষ্টিকোণটি আমার এড়াইয়া গিয়াছে। এ স্থলে এই নূতন সঙ্কেতটি তথ্যোপলব্ধি সম্বন্ধে আমার বিশেষ সহায়ক হইল। এখন এক দিকে নিজ মেধা ও কাললব্ধ অভিজ্ঞতা এবং অপর দিকে সতীর্থসম্ভাষালব্ধ সঙ্কেত সাহায্যে অক্লান্ত মনন দ্বারা আমার জ্ঞান ষোল আনা হইল। এই মনন যে কত বড় বলা যায় না। গুরূপদেশ ব্যতীত জ্ঞানার্জ্জন আরম্ভ হয় না বটে, কিন্তু মননের মূল্য গুরূপদেশের "শত" গুণ। কারণ, বিনা মননে গুরূপদেশ "মৃত", জড় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই জন্য বলে—"শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননম্"।

এই জন্যই বলিয়াছি যে, ষোল আনা জ্ঞান গুরূপদেশের পর বহু সময় ও বহু শ্রম, উভয়েরই অপেক্ষা রাখে। এ অবস্থায় "আগম"ই সমস্ত জীবন লইতে পারে বলিয়া পতঞ্জলির আক্ষেপ বৃথা নয়। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে "আগম"এ অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনমাত্র করিতে দিন ফুরাইল। "স্বাধ্যায়", "প্রবচন", "ব্যবহার",—এক কথায় "ক্রিয়া"র সময় পাইলাম না। এরূপ জ্ঞান অর্জনে লাভ কি ? "হতং জ্ঞানং ক্রিয়াহীনম্"। অর্জন না করিয়া লোকসানই বা কি ?

এইরূপে জ্ঞানের অসীমতা ও আয়ুঃর সসীমতা মানব সভ্যতার আদিযুগ হইতে জ্ঞানান্বেষীমাত্রকে ব্যাকুল করিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে এরূপ বহু লোক হইয়াছেন, যাঁহাদের জ্ঞানের জন্য বুভুক্ষা সর্বগ্রাসী বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা বিশ্বসংসারের সমস্তই জানিতে চাহেন। ইঁহাদের পক্ষে আয়ুঃর সসীমতা জন্য আক্ষেপ অতীব তীব্র।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য তিনটি উপায় উদ্ভাবিত হইল। প্রথমটি—জ্ঞানান্বেষীকে বলা হইল—"জ্ঞান ত অসীম, সেই অসীমের কোনও এক অংশ তোমার বিশেষ আবশ্যক বোধে বাছিয়া লও এবং উহারই সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর।" ইহাতে জ্ঞাতব্যের পরিধি যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হইল।

দ্বিতীয়টি—"তোমার নির্বাচিত বিষয়ে যাহা সারভূত, তাহারই অন্বেষণ কর।" অর্থাৎ যাহা দ্বারা তোমার কার্য্য-সাধন হইবে। জ্ঞানের বহুতা দ্বারা কার্য্যের হানিই হয়। যে লোক "ইহা জানিব", "ইহা জানিব" করিয়া ছুটাছুটি করে, সে শতকল্পেও আসল জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারে না। এই কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৪১,১৮-১৯ এ আছে—

"সারভূতমুপাসীত জ্ঞানং যৎ কার্য্যসাধকম্।
জ্ঞানস্য বহুতা যেয়ং যোগবিঘ্নকরা হি সা॥
ইদং জ্ঞেয়মিদং জ্ঞেয়মিতি যস্তৃষিতশ্চরেৎ।
অপি কল্পসহস্রেষু নৈব জ্ঞেয়মবাপ্নুয়াৎ॥"

তৃতীয়টি—মানবের মেধার সসীমতার জন্য এই নিয়ম করিতে হইয়াছে। "মেধা" অর্থে "অতিতানস্মৃতি" ("বৃহৎ সংহিতা" ৬৭.৩৬. ভট্টোৎপল টীকা)—অর্থাৎ খুব বিস্তৃত স্মৃতিশক্তি। যে সম্পর্কে Ruskin তাঁহার এক শিক্ষকের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"He had a capacious memory, the most indispensable prerequisite of all sound learning" Sir William Hamilton-এর "Lectures on Metaphysics"-এ Giulio Guidi নামক এক কর্সিকাবাসীর কথা আছে। ইনি ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে পাড়ুয়াতে অধ্যয়নের জন্য আসিয়াছিলেন। ইনি নাকি ৩৬,০০০ পরস্পর অসংলগ্ন কথা, প্রথম হইতে শেষ, বিপরীত ভাবে শেষ হইতে প্রথম ইত্যাদি নানা প্রকারে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। আমাদের দেশেও

"মেধা", ধারণা বা স্মৃতিশক্তিকে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে—"আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"

মানুষের স্মৃতিশক্তির এই সসীমতা উপলব্ধি করিয়াই ধারণ-সৌকর্য্যার্থে, প্রথমতঃ, লক্ষণানুসারে বিশ্বের অগণ্য বস্তুর শ্রেণী বিভাগ করা হয়। কারণ, অগণ্য বস্তু প্রত্যেকটি পৃথক্ ভাবে মনে রাখা অসম্ভব, কিন্তু যদি তাহাদের সাধারণ লক্ষণ অবলম্বনে তাহাদের কতকগুলি করিয়া লইয়া এক এক শ্রেণীতে সম্বদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে সত্ত্বগুলির সংখ্যা স্বল্পতর হওয়ায় মনে রাখা সহজ হয়। এই কথাই নিরুক্তে দুর্গাচার্য্য টীকাতে আছে—

"ঋষয়োঽপ্যুপদেশস্য নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বশঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥"

ইহাতেও বোধ হয় স্মৃতিশক্তির উপর অত্যাচার যথেষ্ট কমে না। এই ভার আরও লাঘবের জন্য আবার "সূত্র" "অক্ষরমুদ্রা" প্রভৃতির উদ্ভব।

এই "ধারণা" যে বিশেষ দরকার, বলা বাহুল্য। কারণ, পড়াশুনা করিয়া যদি "ধারণা" না হইল, মনে না রহিল, সে পড়া শুনায় লাভ কি? সে পড়া শুনা ত হস্তিস্নানবৎ একেবারেই ব্যর্থ। শুধু পড়িলে, জানিলে হইবে না। মনে রাখা একান্ত আবশ্যক। এই কথাই শতপথ ব্রাহ্মণে (১. ৫. ১. ৬.) আছে—"দেবান্ যক্ষদ্ বিদ্বাংশ্চিকিত্বানিতি।" এখানে সায়ণ বলিতেছেন—

"বিদ্বান্ ইত্যনেন যষ্টব্যদেবতাপরিজ্ঞানম্।
চিকিত্বান্ ইতি পরিজ্ঞাতস্যার্থস্যাঽবিস্মরণম্।"

যাহা শিখিয়াছি, তাহা ভুলিয়া না যাওয়া। মনে রাখিতে না পারিলে "মনন" অসম্ভব। মনন না করিলে গূঢ়ার্থবোধ হয় না। এই বিষয়ই আছে মনু, ১২. ১০৩, এ—

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ গ্রন্থিভ্যো ধারিণোবরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥"

অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাঁহারা গ্রন্থী, অর্থাৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন; আবার—গ্রন্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি ধারী, অর্থাৎ গ্রন্থ যে শুধু পড়িয়াছেন, তাহা নয়, স্মৃতিশক্তিতে ধরিয়া রাখিয়াছেন। আবার—এই ধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যিনি জ্ঞানী, অর্থাৎ গ্রন্থ যে শুধু অধ্যয়ন ও ধারণ করিয়াছেন, তাহা নয়, তাহার গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন। কারণ, যিনি শুধু "ধারী", তিনি বস্তুতঃ "চলন্ত আলমারী" অপেক্ষা বেশী কিছু নহেন। আবার—জ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি ব্যবসায়ী, অর্থাৎ যিনি জ্ঞান অর্জন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। (ইহাকেই পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে "ব্যবহার" বলিয়াছেন)। কারণ, জ্ঞানার্জন করিলাম, কিন্তু সে জ্ঞান কাজে লাগাইলাম না, সে জ্ঞানে লাভ কি? "হতং জ্ঞানং ক্রিয়াহীনম্।" এই সম্বন্ধেই আক্ষেপ আছে—ম-ভা-৫, ৩৯-৩৮ (চি) তে—"উপলভ্য চাঽবিদিতং বিদিতং চাঽননুষ্ঠিতম্", যাহা জানা উচিত, তাহা জানিলাম না; যদি বা জানিলাম, সে মত কাজ করিলাম না। আরও মনে পড়ে—

"শাস্ত্রাণ্যধীত্যাঽপি ভবন্তি মূর্খাঃ
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্।
সুচিন্তিতং চৌষধমাতুরাণাং
ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্॥"

কাজেই দাঁড়াইল—শিষ্যের কর্ত্তব্য শুধু গুরুর নিকট অধ্যয়ন নয়। অধ্যয়নের পর "ধারণ", তাহার পর ধারিত বিষয় মনন দ্বারা গূঢ়ার্থ উপলব্ধি, তাহার পর সেই উপলব্ধ অর্থকে কাজে আনা, প্রবচন ও ব্যবহার দ্বারা। ঠিক বলিতে গেলে, মননলব্ধ বস্তু বা উপলব্ধি (যাহাকে সাধারণতঃ "জ্ঞান" বলিয়া থাকে) প্রকৃত পক্ষে "জ্ঞান" পদবাচ্য হয় না, যতক্ষণ না পর্য্যন্ত উক্ত মননলব্ধ বস্তু প্রবচন ও ব্যবহারে প্রযুক্ত হয়।

এই কথা বুঝিতে গেলে চরক সংহিতা ৩. ৮ (বিমান স্থান, ৮ম অধ্যায়) মনে পড়ে। সেখানে এই বিষয় সুন্দর ভাবে বলা আছে—শিষ্য গুরুর নিকট "কৃৎস্নং শাস্ত্রমধিগম্য শাস্ত্রস্য দৃঢ়তায়াম্ অভিধানসৌষ্ঠবস্যাঽর্থস্য বিজ্ঞানে বচনশক্তৌ চ ভূয়ঃ প্রযতেত সম্যক্।" অর্থাৎ গুরুর নিকট সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়া শাস্ত্রে দৃঢ়তা, সুষ্ঠু ভাবে বাক্যের ও তদর্থের বিশেষ জ্ঞান এবং বলিবার অর্থাৎ, ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি—এই সমস্ত জন্য পুনঃ পুনঃ সম্যক্ চেষ্টা করিবে।

ইহার উপায় বলিতেছেন—"তত্রোপায়ঃ ব্যাখ্যাস্যন্তে। অধ্যয়নম্ অধ্যাপনম্ তদ্বিদ্যসম্ভাষেত্যুপায়াঃ।" অর্থাৎ ইহার তিনটি উপায়—(১) অধ্যয়ন, (২) অধ্যাপন, (৩) তদ্বিদ্যসম্ভাষা। যথাক্রমে বলিতেছি—

(১) "অধ্যয়ন"—চরক বলিতেছেন—

"তত্রাঽয়মধ্যয়নবিধিঃ, কল্যঃ কৃতক্ষণঃ প্রাত-
রুত্থায়োপব্যূষং বা কৃত্বাঽবশ্যকম্ উপস্পৃশ্যোদকং
দেবগোব্রাহ্মণগুরুবৃদ্ধসিদ্ধাচার্য্যেভ্যো নমস্কৃত্য
সমে শুচৌ দেশে সুখোপবিষ্টো মনঃপুরঃ-
সরাভির্বাগ্ভিঃ সূত্রমনুক্রামন্ পুনঃপুনরাবর্ত্তয়েৎ
বুদ্ধ্যা সম্যগনুপ্রবিশ্যাঽর্থতত্ত্বং স্বদোষপরিহার—
পরদোষপ্রমাণার্থমেব মধ্যন্দিনেঽপরাহ্নে রাত্রৌ চ
শশ্বদপরিহাপয়ন্নধ্যয়নমভ্যস্যেদিত্যধ্যয়নবিধিঃ।"

ইহা দেখিতেছি—বেদবিদ্যার্থীর "স্বাধ্যায়"এরই রকমফের। বেদবিদ্যার্থীর "স্বাধ্যায়" ও আয়ুর্বেদবিদ্যার্থীর "অধ্যয়ন" এই দুয়ের মধ্যে যে অল্প প্রভেদ, তাহা বোধ হয় বিষয়বস্তুর প্রভেদের জন্য। যেমন স্বাধ্যায়ে "অপাং সমীপে", "গত্বাঽরণ্যং" (মনু, ২. ১০৪), "প্রাচ্যাং দিশি গ্রামাদচ্ছদির্দর্শ উদীচ্যাং প্রাগুদীচ্যাং বোদিত আদিত্যঃ" ইত্যাদি।

যাহা হউক, মোটমাট জিনিসটা একই—গুরুর নিকট লব্ধ উপদেশ ধারণ করিয়া মনে পুনঃ পুনরাবর্ত্তন।

(২) "অধ্যাপন"—ইহা দেখিতেছি বেদবিদ্যার 'প্রবচন'। কারণ, গোড়াতেই—"অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্যঃ শিষ্যমাদিতঃ পরীক্ষেত।" অধ্যাপন করিতে হইলে আচার্য্য প্রথমেই শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

এই স্থানেই আচার্য্য বা প্রবক্তা প্রথম জানিতে পারেন যে, তিনি নিজে "অসংশয়" হইয়াছেন কিনা। বক্তব্য বিষয়ে তাঁহার নিজের সম্যক্ জ্ঞান হইয়াছে কি না। অনেক সময় দেখা যায় যে, মনে হয় "বেশ বুঝিয়াছি," কিন্তু কাহাকেও বুঝাইতে গেলে দেখা যায় যে, অনেক স্থলেই "আবছায়া" গোছের

ভাবটা ঠিক পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারি নাই, ভাবপ্রকাশের জন্ত উপযুক্ত কথাও ঠিক জোগাইতেছে না। এই সময়ে এই চাপে ক্রমে ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, কাজেই ঠিক উপযুক্ত কথাও জোগায়। আচার্য্যের নিজ জ্ঞান স্ফুটতর, পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপে বলা যায় যে, আচার্য্য বিদ্যা দান করিতে গিয়া নিজেই বিদ্যা গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতেও যে জ্ঞানের সম্যক্ পরিপুষ্টি হয়, তাহা নহে।

এই অসম্পূর্ণতা ঘুচাইবার উপায়—(৩) "তদ্বিদ্যসম্ভাষা"—অর্থাৎ যাঁহারা সেই বিদ্যায় বিদ্বান্, তাঁহাদের সহিত সম্ভাষা বা কথোপকথন। ইহা দুই ভাবে হইতে পারে—(ক) সন্ধায় সম্ভাষা, (খ) বিগৃহ্যসম্ভাষা। অর্থাৎ, যদি সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি অকোপন ও অনসূয়ক হন এবং অনুনয় করিলে সমস্ত বলিবেন এরূপ হন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট বিনীতভাবে প্রশ্ন করিয়া সমস্ত জানিয়া লইতে পারা যায়। ইহাই "সন্ধায় সম্ভাষা।" কিন্তু যদি সেই বিদ্বান্ উপরোক্ত গুণবিহীন হন তাহা হইলে তাঁহার সহিত "বিগৃহ্য সম্ভাষা।" অর্থাৎ ঝগড়া করিয়া রাগাইয়া দিয়া কথা কহিবে। তাহা হইলে তর্কের মুখে উদ্দিষ্ট বিষয়ের গূঢ়ার্থ প্রকাশ পাইবে।

এরূপে দেখিতেছি—জ্ঞান সম্বন্ধে এই সমস্ত ব্যাপার মোট দুই ভাগে ভাগ করা যায়—"অর্জ্জন" ও "প্রয়োগ"। গুরূপদেশ, অধ্যয়ন (বা স্বাধ্যায়), ও "তদ্বিদসম্ভাষা", এই কয়টি লইয়া "অর্জ্জন"। অধ্যাপন (বা প্রবচন) ও ব্যবহার, এই দুইটি লইয়া "প্রয়োগ"। প্রথমটি Theoretical ও দ্বিতীয়টি practical বলা যায়। এই ভাবেই অর্জুনের নিকট অভিমন্যুর শিক্ষা সম্বন্ধে আছে—"আগমে চ প্রয়োগে চ চক্রে তুল্যমিবাত্মনা" (ম. ভা. ১. ২২১. ৭৪)। আগম theory, প্রয়োগ practice

এই ভাবেই প্রভেদে দেখান আছে—সুশ্রুত সংহিতা, ১. ৩. ১৮তে—

"যস্ত কেবল শাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ"

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্র (theory মাত্র) জানেন, কর্ম practice জানেন না। বস্তুতঃপক্ষে, এই "আগম" (বা "শাস্ত্র") যদি "কর্ম" (বা "প্রয়োগ")এ নিয়োজিত না করা হয় তাহা হইলে "প্রত্যক্ষ" হয় না। "প্রত্যক্ষ" না হইলে "জ্ঞান" সম্পূর্ণ হয় না। কারণ theoryতে অনেক কিছু খুব সোজা মনে হয়, কিন্তু practiceএ দেখা যায় কত তফাৎ। এই "প্রয়োগ" বা "কর্ম" দ্বারা পূর্ণীকৃত "জ্ঞান"ই আসল ও চরম জ্ঞান। ইহার পূর্বাবস্থা পর্য্যন্ত যে "জ্ঞান," তাহা ঠিক সম্পূর্ণ জ্ঞান নহে। এইরূপে প্রয়োগ বা কর্ম দ্বারা পূর্ণীকৃত জ্ঞানকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে "জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।" সকল "আগম" এরই অন্তিম গন্তব্য স্থান এই 'প্রত্যক্ষ,' অর্থাৎ পূর্ণ সত্যের সহিত অব্যবহিত সাক্ষাৎকার। যে "আগম" প্রত্যক্ষে পৌঁছিল না, সে "আগম" মধ্যপথে অবসন্ন, ব্যর্থ। এরূপ "আগম"-এর উপর কেহ নির্ভর করিবে না।

কেবল মাত্র "আগম" বা "শ্রুত" সাহায্যে সত্য দর্শন এবং "প্রয়োগ" দ্বারা সত্যের সহিত "প্রত্যক্ষ" বা অব্যবহিত সাক্ষাৎকার—এই দুই এর মধ্যে যে "অন্তরং মহদন্তরং," বলা বাহুল্য।

এইরূপে—(১) কেবলমাত্র "আগম" বা "শ্রুত" অবলম্বনে যাঁহার সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান এবং (২) যিনি সত্য সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, ইহার মধ্যে শেষোক্তই যে শ্রেষ্ঠ, বলা বাহুল্য। ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

এই "প্রত্যক্ষ" যে সহজলভ্য নয়, বলা বাহুল্য। নিরুক্তে (১৩. ১২) এই সম্বন্ধে আছে—"ন হ্যেষু প্রত্যক্ষমস্ত্যনৃষেরতপসো বা," অর্থাৎ যিনি ঋষি বা তপঃপরায়ণ নহেন তাঁহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তপঃপরায়ণ না হইলে ঋষি হওয়া সম্ভব নহে। তপঃ কি ?—

"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
তজ্জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্ম্মো পর উচ্যতে॥
ম. ভা. ১২. ২৫০. ৪ (চি)

যতক্ষণ মনঃ ইন্দ্রিয়াদি একাদশ বহির্মুখী থাকিবে ততক্ষণ কোনও আসল কাজ হওয়া অসম্ভব। এই একাদশকে এক সঙ্গে অন্তর্মুখী করিলে (focus) তবে তপঃ হয়, তবে সত্যের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। এই কথাই কাঠকোপনিষৎ ২. ১. ১এ আছে—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্
পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃত্তচক্ষু-
রমৃতত্বমিচ্ছন্॥"

যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই একাদশ "আবৃত্ত" অর্থাৎ মোড় ঘুরাইয়া অন্তর্মুখী না হইতেছে ততক্ষণ সত্যসাক্ষাৎকার অসম্ভব।

এই অন্তর্মুখী করার ফলে দুইটি পরস্পরবিরোধী ভাবের একাধারে সমন্বয় সম্ভব হয়—একান্ত অনুরাগ ও একান্ত বৈরাগ্য। অর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণে একান্ত অনুরাগ, এবং তদ্ব্যতীত সমস্ত বিষয়ে (যথা, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য পারিপাট্যাদি) একান্ত বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যকেই উদ্দেশ করিয়া পাঠ্যাবস্থাকে "ব্রহ্মচর্য্য" বলে। এই কথাই আছে—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৪.৪.৩এ—

"ব্রহ্মচর্য্যং ভগবতি বৎস্যামি।"

এই সময়ে খুব কঠোরভাবে থাকিতে হয়। নারদ বলেন—

"যোঽহেরিব গণাদ্ ভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব।
রাক্ষসীভ্য ইব স্ত্রীভ্যঃ স বিদ্যামধিগচ্ছতি॥
দ্যূতং পুস্তকশুশ্রূষা নাটকাসক্তিরেব চ।
স্ত্রিয়স্তন্দ্রী চ নিদ্রা চ বিদ্যাবিঘ্নকরাণি ষট্"
—স্মৃতিচন্দ্রিকা, ১. পৃ. ৫২

"গণাৎ" স্থলে "গণাৎ" পাঠান্তর আছে।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য সময়ে যে ব্যক্তি গণ (বা গণ, অর্থাৎ দল দঙ্গল)-কে সাপের মত ভয় করে, আরাম বা তৃপ্তি করিয়া খাওয়াকে নরকের মত ভয় করে, স্ত্রীলোককে রাক্ষসীর মত ভয় করে, সেই বিদ্যা প্রাপ্ত হয়। দ্যূত, অত্যধিক পুস্তকশ্রবণ (too much reading), নাটকাদি অভিনয় দর্শনে আসক্তি, স্ত্রী, আলস্য, নিদ্রা এই ছয়টি বিদ্যাগ্রহণে বিঘ্ন উৎপাদন করে।

সর্ব বিষয়ই দেশকাল পাত্রের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু যদি এই একাগ্রতা একান্ত হয় তাহা হইলে দেশ, কাল বা পাত্রের কোনও বিচারের বা অপেক্ষার আবশ্যকতা থাকে না। "যত্রৈকাগ্রতা তত্রাঽবিশেষাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৪. ১. ৬. ১১)। বিদ্যা অধিগত হইবেই, সন্দেহ নাই, যদি শিষ্য উপরোক্ত ধরণে একনিষ্ঠ হইয়া চেষ্টা করে।

["চি"—চিত্রশালা প্রেস সংস্করণ]



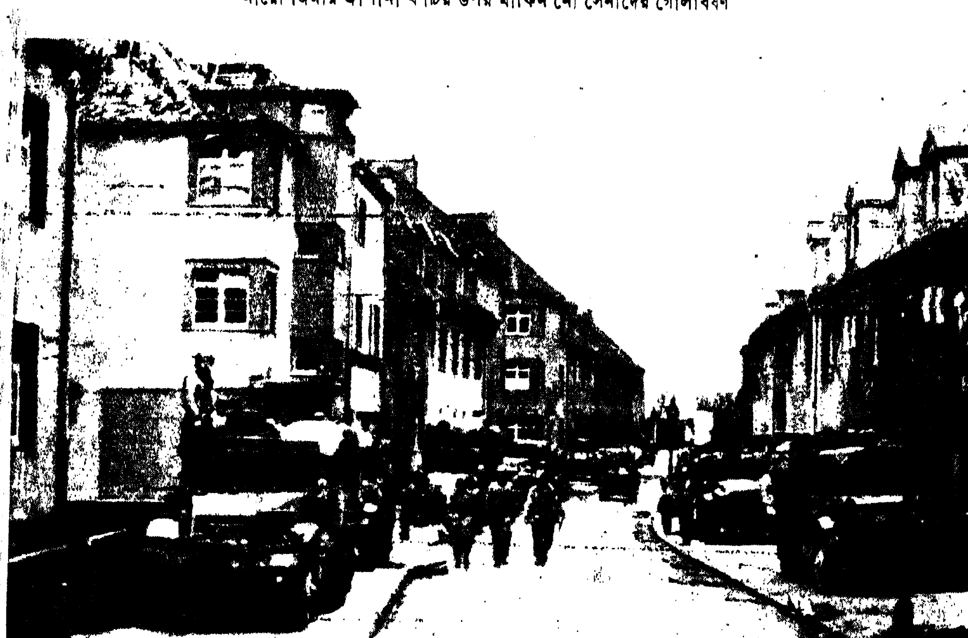
মার্কিন নবম বাহিনীর পদাতিক সৈন্যগণ রোয়ের নদী অতিক্রম করিয়া জার্মেনীর
একটি বিধ্বস্ত শহরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছে



মার্কিন এঞ্জিনীয়ার-নির্ম্মিত প্রুম নদীর একটি সেতু পার হইয়া ইউ. এস. কমভয়ের রাইন অভিমুখে অগ্রগতি



আয়ো-জিমার জাপানী ঘাঁটির উপর মার্কিন নৌ সেনাদের গোলাবর্ষণ



জার্মেনীর কলোনের রাস্তায় সমরোপকরণ সহ মার্কিন প্রথম বাহিনী

নূতন জগতে

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আকাশে মেঘ ছিল না, রাজধানীর এই বিতল ঘরখানিতে আলো-হাওয়া প্রচুর। কেবিনের গায়ে-ঘেঁষা খানিকটা নিরালা সিটটির মধ্যে প্রসন্নতাও কিছু অনুভূত হইল। তথাপি পরিচিত জগৎ হইতে চলিয়া-আসার বেদনা মনকে পীড়া দিতে লাগিল। অপরিচিত পরিবেশপ্রসূত বিরাগ ঠিক নহে—রোগের অনিশ্চিত আরোগ্য-লাভের আশঙ্কাতেই হয়তো এমনটি সম্ভবপর হইয়াছে।

বসুন—ওই আপনার সিট।

ঠিক পায়ের গোড়ায় নার্সের বসিবার জায়গা হইতে নির্দেশ আসিল।

বিছানায় বসিয়া চারিদিকে চাহিলাম। লম্বা চওড়ায় প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন ঘর, কেবিন লইয়া সর্ব্বসুদ্ধ উনিশটি সিট। ঘরের বাহিরে পুরাতন জগতের পরিচয়-বস্ত্র ছাড়িয়া আসিয়াছি; মাথার ধারে কাগজে-আটকানো বোর্ডটায় তাহার সামান্যতম নিদর্শন আছে, কিন্তু দেওয়ালের গায়ে ক্ষোদিত নম্বরটাই পুরাতন পরিচয়কে গ্রাস করিয়াছে। নাম মুছিয়া গেল, নম্বরে অধিষ্ঠিত হইলাম।

চারিদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি। পুরাতন জগতে নূতন কিছু ঘটিলে চাঞ্চল্য উঠে। অনেকটা অগভীর পুকুরের জলে ঢিল ফেলার মত।

পাশের বেড হইতে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে উঠিয়া আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল। ছেলেটির বাম চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বলিয়া ডান চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক প্রখর। সেই প্রখর দৃষ্টি দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করতঃ কহিল, আপনার কি হয়েছে?

রোগের নাম শুনিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, অপারেশন হবে? খুব শক্ত অপারেশন বুঝি?

সংশয়-কুণ্ঠিত-স্বরে বলিলাম, বোধ হয়।

কত দিনের রোগ ও কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দিতে-না-দিতে আর একটি ওই বয়সী কৌতূহলী ছেলে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। তাহারও ডান কানের পিঠ হইতে মাথার খানিকটা পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বাঁধনে মুখের খানিকটা বাঁকিয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক নহে।

কি ভাই—তিন নম্বর, আজ তোমার ড্রেসিং হ'ল?

নবাগত ছেলেটি বলিল, কই আর হ'ল! ডাক্তার বলে গেলেন—সকাল বেলায়। আর. এম. ও.র তো সে ভাবনায় ঘুম নেই! তোমার?

বললে—সন্ধ্যেবেলায় হবে।

হাঁ—সন্ধ্যেবেলায় তো কত হয়! জানেন সার—এখানে ব্যবস্থা আছে সব, কিন্তু কে কার কড়ি ধারে গোছ!

সে কি—বড় হাসপাতাল—

হাঁ মশায়, নামেই তালপুকুর—ঘটি ডোবে না। দেখুন না নার্সের কাণ্ড। ওপর নীচের ছুটি ওয়ার্ড; নীচের গেলে ওপর দেখে কে বলুন।

কেন, নীচের আলাদা ষ্টাফ নেই?

ষ্টাফ সর্ট। যুদ্ধের হাঙ্গামা। তা ছাড়া দেখছেন তো সব মেল নার্স। অধিকাংশেরই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব।

খানিকটা আতঙ্কিত হইলাম। চিকিৎসকদের ঔদাসীন্য ও নার্সের অনভিজ্ঞতা দুইটি রোগীর পক্ষে মারাত্মক। তবে সকলের উপরে ভগবান আছেন। সে বিশ্বাসকেও আঁকড়াইয়া ধরা আসন্ন অপারেশনের মুখে কম কঠিন নহে।

তিন নম্বর বলিল, আপনাদের অপারেশন তত শক্ত নয়—আব্‌ছাড় হচ্ছে। আমার কেসটাই ছিল সাংঘাতিক। একটু থামিয়া বলিল, এই যে কানের পিঠে হাড় দেখছেন—ওর মধ্যে পুঁজ জমেছিল। হাড় কেটেছে—প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। মাসটার্ড য়্যাবসেস্—কিনা সবচেয়ে সাংঘাতিক রোগ।

দু-নম্বর বলিল, আমার কেসটাও খুব শক্ত। ছেলেবেলায় চোখের কোণে একটা ছোটো কালো তিল ছিল। বয়স যতই বাড়ে—তিলটি মুসুর ডোর হতে মটর ডোর—মটর থেকে খানিকটা মাংস গজিয়ে নাকের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ে। চোখ ঢেকে ফেলেছিল আর কি! জোরে চলতে গেলে সেটি দুলতে থাকত—ভারি অস্বস্তি।

—কি রোগ?

—অ্যান্‌জিয়মো।

তিন নম্বর বলিল, তবে অপারেশন ওর সোজা। ক্লোরোফরম দিতে হয় নি। গোটাকতক লোক্যাল ইন্‌জেক্‌শান দিয়ে মাংসটা তুলে দিয়েছে। আমার সার—পুরো তিন ঘণ্টা লেগেছিল। হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে হাড় কাটা—একটু অসাবধান হলে ব্রেন পর্য্যন্ত অ্যাফেক্ট করত।

দু-নম্বর বলিল, চোখের কাছটাও—

হাসিয়া দুই জনকে নিরস্ত করিয়া কহিলাম, ডাক্তার কখন আসবেন?

ছ'টার পর—ভিজিটাররা চলে গেলে।

নার্স কহিল, আপনারা সব বেডে গিয়ে বসুন—ডাক্তাররা হঠাৎ দেখলে বকাবকি করতে পারেন।

দুইজনে যথাস্থানে বসিলে নার্স আমার আর এক দফা জিজ্ঞাসা-বাদ করিয়া অভয় দিল, ভয় কি, কত রুগী আসছে—যাচ্ছে, মনে করুন না—বাড়িতেই আছেন।

বাড়ির চেয়ে জায়গাটা তো মন্দ নয়। পুব, পশ্চিম ও উত্তরে ফাঁকা মাঠ। প্রাসাদোপম বাড়িতে প্রচুর আলো এবং অবাধ হাওয়া। ঘরে বিজলী বাতি ও বিজলী পাখা। বেশ খানিকটা নীল আকাশ, সবুজ শষ্প-ভরা মাঠ ও দূরের বৃক্ষশ্রেণী চোখকে তৃপ্ত করিতেছে। মনের ভাবনাকে ঠাঁই না দিলে অনায়াসে কবিতা লিখিতে পারা যায়। কিন্তু এত আলো হাওয়া ও প্রসারের মধ্যে এক টুকরা সন্দেহ মনের অন্ধকার কোণে কি করিয়া যে আটকাইয়া রহিল—আশ্চর্য্য! মৃত্যুর ভয় মানুষকে রোগদুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এমনই সংশয়ে ভয়ে মুহ্যমান করিয়া রাখে। যুদ্ধের প্রাক্কালে

জয়ের সংশয় সর্ব্বক্ষেত্রেই সুনিশ্চিত। বিকল দেহযন্ত্রে আজ সংঘর্ষ বাধিয়াছে—কবিতা লিখিবার বাহ্যিক উপকরণগুলি তাই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে।

ওধার হইতে একটি রোগী কাতর কণ্ঠে ডাকিল, মেল-নার্স-বাবু, একটু জল দিন।

নার্স বলিল, অপারেশন রুগী—বেশি জল খায় না।

তবে এক কুচি বরফ—

বরফ! এ ওয়ার্ডে বরফ নেই—।

তবে একটু ডাবের জল।

নার্স বিরক্তস্বরে বলিল, আঃ—জ্বালালে! অপারেশন হবার দিন নিজের লোক কাছে রাখবার ব্যবস্থা করতে হয়।

কেবিন হইতে ঘণ্টা বাজিবামাত্র নার্স সেই দিকে দৌড়াইল।

কেবিনে পদমর্য্যাদাযুক্ত লোকেরাই থাকেন। কর্ত্তব্য-অবহেলার শাস্তি দিবার ক্ষমতা তাঁহাদের কেহ কেহ রাখেন এবং অর্থব্যয়েও অকুণ্ঠিত। নদী পর্ব্বতগুহা হইতে এক বার বাহির হইলে আর স্বস্থানে ফিরিয়া যায় না, সেই তার পরম সম্মান। দান কিন্তু বহুক্ষেত্রে বহু অসম্মানের কলঙ্কে ম্লান হইয়া যায়। অবশ্য পাথরে ক্ষোদিত দাতার নাম ও সহৃদয়তার কাহিনী সাদা চোখে সাদাই থাকে। কেবিন হইতে নার্স বাহির হইল একটু ব্যস্ত ভাবেই—হাতে তার সস্‌প্যান। সস্‌প্যানে সামান্য জলের মধ্যে দুটি ছোট ডিম। ষ্টোর রুমে গ্যাস-ষ্টোভ জ্বলিতেছে; সকাল বিকাল দুটি করিয়া অর্দ্ধসিদ্ধ আণ্ডা না হইলে কেবিনের রোগীর চলে না। একটা চাকর উঁহারই ফরমাসে পান ও ডাব আনিতে বাহিরে গিয়াছে, আর একজন ডিউটি নাই বলিয়া বারান্দায় ঘুমাইতেছে। মেথরটা মেঝে পরিষ্কার করিতেছে—কাজেই ডিম দুটি সিদ্ধের ভার নার্স লইয়াছে।

মেল-নার্স-বাবু, একটু জল। পাশে নির্লজ্জ লোকটার কাতর স্বর।

হচ্ছে—হচ্ছে। ষ্টোর-রুমের মধ্যে নার্স অদৃশ্য হইল।

দু' নম্বর উঠিয়া আট নম্বরের কাছে গেল এবং চাকু ছুরি দিয়া ডাব কাটিয়া খানিকটা জল তাহাকে পান করাইয়া বাকিটা ঢাকা দিয়া রাখিল।

ওই কেবিনটার জাঁক বেশি বলিয়া মনে হইল। জানালার সাদা-পরদা একপাশে গুটানো রহিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া ভিতরের প্রায় সবটুকু দেখা যায়। একখানি স্প্রিংওয়ালা খাট—ছোট মত একটা ড্রেসিং টেবিল—একখানি চেয়ার—সুদৃশ্য একটি মশারি হুকে ঝুলিতেছে এবং মাথার উপর বিজলী পাখা অনবরত ঘুরিতেছে।

আপরাহ্ণিক বেশে সুসজ্জিত তিন-চারিটি যুবক—কাহারও হাতে সংবাদপত্র—কাহারও হাতে চায়ের পেয়ালা—কেহ বা সিগারেটে দিতেছেন আরামদায়ক টান—দিব্য আড্ডা জমাইয়াছেন ওই ঘরে। চাকরটা চর্‌কিবাজীর মত বাবুদের চা, জল, বরফ, লেবু, ডাব ইত্যাদি আনিয়া দিতেছে, নার্স রুটির টুকরায় মাখন মাখাইতেছে, মেথরটাও মাঝে মাঝে আসিয়া ষ্টোর-রুম হইতে হয়তো বা এক কেত্‌লি গরম জল—হয়ত বা কাটারিখানা আগাইয়া দিতেছে। সর্ব্বশুদ্ধ বেশ জমজমাট ভাব।

দু' নম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওঁদের মধ্যে রুগী কোন্‌টি?

সে যাহাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল, তাহাকেই দলের মধ্যে সুস্থতম বোধ হইল। সুপরিচ্ছন্ন বেশবাসে সুমার্জ্জিত ভাব—সদ্য-ক্ষৌরিত ক্রীমলেপিত সুকোমল মুখমণ্ডল—গৌর গণ্ডদেশে দাড়িম-লাঞ্ছিত রক্তিম বর্ণ, সুগোল হাত এবং নিটোল দেহ, লাইমজুস গ্লিসারিন প্রসাধিত চক্‌চকে কেশ—এ রকমের রোগী দর্শন কদাচিৎ ঘটে!

এদিকে রোগী-দর্শনের ঘণ্টা বাজিলে দু-একটি করিয়া লোক আসিতে লাগিল—নেহাৎ খুচরা রেটে। কাহারও বিছানার সামান্য অংশ কেহ স্পর্শ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া দু-মিনিটে কাজ সারিয়া চলিয়া গেল, কেহ বা পাশের টুল টানিয়া শিয়রে বসিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। কোন বেড ঘিরিয়া বন্ধুবান্ধবের দল একসঙ্গে নানা কথা কহিয়া কোলাহল সৃষ্টি করিতে লাগিল। কেহ স্নেহের টানে আসিয়াছে—কাহারও বা কর্ত্তব্যের দায়। কিন্তু পাশের কেবিনে পাইকারী রেটে তত্ত্বাবধায়কের দল আসা-যাওয়া করিতেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় কেবিনটা মিলের চিম্‌নির মত হইয়াছে। উচ্চহাস্যে ও গল্পে রোগকে যেন নিষ্ঠুরভাবে শিকার করা হইতেছে।

ঘণ্টা বাজিল, একে একে দর্শনার্থীর দল চলিয়া গেল। মেথর ঝাড়ু ও ন্যাতা লইয়া গৃহ-মার্জ্জনায় প্রবৃত্ত হইল, নার্স ঔষধ সেবনের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিল—রোগীরা অল্পক্ষণের স্বাধীনতা হারাইয়া শয্যা আশ্রয় করিল।

বৈচিত্র্যময় ওয়ার্ড। আই ওয়ার্ডের খানিকটা পর্য্যন্ত এর মধ্যে আছে। কাজেই বিভিন্ন আর. এম. ও'রা হাউস সার্জ্জেনের সঙ্গে পরিদর্শন সারিয়া যাইতেছেন। কোন্ কেস রেডি করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ—ডায়েট শীটে রোগীর পথ্যাপথ্য নির্ব্বাচন-বিধান, যন্ত্রপাতি ও অ্যামপিউল লইয়া কাহারও দেহে ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া, কোন সদ্য-অস্ত্রোপচার-সমাপ্ত নিস্তেজ রোগীর দেহতাপ বৃদ্ধির জন্য হীট্‌ ক্রেডেলের ব্যবস্থা—ইত্যাদি যান্ত্রিক নিয়মে সুসম্পন্ন হইতেছে। কোন রোগী যন্ত্রণার অভিযোগ করিলে—কোন ডাক্তার হাসিয়া ঘাড় নাড়িতেছেন—কেহ বা দু-একটি কথা বলিতেছেন। যেন যন্ত্রণাটা উপলক্ষ্য! তৃষ্ণার কথা, খাবারের কথা, নার্সের অবহেলা—এসব তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর তাঁহাদের নাই। যুদ্ধের বাজারে এসব অসুবিধা জানিয়াই তো এখানে আসা!

তার পর ঘটাং করিয়া একটা শব্দ হইল,—রোগীরা সচেতন হইয়া উঠিল। খাবার আসিয়াছে। বেশির ভাগ দুধ-পাউরুটির ব্যবস্থা—দুই-এক জনের ভাত। মাথার কাছে মীটসেফের মাথায় রাখা অ্যালুমিনিয়মের মগটিতে দুধ ঢালিয়া এক টুকরা (আধ পাউণ্ড ওজন) পাঁউরুটি রাখিয়া দিল। পিতলের কানা উঁচু পরাতে মগ-মাপা ভাত দিয়া গেল। সে অন্নের মধ্যে অন্নপূর্ণার প্রসন্ন হাসি বা ভিক্ষুককে দানের মমতাটুকু নাই। মানুষের হাত দিয়া পরিবেশিত হইলেও যন্ত্রের রূঢ়তা উহার প্রত্যেকটি দানার মধ্যে নিহিত। তবু ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা। সেই গলিত অন্নপিণ্ড—জলবৎ ডালের ধারায় নরম করিয়া—নাম-না-জানা

একটা ঘ্যাঁট তরকারি ও একখানা ভাজা মাছের সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ভাত খাওয়া হইলে দু' নম্বরকে বলিলাম, পেট ভরলো?

না কাকাবাবু। ওই মগে মেপে ভাত দেয়—ও আর কতটুকু! আরও এক মগ খেতে পারি।

চেয়ে নাও না?

মাপা জিনিস দেবার জো নেই। সবই তো রেশনের ব্যাপার।

তা সত্য। শুধু দুর্দ্দিনে সারবস্তু কিছু পেটে না পড়াতে ক্ষুধার মাত্রাটা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

অন্ন লইয়া প্রকাশ্য অভিযোগ যে না উঠিল তাহা নহে। মগরাহাট না কোথায় বাড়ি একজন আধাবয়সী চাষী লোক রীতিমত বকাবকি সুরু করিয়া দিল। পরিবেশনকারীও আইন দেখাইয়া তাহাকে ধমক দিতে লাগিল। বিভাগীয় আর. এম. ও. ছুটিয়া আসিলেন।

গোলমাল কেন?

মশয়—এই ক'টি ভাতে পেট ভরে?

ফুল ডায়েট না হাফ্? প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডায়েট শীটে চোখ বুলাইয়া কহিলেন, ওর বেশি দেওয়া নিয়ম নেই। রেশন হয়েছে কলকাতায় জান না?

তথাপি লোকটি গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।

অতঃপর নার্স দর্শন দিলেন। বাম হাতে ঔষধের বোতল—ডান হাতে মেজার গ্লাস।

ওষুধটুকু খেয়ে নিন্ সার।

কি ওষুধ?

এই এ্যালকালিন মিকশ্চার। তেতো নয়—কষা নয়—

আমার অধরস্পৃষ্ট গ্লাসটি না ধুইয়া দ্বিতীয় রোগীকে ঔষধ সেবন করাইলেন; তার পর তৃতীয়কে। স্বাস্থ্যনিলয়ে বসিয়া এই পরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশনে মন তন্মুহূর্ত্তে বিমুখ হইয়া উঠিল। তার পর তাপমান যন্ত্রে জ্বর দেখার অভিনয়। অভিনয় ছাড়া আর কি বলিব! কাহারও হাত টিপিয়া, কাহারও বা কপালে হাত দিয়া মাত্র দুই-এক জনকে তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করত নার্স-সাহেব চার্টে অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন!

সে পর্ব্ব মিটিলে নার্স-সাহেব আমার বেডের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওখানা কি বই সার?

একখানা নভেল।

একটু পড়তে পারি? বলিয়া অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। তার পর সামনের চেয়ারখানা ডেস্কের নিকট টানিয়া আনিলেন এবং দু'টি পা ডেস্কের উপর তুলিয়া দিয়া বইয়ে মনোনিবেশ করিলেন। রোগীরা নিবিষ্টচিত্ত নার্সকে আর বিরক্ত করিল না—কেহ বা বিছানায় শুইয়া—কেহ বা বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া পরিচিত রোগীর সঙ্গে আলাপ জমাইতে লাগিল। বাহিরে ট্রাম-বাসের শব্দ কমিয়া আসিতেছে, শুধু ষ্টেশন ইয়ার্ডে অতিকায় এঞ্জিনগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে এবং বিরাট অজগর দেহের মত ওয়াগনগুলি গা নাড়া দিতেছে। ব্ল্যাক-আউটের বাজার—স্তিমিত আলোর শহর তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় যেন দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে।

নূতন পরিবেশে নিদ্রা আসিল বহু বিলম্বে। ভোরের হাওয়ায় চোখ বুজিতে-না-বুজিতে একি উৎপাত! নার্স হৈচৈ করিয়া রোগীদের পরিপূর্ণ নিদ্রা সকালে ভাঙিয়া দিল। বাহিরের পথে তখনও লোক চলাচল আরম্ভ হয় নাই, ইয়ার্ডে শুধু এঞ্জিনগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে—তাহাতে রাতের গাম্ভীর্য্য বেশ বুঝা যায়। আকাশে তারার মিছিল—পূর্ব্বদিকে প্রভাতের কোন ইঙ্গিতই নাই। ওয়ার্ডে ঘড়ি না থাকায় অকাল নিদ্রাভঙ্গের এই উৎসব! চাকর মগে গরম জল ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেল—নার্স ঔষধের শিশি বোতল ষ্টোর-রুম হইতে আনিয়া টেবিলের উপর গুছাইতে লাগিল। নিদ্রাভারগ্রস্ত রোগীকে মুখ ধুইবার নির্দ্দেশ ও ঔষধ খাওয়াইবার প্রচেষ্টায় অনুনয় ভর্ৎসনা ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি চলিতে লাগিল। রোগীর ও নার্সের সত্যকার সম্বন্ধটি যেন এই রাত্রি-শেষের মুহূর্ত্ত নিঃশেষে প্রকাশ করিয়া দিল।

দলাদলি যদি জগতের নিয়ম হয়—এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? এখানে রোগীরাই রোগীদের বন্ধু। তাহাদেরই বিচিত্র আলাপে পুরাতন পৃথিবী মমতাময়ী মাতার মত শিয়রে আসিয়া বসেন। আশ্চর্য্য—যার যত অভাবই থাকুক—সেই পৃথিবীর দুঃখকষ্টের পাঁচালী সর্ব্বক্ষণ কেহ কীর্ত্তন করে না, এই পৃথিবীর প্রাসাদে বাস করিয়া যে অসুবিধাগুলি অহরহ মনকে তিক্ত করিয়া তুলিতেছে—তাহাই আলাপ-পরিচয়ে প্রতিদণ্ডে ফুটিতেছে। পৃথিবীর (হউক সে নূতন কিংবা পুরাতন) হৃদয়হীনতার কি ইয়ত্তা আছে? এক ভাগ স্থলের মধ্যে পাহাড় ও মরুভূমির পরিমাণটাই বা কম কি! কৃপণ ভগবান তিন ভাগ জলের উপর কাউ দিয়াছেন এইগুলি। যুদ্ধ বাধিবে না কি মানুষ হাত-পা গুটাইয়া আরাম করিবে নিশ্চিন্তে! সৃষ্টির খুঁতেই মানুষ হইয়াছে খুঁৎখুঁতে। ডাক্তারের সঙ্গে নার্সের—নার্সের সঙ্গে রোগীর—রোগীর সঙ্গে খাবার পরিবেশনকারীর—চাকরের মেথরের বাদ্‌বিতণ্ডা লাগিয়াই আছে। যুদ্ধের বিক্ষোভে পৃথিবী আজ বিক্ষুব্ধ।

তবু ফাল্গুনের শেষ দিনে আকাশের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে। হাসপাতালের মাঠে দু'টি আমগাছ ও ওয়ার্ড ঘেঁষিয়া একটি মহুয়া গাছে ঋতু-উৎসবের প্রসাদ-চিহ্ন। মহুয়া গাছটারই শোভা বেশি। আমের মুকুল শেষ হইয়া কতক ঝরিয়াছে—কতক বা দানা বাঁধিয়াছে, মহুয়ার স্তবকবদ্ধ লাল পুষ্পকলিকা ফাল্গুনের কামনাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবার আয়োজনে ব্যস্ত। মাটির রসে আকাশের আলোয় ঋতুর দাক্ষিণ্যে ওরই প্রকাশটি হইতেছে সুসম্পূর্ণ।

মুখ ধোওয়া এবং ঔষধ খাওয়ানোর পালা শেষ হইলে আসিল প্রাতরাশ। অর্থাৎ এক টুকরা পাঁউরুটি ও খানিকটা স্বাদহীন বর্ণহীন চা। অতঃপর সংবাদপত্রের হকার আসিয়া কাগজ চাই কিনা জিজ্ঞাসা করিল। পথ্য জোটে না—কাগজ আর কে কিনিবে!

কেবিনের ভদ্রলোক ততক্ষণে চা, ডিম, রুটি ইত্যাদি শেষ করিয়া মুখে ক্রীম ইত্যাদি মাখিয়া নূতন একটি স্যুট পরিয়া হলের মধ্যে আসিয়া দর্শন দিলেন। নার্স সসম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া দিল। তিনি চেয়ারে বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইলেন এবং নার্সকে দুই-একটি প্রশ্ন করিয়া আমার নিকটে আসিলেন।

আপনার কি অসুখ সার ?

বলিলাম। ভদ্রতার খাতিরে তাঁহার কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিলেন, আমার তো অপারেশন কেস নয়—আছি মেডিক্যালে।—ডাক্তারেরা অনেকে বন্ধু আছেন—এইখানে চিকিৎসার সুবিধা হবে বলেই থাকা।

কেমন বোধ করছেন ?

আর বলবেন না মশাই। হাসপাতাল আজ নামেই হাসপাতাল! না নার্সিং—না ওষুধ। কেন যে লোক আসে এখানে! আছি মাস তিনেক—যা খরচ হচ্ছে তাতে বাইরে গিয়ে অনায়াসে ভাল ভাবে চিকিৎসা করাতে পারতাম।

তাই কেন যান না।

ডাক্তার বন্ধু—প্রায় সর্ব্বক্ষণই ওঁদের পাই। আমার ব্যাপার কি জানেন—খানিকটা নার্ভাসনেস আছে বৈকি। যদি এক ঘণ্টা কোন ডাক্তারকে না দেখি—

পয়সা আছে—খরচ করিয়া আনন্দ পান সে কথা ভাল, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া এই যে কেবিন আটকাইয়া রাখা এবং অর্থের মহিমায় চাকর মেথরকে পর্য্যন্ত সাধারণ রোগীর পরিচর্য্যা হইতে বঞ্চিত করা—এই অন্যায়টুকু কেন যে বোঝেন না!

ভদ্রলোক কিন্তু সাধারণ রোগীর জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

এদের দেখলে দুঃখু হয় মশায়। পুওর ডায়েট—কেয়ারলেস এ্যাটেনডান্স। নেহাৎ ভগবানের দয়া তাই টেঁকে যায়।

সাড়ে-আটটা হইতে বারোটা পর্য্যন্ত বিচিত্র বেশধারী ছোট-বড়-মাঝারি ডাক্তারদের এবং ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে ওয়ার্ড সরগরম থাকে। তখন নার্সরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে—রোগীরাও কিছু কিছু অভিযোগ করে। সমস্তটাই যেখানে অভিযোগের বিষয়ীভূত—সামান্য বিষয়ে সেখানে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াও কষ্টসাধ্য। তবু মানবীয় দুর্ব্বলতাবশত রোগীরা জানায় অভাব, এবং মানবীয় ঔদার্য্যহেতু ডাক্তাররা শোনেন তার খানিকটা এবং মানবীয় ভ্রান্তিবশতই কিছুক্ষণ পরে দুই পক্ষই ভুলিয়া যায় সে সব তুচ্ছ কথা। উদাসীন হাসপাতালের ঘরে ঘরে নিয়মের অনুবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে।

আট নম্বরে যে নূতন রোগীটি আসিয়াছে তার গল্প সন্ধ্যাবেলায় বেশ জমে। নাবিক-জীবনে তার সঞ্চয় খানিকটা আছে। দেশ-বিদেশের কথা—সমুদ্রের কথা—বন্দরের জাঁকজমক—বিভিন্ন জাতির সঙ্গে পরিচয় ও তাদের জীবন-রহস্য গল্পের মতই মিষ্ট লাগে। লোকটি বলে, এখানে ভাল লাগছে না। ডাক্তার বলেছে অপারেশনের পর নাকি জাহাজে কাজ করা চলবে না। আমি তো একদণ্ডও এখানে থাকতে পারব না। ভাল লাগে না।

সে কি—দেশ বলে টান নেই? বাড়ি-ঘরের মায়া নেই তোমার?

লোকটি হাসিয়া মাথা নাড়ে।

সমুদ্রে যান নি কোন দিন—যদি যেতেন জিজ্ঞাসা করতেন না একথা।

ও মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে—না উচ্ছৃঙ্খলতায়?

সাত নম্বরও তাহার কথা কিছু শোনায়; দপ্তরীর কাজ ক[...]—মাসে কামাই (উপার্জ্জন) হয় বেশ, ছেলে ক'টিও আয়[...] দোয়ায় রোজগার করে। আরে মশাই, হাসপাতালে এসে চুপ[...] চাপ বসে থাকলে ঠকে যাবেন। জুলুম জবরদস্তি না করলে কি[...] কাজ আদায় হয়?

সে তো প্রত্যক্ষ করিতেছি। খাবার আসিবার সঙ্গে সঙ্গে[...] তিনি একখানি সসার লইয়া বারান্দায় যান এবং নিজের হাতে[...] কয়েকখানি মাছ উঠাইয়া লন। বাড়ি হইতে খানা আসে—তাহাতে মাছের ভাগ জুৎসই থাকে না বলিয়াই এই ব্যবস্থা[...] ডাকিবামাত্র জমাদার বেডপ্যান লইয়া হাজির হয় এবং ডাক্তার[...] অযত্ন করেন না। জল গরম ও দুধ গরম করিবার জন্য ষ্টোর[...] রুমেও তাঁর অবাধ গতি।

এই সব সুনিয়মের মূলে যে তথ্যটি আছে—আমাকে চুপি[...] চুপি শিখাইয়া দিলেন! দিন দু-আনা চার আনা ছাড়বেন, তোফা[...] আরামে থাকবেন। হাসপাতালের ব্যবস্থা ভাল—বাড়িতে চা[...] গুণ খরচ করলেও এমনটি হয় না।

ব্যবস্থা তো ভালই। বিনা পয়সায় রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা—ওষুধের ব্যবস্থা—সর্ব্বক্ষণের জন্য ডাক্তারকে পাওয়া ভাগ্যের ক[...] বৈকি।

কথায় কথায় পরীক্ষা—কত রকমের পরীক্ষা। দেহ লই[...] লজ্জা প্রকাশের অবকাশ যেন বাহুল্য। একটা কাঠের টুক[...] কিম্বা একটি মাংসময় যন্ত্র। কোথায় সামান্য একটি স্ক্রু ঢিলা হই[...] বা কোন্ ক্ষুদ্র চাকাটির ক্ষুদ্র একটি দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হইল—তাহার[...] মেরামতের ব্যবস্থা। আত্মসমর্পণের এমন পরিপূর্ণ ভাবটি অ[...] কোথাও দেখা যায় না।

পরদা ঘিরিয়া ড্রেসিং ইত্যাদি হয়। লজ্জা হইতে রোগীকে[...] বাঁচাইবার জন্য নহে—বীভৎসতা যাহাতে চোখে না পড়ে[...] সুচারু দেহে সামান্য স্ফোটক দেখিলে মনে প্রতিক্রিয়া সুরু হয়[...] দেহগত আকর্ষণ সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হইয়া যায়।

সেদিন আট নম্বরের অপারেশন হইবে। সে পাঁচ নম্বরকে[...] বলিল, ভাইসাহেব—আমায় একটু দেখো। একটি টাকা আমা[...] আছে, তোমার কাছে রেখে দাও। জ্ঞান হলে কিছু ফলটল কি[...] খাইয়ো।

সেদিন সে অপারেশন-টেবিল হইতে ফিরিয়া আসিল।

ডাক্তার সেইদিন বৈকালে পাঁচ নম্বরকে বলিলেন, আপ[...] সেরে গেছেন। পরশু নাগাদ আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে[...] একটি সসপেন্সারি ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করবেন।

তার পরদিন খুব ভোরে লোকটি ব্যাণ্ডেজ কিনিতে গেল—আর ফিরিল না।

সেই দিনই আট নম্বরের অপারেশন হইল এবং বৈকালে জ্ঞা[...] হইতেই সে কাঁদিতে লাগিল।

দু' নম্বর আসিয়া বলিল, কাকাবাবু শুনেছেন?

শুনিলাম। পাঁচ নম্বর না ফিরুক তাহাতে কাহারও কি[...] ক্ষতি ছিল না—শুধু আট নম্বরকে সে কাঁদাইয়া গিয়াছে। অর্থা[...] গচ্ছিত টাকাটি ফেরত দেয় নাই।

আমরাই ভাব ইত্যাদি দিয়া আট নম্বরের তত্ত্বাবধান করিলাম। কয়দিন হইতে আকাশে মেঘের আনাগোনা চলিতেছে। চৈত্রের প্রথমে সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িতেছে বলিয়া মেঘের কাছে আমরা বর্ষণপ্রত্যাশী। অন্ততঃ খানিকটা ঝড় হইয়াও যায় যদি! সেইদিন সকালে ডাক্তার জানাইয়াছেন পরশু আমার অপারেশন হইবে। কথাটা শুনিয়া অবধি একটা অজানা আতঙ্কে মন মুহ্যমান হইয়া গিয়াছে। যে সব অপারেশন কয়দিন দেখিলাম—তাহার পর পর অবস্থাগুলি মনে গাঁথিয়া রাখিতেছি। যদিও এ ওয়ার্ডে কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই তবু অদৃশ্য শত্রুকে তুচ্ছ করিতে পারিতেছি না। এই ওয়ার্ডে একটি দশ-বারো বছরের ছেলে ছিল। ছেলেটির সর্ব্বত্র অবাধ গতি। রাশভারী ডাক্তারকে সে ডরায় না—নার্সের শাসন তো কোনদিনই মানিতে দেখিলাম না।

প্রত্যেক রোগীর কাছে গিয়া শুধাইত, হ্যাগা, তোমার কি অসুখ? অপারেশন হবে? তা ভয় কি।

কেহ জল চাহিলে ছুটিয়া সে জল আনিয়া দিত, অন্ত ওয়ার্ড হইতে বরফ চুরি করিয়া আনিত। দু-পাশের বারান্দায় ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিত। পাতি লেবুর উপর ছিল তার অপরিসীম লোভ। খাবার সে কাহারও কাছে চাহিত না, কিন্তু লেবু চাহিয়া লইত বল খেলিবার জন্ম। সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। চঞ্চল ছেলেটির মধ্যে সেবার ভাবটি পরিস্ফুট।

সন্ধ্যাবেলায় আমার শিয়রে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাল তোমার অপারেশন হবে? আঃ বেশ মজা।

মজা কিরে? ভয় হয় না তোর?

ভয়! খিল খিল করিয়া সে হাসিয়া উঠিল। ভয় কিসের গো? ডাক্তার ইন্‌জেকশন করে যায় সন্ধ্যেবেলা, সকালে কিছু খেতে দেয় না—মেথর এসে ডুস দেয়। তার পর নাপিত আসে কামাতে। কামানো হয়ে গেলে ফের ইন্‌জেকশন। তার পর টেচারে শুইয়ে—লাল কম্বল ঢাকা দিয়ে নিয়ে যাবে উই ঘরে। সাদা পাথরের টেবুল—মাথায় সূয্যির মত আলো—আর মুখোস-পরা সব ডাক্তার। তুলোর পাহাড় যেমন সাদা—তেমনি সাদা সব যন্তরপাতি। ওষুধ শুঁকিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে কিছু জানতে পারবা না। তার পর তোমাকে নিয়ে আসবে এই ঘরে। বিছানায় শুইয়ে হাত-পা দেবে বেঁধে। মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠবে—বমি হবে। তার পর জ্ঞেয়ান হবে। খানিক পরে বরফ খেতে দেবে, ডাবের জলও দেবে। ব্যস্‌।

যদি মরে যাই?

ধুর—মরবা কেনে। কত লোক গেল বাড়ি।

তোর অপারেশন হয় নি?

না। দু-বার নে গেছলো ওই ঘরে, সব দেখেছি। ভারি মজা।

এমন সময় দম্‌কা হাওয়া আসিল, ছেলেটিও ছুটিয়া পলাইল।

নার্সেরা অভয় দিত, ভয় কি, আমরা আপনাকে দেখাশোনা করব। কিন্তু সেইদিন বিকাল হইতে ডিউটি বদল হইয়া জানা নার্সেরা অন্ত ওয়ার্ডে চলিয়া গেল। রাত্রিতে যিনি আসিলেন—তাঁহার 'ডোণ্ট-কেয়ার' ভাবটা যেন বেশি। দৈহিক শক্তি ও সজ্জা সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বক্ষণ সজাগ। হাতে একখানা বই—রোগীর জগতে যেটুকু থাকেন—তাহাও সমনস্কে নহে। সেই দিনই রাত্রিতে কাহাকেও এ্যালকালিন মিক্‌শ্চারের বদলে ক্যালসিয়াম মিক্‌শ্চার খাওয়াইয়া দিলেন, কাহাকেও বা কোন ওষুধই দিলেন না। চার্টে আপনমনে কি সব অঙ্কপাত করিলেন—রোগীকে জিজ্ঞাসামাত্র করিলেন না। হাত ফস্কাইয়া থার্ম্মোমিটারটা পড়িয়া ভাঙিয়া গেল—খানিক পরে ভাঙিল কাচের গ্লাসটি। উভয় বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া বইয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তার পর রাত্রি গভীর হইলে একখানি শূন্তশয্যায় দেহ প্রসারিত করিয়া দিলেন।

দুয়ারে খিল দেওয়া ছিল। বাহিরের ঠক্‌ঠক্‌ ধ্বনিতে নার্সের গভীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না, আঠারো নম্বরের রোগী উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। নাইট-ইন-চার্জ্জ সিসটার টর্চ্চ হাতে ঘরে ঢুকিলেন এবং মেল-নার্সকে ধাক্কা দিয়া জাগাইলেন। তার পর ভর্ৎসনা ও ভয় প্রদর্শনের নমুনা আর দিব না—শুধু এইটুকু বলিতে পারি পরিদর্শিকা চলিয়া গেলে আমাদের মেল-নার্সবাবু একটি মধুর সম্বোধনে সেই অনুদ্দিষ্টাকে আপ্যায়িত করিয়া নিজেকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনুশোচনার বা ভয়ের বিন্দুমাত্র ছায়া সে মুখে দেখা গেল না।

পরের রাত্রিতে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। ঝড় ছিল বলিয়া দুয়ার বন্ধ করিতে হইল। বৃষ্টি থামিলেও সে দুয়ার আর খোলা হইল না, মেল-নার্স শয়নের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। আজ কোন বেড খালি ছিল না, তিন জন নূতন রোগী ভর্ত্তি হইয়াছে। ভাবিলাম, আরাম করিয়া ঘুম দেওয়া ও-বেচারার ভাগ্যে আজ বিধাতা লেখেন নাই। জানিতাম না—কৃতী পুরুষরা সর্ব্বক্ষেত্রেই সুযোগ সৃষ্টি করিতে সুদক্ষ।

সেদিনও মাঝরাত্রিতে দুয়ারে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ হইল, নিকটবর্ত্তী রোগী দুয়ার খুলিয়া দিল, কিন্তু কোথায় মেল-নার্স? সে কি হাওয়া হইয়া উড়িয়া গেল! কিন্তু পরিদর্শিকার অভিজ্ঞতা অদ্ভুত। টর্চ্চের আলো ফেলিয়া তিনি নবাগত এক রোগীর বিছানা হইতে মেল নার্সকে আবিষ্কার করিলেন। সে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পরম নির্ব্বিকারচিত্তে ভর্ৎসনা শুনিতে লাগিল। পরিদর্শিকা চলিয়া গেলে সেই প্রিয় সম্বোধনের সঙ্গে আরও গোটা-কতক গ্রাম্য শব্দ জুড়িয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। অস্ফুট স্বরে বলিল, কত কলেজ ঘুরে এলাম—কত নার্সকেই দেখলাম চাকরি তো নিতে পারবে না!

আজ অপারেশনের দিন। প্রভাতের আলো স্তিমিত বোধ হইতেছে, প্রাত্যহিক ঘটনাগুলিতে দৃষ্টি বা মন নাই। কে আসিল—কে চলিয়া গেল—কোথায় কি কৌতূহলজনক ব্যাপার ঘটিল ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার সজ্ঞাতেই সকালটা সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়াছে।

তার পর যাত্রা করিলাম।

ঘুম ভাঙিয়া গেল—বেলা তখন বারোটা। খাবারের বাক্সটার শব্দ এবং আহার-পর্ব্বের অনুযোগে নিত্যকার কোলাহল জমি-

য়াছে। মহুয়া গাছ হইতে কাকের দল আহার-প্রত্যাশায় কা-কা শব্দ করিতেছে, এঞ্জিনের কোঁসকোঁসানি মালগাড়ির শান্টিঙের শব্দ কানে আসিতেছে। প্রথম চৈতন্যের অস্ফুট ও মিশ্র কোলাহল ক্রমশঃ অর্থযুক্ত হইতেছে।

খাটের রেলিংটা পা দিয়া অনুভব করিলাম, বাঁচিয়া আছি।

আমাকে চোখ চাহিতে দেখিয়া কে হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিল এবং মিষ্ট স্বরে বলিল, চুপ করে ঘুমুন, ভয় কি।

ভয় বা চিন্তা প্রথম চৈতন্যদ্বারে ভীরু করাঘাত করিতে পারে কি? ঘুমাইবার সুযোগ হয়তো বহুবার পাইব। যন্ত্রণা? সে অনুভূতিও তত প্রবল নহে। আকাশপ্লাবী আলোর বন্যায় ঘর ভাসিয়া যাইতেছে। স্তিমিত প্রভাত যৌবন-লাবণ্যে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে সহসা, নীল আকাশের টুকরা ইন্দ্রকান্ত মণির দ্যুতিতে ঝলমল করিতেছে—আর সেই ঝলমলে মণিদ্যুতির নীচেয় লাল ফুলের স্তবক-সজ্জিত কামনা-প্রদীপ্ত মহুয়া গাছটি নিঃশব্দে হাসিতেছে।

ওই অপরূপ গাছের তিনটি শাখার সংযোগস্থলে বায়স-দম্পতি বাসা বাঁধিবার আয়োজনে ব্যস্ত। পুরাতন জগতের নূতন রূপ—নূতন অর্থ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে।

অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

(স্মৃতিকথা)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। ৩০শে মার্চ, রাত প্রায় আড়াইটে। ইংরেজী মতে ৩১শে মার্চ মর্নিং আড়াইটে। এঞ্জিন থেকে হুইসলের শব্দ শোনা গেল। তার পর ট্রেনখানির গতিবেগ ধীরে ধীরে মন্দীভূত হতে লাগল। তার পর আরও মন্দ আরও মন্দ, মন্দ—মন্দতর—মন্দতম হয়ে অবশেষে থেমে পিছনের দিকে এক ধাক্কা লাগিয়ে আবার সামনের দিকে একটু পা বাড়িয়ে ট্রেনখানি একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বুঝা গেল এই ট্রেনখানিতে ভ্যাকুয়াম ব্রেকের কোনো বালাই নেই। আমি কামরার দরজা খুলে প্ল্যাটফরমে নেমে পড়লাম। এই হচ্ছে পণ্ডিচারীর রেলওয়ে স্টেশন।

নিশ্চিত জানি উপরে লেখা লাইন ক'টি প'ড়ে পাঠক-পাঠিকাবর্গের ইন্দীবর তুল্য বা সফরী সমতুল, কুরঙ্গ-লাঞ্ছন বা খঞ্জন-গঞ্জন নয়নসমূহ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যাবে। তাঁরা কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে ভাববেন যে, বঙ্গসন্তানেরা বম্বে বা বর্মায় যায়, মাদ্রাজে বা মালয় উপদ্বীপে যায় এমন কি লঙ্কা দ্বীপেও তারা সেই বিজয়সিংহের আমল থেকে যাতায়াত করছে—কিন্তু রাত আড়াইটের সময় পণ্ডিচারী রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফরম্! ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা বুঝাতে হ'লে পূর্ব্বকথা কিছু বলা দরকার। সুতরাং তা বলছি। ঐ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দেরই ফেব্রুয়ারি—বোধ হয় মাসের মাঝামাঝি বা শেষাশেষি হবে। রাত তখন প্রায় আটটা আন্দাজ। কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে চার নম্বর শ্যামপুকুর লেন বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে একটি পরিণত বয়স্ক যুবককে ঘিরে কয়েকটি তরুণ বয়স্ক বসেছিলেন। পরিণত বয়স্ক যুবকটি ঘরের একমাত্র আসবাব একটি ছোট তক্তপোষের উপর বসেছিলেন এবং তরুণদের মধ্যে দু-এক জন সেই তক্তপোষে এবং বাদবাকি মেঝের উপর স্থান গ্রহণ করেছিলেন। পরিণত বয়স্ক যুবকটির সম্মুখে কাগজ এবং হাতে পেনসিল। তিনি অটোম্যাটিক রাইটিং করছিলেন এবং তাই প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। তরুণরা তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন এবং নানা প্রশ্নে সম্ভবতঃ পরলোকের আত্মাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিলেন।

এই পরিণত বয়স্ক যুবকটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। আর তরুণরা যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবিজয়কুমার নাগ, শ্রীহেম সেন, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত এবং এই লেখক।*

এঁদের মধ্যে সৌরীন আর আমি ছাড়া আর সবাই ১৯০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দের আলিপুরের বোমার মামলা নামে খ্যাত মোকদ্দমার আসামী দলভুক্ত ছিলেন। এঁরা কয়জন আরও অনেকের সঙ্গে প্রমাণাভাবে খালাস পান।

আলিপুরের বোমার মামলা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে এখানে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে যাঁরা মাতৃভূমির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন তাঁদের কারও কারও মধ্যে সন্ত্রাসবাদ (terrorism) মাথা তুলেছিল। ফলে বাংলা দেশে কলিকাতাকে কেন্দ্র করে একটা গুপ্ত সমিতি জন্ম নেয়। পুলিস এই গুপ্ত সমিতির সকল ব্যাপার ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করে এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় সমিতির অধিকাংশ সভ্যকে গ্রেপ্তার করে। বোমা রিভলভার ইত্যাদিও তাদের হস্তগত হয়। এক বছর ধ'রে এঁদের বিচার চলে এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বিচারে এঁদের কতক খালাস পান এবং কতকের দণ্ড হয়। দণ্ডিতদের মধ্যে তিন জনের—বারীন্দ্র, হেমদাস ও উল্লাসকর—ফাঁসিরও হুকুম হয়। হাইকোর্টের আপীলে ফাঁসি রদ হ'য়ে এঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

হাজত থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ আবার পূর্ণোদ্যমে দেশের কাজে লেগে যান এবং "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম" নাম দিয়ে একখানি ইংরেজী ও একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কলমের ভঙ্গি কিছু বদলেছে। পূর্ব্বে ইংরেজী দৈনিক "বন্দে মাতরম্"এ তিনি যা লিখতেন তা বিশেষ করে ছিল রাজনৈতিক, কিন্তু "কর্ম্মযোগিন্" ও "ধর্ম্ম"র লেখায় একটা গভীরতর সুর শোনা যায়। যেন রাজনীতিকে উপলক্ষ্য ক'রে, ইংরেজদের বোধগম্য রাজ-

* এঁদের মধ্যে বীরেন, সৌরীন ও বিজয় আজ পরলোকে। হেম সেনের কোন সংবাদ জানি নে।—লেখক

প্রতির বহির্মুলক ও অগভীর দৈনন্দিন আবরণ ভেদ ক'রে ভারতবর্ষের আত্মকথা—তার চিরন্তনের আত্মার কাহিনী প্রকাশের আয়োজন। এ-থেকে অরবিন্দের ভবিষ্যৎ জীবনের ক্রমণপথের নির্দেশ কতকটা ধরা যায়। রাজনৈতিক নেতার দল থেকে তিনি যেন ভারতের আত্মদ্রষ্টা ও সত্যদ্রষ্টা ঋষি-দের আশ্রম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন। মনের এই গতি নিজেকে আবিষ্কারের জন্যেও দরকার এবং দেশকে বুঝবার জন্যও প্রয়োজন। বিশেষ করে আজকার দিনে ভারতবর্ষের পক্ষে এ প্রয়োজন অতীব গুরুতর। কেবল ভারতবর্ষের পক্ষেই নয়, বিশ্বমানবের পক্ষেও। আমরা যেন আজ আবার সেই প্রথম ইংরেজী শিক্ষার আমলে ফিরে গিয়েছি। প্রভেদ শুধু এই যে, তখন আমরা আমাদের আত্মার সন্ধান করছিলাম ইংলণ্ডে আর এখন করছি রাশিয়ায়। কিন্তু ইংলণ্ড ও রাশিয়া যা দিতে পারে তার চাইতে সহস্রগুণে সমৃদ্ধ এক ঐশ্বর্যের আমরা অধিকারী, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এ-ঐশ্বর্য পঞ্চমবার্ষিকী বা পঞ্চদশ বার্ষিকী প্ল্যানের সম্পদ নয়। অথচ এই ঐশ্বর্যকে না জানলে পুরো মানুষটাকে কোনোকালেই জানা যায় না। পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের ঐশ্বর্য মানুষকে মাত্র জীবন দিতে পারে কিন্তু এ ঐশ্বর্য দেয় জীবনামৃত।

সে যা হোক্‌, আমি পূর্বে যে চার নম্বর শ্যামপুকুর লেন বাড়ির উল্লেখ করেছি সেই বাড়িটি ছিল "কর্মযোগিন্" ও "ধর্ম"'র কার্যালয়। এর এক অংশে ছিল ছাপাখানা ও আপিস এবং অন্য অংশে বাস করতাম বীরেন, নলিনী, বিজয় ও আমি এবং হেম সেন এসে মাঝে মাঝে আস্তানা গাড়তেন। সৌরীন থাকতেন সার্পেনটাইন লেনে তাঁর কাকা মহাশয়ের ভাড়া করা বাড়িতে। তাঁর কাকা মহাশয় শ্রীযুক্ত ভূপাল চন্দ্র বসু ছিলেন অরবিন্দের শ্বশুর।

বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের (?) কথাটা এইখানে বলি। কেননা তার মধ্যে একটু ঔপন্যাসিক রসের আমেজ আছে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় এক মাসকাল আমি রাঁচিতে ছিলাম মোরাবাদি পাহাড়ে ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আবাসে। বসু মহাশয়ও তখন রাঁচিতে অবস্থান করছিলেন। তিনি আমার কথা শুনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ জানান। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একদিন সন্ধ্যার পর সঙ্গে ক'রে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। গিয়ে দেখি একটি অন্ধকার ঘরে বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন। বাতে এক রকম উত্থানশক্তি রহিত। আমরা দু'জনে বিছানার পাশে খানি চেয়ারে বসলাম। প্রায় আধ কি তিন পোয়া ঘণ্টা কথাবার্তার পর আমরা দু'জনে সেই আঁধারে আঁধারেই আবার বিদায় নিলাম। তিনিও আমার মুখ দেখলেন না আমিও তাঁর মুখ দেখলাম না। বাল্যকালে একদা রেনল্ডস্‌-লিখিত জোসেফ উইলমটের বাংলা অনুবাদ গোগ্রাসে গিলেছিলাম। মনে পড়ল তার মধ্যে এমনি একটা দৃশ্য আছে। ইটালিতে জোসেফ উইলমটকে এমনি আঁধারে আঁধারে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ (?) করতে হয়েছিল। সেই দৃশ্য আর এই দৃশ্য মিলে গিয়ে আমার মনে যে কিছুমাত্র ঔপন্যাসিক রসের আস্বাদ দেয় নি তা বলতে পারি না।

এর ন'দশ বছর পরে বসু মহাশয় পণ্ডিচারীতে একাধিক বার এসেছেন। এবং একাধিকবার আমাকে আহার্য সহযোগে চা খাইয়ে সেই আঁধারে আঁধারে সাক্ষাতের ক্ষতিপূরণ করেছেন।

এই শ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে আমরা নিজেরাই রান্না করে খেতাম—নিরামিষ। অবশ্য নিরামিষটা আদর্শ হিসাবে নয়, ঐটে তৈরি করা সহজ ব'লে। প্রাতরাশটা ছিল আমাদের অতি সুনিয়মিত—কেননা ওটা করা হ'ত বাজার থেকে কিনে। প্রাতরাশের উপাদান ছিল মুড়ি, নারিকেল এবং বেগুনী। আমরা তখনো কেউ চা-রসে রসিক হয়ে উঠি নি। কিন্তু দুপুর বেলার আহার ব্যাপারে বিরাজ করত একটা complete anarchy—এটা ছিল স্বেচ্ছা বেনিয়মের রাজত্ব। উৎসাহ হ'ল তো ন'টা দশটার মধ্যে রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়া শেষ। আর যেদিন উৎসাহ হ'ল না সেদিন গড়িমসি করতে করতে এ ওর গা ঠেলাঠেলি করতে করতে দু'টো তিনটে আন্দাজ রান্না ক'রে খাওয়া হ'ল। হেম সেন যখন থাকতেন তখনই শুধু এই অনিয়মের রাজ্যে কতকটা সুনিয়মের প্রতিষ্ঠা হ'ত। হেম সেন ছিলেন হঠযোগী। সেইজন্য সম্ভবতঃ শারীরিক আলস্যকে প্রশ্রয় না দেবার কায়দা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাতের আহার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো ছাপ নেই। তবে উপবাস করতাম না সেটা নিশ্চিত। রাত্রে দু'একদিন হোটেলে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে পক্ব ভোজ্য গ্রহণের কথা মনে আছে।

এই বাড়িতে মাঝে মাঝে একটি যুবককে আসতে দেখতাম। তাঁর নাম শুনতাম গণেন মহারাজ। নামেই প্রকাশ যে তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কিত লোক। আমাদের নিরামিষ আহারের ফলে বীরেন কিম্বা আমাদের মধ্যে অন্য কেউ গণেন মহারাজকে বলেছিলেন কি না জানি নে কিন্তু তিনি অর্থাৎ গণেন মহারাজ একদিন একটি স্যামনের (Salmon) টিন এনে হাজির করলেন। এখানে বিশেষ ক'রে বীরেনের নামটা করলাম এই-জন্যে যে, আমাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন খাদ্য সম্বন্ধে একটু বিশেষ অনুরাগ-প্রবণ। Stuffed দ্বিজ বিশেষের রোস্ট্—পৈতেধারী দ্বিজ নয়, পালকধারী দ্বিজ—প্লেটে সামনে নিয়ে ব'সে তাঁর চোখ থেকে স্বর্গীয় জ্যোতির বিকীরণ দেখেছি। সম্ভবতঃ অন্নং ব্রহ্ম, এর উপলব্ধি তাঁর দেহের প্রতি রোমকূপে সত্য হ'য়ে উঠেছিল।

আমি তখন সবে মফস্বল শহর থেকে কলিকাতায় এসেছি, তার উপর আবার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, তাই বোধ হয় খেতে ব'সে যখন ঐ স্যামনের টিনটা খোলা হ'ল এবং ওর ভিতরকার লালচে লালচে জলপাইয়ের তেলে (olive oil) জ্যাবড়ানো মাংস-পিণ্ডবৎ একটা পদার্থ দেখা গেল তখন ঐ দৃশ্যে আমার পেটের খিদে তো দ্রুত পলায়ন করলই সেই সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে একটা গা-ঘিন্-ঘিন্ ভাবও চারিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম যে, যুদ্ধক্ষেত্রেই যে কেবল বীরত্বের প্রয়োজন আছে তাই নয়, অবস্থা-বিশেষে ভোজ্যক্ষেত্রেও ঐ গুণপনার ডাক পড়ে। আর

বিশেষতঃ ম্লেচ্ছদের হাত থেকে দেশ উদ্ধারের জন্ত যারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে ম্লেচ্ছদের ভোজ্যবস্তুর সম্মুখেই যদি তারা মূর্ছাভাবাপন্ন হয় তবে খাস ম্লেচ্ছদের সম্মুখীন হ'লে যে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং অসহায়া দেশমাতৃকার মুখ চেয়ে, দৃশ্যতঃ পেটের নাড়ী-ওলটানো সেই পদার্থটি বিপুল পৌরুষের সহিত একটু তুলে মুখে দেওয়া গেল। ও হরি! দেখতেই যা, আসলে কিছু নয়। মুখে দিতেই আমার জীবাত্মা মুহূর্তের মধ্যে থার্ডিস্থ হ'য়ে গেলেন, কেননা এ একেবারে নিতান্তই মাছ। বস্তুটি চোখে দেখতেই ম্লেচ্ছ কিন্তু খেতে নির্ভুল মৎস্য-গোত্রীয়—একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার—বাঙালী হিন্দুর সনাতন জিনিস। নামটা বিলিতি হোক কিন্তু স্বাদটা একেবারে গৌড়ীয়। বোঝা গেল সাহেব মাছ আর বাঙালী মাছে কোনই তফাৎ নেই।

আমার এই প্রথম শ্যামন সন্দর্শনের এগার বছর পরে ১৯২১-এর শেষ দিকে বা ১৯২২-এর গোড়ার দিকে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মে ফেয়ারের বাড়িতে তাঁর লেখাপড়া করবার ঘরে গণেন মহারাজকে একদিন খদ্দর-মণ্ডিত হ'য়ে চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে ব'সে থাকতে দেখেছিলাম—অন্ততঃ আমার মনে হয়েছিল যে তিনিই সেই গণেন মহারাজ। ইনি আজ আর ইহলোকে নেই।

এই শ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে বোমার মামলার অন্যতম আসামী শচীন সেনকে একদিন আসতে দেখেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, নেড়া মাথা, কালো রঙ, সুশ্রী কমনীয় চেহারা, উজ্জ্বল চোখ—যাকে ইংরেজীতে বলে sparkling. যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ টুকরো টুকরো গান (snatches of songs) তাঁর কণ্ঠ থেকে ক্রমাগত উৎসারিত হচ্ছিল। বোমার মামলায় যাঁরা খালাস পান তাঁদের মধ্যে ইনি ও দেবব্রত বসু রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। দেবব্রত পরে প্রজ্ঞানন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা দুজনেই আজ মৃত।

এই সময়ে এক দিন স্টার থিয়েটারে "প্রতাপাদিত্য" অভিনয় দেখেছিলাম। প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমর দত্ত মহাশয় নেমেছিলেন। এই আমার প্রথম কলিকাতায় থিয়েটার দেখা। এর পূর্বে একবার অরোরা থিয়েটারের "আলিবাবা" অভিনয় দেখেছিলাম—আমাদের শহরে কোনো জমিদারের বাড়িতে কি একটা উপলক্ষ্যে বায়না নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ সম্প্রদায় সেই সময়ে। এই শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে আমরা মফস্বলের সেই সুদূর শহরে থেকেই, গিরীশ ঘোষ, দানিবাবু, অমর দত্ত, অর্ধেন্দু মুস্তোফি, অমৃত বোস, তারাসুন্দরী, নরীসুন্দরী প্রভৃতির নাম খুব শুনতাম। সে সময়ে আমাদের শহরের সখের নাট্য-সমাজের মধ্যীয় পিতৃদেব একাধারে ডিরেক্টর ম্যানেজার রিহার্সাল মাস্টার ইত্যাদি ছিলেন। শুনতাম যে তিনি ভাল অভিনেতা ছিলেন। কিন্তু আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তাঁকে কোনোদিন রঙ্গমঞ্চে নামতে দেখি নি। তাঁর কাছে "রঙ্গালয়" নামে একখানি কাগজ আসত। তাতে মাঝে মাঝে আর্ট পেপারে ছাপা ছবি ক্রোড়পত্র রূপে থাকত। এইরূপ একখানি ক্রোড়পত্রে কপোতাক্ষ নাদিরশাহ রূপে অমর দত্তের ছবি দেখেছিলাম। ছবিটা অবশ্য কৃষ্ণকান্তের উইলের নাট্যরূপ "ভ্রমর"-এর একটি দৃশ্যের। কিন্তু সেদিন অমর দত্তের প্রতাপাদিত্যের অভিনয় দেখে নিরাশ হলাম। সে অভিনয়, মনে হ'ল যেন যাত্রার অভিনয়েরই এক উঁচু সংস্করণ। প্রতাপাদিত্য ভূমিকার এর চাইতে ভাল অভিনয় আমাদের শহরের নাট্য-সমাজে দেখেছি, এবং সেখানে এক ভদ্রলোক ভবানন্দের অভিনয় করেছিলেন যার কাছে সেদিনকার কলিকাতার স্টারের ভবানন্দ দাঁড়াতেই পারে না। পরে শুনেছিলাম যে অমর দত্ত মহাশয় সামাজিক নাটকেই ভাল অভিনয় করেন।

অরবিন্দ এই সময়ে কলেজ স্কোয়ারে তাঁর মেসো মহাশয় "সঞ্জীবনী"র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে থাকতেন। এই বাড়িতে আমি অরবিন্দকে একবার মাত্র তিন চার সেকেণ্ডের জন্ত দেখেছিলাম। আমাদের খরচের টাকা ফুরালে আমি একবার তাঁর কাছে টাকা আনতে গিয়েছিলাম। প্রাতঃকালে নটা সাড়েনটার সময় আমি সে বাড়িতে গিয়ে যেখান দিয়ে উপরের যে-ঘরে গিয়ে উঠলাম সে-সবের যে ছাপ আমার মনে আছে তা একটা বসত-বাটীর নয়, তা ছাপাখানা এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাপারের। আমি সেই ঘরে দু'এক মিনিট অপেক্ষা করতেই ভিতর দিককার একটা দরজা দিয়ে অরবিন্দ সেই ঘরে এলেন। একটি টুইলের সার্ট গায়ে চটি পায় এবং মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা। আমার হাতে টাকা দিয়ে (নোটে) কোনো বাক্য ব্যয় না ক'রে আবার চলে গেলেন। কত টাকা দিয়েছিলেন ঠিক মনে নেই। তবে কুড়ি-পঁচিশের মতো হবে। আমি টাকা নিয়ে শ্যামপুকুর লেনে ফিরে এলাম।

কলেজ স্কোয়ারের এই বাড়ি থেকে অরবিন্দ রোজ বিকেল চারটে পাঁচটার সময় শ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে আসতেন। পূর্বেই বলেছি যে আমরা কেউ চা খেতাম না—কিন্তু আমাদের চা করবার ব্যবস্থা ছিল। অরবিন্দ এলে তাঁকে এক পেয়ালা চা ক'রে দেওয়া হ'ত, এবং গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ের একটা খাবারের দোকান থেকে লুচি আলুর দম ও হালুয়া কিনে এনে তাঁকে জলখাবার দেওয়া হ'ত। তিনি এখানে এসে তাঁর পত্রিকা-সম্পর্কে কিছুকাল ব্যাপৃত থাকতেন। তারপর আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতেন এবং প্রায় রোজ অটোমেটিক্ রাইটিং হ'ত।

অটোম্যাটিক রাইটিঙের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এই: প্রথমেই এর স্বীকার্য হচ্ছে এই যে, পরলোক ব'লে এমন একটা স্থান বা অবস্থা আছে যেখানে মৃত মানুষের আত্মা বিদেহী অবস্থায় থাকে। আবার জীবিত মানুষের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা অতি সহজে এই ইহলোক আর ঐ পরলোকের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করতে পারেন। এঁদেরই বলা হয় মিডিয়াম (medium)। এঁদের শরীর অধিকার ক'রে বিদেহী আত্মারা কথা বলতে পারেন বা লিখতে পারেন। এই লেখাকেই বলা হয় অটোম্যাটিক রাইটিং।

এই সময়ে অরবিন্দ তামিল ভাষা শিখছিলেন। এই বাড়িতেই "কর্মযোগিন্" আপিস ঘরে এসে এক দক্ষিণী ভদ্রলোক তাঁকে তামিল পড়িয়ে যেতেন। মনে আছে একদিন

তিনি তামিল পাঠ সাঙ্গ ক'রে ফিরে এসে তের-চোদ্দ বছরের স্কুল বালকের মতো কৌতুক বোধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললেন—"Do you know what is পীরেন্তির নাত্ তত্ত কোপ্তা ?" আমরা অবশ্য সবাই অজ্ঞতায় বাকহীন হ'য়ে রইলাম। তিনি বললেন—"ঐ হচ্ছে তামিলে বীরেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত।

তামিল ভাষায় স্পর্শ বর্ণের প্রতি বর্গের প্রথম ও শেষ বর্ণটি মাত্র আছে, মাঝের তিনটির কোনো অস্তিত্ব নেই। ক ঙ, চ ঞ, ট ণ, ত ন, প ম এবং আরো কয়েকটি নিয়ে তামিল ব্যঞ্জন বর্ণ। (টাইপ-রাইটারের পাণ্ডাদের একেবারে স্বর্গলোক।) সুতরাং প্রতি বর্গের দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনিটি সেই বর্গের প্রথম বর্ণটি দিয়ে সারতে হয়। ফাঁসি কাঠ থেকে বাঁচবার জন্যেও তামিলে "ভারত" লিখবার উপায় নেই, লিখতে হবে "পারত"। তার পর পাঠকের নসীব যদি তিনি বুঝে উঠতে পারেন যে ওটা আসলে হচ্ছে "ভারত।" এই বর্ণমালায় যদি সংস্কৃত ভাষা লিখতে হয় তবে "কর্ম" আর "ধর্ম" এক হ'য়ে যাবে, এবং "তনু"তে ও "ধনু"তে চাক্ষুষ কোনো পার্থক্য থাকবে না। তাই তামিলে বীরেন্দ্র হয় পীরেন্তির (তামিলে ব্যঞ্জন যুক্তাক্ষরও নেই), নাথ হয় নাত্, দত্ত হয় তত্ত এবং গুপ্ত যে কেন কুপত না হয়ে কোপ্তা হ'ল তার কারণ সম্ভবতঃ হয় দক্ষিণী অজ্ঞতা নয় অরবিন্দের কৌতুক-প্রবণতা।

পূর্বেই বলেছি যে অরবিন্দ শ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে আসতেন বিকেল চারটে পাঁচটার সময়। তিনি এখান থেকে কলেজ স্কোয়ারে ফিরতেন রাত নটা সাড়ে নটার সময়। ফিরবার সময় আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে গ্রে ষ্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত যেতাম। সেইখানে তিনি ট্রাম ধরতেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে এগিয়ে পূর্বমুখী একটা গলির ভিতর দিয়ে একটা ছোট ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়তাম—বোধ হয় সেটা ছিল একটা কাঠের আড়ত—তারপর সেখান থেকে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাড়ির উত্তর পাশ দিয়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে প'ড়ে আমরা গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছতাম। এইটেই ছিল এদিকে যাতায়াতের আমাদের সোজা রাস্তা—যাকে বলে short cut। কচিৎ কদাচিৎ অরবিন্দের ফিরতে খুব দেরি হ'য়ে যেত। এত দেরি হত যে ট্রাম পাওয়া যেত না তখন একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হ'ত, তাতে ক'রে তিনি চ'লে যেতেন। তখনও survival of the swiftest সূত্রের বলে কলিকাতার রাস্তা থেকে ঘোড়ার গাড়ী অন্তর্হিত প্রায় হয় নি।

কলিকাতায় এসে এই বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের আমি অরবিন্দকে সেজদা বলে উল্লেখ করতে শুনেছি। স্পষ্টই বোঝা যায় যে বারীন্দ্রের সেজদা তাঁর বৈপ্লবিক অনুচরদের কাছে—বিশেষ করে যাঁরা তরুণ বয়েসের—সেজদা হ'য়ে উঠেছিলেন। তার পর অরবিন্দের বার তিনেক নামের পরিবর্তন ঘটে—অর্থাৎ যে নামে আমরা তাঁকে উল্লেখ করতাম। এক সময়ে আমরা তাঁকে "কর্তা" বলে উল্লেখ করতাম। কিন্তু ওটা ভাবভঙ্গিতে নিতান্তই সেকেলে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবার কথা নয়। তার পর তাঁর নাম দাঁড়ায় "A. G"তে। কিন্তু বলাবাহুল্য ওটা টিক্-বীয়ার-গন্ধী। সুতরাং স্থায়িত্ব লাভের যোগ্যতাহীন। সর্বশেষে তাঁর নাম এলো "শ্রীঅরবিন্দ" রূপে। তাঁর এ নাম আজ আর ঘরেই আবদ্ধ নেই, বাইরেও ছড়িয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ নামের আগে দু'চার জন তাঁকে "অরো" বলেও উল্লেখ করতেন। ওটা যেন বাহ্য ও মিথ্যা অন্তরঙ্গতার বাড়াবাড়িতে ন্যাটুকেপনা বলে আমার মনে হ'ত। সে যা হোক এখন মূলসূত্রে আসা যাক্।

এই চার নম্বর শ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের একদিন, দ্বিতলের একটি কক্ষে ব'সে রাত প্রায় আটটার সময় অরবিন্দ অটোম্যাটিক রাইটিং করছিলেন এবং কয়েকটি তরুণ বয়স্ককে প'ড়ে শুনাচ্ছিলেন। আমাদের লেখা ব'লে যদি কেউ মনে করেন যে ব্যাপারটা নিতান্ত আগাগোড়া গুরুগম্ভীর তবে তিনি ভুল করবেন। আমাদের সবাই গুরুগম্ভীর নন—তাঁদের মধ্যেও রঙ্গ-রহস্য কৌতুকপ্রিয়ও আছেন। সুতরাং সেই অটোম্যাটিক রাইটিঙের আসর কখনও গুরুগম্ভীর বাণীতে স্তব্ধ আবার কখনও হাস্য কৌতুকে উচ্ছ্বসিত। এমনি যখন আমাদের লেখনী পুরোদমে চলছিল তখন সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন রামবাবু।

রামবাবুর পুরোনাম শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মজুমদার। ইনিও যুবক—বয়েস ত্রিশের নীচেই হবে—ফরসা রং, মুখমণ্ডলে গোঁফ-দাড়ি—অযত্ন-বর্ধিত নয়, সযত্ন কর্তিত অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে well-trimmed—কেশ-কলাপে পোষাক-পরিচ্ছদে সর্বদাই ফিটফাট যেন তিনি সদাই বিয়ে করতে চলেছেন। কেশ-বেশে তাঁকে কোনোদিন অগোছাল বা মলিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কপালে একটি কাটা দাগ, বাল্যে অতি শান্ত শিষ্ট ছিলেন তারই চিহ্ন বোধ হয়। রামবাবু কলিকাতারই বাসিন্দা এবং ঐ অঞ্চলেরই লোক। শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট থেকে উত্তরমুখী একটা লেনে (নামটা মনে নেই) তিনি বাস করতেন। তিনি ছিলেন "কর্মযোগিন্" ও "ধর্ম" পত্রিকার সহকারী।

রামবাবু ঘরে প্রবেশ ক'রে একটু উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে অরবিন্দকে জানালেন যে তাঁর নামে আবার ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। বিশ্বাস-যোগ্য খবর, কোনো উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী জানিয়েছেন। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। কিছুকাল থেকেই কানা-ঘুষা শোনা যাচ্ছিল যে গবর্ণমেণ্ট অরবিন্দকে আপন কুক্ষিগত না করে ছাড়বে না। তথাপি সংবাদ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে পরিবর্তিত হ'য়ে গেল। যে স্থান ছিল হাস্য-কৌতুকে উচ্ছ্বসিত, সেখানে নিবিড় স্তব্ধতা বিছিয়ে গেল। প্রখর আলোক থেকে যেন হঠাৎ অন্ধকার। আমরা সবাই উৎকণ্ঠিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অরবিন্দ কয়েক মুহূর্ত যেন কি ভাবলেন—কয়েক মুহূর্ত মাত্র—তারপর বললেন—"আমি চন্দননগর যাব।"

রামবাবু বললেন—"এক্ষুনি ?"

অরবিন্দ উত্তর করলেন—"এক্ষুনি—এই মুহূর্তে।"*

অরবিন্দ উঠে দাঁড়ালেন, এবং রামবাবুর সঙ্গে তিনি

* পাঠক মনে করবেন না, অরবিন্দ ও রামবাবু ঠিক এই শব্দগুলিই ব্যবহার করেছিলেন। আমি কেবল তাঁরা যে ভাবের কথা বলেছিলেন ও যে ঘটনা ঘটেছিল তাই বিবৃত করছি—লেখক।

বাড়ি থেকে বেরুলেন। তাঁদের কিছু পশ্চাতে বেরুলেন বীরেন তাঁদের অনুসরণ ক'রে এবং বীরেনের কিছু পশ্চাতে বেরুলাম আমি বীরেনকে অনুসরণ করে। সর্বাগ্রে অরবিন্দ ও রামবাবু, তাঁদের পশ্চাতে কিছু দূরে তাঁদের দৃষ্টিপথে রেখে বীরেন এবং বীরেনের পশ্চাতে কিছুদূরে বীরেনকে দৃষ্টিপথে রেখে আমি—এই রকমের একটা শোভাযাত্রা নয়, "বোবাযাত্রা" অর্থাৎ silent procession তৈরি হ'ল। চারজন লোকের এই "বোবাযাত্রা" স্থূলজগতে অসংলগ্ন কিন্তু সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্মসূত্র দ্বারা গ্রথিত হ'য়ে উত্তর মুখে পথ চলতে লাগল।

অরবিন্দ যতক্ষণ এ বাড়িতে থাকতেন ততক্ষণ এ বাড়ি গোয়েন্দা পুলিসের নজরবন্দী থাকত। এই কিছুদিন মাত্র আগে পুলিস কর্মচারীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের ঔৎসুক্য নিবারণার্থে আমাদের অটোম্যাটিক রাইটিঙের আসর রাস্তার উপরের একটা ঘর থেকে ভিতরের দিককার একটা ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল সেদিন যখন অরবিন্দ রামবাবুর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরুলেন এবং পর পর আমরা দু'জনে বেরুলাম তখন সে-বাড়ির কাছে কিনারে পুলিসের কোনো চিহ্ন নেই। বাল্যকালে যাত্রাগানে "সুরথ উদ্ধার" পালায় দেখেছিলাম, সুরথ রাজার বিশ্বস্ত সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহ ষড়যন্ত্রের ফলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন এবং কারাগার থেকে যখন তাঁকে উদ্ধার করবার সময় হ'ল তখন দেবতারা নিদ্রাদেবীকে পাঠালেন কারাগারের প্রহরীদের চোখ অধিকার করবার জন্যে। প্রহরীরা অবশ্য বার-পাঁচ সাতেক হাই তুলে দু'চার বার চোখ কচলিয়ে আসর তলে লুটিয়ে পড়ল। সেই রকম সেদিন সেই সময় দেবতারা তৃষ্ণা দেবীকে গোয়েন্দা পুলিসটির কণ্ঠ অধিকার করতে পাঠিয়েছিলেন কি না এবং সেই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য গোয়েন্দাটি হাওয়া খেতে কিম্বা তার চাইতে স্থূলতর কিছু খেতে অন্যত্র গিয়েছিলেন কি না তা জানি নে। কিম্বা হয়তো ইনি বুদ্ধির চাতুর্যের দ্বারা প্রত্যহই তাঁর কর্তব্যবোধকে নিয়ন্ত্রিত করতেন। অরবিন্দ এ বাড়িতে আসতেন চারটে পাঁচটার সময় এবং চ'লে যেতেন ন'টার পর। সুতরাং মাঝের এই সুদীর্ঘ সময় এই সংকীর্ণ গলির মধ্যে থেকে পায়ের গোড়ালিতে ঠাণ্ডা লাগানো, যাকে ইংরেজীতে বলে cooling one's heels, বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এ-সময়টায় বরং অন্যত্র গিয়ে আনন্দ আহরণে আত্মনিয়োগ করলে চিত্তের প্রসাদ লাভ হ'তে পারে। তাই বোধ হয় তিনি চার-পাঁচটার সময় অরবিন্দকে এ-বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে মনে মনে "ঠিক হ্যায়" ব'লে চ'লে যেতেন এবং চিত্তের প্রসাদ লাভ ক'রে ন'টার আগেই ফিরে এসে আপনার কর্তব্য-তরীর হাল ধরতেন। সে যা হোক, যে কারণেই হোক না কেন, দেখা গেল যে ঠিক ঐ সময়টাতে পুলিসের গোয়েন্দাটি সেখানে উপস্থিত নেই। হেড কোয়ার্টারে তাঁর সেদিন কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা জানবার জন্য ভারি কৌতূহল জাগে।

কিন্তু পুলিসের লোক সে সময় উপস্থিত থাকলেই যে বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারতেন তা মনে হয় না। পূর্বেই বলেছি যে রামবাবু ঐ অঞ্চলেরই লোক। সুতরাং ওর নাড়ীনক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে থাকবারই কথা। তিনি অরবিন্দকে নিয়ে এমন একটা পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করলেন যা আমার কাছে একটা অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আমি কলিকাতায় সবে এসেছি। আমার চোখ মফস্বলী দৃষ্টি তখনও বিস্মৃত হয় নি। এ পর্যন্ত এই রাজধানীতে বড় রাস্তার পাশে অট্টালিকাশ্রেণীকে ভদ্রতাকে উচ্চ শিরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। কিন্তু বুদ্ধিমান ব'লে পরিকীর্তিত মানুষ নামক জীবদের বাসস্থানের সমষ্টি যে এমন গোলকধাঁধার রূপ ধারণ করতে পারে তা এই পল্লী প্রবেশের পূর্বে আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সেদিনের সম্ভাব্য অনুসরণকারী কোনো গোয়েন্দা পুলিসকে ব্যাহত করা ছাড়া এর দ্বারা অন্য কোনোরকম স্বাস্থ্যজনক কার্য সাধিত হ'তে পারে না, এটা নিশ্চিত। ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি বাড়ি, ঘন ঘন গলি, পদে পদে বেঁক। রাস্তা জনমানবহীন। সেই রাত আটটার সময়েই কোনোদিকে সাড়াশব্দ নেই। তখন অবশ্য রেডিওর চল হয় নি। কিন্তু গ্রামোফোনের চল হয়েছে তো, কিম্বা কুমারী কন্যাকে পাত্রস্থ করবার জন্যে কিঞ্চিৎ গানের চর্চার চল হয়েছে তো। কিন্তু কোনোখান থেকেই গ্রামোফোনের একটা সুর বা হারমোনিয়মের সা-রে-গা-মার একটু রেশ ভেসে আসছে না। সেই নিবিড় স্তব্ধতার মাঝে সেই বহু গলি-অধ্যুষিত বহু বেঁক-সমন্বিত পল্লী-অঞ্চলে জনমানবহীন পথে পুলিস তো পুলিস পুলিসের প্রপিতামহ পর্যন্ত কারও সাধ্য নেই যে কোনো লোককে অনুসরণ ক'রে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিপথে রাখতে পারে। তাই বলছিলাম যে গোয়েন্দাটি উপস্থিত থাকলেও বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারতেন ব'লে মনে হয় না। তবে তিনি অবশ্য এই জ্ঞান লাভ করতে পারতেন যে সেদিন অরবিন্দ বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ারে না ফিরে ঠিক তার উল্‌টো দিকে কোথায় যাত্রা করেছেন এক গোলকধাঁধারূপ পল্লীর ভিতর দিয়ে। আর কলিকাতার গোয়েন্দামহলে যদি 'শারলক্ হোমস্' ব 'এ্যারকিয়ুল পোয়ারো'র মতো কোনো কর্মচারী থাকতেন তবে ঐ অতি ক্ষীণ সূত্রটুকু ধ'রে হয়তো কোনক্রমে চন্দননগরে পৌঁছে যেতে পারতেন। আর তবে সম্ভবতঃ এই কাহিনী লিখবার আর প্রয়োজন হ'ত না।

সে যা হোক, প্রায় পনর কি বিশ মিনিট আন্দাজ চ'লে আমরা গঙ্গার এক ঘাটে এসে পৌঁছলাম। পূর্বেই বলেছি, কলিকাতায় আমি কেবল এসেছি—তিন মাসও হয় নি—সুতরাং আমার তেমন পরিচিত নয় (আজও নয়), কাজেই সেটা কোন ঘাট তা বলতে পারিনে— বাগবাজারের ঘাট হ'তে পারে সেই ঘাটে পৌঁছে নৌকার এক মাঝিকে উদ্দেশ ক'রে রামবাবু হাঁক দিলেন—"আরে ভাড়া যাবি ?"

রামবাবুর এই কথা কয়টি এবং তাঁর গলার আওয়াজ আজও যেন আমার কানে লেগে আছে। তারপর মাঝি ও রামবাবুতে যে কথাবর্তা হ'ল, তা নিম্নস্বরে। কথাবার্তা শেষে অরবিন্দ সেই নৌকায় আরোহণ করলেন। তারপর বীরেন ও আমি তাতে উঠলাম। রামবাবু বিদায় নিলেন। নৌকা খুলে দিল আমরা ভাগীরথী বক্ষে ভাসলাম।

নদীবক্ষে গিয়ে বোঝা গেল যে সেটা শুক্লপক্ষ, চতুর্দিক জ্যোৎস্নালোকে হাস্যোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ সম্পাতে বীচিবিভঙ্গে ঝিকিমিকি। কি তিথি জানি নে, হয় তো সেদিন—

"সান্দ্র একাদশী
তন্দ্রাহারা শশী
অসীম পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি"

কোথায় পুলিস, কোথায় নগর, কোথায় দ্বেষ হিংসা সংগ্রাম, স্বাধীনতা পরাধীনতার প্রশ্ন! আমরা যেন মানব-সভ্যতার দারুণ জঠর থেকে প্রকৃতির প্রশান্ত মুক্তির মাঝে ভূমিষ্ঠ হ'লাম।

এইখানে কর্তব্যের খাতিরে একটা কথার অবতারণা করতে বাধ্য হচ্ছি। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় "শ্রীঅরবিন্দ" নাম দিয়ে "উদ্বোধনে"র পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দের একখানি জীবনী লিখছেন। লোক মুখে শুনেছি তাতে তিনি অনেক ভুল সংবাদ এবং অনেক সত্য সংবাদের সঙ্গে ভুল সিদ্ধান্ত সরবরাহ করছেন। লোকমুখের এ-কথা আমি বিশ্বাস করি নি। মনে হয়েছে মরণশীল মনুষ্যেরা স্বভাবতঃই ঈর্ষা-পরবশ। এবং ঈর্ষান্বিত লোকেরা কি না বলতে পারেন! কিন্তু বঙ্গাব্দ তের শ' একান্নর আষাঢ় মাসের "উদ্বোধনে"র পৃষ্ঠায় রায় চৌধুরী মহাশয় অরবিন্দের কলিকাতা ত্যাগ ক'রে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে যাওয়ার সম্পর্কে যে-ছুটি সন্দেশ পরিবেশন করেছেন তা প'ড়ে মনে হ'ল যে অরবিন্দ-জীবনী সম্বন্ধে লোকমুখের কথা একেবারে মিথ্যা নাও হ'তে পারে। রায় চৌধুরী মহাশয় উক্ত পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় লিখছেন—"'উদ্বোধন'-সম্পাদক আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী সুন্দরানন্দ গত ১১ই ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন-আফিস হইতে আমাকে নিম্নলিখিত কথা কয়টি লিখিয়াছেন—

১। শ্রীঅরবিন্দ বাগবাজার মঠে আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া নৌকাযোগে বাগবাজার ঘাট হইতে চন্দননগর যান।

২। ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ ও ভগিনী নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে ঘাট পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন।"

রায় চৌধুরী মহাশয়ের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কথাগুলি লিখেছেন বটে কিন্তু সত্যের দিক থেকে কথাগুলি নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।

এখন জানতে সাধ হয়, স্বামী সুন্দরানন্দ এই সুন্দর সন্দেশ ছুটি কোন্ বিপণি থেকে সংগ্রহ করলেন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে Truth is beauty and Beauty is truth—সত্যই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য। কিন্তু এই সন্দেশ ছুটি সুন্দর হ'তে পারে কিন্তু সত্য নয়। মনে হচ্ছে যেন কোথা থেকে একটি প্রচার-সচিব উঁকিঝুঁকি মারছেন—অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে propaganda minister। আমি প্রচার-সচিবের নিন্দা করছি নে, কিন্তু ইনি বোধ হচ্ছে যেন superlative degreeর—অর্থাৎ একেবারে—"তম" বিশেষণে বিভূষিত।

সুতরাং ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ যাতে না হয় সেইজন্তে আজ আমি এখানে স্পষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে রাখছি যে সুন্দরানন্দের ঐ সংবাদ ছুটি সর্বৈব মিথ্যা—একেবারে অসঙ্কোচে অসংশয়ে অবিসম্বাদিতরূপে মিথ্যা। অরবিন্দ সে-দিন কোনো মঠে যান নি, শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করেন নি (৺সারদামণি দেবীর সহিত অরবিন্দের কোনো দিনই দেখা হয় নি) এবং সেদিন সে-সময়ে গণেন মহারাজ বা ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর কোনো সাক্ষাৎই ঘটে নি। সেদিন তিন ব্যক্তি অরবিন্দের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যান—এঁদের নাম হচ্ছে রাম মজুমদার, বীরেন ঘোষ এবং সুরেশ চক্রবর্তী। এঁদের মধ্যে রামবাবু ফিরে আসেন, অন্ত ছু'জন অরবিন্দের সঙ্গে চন্দননগর পর্যন্ত যান।

কিন্তু এই সব গল্প রচকদের বুদ্ধিকে বলিহারি! অরবিন্দ সেদিন গোপনে কলিকাতা ত্যাগ করছেন। কিন্তু তাঁর প্রথম কাজ হ'ল মঠের মতো একটা স্থানে গিয়ে দশ জনের দৃষ্টি আকর্ষণ। কিন্তু সেটাও বোধ হয় যথেষ্ট মনে না হওয়াতে, বাগবাজারের মতো অঞ্চলে একজন ইয়োরোপীয় মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাস্তায় বেরুলেন এবং নদীর ঘাটে পৌঁছলেন—যাতে সকলের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। গল্পরচক যে কেন ঐ সঙ্গে "অরবিন্দ বাগবাজার থেকে ক' সের রসগোল্লা কিনলেন এবং বড় বাজার থেকে একখানি লেপ সংগ্রহ করলেন" এই বাক্যটি জুড়ে দেন নি তা বোঝা যায় না। তা যদি দিতেন তবে অধ্যাত্ম রসের সঙ্গে বাস্তব রসের মিলন হ'য়ে একেবারে সোনায় সোহাগা হ'ত—গল্পটা আরো রসবান হ'য়ে উঠত।

এইখানে জীবন-চরিত লেখা সম্বন্ধে একটা কথা বলি। শতকরা নিরানব্বুই জন লোকের ধারণা যে জীবন-চরিত লেখা অতি সহজ ব্যাপার। কিন্তু আসলে জীবন-চরিত লেখা গল্প উপন্যাস লেখার চাইতে শক্ত—ঠিক যেমন 'পোর্ট্রেট' আঁকা 'ল্যাণ্ডস্কেপ' আঁকার চাইতে কঠিন। গল্প উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখক বড় জোর অপাঠ্য গল্প উপন্যাস মাত্র লিখতে পারেন, কিন্তু জীবন-চরিত লিখতে গিয়ে লেখকের খুনে হ'য়ে উঠবার সম্ভাবনা। এই কথাটা যদি মনে রাখেন তবে জীবনীকারদেরও আর খুনে হ'য়ে উঠতে হয় না এবং যাঁদের জীবন-চরিত লেখা হয় তাঁদেরও আর এই ব'লে প্রার্থনা করতে হয় না—"হে ভগবান্! আমার ভক্তদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।"

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গিরিজাবাবু সংবাদ-সংগ্রহে পাকা-হাত নন। নইলে অরবিন্দের চন্দননগর যাওয়া সম্পর্কে উপরি-উক্ত যে-ছুটি সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য কি মিথ্যা, সেটা সঠিক জানা তাঁর পক্ষে কঠিন ব্যাপার ছিল না। এবং তাতে খরচ হ'ত মাত্র তিন পয়সার একখানি পোস্টকার্ড।

কিম্বা, এখন মনস্তত্ত্বের রেওয়াজ—অবচেতন মনের; সুতরাং যদি কেউ বলেন যে, গিরিজাবাবুর অবচেতন মন ঐ ছুটি সংবাদ সত্য ব'লে গ্রহণ করতেই এমন উদগ্রীব ছিলেন যে বেশি অনুসন্ধান করতে গিয়ে পাছে ও-ছুটি মায়া-মরীচিকার মতো মিলিয়ে যায় সেইজন্তে তিন পয়সা খরচের দিকে তিনি হাত বাড়ান নি, তবে তাঁর বিশেষ দোষ দেওয়া যাবে না।

সে যা হোক্, এখন আসল কথায় আসা যাক্। আমাদের নৌকা চলতে লাগল। দাঁড়ী মাঝিরা কি ভাবল কে জানে! এমন জ্যোৎস্না রাত, প্রফুল্লিতা প্রকৃতি, উৎফুল্লা ভাগীরথী। এমন যামিনীতে তারা নিশ্চয়ই বহু বাবুলোকদের নৌকা-বিহারে নিয়ে আসায় অভ্যস্ত। কিন্তু সেদিন সেই যে তিনটি প্রাণী নৌকার ছইয়ের ভিতরে গিয়ে অন্ধকারে মগ্ন কাঠের পাটাতনের উপরে এমন চুপচাপ রইল যে তার পর তাদের অস্তিত্বের আর কোনো প্রমাণই পাওয়া গেল না—না একটু হারমনিয়মের সা রে গা মা, না একটু মধু কণ্ঠের শ্রবণরঞ্জিনী

সুরলহরী, না কোনো নৃত্যশিল্পপটীয়সীর নূপুর-গুঞ্জরণ! দাঁড়ী-মাঝিরা যদি দার্শনিক বা মনস্তাত্ত্বিক হ'ত তবে তারা নিশ্চয়ই এ নিয়ে গবেষণা সুরু ক'রে দিত এবং পরিশেষে কোন্ সত্যে উপনীত হ'ত কে জানে। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তারা দার্শনিকও নয়, মনস্তাত্ত্বিকও নয়, সুতরাং নির্বিঘ্নে নৌকা চলতে লাগল। পথে আর কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটল না। কেবল একবার নৌকাখানি একটা চড়ায় একটু আটকিয়েছিল। তখন অবশ্য মর্মে কতকটা এই রকম ভাবের উদয় হয়েছিল—"হে মাতর্গঙ্গে! অবশেষে সময় বুঝে এইখানে এমন ভাবে চড়া হ'য়ে রইলি মা?" কিন্তু মা গঙ্গা বিশেষ কষ্ট দিলেন না। দাঁড়ী-মাঝিদের সঙ্গে বীরেন ও আমি নেমে মিনিট আট দশেক ঠেলাঠেলি করতেই নৌকা চড়া ছাড়ল। মা গঙ্গা নৌকা আটক করবার আর কোনো উদ্যম করেন নি। লক্ষ্মী মা!

সারা রাত চ'লে খুব ভোরে ঘোর ঘোর থাকতে নৌকা চন্দননগরে পৌঁছল। অরবিন্দ নৌকা থেকে বীরেনকে চন্দন-নগরের খ্যাতনামা নাগরিক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছে পাঠান। কিন্তু রায় মহাশয় অরবিন্দকে কোনো রকম সাহায্য করতে অসমর্থ জানালেন। কিন্তু তিনি বীরেনের মারফত অরবিন্দের কাছে একটি সৎ পরামর্শ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি অরবিন্দকে ফ্রান্সে যেতে বললেন। অনুমান হয় চারু রায় মহাশয় মনে করেছিলেন যে, অরবিন্দ তাঁর নৌকার মাঝিটিকে বললেই সে ঘণ্টা আড়াইয়ের মধ্যে বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর এবং ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে তাঁকে নিস্ (Nice), তুলঁ (Toulon) বা মার্সেই (Marseille)এ পৌঁছে দিতে পারবে। কিন্তু সম্ভবতঃ অরবিন্দ কলিকাতার বাগবাজার ঘাট থেকে সংগৃহীত পান্সীর এই মাঝিটির ঈদৃশ সামর্থ্য সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সন্দিহান হ'য়ে উঠেছিলেন। সুতরাং তিনি আর ফ্রান্সে গেলেন না—যেখানে ছিলেন সেইখানেই থাকলেন। কিন্তু তাঁকে বেশিক্ষণ থাকতে হ'ল না। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় অরবিন্দের আগমন-সংবাদ পেয়ে সাগ্রহে তাঁকে আপন বাটীতে স্থান দিলেন।

এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, আর আজ ১৯৪৪-এর ডিসেম্বর। চৌ—ত্রি—শ বৎসর। এই চৌত্রিশ বৎসরে পৃথিবীতে কি পরিবর্তনই না ঘটেছে! মতি বাবুর জীবনেও কম পরিবর্তন ঘটে নি। ১৯১০-এর চন্দন-নগর বোড়াইচণ্ডীতলার অখ্যাতনামা মতিবাবু আজ প্রায় সারা বাংলাদেশে পরিচিত। বহু লোক আজ তাঁর কথা শ্রদ্ধা সহকারে শোনেন, তাঁর লেখা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন। বাংলাদেশের বহু তরুণ তরুণী যাঁরা "স্বদেশী আন্দোলন" যুগের বহু পরে জন্মেছেন, যাঁদের "Bande Mataram" (বন্দেমাতরম্)এর অরবিন্দকে জানবার উপায় নেই, Life Divine (লাইফ ডিভাইন)এর শ্রীঅরবিন্দকে বুঝবার উৎসাহ নেই, তাঁদের অনেকে হয়তো মতিবাবুর রচিত "মুখরোচক" "জীবন-সঙ্গিনী" গ্রন্থ পাঠ ক'রে অরবিন্দের পরিচয় জানবেন। সুতরাং "জীবন-সঙ্গিনী" পাঠ ক'রে আমার দু'একটি কথা যা মনে উদয় হয়েছে তা এইখানে লিপিবদ্ধ করছি। আমার কাহিনীর পক্ষে এ অবান্তর—কিন্তু একটা বৃহত্তর দিক থে এটা প্রাসঙ্গিক ব'লে মনে করি।*

(আগামী বারে সমাপ্য)

---

* এই নিবন্ধ লেখা শেষ হ'য়ে যাবার পর ১৩৫১ ফাল্গুনে "উদ্বোধনে" দুটি সংবাদ নজরে পড়ল। এর একটি সংবাদ দিয়েছে "উদ্বোধন"-সম্পাদক এবং অন্যটি দিয়েছেন গিরিজাশঙ্করবাবু। আমি শুনেছিলাম যে রামবাবু জীবিত নেই। কিন্তু উদ্বোধন সম্পাদক লিখছেন—

"'শ্রীযুক্ত রাম মজুমদার এখনও জীবিত আছেন। কিছু দি পূর্বেও তিনি 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে আসিয়া আমাদিগকে বলিয়াছে যে, তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাটিতে লই আসিয়াছিলেন। বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে নৌকায় আরোহ করিয়া শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর যান।' উঃ সঃ।"

রামবাবুর মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ রটায় আশা করি তিনি শতা হ'য়ে বেঁচে থাকবেন। কিন্তু উদ্বোধন-সম্পাদকের ঐ লেখায় এট স্পষ্ট নয়, রামবাবু চন্দননগর যাবার মুখেই শ্রীঅরবিন্দকে শ্রীশ্রীমায়ে বাটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন কি না। ও-লেখার তাৎপর্য যদি তা হয় তবে এ-কথা বলতেই হবে যে তা সত্য নয়। এবং রামবা যদি ও-কথা ব'লে থাকেন তবে সেটা একটা মহা রহস্যের ব্যাপার এ তাঁর স্মৃতি-বিভ্রম? কিম্বা চিত্তের বিভ্রম? কিম্বা অন্য কি তা আবিষ্কার করবার উপায় নেই। রামবাবু সেদিন শ্রীঅরবিন্দকে বরাবর গঙ্গার ঘাটেই নিয়ে গিয়েছিলেন, অন্য কোথাও নয়। এ সম্বন্ধে কোনোই ভুল নেই।

দ্বিতীয় সংবাদটি গিরিজাবাবুর এবং আরও মজাদার। গিরিজা বাবু লিখছেন—

"শ্রীঅরবিন্দের মাসতুত ভাই সুকুমার মিত্র আমাকে বলিয়া ছেন যে কর্ম্মযোগিন অফিস পুলিশে ঘেরাও করার পরে, সুকুমা বাবু ঐ অফিসে গিয়া অরবিন্দকে পাশের বাড়ির দেয়াল টপকাইয়া ফেলিয়া দেন। তিনি পাশের বাড়ি দিয়া পলায়ন করেন।"

পুলিসে-ঘেরা বাড়িতে সুকুমারবাবু নিজে দেয়াল টপকি প্রবেশ করেছিলেন কি না তা গিরিজাবাবুর লেখায় প্রকা নেই। সে যা হোক, সুকুমারবাবু যদি গিরিজাবাবুর কাছে এম গল্প ক'রে থাকেন তবে সেটা সুকুমারবাবুর একেবারেই কল্পনা প্রসূত। এবং আমার বিশ্বাস যে কেউ সুকুমারবাবুকে দশ মিনিটের জেরাতে এ-গল্পের গলদ ধরে ফেলতে পারেন। কি গিরিজাবাবুর কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনি বিশ্বাস-প্রবণতা যা শোনেন তাই রূপকথা-উৎফুল্ল শিশুদের মত বিশ্বাস করেন আমি যত দিন কর্মযোগিন অফিসে অবস্থান করছিলাম তা মধ্যে সুকুমারবাবু কোনো দিন সে-বাড়িতে পদার্পণ করেছে ব'লে আমার জানা নেই। অন্ততঃ যে রাত্রে শ্রীঅরবিন্দ চন্দন নগর যান সেদিন সারাদিনমান ও রাত্রের কোনো সময়ে সুকুমা বাবু ও-বাড়ির ত্রিসীমানার কাছেও কোথাও ছিলেন না—এ কথ গিরিজাবাবু বেদবাক্যের মত মেনে নিতে পারেন—অবশ্য গিরিজা বাবু যদি বেদ মানেন।

এই সব গল্পের পিছনে কোন্ মনস্তত্ত্ব সক্রিয় সেটা মনস্তাত্ত্বিক দের একটা সত্যিকার গবেষণার বিষয় ব'লে মনে হয়।—লেখক।

বেশ পরিষ্কার ছিল, শরতের পূর্বাভাস, আজ দুপুর থেকেই বেশ মেঘলা ভাব দাঁড়াইয়াছে, বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবটা বাড়িয়া চলিল। সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টি নামিবার সম্ভাবনা দেখিয়া আমি একটু বেলা থাকিতেই শেঠজীর নিকট বিদায় লইলাম, খানিকটা আগাইয়া দিয়া তিনি বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

ক্যাম্পে আসিতে আসিতে আকাশ বেশ ভাল করিয়া ঘিরিয়া আসিল, মাঝে মাঝে মেঘের ডাক। বোধ হয় চারিদিকে জলের জন্য এখানে ডাকটাও একটু নূতন ধরণের,—মনে হয় নিচের জলের সঙ্গে উপরের জলের যেন পরিচিত ভাষায় গম্ভীর আলাপ-মন্ত্র। ঠিক ও-ধরণের জিনিস আমরা আ[illegible]দের প্রান্তে পাই না।

এখানকার একঘেয়ে জীবনে বর্ষার দিনগুলো যেন আরও অপ্রীতিকরই বলিয়া মনে হয়, সাধারণত, বন্দীকে যেন নির্মম নিঃসঙ্গ কারাগুহায় প্রবেশ করিতে হইল। সঙ্গে আমার বরাবরই কিছু বই থাকে, বেশির ভাগই কাব্যগ্রন্থ; এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম সেগুলা লইয়া খুবই নাড়াচাড়া করিতাম। খুব ভাল লাগিত, মনে হইত যেন বিশেষ করিয়া কাব্যপাঠের জন্যই বিধাতা এই আধ-সত্য আধ-অলীক জায়গাটিকে স্বপ্নের রাজ্য হইতে চয়ন করিয়া আকাশ-অবলম্বী করিয়া তুলাইয়া রাখিয়াছেন।…ওদিকে নিজ বাংলার মন্ত্রণাগার থেকে মৃত্যুদূতের নিমন্ত্রণপত্র গেছে, বাংলার বন্ধু-সমাজ তাহাকে জোগাইবে আহার, উল্লসিত মৃত্যুদূতের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপে সে সংবাদের একরূপ কিছুই আসিয়া পৌঁছিতে পারিত না, আমার কাব্য আলোচনা অব্যাহতভাবে চলিল কিছুদিন।…তাহার পর আসিল ক্লান্তি, একে একে সমস্ত গ্রন্থগুলি বাক্সজাত করিয়া ফেলিলাম।

আজ সন্ধ্যায় যখন প্রথম বর্ষা নামিল সেই আদিম আনন্দটি আবার ফিরিয়া আসিল। এর যশটা কিন্তু বর্ষাকে দিলাম না, দিলাম একটি নবপরিণীত যুবার ব্যথাম্লান সলজ্জ হাসিকে। অনেক দিন পরে আমি আবার পেটিকা খুলিয়া কাব্যগ্রন্থ বাহির করিলাম—জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থই বাহির করিলাম—মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত।

সমস্ত রাত বৃষ্টি হইল। কুণ্ডনলালের ব্যথা আমায় সে রাত্রে বড়ই আতুর করিয়া তুলিল; মেঘদূতের প্রতিটি অক্ষর আমার কাছে নূতন অর্থে অর্থবান হইয়া উঠিয়াছে। এ যে আরও সুদূর নির্বাসন;—যে জগতে কুণ্ডনলালের তন্বীশ্যামাশিখরিদশনা…যুবতী বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ—সমুদ্রলগ্না এই স্বপ্নপুরী যে সে জগৎ থেকে আলাদা একেবারেই। এখানকার বুকের ব্যথা ওখানকার একজনের বুকে সংক্রামিত করিবে—মেঘের চেয়েও সূক্ষ্মদেহ কোথায় সেই দরদী বার্তাবহ? অনেক রাত্রি পর্যন্তই আমি পড়িলাম, কিন্তু দৃষ্টির গতি এতই বেদন-মন্থর হইয়া পড়িল যে আমি 'পূর্বমেঘ'টুকুও শেষ করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

পরদিন সকালে বৃষ্টি ধরিয়া আসিল। রাত্রের সেই স্বপ্নালু ভাবটি যদিও পুরাপুরি নাই তবু তাহার আমেজ রহিয়াছে খানিকটা। বইটাও একবার শেষ করিবার আগ্রহ রহিয়াছে, সকাল-বেলাকার কাজগুলা সারিয়া আমি তাঁবুর মুখটিতে আবার মেঘদূত লইয়া বসিলাম। মেঘগুলি অল্প অল্প বিভক্ত হইয়া গেছে, হাওয়াটা হইয়াছে একটু জোরালো, তাহাতে সেগুলা বেশ লঘু গতিতে উত্তর দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে।…রাত্রে মেঘের এই দূতালি ভাবটা এত প্রত্যক্ষ ছিল না। তাই তখনকার সেই স্বপ্নালুতা বোধ হয় একটু কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার জায়গায় বেশ একটি নূতন সজীবতা আসিয়া পড়িল। একটুর মধ্যেই আমি আবার বেশ ডুবিয়া গেলাম।

'পূর্বমেঘ' শেষ করিয়া ক্যাম্প-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া একটি সিগারেট ধরাইলাম। মনটা আরও একটু প্রস্তুত করিয়া লইতেছি, এইবার—

চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্।

—সেই অলকাপুরীতে প্রবেশ করিতে হইবে; এমন সময় দেখি কুণ্ডনলাল মন্থরগতিতে এই দিক পানে চলিয়া আসিতেছেন।

বড় আনন্দ বোধ হইল। মনে হইল মেঘদূতের বিরহী যক্ষই যেন সারা রাত্রির সাধনার ফলে আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত, একটু বেশি আগ্রহ করিয়াই সেদিন অভ্যর্থনা করিলাম। কুণ্ডনলাল আমার পাশেই একটি ক্যাম্প-চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

মনটা বেশ প্রফুল্ল কালকের তুলনায়। একটু রহস্যের আভাসেই প্রশ্ন করিলাম, "আজ শেঠজীকে একটু প্রসন্ন দেখছি, চিঠিপত্র কিছু এল নাকি সকালের বোটে?"

কুণ্ডনলালের মুখটা হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"আগো হাঁ বাঙ্গালীবাবু, এলো একঠো চিট্‌ঠি, আমার নিজের নামে সওয়া-ছ'টাকা দরে যে ঢাই হাজার মোন চাল ধরে রেখেছিলাম, তার দাম সারে নো টাকা হয়ে গেল; আরও তেজ হোবে।"

এত বড় আঘাত আমার কাব্যানুভূতি কখনও পায় নাই। তবুও মনের ভাবটা যথাসম্ভব গোপন করিয়া আনন্দের সহিত অভিনন্দন জানাইলাম। অন্য কথাও আসিয়া পড়িল, কুণ্ডনলালের অন্তরের আনন্দ যেন সবতাতেই উছলিয়া পড়িতেছে। ক্রমে মনকে প্রবোধ দিলাম—এত যখন, তখন কুণ্ডনলাল মুনাফায় চেয়েও মিষ্টতর কিছু আজকের ডাকে পাইয়াছে নিশ্চয়, লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না।

বইটা একটা ছোট টেবিলে রাখা ছিল, একে কুণ্ডনলাল তুলিয়া লইল। বইটি বাংলা অক্ষরে বাংলা-সংস্কৃতের একটি চিত্রিত সংস্করণ। একটু নাড়াচাড়া করিয়া প্রশ্ন করিল, "এ কি কেতাব পড়ছিলেন বাঙ্গালীবাবু?"

বলিলাম, "মেঘদূত।"

"মেঘদূঁত?—অচ্ছা!…"

প্রশ্ন করিলাম, "পড়েছেন নিশ্চয়?"

"না বাঙ্গালীবাবু, না-ধব্‌ শোনা আছে।. বাৎ কি আছে ওর ভেতর?"

বলিলাম, "মেঘদূত হল মহাকবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ কাব্য এক হিসাবে…"

কুণ্ডনলাল প্রশংসা এবং বিস্ময়ে একটা চোখের ভ্রূ তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অচ্ছা! কবি কলিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এক হিসাবে! …আগে?—কাব্যের বিষয় কি আছে?"

বলিলাম, "বিষয় মোটামুটি এই যে, একজন যক্ষ কুবেরের শাপে বিন্ধ্যাচলের রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হয়; সে পাহাড়ের গায়ের মেঘকে প্রার্থনা জানাচ্ছে হিমালয়ের অলকাপুরীতে আমার প্রেয়সীর কাছে আমার খবর পৌঁছে দাও..."

কুণ্ডনলাল অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া আমার পানে চাহিয়াছিলেন, বলিলেন, "অচ্ছা! তাহলে বাঙ্গালীবাবু হাওয়াই জাহাজের মতোন্ ওয়্যারলিসেরও পত্তা ছিল হিন্দুদের! মেঘের বিদ্যুৎকে..."

বলিলাম, "না, ওয়্যারলেস নয়, কবির কল্পনা; তিনি গোড়াতেই বলে দিয়েছেন—"কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপনাশ্চেতনাচেতনেষু"— অর্থাৎ বিরহী জন চেতন-অচেতনের ভেদাভেদ বোঝে না। তাই মেঘকে সজীব কল্পনা করেই যক্ষ তাকে তার স্ত্রীর কাছে সংবাদ নিয়ে যেতে বলছে। কোন্ পথে যেতে হবে, কোথায় কি দেখবে, কোন্ শহরের কি বিশেষত্ব—এই সমস্তের একটি পরিষ্কার বর্ণনা দিয়ে গেছেন কবি..."

"অচ্ছা!—সোমস্ত পথের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। আমায় কুছ্ কুছ্ শোনান্ বাঙ্গালীবাবু, বড়ো দিলচস্পী মালুম হোচ্ছে।"

কৌতূহল খানিকটা জাগ্রত হইতে দেখিয়া আমারও লুপ্ত উৎসাহ খানিকটা ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, "আপনার যদি ভাল লাগে শেঠজী তো না হয় সমস্তটাই পড়া যাবে দুজনে মিলে—অবসরের ত অভাব নেই, আর জায়গাটিও কাব্য পড়বার মতনই—আপনার মনে হয় না তাই?"

যত দূর দেখা যায় সবুজের ঢেউ, উপরে চঞ্চল খণ্ডিত মেঘের অভিযান, বহু দূরে নীল সমুদ্রের একটি সরু ফালি—যেন অবগুণ্ঠিতা কাহার টানা দুটি চোখ কৌতুকভরে সমস্ত দৃশ্যটির পানে চাহিয়া আছে।

কুণ্ডনলাল একবার সমস্তটার উপর চোখ বুলাইয়া আনিয়া কতকটা আবেগভরেই বলিল, "সত্যি বাঙ্গালীবাবু, এরকম চোমোৎকার দৃশ্য আমি কোথাও দেখি নি, আর ধান ত যেন লছমীমাইয়ের খাজানা আছে। বোড্ডো মেহেরবানি যদি আপনি আমায় মেঘদূত পড়িয়ে শোনান্।...অচ্ছা! বিন্ধ্যাচল থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিলকুল জায়গায় বেয়ান আছে? খুব দিলচস্পী হোবে বাবুজী..."

কালকের রাত্রের সেই ব্যথাতুর ভাবটির পর থেকেই আমি বুঝিয়াছিলাম লোকটি ভাবুক,—উপরে প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ পান বলিয়া আরও ভাল লাগিল। এমন জায়গায় এমন একটি দরদী মনের স্পর্শ পাইয়া আমার মনের কপাটও যেন খুলিয়া গেল। বলিলাম, "তাহ'লে শেঠজী, আপনি খেয়ে-দেয়ে বিকেলের দিকে আসুন আবার। এ জিনিস এক বৈঠকে শেষ না করলে রসটা পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। আমিও যে কাজগুলো আছে সেরে রাখব, আজ তা হ'লে কাব্যচর্চাই চলুক।"

ভিতরের আগ্রহে কুণ্ডনলালের মুখটি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, বলিলেন, "বড্ডো মেহেরবানি হবে বাঙ্গালীবাবু, কিন্তু এখন কুছটি [illegible] পেশ করে দিন, আমার জানতে বড্ডো ইয়াদা হচ্ছে।"

৩

একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে আমাকে। বলিলাম, "সে ত আনন্দের কথা শেঠজী—এত যখন আপনার আগ্রহ। ব্যাপারটা ঐ বললাম—বিরহী যক্ষ মেঘকে তার প্রেয়সীর কাছে দূত করে পাঠাচ্ছে। সমস্ত কাব্যটি দুটি ভাগে বিভক্ত—পূর্বমেঘ আর উত্তরমেঘ। "পূর্বমেঘ" হচ্ছে যাত্রাপথের কাহিনী। গোড়াতেই দেখি আষাঢ়ের প্রথম দিনে রামগিরির সানুদেশ-সংলগ্ন মেঘ দেখে বিরহী যক্ষ বনমল্লিকা দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে প্রেয়সীর কাছে পাঠাচ্ছে। তার পর পথের নির্দেশ—সে পথ নানা রকম আনন্দময় দৃশ্য দিয়ে তোমার মনস্তুষ্টি করবে—কোথাও পথিকবধূরা প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশায় মুখ থেকে অলক কেশের গুচ্ছ সরিয়ে চোখ তুলে তোমার ওপর স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করবে—কোথাও সার বেঁধে বলাকা তোমার বুকে দুলবে—কৈলাসগামী রাজহংস ঠোঁটে মৃণাল-কিশলয় নিয়ে তোমার সাথী হবে। কোথাও বর্ষায় ধোওয়া ক্ষেত থেকে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠবে—কৃষক বধূরা স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তোমার পানে থাকবে চেয়ে। উত্তরে যেতে যেতে এসে তুমি আম্রকূটগিরি। হে মেঘ, সেই গিরিশিরে যে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, তোমার উচ্ছল জলধারায় তাকে নিভিয়ে দিও, গিরিরাজ তোমায় সাদরে মস্তকে ধারণ করবেন। সেখানে অল্প বিশ্রাম নিয়ে রেবা নদী পার হয়ে তুমি দশার্ণ ভূমিখণ্ডে এসে পড়বে। অপূর্ব সেই দেশ—বিশেষ করে অপূর্ব তার রাজধানী বিদিশা নগরী। সেইখানে বেত্রবতী নদীর জল পান করে পথের ক্লান্তি দূর করে তুমি গিয়ে উঠবে নীচৈ পর্বতে। তোমায় দেখে আনন্দে কদম্ব ফুল সব উঠবে ফুটে, তারপর তোমার জলকণা দিয়ে জুঁই ফুলের কুঁড়িদের ফোটাতে ফোটাতে..."

কুণ্ডনলাল মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছে, এত আবিষ্ট যেন মেঘের সঙ্গে কৈলাসগামী রাজহংসের মতোই রামগিরি হইতে নীচৈ পর্যন্ত সমস্ত পথটা অতিক্রম করিয়া আসিল। বলিল "অচ্ছা! এই রোকোম করে সমস্ত রাস্তার চেয়ান দিয়ে দিলেন কালিদাস তো নিজেই দিয়েছিলেন বাবু? বড়া ধুরন্ধর কবি ছিলেন তো—সমস্ত রাস্তার হালচাল জানতেন,—অচ্ছা!"

বলিলাম, "এতো আপনাকে শুধু কাঠামোটা বলছি শেঠজী একটি একটি করে বর্ণনা যখন শুনবেন।"

"অচ্ছা!"

"তার পর এল উজ্জয়িনীর বর্ণনা—যক্ষ বলিল, হে মেঘ একটু ঘুর হইলেও তুমি উজ্জয়িনী পুরী হইয়া..."

"উর্জ্জেন!—কোন্ উর্জ্জেন বাঙ্গালীবাবু?"

বলিলাম, "এই উজ্জয়িনীই, আবার কোন্ উজ্জয়িনী?"

"সে ত আজমীঢ়ের কাছে।"

"কাছেই ত, তোমাদের ওদিককারই ব্যাপার ত মেঘদূত।"

"অচ্ছা!"—বলিয়া এমন স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, মনে হইল কাব্য আর এই কঠিন বাস্তব কুণ্ডনলালের কাছে যেন এক হইয়া গেছে। প্রশ্ন করিলেন, "কবি কালিদাস আর কি ব্যেবসা করতেন বাবুজী?—অনেক মুলুক ঘোরা ছিল..."

বলিলাম, "কবি আর কি করবে শেঠজী?—কাব্য লিখতেন

আবর্জ্জনা পরিষ্কারে মনুষ্যেতর প্রাণী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ুষ্যসমাজে কতক লোক ময়লা পরিষ্কারের কাজটাকে জাতিগত ত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। এই জাতি-বিভাগ স্বাভাবিক নহে, ত্রিম উপায়ে পরিকল্পিত। অর্থাৎ ময়লা পরিষ্কার করিবার াভাবিক প্রবৃত্তি লইয়াই কেহ জন্মগ্রহণ করে না, কর্ম্মানুসারেই ই শ্রেণী-বিভাগের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। মনুষ্যেতর প্রাণী মাজেও জাতি-বিভাগের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু াহা কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পিত নহে, প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহার ৎপত্তি ঘটিয়াছে। মনুষ্যেতর একই জাতীয় াণীদের মধ্যে প্রকৃতি অনুযায়ী কতকগুলি গুরুতর ার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সন্ন্যাসী- াকড়া ও গেছো-কাঁকড়া এবং কিয়া-প্যারটের কথা ল্লেখ করা যাইতে পারে। সন্ন্যাসী-কাঁকড়া ও গছো-কাঁকড়া উভয়েই একই জাতীয় কাঁকড়া ইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সন্ন্যাসী-কাঁকড়া জলজ পাকা-মাকড় খাইয়া উদর পূরণ করে; কিন্তু গছো-কাঁকড়ার নারিকেলের শাঁসই প্রধান খাদ্য। রূপ, কিয়া-প্যারটও সাধারণ টিয়া জাতীয় পাখী। য়ারা সম্পূর্ণ রূপে নিরামিষাশী; কিন্তু কিয়া-প্যারট ধানতঃ মেষ-মাংস ও চর্ব্বি খাইয়াই জীবিকা র্ব্বাহ করে। এই হিসাবে, বিভিন্ন জাতীয় যে কল প্রাণী ময়লা, আবর্জ্জনা, মৃত বা গলিত াস্তব পদার্থ উদরস্থ করিয়া জীবন ধারণ করে াহাদিগকেই আবর্জ্জনা-পরিষ্কারক শ্রেণীভুক্ত করা ইয়াছে। ভূচর, খেচর ও জলচর প্রাণীদের মধ্যে দূষিত, গলিত পদার্থ ভোজী এরূপ আবর্জ্জনা-পরিষ্কারকের অভাব নাই। ইহারা পূতিগন্ধময় গলিত, দূষিত পদার্থ উদরস্থ করিয়া জলবায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষায় অপরিমেয় সহায়তা করিয়া থাকে।

আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের কার্য্যে পক্ষিজাতীয় প্রাণীরাই বোধ হয় আমাদের সর্ব্বাধিক সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে শকুন জাতীয় পাখীরাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শকুন সর্ব্বদাই উর্দ্ধাকাশে বিচরণ করে। দিনের বেলায় আকাশের দিকে চাহিলেই দেখা যাইবে খুব উঁচুতে ডানা প্রসারিত করিয়া শকুনেরা যেন অবলীলাক্রমে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের ডানার জোর খুবই বেশী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরূপ ভাবে আকাশে বিচরণ করিয়া ইহারা কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি এতই প্রখর যে কোথাও কোন জীবজন্তুর মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইলে অত উঁচু হইতেই তাহারা দেখিতে পায় এবং তৎক্ষণাৎ ডানা দুইটিকে অর্দ্ধসঙ্কুচিত করিয়া প্রায় খাড়া ভাবে, ভীষণ বেগে, শোঁ শোঁ শব্দে নীচে নামিয়া আসে। অন্যান্য শকুনেরা দূরতর স্থানে বিচরণ করিলেও তাহারা পরস্পরের প্রতি নজর রাখে। একটি শকুনকে কোন স্থানে অবতরণ করিতে দেখিলেই অন্যান্য শকুনেরা তাহাকে অনুসরণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হয় এবং মৃতদেহকে কাড়াকাড়ি করিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলে। বৃহদাকারের একটা গরু বা মহিষের মৃতদেহকে পঁচিশ-ত্রিশটা শকুন প্রায় ঘণ্টা-খানেক সময়ের মধ্যেই নিঃশেষে উজাড় করিয়া দেয়; কেবল হাড় কয়খানা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কে কাহার আগে মাংস ছিঁড়িয়া খাইবে ইহার জন্য সময় সময় পরস্পরের মধ্যে মারামারি লাগিয়া যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই হউক বা অতিলোভের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, ইহারা প্রায়ই এত অধিক পরিমাণ মাংস উদরস্থ করিয়া থাকে যে, দেহের ভারে উড়িয়া যাইবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত থাকে না। কাহারও কাহারও দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতাও লোপ পায়। কিন্তু তথাপি খাওয়া ছাড়ে না;



মেক্সিকো দেশীয় শকুন; গলিত পদার্থ সন্ধান করিয়া খাইতেছে



শকুনেরা বিশ্রাম করিতেছে

শুইয়া-শুইয়াই মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে থাকে। এই অবস্থায় তাড়া করিলে ডানা প্রসারিত করিয়া কেবল এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া থাকে, উড়িয়া পলায়ন করিতে পারে না। বড়জোর, কোনক্রমে নিকটস্থ কোন উঁচু স্থানে উড়িয়া আশ্রয় গ্রহণ করে মাত্র। ইহারা যেমন ঔদরিক তেমন আবার একাদিক্রমে অনেক দিন না খাইয়াও কাটাইতে পারে। মৃত জীব-জন্তুর অভাবে অনেক সময় ইহাদিগকে উপবাসে কাটাইতে দেখা যায়। ইহারা মৃতদেহ ছাড়া জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে না। তবে একবার ভুলক্রমে কোন অর্দ্ধমৃত বা আহত প্রাণীকে দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করিয়া বসিলে আর রক্ষা নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ অবস্থায় কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষও নাকি শকুনির কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।



অতিরিক্ত ভোজনের পর শকুনেরা অনেক সময়ে এইভাবে বিশ্রাম করে

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের শকুন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই দেখিতে কুৎসিত। ইহাদের মধ্যে কনডোর নামক শকুনিরাই বোধ হয় আকৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কনডোরের প্রসারিত ডানার মাপ ছয় হাতেরও বেশী হইয়া থাকে। গ্রিফন নামক শকুনিদের আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট। কালো রঙের শকুনিকে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণতঃ ক্যারিয়ন-ক্রো নামে অভিহিত করা হয়। তুরস্কের শকুন জাতীয় পাখীরা জন-ক্রো নামে পরিচিত। মিশর দেশের শকুনদের বলা হয়—ফ্যারাওজ-চিকেন। শকুন জাতীয় পাখীদের মধ্যে আকৃতিতে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। ইহাদের মত নোংরা পাখীও বোধ হয় আর নাই। এমন কোন দূষিত বা ঘৃণিত পদার্থ নাই যাহা ইহারা খায় না। ময়লা পরিষ্কারের কার্য্যে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করে বলিয়া আইনের সাহায্যে ইহাদিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যেখানে শকুনিদের ভোজের সমারোহ সেখানেই দুই-একটা গৃধ্র আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিতে অনেকটা শকুনির মত হইলেও ইহাদের মাথার রং লাল এবং মস্তকের উভয় পার্শ্বে কানের মত দুইটি লালবর্ণের পর্দ্দা ঝুলিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ইহারা রাজ-শকুনি নামে পরিচিত। সাধারণ শকুনেরা ইহাদিগকে যেরূপ সমীহ করিয়া চলে তাহাতে রাজ-শকুনি নামটাই উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কারণ কোন মৃতদেহের কাছে গৃধ্র আসিবামাত্রই শকুনেরা তফাতে সরিয়া যায় এবং তাহার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এক পাশে নিঃশব্দে অবস্থান করে। দক্ষিণ-আমেরিকায় ক্যারিয়ন-হক বা ক্যারাক্যারাস নামক একজাতীয় পাখী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শকুনের মতই দলে দলে আসিয়া মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া থাকে। মৃতদেহ



আহারের পরে শকুনেরা বিশ্রাম করিতেছে



গৃধ্র

ভক্ষণ করিলেও কিন্তু জীবন্ত প্রাণীদিগকে সুবিধা-মত আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। বন্য কুকুর বা নেকড়ে বাঘ যখন দলবদ্ধ ভাবে শিকার আক্রমণ করিয়া তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে ইহারাও সেরূপ দল বাঁধিয়া জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে। শকুন অথবা ঈগল পাখী দেখিতে পাইলেই ইহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। সাধারণতঃ ইহারা প্রায়ই মাংসের লোভে শিকারী জীবজন্তু অথবা মানুষের অনুসরণ করিয়া থাকে। সিম্যাঙ্গো নামক পাখীরাও শকুনের মত মৃত জীবজন্তুর মাংস উদরস্থ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহাদিগকে প্রায়ই মনুষ্যাবাসের আশেপাশে জীবজন্তুর মৃতদেহের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। সময় সময় ইহারা জীবন্ত প্রাণীকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। একটা পাখী কোন একটা প্রাণীকে আক্রমণ করিলে অপর পাখীরা আসিয়া তাহাকে সাহায্য করে। অনেক সময় দেখা যায়, তাড়া খাইয়া খরগোস গর্ত্তের ভিতর আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু সিম্যাঙ্গো পাখী ঠিক গর্ত্তের মুখেই পাহারায় রহিয়াছে, একবার মুখ বাহির করিলেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। আমাদের দেশের হাড়গিলা এবং ম্যারাবু-ষ্টর্ক নামক পাখীরা মৃত জীবজন্তুর মাংস এবং বিশেষভাবে হাড়গোড় উদরস্থ করিয়া ময়লা পরিষ্কারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। কাক এবং গোদা-চিলেরা ভালমন্দ সর্ব্বপ্রকারের খাদ্য উদরস্থ করিলেও মৃত প্রাণীদের মাংস এবং পচা বা গলিত পদার্থ ভক্ষণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। সামুদ্রিক গাল পাখীরা মৃত মৎস্য এবং অন্যান্য প্রাণীদের মৃতদেহ উদরস্থ করিয়াই জীবনধারণ করে। অনেক সময় ইহারা দলবদ্ধ ভাবে মৃত প্রাণীদের মাংস কাড়াকাড়ি করিয়া খায়।



মৃত জান্তব পদার্থভোজী গাল জাতীয় পাখী

স্থলচর জীবজন্তুদের মধ্যে শিয়াল, কুকুর, নেকড়ে-বাঘ, হায়েনা, আর্ম্মাডিলো প্রভৃতি প্রাণীরা পূতিগন্ধময় দূষিত বা গলিত পদার্থ উদরস্থ করিয়া ময়লা পরিষ্কারে সহায়তা করিয়া থাকে। শিয়ালেরা রাত্রিবেলায় মনুষ্যাবাসের সন্নিধানে আহারান্বেষণে ঘোরাফেরা করে এবং যে-কোন রকম মৃতদেহ দেখিতে পাইলেই তাহা উদরস্থ করে। নেকড়ে বাঘেরাও গলিত বা দুর্গন্ধযুক্ত যে-কোন রকমের মাংস ভক্ষণে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। তবে গলিত বা দূষিত পদার্থ ভক্ষণে হায়েনাদের সহিত বোধ হয় আর কাহারও তুলনা করা চলে না। তাহারা রাত্রিবেলায় গৃহস্থাবাসের সন্নিধানে আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যে-কোন গলিত পদার্থ দেখিতে পায় তাহাই সাগ্রহে উদরস্থ করিয়া থাকে। অন্যান্য মাংসাশী জীবের ভুক্তাবশেষ হাড়গোড়গুলিও ইহারা বাদ দেয় না। ইহাদের চোয়াল এতই শক্তিশালী যে বৃহদাকৃতির প্রাণীদের মোটা মোটা হাড়গুলিকেও চিবাইয়া অনায়াসে ভাঙিয়া ফেলে এবং তাহাদের মজ্জা বাহির করিয়া খায়। হায়েনা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের একটা অস্বাভাবিক ভীতি আছে; এই কারণেই বোধ হয় ইহাদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা প্রতি বৎসরই ইহারা তাহাদের যৌন-রূপ পরিবর্ত্তন করে অর্থাৎ পুরুষ-হায়েনা স্ত্রী-হায়েনাতে অথবা স্ত্রী-হায়েনা পুরুষ-হায়েনাতে রূপান্তর পরিগ্রহ করে। কোন কোন দেশের লোকের বিশ্বাস, হায়েনার ছায়া পড়িলে গৃহপালিত কুকুরের বাক্‌রোধ ঘটিয়া থাকে। অনেকের ধারণা, ইহারা মনুষ্যকণ্ঠস্বর অবিকল নকল করিতে পারে। অনেকে আবার ইহাও মনে করে যে, অন্ধকার রাত্রিতে ইহারা মানুষের নাম ধরিয়া ডাকে এবং তাহাকে বাহিরে আনিয়া তাহার মাংসে উদর পূরণ করে। মোটের উপর হায়েনা সম্বন্ধে যতই ভীতিপ্রদ ধারণা প্রচলিত থাকুক না কেন, পূতিগন্ধময় জুগুপ্সা-জনক পদার্থ অপসারিত করিয়া ইহারা যে মানুষের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কোন কোন জাতীয়



হায়েনা

ভল্লুকেরাও আগ্রহের সহিত দুর্গন্ধময় গলিত মৃত জীবজন্তু উদরস্থ করিয়া থাকে। মেরু প্রদেশের ভল্লুকেরা তিমির মৃতদেহের গলিত মাংস ভক্ষণেও ইতস্ততঃ করে না। আমেরিকার বাদামী রঙের ভল্লুকেরা পচা মাছ এবং যে-কোন প্রাণীর মৃতদেহ সাগ্রহে উদরসাৎ করে। কালো রঙের পোষা ভালুকেরাও গলিত মাছ, মাংস এবং অন্যান্য পদার্থ গলাধঃকরণ করিয়া থাকে।



মৃতদেহভোজী আর্মাডিলো

শক্ত খোলায় আবৃত আর্মাডিলো নামক প্রাণীদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বভুক বলা যাইতে পারে। ইহারা পাখী, ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ হইতে আরম্ভ করিয়া পোকামাকড় প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ উদরস্থ করিয়া থাকে; তা ছাড়া ফলমূলও বাদ দেয় না। এত রকমের আহার্য্য বস্তুতে অভ্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ইহারা দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাছ, মাংস অতি উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকে। কোন বৃহদাকার জীবজন্তুর মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিলে ইহারা তাহার নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তলার দিক হইতে মাংস কুরিয়া কুরিয়া খায়। দেহটা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত রোজ রাত্রিতে আসিয়া ইহারা এরূপে মাংস উদরস্থ করে। পেবা-আর্ম্মাডিলো আবার কিছু কিছু মাংস তাহাদের গর্ত্তে লইয়া গিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। শূকরেরাও ময়লা পরিষ্কারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। গৃহপালিত এবং বন্য উভয় রকমের শূকরই ময়লা-ভোজী। ইহারা পচা মাছ, মাংস হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গন্ধযুক্ত যাবতীয় ময়লা আবর্জ্জনাই আগ্রহসহকারে উদরস্থ করে। এই সকল বৃহদাকৃতির জন্তু জানোয়ার ছাড়াও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় ইঁদুরজাতীয় প্রাণীরা পচা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ উদরসাৎ করিয়া আবর্জ্জনা অপসারণে সহায়তা কম করে না। ইহাদের মধ্যে গর্ত্তবাসী বৃহদাকার কালো রঙের মেঠো-ইঁদুরেরাই পচা বা গলিত পদার্থসমূহ উদরস্থ করে বেশী। কিন্তু আবর্জ্জনা দূরীকরণে সহায়তা করিলেও ইহারা প্লেগ রোগের বীজাণু ছড়াইয়া মানুষের যথেষ্ট অপকারও করিয়া থাকে।

মৎস্যজাতীয় জলচর প্রাণীদের অনেকেই ময়লা, পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থাদি উদরসাৎ করিয়া জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে। চাঁদা, চেলা, কই, সিঙ্গি, ইলিস, চেতল প্রভৃতি মাছেরা প্রধানতঃ দুর্গন্ধযুক্ত গলিত পদার্থসমূহ উপাদেয় বোধে উদরসাৎ করিয়া থাকে। যতই দূষিত হউক না কেন খাদ্যোপযোগী কোন পদার্থই ইহারা বাদ দেয় না। চিংড়ি ও কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীরা প্রধানতঃ মৃত মৎস্যাদি ও অন্যান্য গলিত জান্তব পদার্থ আহার করিয়াই জীবনধারণ করে। সাধারণ বাণ ও কঙ্গার-ইল জাতীয় মাছেরা অন্যান্য ছোটখাট মাছ শিকার করিলেও বেশীর ভাগই গলিত, দূষিত মাছ-মাংস ও অন্যান্য আবর্জ্জনা ভক্ষণ করিয়া থাকে। তারা-মাছেরাও অন্যান্য জীবন্ত প্রাণী শিকার করিয়া থাকে; কিন্তু কোন কিছুর মৃতদেহ দেখিতে পাইলেই তাহা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না করা পর্য্যন্ত স্থান ত্যাগ করে না। হ্যাগ-ফিশ নামক নলাকৃতি এক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্য অন্যান্য মৃত বা গলিত মৎস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। বঁড়শিতে গাঁথিয়া বা ফাঁদে পড়িয়া কোন মাছ মরিয়া যাইবামাত্রই ইহারা তাহার শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং চামড়া ও শক্ত হাড়গুলি ছাড়া সমুদয় মাংস উদরস্থ করিয়া ফেলে। প্রধানতঃ মৃত মৎস্যাদি ভক্ষণে অতিমাত্রায় উৎসাহী হইলেও ইহারা হাঙ্গর জাতীয় বৃহদাকৃতির হিংস্র প্রাণীদের সহিত গুরুতর শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে। লম্বায় ইহারা এক ফুটের বেশী বড় হয় না। হাঙ্গরের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের দ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে হাঙ্গরের মৃত্যু অনিবার্য্য। চোখ, নাক বা কান্‌কোর ভিতর দিয়া ইহারা হাঙ্গরের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং চামড়া ও হাড়গোড় বাদে শরীরের মাংস খাইয়া ফেলে। কড্‌লিভার অয়েলের জন্য বিখ্যাত কড্ মাছের মত ময়লা-ভোজী মৎস্য জাতীয় প্রাণী আর বোধ হয়



গলিত পদার্থভোজী শূকর

দ্বিতীয়টি নাই। ইহারা না খায় এমন পদার্থই নাই। পচা মাছ, মাংস বা খাদ্যোপযোগী যে-কোন রকমের আবর্জ্জনা ইহারা সাগ্রহে উদরসাৎ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও অনেক কড্‌মাছের পেটে পালক সমেত আস্ত পাখী, চাবির গোছা, মোমবাতি এবং অন্যান্য অনেক রকমের জিনিস দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। একবার একটা কড্‌মাছের পেটের ভিতর হইতে ছোট্ট একখানি বইও বাহির হইয়াছিল। মোটের উপর ইহারা যে স্থানে বিচরণ করে তাহার আশেপাশে কোথাও কোনরূপ ময়লা বা আবর্জ্জনার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত উভচর গোসাপ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীরাও দুর্গন্ধযুক্ত গলিত জান্তব পদার্থ উদরস্থ করিয়া আবর্জ্জনা-পরিষ্কারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

এই সকল প্রাণী ব্যতিরেকে নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যেও ময়লা পরিষ্কারকের অভাব নাই। পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্র প্রাণী হইলেও দলবদ্ধভাবে ময়লা পরিষ্কারের কাজে অপূর্ব্ব কৌশল এবং দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। কোনস্থানে সাপ, ব্যাঙ, আরসোলা, টিক্‌টিকি, ইঁদুর প্রভৃতি যে-কোন প্রাণীর মৃতদেহ পচিতে থাকিলে পিপীলিকা আসিয়া তাহা ঘিরিয়া ধরে এবং ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তাহা নিঃশেষে পরিষ্কার করিয়া ফেলে। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে ড্রাইভার-অ্যান্ট নামক এক প্রকার দুর্দ্ধর্ষ পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দংশন যেমনই বিষাক্ত তেমনই ইহারা বেপরোয়া। ইহারা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে এবং এক একটা দল দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইলেরও বেশী স্থান অধিকার করিয়া চলে। ইহারা জীবন্ত কি মৃত কোন প্রাণীকেই বাদ দেয় না। চলিবার মুখে যাহা পড়ে তাহাই নিঃশেষে উজাড় করিয়া যায়। মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এমন কোন প্রাণী নাই যাহারা ইহাদিগকে ভয় করে না। যে পথে ইহারা চলে সে পথে জীবন্ত সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, কেঁচো, টিক্‌টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া দূষিত এবং গলিত কোন জান্তব আবর্জনার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। গুবরেপোকারাও ময়লা অপসারণে অপরিসীম সহায়তা করিয়া থাকে। প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন রকমের গুবরে-পোকা দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহারা অনেকেই মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীদের মল উদরস্থ করিয়া থাকে। অনেকে আবার ছোটখাট প্রাণীদের মৃতদেহ, পচা মাছ-মাংস খাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহারা রাত্রিচর প্রাণী। ইঁদুর, খরগোস, বা ঐ রকমের কোন মৃতদেহ দেখিতে পাইলেই ইহারা আসিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত খনন করে। তলার মাটি আল্‌গা হইলেই মৃতদেহটা আপন ভাবে নীচে নামিতে থাকে। এইরূপে



শব-মাংস ভোজী টার্ক জাতীয় পাখী

কিছুদূর নিম্নে গেলেই উপরে আল্‌গা মাটি চাপাইয়া মৃতদেহটাকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে। তার পর মাটির নীচে আসিয়া দিনের পর দিন ধীরে ধীরে সমস্ত দেহটাকে উদরসাৎ করিতে থাকে। অনেকেই হয়ত দুইটি গুবরেপোকাকে একযোগে গোবরের ডেলা গড়াইয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন। ইহারা ডেলাটাকে গর্ত্তের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার মধ্যে ডিম পাড়ে। বাচ্চা বাহির হইয়াই এই গোবর খাইতে আরম্ভ করে। আহার্য্য বস্তু নিঃশেষিত হইবার পর বাচ্চাগুলি পুত্তলীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। কিছুকাল পরে গুবরে-পোকার রূপ ধারণ করিয়া গর্ত্তের বাহিরে আসে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা সুরু করিয়া দেয়। বিভিন্ন জাতীয় মাছির বাচ্চারাও ময়লা উদরস্থ করিয়াই জীবনধারণ করে। জীবজন্তুর মল এবং পচা মাছ-মাংসের মধ্যে অসংখ্য পোকা কিলবিল করিতে দেখা যায়। ইহারাই বিভিন্ন জাতীয় মাছির বাচ্চা। ইহারা ঐ সকল পূতিগন্ধময় পদার্থ উদরস্থ করিয়া বড় হয়। অবশেষে পুত্তলীতে পরিণত হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিবার পর প্রকৃত মাছির রূপ ধারণ করে।

রাজ্যশ্রীর বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

আমি অন্যত্র বলিয়াছি যে, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রের ব্যবস্থাদি হইতে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের যে আংশিক চিত্র পাওয়া যায়, উহা অনেকাংশে বাচনিক, আদর্শমূলক, গতানুগতিক এবং স্থান-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ। উহার কতখানি প্রকৃত-পক্ষে লোকব্যবহারানুগত ছিল তাহা সম্যক্ নির্ণয় করা সহজ নহে। এই কারণে কাব্যাদিতে সমাজ ও গৃহস্থজীবন সম্বন্ধীয়

কোন অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া গেলে, অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক-গণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। কিন্তু এই প্রকারের বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ প্রাচীন ভারতীয় কাব্যগ্রন্থে অধিক দেখা যায় না। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত বাণভট্টের হর্ষচরিত-কাব্যে একটি বিবাহের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনা আছে। উহা ঐতি-হাসিকগণের পক্ষে মূল্যবান্। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উল্লিখিত বিবরণটি 'প্রবাসী'র পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। দুঃখের বিষয়, অনুবাদে বাণভট্টের অনবদ্য ভাষার কাব্যরস রক্ষা করা সম্ভব নহে। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হর্ষচরিতে নানার্থ শব্দের প্রয়োগ-বাহুল্য। কোন কোন ক্ষেত্রে উপমাদি কিঞ্চিৎ বর্জ্জন না করিলে বর্ণনাটি সাধারণ পাঠকের রুচির অনুপযোগী হইয়া পড়ে। আবার স্থানে স্থানে বিভিন্নপ্রকার সম্ভাবিত ব্যাখ্যার একটিমাত্র অবলম্বন করিলে অনুবাদ কিছু সুখবোধ্য হয়। হর্ষচরিতের ভাষার শ্লেষ গুণটি অনেক স্থলে অনুবাদে উপেক্ষা করিতে হয়। বাণের সুদীর্ঘ বাক্যগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য-সমষ্টি দ্বারা প্রকাশ না করিলে বাংলায় উহা পাঠযোগ্য হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, উৎসবমত্ত রাজপুরীর বর্ণনায় কবি মাত্র একটি বাক্য ব্যয় করিয়াছেন; কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে উহা ৪৬ পঙ্‌ক্তি স্থান অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক, আমরা বাণের বর্ণনার যথাসম্ভব মূলানুগত তাৎপর্য্য মাত্র প্রকাশের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সংক্ষেপে স্থান-কাল-পাত্রাদির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-পঞ্জাবের অন্তর্গত কর্ণাল-অম্বালা অঞ্চল ও উহার সমীপবর্ত্তী স্থান জুড়িয়া শ্রীকণ্ঠ নামে একটি রাজ্য ছিল। উহার রাজধানী স্থাণ্বীশ্বর (আধুনিক থানেশ্বর)। এই রাজ্যের প্রথম পরাক্রান্ত নরপতির নাম প্রভাকরবর্দ্ধন; তিনি অনুমান ৫৮০ হইতে ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। পুত্রদ্বয়ের নাম রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন; কন্যার নাম রাজ্যশ্রী। এই রাজ্যশ্রীর বিবাহ সম্পর্কে বাণভট্টের হর্ষ-চরিতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

রাজ্যশ্রী দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছিলেন। নৃত্যগীতাদি-কুশলা সখীগণের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ ঘনিষ্ঠ হইল। ক্রমে তিনি নিজেও সমুদয় কলায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। শীঘ্রই তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এইবার রাজ্যশ্রীর প্রতি রাজ-গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা সকলেই দূত পাঠাইয়া থানে-শ্বর-রাজকুমারীর পাণি প্রার্থনা করিলেন।

একদিন রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন অন্তঃপুর-প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় বাহ্যকক্ষস্থিত কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির কণ্ঠ হইতে নিম্নোদ্ধৃত গানটি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল।—

উদ্বেগমোহাবর্ত্তে পাতয়তি পয়োধরোন্নমনকালে।
সরিদিব তটমনুবর্ষং বিবর্দ্ধমানা সুতা পিতরম্॥[১]

গান শুনিয়া রাজা পরিজনদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলেন; পরে নির্জ্জনে পার্শ্বস্থিতা রাজ্ঞী যশোবতীকে বলিলেন, "দেবী, আমাদের কন্যা রাজ্যশ্রী এখন তারুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন তাহার গুণগ্রামের বিষয় সর্ব্বদাই আমার মনে উদিত হয়, তেমনি তাহার জন্য একটা দুশ্চিন্তাও আমার হৃদয় পরিত্যাগ করে না। কন্যার যৌবনারম্ভ হইতে পিতা সন্তাপানলে দগ্ধ হইতে থাকেন। রাজ্যশ্রীর পয়োধরোন্নতি আমার হৃদয় অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। দুর্লঙ্ঘ্য সামাজিক বিধির উপর আমাদের কোন হাত নাই। সেই বিধি অনুসারে, যাহাকে বুকে করিয়া লালনপালন করিয়াছি এবং কোনদিন ত্যাগ করিবার কথা ভাবি নাই, নিজের অঙ্গসম্ভূতা সেই কন্যাকে কোন অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া লইয়া যায়। সত্যই ইহা মনুষ্যজীবনের পক্ষে শোচনীয় ব্যাপার। যদিও পুত্র এবং কন্যা উভয়েই আমাদের সন্তান তাহা হইলেও এই কারণে কন্যার জন্মে প্রাজ্ঞব্যক্তি শোকগ্রস্ত হন। এইজন্যই কন্যার জন্মকালে লোকে নয়নজলে তাহার তর্পণ করিয়া থাকে।[২] মুনিরা যে বিবাহ করেন না এবং গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে আশ্রয় লন তাহারও এই কারণ। সন্তানের বিরহ কে সহ্য করিতে পারে? আমাদের রাজ্যশ্রীর জন্য বরপক্ষের দূত আসিতে আরম্ভ করিয়াছে; দুশ্চিন্তাও আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছে। কি করিব? গৃহস্থকে অবশ্যই লোকবৃত্তির অনুসরণ করিতে হইবে। যাহা হউক, বরের অন্য যে গুণই থাকুক, জ্ঞানীব্যক্তির পক্ষে কুলগৌরবই বরনির্ণয়ে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বর্ত্তমানে মৌখরীবংশ রাজগণের শীর্ষস্থিত এবং সমগ্র জগতে সম্মানিত। সেই মৌখরীবংশের তিলকস্বরূপ অবন্তিবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মা রাজ্যশ্রীর পাণিপ্রার্থনা করিয়াছেন।[৩] গ্রহবর্ম্মা পিতার অনুরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন। যদি তোমার অনভিমত না হয় তবে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।"

স্বামীর কথা শুনিয়া দুহিতৃস্নেহকাতরা মহাদেবী যশো-বতীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আর্য্য-পুত্র, কন্যাসন্তানের পক্ষে ত মাতা পালনকারিণী ধাত্রী মাত্র। কন্যাদানবিষয়ে পিতারই কর্ত্তৃত্ব। তবে কৃপার পাত্রী বলিয়াই পুত্র অপেক্ষা কন্যার প্রতি স্নেহ অধিক হইয়া থাকে। রাজ্যশ্রীর জন্য আমাদের ব্যাকুলতা আর্য্যপুত্রের অবিদিত নাই।"

রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন কন্যাদান বিষয়ে মনঃস্থির করিয়া পুত্র-দ্বয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি রাজ্যবর্দ্ধন এবং হর্ষবর্দ্ধনের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজ্যশ্রীর করপ্রার্থনা করিবার জন্য গ্রহবর্ম্মার প্রেরিত প্রধান দূতপুরুষ পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক শুভদিনে সমস্ত রাজকুলসমক্ষে রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন কন্যাদান উপলক্ষে মৌখরী-

---

১। বাণভট্টের ভাষার অনুবাদ যে কঠিন, তাহা এই আর্য্যাটি হইতে কিছু বুঝা যাইবে। এস্থলে সুতার সহিত সরিতের উপমা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু শ্লোকের অধিকাংশ শব্দেরই সুতাপক্ষে একরূপ এবং সরিৎপক্ষে ভিন্নরূপ অর্থ করিতে হইবে।

২। এ স্থলে মৃতের উদ্দেশ্যে দাতব্য জলাঞ্জলির ইঙ্গিত করা হইয়াছে। Colebrooke's Essays, II, p. 177 দ্রষ্টব্য।

৩। আধুনিক যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের অধিকাংশ মৌখরী বা মুখর বংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। অনেকে অনুমান করেন, কনৌজে তাঁহাদের রাজধানী ছিল।

রাজদূতের হস্তে জলসেক করিলেন।[৪] কৃতকার্য্য হইয়া দূত প্রসন্নমনে বিদায়গ্রহণ করিল।

বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের গৃহ ঔজ্জ্বল্য, রমণীয়তা, ঔৎসুক্য এবং মাঙ্গল্যে মণ্ডিত হইল। সকল লোককে যথেচ্ছভাবে তাম্বুল, পটবাস (সুগন্ধি চূর্ণ বিশেষ) এবং পুষ্প বিতরণ করা হইল। নানা দেশ হইতে শিল্পীদিগকে আনা হইল। রাজপুরুষগণের তত্ত্বাবধানে গ্রামবাসীরা উপকরণসম্ভার আনিতে লাগিল। দৌবারিকগণ বিভিন্ন নৃপতির প্রেরিত উপহারদ্রব্যাদি উপস্থিত করিল। নিমন্ত্রিত হইয়া যে বন্ধুবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজবল্লভগণ তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে তৎপর রহিলেন। চর্ম্মকারদিগকে মধুমদ সেবন করিতে দেওয়া হইয়াছিল ; তাহারা বাদনযষ্টি হস্তে লইয়া উদ্দামভাবে মঙ্গলপটহসমূহ বাজাইতে লাগিল। উলূখল, মুষল, শিলা প্রভৃতি উপকরণ পিষ্টপঞ্চাঙ্গুল দ্বারা মণ্ডিত করা হইল।[৫] যে স্থানে ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল সেখানে নানাদিক হইতে চারণেরা আসিয়া ভীড় করিল। সূত্রধরেরা শ্বেতপুষ্প, সুগন্ধি বিলেপন এবং বসন দ্বারা সংস্কৃত হইয়া বিবাহবেদীর সূত্রপাত করিতেছিল। হস্তে ঊর্দ্ধমুখী কূর্চ্চক (বুরুশ) এবং স্কন্ধে সুধাকর্পর (শ্বেত রঙের পাত্র) লইয়া মজুরেরা অধিরোহিণীতে আরোহণপূর্ব্বক প্রাসাদপ্রতোলীর প্রাকারশিখর ধবলবর্ণে রঞ্জিত করিতেছিল। পিষ্টকুঙ্কুমসম্ভার ধুইয়া ফেলা হইতেছিল ; সেই কুঙ্কুমমিশ্রিত জলধারায় লোকের চরণ রঞ্জিত হইয়া গেল। যৌতুকযোগ্য হস্তী, অশ্ব প্রভৃতিতে অঙ্গন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল ; লোকে সেগুলিকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ভীড় করিল। গণকেরা লগ্নসমূহের বিচারে নিযুক্ত ছিলেন। মকরমুখী প্রণালীবাহিত গন্ধোদকে ক্রীড়াবাপীসমূহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্বর্ণকারেরা সোনা পিটাইতেছিল ; সেই টাং টাং শব্দে অলিন্দ মুখরিত হইয়াছিল। নবোত্থিত প্রাচীরাদির ঊর্দ্ধভাগ হইতে বালুকারাশি গাত্রে পতিত হওয়ায় আলেপক জনদিগকেও প্রাচীরের ন্যায় আলিপ্ত হইতে হইয়াছিল। চতুর চিত্রকরবর্গ মঙ্গলালেখ্য চিত্রিত করিতেছিল। লেপ্যকারেরা মৃত্তিকা দ্বারা মৎস্য, কূর্ম্ম, মকর, নারিকেল, কদলী এবং পূগবৃক্ষ নির্ম্মাণ করিতেছিল। সামন্ত নৃপতিগণ আবদ্ধকক্ষ্য হইয়া (কোমর বাঁধিয়া) অধিরাজনির্দিষ্ট নানা কর্ম্মসম্পাদনে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তাঁহারা সিন্দূরময় কুট্টিমভূমিসমূহ মসৃণ করিবার কার্য্যে এবং বিবাহবেদিকাসমূহের স্তম্ভ উত্থাপনের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। স্তম্ভগাত্রে সরস (জলমিশ্রিত) আতপর্ণের হস্তচিহ্ন দেখা যাইতেছিল।[৬] স্তম্ভগুলি পাটলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং উহার শিখরদেশে আম্র ও অশোকের পল্লব শোভা পাইতেছিল। সূর্য্যোদয়কাল হইতে সতী, সুভগা, সুরূপা, সুবেশা এবং অবিধবা সামন্তসীমন্তিনীগণ আসিয়া সর্ব্বত্র ভীড় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ললাট সিন্দূরধূলির রেখায় দ্বারা চিহ্নিত[৭] ; তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে বধূ ও বরের কুলাদি-বিষয়ক শ্রুতিমধুর মঙ্গলসঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছিল। কেহ কেহ বহুবিধ বর্ণকসিক্ত অঙ্গুলি দ্বারা গ্রীবাসূত্রসমূহ চিত্রিত করিতেছিলেন। কেহ বা বিচিত্র লতাপত্রাদিতে আলেখ্য রচনা করিতেছিলেন। আবার কেহ ধবলিত কলসসমূহ এবং অদগ্ধ শরাবাদি সেই পত্রলতা দ্বারা সাজাইতেছিলেন। অনেকে কার্পাসবৃক্ষের অভিন্নপুট তূলাপল্লবসমূহ[৮] এবং বিবাহ-কঙ্কণরচনার্থ ঊর্ণাসূত্র রঞ্জিত করিতেছিলেন। কেহ বলাশনাপক্ব[৯] ঘৃত দ্বারা ঘনীকৃত পিষ্টকুঙ্কুম মিশ্রিত অঙ্গরাগসমূহ এবং বিশেষরূপে লাবণ্যবর্দ্ধক মুখালেপনাদি প্রস্তুত করিতেছিলেন। আবার কেহ লবঙ্গমালা রচনা করিতেছিলেন ; উহার মধ্যে স্থানে স্থানে কক্কোল, জাতীফল এবং স্ফটিকবর্ণ কর্পূরখণ্ড গ্রথিত করা হইতেছিল।

রাজপুরীতে যেন সহস্র সহস্র ইন্দ্রধনু স্ফুরিত হইতেছিল ; কারণ চারিদিকেই চিত্রবিচিত্র বস্ত্রাদির সমারোহ। সর্পনির্ম্মোকের ন্যায় মসৃণ ও নিঃশ্বাসহার্য্য এবং কচি কদলীগর্ভের ন্যায় কোমল বিবিধ প্রকারের স্পর্শানুমেয় বসন—ক্ষৌম, বাদর (কার্পাস), দুকূল, লালাতন্তুজ (কৌশেয়), অংশুক, নেত্র ইত্যাদি।[১০] কোথাও কাটছাঁট, মাপজোক প্রভৃতি কার্য্যে নিপুণা প্রাচীন পৌরপুরন্ধ্রীগণ বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছিল। ঐরূপ কতকগুলি বস্ত্র লইয়া রজকেরা রাজান্তঃপুরের বৃদ্ধা মহিলাদিগের পরামর্শমত রং লাগাইতেছিল। কতকগুলি রঞ্জিত বস্ত্রের উভয় প্রান্ত ধরিয়া আন্দোলিত করিয়া ভৃত্যগণ ছায়ায় শুকাইতে দিয়াছিল। আবার শুকাইবার পর কতকগুলি বস্ত্রে কুটিলাকার পল্লবমালা অঙ্কিত হইতেছিল ; কতকগুলি কুঙ্কুমপঙ্কে চিত্রিত করা হইতেছিল। কতকগুলি বস্ত্র ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া ভৃত্যেরা উহার ভঙ্গুরাংশ ছিঁড়িয়া ফেলিতেছিল। উজ্জ্বল আস্তরণবিশিষ্ট শয্যাসমূহ

৪। যে বস্তু ঠিক হাতে হাতে দিবার মত নহে তাহার উল্লেখ করিয়া জলদানই সে যুগের প্রথা ছিল। পুরাণে আছে, "দ্রব্যস্ত নাম গৃহীয়াদ্দদানীতি তথা বদেৎ। তোয়ং দদ্যাৎ ততো হস্তে দানে বিধিরয়ং স্মৃতঃ।"

৫। পিষ্ট শব্দের অর্থ সম্ভবতঃ জলে মেশানো ময়দা। বোধ হয় পরে এই অর্থে সরস-আতর্পণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহা হউক, সেকালে ঐ বস্তুতে অঙ্গুলি বা হস্ত ডুবাইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যাদিতে ছাপ লাগাইবার প্রথা ছিল বলিয়া মনে হয়। এইরূপ কার্য্যে বাংলা দেশে গোধূমচূর্ণ স্থলে তণ্ডুলচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। পরবর্ত্তী পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬। এ স্থলেও পিষ্টপঞ্চাঙ্গুল চিহ্নের উল্লেখ পাওয়া যাইতে বলিয়াছে বোধ হয়। হর্ষচরিতের টীকাকারের মতে সম্ভবতঃ ঘৃতলিপ্ত অঙ্গুলিতে গোধূমচূর্ণ মাখিয়া পঞ্চাঙ্গুল চিহ্ন দেওয়া হইত (দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস দ্রষ্টব্য)। এই ব্যাখ্যা সত্য হইলে সরস-আতর্পণের হস্তচিহ্ন পিষ্টপঞ্চাঙ্গুল চিহ্ন হইতে স্বতন্ত্র।

৭। সম্ভবতঃ ইহা সীমন্তের সিন্দূর রেখা, ললাটের সিন্দূরবিন্দু নহে। অবিধবাগণের সীমন্তে সিন্দূর ব্যবহার একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় ; কারণ ইহা প্রাচীন আর্য্য প্রথা নহে।

৮। টীকাকার বলেন, "অভিন্নপুটৌ বংশাদিময়শ্চতুষ্কোণঃ পাটলাকৃতির্জালকৈঃ ক্রিয়তে ; তচ্ছিদ্রান্তরপূরণায় কার্পাসতূলপল্লবা রচ্যন্তে।" কিন্তু রঘুবংশে (১৭।১২) অভিন্নপুট শব্দ অস্ফুটিত পল্লব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

৯। টীকাকার বলেন, "বলাশনা পুষ্পাখ্যোষধিঃ।"

১০। বস্ত্রের এই শ্রেণীভেদের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা কঠিন। হর্ষচরিতের ইংরেজী অনুবাদকেরা লিখিয়াছেন, "linen, cotton, bark silk, spider's thread, muslin and shot silk."

হংসকুলকে পরাভূত করিয়াছিল। উহার নিকটে তারকার ন্যায় মুক্তাফলে শোভিত কঞ্চুক এবং বিভিন্ন প্রয়োজন উপলক্ষে থাকে থাকে সজ্জিত সহস্র সহস্র পট্ট ও পটী খণ্ড।[১১] উপরে নূতন রঞ্জিত কোমল দুকূলশোভিত পটবিতান। মণ্ডপসমূহের চাল আবরক[১২] বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদিত; চিত্র-বিচিত্র নেত্রবস্ত্রের খণ্ডসমূহ দ্বারা মণ্ডপস্তম্ভ পরিবেষ্টিত। এই সকল কারণে রাজপুরে ঔজ্জ্বল্য, রমণীয়তা, ঔৎসুক্য এবং মঙ্গল্য দৃষ্ট হইতেছিল।

দেবী যশোবতীর হৃদয় বিবাহোৎসব ব্যাপারে পর্য্যাকুল। তিনি একাকী হইয়াও যেন বহুধা বিভক্তের ন্যায় কাজ করিতে-ছিলেন। তাঁহার হৃদয় স্বামীর সহিত, কৌতূহল জামাতার সহিত এবং স্নেহ দুহিতার সহিত রহিল। আবার নিমন্ত্রিতা মহিলা-দিগের অভ্যর্থনা এবং পরিজনদিগকে আদেশদান ব্যাপারেও তাঁহার ত্রুটি দেখা গেল না। তিনি মহোৎসবে আনন্দ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদা কৃতাকৃত বিষয়ের পর্য্যবে-ক্ষণে ব্যস্ত রহিল। রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন বার বার উষ্ট্র এবং হস্তিনী[১৩] প্রেরণ করিয়া জামাতার আনন্দের উদ্রেক করিতে লাগিলেন। আজ্ঞা সম্পাদনে দক্ষ পরিজনেরা আদেশ পালনের অপেক্ষায় তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া ছিল; কিন্তু দুহিতৃস্নেহ-কাতর নরপতি পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বয়ং সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বিবাহ বাসর সমাগত হইল। সমস্ত রাজপরিবার যেন অবিধবাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত জীবলোক যেন মঙ্গলময়, দিঙ্মণ্ডল চারণময়, অন্তরীক্ষ পটহময়, পরিজন ভূষণময়, সৃষ্টি বান্ধবময়, কাল নির্বৃতিময় এবং মহোৎসব লক্ষ্মীময় বোধ হইল। এ যেন সুখের নিধান, জীবনের সার্থকতা, পুণ্যের পরিণাম, বিভূতির যৌবন, প্রীতির যৌবরাজ্য, মনোরথের সিদ্ধি-কাল। যেন লোকের অঙ্গুলিপর্ব্বে গণিত হইয়া, মার্গধ্বজ-সমূহের দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া, মঙ্গল্যবাদ্যশব্দে প্রত্যুদ্গত হইয়া, মৌহুর্ত্তিকদিগের দ্বারা আহূত হইয়া, সকলের বাসনায় আকৃষ্ট হইয়া এবং বধূ রাজ্যশ্রীর সখীগণের হৃদয় দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া বিবাহদিবস উপস্থিত হইল। সে দিন প্রাতঃকালে প্রতীহারগণ[১৪] সমস্ত অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে রাজপুরী হইতে বহিষ্কৃত করিল।

তারপর একজন সুদর্শন যুবককে সঙ্গে লইয়া প্রধান প্রতী-হার রাজসমীপে উপস্থিত হইল। বলিল, "দেব, জামাতার নিকট হইতে পারিজাতক নামা তাম্বূলদায়ক[১৫] আসিয়াছেন।' জামাতার সম্মানার্থ লোকটিকে সমাদর করিয়া রাজা দূর হইতেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালক, গ্রহবর্ম্মা কুশলে আছেন ত?" রাজার স্বর শুনিয়া তাম্বূলদায়ক কয়েক পদ তাঁহার দিকে বেগে ছুটিয়া আসিল এবং বাহু প্রসারিত করিয়া কিয়ৎ-কাল মস্তক ভূমিতে নিবদ্ধ রাখিল। পরে ভূমি হইতে উঠিয়া বলিল, "দেব, আপনার আশীর্ব্বাদে তিনি কুশলে আছেন। তিনি আপনাকে নমস্কার দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছেন।" লোকটি জামাতার আগমন নিবেদন করিতে আসিয়াছে জানিয়া রাজা তাহাকে যথাবিধি সংকৃত করিলেন। পরে বলিলেন, "রজনীর প্রথম প্রহরে বিবাহকাল; উহা অতিক্রান্ত হইয়া যাহাতে কোন দোষ না ঘটে সেইরূপ কার্য্য করিও।" অতঃপর পারিজাতক বিদায় গ্রহণ করিল।

দিবা অবসান হইল, যেন সে কমলবনের শ্রী বধূ রাজ্যশ্রীর মুখে সঞ্চারিত করিয়া গেল। সূর্য্য অরুণবর্ণ ধারণ করিল, বোধ হইল যেন উহা দিবস লক্ষ্মীর রক্তবর্ণ পদপল্লব। বধূ ও বরের অনুরাগের সহিত তুলনায় নিজেদের প্রেম লঘু হইয়া পড়িবে, এই ভয়েই যেন চক্রবাকমিথুন বিচ্ছিন্ন হইল। রক্তাংশুকের ন্যায় সুকুমার নভোগাত্রে কপোতকণ্ঠবৎ আপাণ্ডুর সন্ধ্যারাগ স্ফুরিত হইল। বরযাত্রাগমনসমুখ ধূলিরাশির ন্যায় অন্ধকার দিঙ্মুখ আচ্ছন্ন করিল। বিবাহলগ্ন উপস্থিত করিবার জন্যই যেন তারাগণ উদিত হইল। উদয় পর্ব্বত হইতে মঙ্গলকলসের ন্যায় ক্রমবর্দ্ধমান ধবলছায়াসম্পন্ন চন্দ্রমণ্ডল উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল।[১৬] বধূবদনের লাবণ্যজ্যোৎস্না প্রদোষের অন্ধকারকে গ্রাস করিল। কুমুদবন যেন ঊর্দ্ধমুখে বৃথা-উদিত চন্দ্রকে উপহাস করিতে লাগিল। যথাসময়ে গ্রহবর্ম্মা আসিলেন। তাঁহার সম্মুখে পদাতিগণ মুহুর্মুহু স্বর্ণখচিত অরুণচামর আন্দোলিত করিতে করিতে ছুটিতেছিল। বরের সহিত সমাগত অশ্বসমূহে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হইয়াছিল; তাহাদের হ্রেষাশব্দের উত্তরে রাজধানীর উৎকর্ণ অশ্ববৃন্দ যেন প্রতিহ্রেষাধ্বনি দ্বারা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। চন্দ্রোদয়ে বিলীন অন্ধকার যেন বরের মহাবল হস্তীগুলি-দ্বারা পুনরায় ঘনীভূত হইল। তাহাদের সাজসজ্জা সমস্ত স্বর্ণময়। তাহারা চামরের ন্যায় কর্ণ আন্দোলিত করিতেছিল; তাহা-দের গলঘণ্টা হইতে টঙ্কারধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। হস্তীগুলির পৃষ্ঠাবরণবস্ত্র চিত্রবিচিত্র। গ্রহবর্ম্মা হস্তিনীপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন; সেই হস্তিনীর মুখ নক্ষত্রমালাসংজ্ঞক হারে শোভিত। জামাতার সম্মুখভাগে নৃত্যপরায়ণ গায়কগণের কোলাহল নানাপ্রকার বিহঙ্গের মিলিত সঙ্গীতের ন্যায় শোনা যাইতেছিল; বোধ হইল যেন উপবনের সহিত নবীন বসন্তের সমাগম হইয়াছে।[১৭] গন্ধতৈলপূর্ণ দীপমালার আলোকে সমুদয় স্থান হরিদ্রাবর্ণ দেখা যাইতেছিল, মনে হইল যেন চারিদিক কুঙ্কুমচূর্ণে ছাইয়া

১১। ইংরেজীতে বলা হইয়াছে, "canvas and cloth pieces."

১২। মূলে আছে "স্তবরক"। টীকাকার বলেন, উহা একপ্রকারের বস্ত্র। ইংরেজীতে লেখা হইয়াছে "garments."

১৩। মূলে আছে "উষ্ট্রবামী"। অনেকে উহার অর্থ করিয়াছেন "উষ্ট্রী"।

১৪। প্রতীহারগণ রাজপুরীর ও পুরদ্বারের এবং রাজদেহের রক্ষকের কার্য্য করিত।

১৫। সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পানের বাটা বহন করাই তাম্বূলদায়কের প্রাথমিক কার্য্য ছিল।

১৬। টীকাকার মূলের "বর্দ্ধমানধবলচ্ছায়" শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়া-ছেন, "বর্দ্ধমানং শরাবঃ। তেন চ ধবলচ্ছায়ম্। তদ্ধি মক্কোললিপ্তং বিবাহে ক্রিয়ত ইত্যাচারঃ।" মক্কোল শব্দের অর্থ খড়িমাটি।

১৭। পশ্চিম ভারতে বর কৃত্রিম উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিবাহ করিতে যান। বরের চারিদিকে থাকিয়া মজুরেরা উহা বহন করিয়া লয়। সম্ভবতঃ গ্রহবর্ম্মাও এইরূপ কৃত্রিম উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন।

গিয়াছে। বরের কুসুমমণ্ডিত শীর্ষদেশের চারিপার্শ্বে প্রফুল্ল মল্লিকার মুণ্ডমালা শোভা পাইতেছিল। কামধনুবৎ পুষ্পদামে তাঁহার বৈকক্ষকমালা বিরচিত হইয়াছিল। চারিদিক হইতে কুসুমগন্ধাকুল ভ্রমরের গুঞ্জনে উৎফুল্লচিত্ত গ্রহবর্মা মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ শ্রীসম্পন্ন পারিজাত পাদপের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। তাঁহার হৃদয় নববধূর বদন অবলোকনের জন্য কুতূহলী হইয়াছিল; সেইজন্যই যেন তাঁহার মুখ দেহের অগ্রবর্ত্তী ছিল।

রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন পুত্রদ্বয় এবং সামন্তবর্গের সহিত দ্বারসমীপবর্ত্তী জামাতার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। গ্রহবর্মা হস্তিনীপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক নমস্কার করিলে রাজা তাঁহাকে প্রসারিতভুজে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তারপরে গ্রহবর্মা যথাক্রমে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনকে আলিঙ্গন করিলে, রাজা তাঁহাকে হাত ধরিয়া অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে প্রভাকরবর্দ্ধন আপনার অনুরূপ আসনে বসাইয়া জামাতাকে নানা উপচারে সম্মানিত করিলেন।

অনতিবিলম্বে গম্ভীর নামক রাজার অনুরক্ত জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া গ্রহবর্মাকে বলিলেন, "তাত, আপনাকে লাভ করিয়া রাজ্যশ্রী এতদিনে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের ন্যায় সমগ্রজগতে বিখ্যাত কীর্ত্তি পুষ্যভূতিবংশ ও মুখরকুলকে সম্মিলিত করিলেন। আপনি প্রথমেই গুণবত্তা হেতু মহারাজের হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছেন, এখন ত আপনি তৎকর্ত্তৃক ভূষণের ন্যায় মস্তকে বহনের যোগ্য হইলেন।"

গম্ভীর যখন ঐ কথা বলিতেছিলেন তখন মৌহূর্ত্তিকগণ আসিয়া রাজাকে বলিলেন, "দেব, লগ্নবেলা আসিল। জামাতা এখন কৌতুকগৃহে চলুন।" রাজা জামাতাকে বলিলেন, "ওঠ; ভিতরে যাও।" অতঃপর গ্রহবর্মা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। জামাতৃদর্শনকুতূহলী স্ত্রীগণের সহস্র দৃষ্টি তদুপরি পতিত হইল। সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি কৌতুকগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারসমীপে পরিজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে কতিপয় আত্মীয়া, প্রিয়সখী এবং দাসদাসীর মধ্যে গ্রহবর্মা নববধূকে দেখিতে পাইলেন। রাজ্যশ্রীর অরুণাংশুকে অবগুণ্ঠিত বদনপ্রভায় দীপালোক নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার দেহের অত্যধিক সৌকুমার্য্যে শঙ্কিত হইয়াই যেন যৌবন তাঁহাকে সুদৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে নাই।[১৮] তাঁহার সাধ্বসনিরুদ্ধ হৃদয় হইতে গোপনে ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস মুক্ত হইতেছিল, যেন বিদায়োন্মুখ কুমারীত্বের জন্যই তিনি শোকপ্রকাশ করিতেছিলেন। লজ্জা তাঁহার কম্পমান ও পতনোন্মুখ দেহখানিকে নিস্পন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার যে হস্তখানি অচিরে বর কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, ভয়বেপমানা রাজ্যশ্রী উহার দিকেই চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার তনুলতা চন্দনচর্চ্চায় ধবলিত; সর্ব্বাঙ্গে কুসুমগন্ধ; নিঃশ্বাসপরিমলে মধুকরকুল আকৃষ্ট; দেখিয়া তাহাকে কন্দর্পানুগামিনী রতি বলিয়া বোধ হইল। প্রভা, লাবণ্য, মদ, সৌরভ ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত রাজ্যশ্রী যেন সমুদ্র-মন্থনজাতা দ্বিতীয়া লক্ষ্মী। শ্বেতসিন্ধুবার কুসুমের মঞ্জরীবৎ কর্ণভূষার মুক্তারশ্মিকে রাজ্যশ্রীর কর্ণাবতংস বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। কর্ণাভরণের মরকতপ্রভায় সবুজবর্ণ কপোলতল যেন মনোহারিণী লোচনছায়াকে হর্ষসমুজ্জ্বল করিয়াছিল। অধোমুখী রাজ্যশ্রী বর এবং কৌতুকব্যাপার দর্শনের জন্য আকুল হইয়া বার বার মুখ তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং পরিহাসপ্রিয়া সখীগণ ও নিজের সাকাঙ্ক্ষ হৃদয়কে ভৎর্সনা করিতেছিলেন।[১৯]

হৃদয়চোর প্রবেশ করিবামাত্র বধূ তাঁহাকে কন্দর্পের কবলে সমর্পণ করিলেন। পরিহাসস্মিতমুখী নারীরা জামাতাকে দিয়া কৌতুকগৃহে যে যে কার্য্য করাইয়া থাকে, গ্রহবর্মা সে সকল নিপুণভাবে সম্পাদন করিলেন। অতঃপর বধূ পরিণয়ানুরূপ বেশে সজ্জিত হইলে তাঁহার কর ধারণপূর্ব্বক জামাতা নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুধাধবলিত নূতন বেদীর সমীপে পৌঁছিলেন। যে সকল রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা বেদীর চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। বেদীর চারিপার্শ্বে মৃন্ময় পুত্তলিকাসমূহ সজ্জিত ছিল; সেগুলির হস্তে মঙ্গল্য ফল। উহার সহিত পঞ্চমুখ বিশিষ্ট মঙ্গলকলসমালায় শিশিরসিক্ত যবাঙ্কুর সজ্জিত। কলসগুলির মুখ ভোজনপাত্রের ন্যায়[২০]; সেগুলি কোমল বর্ণ সুচিত্রিত ছিল।

উপদ্রষ্টা দ্বিজগণ বেদীর উপরে উপাধ্যায়দিগের দ্বারা উপস্থাপিত ইন্ধনে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। অগ্নি হইতে ধূম নির্গত হইতেছিল। উহার নিকটে সুপরিষ্কৃত হরিতবর্ণ কুশ; কাছেই ভারে ভারে প্রস্তরখণ্ড, অজিন, ঘৃত ও স্রুক্ (অগ্নিতে আহুতি দিবার জন্য কাষ্ঠনির্মিত হাতা) এবং নূতন শূর্পে শ্যামল শমীপত্র মিশ্রিত লাজ (খৈ) সজ্জিত ছিল। বধূর সহিত বর সেই বেদীতে আরোহণ করিলেন, যেন জ্যোৎস্নার সহিত চন্দ্র নভোমণ্ডলে উদিত হইল। যেমন রতির সহিত কন্দর্প রক্তাশোকের সমীপবর্ত্তী হন, গ্রহবর্মা সেইরূপ বধূর সহিত অরুণশিখামণ্ডিত অগ্নির নিকটে উপস্থিত হইলেন। অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল; বরবধূ অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। বধূর মুখদর্শনের জন্য কুতূহলী হইয়া অগ্নিশিখাও যেন দক্ষিণাবর্ত্তে ঘুরিতে লাগিল। অগ্নিতে লাজাঞ্জলি পড়িল; নখময়ূখধবলিত অগ্নিকে দেখিয়া বোধ হইল যেন তিনি বধূবরের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া বিস্ময়ের হাসি হাসিলেন।

রাজ্যশ্রী রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র হইতে স্থূল মুক্তাফলের ন্যায় বিমল অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল; কিন্তু রোদনে তাহার বদনবিকার দেখা গেল না। সাশ্রুনেত্র বান্ধববধূগণ সরবে ক্রন্দন করিলেন। সমস্ত বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপ সমাপিত হইলে বধূর সহিত জামাতা শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে প্রণামের পর শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহের দ্বারপক্ষে রতি ও প্রীতি দেবতার মূর্তি অঙ্কিত ছিল। অলিকুল বান্ধবের ন্যায় অগ্রে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া গুঞ্জনধ্বনি তুলিল। তাহাদের পক্ষসঞ্চালনে

১৮। ইহাতে মনে হয় রাজ্যশ্রী সুপরিপূর্ণযৌবনা ছিলেন না। পূর্ব্বে তাঁহাকে যুবতী এবং তরুণী বলা হইয়াছে। কামশাস্ত্রকারগণের মতে যুবতী বা তরুণীর সংজ্ঞা—"আষোড়শাত্তবেদ্ বালা তরুণী ত্রিংশতা মতা।"

১৯। এ স্থলে মূলের ভাষা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

২০। এ স্থলে মূলের ভাষায় এবং টীকাকারের ব্যাখ্যায় কিছু ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়।

গৃহের মঙ্গলপ্রদীপমালা আন্দোলিত হইতে লাগিল। একদিকে স্তবকিত রক্তাশোকতরুতলবর্ত্তী কামদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল; তিনি ধনুকে গুণ আরোপণপূর্ব্বক তির্য্যগ্‌দৃষ্টিতে চাহিয়া শর-ক্ষেপণ করিতেছেন। একধারে উপাধান এবং সুদৃশ্য আস্তরণ-যুক্ত শয্যা। উহার একপার্শ্বে স্বর্ণনির্ম্মিত পিকদান বিন্যস্ত; অপর পার্শ্বে একটি কনকপুত্তলিকা হস্তিদন্তনির্ম্মিত পেটিকা ধারণ করিয়া আছে, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঊর্দ্ধ্বমুখী কমলহস্তে বিরাজমানা। শয্যার শিয়রের দিকে কুমুদরাজি শোভিত রজতনির্ম্মিত নিদ্রাকলস[২১] শোভা পাইতেছিল।

লজ্জাবতী নববধূ পরাঙ্মুখী হইয়া শয়ন করিলেন। মণিময় ভিত্তিদর্পণে তাঁহার মুখের প্রতিচ্ছবিসমূহ দেখিতে দেখিতে গ্রহবর্ম্মা নিশা অতিবাহিত করিলেন; তাঁহার বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাদের প্রথমালাপ শুনিবার জন্য কৌতূহলী গৃহদেবতা-গণকে মণিগবাক্ষপথে দেখা যাইতেছে। জামাতা দশ দিন শ্বশুরভবনে অবস্থান করিলেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার তদীয় শ্বশ্রূর হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিল। সেই আনন্দময় দিনগুলি অভিনব উপচারাদির জন্য নিত্য নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তার পর সকল লোকের হৃদয় হরণ করিয়া গ্রহবর্ম্মা বধূর সহিত স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন কষ্টেই জামাতাকে বিদায় দিয়াছিলেন।

২১। কাদম্বরীতেও নিদ্রাকলসের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ মনে করেন, অমঙ্গলবিদূরণের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত।

বৈশাখী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বরষের প্রান্তে এসে হ'ল নাকো নবসূর্য্যোদয়,
স্বপ্নের শিশিরে ভেজা তোমার আঁখিতে জাগে ভয়।
বর্ণোচ্ছ্বাসে বিচঞ্চল কমল মেলেনি দল,
এখনো যে জাগিছে সংশয়।
দুর্যোগের অন্ধকারে দিবসের হয়ে গেল দেরী,
বাহিরে বাজিয়া চলে সময়ের শ্রান্তিহীন ভেরী।

আবার এসেছি ফিরে বর্ষপ্রান্তে তোমার অঙ্গনে,
বৈশাখীপ্রলয়নৃত্যে বিকম্পিত ধরা ক্ষণে ক্ষণে।
জাগো জাগো, মেল আঁখি, রাত্রি আর নাহি বাকি,
জাগে প্রাণ নূতন স্পন্দনে।
আসেনি সময় আজো? এখনো কি টুটেনি বন্ধন?
গান শুধু রয়ে গেল বাক্যহারা অশ্রান্ত ক্রন্দন।

আবর্ত্তিত কালস্রোত; যুগান্তর মন্বন্তর পরে
দু-জনের দেখা হ'ল— এ জন্মে কি?—বুঝি জন্মান্তরে।
আনন্দে বিস্ময়ে ত্রাসে নয়নে জিজ্ঞাসা ভাসে,
নীরবে সে কোন্ প্রশ্ন করে?
বসন্ত চলিয়া গেছে, আনেনি ত মল্লিকার বাস,
কোটি আর্ত্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

সে নিশ্বাস, সে ক্রন্দন, সে দারুণ বেদনার পারে
প্রতীক্ষা-আতুর আঁখি, স্বপ্নালু যে দেখিলাম তারে।
রেখো না রেখো না ভয়, তথ্য শুধু সত্য নয়,
অলীক ভেবো না কল্পনারে।
পথের ধূলায় লুটে সহস্র সে আশা-সৌধ ভাঙা,
পৃথিবীর শ্যামাঞ্চল মানবের হৃদিরক্তে রাঙা।

চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত বাস্তবের ভয়ঙ্করী কায়া,
হৃদয়ের সুখ-দুঃখ অর্থহীন, মিথ্যা, শুধু ছায়া।
প্রেম তবু মিথ্যা নয়, পেয়েছি সে পরিচয়,
তোমার দু-চোখে ভরা মায়া।
দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে, তবু আছে এতটুকু আশা,
জীবনে থাকে না কিছু, বেঁচে থাকে শুধু ভালবাসা।

মাধবীর মেটে ঘরে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ঘুমের ঝুরির সম দোলে লতা মৃদুল পবনে
চাঁদের কিরণধারা নামে ধীরে এ নিঝুম রাতে;
জাগে আবছায়া ভয়। বিহঙ্গের পক্ষ সঞ্চালনে
ফুলের সৌরভভরা তন্দ্রাতুর বনচক্রতলে
মাধবীর মেটে ঘর নুয়ে পড়ে মোর দৃষ্টিপাতে,
এই মৌন অবসরে বেদনায় ভাসি অশ্রুজলে।
তার যেন লঘু হাসি শোনা যায়, হয় না তো দেখা।
স্মৃতির খদ্যোত শিখা জ্বলিতেছে, হেথা আমি একা।

অদূরে নদীর বুকে জেলেডিঙি চলে হেলে দুলে
দূর কোন্ কৃষাণের আঙিনায় মেঠো বাঁশী ব'জে।
জ্যোছনায় ঢাকা তটে জোয়ারের ঢেউ ওঠে ফুলে,
সুনীল অম্বরতলে মরণের পাণ্ডুলিপি রাজে,—
জনহীন গ্রামখানি। মাধবীরে পাই না তো কাছে।
একদিন ওই ঘরে আমি, এসেছিনু পথ ভুলে।

চেয়ে দেখি চারিদিকে—মালঞ্চেতে কাঁদে ফুলকুঁড়ি
তার যেন পদধ্বনি আসে কানে নিশীথ-বিতানে;
ঘুরিলাম শীর্ণবাঁকা পথপ্রান্তে,—সে কি লুকোচুরি
খেলিতেছে মোর সাথে। ঝুঁঝনাক আছে কোন্‌খানে?
চিরপরিচয়মাঝে সে আমার কেন অগোচরে।
শূন্যগৃহ, শূন্যতার ব্যথা পাই বিষণ্ন প্রহরে।

রবীন্দ্রনাথ

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

আমি একা বসে করি সুন্দরের ধ্যান—
আশিস্ লভিয়া যাঁর জ্যোতির্ময় রবি ;
স্পর্শ যাঁর সুমধুর গন্ধবর্ণগান,
উন্মনা করেছে তোমা পৃথিবীর কবি।

রক্তরাঙা পলাশের পারুলের বন,
সপ্তপর্ণতরুশ্রেণী মালতীর লতা,
একদা উতলা তব করিয়াছে মন—
শালের মঞ্জরী কত কহিয়াছে কথা।

সুন্দরে দেখি নি কভু দেখেছি তাঁহার
আনন্দ প্রকাশ তব অপূর্ব জীবনে—
সৃষ্টি তাঁর নৃত্যলীলা বেদনা অপার
তোমাতে পেয়েছে রূপ বিচিত্র বরণে।

এসেছে বসন্ত পুন শালবীথিকায়
রাঙা কচি পাতা শত আমের মুকুল—
কণে শুনি সুন্দরের আহ্বান হায়
কে দিবে নতুন প্রাণ ভরিয়া দুকূল !



শান্তিনিকেতনের শাল-বীথিকায় রবীন্দ্রনাথ
শ্রীনন্দলাল বসু
[মিসেস হাশমত রশীদের সৌজন্যে

ডাইনীর ছেলে

শ্রীকালীপদ ঘটক

সকাল থেকে দেখা নাই রাগদার মায়ের, কোন্ ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছে বুড়ী। এতখানি বেলায় একবোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে বুড়ী বাড়ী ঢুকল। জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ এরা নিজেরাই খুশিমত সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, সরকারী বিধি-নিষেধ এদের খর্কে বলবৎ নয়। কিন্তু বুড়ী নিজে এবয়স পর্য্যন্ত এত শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে—এটা রাগদা পছন্দ করে না। বুড়ীকে কাঠ বয়ে আনতে দেখে ভয়ানক চটে গেল রাগদা। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে বুড়ীর, তাই দেখে রাগদা চোখ পাকিয়ে বলে উঠল,—মা!

কাঠের বোঝাটা একপাশে নামিয়ে রেখে সস্নেহে জবাব দিলে বুড়ী—কি বেটা।

রাগদা একটু জোরগলায় বললে—কাঠের কি তোর অভাব আছে?

অভাব সত্যই নাই, যথেষ্ট কাঠ রাগদা সংগ্রহ করে রেখেছে, মুংলীর বিয়েতে এতগুলো কাঠ হয়ত লাগবেই না। কিন্তু তবু বুড়ীর মন মানে না, সকল কাজেই যত কিছু ঝক্কিঝঞ্ঝাট, যত কিছু দায়িত্বভার বুক পেতে যতখানা পারে সবটুকু তার কেড়ে নিতে চায় বুড়ী। এই কাঠ-ভাঙা নিয়েই আরও কয়েক দিন রাগদার কাছে বকুনি খেতে হয়েছে বুড়ীকে।

মুংলীর বিয়ের জন্ত যথেষ্ট কাঠ মজুত আছে, কিন্তু বুড়ী জানে আরও অনেক কাঠ দরকার। রাগদার বৌয়ের ছেলে হবে, আঁতুড় ঘরে জ্বালানি কাঠ চাই বিস্তর। রাগদা হয়ত এ কথাটা ভেবেই দেখে নি। ভাবতেও ওকে দেয় না বুড়ী, এই ওর স্বভাব। একলা বুড়ী এই সংসারের জন্ত সারাটা জীবন শুধু খেটেই এসেছে, এতে যে তার কতখানি সুখ, কতখানি আনন্দ—ছেলে তার কোন খোঁজ রাখে না। রাগদাকে মানুষ করতে, রাগদার এই সংসারটিকে গড়ে তুলতে কি না করেছে বুড়ী, রাগদা আজও বুড়ীর কাছে সেই এতটুকু। মাকে নইলে একটি দিনও চলে না রাগদার, যত বড় যোয়ানই সে হোক, যত বড় শিকারীই সে হোক না কেন, মায়ের কাছে আজও রাগদা শিশুর চেয়েও দুর্বল। রাগদার মনের স্নেহকোমল বৃত্তিগুলি নাগপাশের মত মা-বুড়ীকে তার জড়িয়ে আছে আজও। রাগদা বলে—মা, সে ত 'মারাং' দেওতা, 'বংহার' চেয়েও বড়।

এতখানি বেলা হল রাগদার এখনও খাওয়া হয়নি, 'দা-মাড়ি'* হেঁসেল-ঘরে যেমনকার তেমনি ঢাকা দেওয়া আছে। তাই দেখে বুড়ী চটে একেবারে আগুন হয়ে গেল। রাগদার বৌকে সামনে পেয়ে কতকগুলো কড়া কথা শুনিয়ে দিল বুড়ী। ছেলে যে তার এত বেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে রয়েছে সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।

রাগদার বৌ কি যেন একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাগদা তাকে সুযোগ দিলে না, তাড়াতাড়ি বলে উঠল রাগদা যে পুনঃ পুনঃ খাবার চেয়েও সে খেতে পায় নি, অগত্যা সে মা-বুড়ীর প্রতীক্ষা করে আছে। মা নইলে যত্ন করে খাওয়াচ্ছে কে ছেলেকে!

বুড়ী আরও চটে গেল ভীষণ। শাশুড়ীর কাছ থেকে গালাগালি খেয়ে রাগদার বৌ থ মেরে গেল। এ কিন্তু ভারি অন্যায়, বিনা দোষে রাগদা ওকে মাঝে মাঝে মা-বুড়ীর কাছ থেকে এমনিধারা বকুনি খাওয়ায়। রাগদা যে বাড়ী ফিরেই মাদল নিয়ে নাচগানে মেতে উঠেছে, তারপর সে শিকার-পর্ব সামাধা করে এই মাত্র যে বাড়ী ঢুকল এসে, পান্তাভাত বেড়ে দেওয়ার অবসরটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি, সে কথা বুড়ীকে বোঝায় কে! তার উপর রাগদা আর এক কাঠি উসকে দিলে। বকে-ঝকে একশা করতে লাগল বুড়ী। রাগদা তখন আড়চোখে বৌয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে। বৌ চটে উঠেছিল, কিন্তু রাগদার মুখের দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে ফেললে সেও। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে দে ছুট, রাগদার বৌ ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকোল।

মুংলী এতক্ষণ দূর থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিল, ভয়ে এতক্ষণ কাছে আসতে পারে নি। সামনে এসে দাঁড়াতেই বুড়ী ওকেও তেড়ে উঠল। বৌয়ের চেয়ে মুংলীর অপরাধ কিছু কম নয়, সেও ত ইচ্ছে করলে এক ঘটী জল গড়িয়ে পান্তাভাত দুটো বেড়ে দিতে পারত, এতক্ষণ তা দেওয়া হয় নি কেন?

সামনে দাঁড়িয়ে আছে রাগদা, এক্ষুনি হয়ত মায়ের কাছে যা-তা কতকগুলো নালিশ করে মুংলীকে আরও বকুনি খাওয়াবে। বেগতিক বুঝে মুংলীও তাড়াতাড়ি আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল, হো হো করে হেসে উঠল রাগদা। মুংলী আর রাগদার বৌ ঘরের মধ্যে তখন হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

এই ওদের খেলা। মা-বুড়ীকে রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখে রাগদা। ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে বৌ-বেটিকে বকেঝকে একশা করে বুড়ী। ঘর-সংসার বজায় রাখতে হলে মাঝে মাঝে বৌ-বেটিদের একটু-আধটু শাসন করা দরকার বৈকি! কিন্তু এসব ওদের একেবারেই গা-সওয়া হয়ে গেছে বুড়ীর কথায় কেউ রাগ করে না। বুড়ী ওদের উপর রাগ করে যতখানি, ভালবাসে তার চেয়ে অনেক বেশী।

রাগদার জন্তে কতকগুলো পান্তাভাত বেড়ে দিয়ে বুড়ী বললে—বস বেটা, বেলা হল।

রাগদা বলে উঠল—ঐ যাঃ—খাড়ু দুটো তোকে দেখানো হয় নি, একদম ভুলে গেইছি।

সেকরা-বাড়ী মুংলীর বিয়ের জন্তে চাঁদি রুপোর গয়না গড়তে দেওয়া হয়েছে। খাড়ু দুটো আজ পাওয়া গেল, বাউটি হাঁসুলী, বাঁকমল, ঝুমকো দুচার দিনের মধ্যেই এসে যাবে বাকিগুলো। কোঁচার খুঁট থেকে খাড়ু দুটো বের ক'রে মুংলীকে টানতে টানতে ঘর থেকে নিয়ে এল রাগদা, বলল—পর, দেখি কেমন মানায়।

মুংলী পরতে চায় না কোনমতেই, রাগদার বৌ এসে ওর হা

* দা-মাড়ি—জল-ভেজা পান্তাভাত।

ছুটো টেনে ধরে খাড়ু ছুটো পরিয়ে দিল মুংলীর হাতে। রাগদা বলে উঠল—বাঃ কি চমৎকার তোকে লাগছে মুংলী!

রাগদার মায়ের চোখ ছুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সব গয়না পরলে না জানি মুংলীর আরও কতই না বাহার খুলবে। এ সব না হলে কি বেটির বিয়ে মানায়।

রাগদার মা খুশী হয়ে বলে উঠল—বেটা আর পিদ্রের গয়নাগুলো?

রাগদা বললে—সে এখন পরে হবেক, কোথা পিদ্রে কোথা যে কি তার ঠিক নাই, তার আবার গয়না।

রাগদার বৌ আর মুংলী মুখ চেয়ে চেয়ে হাসছে। রাগদার মা বললে—তা হবেক নাই বেটা, সেকরাকে আমি বলে এসেছি, গয়না আমি এখন থেকে গঁড়াই রাখব।

পান্তাভাত খেতে খেতে হাসতে লাগল রাগদা। রাগদার মা ঘরের ভিতর থেকে একটা ঝুড়ি বের ক'রে এনে বললে—থাম বেটা, মহুলগুলো আগে কুড়িয়ে আনি; রাস্তার ধারে পড়ে আছে, হয়ত এখনও কেউ দেখতে পায় নি।

চোত বোশেখের কাঠফাটা রৌদ্রে বুড়ী যে আবার এত বেলায় মহুল কুড়ুতে বেরুবে এটা রাগদা ভাল বুঝলে না। কি হবে মহুল নিয়ে, ওতে আর সংসারের কতটুকুই বা আসান হবে। সারা গ্রীষ্মকাল মহুল কুড়িয়ে রোজগার খুব সামান্যই, ওটা না হলেও বিশেষ কিছু এসে যায় না, বৌ-বেটিরা গতর খাটিয়ে যতটুকু পারে সেই ভাল, মা বুড়ীকে আর এ সব কাজে উৎসাহ দেয় না রাগদা, পদে পদে বরং বিরোধিতাই ক'রে থাকে।

বুড়ী কিন্তু কোন কথা শুনতে চায় না। মহুল কুড়িয়ে জন্ম গেছে ওর, মহুল কুড়ান মস্ত একটা নেশা, আজও সেটা ভুলতে পারে নি বুড়ী। আগে কত রাত জেগে বন-বাদার ঘুরে ঘুরে ঝুড়ি ঝুড়ি মহুল কুড়িয়ে আনত বুড়ী, তাই থেকে ছ'টা মাসের ছুন তেলের খরচা চলে যেত। পাড়ার সমর্থ মেয়েরা প্রায় সকলেই রাত জেগে মহুল কুড়োয় আজও। বুড়ীর এখন আর সে বয়স নেই, সামর্থ্যও ঢের কমে গেছে, কিন্তু তবু কিছুটা মহুল সংগ্রহ না ক'রে ক্ষান্ত হয় না বুড়ী, সুযোগ পেলেই রাগদাকে শেষ লুকিয়েও ঝুড়ি নিয়ে মহুল কুড়ুতে বেড়িয়ে পড়ে। এই মহুল কুড়ান বুড়ীর একটা চিরকেলে বাতিক।

রাগদার নিষেধ বুড়ী কানেই তুললে না, বললে—ভাবিস না বেটা, আমি যাব আর আসব।

ঝুড়ি নিয়ে বুড়ী মহুল কুড়তে বেরিয়ে পড়ল। পান্তাভাতে বেশ তৃপ্তি হ'ল না রাগদার, বৌকে ডেকে বলল—মদ সাঁজান আছে?

পচুই মদ এরা বাড়ীতেই তৈরি ক'রে খায়। রাগদার বৌ জবাব দিল, আছে।

রাগদা বললে, লাগা, ভয়ানক গরম পড়েছে।

মুংলী আর রাগদার বৌ মিলে সাঁজন-দেওয়া সিদ্ধ চালে বাখরের গুঁড়ো মিশিয়ে গরম জলে চটকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পচুই মদ তৈরি ক'রে ফেললে। পচুই রাগদার প্রিয় খাদ্য। মহুল চুঁইয়ে পাকি মদও এরা তৈরি করতে জানে, মাঝে মাঝে সেটাও চলে। রাগদার বৌ আর মুংলী মহুলের মদ খেয়ে সে-বার ভয়ানক মাতাল হয়ে পড়েছিল, সেই থেকে ওটা এখন বন্ধ আছে। পচুই মদে কোন হাঙ্গাম নাই, ওটা এদের বরাবরই চলে।

গোদা সাপের চচ্চড়ি দিয়ে পচুই খেতে বসল রাগদা দাওয়ার উপর চাটাই পেতে। রাগদার বাড়ীর সামনে দিয়ে দূরে সদর রাস্তায় পাড়ার মিতন মাঝি তীর-ধনুক কাঁধে ফেলে কোথায় যেন চলেছে। মিতন মাঝি রাগদার স্যাঙাত, ছেলে বেলা থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ওরা ছ'জনে। একসঙ্গে ওরা আমোদ-আহ্লাদ করে, একসঙ্গে শিকার করতে বেরোয়, একসঙ্গে ওরা নেশা ভাঙ ক'রে আনন্দ পায়। কাঁড় চালাতে মিতনও বড় কম নয়, রাগদার শিকারের একমাত্র সঙ্গী এই মিতন মাঝি। এত এদের ভাব, এতখানি হৃদ্যতা, অথচ কিছু দিন থেকে মিতন মাঝির আর দেখাই পাওয়া যায় না, রাগদার বাড়ী আসা-যাওয়া সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

দূর থেকে মিতনকে দেখতে পেয়ে জোর গলায় হাঁক দিলে রাগদা। মিতন হয়ত শুনতেই পেলে না। আরও জোরে ডাকতে লাগল রাগদা। থমকে একটু দাঁড়াল মিতন, কিন্তু ফিরে একবার তাকাল না, সামনের দিকে মুখ করে আবার সে হাঁটতে সুরু করল। রাগদা এবার তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সদর দোরে দাঁড়িয়ে আরও জোরে হাঁকতে লাগল—মিতন,—মিত-ন।

মিতন মাঝি ফিরে দাঁড়াল, রাগদাকে দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল সে। রাগদা বললে, হন্ হন্ ক'রে চল্লি কোথা, খানিক মদ খেয়ে যাবি না?

মিতন মাঝি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে—না ভাই, বেজাই কাজ পড়েছে, বসবার এখন সময় নাই।

মিতন মাঝির হাত ধরে হড় হড় ক'রে টেনে নিয়ে চললো রাগদা। কাজ এমনি পড়লেই হ'ল। কতদিন থেকে এক-সঙ্গে বসে মদ খাওয়া হয় নি, আয়োজন সব প্রস্তুত, মিতনকে আজ মদ না খাইয়ে কোনমতেই ছেড়ে দেবে না রাগদা, এতে মিতনের যত ক্ষতিই হোক। মিতনকে রাগদা চাটাইয়ের উপর বসিয়ে মদের ভাঁড়টা এগিয়ে দিয়ে বললে, লেঃ—খা।

মিতন মাঝি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল রাগদাকে,—মা-বুড়ী তোর গেল কোথা?

রাগদা বললে, মহুল কুড়ুতে।

ঢক ঢক করে পচুই মদ খানিকটা টেনে নিয়ে মিতন বললে, মহুল না হলে তোর পাকি মদের যোগাড় হবেক কিসে, তোর লেগেই ত বুড়ী খেটে খেটে হায়রান।

মাতৃগর্বে বুকটা যেন ফুলে উঠল রাগদার, খুশী হয়ে রাগদা বলে উঠল, তা বটে, হাঁ ভাল কথা—আজ আমি মহুল চুঁইয়ে রাখব, কাল তোকে আসতে হবে। ছ'জনে ছ'টি বোতল পাকি নেশা, আসবি ত?

মিতন মাঝি একটু কাঁচুমাচু করে বললে, কাল? কাল আর আমার আসা হবেক নাই স্যাঙাত, আমি এখন উঠি, আমাকে তুই বাদ দে।

মহুলের মদ যে মিতন মাঝির কত প্রিয় রাগদার তা ভাল রকমই জানা আছে। তবুও সে আসতে চায় না, ব্যাপার কি? রাগদা একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে—কেনে বল্ দেখি?

মিতন মাঝি একটু কুণ্ঠিত ভাবে জবাব দিলে—তোর এখানে আসতে আমার ভয় করে।

মিতন মাঝির কথা শুনে বিস্মিত হ'ল রাগদা, বললে—ভয়! ভয় কিসের?

মিতন মাঝি বললে—বলব? বলাই আমার উচিত, তুই হয়ত কোন খবর রাখিস না। তোর মায়ের নামে ভয়ানক বদনাম রটেছে সাঁওতাল পাড়ায়।

রাগদার মায়ের নামে বদনাম! মিতন মাঝির কথা শুনে অবাক হয়ে গেল রাগদা, বললে—কিসের বদনাম, খুলে বল মিতন!

মিতন বললে—ডাইনী।

চমকে উঠল রাগদা, তাড়াতাড়ি বলে উঠল—কে?

—তোর মা।

—কে বললে?

—গাঁ-শুদ্ধ লোকে বলছে।

—প্রমাণ?

—প্রমাণ আছে বইকি।

রাগদার মা যে কিছুকাল থেকে ডাইনী হয়েছে, এবং ক্রমাগত পাড়ার লোকের ক্ষতি করতে আরম্ভ করেছে—দু' একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে মিতন মাঝি পরিষ্কার ভাবে সে কথা বুঝিয়ে দিলে রাগদাকে। কিসকু মাঝির বৌটাই ত একটা মস্ত বড় প্রমাণ, ওঝার কাছে রাগদার মায়ের নাম পর্য্যন্ত সে প্রকাশ করে দিয়েছে। অন্যান্য জান গুরুরাও একই কথাই বলে।

ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল রাগদা—রাগদার মা ডাইনী? এ যে রাগদা কল্পনা করতে পারে না। মিতন মাঝির দিকে অভিভূতের মত কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল রাগদা—এ কথা তুই বিশ্বাস করিস মিতন?

মিতন মাঝি অকুণ্ঠ চিত্তে জবাব দিলে—করি।

রাগদার হৃৎপিণ্ডটা কে যেন টেনে ধরেছে। মিতন মাঝি রাগদার অন্তরঙ্গ মিতা, রাগদার নেহাৎ আপনার জন, সেও এ কথা বিশ্বাস করে! মিতন মাঝি ত মিথ্যা কথা বলে না, তবে কি—তবে কি সত্যিই রাগদার মা ডাইনী!

ধীরে ধীরে বিদেয় হয়ে গেল মিতন। কি আশ্চর্য্য, মিতন পর্য্যন্ত আজ রাগদার বাড়ী আসতে ভয় করে! কত কথাই বলে গেল মিতন, এ সব কি সত্যি?

মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ার উপর বসে পড়ল রাগদা। না না—এ কখনো হতে পারে না, রাগদার মন বলছে মা-বুড়ী তার ডাইনী নয়, লোকে হয়ত হিংসে ক'রে রটাচ্ছে। যে রাগদার মা গাঁয়ের লোকের জন্তে এত করে, পাড়ার ঘরে এ পর্য্যন্ত যাকে ছোট-বড় সকলেই খাতির শ্রদ্ধা ক'রে চলত, সে-ই আজ তাদের চোখে ডাইনী! কে বলে রাগদার মা ডাইনী? কিসকু মাঝি—জিতু হাড়াম—কিষ্টু ওঝা—আর কে? পাড়ার লোক—সবাই? সব শালাকে খুন করবে রাগদা। রাগদার মাকে যে ডাইনী বলতে সাহস করে—রাগদার সে দুশমন, রাগদা তাকে ছেড়ে কথা কইবে না। প্রমাণ করুক—রাগদার সামনে এসে প্রমাণ করুক শয়তানের দল যে মা-বুড়ী তার ডাইনী। মিথ্যে কথা—এ কথা যারা বলে তারা মিথ্যেবাদী।

কিন্তু মিতন? মিতন মাঝি যে নিজেও—

বন্ বন্ ক'রে রাগদার মাথা ঘুরতে থাকে, রাগদা আর ভাবতে পারে না। ছেঁড়া চাটাইটার উপর মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রাগদা। মিতন মাঝি রাগদাকে আজ গভীর একটা অন্ধকার কূয়োর মধ্যে যেন ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে গেল। সেখানে আলো নাই, বাতাস নাই, চারিদিক শুধু ঘুরঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকার কূয়োর মধ্যে রাগদা যেন ডুবছে আর উঠছে, কিন্তু তার থৈ পাওয়া যাচ্ছে না। শুটকে মত পেটমোটা কদর্য্য এক প্রেতমূর্ত্তি বিকট একটা হাঁ ক'রে রাগদার দিকে যেন লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে, অথচ তাকে গিলে ফেলছে না। রাগদা চোখ দু'টো বন্ধ ক'রে দু' হাত দিয়ে বুকটা তার চেপে ধরলে, দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে রাগদার।

কতক্ষণ এই ভাবেই কেটে গেছে। রাগদার মা এসে ঘুম ভাঙালে রাগদার, বললে—ভাত খাবার সময় হয়েছে বেটা, ওঠ।

রাগদা চোখ মেলে চেয়ে দেখে সামনে তার মা-বুড়ী। বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল রাগদার, মিতন মাঝির কথাগুলো রাগদার মনের মধ্যে গুমরে গুমরে যেন ঘুরপাক খেতে লাগল। অভিভূতের মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে মা-বুড়ীর দিকে কিছুক্ষণ ধরে চেয়ে থাকল রাগদা।

এই রাগদার মা, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে বুড়ীর, আগের মত সে স্বাস্থ্য নাই, সামর্থ্য নাই, গায়ের মাংস প্রায় ঝুলে পড়েছে বুড়ীর, বয়সের পরিপূর্ণতায় মাথার চুলগুলো বিলকুল শাদা হয়ে গেছে। নিজের জন্য আশা-আকাঙ্ক্ষা করবার মত কিছুই আর অবশিষ্ট নাই বুড়ীর, জীবনের বাকি কয়েকটা দিন এই ভাবেই সংসারের বেগার খাটতে খাটতে কোন দিন হয়ত সট করে সরে পড়বে। পার্থিব লাভ-লোকসান আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দ্বেষ-হিংসার একেবারে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ী। জীবনে সে কারও কোন দিন ক্ষতি করে নি এতটুকু অথচ এরি নামে লোকে আজ বদনাম রটায়, ডাইনী ব'লে ঘৃণার চোখে দেখে! গাঁয়ের লোকের কথা রাগদা ধরে না, কিন্তু মিতন মাঝি? সেও যে আজ ওদের কথা বিশ্বাস করেছে। তবে কি—সত্যি সত্যি শেষবয়সে বংশের নাম ডোবাবে বুড়ী! মিতন মাঝি একি বিষের আগুন জ্বেলে দিয়ে গেল আজ রাগদার বুকে!

রাগদার মা আবার স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাক দিলে—বেটা!

রাগদা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। এযে সেই মানুষ সেই মন সেই প্রাণ, চিরপরিচিত সেই স্নেহকোমল ডাক—বেটা! কোথাও ত এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নি।

রাগদার গায়ে হাত রেখে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে বুড়ী—তোর কি কোন অসুখ করেছে বেটা?

একটু অপ্রকৃতিস্থ ভাবে বলে যেতে লাগল রাগদা—মা, ওরা তোর বদনাম করছে, ওরা তোকে গালমন্দ দিচ্ছে।

রাগদার মা জিজ্ঞাসা করলে—কে?

রাগদা বললে—দুশমন যারা।

রাগদার মা বিস্মিত হয়ে বললে—কি বলছে?

রাগদা জবাব দিলে—ও কথা তুই শুনতে চাস না। তুই শুধু বল যে তুই যা ছিলি তাই-ই আছিস। তুই আমার মা,

আমি তোর ছেলে, আমি জানি তুই যা বলবি ঠিকই বলবি, আমি তোকে চিনি যে।

রাগদা ছটফট করতে লাগল। বুড়ী এর বিশেষ কারণ কিছু খুঁজে পেলে না, রাগদাকে শুধু শান্ত করবার জন্ত বলে উঠল—তুই ঠিকই বলেছিস বেটা, আমি যা ছিলাম তাই-ই আছি, কই—কিছুই ত আমার হয় নি।

রাগদা একটু শান্ত হ'ল, বললে—আমি জানি—এ আমি জানি মা, তোকে আমি চিনি যে।

রাগদা হঠাৎ হু'হাত দিয়ে ওর মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠল—মা!

একান্ত আগ্রহে শীর্ণ হাত হু'খানা বাড়িয়ে দিয়ে রাগদাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বুড়ী বললে, বেটা!

রাগদার মুখে কথা সরল না, বুড়ীর বুকে মুখ গুঁজে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে এতক্ষণে রাগদা যেন নিশ্চিন্ত হ'ল।

ক্রমশঃ

কাপড়ের ব্ল্যাক মার্কেট

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

কাপড়ের ব্ল্যাক মার্কেট সৃষ্টির প্রধান কারণ দুইটি—উৎপাদন হ্রাস ও বিক্রয়-ব্যবস্থার আমূল বিপর্য্যয় এবং এই দুইটিই বস্ত্র-সমস্যা-সমাধানে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রত্যক্ষ ফল। জনমতের বিরুদ্ধে ভারত-সরকার কিরূপে ভারতের বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী করিতেছেন, সৈন্যদের জন্ত প্রয়োজনীয় কাপড় আমেরিকা বা ব্রিটেন হইতে না আনিয়া কিরূপে ভারতীয় মিলগুলি হইতে উহা আদায় করিতেছেন, এবং উহার ফলে কিরূপে জনসাধারণের প্রাপ্য কাপড়ের পরিমাণ কমিতেছে চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে তাহা দেখাইয়াছি। সম্প্রতি ভারত-সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ ভেলোডিও বলিয়াছেন, "বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের দুইটি মূল উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত, তন্মধ্যে প্রথমটি ব্যর্থ হইয়াছে, বস্ত্র উৎপাদন তো বাড়েই নাই, যুদ্ধের মধ্যে বাড়িবার সম্ভাবনাও আর নাই; রপ্তানী ও সাপ্লাই বিভাগের দাবী না কমিলে জনসাধারণের প্রাপ্য বস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধিরও কোন আশা নাই।"

মিঃ ভেলোডি শুধু প্রথমটির ব্যর্থতার কথা বলিয়াছেন। বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও ঠিক সমানভাবে ব্যর্থ হইয়াছে এবং এই উভয় ব্যর্থতার সম্মিলিত ফল দেশবাসীর পক্ষে যেমন মারাত্মক হইয়াছে, ঠিক তেমনি লাভজনক হইয়াছে বিলাতী কাপড়ওয়ালাদের বেলায়। ব্রিটেন হইতে কাপড় আমদানির বন্দোবস্ত ১৯৪৩-এর জুন মাসে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সুরু হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল সর মহম্মদ আজিজুল হকের এক উক্তিতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ১৯৪২-এর জুলাই হইতে ১৯৪৪-এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বিলাতী সূক্ষ্ম বস্ত্র আমদানির জন্ত ২০৯টি লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। আপাততঃ মোট দেড় কোটি গজ বিলাতী কাপড় আমদানির আয়োজন হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যগণ সর মহম্মদ আজিজুল হককে চাপিয়া ধরিলে তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে আমদানি বিলাতী কাপড়ের মধ্যে এমন অনেক কাপড় থাকিতে পারে যাহা এদেশে প্রস্তুত করা যায়। সর বিঠল চন্দাবরকার বলিয়াছেন যে এই আমদানী সম্বন্ধে টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের সহিত পরামর্শ করা হয় নাই; তাঁহারা ইহা জানিতেন না। বিলাতী কাপড় আমদানী করিয়া সৈন্য বিভাগের জন্ত উহা ব্যবহার করিয়া সাময়িক প্রয়োজনে বস্ত্র সরবরাহের দায় হইতে মিলগুলিকে রেহাই দিলে সব দিক অনায়াসে রক্ষা পাইতে পারিত, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোন দিনই সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। বস্ত্র উৎপাদন ব্যাপারও ঠিক সমান রহস্যজনক। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর প্রশ্নের উত্তরে সর মহম্মদ আজিজুল হক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে ভারত-সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার কয়লার অভাবের কারণ দেখাইয়া যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ ভিন্ন অন্যান্য প্রদেশের কাপড়ের কল কিছুদিন বন্ধ রাখিবার জন্ত মিলমালিকগণকে "পরামর্শ" দিয়াছিলেন। কয়লার অভাবে সত্যই কতকগুলি মিল গত জানুয়ারি মাসে বন্ধ ছিল এবং এই কারণে প্রায় আড়াই কোটি গজ কাপড় কম তৈরি হইয়াছে। চটকল প্রভৃতি অন্য কোন মিলকে কিন্তু কয়লার অভাবের জন্ত কাজ বন্ধ রাখিতে বলা হয় নাই। বোম্বাইয়ের কমার্স পত্রিকাটিকে বোম্বাই মিলমালিকদের মুখপত্ররূপে গণ্য করা চলিতে পারে। এই পত্রিকা ২৪শে মার্চ্চের সংখ্যায় লিখিয়াছে, "মিঃ ভেলোডি সরকারের দোষ চাপিবার চেষ্টা না করিয়া মুক্তকণ্ঠে যে উহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা সুখের বিষয় কিন্তু তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহাতে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারী অক্ষমতার দোষ ক্ষালন হয় না। কড়া কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ভারত-সরকারের শিল্প বিভাগ সুসম্বদ্ধভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা কোন দিনই করেন নাই।" পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কাপড়ের উৎপাদন কমিলেও আমাদের দেশে উহা কমিবার কোন কারণ নাই। ভারতীয় ছোট আঁশের তুলা হইতে খুব মিহি কাপড় তৈরি না হইলেও মোটা কাপড় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হইতে পারে। তুলার অভাবও আমাদের নাই। ভারত-সরকারের অর্থনৈতিক বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ব্যবসা-বাণিজ্যের মাসিক বিবরণীতে দেখা যায় এদেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তুলা রহিয়াছে। (Over-abundance of supplies of unwanted cotton were the chief factors affecting the tone of the market.)

কাপড় বিক্রয়ের বন্দোবস্তের ফল আরও মারাত্মক হইয়াছে। ভারত-সরকার কাপড় বিক্রয়ের যে বন্দোবস্ত করেন তাহা মোটামুটি এই—১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২ এই তিন বৎসর যাহাদের কাপড়ের কারবার ছিল তাহাদিগকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় মিল হইতে ক্রয় করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দেওয়া হয়। ইহাদিগকে বলা হয় কোটা-হোল্ডার। এই তিন বৎসর যাহাদের কাপড়ের ব্যবসা ছিল না তাহা-

দিগকে প্রাদেশিক সরকারের সুপারিশে লাইসেন্স দেওয়া হয়। কোন মিল এই দুই শ্রেণীর দালাল ভিন্ন অপর কাহাকেও কাপড় বিক্রয় করিতে পারে না। এই কোটা হোল্ডার এবং লাইসেন্স হোল্ডারদের তৎপরতায় ব্ল্যাক মার্কেট কি ভাবে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ মিঃ আর এল এন বিজয়নগর নামক জনৈক লেখক 'কমার্স' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে দিয়াছেন (৩রা ও ২৪শে মার্চ্চ)। তাঁহার মতে এই বন্দোবস্তের প্রধান ত্রুটি এই যে কোন অঞ্চল কি ধরণের কাপড় পাইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে মিহি মোটা মাঝারি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কাপড়ের চাহিদা থাকে। যেখানে মিহি কাপড়ের চাহিদা বেশী সেখানে মোটা কাপড় বরাদ্দ হইলে ঐ স্থানে উহা বিক্রয় করা অসুবিধা হয়; ফলে ঐ সব ব্যবসায়ী অন্যত্র উহা বিক্রয়ের চোরা পথের সন্ধান করিতে থাকে। তার পর মিঃ বিজয়নগর স্পষ্ট বলিতেছেন, কোটা-হোল্ডারদের মাথার উপর কেহ না থাকায় ইহারাই চোরা কারবারের প্রধান উৎস হইয়া উঠিয়াছে। চোরা কারবারের সুবিধা যেখানে আছে সেই সব স্থানেই ইহারা কাপড় পাঠাইয়া দিতেছে। সরকারী ব্যবস্থাও এমন যে গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীদের পক্ষে ঘুষ খাইয়া ইহাদের সহায়তা করিবারও যথেষ্ট সুযোগ আছে।

সরকারী-বণ্টন ব্যবস্থার কুফল কত দূর গিয়াছে তাহার আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে মধ্যপ্রদেশের খুচরা বস্ত্র বিক্রেতাদের এক সম্মিলনীর বিবরণীতে। গত জানুয়ারিতে নাগপুরে এই সম্মেলন হয়। উহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ ভোঁসলা টেক্সটাইল কমিশনারের নিকট লিখিত এক পত্রে চোরা কারবার কিরূপে সৃষ্টি হইতেছে তাহার বিবরণ দেন। নাগপুর টাইমস পত্রিকায় (২৪শে জানুয়ারি) পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে। কি ভাবে যথেচ্ছ লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে তাহার প্রমাণ দিয়া মিঃ ভোঁসলা লেখেন যে নাগপুরে ১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২ এই তিন বৎসরে খুচরা বস্ত্র বিক্রেতার সংখ্যা ছিল ১৭৫; বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ হুকুমনামার বলে সেখানে ২৫০০ লোককে কাপড় বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনের সম্পাদক মিঃ বাবুলাল কোটা-হোল্ডারদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বলিতেছেন, পূর্ব্ব ব্যবসায়ের জোরে ইহারা মিল হইতে কাপড় পায়, কিন্তু নিজেদের পুরাতন ক্রেতৃবর্গকে কাপড় বিক্রয় করিতে ইহারা আইনত: বাধ্য নহে। ইহারা নিজেদের খুশী মত লোককে বিক্রয় করে। তবে লাইসেন্স প্রাপ্ত লোক ভিন্ন কাহাকেও বিক্রয় করিতে পারে না বলিয়া ইহারা নিজেদের আত্মীয়স্বজন বা ভৃত্যের নামে লাইসেন্স সংগ্রহ করিয়া লয় এবং কাপড় আসিলেই এই সব ভুয়া ব্যবসায়ীর নামে খরচ লিখিয়া রাখে। প্রকৃত ব্যবসায়ী কেহ কাপড় চাহিলে বলে সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কাজেই বাধ্য হইয়া আসল ব্যবসায়িগণকেও চোরা কারবারে অবতীর্ণ হইতে হয়। প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট এইভাবে অবাধে লাইসেন্স দিয়া চলিয়াছেন।

শুধু মধ্যপ্রদেশে নয়, বাংলা দেশেও এই ব্যাপার পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। বস্ত্র ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে হোওলিং এজেন্ট নিয়োগ বা বস্ত্র বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে। বাংলা-সরকার ক্রমাগত সমস্ত ব্যাপারটা নিজেদের মুঠার ভিতর আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাংলায় কাপড়ের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ ভেলোড়ি বলিয়াছেন, বাংলায় বস্ত্রাভাবের কারণ একমাত্র তথাকার প্রাদেশিক সরকারই বলিতে পারেন। সকলেই এ বিষয়ে একমত যে বাংলা-সরকার কর্ত্তৃক প্রাপ্ত কাপড় বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত মন্ত্রীরা করিতে পারেন নাই বলিয়াই সেখানে এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। প্রিয়পাত্র বাছিয়া লাইসেন্স দেওয়ার রীতি পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় বস্ত্রব্যবসায়ীদের সমিতিগুলিকে কাপড় বিক্রয়ের ভার দিলে এবং ঐ সব সমিতিতে জনসাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করিলে এই পাপ অনায়াসে বন্ধ হইতে পারিত। আমরা জানি, কোন কোন জেলা হইতে এরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষও উহা সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডল উহা প্রত্যাখ্যান করেন। একটি বাজারের সমস্ত খুচরা বস্ত্র বিক্রেতা একত্র হইয়া কাপড়ের গাঁইট গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উহা খুলিলে কত কাপড় আসিল তাহা সকলে জানিতে পারে। ঐ কাপড় নিজেদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করিয়া লইলে কাহার নিকট কত কাপড় আছে তাহাও জানা থাকে। সুতরাং কেহ কাপড় প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় না করিয়া সরাইতেছে কিনা তাহাও ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। ঐ সঙ্গে ক্রেতাদের প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট থাকিলে ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করা খুবই সহজ হয়। বাংলার মন্ত্রীরা এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। এসোসিয়েশনের নিকট তাঁহারা কয়েকজন বিক্রেতার নাম চাহিয়া পাঠান, তাহার মধ্যে আবার আনুপাতিক হারে মুসলমানের নাম থাকা চাই। কাপড় বিক্রয় ব্যবসায়ে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য, সুতরাং কোন শ্রেণীর লোককে আনিয়া অনুপাত পূরণ করা হয় তাহা অনুমানসাপেক্ষ। ইহাদেরই মধ্য হইতে গবর্ণমেন্ট নিজেদের উদ্দেশ্য অনুসারে কয়েক জনকে লাইসেন্স প্রদান করেন। আনাড়ীদের কি ভাবে লাইসেন্স দেওয়া হইয়া থাকে তাহার আর এক দফা পরিচয় পাওয়া যায় কাপড় ও সুতা ব্যবসায়ী সমিতিসমূহের ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন মোরারজির উক্তিতে। এলাহাবাদে লীডার পত্রিকার প্রতিনিধিকে তিনি বলিয়াছেন: (লীডার ১৩ই জানুয়ারি)—"বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রসমূহে ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করিবার চেষ্টা চলিতেছে কিন্তু প্রদেশগুলি হইতে আশ্রিতবাৎসল্য ও নানাবিধ দুর্নীতির সংবাদ আসিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি সম্প্রতি কোন প্রদেশ হইতে একদল লোক কাপড়ের জন্য বোম্বাইয়ে উপস্থিত হইলে দেখা গেল তাহারা প্রকৃত বস্ত্রব্যবসায়ী নহে। তাহাদের পারমিট বাতিল করিয়া দিতে হইল।" ইহারা বাংলা হইতে গিয়াছিল কিনা মিঃ মোরারজি অবশ্য তাহা বলেন নাই, কিন্তু সকল প্রদেশের বেলাতেই এই ব্যাপার প্রযোজ্য। বাংলা-সরকার ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতি বন্ধ করিয়া নিজেদের প্রিয়পাত্রগণকেই কাপড় বিক্রয়ের এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া ব্ল্যাক মার্কেটের সদর রাস্তা খোলা রাখিতে চাহিতেছেন। শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের

স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হওয়া উচিত কি না খাস ব্রিটেনেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং লর্ড উলটন তদুত্তরে বলিয়াছেন, বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা রুদ্ধ না হইয়া উহা যাহাতে অব্যাহত থাকে এই নীতিই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুসরণ করিতে চাহেন। এই মূলনীতি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্ম পার্লামেণ্টে এক্সপোর্ট ক্রেডিটস্ গ্যারান্টি বিল নামে একটি আইনের খসড়াও উত্থাপিত হইয়াছে। অথচ এদেশে ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকারেরা যত রকমে সম্ভব ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা পদদলিত করিবার আয়োজন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কাপড়ের উৎপাদন হ্রাস, বাধ্যতামূলক রপ্তানি এবং বিক্রয়ের স্বাভাবিক পন্থাসমূহ রুদ্ধ করিয়া আনাড়ীদের হাতে বিক্রয়ের ভার অর্পণের অবশ্যম্ভাবী ফল ব্ল্যাক মার্কেটের সৃষ্টি ও ও পুষ্টি; বস্তুতঃ ঘটিয়াছেও তাহাই। এই সঙ্গে কাপড়ের মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধেও সরকারী নীতি সমালোচনার যোগ্য। আপার ইণ্ডিয়া কমার্স চেম্বারের বার্ষিক সভায় সর রবার্ট মেনজিস বলিয়াছেন, "কাপড়ের বর্ত্তমান মূল্য ১৯৪৩-এর মে মাসের তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়াছে, মিলগুলির লাভের মাত্রাও ইহাতে কিছু কমিবে। ১৯৪৩-এ মিলগুলি যে অপ্রত্যাশিত ও সম্পূর্ণ অন্যায় লাভ করিয়াছিল তাহা আর তাহারা করিতে পারিতেছে না।" (Mills were no longer making the fantastic and completely unjustifiable profits which had been possible in the year 1943,) এই অসঙ্গত মূল্য বৃদ্ধিতে ক্রেতাদের সর্ব্বনাশ হইলেও গবর্ণমেণ্ট ও মিলমালিক উভয়েই লাভবান হইয়াছেন। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের ঘাড়ে নূতন কর বসাইয়া দেশব্যাপী প্রতিবাদের সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্ত্তে—গবর্ণমেণ্ট মিলগুলিকে যথেচ্ছ লাভ করিতে দিয়াছেন এবং উহাদের লাভ হইতে মোটা ভাগ বসাইয়া অতিরিক্ত লাভ কর আদায় করিয়াছেন। একমাত্র আমেদাবাদ হইতেই এক বৎসরে দশ-বার কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ কর আদায় হইয়াছে। এই মূল্য বৃদ্ধিতে কাপড়ের ক্রেতা এবং কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডার কাহারও লাভ হয় নাই, লাল হইয়াছে উহাদের ম্যানেজিং এজেণ্টেরা। বোম্বাইয়ের একটি শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজিং এজেণ্ট কোম্পানীর পরিচালনাধীন একটি মিলের লাভের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল, উহা হইতে অবস্থা কতকটা বোঝা যাইবে—

(হাজার টাকার হিসাব)

বৎসর	বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থ	মোট ব্যয়	লাভ	ট্যাক্স	লভ্যাংশ
১৯৩৯	৪১,১৯	৩৪,৬০	১,৬১	×	১,১২ (৪%)
১৯৪৩	১,৬৭,৮৬	১,২২,৩৩	৫৪,৪৭	৩৬,৫০	২,৮০ (১০%)
১৯৪৪	১,৬৮,৭৫	১,২৩,৯৬	৪১,১৬	২৭,১০	১,৯৬ (৭%)

এ বৎসর অংশীদারেরা যেখানে মাত্র ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা অর্থাৎ ৭% ডিভিডেণ্ড পাইয়াছেন, ম্যানেজিং এজেণ্টরা সেখানে কমিশন পাইয়াছেন ৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। ইহা তাহাদের প্রকাশ্য কমিশন; ইহার উপর আপিস খরচ, বিক্রয়ের উপর কমিশন, যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কমিশন ইত্যাদি আরও বহুবিধ উপায়ে তাঁহাদের বিলক্ষণ দু'পয়সা উপরি আয় আছে। ভারত-বর্ষের অধিকাংশ কাপড়ের কলই ম্যানেজিং এজেণ্ট পরিচালিত। একই পরিমাণ কাপড় তৈরি করিয়া যে ম্যানেজিং এজেণ্টরা ১৯৩৯-এ মাত্র ২০ হাজার টাকা কমিশন লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, ১৯৪৩-এ তাঁহারাই আদায় করিয়াছেন ৫ লক্ষ ২৯ হাজার ও ১৯৪৪-এ ৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা। শেষোক্ত দুই বৎসরে গবর্ণমেণ্ট এই মিলটি হইতে আদায় করিয়াছেন যথাক্রমে ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার ও ২৭ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। অংশীদারদের ভাগ্যে সেই দশ ও সাত পার্সেণ্ট। ক্রেতাদের দিতে হইয়াছে ১৯৩৯-এর তুলনায় চতুর্গুণ বেশী মূল্য। প্রত্যেক মিলের লাভ-লোকসানের খতিয়ান মিলাইলে এই একই ব্যাপার ধরা পড়িবে। ট্যাক্স আদায়ের সহজ পন্থা অবলম্বনের জন্ম মিল-গুলিকে এই ভাবে যথেচ্ছ লাভ করিতে দিয়া ব্ল্যাক মার্কেটের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করা হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

ভারত-সরকারের বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নীতির দোষে এক দিকে যেমন ব্ল্যাক-মার্কেট চলিয়াছে অপর দিকে তেমনি বিলাতী কাপড় আমদানির পথ প্রশস্ত হইয়াছে। অত্যধিক হারে কাপড়ের মূল্য নির্দ্ধারণে গরীবেরা কাপড় কিনিতে পারে নাই, ভারত-সরকার তখন গরীবের দোহাই দিয়া সস্তা কাপড়ের নামে ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় তৈরি করাইয়া উহা গুদামজাত করিয়াছেন, সাপ্লাই বিভাগের জন্ম কাপড় কাড়িয়া লইয়া এবং বিদেশে কাপড় রপ্তানী করিয়া দেশে কাপড়ের অভাব ঘটাইয়াছেন। তাঁতের কাপড় বাজারে আসিতে আরম্ভ করিলে তাঁতিদের উপকারের দোহাই দিয়া সুতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাঁতের কাপড় বন্ধ করিয়া উহাদেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে, গত পূজার সময় সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে মিলের কাপড়ের অভাব যখন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে বাজার তখন তাঁতের কাপড়ে ছাইয়া গিয়াছিল। ঠিক সেই সময় তাঁতিদের জন্ম সরকারের দরদ উথলিয়া উঠে। সুতা নিয়ন্ত্রণ সুরু হয়, পরিণামে তাঁতের কাপড় বন্ধ হইয়াছে, তাঁতিরাও মরিতে বসিয়াছে।

দেশে সুতারও অভাব কিন্তু খুব বেশী নয়। মিলগুলি যে সুতা নিজেরা ব্যবহার না করিয়া তাঁতিদের জন্ম বিক্রয় করে তাহার পরিমাণ মাসে ৯৮,৬০০ গাঁইট। এক গাঁইটের ওজন ৪০০ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের নামে মাসে ১৭০০০ গাঁইট গ্রহণ করেন। সরকারী চাহিদা প্রভৃতি বাদ দিয়া হাতের তাঁতের জন্ম মাসে মোট ৭২,৬০০ গাঁইট সুতা মিলগুলির হাতে থাকে। অল্প দিন পূর্ব্বে ভারত-সরকারের আদেশে অধ্যাপক টমাসের নেতৃত্বে হাতের তাঁত সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান হইয়াছে তাহার রিপোর্টে দেখা যায় তাঁতিদের জন্ম মাসে ৬৫,০০০ গাঁইট সুতা দরকার। এই পরিমাণ সুতা দেশে আছে ও তৈরি হয় কিন্তু সরকারী কণ্ট্রোলের দৌলতে তাঁতিরা তাহা পায় না। পাইলে কাপড়ের অভাব অনেক কমিয়া যায়।

ম্যাঞ্চেষ্টার যাহাতে ভারতের কাপড়ের বাজার পুনরায় দখল করিতে পারে তাহার জন্ম ধাপে ধাপে চেষ্টা করিয়া যে বস্ত্রাভাব ঘটানো হইয়াছে, তাহারই শেষ ধাপ রেশনিং। রেশনের দোকানে দেশী বিলাতী, মিহি মোটা, সরু পাড়, চওড়া পাড়

কিছুই বাধা চলিবে না। রেশনের চাউলের ভায় অধিকাংশ লোকই যে কোন কাপড় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে; কিন্তু এক শ্রেণীর লোক ইহারই মধ্যে পছন্দসই কাপড় বাহির করিবার জন্ত চেষ্টা করিবে সন্দেহ নাই। তারপর পরিমাণ। মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে বৎসরে ৪ খানা ধুতি ও ৪টি জামা না হইলে চলিতে পারে না অর্থাৎ অন্ততঃ ৩২ গজ কাপড় তাহার দরকার। মেয়েদের জন্ত আরও বেশী প্রয়োজন। উভয়ের জন্ত গবর্ণমেণ্ট বরাদ্দ করিয়াছেন মাত্র ১০ গজ। সুতরাং যে সব গরীব লোক কম কাপড় ক্রয় করিবে তাহাদের ভাগের উদ্বৃত্ত লইয়াও ব্ল্যাক মার্কেট চলিতে থাকিবে। রেশনিঙের মধ্যে কাপড় রেশনিং সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; বিলাতেও উহা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই বলিয়া টেগার্ট সাহেবকে ব্ল্যাক-মার্কেট বন্ধ করিবার জন্ত নিযুক্ত করা হইয়াছে। বাংলায় ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থবাহী শ্বেতাঙ্গদলের রাজনৈতিক দাস মন্ত্রীদের কার্য্যকলাপে লাভ কাহার হইতেছে তাহা এই ভাবে প্রতি পদে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

ব্ল্যাক-মার্কেট ইঁহারা বন্ধ করিতে পারেন নাই, পারিবেন বলিয়াও কেহ বিশ্বাস করে না। বাংলা-সরকারের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে বাংলার বাহিরের লোকদেরও ধারণা কিরূপ 'কমার্সে'র (১০ই মার্চ) নিম্নলিখিত কঠোর মন্তব্য হইতে তাহা বুঝা যাইবে—"বাংলায় কাপড়ের দুর্ভিক্ষের জন্ত দায়ী কে তাহা বুঝা অত্যন্ত সহজ। দোষ প্রধানতঃ বাংলা-সরকারের। তাঁহাদের অনুসৃত কর্ম্মপদ্ধতির বিচার করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা জানিতে চাই বাংলা দেশে কাপড়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও ইঁহারা কেন সেখান হইতে কাপড় অবাধে রপ্তানী হইতে দিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে চীন ও তিব্বতের সহিত চোরাই ব্যবসা খুব ভাল ভাবে চলিতে দেওয়া হইয়াছে। তিব্বতে কাপড় পাঠাইবার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া তথাকার রপ্তানি বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বাংলার অভাব সত্ত্বেও তথা হইতে চীনের সহিত চোরা কারবার এখনও পুর্ণোদ্যমে চলিতেছে বলিয়া সংবাদ আসিতেছে। এই মারাত্মক ফাটল বন্ধ করা বাংলা-সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই।"

ইঁহাদের হাতে কাপড় বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার পড়িবার পর দেশবাসীর কি অবস্থা হইবে তাহা অনুমান করাই ভাল। মনে রাখা দরকার যে বস্ত্র উৎপাদন ভয়ানক কিছু কমিয়াছে এমন কথা এই ব্যবসায়ের বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন না। এই সেদিনও (কমার্স, ৩১শে মার্চ) টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাজ ঠাকরসি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে ১৯৩৯-এর তুলনায় দেশী কাপড় তৈরি এক বিন্দুও কমে নাই এবং উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ এখনও আছে। ইহার উপর কমার্স নিজেও মন্তব্য করিয়াছেন যে দেশে উৎপন্ন সমস্ত কাপড় জনসাধারণ পাইলে কাপড়ের অভাব হইত না।

মনীষীদের জীবনস্মৃতি—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, ২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১৲ টাকা।

ইহাতে রাজনারায়ণ বসু, বিপিন পাল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় বরেণ্য ব্যক্তির লিখিত আত্মকাহিনী হইতে ছেলেদের পাঠোপযোগী অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐগুলি পাঠ করিলে উক্ত মনীষিগণের বিশিষ্ট সাধনার ধারা বুঝিতে পারা যায় এবং তাঁহাদের সমসাময়িক দেশ ও সমাজের অবস্থাও অবগত হওয়া যায়। পরিশিষ্টে মনীষিগণের কীর্তি ও রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এ ধরণের সঙ্কলন-গ্রন্থ এই প্রথম চোখে পড়িল। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থখানি পরিপুষ্ট ও পূর্ণতর আকারে দেখিবার আশায় রহিলাম।

রবিবারের দেশে—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক। প্রকাশক—শ্রীসুনীতচন্দ্র মজুমদার, ২৫ নং মোহিনীমোহন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য—১।০

ছেলেদের আবৃত্তির উপযোগী কবিতার বই। অধিকাংশই হাসির কবিতা। কবিতাগুলি ফোয়ারার মত স্বতঃস্ফূর্ত ও রংমশালের মত দেদীপ্যমান। মলাটের ছবিটি সুন্দর ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে। কিন্তু অধিক মূল্যের দরুন এমন চমৎকার কবিতাগুলি মাঠে মারা যাইতে পারে।

মানচিত্রে ভূমণ্ডল—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ। বুক করপোরেশন লিমিটেড, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—২৲

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রগণের উপযোগী। অযথা ভারাক্রান্ত না হওয়াতে ম্যাপগুলি পরিপাটি ও শোভন হইয়াছে। কিন্তু প্রধান দুইখানি ম্যাপ (এশিয়া ও ইউরোপ) যথাস্থানে রং না পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ দুইখানি পুনর্মুদ্রিত করা উচিত। মূল্যও কিছু কম করা আবশ্যক।

অজীর্ণ চিকিৎসা—জে, হালদার। ২২।১।১, কেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, সায়েন্টিফিক ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০

ইহাতে সকলপ্রকার অজীর্ণ রোগ অর্থাৎ পেটের অসুখ সারাইবার কতকগুলি সহজ সরল উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। অজীর্ণ-নিবারক আহার্য ও পথ্য সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশপূর্ণ পুস্তিকাখানি সকলেরই কাজে লাগিবে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

আলোচনা

"বর্তমান যুদ্ধে বস্ত্রসমস্যা"

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

গত চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দেবজ্যোতি বর্মণ-লিখিত "বর্তমান যুদ্ধে বস্ত্র-সমস্যা" সম্বন্ধে এ স্থলে কিছু বলতে চাই।

বস্ত্রাভাব "সৃষ্টি করার" পেছনে যে অভিসন্ধি আছে তা মনে করার সত্যি কারণ আছে। সে অভাব পূরণ করার জন্য আর বাজার দখল করার জন্যই কি আমেরিকা আর ইংলণ্ড থেকে নিরেস কাপড় আসছে না? সাধারণ লোকের কাছে প্রয়োজনানুসারে সে কাপড় দেখতে-না-দেখতেই বিক্রী হয়ে যাবে। কিন্তু এর ফলে আমাদের উন্নতিশীল একটা শিল্প যে কতখানি পিছিয়ে পড়বে বা আদৌ বেঁচে থাকতে পারবে কিনা সেটা ভাবতে গেলে সত্যি একটা ভয়াবহ পরিণতির কথা মনে হয়। বর্মণ মশায় এক জায়গায় লিখেছেন মিল-মালিকেরা কল্পনার অতীত অর্থ সঞ্চয় করেছেন—সেটা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রথমাবস্থায় বস্ত্রমূল্য অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেওয়ার দরুন তাঁরা সত্যি কিছু লাভবান হয়েছিলেন, কিন্তু বস্ত্রের দর বেঁধে দেওয়ার পর মিল-মালিকেরা অতিরিক্ত লাভ পাওয়া তো দূরের কথা—বরং এ দুর্দ্দিনে যা ন্যায্য প্রাপ্য ছিল তাও পাচ্ছেন না বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়, বস্ত্রমূল্য বেঁধে দিয়েই গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত নেই। ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স বসিয়ে কারখানাগুলোর কর্তৃপক্ষের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে নিয়েছেন এবং মালিকেরা নিজেদের গড়া কারখানা পরিচালনা করা, কোন কিছু দেওয়া বা নেওয়া কিংবা শ্রমিকদের সম্বন্ধেও যে-কোন ব্যবস্থাই করতে চান তৎসমুদয়ই পরোক্ষে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ। অতিরিক্ত লাভ বন্ধ করার পন্থা উহা মোটেই নয়, বরং এটা সুষ্ঠু পরিচালনারই অন্তরায়। গবর্ণমেণ্ট নিজেদের প্রাপ্য চুকিয়ে নিয়েই খালাস। এ প্রসঙ্গে উৎপাদন-ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্মণ মশায় লিখেছেন কয়েক মাসে কলকব্জা অকস্মাৎ খারাপ হবার কথা নয়, তুলোর উৎপাদন কমেনি বা তাঁতও লোপ পায়নি। কথাগুলো উৎপাদন-বৃদ্ধির পক্ষে সুযুক্তি সন্দেহ নেই কিন্তু ভেতরের কথা তা নয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ, ব্যাণ্ডেজ, মশারির কাপড় থেকে আরম্ভ করে তোয়ালে পর্যন্ত তৈরির জন্য সামরিক অর্ডারের দরুন কত তাঁত যে "আটকে থাকছে" সেটা চিন্তা করে দেখা দরকার। তুলো পাওয়া যাচ্ছে সত্য, কিন্তু উৎপাদন কমে যাওয়ার প্রকৃত কারণ রয়েছে। গবর্ণমেণ্ট সবকিছুর দর বেঁধে দিয়েই তো খালাস কিন্তু কিছু সরবরাহ করার দায়িত্ব নিচ্ছেন না। কয়লার অভাবে কারখানা বন্ধ গিয়েছে। পর্য্যাপ্ত কাঠকয়লা পর্যন্ত পাওয়া যায় নি বা যাচ্ছে না। আর কারখানা চালাতে যে বিরাট ষ্টোর মেটিরিয়ালস্-এর দরকার—সেটা ভাববার কথা নয় কি? ষ্টোর সাপ্লাই করবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট নিচ্ছেন কি? মাকু, শানা, ববিন, বয় ইত্যাদি হাজার রকম জিনিসের অভাবে এখনও তাঁত বন্ধ হয়ে আছে। মেসিন সত্যি নষ্ট হয় নি। বর্তমানে যে সমস্ত জিনিস দিয়ে কারখানা চলছে, ম্যানুফ্যাকচারিং স্কেলে তা চলতে পারে না। তদুপরি গেল মন্বন্তরে লোকাভাবে কারখানাগুলো, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের কারখানাগুলো, প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সে ক্ষতির পরিণাম এখন আমরা ভোগ করছি। কারখানাগুলোর প্রতি গবর্ণমেণ্টের শৈথিল্যই যে আমাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রধান কারণ একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। এবং অন্নের হাহাকারের মত বস্ত্রের দুর্ভিক্ষের দায়িত্বও গবর্ণমেণ্ট নিতে চাইছেন না।

কারখানার মালিকগণ যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কত দূর কি করেছেন আমরা তা জানি না। আমাদের দেশের শিল্পপতিগণ জাহাজ ইত্যাদি কোন কোন ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন কিন্তু যে শিল্পগুলো আজও বেঁচে আছে, কিন্তু অবহেলার ফলে ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার এবং উন্নত করার মত ব্যাপক কোনো পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা আমরা তা জানিনা। যদিও এ দিকে গবর্ণমেণ্টের কোনো আগ্রহ নেই তবু মিল-মালিকদের এ বিষয়ে ব্যাপক কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করার সময় কি এখনো আসে নি? বর্মণ মশায়ের মতে—"ল্যাংকাশায়ারের বাতিল করা যন্ত্র সস্তা দরে কিনে আপ-টু-ডেট হবার" সুযোগটুকুই বা আমাদের মিল-মালিকগণ পাবেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। শ্রমিকদের কার্য্যপ্রণালীর গতানুগতিক ধারা বদল করে উৎপাদন-বৃদ্ধির নূতন প্রণালী গ্রহণ না করলে আমাদের এগিয়ে চলাও সম্ভব হবে না।

উত্তর

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ রায় আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন নাই, শুধু মিল্‌মালিকদের পক্ষে কিছু বলিতে চাহিয়াছেন। আমার প্রধান কথা এই যে সরকারী শৈথিল্য বা অবহেলা বর্ত্তমান বস্ত্রাভাবের কারণ নয়, উহার পিছনে ভারতে পুনরায় বিলাতী কাপড় বিক্রয়ের পাকা ব্যবস্থা করিবার একটা পরিকল্পনা আছে এবং মিলমালিকেরা অতিলাভের লোভে যাহা করিয়াছেন তাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের উদ্দেশ্যসাধনেই সাহায্য করা হইয়াছে। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প বলিতে পূর্ব্ববঙ্গের গুটিকয়েক মিলকে বুঝায় না, বোম্বাই আমেদাবাদ কানপুর প্রভৃতির মিল লইয়াই আমি আলোচনা করিয়াছি।

"শাব্দিক পুরুষোত্তম"

শ্রীবৃন্দাবন শর্ম্মা

গত ফাল্গুন সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পিএচ-ডি, মহোদয় "শাব্দিক পুরুষোত্তম" প্রবন্ধে ত্রিকাণ্ডশেষ, হারাবলী, দ্বিরূপ শেষ, একাক্ষরকোষ, প্রভৃতি কতিপয় অভিধান বা কোষ-গ্রন্থের রচয়িতা পুরুষোত্তমদেবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। এই সব গ্রন্থের রচনাকাল ১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন ও গ্রন্থগুলিও পূর্ব্বভারতে রচিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। পুরুষোত্তমদেব কোন্ দেশের লোক তৎসম্বন্ধে লেখক মহোদয় সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। পুরুষোত্তমদেবকে তিনি বৌদ্ধ বা শৈব বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই অনুমান তথা সিদ্ধান্তের উপর দুই একটি কথা বলিতেছি।

উৎকল দেশে সূর্য্যবংশীয় রাজা পুরুষোত্তমদেব খ্রীষ্টীয় ১৪৭৯-১৫০৪ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে তিনি ১৪৭০—১৪৯৭ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। Sanskrit Literature গ্রন্থের লেখক A. A. Macdonell পুরুষোত্তমদেব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"A supplement to it is the Trikanda-cesha by Purushottamadeva perhaps as late as 1300 A D."

এই উৎকলীয় রাজা পুরুষোত্তমদেব ত্রিকাণ্ডশেষ, হারাবলী, একাক্ষরকোষ, প্রভৃতি গ্রন্থাদির সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া উৎকল দেশে আজিও প্রচলিত আছে। সূর্য্যবংশীয় রাজা পুরুষোত্তমদেব কাঞ্চি জয় করিয়া কাঞ্চিরাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এ কথা ইতিহাসে ব্যক্ত আছে। পুরুষোত্তমদেবের যোগ্য পুত্র রাজা প্রতাপরুদ্রদেব "সরস্বতী বিলাস" নামক স্মৃতি-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে আসেন ও বাস করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বদেশ ছাড়িয়া এই রাজার অধীনে বাস করতঃ টোল পরিচালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

ত্রিকাণ্ডশেষ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ব্যক্ত আছে :—

জয়ন্তি সন্তঃ কুশলং প্রজানাং
নমো মুনীন্দ্রায় সুরাঃ স্মৃতাঃ স্থ।
স্তুতাসি বাগ্‌দেবী দয়স্বমাত
র্বিধেহি বিঘ্নাধিপ মঙ্গলানি।

মর্ম্মার্থ :—স্বজনবর্গ জয়ী হউন, প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক, হে দেবগণ! আমি সকলকে স্মরণ করিতেছি, হে জননী সরস্বতী! তোমাকে স্তব করিতেছি, দয়া বিধান কর। হে বিঘ্নেশ্বর! (গণনাথ বা গণপতি) আপনি সকল বিঘ্ন নিরাকরণপূর্ব্বক মঙ্গল বিধান করুন। এই প্রার্থনাবলী আলোচনা করিলে মনে হয় সর্ব্বদেব প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ-মন্দিরে রাজা পুরুষোত্তম উপস্থিত থাকিয়া দেবতাগণকে বন্দনা করিতেছেন। অতএব পুরুষোত্তমদেবকে সনাতনী হিন্দু বলিলে কোনও অত্যুক্তি হয় না। "কুশলং প্রজানাং"—প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক—এই প্রার্থনা হইতে সূচিত হয় পুরুষোত্তমদেব রাজা ছিলেন।

মহারাষ্ট্র ভাষানিবদ্ধ কবি-চরিতাখ্য গ্রন্থে ব্যক্ত আছে—"পুরুষোত্তমঃ কলিঙ্গদেশ মহীপতিঃ শালিবাহন শকাব্দ চতুর্দ্দশশতক আসীৎ। কটকাভিধানং নগরং চ তদ্রাজধানী বভূব। স চ ওড়িষ্যাক্ষত্রিয় আসীৎ। তেনৈব ত্রিকাণ্ডশেষ, হারাবলী, একাক্ষরকোষ ইতি গ্রন্থত্রয়ং স্বদেশীয় পাঠশালোপযুক্তং প্রণীতং ইত্যাদ্যুক্তমস্তি।"

কবিচরিতাখ্য গ্রন্থে রাজাপুরুষোত্তমদেব সম্বন্ধে যে কথা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা কত দূর সত্য বা সম্ভব এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হইলে সর্ব্বসাধারণের সন্দেহ মোচন হইবে।

দেশ-বিদেশের কথা

গিরিজাকুমার বসু

সুকবি গিরিজাকুমার বসু মহাশয় গত ১৪ই চৈত্র তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রবীন্দ্র-যুগের শক্তিমান কবিদের ছিলেন অন্যতম। ভারতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে কিরূপ উচুদরের কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন সে পরিচয় তাঁহার 'ধূলি' নামক কাব্যগ্রন্থে মিলিবে।

গিরিজাকুমার ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন হইবার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তিও ছিল প্রচুর। কখনো সম্পাদকরূপে, কখনো বা হিসাবপরীক্ষকরূপে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল তিনি দীপালি পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ভুবনচন্দ্র বিজলী

মেদিনীপুর গোকুলনগর নিবাসী কবি ভুবনচন্দ্র বিজলী গত ২৫শে জানুয়ারী মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইত। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে 'স্বপ্ন-সায়র' নামে তাঁহার একখানি কবিতা-পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছিল। ভুবনচন্দ্র আজীবন বাণীর অর্চনা করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানে ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার কতকগুলি সমস্যা

শ্রীরেণুকা মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নারীজগৎ নূতন প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সমাজে তাহাদের স্থান যে পুরুষেরই সমান তাহা তাহারা বুঝিয়াছে এবং সকলে স্বীকার করিয়াছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে স্ত্রীজাতির এত স্বাধীনতা কল্পনার অতীত ছিল। এই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা বিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগৃতির ফল। তখন হইতেই ভারতীয় রমণী জাগিয়াছে, বুঝিয়াছে যে বাহির-বিশ্বে তাহারা একটি প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারে এবং সেখানেও তাহাদের প্রয়োজন আছে। এখন সাধারণেও বুঝিয়াছে যে কেবলমাত্র শিক্ষিতা নারীরাই জাতির সন্তানদিগের চরিত্র উত্তমরূপে গঠন করিতে পারিবেন।

আজকাল আমরা ভাবি যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার যথেষ্ট হইয়াছে। শিক্ষিতা রমণীর অভা নাই বলিলেই হয়। ১৯১৭ সালে ৬১৫ জন ম্যাট্রিক পাস ও ৫৬ জন গ্রাজুয়েট হইয়াছিল এবং ঠিক ২০ বৎসর পরে প্রায় ইহার দশ গুণেরও অধিক (৫,০৮৩ ম্যাট্রিক, ৮৯২ বি-এ ও বি-এস্‌সি) পাস করিয়াছিল। ইহা হইতেই মনে হয় স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার ও উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু ইহা ভুল। ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট দেখিলে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হয়। ইহার অনুযায়ী ঐ সালের স্ত্রীলোক-সংখ্যার শতকরা মোট ২·৬১ জন শিক্ষালাভ করিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষার আরও বিস্তার আবশ্যক। ভারতে কতকগুলি বাধা-বিঘ্নের জন্ত ইহার ঠিকমত উন্নতি হইতে পারিতেছে না।

এখন প্রথম সমস্যা হইতেছে উত্তমরূপে স্ত্রীশিক্ষার তত্ত্বাবধান করা। যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আছে তাহা যথাযথ ভাবে পরিচালিত হয় না। দক্ষ তত্ত্বাবধান-কারীর অভাবেই ইহা হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতিই নিজেদের শিক্ষা ব্যাপার অতি সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করিতে পারিবেন। নিজেদের সুবিধা-অসুবিধা নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু দেখা যায় কেবলমাত্র পঞ্জাব প্রদেশ ভিন্ন অন্ত কোনও প্রদেশে ডেপুটি ডিরেক্‌ট্রেস নিযুক্ত করা হয় নাই এবং সমস্ত ব্রিটিশ-ভারতে মোট ১৪১ জন ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস * আছেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে প্রায়ই পুরুষদিগের দ্বারা তত্ত্বাবধান হইয়া থাকে। অন্যান্ত কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন না, সময়ও পান না এবং তাহার সমস্যাও বুঝিতে পারেন না। কোন রূপে দায়সারা ভাবে নিজের কাজ করিয়া থাকেন। ইহার উন্নতির কোনও চেষ্টাই তাঁহাদের দ্বারা হয় না। ফলে বালিকা বিদ্যালয়গুলি বালক বিদ্যালয়েরই অনুরূপ হইয়াছে ও অধিকাংশ বিদ্যালয়ই বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যেক প্রদেশে বিদ্যালয়ের তত্ত্বা-বধানের জন্ত ডেপুটি ডিরেক্‌ট্রেস এবং পরিচালনার জন্ত যথেষ্ট ইনস্পেক্‌ট্রেস নিযুক্ত করা আবশ্যক।

ইহা ছাড়াও আমাদের দেশের বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষয়িত্রীর সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। প্রচুর পরিমাণে শিক্ষয়িত্রী এখনও আমরা দেখিতে পাই না। অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলাই শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। ইহার জন্ত একটি প্রধান কারণ হইতেছে, অনেকেই নিজ গৃহ হইতে বেশী দূরে যাইতে চাহেন না এবং একাকী যাওয়ায় অনেক বাধাবিঘ্ন আছে। আবার শিক্ষক হইতে শিক্ষয়িত্রীদিগের মাহিনাও বেশী। এই সব নানা কারণে আমাদের দেশে শিক্ষকতা কার্য্যের জন্য শিক্ষয়িত্রীর অভাব রহিয়া গিয়াছে।

এর পর আর্থিক সমস্যা। দেখা গিয়াছে যে, পুরুষ-দিগের শিক্ষার জন্ত যাহা ব্যয় করা হয় তাহার প্রায় ১৬·৫ স্ত্রীশিক্ষায় ব্যয় করা হয়। হার্টগ কমিটি বলিয়াছেন যে ভারতীয় শিক্ষাধারার উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। দুঃখের বিষয় ইহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট যদিও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পক্ষপাতী তথাপি আর্থিক সঙ্কটের দরুন কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।‡ আরও দুঃখের বিষয় এই যে শিক্ষা-ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করিবার সময় কর্ত্তৃপক্ষেরা বালকদিগের শিক্ষার প্রতিই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখেন। বালিকাদের শিক্ষার প্রতি তাঁহারা খালি মৌখিক সহানুভূতিই* দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অর্থ সাহায্য করিতে নারাজ। ১৯৩৬ সালের Central Advisory Board-এর Women's Education Committee অনু-মোদন করেন যে পাবলিক ফাণ্ডের অর্থে প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষার দাবি প্রথমেই থাকা উচিত।† কিন্তু এখনও কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।

তাহার পর প্রধান সমস্যা শিক্ষার অপচয়। ইহা সব-চেয়ে বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে। প্রাথমিক শিক্ষায় চতুর্থ শ্রেণীর পরীক্ষা পাস না করিলে শিক্ষা অর্থহীন‡ কিন্তু দেখা যায় যে ভারতে প্রায় শতকরা ১৫ জন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে অর্থাৎ শতকরা ৮৫ জনের শিক্ষার অপচয় হয়। আমাদের অর্থসঙ্কট এবং উপযুক্ত পাঠ্য বিষয়ের অভাব ইহার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী। তাহার পর ইহাও দেখা যায় যে স্ত্রীজাতির ছাত্রীজীবন পুরুষজাতির ছাত্রজীবন অপেক্ষা অনেক কম, কারণ গৃহে নারীর প্রয়োজন বেশী। অধিকাংশ পিতামাতাই তাঁহাদের কন্যাকে কৈশোর অবস্থায় বিদ্যালয়ে রাখিতে ইতস্ততঃ করেন। বালিকাদিগের বিবাহের বয়স বালকদিগের অপেক্ষা শীঘ্র আসে। সেইজন্ত অনেক সময় পিতামাতা নিজ কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা গৃহ-কর্ম্মে সুদক্ষ করিয়া তুলিতে চাহেন—এই জন্ত অধিকাংশ বালিকারাই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দূরে থাকুক এমনকি প্রাথমিক শিক্ষাও সম্পূর্ণ হয় না। এই বিষয়ে পিতামাতাদিগের বুঝা উচিত যে যত দিন না কন্যার বিবাহ হয় তত দিন তাহারা যেন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে।

---

* ভারতীয় শিক্ষার পঞ্চবার্ষিক একাদশ রিপোর্ট—দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২৫১-২৫৩।

* ভারতীয় শিক্ষার পঞ্চবার্ষিক দশম রিপোর্ট—প্রথম ভাগ—পৃষ্ঠা ১৬৪

† ১৯৩৬ সালের উইমেন্‌স এডুকেশন কমিটির রিপোর্ট—পৃষ্ঠা ৪

‡ হার্টগ কমিটির রিপোর্ট—পৃষ্ঠা ৪৫

অনেকে নিজ ইচ্ছাসত্ত্বেও কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে দ্বিধা করেন। তাহার জন্ত বিস্তালয়ের শিক্ষাপ্রণালীও অনেকটা দায়ী। যে ধারায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। এই শিক্ষা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক। ইহা ভারতীয় সমাজের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতির বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, যে শিক্ষা বিস্তালয় হইতে ছাত্রীরা পাইয়াছে তাহা তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনে ক্ষতিকর হইয়াছে। ইহার কারণ তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলিতে বালক-বিস্তালয়ের হুবহু নকল করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্ত উভয়েরই শিক্ষাপ্রণালী এক রকম হইতে পারে কিন্তু তাহার পর বিভিন্ন হওয়া চাই। ইহা বুঝা উচিত যে বালিকাদের শিক্ষার একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং স্ত্রীজাতি ঐ বৈশিষ্ট্য হারাইলে সমাজ ও জাতি উভয়েরই অমঙ্গল।

মাধ্যমিক শিক্ষা হইতে বালিকাদিগকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ভারতীয় শিল্পকলা, সঙ্গীত, সূচীশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত। অধ্যাপক কার্ভের বিশ্ববিস্তালয় এবং দিল্লীর লেডী আরউইন কলেজে স্ত্রীশিক্ষা যাহাতে ভারতীয় জীবনের উপযোগী হইয়া উঠে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। পুরুষের শিক্ষা চাকরীর জন্ত হইতে পারে কিন্তু স্ত্রীর শিক্ষা মানসিক ও সাংসারিক উন্নতির জন্য। শিক্ষিতা ভারতীয় মহিলার কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠিন। তাঁহারাই জাতির ভবিষ্যৎ সন্তানদিগকে গড়িয়া তুলিবেন। ভারতের জাতীয় এবং সামাজিক উন্নতি তাঁহারাই করিতে পারিবেন।

বালিকা বিস্তালয়ের অভাবের দরুণ অনেকে নিজ কন্যাকে বিস্তালয়ে পাঠাইতে পারেন না—কারণ তাঁহারা সহশিক্ষার পক্ষপাতী নহেন। বালিকা বিস্তালয় যতগুলি আছে তাহা হইতে তাহার চাহিদা অধিক। এইজন্য অনেকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কন্যাকে বালক বিস্তালয়ে অধ্যয়ন করাইতে বাধ্য হন। ১৯৩৭ সালে শতকরা ৪৩'৪ জন বালিকা, বালক বিস্তালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে।* যে সব স্থানে বালিকাদিগের পৃথক বিস্তালয় নাই সেখানে বাধ্য হইয়াই সহশিক্ষার ... করিতে হয় এবং করা উচিত। এই সহশিক্ষা লইয়া ... তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষায় সহশি... ক্ষতিকারক হয় না, মাধ্যমিক শিক্ষায় ক্ষতিকারক হইয়া থাকে।

কৈশোর অবস্থার আরম্ভেই শারীরিক ও মানসিক বিশ্রা... দরকার। পরীক্ষার গুরুচাপ ও বালকদিগের সহিত প্রতি-যোগিতা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। বালক ও বালিকাদিগে... চিন্তাধারা নানা ভাবে বিস্তৃত হয়। একই ক্লাসে উভয়কে শিক্ষা দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠে, কারণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে ... রকমের উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই সময়ে তাহাদিগকে নিজ নিজ বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র অনুযায়ী শিক্ষিত করিতে হয়। ভারতে সহশিক্ষার প্রবর্ত্তন যদিও করা হইয়াছে তথাপি ইহা... দিগকে অবাধে মেলামেশা করিতে দেওয়া হয় না—উভয়কে পৃথক পৃথক রাখা হয়। ফলে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে পারে না এবং বালিকাদিগের যেরূপ শিক্ষার আবশ্যক তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না।

এইগুলিই হইল ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার কতকগুলি সমস্যা। যত দিন পর্য্যন্ত প্রচুর বালিকা বিস্তালয় স্থাপন, অর্থসঙ্কট দূর এব... পাঠ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তন না হয় তত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার শী... উন্নতি হইবে না। কিন্তু গত ২৫ বৎসরের মধ্যে ইহার ... উন্নতি দেখা গিয়াছে তাহাতে ইহার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ আমরা কল্পনা করিতে পারি। ধীরে ধীরে আমাদের দেশে সাধারণে... মনে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে মতবাদ ছিল তাহা চলিয়া যাইতেছে; তাহারা ইহার প্রয়োজন বুঝিয়াছে এবং শিক্ষিতা রমণীগণ বুঝিয়াছে যে দেশবাসী হিসাবে তাহাদের কর্ত্তব্য পুরুষদিগে... চেয়েও অধিক। আজকাল ভারতের কয়েকটি প্রদেশে ... সম্প্রদায়ের ভিতর স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। কোচি... এবং ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশে শতকরা ৩৪ জন মহিলা শিক্ষিতা; বরোদা ও কুর্গ প্রদেশে প্রতি তিন জন শিক্ষিত পুরুষে ১ জ... শিক্ষিতা মহিলা; এবং পার্শীদিগের ভিতর প্রায় শতকরা ৭... জন মহিলা শিক্ষিতা। ইহা হইতেই আশা করা যায় ... স্ত্রীশিক্ষা সমগ্র ভারতে ও সমস্ত সম্প্রদায়ে শীঘ্রই বিস্তার লা... করিবে।

* ভারতীয় শিক্ষার পঞ্চমবার্ষিক একাদশ রিপোর্ট - প্রথম ভাগ—পৃষ্ঠা ১৫৫।

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

একেশ্বরের মানসপুত্র ঈশার আশিষ ডালি,
তাহারি প্রেমের দিশারী তুমি যে দিশাহারা পৃথিবীর।
প্রমিথিউসের প্রথম অনলে আনিলে সমিধ জ্বালি,
সেই হোমানলে হ'ল নির্ম্মল বরণ শীর্ষানীর।

তুমি সে ঈশার শুভ মনীষার ভগীরথ সত্তম
আনিলে বাজায়ে বিজয়-বিষাণ জ্বালায়ে আরতি শিখা
খ্রীষ্ট প্রেমের ভাগীরথীধারা উজান প্রবাহ সম,
তোমারে নিখিল-ভারত লিখিল সুস্বাগত লিখা।

হে দীনবন্ধু! এ দীন বঙ্গে মাটিতে অঙ্গ মেলে
সুরুচি মাতারে ত্যজিয়া চাহিলে দুখিনী সুনীতি মারে,
হে ধ্রুব সাধক উত্তানপাদ রাজার প্রাসাদ ফেলে
থত নামিলে শ্যামলে ও নীলে শান্তিকেতন দ্বারে।

তীব্র রবির রশ্মিতে যবে ঝলমল করে বিশ্ব,
ঢালি স্নেহধারা স্নিগ্ধ করিলে শারদ বারিদ নিঃস্ব।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৫শ ভাগ ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সানফ্রান্সিস্কো

সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলন নির্দ্ধারিত দিবসেই আরম্ভ হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। যুদ্ধের তিন প্রধান নায়কের মধ্যে রুজভেল্ট মারা গিয়াছেন, চার্চিল ও ষ্টালিন সানফ্রান্সিস্কোতে আসেন নাই। সম্মেলনে সমবেত বড় নেতাদের মধ্যে ছিলেন একমাত্র মলোটোভ, তাঁহার প্রস্থানে এবার উহা ছোট ও মাঝারি একদল রাজনীতিকের প্রাথমিক আলোচনার ক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হইবে। যে শ্রেণীর রাজনীতিবিদেরা সেখানে রহিলেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই প্রতিটি গুরুতর ব্যাপারে নিজ নিজ গবর্ণমেণ্টের উপদেশের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হইবে। সম্মেলনের গুরুত্ব ইহাতে অনেক কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই, অযথা সময়ও অনেক নষ্ট হইবে।

সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের উপর এশিয়াবাসী আস্থা রাখিতে পারিতেছে না। ভের্সাই বৈঠকের ন্যায় এখানেও যে সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারাই প্রধান লক্ষ্য তাহা ধীরে ধীরে ধরা পড়িতেছে। এই সম্মেলনের প্রথম ত্রুটি এই যে, এখানে বিজিত জাতির কোন প্রতিনিধি তো রহিলই না, নিরপেক্ষ দেশগুলিও এখানে আমন্ত্রিত হয় নাই। নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে যাহারা জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে শুধু তাহারাই সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইয়াছে। আমন্ত্রিত দেশগুলির মধ্যেও আবার ছোট-বড় ভাগ করা হইয়াছে। ইউরোপের বারুদস্তূপে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ যে পোলাণ্ড তাহার প্রতিনিধিত্ব এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। রাশিয়ার সহিত ব্রিটেন ও আমেরিকার পূর্ণ মতৈক্যের পরিচয়ও দেখা যায় না। সর্ব্বোপরি এশিয়া ও আফ্রিকার যে বিপুল জনসঙ্ঘ আজও এই বিজেতা শক্তিদেরই পদানত হইয়া রহিয়াছে তাহাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে সে সম্বন্ধে কোন কথা আজও উঠে নাই। মলোটোভ সঙ্কুচিত চিত্তে মাঝে মাঝে পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার ক্ষীণ সুর সহজেই ধরা পড়ে।

সানফ্রান্সিস্কো হইতে বিশ্বের নিপীড়িত জনসাধারণের আশা করিবার কিছু নাই, ইহা পৃথিবীর মনীষিবৃন্দ তো বুঝিয়াছেনই, সাধারণ লোকেও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। সানফ্রান্সিস্কোতে বিশ্বশান্তির চার্টার রচিত হইবে না, স্বাক্ষরিত হইবে তৃতীয় মহাযুদ্ধে কোটি কোটি লোকের মৃত্যুর পরোয়ানা এ আশঙ্কা অনেকেই করিয়াছেন; মহাত্মা গান্ধী ত উহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। রুজভেল্ট-পত্নীর নিকট প্রেরিত এক তারবার্ত্তায় গান্ধীজী তাঁহার স্বামীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ঐ সঙ্গে ইহাও তিনি বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে যে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতে হইল না ইহার জন্য রুজভেল্ট-পত্নীকে তিনি ভাগ্যবতী মনে করিতেছেন। শ্রীমতী রুজভেল্ট অবশ্য প্রত্যুত্তরে গান্ধীজীকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার এই আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইবে। গান্ধীজী কেন, ভারতবর্ষের ৪০ কোটি লোক ইহাতে অবশ্য আশ্বস্ত হইতে পারিবে না।

সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে গিয়াছেন এমন দুই ব্যক্তি যাঁহারা দাসত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজের পূর্ণ আস্থা অর্জন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সর ফিরোজ খাঁ নূনের সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, ইঁহার নির্লজ্জতা ও অসত্যভাষণের অভ্যাস সর্বজনবিদিত। সানফ্রান্সিস্কো যাত্রার প্রাক্কালে লণ্ডনে সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীদের বৈঠকে "ভারতবর্ষ ইংরেজের নাকের ডগায় তাহার অজ্ঞাতসারেই ডোমিনিয়ম হইয়া পড়িয়াছে" বলিয়া যে দম্ভোক্তি করিয়াছিলেন ব্রিটিশ সংবাদপত্রই তাহাকে buffoonery আখ্যা দিয়াছিল। তারপর সানফ্রান্সিস্কোতে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের প্রেস কনফারেন্সে ষ্টেনোগ্রাফার পাঠাইয়া গোলমালের চেষ্টায় তাঁহারই হাত বিশেষভাবে ছিল ইহাও পরে ধরা পড়িয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে যে হীন ব্যঙ্গোক্তি তিনি করিয়াছিলেন তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী বার্ণার্ড শ। এই ব্যক্তির কার্য্যকলাপে ভারতবাসীর লজ্জার কোন কারণ নাই, চুণ-কালি পড়িয়াছে তাঁহাদেরই মুখে যাঁহারা ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

সর রামস্বামী মুদালিয়ারের ব্যক্তিগত যোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তিনি ভারতবাসীর প্রতিনিধি নহেন ইহা অবশ্যই আমরা বলিব। মাদ্রাজের যে একটি ক্ষুদ্র দল কংগ্রেসের অনুপস্থিতির সুযোগে পরিষদে কর্তৃত্ব করিয়াছে তিনি সেই জাষ্টিস পার্টির লোক, সরকারের প্রিয়পাত্র, দেশবাসীর শ্রদ্ধা তিনি লাভ করেন নাই। তাঁহার দীর্ঘ কর্ম্মজীবনে দেশের কোন উন্নতি কখনো হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি; বরং অনিষ্টই যথেষ্ট হইয়াছে। ইঁহাকে সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা কমিটির চেয়ার-

ম্যান মনোনীত করিতে দেখিয়াও আমরা আশঙ্কা করিতেছি যে এই কমিটির কোন কাজ থাকিবে না, তাই ভারতের এক নগণ্য রাজনৈতিক দাসকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে; অথবা ভারতবর্ষ হইতে U.N.R.R.A-এর ন্যায় একটা মোটা টাকা আদায় করিবার জন্য ভারত-সরকারের শাসন-পরিষদের এই কাষ্ঠপুত্তলিকে রঙ্গমঞ্চে যোজনা করা হইয়াছে। নিরাপত্তা কমিটিতে নরওয়েকে সভাপতি করিবার অর্থ বোধগম্য হয়; এই দেশটি ক্ষুদ্র হইলেও বিশ্ববাসীর সেবায় ইহা কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে আত্মরক্ষার ভার ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হউক, বৃহৎ শক্তিপুঞ্জ ন্যায়ের পক্ষে থাকিবেন এই মনোভাবের দ্বারা চালিত হইয়া যদি নরওয়েকে উক্ত কমিটির সভাপতি করা হইয়া থাকে তবে তাহা সমর্থনযোগ্য হইবে। পূর্ব কমিটিটির ন্যায় নরওয়েকেও শিখণ্ডী খাড়া করা হইয়াছে কি না যথাসময়ে তাহা ধরা পড়িবে।

সানফ্রান্সিস্কোতে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধি কাহারও স্থান হয় নাই সত্য, কিন্তু বৈঠকের বাহিরে বিশ্ববাসী ভারতবর্ষের মর্মবাণী শুনিতে পাইয়াছে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর বক্তৃতায়। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি স্মারক-লিপি তৈরি করিয়া উহা প্রচারের জন্য সরকারী প্রতিনিধিদের হাতে দিয়াছিলেন তাঁহারা উহা প্রচার করিতে অস্বীকার করিয়াছেন কারণ না করিয়া উপায় নাই। স্মারকলিপির নকল সম্মেলনে সমবেত সকল প্রতিনিধিকেই দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সোপানস্বরূপ ক্রিপস প্রস্তাব খোলা আছে বলিয়া মিঃ ইডেন যে উক্তি করিয়াছিলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী সে সম্বন্ধে সানফ্রান্সিস্কোয় সমবেত সকলকে জানান যে উহা ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের অতি পুরাতন ও মামুলি যুক্তির পুনরাবৃত্তি মাত্র। তিনি বলেন, "এই সম্পর্কে শুধু দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, জাতীয় কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতি ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল ক্রিপস্ প্রস্তাব গ্রহণ না করায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে উহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ত্রুটি রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পাইকারী ভাবে সহস্র সহস্র কংগ্রেস-নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া এবং তাঁহাদিগকে বিনাবিচারে আটক রাখিয়া ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টই অচল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা না করিলে ভারতীয়দের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়ত সম্ভব হইত।"

কালিফোর্নিয়ার গবর্ণর শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীকে উক্ত ষ্টেটের আইন সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। রয়টারের প্রতিনিধির নিকট শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলেন, "কালিফোর্নিয়া প্রতিনিধিমণ্ডলীর নিকট ভারতের স্বাধীনতার দাবি ব্যাখ্যা করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" ভারতীয় নরনারীদের মধ্যে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীই সর্বপ্রথম এইরূপ সম্মানের অধিকারী হইলেন।

অর্দ্ধেক পৃথিবী পরাধীন থাকিতে জগতের স্থায়ী শান্তি অসম্ভব, বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে ভারতবাসীর এই ধারণার কথা জানাইয়া শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছেন, "এখানকার সমবেত রাজনৈতিকগণ স্থায়ী শান্তির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিলেই তাঁহারা যথাযথ মিত্রপক্ষের বিজয়োৎসব পালন করিবেন। যদি আন্তর্জাতিক সুবিচারের নীতি স্বীকৃত হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশকে স্বাধীনতা দিয়া ঐ নীতি কার্যকরী করা হয় কেবল তবেই শান্তি আসিবে। এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ইহাই সুস্পষ্ট শিক্ষা যে পৃথিবী অর্দ্ধেক স্বাধীন, অর্দ্ধেক পরাধীন থাকিতে পারে না। স্বভাবতই আমার ভারতবর্ষের কথা মনে পড়ে; ইহা শুধু ব্রিটেনের নহে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য জগতের এক বিরাট্ প্রশ্ন হইয়া থাকিবে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও সম্মান প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের সত্যই আছে কিনা ভারতবর্ষ দিয়া তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ভারতীয় সৈন্যেরা তাহাদের অংশ গ্রহণ করিয়াছে—ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের জন্য তাহারা রণক্ষেত্রে লড়াই করিয়া প্রাণ দিয়াছে। এই আশাই করা যাউক যে, তাহারা গণতন্ত্রের নামে বৃথাই সংগ্রাম করে নাই এবং ভারতবর্ষ শীঘ্রই পৃথিবীর স্বাধীন ও সার্বভৌম গণতান্ত্রিক জাতিসমূহের মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান লাভ করিবে।"

পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার দাবি স্বীকার না করিলে স্থায়ী শান্তি দুরূহ হইবে মলোটোভও এশিয়া ও আমেরিকাবাসীর এই দাবিই সমর্থন করিয়াছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রিটিশ ও মার্কিন অছিগিরির প্রশ্নে মঃ মলোটোভ বলেন, "আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থেই আমাদের সর্বপ্রথম এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে পরাধীন দেশগুলি যথাসম্ভব শীঘ্র জাতীয় স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে পারে। মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের এক বিশেষ প্রতিষ্ঠান দ্বারা ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—বিভিন্ন জাতির সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ দ্রুত কার্যে পরিণত করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এই প্রতিষ্ঠানকে কাজ করিতে হইবে। সমগ্রভাবে এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনায় সোভিয়েট প্রতিনিধিরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে।"

ভারতের প্রতিনিধিরূপে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বৈঠকের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার পান নাই বটে, কিন্তু তাঁহার মুখে পরাধীন দেশের মুক্তির যে বাণী ধ্বনিত হইতেছে তাহা উপেক্ষিত হয় নাই; বিশ্বের প্রকৃত শান্তিকামী রাষ্ট্র ও নেতারা তাহা সমর্থন করিবেনই।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট

উডহেড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের জন্য কমিশন বাংলা-সরকার এবং ভারত-সরকার উভয়কেই দায়ী করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে চেষ্টা করিলে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা যাইত। এই দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফল নহে, গবর্ন্মেণ্টের অযোগ্যতা এবং এক শ্রেণীর লোকের অর্থগৃধ্নুতা দুর্ভিক্ষের মূল কারণ জনসাধারণের এই অভিযোগ স্বীকার করিয়া কমিশন বলিয়াছেন খাদ্যাভাব অপেক্ষা মূল্যবৃদ্ধিতেই বহু লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষের গোড়ায়, মধ্যে ও শেষে কোন সময়েই বাংলা-সরকার অতি সাধারণ বুদ্ধি, বিবেচনা, কর্তব্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। দুর্ভিক্ষ আসিতেছে ইহা বুঝিয়াও তাঁহারা নিজেরা সতর্ক হন নাই, দেশবাসীকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,

দুর্ভিক্ষের সংবাদ যথাসময়ে প্রচার করিয়া সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া সংবাদ চাপিয়াছেন, যেখানে কণ্ট্রোল অত্যাবশ্যক সেখানে উহা তুলিয়া দিয়া অর্থপিশাচ ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠনের পথ খুলিয়া দিয়াছেন, বাহির হইতে খাদ্য আসিলে উহা বুঝিয়া লইয়া মফস্বলে পাঠাইতে পারেন নাই, গ্রামের লোককে অসহায় ভাবে মরিতে দিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে শ্বেতাঙ্গ মিল-মালিকদের চাউল সরবরাহ করিয়াছেন, লাখে লাখে লোক যখন মরিতে আরম্ভ করে টাকার অভাবের দোহাই পাড়িয়া তখনই সাহায্য দান কমাইয়াছেন, যথেষ্ট পরিমাণ মুসলমান দোকানদার ও কর্মচারী জোটে নাই বলিয়া রেশনিং আরম্ভ করেন নাই। রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নাই, এমন কি মৃত্যুর হিসাবটাও রাখা প্রয়োজন বোধ করেন নাই—কমিশনও এইগুলি স্বীকার করিয়াছেন। স্যর জন হার্বার্ট ও ইউরোপীয় দলের চক্রান্তে অকর্মণ্য, অপদার্থ ও ঘুষখোর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রীতদাসদের উপর এই চরম দুর্দিনে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পড়িয়াছিল, ভারত-সরকার এবং ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট উভয়েই তাহাদের প্রতিটি কার্য সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। যে ষ্টেটসম্যান দুর্ভিক্ষের ছবি ছাপিয়া ও সংবাদ প্রচার করিয়া সাংবাদিক কর্তব্য মাত্র পালন করিয়াছিলেন এবং সর্বদা ইহার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা দাবি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে লিখিত বহু মন্তব্যের মধ্যেও মন্ত্রীদলের বিরুদ্ধে একটি কথাও কখনো লেখেন নাই, তিক্ত সমালোচনা অপরিহার্য হইয়া উঠিলে দূরস্থিত আমেরী সাহেব এবং ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছেন। ভারত-সরকার এবং বাংলাদেশের ঐ সময়কার প্রকৃত ভাগ্য-নিয়ন্তা ইউরোপীয় দলের এই কার্যকে নির্বুদ্ধিতা অথবা শয়তানী আখ্যা দেওয়া উচিত কি না ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহার বিচার করিবে। কমিশন এ সম্বন্ধে পরিষ্কার মত দেন নাই, তবে অন্যান্য প্রদেশের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বাংলা-সরকারের মারাত্মক ভুল সমর্থন করিয়া ভারত-সরকার অন্যায় করিয়াছেন, কমিশন ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

সরকারী লোক লইয়া গঠিত কমিশনের উপর আমাদের আস্থা কখনও ছিল না, এখনও নাই। উডহেড কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে যে-সব তথ্য মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন সম্পূর্ণ বে-সরকারী লোক লইয়া কমিশন গঠিত হইলে তাহারই উপর রিপোর্ট আরও গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ হইত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। বাংলা-সরকার কর্তৃক অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কণ্ট্রোল তুলিয়া দেওয়া এবং চাউল সংগ্রহের দায়িত্ব নিজেরা না লইয়া মনোনীত ব্যবসায়ীদের হাতে উহা অর্পণ করা অতি মারাত্মক ভুল হইয়াছে বলিয়া কমিশন স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু উহাতে কাহারা লাভবান হইয়াছে এবং তাহাদের সহিত গবর্মেণ্টের যোগাযোগ কতখানি ছিল কি ছিল না সে সম্বন্ধে তাঁহারা কোন অনুসন্ধান করেন নাই। অথচ তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন দুর্ভিক্ষের কয় মাসে ব্যবসায়ীরা ১৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে এবং প্রতি হাজার টাকা লুঠ করিতে গিয়া ইহারা একটি করিয়া লোকের মৃত্যু ঘটাইয়াছে।

কমিশন ও ভারত-সরকার

কমিশন ভারত-সরকারের ত্রুটির সমালোচনা করিয়াছেন কিন্তু ভারতসচিব মিঃ আমেরী সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। দুর্ভিক্ষে এই ব্যক্তির দায়িত্ব কম নয়। যুদ্ধক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বাংলায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়াও এই ব্যক্তি বড়লাটকে বাংলায় আসিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণে মনোযোগী হইবার জন্য আদেশ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা হইতে গম পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল—ভারতবাসী ইহা তখনও বিশ্বাস করে নাই, আজও করিবে না। বাংলায় খাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধে সমস্ত প্রদেশ একমত হইতে পারিতেছে না ইহা দেখিয়া আন্তঃপ্রাদেশিক সরবরাহ কমিশন গঠন করিবার জন্য বড়লাটকে আদেশ দেওয়া তাঁহার উচিত ছিল। তিনি তাহা করেন নাই। ব্রিটেন ও আমেরিকার জনসাধারণকে দুর্ভিক্ষের সংবাদ জানাইয়া তথা হইতে সাহায্য প্রেরণের বন্দোবস্ত করা তাঁহার কর্তব্য ছিল, তাহা না করিয়া তিনি ভারতের বাহিরে সংবাদ প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র সাফাই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। অথচ তিনিও জানেন ভারতবাসীও জানে এই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কি বস্তু। সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থ যেখানে জড়িত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের লেশমাত্র মর্যাদা সেখানে থাকে না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাট। দৃশ্যত: পাট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তালিকার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু কার্যত: শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থে ভারত-সর-কারের আদেশে পাট বপন, পাট বিক্রয় ও পাটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এখানে মন্ত্রী, ব্যবস্থা-পরিষদ বা পাটচাষী কাহারও কথা থাকে না, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বজায় থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে প্রদেশের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদী যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হয়। ইংরেজের স্বার্থ যেখানে নাই সেখানেই আমেরী হইতে সুরু করিয়া টম ডিক হ্যারি পর্যন্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মর্যাদাহানিতে একান্ত কুণ্ঠিত। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে মন্ত্রীদল সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসাধনের ভারবাহী ভিন্ন আর কিছু নহেন।

দুর্ভিক্ষের মূল ও প্রধান দায়িত্ব যাঁহার সেই স্যর জন হার্বার্ট পরলোকে। মৃতের প্রতি সম্মান দানে ভারতবাসী কখনও কুণ্ঠিত নয়, ব্যক্তিগতভাবে স্যর জনের স্মৃতির অসম্মান ভারতবাসী করিবে না। কিন্তু ১৯৪৩ সালের বাংলার গবর্ণরকে বাঙালী কখনও ভুলিতে পারিবে না, তাঁহার কার্যের সমালোচনাতেও তাহারা বিরত হইবে না, কারণ ভবিষ্যতের সতর্কতার জন্য এই গবর্ণরের কৃত কার্যের সমালোচনা একান্ত আবশ্যক। হিটলারও আজ পরলোকে, ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও রোষের ঊর্ধ্বে; কিন্তু তাই বলিয়া বোমাবিধ্বস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিটেন নাৎসী নায়কের কৃত কার্যের সমালোচনা করিবে না ইহা অস্বাভাবিক। নাৎসী বোমায় ব্রিটেনে যত লোক মরিয়াছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ১৯৪৩ সালের বাংলার গবর্ণরের দোষে বাংলায় তার দশ গুণ লোক মরিয়াছে এবং বাস্তুভিটা হইতে উৎখাত হইয়াছে। উড-হেড কমিশন দুর্ভিক্ষের জন্য প্রধানত: দায়ী এই গবর্ণরের কৃত কার্যের সমালোচনা উপযুক্তভাবে করেন নাই দেশবাসী দুঃখের সহিত ইহা লক্ষ্য করিবে।

প্রাণের বিনিময়ে হাজার টাকা লাভ

উডহেড কমিশন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন দুর্ভিক্ষের সময় ব্যবসায়ীরা ১৫০ কোটি টাকা লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ এক একটি মানুষ মারিয়া ইহারা হাজার টাকা করিয়া পকেটে পুরিয়াছে। কমিশন স্বীকার করিয়াছেন যে ইহাদিগকে দমন করিবার দাবি গবর্মেণ্টকে জানান হইয়াছে, দমনের অক্ষমতার জন্ম গবর্মেণ্টকে দোষী করা হইয়াছে তথাপি গবর্মেণ্ট কিছু করিতে পারেন নাই। কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করিলে এই অতিলাভ বন্ধ করা যাইত ইহা মানিয়া লইয়াও কমিশন মন্ত্রীদের বাঁচাইয়া দিয়া বলিতেছেন, "জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন ইহা সম্ভব ছিল না, এবং লোকের সাহায্য পাওয়া যায় নাই।" দেশবাসী জানে কমিশনের এই উক্তিতে সত্যের লেশমাত্র নাই। ইউরোপীয় দল-নিরপেক্ষ মেজরিটি থাকিতেও প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক শুধু সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনের জন্ম সর জন হার্বার্টের হাতে পদত্যাগ পত্র তুলিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রগতিশীল নেতাদের দিক হইতে সহযোগিতা আসে নাই ইহা সর্বৈব মিথ্যা। নাজিম মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পর ইঁহারাই গবর্ণর ও শ্বেতাঙ্গদলের ভরসায় সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা গঠনে অনিচ্ছুক হন। ঘুষ, চুরি ও অতিলাভ ইঁহাদেরই সমর্থনে অবাধে চলিতেছে ব্যবস্থা-পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে বহুবার প্রকাশ্যে এই অভিযোগ উঠিয়াছে, গবর্নর বা তাঁহার খাস গবর্মেণ্ট ইহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। আমরা তখনও বলিয়াছি এবং এখনও বিশ্বাস করি অতিলাভ দমনের জন্ম সর জন হার্বার্ট প্রকাশ্য বেত্রদণ্ড ও স্বনামে বেনামে সমগ্র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দিলে এবং ছোট বড় নির্বিচারে নরপিশাচদের এই শাস্তি বিধান করিলে অল্পদিনের মধ্যেই এই ভয়াবহ পাপ দূর হইত এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন তিনি লাভ করিতেন। অত্যাচারী সম্রাট বলিয়া আলাউদ্দীন খলজীর কুখ্যাতি আছে সত্য, কিন্তু অতিলাভ দমনে তাঁহার কীর্তিও ইতিহাসে কাল মেঘের কোলে আলোর রেখার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই যুদ্ধে বাংলা-সরকার অতিলাভ দমনের জন্ম উল্লেখযোগ্য বা বাস্তব কোন চেষ্টাই করেন নাই। বরং সর্বপ্রযত্নে বড় বড় নরপিশাচেরা যাহাতে প্রশ্রয় পায় সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া আসিয়াছেন। সমাজে সর্বশ্রেণীর লোকই আছে। নীতিজ্ঞানবর্জিত লোভীর দল যখন দেখে গবর্মেণ্টই অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা তখন ইহারাই বা অতিলাভে উৎসাহিত হইবে না কেন এবং ইহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা যেখানে নাই দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে সেখানে পাঁচ টাকার চাউল পঞ্চাশ টাকায় না কিনিয়াই বা উপায় কি অথবা কিনিতে না পারিলে মৃত্যু ভিন্ন অন্য পথই বা কোথায়? অন্যায়ের প্রতিবিধানের পথ নাই, অথচ স্বহস্তে প্রতিকার করিতে গেলে দণ্ডের ভয় আছে। এই ভাবে সর্বাঙ্গে শৃঙ্খলিত অসহায় সমাজকে অতিলাভের জন্ম দায়ী করা অন্যায়। উডহেড কমিশনের পক্ষে লাঞ্ছিত দেশবাসীর দৃষ্টিতে এই অতিলাভের মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, কারণ কমিশনের যাঁহারা সদস্য তাঁহাদের সহিত দরিদ্র দেশবাসীর কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই, দেশের আপামর জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের নাড়ীর টানও নাই। এই অতিলাভের লজ্জা সমাজের নয়, লজ্জা তাঁহাদের যাঁহারা সেই চরম দুর্দিনে হাত বাড়াইয়া সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া সমাজসেবার নামে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করিয়াছেন। উডহেড কমিশন সেকথা বলিতে পারে নাই।

দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হিসাব

দুর্ভিক্ষের পর বাংলা-সরকার জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংখ্যা-তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া জানাইয়াছিলেন যে মোট ৬৮৮,৮৪৬ জন মারা গিয়াছে। ভারত-সরকার এই সংখ্যা যাচাই করিয়া দেখিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। মিঃ আমেরী তো উহাকেই অবধারিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পার্লামেণ্টের সদস্যগণকে সানন্দে জানাইয়াছিলেন যে দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা দশ লক্ষও হয় নাই, মোটে ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার লোক মরিয়াছে। জনসাধারণ প্রথমাবধিই এই সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অশিক্ষিত চৌকিদারদের আন্দাজের উপর নির্ভর করে, সুতরাং উহাকে অবধারিত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া বিপজ্জনক। তাহা ছাড়া দুর্ভিক্ষে বহু চৌকিদার মরিয়াছে অথবা গ্রামছাড়া হইয়াছে; ইহাদের আন্দাজী হিসাবটাও পাওয়া যায় নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানে দেখা যায় মৃত্যুসংখ্যা ৩৫ লক্ষ এবং জনসাধারণের ধারণা অর্দ্ধ কোটি লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। উডহেড কমিশন বাংলা-সরকারের হিসাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ বা জনসাধারণের ধারণাও সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের ইহা অভিমত, হিসাব নয়। তাঁহারা ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে অন্ততঃ ৬০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কত জন বাঁচিয়াছে কত মরিয়াছে তাহার হিসাব রাখিবার প্রয়োজন বাংলা-সরকার, ভারত-সরকার বা ভারতসচিব কেহই অনুভব করেন নাই। দুর্ভিক্ষ প্রশমনের পর অন্ততঃ এই হিসাবটা অনায়াসেই রাখা যাইতে পারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগকে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া তাঁহাদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াও বাংলা-সরকার মৃতের হিসাবটা অন্ততঃ সংগ্রহ করিবার একটা আন্তরিক চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। কাজেই আজ মৃতের সংখ্যাটা নিছক অনুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রগতির দিনেও এই ব্যাপারে ১১৭৬ সালের সহিত কোন প্রভেদ আজ রহিল না।

মৃতের সংখ্যা নির্ধারণে কমিশনের একটা গুরুতর ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা দুইটি ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু উহার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, ৩০ হাজারেরও বেশী পরিবারকে যুদ্ধের প্রয়োজনে বাস্তুভিটা হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা বলিয়াছেন, ১৯৪৩-এর ১লা এপ্রিল ১৬৬৫৫টি নৌকা মজুত ছিল। মোট কত নৌকা সরান হইয়াছে অথবা ভাঙিয়া জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা তাঁহারা বলেন নাই। লোকের ধারণা অন্ততঃ ৫০ হাজার নৌকা সরান অথবা ভাঙা

হইয়াছিল। এক একটি নৌকার সহিত অন্যূন তিনটি মাঝি ও ধীবর প্রভৃতি পরিবারের ভাগ্য জড়িত থাকে, একটি নৌকা ধ্বংসের সহিত তিনটি পরিবার নষ্ট হইয়াছে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হয়। একটি গ্রাম্য পরিবারে ৫টি লোক ধরিলেও এই দুই হিসাবে ৫০ ও ৩০ মোট ৮০ হাজার পরিবারের ৪ লক্ষ লোককে গবর্ন্মেণ্ট স্বহস্তে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; দুর্ভিক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপন্ন হইয়াছে ইহারাই এবং ইহাদের মধ্যে ৪ হাজার লোকও বাঁচিয়া ফিরিয়াছে কি না সন্দেহ। তারপর আর কয়েকটি শ্রেণী দুর্ভিক্ষে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহারা ভূমিহীন দিনমজুর বর্গাদার এবং ক্ষুদ্র জোতদার। ইহাদের সংখ্যাও কম নয়। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টেই দেখা যায় ৯ বিঘার কম জমি আছে এরূপ চাষীর সংখ্যাই শতকরা ৫৭; ইহার উপর ভূমিহীন দিনমজুর ও বর্গাদার আছে। এই সব চাষী সংবৎসরের খোরাক তুলিতে পারে না, দুর্ভিক্ষে ইহাদের অধিকাংশই যে বিপন্ন হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। বাংলার চাষীর সংখ্যা মোটামুটি ৪ কোটি, তন্মধ্যে আড়াই কোটিরই যদি এই অবস্থা হয় তবে দুর্ভিক্ষে মাত্র ৬০ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এই হিসাব মানিয়া লইব কোন্ যুক্তিতে? আড়াই কোটির মধ্যে মরিয়াছে মাত্র ১৫ লক্ষ—তার মধ্যে মাঝি ধীবর ও গৃহ-বিতাড়িত লোকই যদি হয় ৪ লক্ষ, এই অনুমান তবে লোকে অভ্রান্ত মনে করিবেই বা কেন?

কমিশন নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে সরকারী সাহায্যদান ব্যবস্থা অত্যন্ত সামান্য ছিল, সেপ্টেম্বরের আগে কোনরূপ সাহায্যই গবর্ন্মেণ্ট দেন নাই এবং সাহায্য যখন সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন তখনই টাকার অভাবের অজুহাতে তাঁহারা সাহায্যের পরিমাণ কমাইয়াছেন। দুর্ভিক্ষে মানুষের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ইঁহারা টাকা ধার করিতে অগ্রসর হন নাই কিন্তু দুর্ভিক্ষের পর চাউলের ব্যবসা করিতে নামিয়া ইঁহারাই ৬০।৬৫ কোটি ধার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ ইহাদেরই প্রিয়পাত্র এজেণ্টদের দ্বারা এই টাকাটা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং বৎসরে ৮।১০ কোটি টাকা করিয়া লোকসানও দেখান গিয়াছে। অতি নগণ্য সরকারী সাহায্যে ৬০ লক্ষের মধ্যে ৪৫ লক্ষ লোক বাঁচিল কেমন করিয়া কমিশন সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, জনসাধারণের ব্যক্তিগত সাহায্য যে ইহার জন্য বহুলাংশে দায়ী তাহারও কোন উল্লেখ করেন নাই।

উডহেড কমিশন ও বাংলা-সরকার

উডহেড কমিশন বাংলাদেশের হার্বার্ট-নাজিম গবর্ন্মেণ্টের অনেকগুলি গুণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম, যে সময়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণই ছিল একমাত্র ভরসা, ঠিক সেই সময়েই নিয়ন্ত্রণ অপসারণ। ফল, মূল্যবৃদ্ধি; ৩রা মার্চ যে চাউলের দর ছিল ১৫ টাকা, ১৭ই মে তাহা চড়িয়া হয় ৩০৸৴০; তারপর আরও দ্রুত বাড়িয়া চলে। ঐ সঙ্গে কমিশন চাউল ক্রয়ের ভার গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক স্বহস্তে না লইয়া ব্যবসায়ী এজেণ্ট নিয়োগের নিন্দাও করিয়াছেন। এই দুই ব্যাপারে যোগাযোগ ছিল কিনা কমিশন তাহা লইয়া মন্তব্য করেন নাই, কিন্তু জনসাধারণ অবশ্যই উহা জানিতে চাহিবে। মূল্য নির্দিষ্ট থাকিলে এজেণ্টদের কমিশন ছাড়া আর কিছু লাভ হইত না, ওজনে চুরি প্রভৃতি বড় জোর উপরিলাভ হইত। কিন্তু মূল্য নিয়ন্ত্রণ অপসারণের ফলে এজেণ্টদের পক্ষে এক সপ্তাহের ১৫ টাকায় কেনা চাউল পরের সপ্তাহে ২০ টাকায় গবর্ন্মেণ্টকে বিক্রয় করা হইয়াছে কিনা তাহা প্রকাশ পায় নাই। এজেণ্টদের নিকট হইতে গবর্ন্মেণ্ট ঠিক কি দরে চাউল কিনিয়াছেন, এজেণ্টের কোন্ দিনের কোন্ মালের কেনা-দর ডেলিভারী দেওয়া মালের কেনা দর বলিয়া চালান হইয়াছে তাহাও জানা যায় নাই। বাংলার বর্তমান বাজেটে দেখিতেছি দুর্ভিক্ষের বৎসরে সরকার মোট ২৮,৫৫,৯৯,৭৪৫ টাকার চাউল কিনিয়াছেন এবং ১৬।০ আনা মণ দরে কর্ণ্ট্রোলে বিক্রয় করিয়া মাত্র ৩,৮৬,৬৩,৭৫৩ টাকা ফেরত পাইয়াছেন। কত মণ চাউল কেনা হইয়াছে, কত মণ বিক্রয় হইয়াছে, কি দরে ক্রয় এবং কি দরে বিক্রয় হইয়াছে ইত্যাদি কোন হিসাবই উহাতে নাই। তারপর হিসাবে আছে ১২,৬৯,৬৬,২৫০ টাকা চাউল ক্রয়ের জন্য আগাম দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৯৪৩-৪৪-এ ফেরত আসিয়াছে মাত্র ১৭,৮৪৩ টাকা এবং পর বৎসর ফেরত আসিবে অনুমান করা হইয়াছে ৮১,৫০,০০০ টাকা। চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাবপত্র অতি গভীর অন্ধকারে এখনও আচ্ছন্ন আছে, কমিশন সে সম্বন্ধে কোন কথা তো বলেনই নাই, ব্যবস্থা-পরিষদের কোন নেতাও এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও আবশ্যক বোধ করেন নাই।

বাংলা-সরকারের দ্বিতীয় কীর্তি কলিকাতার যে শ্বেতাঙ্গ-ভোটের জোরে তাঁহাদের জীবনে এই পৌষ মাস আসিয়াছিল তাহাদের কলকারখানার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গ্রামবাসী হিন্দু মুসলমান দরিদ্র জনসাধারণের সর্বনাশ সাধন। কমিশনের সদস্য সর মণিলাল নানাবতী এবং মিঃ রামমূর্তি বলিতেছেন, "কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে বরাবরই যথেষ্ট খাদ্য ছিল, গুরুতর খাদ্যাভাব সেখানে কখনো হয় নাই; অনেক সপ্তাহ চলিবার মত পর্যাপ্ত খাদ্য কারখানাগুলিতে মজুত ছিল। সুতরাং মফস্বলে বেশী খাদ্য পাঠাইয়া দিলে কলিকাতায় বিন্দুমাত্র অভাব না ঘটিলেও গ্রামের লোকের যথেষ্ট সাহায্য করা যাইত।" বাংলা-সরকার তাহা করেন নাই, ১ লক্ষ ৭১ হাজার টন চাউল ইঁহারা গ্রামের লোককে মরিতে দিয়া বিলাতী কারখানাওয়ালাদের সরবরাহ করিয়াছিলেন। সর মণিলাল আর একটু উগ্রভাবে বলিয়াছেন, "১৯৪৩-এর মার্চ মাসেই জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে বাংলা-সরকার কলিকাতার, বিশেষতঃ উহার বড় ব্যবসায়ীদের, স্বার্থরক্ষার জন্য গ্রামের দাবি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রাম্য জনসাধারণের কথা মনে থাকিলে তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া দিয়া অবাধ ব্যবসা করিতে দিতে পারিতেন না, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আদেশের প্রয়োগ শিথিল করিয়া ও অন্যান্য পন্থা অনুসরণ করিয়া অতিলোভী ও মজুতদারদের উৎসাহ দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন।" দেশবাসী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সাহেবদের স্বার্থরক্ষা এবং গ্রামের লোকের সর্বনাশসাধন বিনা কারণে হয় নাই, ইহা নির্বুদ্ধিতা বা বেবন্দোবস্তের ফল বলিয়াও তাহারা বিশ্বাস করে না, ইহার পিছনে বাঙালীর বিনাশসাধনের গভীরতর প্ল্যান ছিল বলিয়াই তাহাদের

আশঙ্কা। কলিকাতায় বিলাতী বণিককুলের মুখপত্র ষ্টেটসম্যান দুর্ভিক্ষের সংবাদ ও ছবি ছাপিয়া নির্বোধ ও নিরক্ষর দেশে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের অন্তরালে অতি সঙ্গোপনে ঐ মন্ত্রীদলকেই সর্বদা সমর্থন করিয়া গিয়াছে। "জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে" এই কীর্তি করা হইয়াছে বলিয়া সর মণিলাল ইহাদিগকে সন্দেহের যে সুযোগ দিয়াছেন, ইহাদের হাতে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত দেশবাসী তাহাও দিতে চাহিত না।

বস্ত্রাভাবের পুরাতন কাহিনী

গত পূজার পূর্ব হইতে দেশে যে বস্ত্রাভাব সুরু হইয়াছে তাহা কমা দূরে থাকুক গত কয়েক মাসে আরও অনেক বেশী তীব্র হইয়াছে। বাংলার পূর্বতন মন্ত্রীদের অযোগ্যতা অকর্মণ্যতা ও হীনতার জন্যই বস্ত্রাভাব এত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের অধীনস্থ সিভিলিয়ান কর্মচারীরাও এই ব্যাপারে যাহা করিয়াছেন তাহাতে কোন প্রশংসাই তাঁহারা দাবি করিতে পারেন না। জনসাধারণের প্রয়োজনের প্রতি উভয়েই সমান উদাসীন, শ্বেতাঙ্গ বণিক-স্বার্থ রক্ষায় সমান তৎপর। ইহাদের মধ্যে মন্ত্রীদল গিয়াছে, এখন সিভিলিয়ান দল পূর্ববৎ বাংলার স্কন্ধে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চাপিয়া বসিয়া তাহার জীবনীশক্তির শেষ রসটুকুও নিংড়াইয়া লইতেছে। ব্যবসায়ীরাই এই বস্ত্রাভাবের মূল কারণ এই কথা সজোরে ঘোষণা করিয়া ইহারা সেই ব্যবসায়ীদেরই মধ্য হইতে হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তাহাদের হাতে কাপড় সমর্পণ করিতেছে। অসাধু বলিয়া যাহাদের দোকান তালাবন্ধ করা হইয়াছে তাহাদেরই লোক সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট এই নূতন এজেণ্টদের মধ্যে আছে কিনা তাহা এখনও স্পষ্ট জানা যায় নাই। চোর বলিয়া গবর্মেণ্ট যে-সব ব্যবসায়ীকে দাগিয়া দিয়াছেন তাহাদেরই নিকট হইতে কি দরে কাপড়গুলি ক্রয় করিয়া এজেণ্টদের দেওয়া হইতেছে, চাউলের ব্যবসার ন্যায় ইহাও সঙ্গোপনেই করা হইতেছে।

সঙ্গোপনে শুধু ইহাই নয়, আরও অনেক কাজই করা হইয়াছে। আমাদের তৈরি কাপড় আমাদেরই ভাগ্যে জুটিবে কিনা তাহা নির্ধারণ করিতেছেন ওয়াশিংটনে বসিয়া ইংরেজ ও আমেরিকান গবর্মেণ্ট। তাঁহাদের হুকুমে ভারতের বাহিরে কোটি কোটি গজ কাপড় রপ্তানি হইয়াছে, আজও হইতেছে; অসহায় ক্লীবের ন্যায় ভারত সরকার তাহাতে সায় দিয়াছেন, সে হুকুম পালন করিয়াছেন। ভারত-সরকারের বাঙালী প্রতিনিধিরাও আসল কথা চাপিয়া গিয়া রপ্তানির সাফাই গাহিয়া এমন ভাব দেখাইয়াছেন যেন ইহার ফলে মধ্য-এশিয়ার কাপড়ের বাজার ভারতবাসীর মুঠার ভিতর আসিয়া যাইবে। সত্য কথা, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর চাপের চোটে প্রকাশ পাইয়াছে, সর আজিজুল হক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে কাপড় রপ্তানি ব্যাপারটার উপর তাঁহাদের কোন হাত নাই, কত কাপড় বাহিরে যাইবে তাহা ঠিক হয় ওয়াশিংটনে।

কাপড় উৎপাদনের বেলাতেও পর্দার আড়ালে অনেক কিছু ঘটিয়াছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কারখানাগুলিতে প্রেরণের জন্য কয়লার খনিতে মালগাড়ীতে কয়লা বোঝাই করিবার পর ভারতরক্ষা আইনে ভারত-সরকার হুকুম দিয়া সেগুলিকে চটকলে পাঠাইয়াছেন। কাপড়ের কলগুলিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা মাসে কয়েকদিন করিয়া কাজ বন্ধ রাখিয়া কয়লা সঞ্চয় করুক। ফলে বহু কোটি গজ কাপড় কম তৈরি হইয়াছে এবং নিছক সরকারের দোষে এই উৎপাদন-হ্রাস ঘটিলেও ইহার সবটা কাটা গিয়াছে জনসাধারণের প্রাপ্য হইতে; গবর্মেণ্ট মিলগুলি হইতে যে কাপড় আদায় করিয়া থাকেন তাহার এক গজও ছাড়েন নাই। কাপড়ের সদ্ব্যবহার গবর্মেণ্টের হাতে কি ভাবে হইতেছে তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় পোষ্টাপিসের পিয়নদের নূতন উর্দি পরিধানে। পিয়নেরা হঠাৎ লম্বা প্যাণ্ট, কোট এবং টুপি পরিয়া চিঠি বিলি করিতে সুরু করিয়াছে। এই কাপড়ের দুর্ভিক্ষের দিনে অকস্মাৎ পোষ্টাপিসের উর্দির প্রয়োজন ঘটিতে দেখিয়া অনেকেরই ধারণা হইতে পারে যে খাকী কাপড় সরকারী গুদামে কিছু বেশীই হইয়া পড়িয়াছে; অথচ বোধহয় বিলাতী মাল ভাল ভাবে বাজারে না-নামা পর্যন্ত এগুলি ছাড়াও যায় না, বাজারে টান রাখিতেই হইবে নহিলে বিলাতী কাপড় কিনিবে কে?

বাংলায় কাপড় রেশনিং

সিভিলিয়ান গ্রিফিথ সাহেব এবার সরবরাহ-মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রায়-বিবস্ত্র বাঙালীকে কাপড় পরাইবার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সবজান্তা এবং সর্বকর্মবিশারদ বলিয়া সিভিলিয়ানদের যে খ্যাতি ছিল গ্রিফিথ সাহেব তাহা শিথিল করিয়া আনিতেছেন এটা তাঁর এবার বুঝা দরকার। তিব্বতে ও চীনে চোরাই পথে কাপড় রপ্তানির ইতিহাস দেশসুদ্ধ লোকে জানে, বাদে শুধু সিভিলিয়ান গ্রিফিথ সাহেব। কাপড় রেশনিঙের আয়োজন সুরু হইয়াছে, সাহেবের হুকুম হইয়াছে প্রত্যেকে দশ গজ করিয়া কাপড় পাইবে, অর্থাৎ হয় একজোড়া ধুতি বা শাড়ী অথবা জামার কাপড়। বাংলাদেশের উদ্ভট সরকারী হিসাবে জনপ্রতি গড়পড়তা দশ গজ কাপড় বিক্রয় হয়। দেশসুদ্ধ লোক জানে ইহার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক লোকেই দশ গজ কাপড়ে বছর চালায়। ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ ছাড়িয়া দিলেও এটা ঠিক যে এক বৎসরের শিশু দশ হাত ধুতি বা দশ হাত শাড়ী পরে না, কিন্তু এই গড়পড়তা দশ গজের হিসাবে তাহাকেও ধরা হয়। এই সোজা কথা বুঝিতে আই-সি-এস পাস করার দরকার হয় না, একটুখানি কাণ্ডজ্ঞান থাকিলেই চলে। গ্রিফিথ সাহেব এবং যে গবর্মেণ্টের তিনি প্রতিনিধি সেই গবর্মেণ্টের কর্ণধার সিভিলিয়ান-তন্ত্রের মগজে এই সোজা হিসাবটা আজও কেহ ঢুকাইতে পারিল না। আজও ইহারাই সকলের জন্য দশগজ কাপড় বরাদ্দ করিয়া রাইটার্স বিল্ডিঙের অন্ধকূপে বসিয়া বোধ হয় বিশ্ববিজয়ের আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছে। কোন্ ষ্টাটিষ্টিসিয়ান এই উদ্ভট হিসাব সমর্থন করিয়াছে তাহা জানিতে পারিলে দেশবাসী তাহাকে বা তাহাদের চিনিয়া রাখিতে পারিত। আমাদের বিশ্বাস এই গড়পরতা দশ গজ হিসাবও বাংলা সরকারের অন্য অনেক হিসাবের মত গোঁজামিল।

কাপড়ের অভাব যেখানে তীব্র, বিক্রয়ের সময় সেখানে ঠেলাঠেলি মারামারি অনিবার্য—চালাক সিভিলিয়ান এটাকেও

ভালই বুঝিয়াছেন। এই অপ্রীতিকর কাজটি পাড়ায় পাড়ায় কমিটি গঠন করিয়া উহার ঘাড়ে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কাপড়ের প্রয়োজন কাহার আছে কাহার নাই তাহা কমিটি ঠিক করিবেন। আমাদের দেশে খোদ গবর্মেণ্ট হইতে সুরু করিয়া যে সরকারী কমিটিতে পর্যন্ত সর্বত্রই সঙ্গোপনে কার্যসিদ্ধির উদার ব্যবস্থা সর্বদাই থাকে; বুদ্ধিমান লোকে উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে, যাহারা পায় না ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারাই উহাকে আখ্যা দেয় আশ্রিতবাৎসল্য ও ব্ল্যাক মার্কেট। আমাদের পাড়া কমিটিগুলিতে অনেক বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতার নাম দেখিতেছি। এগুলিতে এরূপ গোপনে বন্ধুবাৎসল্য যাহাতে না চলিতে পারে, পাড়ার প্রকৃত অভাবগ্রস্ত লোক যাহাতে সর্বাগ্রে কাপড় পায় তাহার প্রতি গোড়া হইতেই সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে কমিটির উপর লোকের আস্থা বাড়িবে। কমিটি প্রত্যেক প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত এবং যাহারা কাপড় পাইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা কমিটির আদেশে সর্বসাধারণ যাহাতে উহা দেখিতে পায় এরূপ প্রকাশ্য স্থানে যেন রাখা হয়। দেশের কাজ দশে মিলিয়া এবং দশের সহানুভূতির সহিত করা হইলে গোল যাহারা করিবে তাহারাই অপাংক্তেয় হইবে। কিন্তু যে কোনরূপ সাফল্যলাভের পূর্বে গোড়ায় গলদ দূর হওয়া দরকার। কাপড় বরাদ্দের হিসাব বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে না করিয়া বর্তমান খামখেয়ালী হুকুম কার্যে পরিণত করিতে গেলে কাপড়ের ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সরকারী বস্ত্রবণ্টননীতি

বস্ত্রবণ্টন সম্বন্ধে সরকারী নীতি বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় একই আকার ধারণ করিয়াছে। নিখিল-ভারত কিষাণ সভার সভাপতি স্বামী সহজানন্দ এ সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলিতেছেন:—

"আজকাল সংবাদপত্র খুলিলেই বস্ত্রের দোকানে বস্ত্রক্রয়েচ্ছু জনতার সমাবেশ এবং বিশৃঙ্খলার সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন বস্ত্রের দোকান এবং বস্ত্রবণ্টন কেন্দ্রে সরকার কর্তৃক অত্যন্ত অল্প পরিমাণে বস্ত্র, বিশেষ করিয়া শাড়ী ও ধুতি, সরবরাহের জন্যই ইহা ঘটিতেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা যদি বর্তমান বিবাহের মরশুমের কথা বিবেচনা করি, তাহা হইলে বস্ত্র সরবরাহের স্বল্পতা অধিকতর প্রকট হইয়া উঠে। আমি জনৈক খুচরা বস্ত্র-বিক্রেতার কথা জানি। ইনি গত বৎসরের শেষের তিন মাসে গড়ে মাসে ১২ হাজার টাকা মূল্যের স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বিক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহাকে মাসে খুব অধিক হইলে মাত্র ১৫ শত টাকা মূল্যের বস্ত্র বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইতেছে। এই ব্যাপার হইতে অবস্থাটা কিরূপ হইয়া উঠিয়াছে, সে সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যাইবে।"

অতঃপর স্বামীজী সরকারের বস্ত্রবণ্টন নীতির সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পাটনা জেলায় কিভাবে বস্ত্র বণ্টন করার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার উল্লেখ করেন। স্বামীজী বলেন, পাটনা শহরসমেত পাটনা জেলার লোক সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষ। খাস পাটনা শহরের জনসংখ্যা দুই লক্ষের কম। পাটনা জেলার দরুন মোট বরাদ্দ প্রায় ৮০০ গাঁইট বস্ত্রের মধ্যে পাটনা শহরের জন্য ৩০০ গাঁইট বরাদ্দ করা হইয়াছে, অর্থাৎ মোট লোকসংখ্যার এগারো ভাগের এক ভাগের দরুন মোট বস্ত্রের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছে। আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। দানাপুর মহকুমার লোকসংখ্যা চারি লক্ষের কম। উক্ত মহকুমার অন্তর্গত দানাপুর এবং খগৌল থানার লোকসংখ্যা একত্রে প্রায় আশি হাজার। দানাপুর মহকুমার জন্য নির্দিষ্ট একশত গাঁইট বস্ত্রের মধ্যে দুই থানার জন্য ৫৫ গাঁইট বস্ত্র দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং অবশিষ্ট তিন লক্ষ লোকের জন্য রহিল মাত্র ৪৫ গাঁইট। কোন্ নীতি এবং যুক্তি অনুসারে ইহা করা হইয়াছে, কেহ বুঝাইয়া বলিতে পারেন কি?

জন প্রতি বরাদ্দ, স্থানীয় বরাদ্দ, প্রাদেশিক বরাদ্দ প্রভৃতি প্রত্যেকটির বেলাতেই গবর্মেণ্ট চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার উপর পক্ষপাতিত্ব আছে। সম্প্রতি দিল্লীতে কয়লা সরবরাহের ব্যাপারে দেখা গিয়াছিল সরকারী কর্মচারীদের ভাগে প্রচুর পরিমাণে কয়লা জুটিয়াছে সাধারণ লোক যাহা পাইয়াছে তাহা নিতান্তই কম। বাংলার মফস্বলেও কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদি বিতরণের বেলাতেও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠিয়াছে। বিশৃঙ্খলার সহিত আশ্রিতবাৎসল্য জুটিলে দেশবাসীর অবস্থা সঙ্গীন হইবে তাহা আর বিচিত্র কি।

বাংলাদেশে মহামারী

বর্তমান সুশাসনে বাংলাদেশ এবার অতি দ্রুত শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষের পর ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়ার পর বসন্ত, বসন্তের পর কলেরায় লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যথারীতি দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের অভাবে, ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইনের অভাব, বসন্তের সময় টিকার অভাব এবং কলেরার সময় লোকের নোংরামির কাঁদুনি গাহিয়া কর্তব্য পালন করিয়াছেন। মানুষের মৃত্যু রোধ করিবার জন্য কোনটিতেই তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। কর্তব্য পালনের অভাব শুধু গবর্মেণ্টের বেলায় সীমাবদ্ধ নয় সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তি ও সংবাদপত্রগুলিও তাঁহাদের কর্তব্য করেন নাই। বাঙালীকে সমূহ ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার জন্য যে আন্দোলন প্রয়োজন এবং সম্পূর্ণ সম্ভব ছিল তাহা হয় নাই। নেতারা দলাদলি করিয়াছেন এবং সংবাদপত্রগুলি যুদ্ধের প্রতিদিনকার গতি ও প্রকৃতি এবং পররাষ্ট্রনীতি লইয়া দিনের পর দিন প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, দেশের সমস্যা লইয়া যে আলোচনা অত্যাবশ্যক ছিল তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ইহাই প্রয়োজন, বাঙালী জাতিকে আত্মবিস্মৃত ও আত্মবীতশ্রদ্ধ না করিতে পারিলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূল শিথিল থাকিয়া যাইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ, তাই বাংলার বিরুদ্ধে গভীর ও ব্যাপক অভিযান ১৯০৬ সাল হইতে ক্রমাগত চলিয়াছে। অর্থ, চাকুরি ও বিজ্ঞাপনের ফাঁদে দেশের মুখপাত্রদের মুখবন্ধ করিবার চেষ্টাও তাই এত প্রবল ও প্রখর। সামান্য ব্যাপারে হৈ-চৈ সৃষ্টি একটি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ চাল ভিন্ন আর কিছু নয়। দেশের মূল সমস্যা হইতে দেশবাসীর দৃষ্টি অন্য ছোটখাটো ব্যাপারে ফিরাইয়া দেওয়া আরও সহজ হয় যখন ইংরেজের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্রীতদাসের দল উহা লইয়া মাতামাতি করিতে থাকে।

বসন্তে যখন দেশ উজাড় হইতেছিল সংবাদপত্রের জন্য তখন টিকা-বীজ লইয়া বাংলা-সরকার ও কর্পোরেশনের দ্বৈরথ

সময়ের বিস্তৃত বিবরণীতে পরিপূর্ণ। সমস্ত দৃষ্টি কলিকাতার উপর নিবদ্ধ, গ্রামবাসী বিনা চিকিৎসায় নীরবে হাজারে হাজারে মরিল। দুর্ভিক্ষে অনাহারে ভগ্নস্বাস্থ্য দেশে চৈত্র বৈশাখ মাসে কলেরার প্রকোপ অতি স্বাভাবিক, এই অতি সত্য ও সহজ কথাটি কাহারও মনে থাকিল না। কলেরা যখন মহামারীর রূপ ধারণ করিল তখন আবার সুরু হইল কলিকাতা লইয়া মাতামাতি, রাস্তার পাশের ফলের খোলা ডালা লইয়া টানাটানি, বাজারের নোংরামির বিস্তৃত বিবরণ। ষ্টেটসম্যানের পাতায় কলিকাতার বাজার ও ফুটপাথের দোকানের ছবি দেখিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিল। একবার জিজ্ঞাসা করিল না গ্রামে কি ঘটিতেছে। ফুটপাথের খোলা ডালা, কাটা ফল টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল,—ভাল কথা। কিন্তু গবর্মেণ্টে জানিতে চাহিলেন না উঁহাদের প্রধান ক্রেতা যে কেরানীবৃন্দ সকাল আটটায় নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া আপিসে আসে এবং সন্ধ্যায় বাড়ী না ফিরিলে যাহাদের আহার জুটিবে না, দুপুর বেলায় তাহাদের টিফিনের জন্য স্বাস্থ্যবিধিসম্মত খাদ্যের ব্যবস্থা আপিসের কর্তারা করিয়াছেন কি? রাস্তার পাশের ফল ও সরবৎ এবং নোংরা জলে ধোওয়া মাছ প্রভৃতি কলেরার জীবাণু ছড়াইতেছে ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ভেজাল খাদ্য ইহার জন্য কতটা দায়ী বাংলা-সরকার বা বাংলার লাট তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছেন কি?

লাটসাহেবের বাজার ও বস্তি পরিদর্শন

বৈঠকখানা, মানিকতলা ও জগুবাবুর বাজারে লাটসাহেবের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি দেখিয়া গেলেন বাংলার রাজধানী কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম তিনটি বাজার কত নোংরা। বাঙালী ইহাতে মাথা নীচু করিল কিন্তু জিজ্ঞাসা করিল না ইংরেজ শাসনে ইহার উন্নতির কি চেষ্টা হইয়াছে। টেনেসী ভ্যালির উন্নতির সংবাদ শিক্ষিত বাঙালী আজ খুঁটিনাটির সহিত অবগত আছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা ভিন্ন দেশের উন্নতি হয় না, তথাপি ইঁহারাও একবার প্রশ্ন করিলেন না যে বাজারগুলির উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কোন চেষ্টা কোন কালেও হইয়াছে কি না। কলিকাতায় এই বাজারগুলি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন লোকসংখ্যা যাহা ছিল এখন বোধ হয় তাহার পাঁচ হইতে দশ গুণ বাড়িয়াছে। বাজারের স্থান সেই একই আছে কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়াছে, সুতরাং নোংরামি ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি এখানে অপরিহার্য। বাজারের স্থান যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রয়োজনের অনুরূপ সেখানে নোংরামি খুবই কম ইহারও প্রমাণ কলিকাতাতেই পাওয়া যায়।

কয়েক মাস পূর্বে বাংলার লাটসাহেব বস্তি পরিদর্শন করিয়া উহাদের দুর্গতি দেখিয়া গভীর বিস্ময় ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ছয় মাসের মধ্যে উহার উন্নতিবিধানের আশ্বাসও তিনি দিয়াছিলেন। প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে, ইহার মধ্যে যথারীতি কমিটি গঠন, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অতিরিক্ত ক্ষমতালাভের জন্য দরখাস্ত এবং উহার প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। এখানেও আসল জিনিস হইতে ছোট ব্যাপারে দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিবার সেই একই প্রয়াস। কলিকাতার বাড়ী-সমস্যার চাপ যে বস্তির দুরবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী সে সম্বন্ধে কেহ উচ্চবাচ্য করে নাই। লাট সাহেবকে কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, বস্তির অধিবাসীরা যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার নীতিগুলি উপলব্ধি করিতে এবং উহা কার্যে প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত আর্থিক সচ্ছলতা লাভ করিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষাবিস্তার ও আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করিবার কথা তিনি ভাবিতেছেন কিনা।

রাজপথে দুর্ঘটনা ও যানবাহন-সমস্যা

কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনা এবং যানবাহন-সমস্যা সম্বন্ধেও এই একই ব্যাপার ঘটিতেছে। অনাবশ্যক ব্ল্যাক আউটের জন্য যেখানে প্রতিদিন বহু লোক লরী ও গাড়ী চাপা পড়িয়া নিহত ও আহত হইত সেখানে রোগের মূল চিকিৎসা না করিয়া নাগরিকগণকে রাস্তায় হাঁটা শিখাইবার জন্য "সপ্তাহ পালন" আরম্ভ হইল। কাগজের দুর্ভিক্ষের দিনে পোষ্টার ছাপিয়া রাস্তায় আঁটিয়া সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়িত হইল। শিক্ষার সময় শেষ হইলে দেখা গেল দুর্ঘটনা যেমন ছিল তেমনি আছে। অথচ ব্ল্যাক আউট তুলিয়া দিবার দিন হইতেই উহা অসম্ভবরূপে কমিয়া গিয়াছে।

ট্রামে বাসে ভিড়ের একমাত্র কারণ যানবাহনের অভাব। যাত্রীরা নামিবার পূর্বেই লোকে ঠেলাঠেলি করিয়া উঠিতে চায় তাহার একমাত্র কারণ এই যে যাত্রী নামা শেষ হইলেই কণ্ডাক্টরেরা ঘণ্টা বাজাইয়া দেয়। তাহারা জানে দায় যাত্রীর, জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহারা চলন্ত গাড়ীতেই লাফাইয়া উঠিবে। চলন্ত গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিবার ন্যায় শারীরিক শক্তি ও দুঃসাহস যাহাদের নাই, যাত্রী নামিবার পূর্বেই ধাক্কাধাক্কি তাহারাই করে। ট্রামের কণ্ডাক্টরেরা ইহার জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক দায়ী। বলা বাহুল্য এই ট্রামওয়ে যে বিদেশী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠান তাহার উচ্চতম কর্মচারীদের এ বিষয়ে কোনই লক্ষ্য নাই এবং তাহাদের শিক্ষা দিবার ক্ষমতা বা সাহস ভূতপূর্ব মন্ত্রীদলের তো ছিলই না এবং বর্তমানে লাট দপ্তরের অকর্মণ্য কর্মচারীদিগেরও নাই। কণ্ডাক্টরদের সংযত করিলেই এই জিনিসটা বন্ধ হইতে পারে অথচ তাহা না করিয়া বাংলা-সরকার বাস-ষ্ট্যাণ্ডে খুঁটি পুঁতিয়া এবং পুলিসের লরী হইতে বক্তৃতা করিয়া ঠেলাঠেলি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ আর. পির নামে যে দুই শত বাস আটকাইয়া রাখা হইয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রায় বৎসরখানেক যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে, গবর্মেণ্ট ইহাতে কর্ণপাত মাত্র করেন নাই। বাসগুলি ছাড়িয়া দিলে ভিড় অনেক কমিত ইহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালী মুসলমানের অর্থনৈতিক বিপর্যয়

শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানেরা স্বীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে সম্প্রতি কি ভাবে নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন ১৬ই বৈশাখের 'আজাদে' প্রকাশিত মিঃ এফ রহমান এম-এসসি-লিখিত "বাঙালী মুসলমানের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়" প্রবন্ধটি তাহার পরিচয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের পিছাইয়া পড়িবার সমস্ত দোষ হিন্দুর ঘাড়ে না চাপাইয়া নিজে-

দেরও যে-সব ত্রুটি ইঁহাদের ছিল তাহা উদ্ঘাটন করিয়া সত্য নির্ধারণের যে চেষ্টা লেখক করিয়াছেন তাহার সহিত সর্বত্র একমত না হইলেও লেখকের প্রয়াস প্রশংসনীয় বলিয়াই আমরা মনে করি। মিঃ রহমান লিখিতেছেন :

"ভারতে মুসলিম রাজত্বের গৌরবময় যুগে যখন সম্রাটগণ নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তখন পশ্চিমের স্পেন, ইতালী প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইউরোপীয় ছাত্রগণ নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও এর সুযোগ্য ব্যবহারের দিকে মনোনিবেশ করেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাবে উন্নত নৌবহর ও অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নিকট ভারত-সম্রাটগণ পরাজিত হতে থাকল। তারপর সাম্রাজ্য হারিয়ে মুসলমানেরা একটা বিজাতীয় বিদ্বেষেই হোক বা অন্য কারণেই হোক বিজেতার ভাষা শিক্ষা করা বা তাদের অনুকরণ করা পছন্দ করে নি। ক্রমশঃ মুসলমানেরা কতিপয় জমিদারী ও কর্ষণযোগ্য ভূমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল এই সময় তাদের প্রতিবেশী সমাজ নবাগত শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল এবং ফলে শীঘ্রই তাদের অনুগ্রহভাজন হয়ে পড়ল। ফলে শাসন, বিচার প্রভৃতি নানা বিভাগের পদসমূহ এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ের নানা দিকে বিশেষ অধিকার লাভ করল। এরই ফলস্বরূপ তখন বিদেশী পণ্যের এজেন্ট স্বরূপ বহু হিন্দু ব্যবসায়ীর জন্ম হয়। শেঠ, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি শব্দে উহার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কাজের সুবিধার জন্য যখন পারসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রচলন হল তখন হিন্দুরাই উহা সকলের আগে শিখে নিল। এইভাবে একদিকে তারা অর্থ ও বিত্তার নানা সুযোগ লাভ করল এবং অন্য দিকে বিদেশের বহু মনীষীর চিন্তাধারা ও নবজীবনদায়িনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে পড়ল। এই নবোন্মাদনার চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় রামমোহনের যুগে। তার পরে এল স্বীয় ঐতিহ্যের প্রতি চোখ মেলে তাকানর যুগ। যার বিকাশ দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রভৃতির মধ্যে। হিন্দুদের রাজানুগ্রহ লাভের কালে মুসলমান স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়েছিল। তারা ইংরেজী শিক্ষা বয়কট করল—চাকুরীতে আগ্রহ দেখাল না—ব্যবসায়-বাণিজ্যেও যোগ দিল না। মুসলমান প্রথম বার এই মস্ত ভুলটা করে বসল। হয়তো মোল্লা সমাজের কিছুটা দোষও আছে। ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারের দ্বারা মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সঙ্গে অপরিচিত থাকতে বাধ্য করে। এই ভুলের বোধ বিশেষভাবে উপলব্ধ হয় আলীগড়ের সার সৈয়দ আহমদ ও বাংলার নওয়াব আবদুল লতীফ প্রমুখ মনীষিগণের দ্বারা। পাশ্চাত্ত্য ভাষা না শিখবার ফলে মুসলমানদের দ্রুত অবনতি এঁরা ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠা হল। তখন থেকে মুসলমানগণ কিছু কিছু করে পাশ্চাত্ত্য ভাষায় শিক্ষালাভ করতে থাকে এবং পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতিশীল জাতির চিন্তাধারা এবং কার্য্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়। এই সময়ে হিন্দুরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে—প্রায় এক সেঞ্চুরী দূরে···।

অতঃপর মিঃ রহমান মন্তব্য করিয়াছেন :

"নানা অফিসের প্রধান প্রধান পদ ম্যাট্রিক পাস হিন্দু কর্তৃক অধিকৃত দেখে এবং নিজে গ্রাজুয়েট হয়েও নিম্ন বেতনে পদের জন্য যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় ক্ষোভ মুসলমানদের মর্মমূলে আঘাত করতে থাকে। এইখানেই মাইনরিটি প্রটেকশনের শরণাপন্ন হতে হল তাদের। বহুকাল পরে নানা আন্দোলনের ফলে শতকরা ৫০টি সরকারী চাকুরী কাগজে কলমে মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট হল। এর পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার অতি দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে এবং আজকাল স্কুল ও কলেজে অনেক মুসলমান ছাত্রের সাক্ষাৎ মিলে।"

ইহা ভুল। আপিসের বড় বড় পদ হিন্দু কর্তৃক অধিকৃত থাকা এবং মুসলমানকে কোথাও ঢুকিতে না দেওয়ার উপর হিন্দুর কোন হাত কোনকালেও ছিল না। রাজ্য আপাততঃ ইংরেজের, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগকর্তাও ইংরেজ। মাইনরিটি প্রটেকশনের চাকুরি রিজার্ভের পূর্বেও বহু মুসলমান স্বীয় যোগ্যতাবলে আই. সি. এস. পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, প্রাদেশিক উচ্চপদে তো পাইয়াছেনই। মুসলমান সমাজে বর্তমান ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী চাকুরি লাভের প্রত্যাশা অপেক্ষা বিংশ শতাব্দীর নূতন আবহাওয়াই সম্ভবতঃ বেশী পরিমাণে দায়ী।

ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমান

শিল্পে ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে হিন্দুর সহিত বাঙালী মুসলমানের তুলনা করিয়া মিঃ রহমান লিখিতেছেন :

"চাকুরী-বাকুরী বা ব্যবসায়ে প্রথম দিকে হিন্দুরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে দেখা দিল বেকার-সমস্যা। চাকুরী না পেয়ে হিন্দু বেকারগণ বেশ মুশকিলে পড়ল। জমিজমা না থাকার ফলে তাদের অন্য উপায়ে অর্থোপার্জন আবশ্যক হয়ে পড়ল। বড়লোকের ছেলেরা ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়ে নানাপ্রকার শিল্প শিখে এল এবং কারখানা স্থাপন করল —সাধারণ লোকের ছেলেরা ঐ সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হল। এই ভাবে শিল্পাদির নানাদিকে তাদের অধিকার বিস্তৃত হল এক দিকে এবং বেকার সমস্যার সমাধানও হল।

শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রেও ঐ (অসহযোগ) আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের কোন লাভ হয় নি। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানেরাও বিদেশী বর্জন করে নি। ঐ বিদেশী বর্জন আন্দোলনের ফলে ভারতের সর্বত্র অসংখ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠান হিন্দু, পার্শী প্রভৃতি অমুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হল। জামসেদপুর, বোম্বাই, আহমদাবাদ, মাদ্রাজ, কলিকাতা, কুষ্টিয়া, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যখন মিলের পর মিল প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল তখন মুসলমানদের মিল তো দূরের কথা, কুটির শিল্পও গড়ে উঠল না— পরন্তু জুতা, দরজীর ব্যবসায় প্রভৃতি মুসলমানদের একচেটিয়া ব্যবসায়গুলিও তাদের হাত থেকে সরে যেতে লাগল। তখন ঋণভারপ্রপীড়িত মুসলমান দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে আসামের দিকে ছুটে চলেছে···।"

শিল্প ও ব্যবসাক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা হিন্দু পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের চেষ্টাতেই করিয়াছে, গবর্মেণ্ট

বা অপর কেহ ইঁহাদিগকে হাত ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দেয় নাই ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য। শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে মুসলমানকেও আপনার পায়েই ভর দিতে হইবে, গবর্মেণ্ট বা অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। বাংলাদেশের ব্যবসাক্ষেত্রে, বিশেষতঃ কলিকাতায়, অবাঙালী মুসলমান নিজের জোরেই জাঁকিয়া বসিয়াছে। বাঙালী মুসলমান ইহাদের সমধর্মী হইয়াও ইহাদের নিকট কতটুকু সাহায্য পাইয়াছেন তাহা আমরা জানি না। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় কথা যোগ্যতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও সততা, মুসলমান বণিকের এই সব গুণ থাকিলে পৃথিবীতে কেহ তাহার উন্নতি রোধ করিতে পারিবে না।

মুসলমান সমাজে বিবাহ-সমস্যা

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল মুসলমান সমাজে বিবাহ-সমস্যা বেশ তীব্রভাবেই দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি "আজাদে" ইহা লইয়া বিতর্ক হইয়াছে, বহু মুসলমান লেখক-লেখিকা উহাতে যোগ দিয়াছেন। মুসলমান মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষা লাভে তাঁহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া দৈহিক সৌন্দর্য্য কমিতেছে, বিলাসিতা বাড়িতেছে, রান্নাবান্না প্রভৃতি তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন—এই সব কারণে নাকি উচ্চশিক্ষিত মুসলমান যুবকেরা শিক্ষিতা তরুণীকে বিবাহ করিতে চাহেন না, বিতর্কের মধ্যে মোটামুটি এই কথাগুলিই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পণপ্রথার সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়াও অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন। বেগজাদী মাহমুদা নাসির নাম্নী জনৈকা মহিলা বিতর্কের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে শিক্ষিতা মুসলমান মেয়েদের বর্তমান অবস্থা ও মনোভাব সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে। ইনি লিখিতেছেন :

বিবাহ-সমস্যার চরম সীমায় পৌছেছে হিন্দু সমাজ যার কুফল আমরা স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি হিন্দুদের সামাজিক জীবনে। মোসলেম সমাজে সমস্যাটা যদি না-ই এসে থাকে তবুও আসতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। বিবাহ-সমস্যাটার একটা বড় দিক হল পণপ্রথা। এরই বিষময় কুফল আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি হিন্দুদের প্রাত্যহিক জীবনে। সুন্দরী, শিক্ষিতা গৃহকর্ম-নিপুণা অর্থাৎ সর্বগুণসম্পন্না মেয়ের বাপকেও ছেলের পণ যোগাতে পথে বসতে হয়। সাধারণতঃ আমাদের ভেতর বিয়ের আগে কন্যাপক্ষ হয়ত দাবি করেন ভরি ভরি সোনার গহনা, জোড়ায় জোড়ায় শাড়ী ; দুলহার পক্ষও দাবি করে বসেন সোনার বোতাম, আংটি, ঘড়ি, সাইকেল আরও অনেক কিছু। এই দাবি থেকে শেষে হয় মনোমালিন্যের সৃষ্টি। দুলহার পক্ষের ভাল ভাবে সন্তুষ্টি সাধন করতে না পারলে দুলহীনকে শ্বশুরবাড়ীতে অনেক রকম কথাও শুনতে হয়। আজকাল যৌতুকাদি নিয়ে কসাইর মত যে দরকষাকষি সুরু হয়েছে এটা অত্যন্ত নীচতার পরিচায়ক। এর থেকে হয়ত জন্ম নেবে বাধ্যতামূলক যৌতুকপ্রথা অথবা পণপ্রথা হতভাগ্য অনুকরণান্ধ বাংলার মোসলেম সমাজে। তারপর আর একটা দিক। দুলহার হয়ত ৫০০ টাকার মোহরানা দেবার মত শক্তি আছে কিন্তু কন্যাপক্ষ যদি ৫০০০ টাকা দাবি করেন তবে সেটা অশোভন নিশ্চয়ই। হাতে-কলমে মোহরানার রেওয়াজ উঠেই গেছে প্রায়—কাগজে কলমে সংখ্যার পর শূন্যের ঘর বেড়েই চলেছে।"

শিক্ষিতা মুসলমান নারী

শিক্ষিতা মেয়েদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শ্রীমতী নাসির বলিতেছেন, "শিক্ষিতারা স্বাস্থ্যবতী নন—বিবাহ সমস্যা শুধু এই জন্যই একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে পড়েছে—এ মনে করার কোন যৌক্তিকতা নেই।...দেশের যে অবস্থা তাতে কি নারী কি পুরুষ প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্যকে অক্ষুন্ন রাখা কঠিন ব্যাপার।" বিলাসিতাসম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই : "বিলাসিতা যদিও সকলে নিজ নিজ সামর্থ্যঅনুযায়ী করে থাকেন, তবুও বিলাসিতা সর্বথা পরিত্যজ্য। কয়েক বছর আগের ও আজকের মেয়েদের মনোভাব তুলনা করলে দেখা যায় যে আজকের মেয়েদের মনোভাবের অনেকখানি পরিবর্তন এসেছে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে। হাল্কা বিলাসিতার প্রভাবে উচ্চশিক্ষিতা পড়তে পারেন না। কিন্তু পথভ্রষ্টের দল সব রকম শ্রেণীর ভিতর থাকবেই। উচ্চশিক্ষিতা যত মেয়েদের দেখেছি ও দেখছি প্রত্যেকেই সহজ, সুন্দর, সুষ্ঠু মনোভাবসম্পন্না। অল্পশিক্ষিতা ও মধ্যম শিক্ষিতারাই বরং এর উল্টা হয়ে থাকে। দীর্ঘদিনের দেখা থেকে এ অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে। কাজেই মেয়েদের উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার প্রয়োজন আছে অনেক। শুধু বিবাহ-সমস্যায় ছেলেদের ভয় দূর করতে নয়, বরং জাতির আদর্শ জননী ভগ্নী ও কন্যারূপে তৈরি হতে। শিক্ষাই এখানে বড় কথা, শিক্ষার প্রসারে সমস্ত রকম খুঁত দূর হয়ে যাবার সম্ভাবনা অনেকখানি। মেয়েদের রান্না না জানা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন : "উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা রান্না জানে না—এ জন্যেই বিবাহ-সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে—এটা মনে করা নিতান্ত অন্যায়। যার যে কাজ সে দুদিন পরেই হোক আর আগেই হোক, তার কাজ সে সুসম্পন্ন করবেই। উচ্চশিক্ষিতাদের জুজুর মত ভয় করবার কোন কারণ নেই। তারা যে অবস্থার মধ্যেই পড়ুক না কেন সহজে সমস্ত কিছু ঠিক করে নেবার শক্তি তাদেরই থাকে বেশী।"

বিতর্কের লেখাগুলি হইতে আর একটি জিনিস অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান পুরুষ ও নারী উভয়েই এক-পত্নীত্ব ধরিয়া লইয়াই আলোচনায় নামিয়াছেন, বহুবিবাহ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিতও কেহ করেন নাই। হিন্দু সমাজের ন্যায় মুসলমান সমাজেও শিক্ষার প্রভাবে বহুবিবাহের কুপ্রথা অবিলম্বে দূর হইবে ইহা নিশ্চিত।

অস্তি ও চিমুরের প্রাণদণ্ডাদেশ-প্রাপ্তদের প্রাণভিক্ষা

অস্তি ও চিমুরের মামলায় প্রাণদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ৭ ব্যক্তির প্রাণ-ভিক্ষা করিয়া বড়লাট ও মধ্যপ্রদেশের গবর্ণরের নিকট এ পর্য্যন্ত বহু আবেদন গিয়াছে কিন্তু প্রাণদণ্ডের আদেশ উহাতে টলে নাই। যে ব্যক্তির মৃত্যু এই মামলার মূল ঘটনা তাঁহারই বিধবা পত্নী ইহাদের প্রাণভিক্ষার আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় অহিংসার মূর্ত প্রতীকও এই প্রাণদণ্ড সম্পূর্ণ

নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন এবং উহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্যও তিনি করিয়াছেন।

এই মামলাটি রাজনৈতিক। ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে ইহার উদ্ভব। নিহত ব্যক্তির প্রতি ইহাদের ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ ছিল না, সাময়িক উত্তেজনাই ইহার কারণ। সুতরাং নরহত্যার অপরাধে অপরাধী হইলেও ইহাদিগকে প্রকৃত নরঘাতকের পর্যায়ে ফেলা যায় না, এবং এই কারণেই প্রধানতঃ ইহাদের প্রাণদণ্ডাদেশও সমর্থন করা চলে না। রাজনৈতিক অপরাধে প্রাণদণ্ডাদেশ সম্বন্ধে বহু ক্ষেত্রেই মতভেদ আছে। ইতালিতে মুসোলিনী কর্তৃক ফাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পর সেখানে রাজনৈতিক অপরাধে প্রাণদণ্ড রহিত হইয়াছিল, শুধু রাজা, যুবরাজ ও প্রধান মন্ত্রীর হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধি বহাল থাকে। সুসভ্য ইংরেজ রাজত্বে এরূপ বিধি প্রচলিত হইলে সুখের বিষয় হইত।

এই মামলা সম্পর্কে জনসাধারণের মনেও খট্‌কা থাকিয়া যাইতেছে। দণ্ডিত আসামীদের প্রাণদণ্ডের ওয়ারেণ্ট স্বাক্ষর আইনসঙ্গত হইয়াছে কি না তাহা লইয়া নাগপুর হাইকোর্টে দুই তিনটি মামলা হইয়া গিয়াছে এবং ইহাতে সকল বিচারপতি একমত হইতে পারেন নাই। সুতরাং যে মামলায় বিচারপতিদের মধ্যে মতভেদ আছে এবং জনসাধারণ যেখানে এই মতভেদ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করে সেখানে প্রাণদণ্ড বিধান যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। ন্যায়বিচারের মূল ধর্মই এই যে, উহার বিরুদ্ধে যেন কাহারও কিছু বলিবার না থাকে। এক্ষেত্রে যেখানে প্রাণদণ্ডাদেশ ন্যায়সঙ্গত হয় নাই বলিয়াই অধিকাংশ লোকের ধারণা, গান্ধীজীর ন্যায় ব্যক্তিও যে প্রাণদণ্ডাদেশকে আইনের জোরে নরহত্যা বলিয়াই মনে করিতেছেন, সেখানে এই প্রাণদণ্ড বিধানে আইনের এবং ইংরেজের বিচারের প্রতি লোকের আস্থা বা শ্রদ্ধা বাড়িবে না।

ইউরোপের যুদ্ধে জয়লাভের পর নূতন করিয়া ভারতবাসী এই ৭ ব্যক্তির প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছে। এই আবেদন ব্যর্থ হইলে ভারতবাসীর মনে যে ক্ষোভ থাকিয়া যাইবে তাহা সহজে দূর হইবে না।

যুদ্ধোত্তর শিল্প এবং ভারত সরকারের প্ল্যান

পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর অর্থনীতির পরিচয় এত দিন পাওয়া গিয়াছে—(১) ধনতান্ত্রিক, (২) ফাসিষ্ট অথবা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক এবং (৩) সমাজতান্ত্রিক অথবা গণ-আয়ত্ত অর্থনীতি। সম্প্রতি ভারত-সরকারের যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে এই তিনটির এক অপূর্ব জগাখিচুড়ী বলা চলে। এই পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধের পর যে-সব শিল্প গঠিত হইবে তাহাদের উপর কর্তৃত্ব ও মালিকানা নিম্নলিখিত ভাবে করা হইবে: (১) স্বত্বাধিকার ও পরিচালনা ভার রাষ্ট্রের, (২) স্বত্বাধিকার রাষ্ট্রের কিন্তু পরিচালনা-ভার ব্যক্তিগত কোম্পানীর অথবা জনসাধারণ কর্তৃক গঠিত কর্পোরেশনের (৩) স্বত্বাধিকার একযোগে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি উভয়ের (৪) স্বত্বাধিকার ব্যক্তিগত, অর্থসাহায্য কতক পরিমাণে রাষ্ট্রের—গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং (৫) ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ও পরিচালনা—কতকটা নিয়ন্ত্রণ গবর্মেণ্টের। ইহাদের মধ্যে (১), (৩) ও (৫) পরিষ্কার সমাজতান্ত্রিক, ফাসিষ্ট ও ধনতান্ত্রিক।

সরকারী পরিকল্পনা আলোচনার প্রারম্ভে সর্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে যে এদেশের গবর্মেণ্ট গণ-আয়ত্ত নয়, বিদেশী-স্বার্থের প্রতিভূ; এই গবর্মেণ্টের হাতে ক্ষমতা যত বাড়িবে আমাদেরই বিরুদ্ধে উহা প্রযুক্ত হইবে। শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে সরকারী ক্ষমতাবৃদ্ধির মারাত্মক কুফল এই যুদ্ধে দেশবাসী যেভাবে অনুভব করিয়াছে তাহাতে যুদ্ধের পরও শিল্প-বাণিজ্যের উপর সরকারী কর্তৃত্বের নামে দেশের লোক শিহরিয়াই উঠিবে। যে কণ্ট্রোল এবং লাইসেন্স সমাজতান্ত্রিক দেশে মানুষের অশেষ কল্যাণের কারণ হইয়াছে, বিদেশী গবর্মেণ্টের হাতে পড়িয়া সেই দুই বস্তুই আজ এদেশে কোটি কোটি মানুষের চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ও অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

গোড়াতেই সরকারী বিবৃতিতে সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে এই বলিয়া যে ভারত-সরকারের উৎসাহ দানের ফলেই এদেশের কাপড়ের কারখানা, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা এবং চিনির কলগুলি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। প্রথমটির বেলায় কথাটা সর্বৈব মিথ্যা, ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প সরকারী সাহায্য ছাড়া কেবলমাত্র নিজেদের চেষ্টায় এবং ক্রেতাসাধারণের—বিশেষতঃ বাঙালী ক্রেতার—সহানুভূতি ও ত্যাগস্বীকারের ফলেই দাঁড়াইতে পারিয়াছে। গবর্মেণ্ট আর কোন দিকে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত কাপড়ের কলগুলির উপর আবগারী শুল্ক বসাইয়াও বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। দ্বিতীয়টিকে গবর্মেণ্ট সংরক্ষণ শুল্ক দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন জনমতের চাপে পড়িয়া, এড়াইবার কম চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। টাটার কারখানার প্রতিষ্ঠাতা জামশেদজী টাটা প্রথমে লণ্ডনে গিয়া মূলধন তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভারত-সরকার তাঁহাকে সাহায্য করেন নাই, বিলাতী ধনিকেরাও ভারতবর্ষে প্রতিযোগী খাড়া করিবার জন্য টাটাকে টাকা দিতে রাজি হন নাই। শেষ পর্যন্ত বোম্বাইয়েই টাটার কারখানার প্রথম মূলধন দেড় কোটি টাকা উঠে। তৃতীয়টির বেলায়ও গবর্মেণ্ট সংরক্ষণের সুযোগ দিয়াছিলেন জনমতের চাপের চোটে, তবে এক্ষেত্রে তাঁহারা একটু বেশী উদার হইয়াছিলেন এই জন্য যে ক্ষতি হইয়াছিল ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের, ইংরেজের নয়। পরে, এই যুদ্ধ বাধিবার পর যখন ভারতীয় শর্করা-শিল্প বিদেশে চিনি রপ্তানির সুযোগ পাইলে দাঁড়াইয়া যাইতে পারিত ঠিক সেই সময় ভারত-সরকার আন্তর্জাতিক শর্করাচুক্তির ধুয়া ধরিয়া ভারতের বাহিরে চিনি পাঠাইতে দেন নাই।

ভারত-সরকারের প্রধান অস্ত্র—কয়লার খনি

নিম্নলিখিত শিল্পগুলিকে ভারত-সরকার রাষ্ট্রের নামে বিদেশী গবর্মেণ্টের অধীন করিতে চান:—(১) লোহা ও ইস্পাত, (২) কলের ইঞ্জিন, (৩) মোটর গাড়ী, ট্রাক্টর, লরী প্রভৃতি, (৪) এরোপ্লেন, (৫) জাহাজ, (৬) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, (৭) বস্ত্র, চিনি, খনি, কাগজ, সিমেণ্ট ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, (৮) কলের হাতিয়ার, (৯) মূল রাসায়নিক দ্রব্য, রং, সার এবং ঔষধ, (১০) ইলেক্ট্রো-কেমিকাল যন্ত্র, (১১) কার্পাস ও পশম বস্ত্র শিল্প (১২)

সিমেণ্ট, (১৩) মোটর চালাইবার এলকোহল, (১৪) চিনি, (১৫) মোটর গাড়ী এবং এরোপ্লেনের তেল, (১৬) রবার, (১৭) লোহা ছাড়া অন্য ধাতব দ্রব্য, (১৮) বিদ্যুৎ, (১৯) কয়লা, (২০) রেডিও।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে কয়লা ছাড়া ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ শিল্পই ভারতবাসীর হাতে আছে অথবা শীঘ্রই আসিবার সম্ভাবনা আছে। চটকলগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর করায়ত্ত। চিনি, কাপড় প্রভৃতি যে তালিকায় স্থান লাভ করিয়াছে—সেখানে চটকল বাদ যাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কয়লাটা তালিকায় ধরা হইয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে উহার ব্যবস্থা আলাদা ভাবে করা হইবে। কয়লা এবং পাট, অর্থাৎ যে দুইটি ক্ষেত্রে বিলাতী স্বার্থ সর্বাপেক্ষা প্রবল ও সুদৃঢ়, সেই দুইটি বাদ দিয়া অন্যান্য শিল্পগুলিকে ভারত-সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়ার একমাত্র অর্থ উহাদিগকে বিলাতী কায়েমী স্বার্থের হাতে সমর্পণ ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

শিল্প গণ-আয়ত্ত করিতে গেলে যাহাকে সকলের আগে ধরিবার কথা সেই কয়লা বাদ গেল কেন? এই যুদ্ধে দেখা গিয়াছে কয়লার খনির মালিকেরা গবর্মেণ্টকে পর্যন্ত কাবু করিয়াছেন, উৎপাদন কমাইয়া ভারত-সরকারের নিকট হইতে অতিরিক্ত লাভকর, আয়কর প্রভৃতি হইতে নানাবিধ সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছেন। ভারতীয় শিল্পগুলি ইহাদের হাতে যে কি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহার ইতিহাস যুদ্ধশেষে জানা যাইবে। কয়লা সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় দেশের শত শত ছোট লোহার কারখানা উঠিয়া গিয়াছে, কাপড়ের কল পর্যন্ত মাঝে মাঝে বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। ছোট বড় কত কারখানা কয়লার অভাবে দরজা বন্ধ করিয়াছে তাহার সংখ্যা আজও নির্ণীত হয় নাই। চটকলের কয়লার অভাব হয় নাই, সাহেবদের কোন কারখানায় কয়লার অভাবে কাজ বন্ধ হইয়াছে বলিয়াও আমাদের জানা নাই।

বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রযুগে মেশিন চালাইবার জন্য মোটর দরকার, আর সেই মোটর চালাইবার জন্য কয়লা অথবা বিদ্যুৎ অপরিহার্য। আমাদের দেশে জলপ্রপাতের অভাব নাই কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের যত সুযোগ আছে তাহার একাংশও এ যাবৎ কাজে খাটান হয় নাই। কাজেই কারখানা চালাইবার জন্য আমাদের কয়লার উপরই নির্ভর করিতে হয়। কয়লার উপর আমাদের হাত না থাকিলে নিছক বিলাতী স্বার্থে কয়লা সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাহার ফলে হয় ভারতীয় কারখানার সর্বনাশ।

ভারত-সরকারের এই বিবৃতিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কোনক্রমেই বলা চলে না। কৃষির উল্লেখমাত্র ইহাতে নাই, ছোট বড় সর্ববিধ শিল্পের সহিত জনসাধারণের কি সম্পর্ক হইবে তাহারও কোন কথা নাই। ইহাতে আছে শুধু শিল্প-নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃত বিবরণ। ভারতবর্ষে বিলাতী কারখানা প্রতিষ্ঠা ভারত-শাসন আইনে পাকা করা হইয়াছে। ভারতবাসী ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সরকারী বিবৃতিতে ইহাদের সম্বন্ধেও কোন কথা নাই। সুতরাং বিবৃতিতে ভারত-সরকারের যে অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কার্যে পরিণত হইলে ভারতবর্ষে স্বদেশী শিল্প যেটুকু অগ্রসর হইয়াছে বিলাতী বণিকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে তাহা সমূলে ধ্বংস হইবেই এই আশঙ্কা আদৌ অমূলক নয়।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

১লা বৈশাখ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বৈতালিক, উপাসনা, সঙ্গীত এবং নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়া আশ্রমবাসীরা এই দিবসটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখার আয়োজনের কোন ত্রুটিই করেন নাই। কলিকাতা, পাটনা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট অতিথি ও দর্শক এই উৎসবে যোগদান করেন। নববর্ষের প্রথম দিবসে ব্রাহ্ম-মুহূর্তে উঠিয়া আশ্রমের ছাত্রছাত্রীরা "ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়" গানটি গাহিয়া আশ্রম পরিভ্রমণ করেন। সূর্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরবর্তী সাঁওতাল-পল্লী এবং চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে দলে দলে নরনারী তাঁহাদের অতিপ্রিয় গুরুদেবের জন্মোৎসবে যোগদান করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তিবিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য সমবেত হইতে থাকে। উপাসনার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমবাসীরা মন্দিরে সমবেত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত উপাসনা-মন্দিরে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রার্থনা করেন। পূজা-মন্দিরের পবিত্র আবহাওয়ায়, চন্দন ও কস্তুরীসুরভিত ধূপের ধোঁয়ায়, শুভ্র পুষ্পের বিপুল সমারোহে, সুন্দর আলপনায় ও আচার্যের কণ্ঠনিঃসৃত বেদমন্ত্রে অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সার্থক হইয়াছিল। আচার্য নন্দলাল বসুর পরিকল্পনায় কলাভবনের ছাত্রীরা মন্দিরের অভ্যন্তরে আলপনা দিয়াছিলেন। উপাসনা-প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন: "আজ পৃথিবীতে যে এত হিংসা এত দ্বেষ এত রক্তারক্তি চলিতেছে, আমরা যদি তাঁহার বাণীর সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিতাম তবে কিছুই এ সব হইত না। মা মা হিংসীঃ—এই বাণী কি আজও আমরা অন্তরে গ্রহণ করিব না? রক্তস্নাত পৃথিবীকে অরুণালোকে ভগবান উদ্ভাসিত করুন। তাঁহার দীপ্তিতে পৃথিবী দীপ্তিমান হউক।"

মন্দিরে উপাসনার পর আম্রকুঞ্জে কবিগুরুর জন্মোৎসব উপলক্ষে এক মনোরম অনুষ্ঠান হয়। উহাতে পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙ্গলা, ফরাসী, ইতালীয়, ইংরেজি, চৈনিক, ইরানী, সংস্কৃত, হিন্দী, তামিল, তেলেগু, গুজরাটী, মারাঠী, সিংহলী প্রভৃতি ভাষায় কবিগুরুর কবিতাবলীর অনুবাদ আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার অভিভাষণে বলেন: 'আশ্রমবাসী অনেকের পক্ষেই শান্তিনিকেতনের অভ্যস্ত কর্মের গণ্ডী পেরিয়ে দেখা শক্ত। এতো কেবলমাত্র বিশেষ কোন একটি শিক্ষা বা নির্ধারিত কর্মের প্রয়োগক্ষেত্র নয়। বার বার আমাদের সজ্ঞান চেষ্টার দ্বারা যেন আমরা আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করে শান্তিনিকেতনকে বহুমুখী সৃষ্টিপ্রতিভার প্রকাশক্ষেত্র বলে জানতে পারি। কবির জীবনে নব নব রূপে আত্মসৃষ্টির সাধনা এই আশ্রমে কি ভাবে দেখা দিয়েছিল তা আজ স্মরণ করবার দিন।

মহান আদর্শ এবং অফুরন্ত প্রাণ-শক্তির যে মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ এখানে রেখে গেছেন তাকে যেন আমরা পূর্ণতর রূপে এখানে গ্রহণ করতে শিখি। তাঁর কর্মের বিচিত্রতা এবং সাধনার মধ্য দিয়ে সেই বৈচিত্র্যের ঐক্য যোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশবাসীর মধ্যে কবির কাজে সহায়তা করবার উদ্যোগ আজ সর্বত্র চলেছে, এই সময়ে আশ্রমবাসীদের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে তা ভুললে চলবে না। শান্তিনিকেতনের কর্ম ও সম্ভাবনাকে সজীব পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। দেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মনে রাখতে হবে। আজ আনন্দ-উৎসবের দিনে তাঁর প্রদত্ত তপস্যাকে পূর্ণ করে প্রকাশ করার দুর্লভ অধিকার যেন আমরা সার্থক করি।"

অপরাহ্নে উদীচীতে এক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা কবিগুরুর কয়েকটি গান গাহিয়া কবির জন্মবাসর উদ্‌যাপন করেন। এই সঙ্গীত পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর।

সন্ধ্যায় নৃত্যনাটিকা চণ্ডালিকা অভিনীত হয়। নৃত্যের সঙ্গে সুমধুর গানের রেশে ও রূপসজ্জায় অভিনয়টি অতি সুন্দর হইয়াছিল। চণ্ডালিকার অংশে শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনী উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেন। অন্যান্য সকলের অভিনয়াংশও সুন্দর হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের বিবরণী আমরা দৈনিক কৃষকের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্তীর সৌজন্যে পাইয়াছি।

কলিকাতায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

২৫শে বৈশাখ কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতঃকালে কবির জন্মস্থান—যেখানে ৮৫ বৎসর পূর্বে তিনি জীবনের প্রথম আলোক দেখিতে পান এবং বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ুর প্রথম স্পর্শ লাভ করেন—কবির পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই জোড়াসাঁকোর বাসভবনে তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীরা সমবেত হইয়া তাঁহাদের একান্ত প্রিয় কবির পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন উৎসবে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী এবং শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়। সমবেত কণ্ঠে একটি বেদগান হইলে পর তিনি বলেন :

"২৫শে জুলাই তারিখে যখন আমরা কবিকে বিদায় দিলাম তখন দেখিলাম চোখে জল। কত শোক, কত বড় বড় আঘাত দেখিয়াছি। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এ চোখের জল তো নিজের বেদনা নয়। কি জগৎকে রাখিয়া গেলেন—সভ্যতার সঙ্কটে জগৎ আজ সঙ্কটাপন্ন, তারই বেদনায় তিনি আহত হইয়াছিলেন। প্রার্থনা করি আজ তাঁহার সেদিনের চোখের জলের যেন অবসান হয়। পৃথিবীর শত্রুতা, অপ্রেম যাহাতে অবসান করিয়া আনিতে পারি হয়ত সেজন্য তাঁহার বিদায়ের প্রয়োজন ছিল। আপন মৃত্যুর দ্বারা আপন পটভূমি তিনি তৈরি করিয়াছেন।"

উপসংহারে প্রার্থনা সহকারে তিনি বলেন, "আজ মৃত্যুর স্নিগ্ধতা ও জীবনের উজ্জ্বলতা—সব যুক্ত হউক, তিনি যে রক্ত-মাংস দিয়া জীবনযজ্ঞের আহুতি দিয়া গিয়াছেন সেই আহুতি সার্থক হউক। তাঁহার বাণী ও ঋষিদের মন্ত্র সত্য ও শাশ্বত হউক।"

অপরাহ্নে সিনেট হলে এক বিরাট জন-সভায় সুদীর্ঘ জীবন-ব্যাপী দেশ ও জাতির জন্য তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, সেই অপরিসীম অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়া কলিকাতার নাগরিক ও সাহিত্যিকগণ তাঁহার উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সভায় কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস, মিঃ আবদার রহমান সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বক্তৃতা করেন।

অপরাহ্নে অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক একটি বেতার বৈঠকের আয়োজন হয়। উহাতে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুরুর ২৫শে বৈশাখ শীর্ষক রচনাটি পাঠ করেন এবং অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ, ডাঃ কালিদাস নাগ, সোমনাথ মৈত্র, ডাঃ প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে রবীন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা তহবিলে প্রায় তিন লক্ষ টাকা তাঁহার জন্মদিনের পূর্ব পর্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা

মানভূম জেলার কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র ঘোষ আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী-দের বর্তমান দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতে-ছেন : একথা বহুবিদিত যে, আমাদের দেশে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদিগকে যে আহার্য দেওয়া হয় তাহা শরীরের পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত এবং নিম্নস্তরের। যোগ্যতার সহিত স্বাস্থ্য-রক্ষা করিয়া চলার পক্ষে তাহা অনুপযোগী, আমাদের কারারুদ্ধ তৃতীয় শ্রেণীর সহকর্মী ও অন্যান্য কয়েদীদের সেই আহার্যের সম্পর্কেই গবর্মেণ্ট সম্প্রতি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই আমার আলোচ্য বিষয়। পূর্বে একজন কয়েদীকে মধ্যাহ্নভোজন কালে ছয় ছটাক চালের ভাত দেওয়া হইত। ছয় ছটাক কমাইয়া সাড়ে-চার ছটাক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সান্ধ্য-ভোজনকালে ইহা হইতেও কম দেওয়া হয়। এমন কি যে কঠিন পরিশ্রম করে, তাহার জন্যও ঐ ব্যবস্থা। বিনাশ্রম কয়েদীদের আহার্য আরও কম। প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল এই পরিবর্তিত খাদ্যব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

পূর্বে যে আহার্য দেওয়া হইত তাহা পুষ্টির দিক হইতে যথেষ্ট অনুপযোগী হইলেও উহাতে উদরপূর্তির কাজটা চলিত; কিন্তু এখন তাহাও সম্ভব হইতেছে না, অধিকন্তু অপুষ্টির সমস্যা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ক্ষুধা লইয়া তাহাদিগকে বিশ্রাম-শয্যা গ্রহণ করিতে হয়।

জেলের খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণের যে ব্যবস্থা তাহাতে স্বাস্থ্যের অবস্থা যে কি হয় তাহা আমরা জানি। তাহার উপর এই অবিবেচিত, নিষ্করুণ খাদ্য-সঙ্কোচের ফলে স্বাস্থ্যের অবস্থা যে কি কঠোরতর দশায় পরিণত হইবে, তাহা আমরা ধারণা করিয়া লইতে পারি।

খাদ্য-সঙ্কোচ ভাল রকমই করা হইয়াছে। কি পরিমাণ খাদ্য কোন্ কোন্ খাদ্যবস্তু হইতে হ্রাস করা হইয়াছে, তাহার পূর্ণ অঙ্ক-তালিকাদিতে বিরত থাকিলাম।

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের প্রতি আর একটি অবাঞ্ছিত আচরণ যাহা বহু দিন হইতে ঘটিতেছে তাহা জানাইতে চাই। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীগণ সাধারণ জেল-আইনের দ্বারা, দু-একটি বস্তু ছাড়া কোনো জিনিষ ঘর হইতে আনিবার বা নিজের খরচে কিনিয়া লইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত। খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য সামগ্রী যাহা জেল হইতে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদিগকে দেওয়া হয়, তাহা নিয়মিত, সুস্থ এবং মানবোচিত জীবনযাত্রার পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী—তাহা আমরা জানি। একজন কয়েদীকে জীবনযাত্রার সৌকর্য এবং প্রয়োজনের পক্ষে অপরিহার্য বহু জিনিষের অত্যন্ত অভাব নিয়তই বোধ করিতে হয়। যথা তেল, সাবান, মশারি, পুষ্টিকর খাদ্য, ফল, টনিক, লেখাপড়ার কাগজ, লেখার সরঞ্জাম প্রভৃতি। সরকার নিজের পক্ষ হইতেও এ সমস্ত জিনিষ কয়েদীদিগকে দিতে রাজী নহেন, আবার কয়েদীরা যে নিজের খরচে তাহা আনাইয়া লইবে তাহাতেও সম্মত নহেন। এই অন্যায়টির অবসান করা বিষয়ে আপত্তিস্বরূপ সরকারপক্ষ হইতে অর্থনৈতিক প্রশ্ন তুলিবারও অবকাশ কোথাও নাই। অপর দিকে কয়েদীদের সঙ্গে ব্যবহারে সরকার যে মানবতা-বোধসম্পন্ন, সে ধারণাও আমাদিগকে করাইবার চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরা মানুষ; রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্ত বহু ভদ্র সন্তানকে নানা কারণে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদশা যাপন করিতে হয়। বন্দীদের খাওয়া কমান হইয়াছে এই সংবাদ সত্য হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ১২ই বৈশাখে প্রকাশিত এই সংবাদের সরকারী প্রতিবাদ আমাদের চোখে পড়ে নাই। ইহা সত্য কি না গবর্মেণ্টের তাহা জানান উচিত এবং সত্য হইলে অবিলম্বে তাহার প্রতিকার করা উচিত। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে আমাদের মনে হয় অন্ততঃ রাজনৈতিক বন্দীদের বেলায় নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য গবর্মেণ্ট সরবরাহ না করিলেও বাড়ী হইতে আনিতে দেওয়া উচিত। কয়েক বৎসর পূর্বে রাজনৈতিক বন্দীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি বিল আনিয়াছিলেন, সর নাজিমুদ্দীন তখন স্বরাষ্ট্র-সচিব। তিনি উহা বিবেচনা পর্যন্ত করিতে সম্মত হন নাই; বিলটি সরাসরি পরিত্যক্ত হয়। নাৎসী বন্দীশিবিরের নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বন্দীশালায় এই ব্যবহারের সংবাদে দেশবাসী আনন্দিত হয় না ইহা নিশ্চিত।

নিখিল-বঙ্গ কৃষক-প্রজা সম্মেলন

রাজসাহী জেলার লোহাচুড়ায় নিখিল-বঙ্গ কৃষক-প্রজা সম্মেলনে সভাপতি মৌলবী শামসুদ্দীন আমেদ তাঁহার অভিভাষণে [illegible] সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন কংগ্রেসই দেশের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং পাকিস্থান মুসলমানদের স্বার্থের বিরোধী। মুসলিম লীগ ও পাকিস্থান সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই:

লীগ-শাসনের কুফল আপনারা যে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং লীগ-পরিকল্পিত পাকিস্থানের শাসনের স্বরূপও যে কেমন হইবে তাহা আপনারা অনুমান করিতে পারেন এবং এরূপ পাকিস্থানে যে আপনারাও বসবাস করিতে চাহিবেন না তাহাও অনুমান করা কঠিন নহে। রাজনৈতিক পরিবর্তন আমরা চাহিতেছি—শুধু পরিবর্তন কেন রাজনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা আমরা চাহিতেছি। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার পথে কতকগুলি পরিবর্তনের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে চলিতে হইবে। সেই পরিবর্তন যদি আমাদের আদর্শের অনুকূল না হয়, তাহা যদি আমাদিগকে আরও দুরবস্থার দিকে, আরও অধঃপতনের দিকেই লইয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে সেই পরিবর্তনকে কেহই সাদরে বরণ করিয়া লইবেন না বরং উদ্দেশ্য এবং আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলে ইহার প্রতিকূলতাই করিবেন। যে ধারণায় আমি মুসলিম লীগ ও লীগ-পরিকল্পিত পাকিস্থানের বিরোধী, ঠিক সেইরূপ কারণেই আমি হিন্দু মহাসভার অখণ্ড হিন্দুস্থান পরিকল্পনারও বিরোধী। উভয়ের মতবাদই উৎকট সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট। পাকিস্থান যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেও টিকিতে পারে না সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে; পাকিস্থানের কর্মকর্তারা যুক্তিতর্ক দিয়া সে সকল এখনও খণ্ডন করিতে পারেন নাই। স্থির-ধীর ভাবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া অগণিত মুসলমানের স্বার্থের খাতিরেই পাকিস্থানের বিরোধিতা করা ভিন্ন আমি উপায়ান্তর দেখিতেছি না। আর একটা কথা, অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রে যে ধর্ম হিসাবে ইসলাম বা হিন্দু কিম্বা অন্য কোন ধর্ম বিপন্ন হইবে, তাহা কল্পনা করাও ঠিক নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চীনের ও রাশিয়ার মুসলমানদের কথা বলিতেছি।

কংগ্রেসের প্রভাবে হিন্দু মহাসভা যেমন সমগ্র হিন্দুদিগকে সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিতে পারিতেছে না, সুখের বিষয় যে, তেমনি মুসলমান সমাজের মধ্যেও ক্রমে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইতেছে এবং তাঁহারা ক্রমেই মিঃ জিন্নার কুচক্রান্তের সংস্রব ছাড়িয়া আসিতেছেন। অধুনা পঞ্জাব, সিন্ধু, আসাম, যুক্তপ্রদেশ এবং শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে লীগদল যেভাবে 'বানচাল' খাইয়াছে তাহাতে লীগের ক্ষুদ্র তরী ঠিক রাখা আজ মিঃ জিন্নার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে এবং লীগের প্রভাব যে ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিষবিমুক্ত হইতে পারিলেই আমাদের সত্যিকারের জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইবে—আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব।

চিত্র-পরিচয়

আওরঙ্গজীবের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হইয়া দারা যখন আফঘানিস্থানের শাসনকর্তার সাহায্যে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রমপূর্বক দাদারের পথে অগ্রসর হন তখন তাঁহার পুত্র-শোকাতুরা পত্নী নাদিরা বানু, শোকতাপ-ক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ দেহ এই কঠোর পথশ্রম সহ্য করিতে পারিল না, অকস্মাৎ পথিমধ্যে বিনা চিকিৎসায় তাঁহার মৃত্যু হইল।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

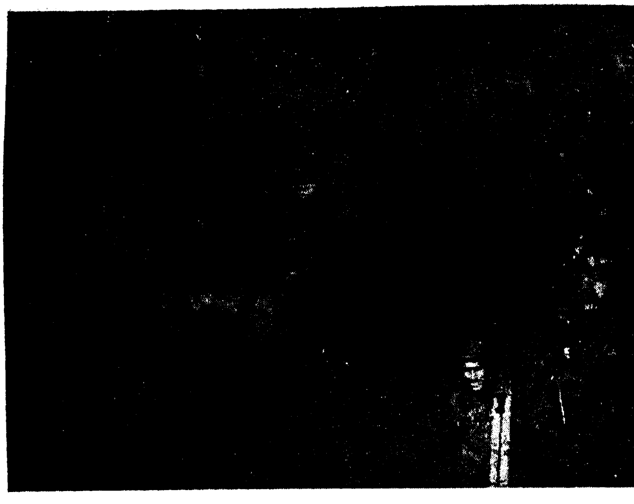
বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ইউরোপীয় পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল। যে দুইজন লোকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইটালী ও জার্ম্মানীতে শক্তি-তন্ত্র গঠিত হয়, তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গেই ফ্যাসিজম্ ও নাৎসী-বাদেরও লোপ হইয়া গেল। হিটলারের মৃত্যু কোথায় ও কবে এবং কি ভাবে ঘটিয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে জার্ম্মান রক্ষীসেনার কেন্দ্রীভূত চালনার ইতি ঐ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয়। পাঁচ গুণের অধিক সৈন্তবল এবং ততোধিক অস্ত্রবলের বিরুদ্ধে "মরীয়া লড়াই" চালাইবার ক্ষমতা হিটলারের পরে জার্ম্মানীর অন্ত কোনও রণনায়কের ছিল না। যে প্রচণ্ড বলে মিত্রপক্ষ এবং রুশসেনা যুগপৎ দুই দিক হইতে আক্রমণ চালাইতেছিল তাহার সম্মুখে জার্ম্মান দল কোথাও দাঁড়াইতে পারে নাই। উপরন্ত রুর অঞ্চল এবং সাইলেসীয়ার ব্রেসলাউ অঞ্চল যুদ্ধের আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া গেলে জার্ম্মানীর যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণ কেন্দ্রগুলির বৃহত্তম অংশ কাজের বাহিরে চলিয়া যায় যাহার ফলে জার্ম্মান সেনা অস্ত্রবলে দ্রুত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। এইরূপে যখন জার্ম্মানীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন সেই সময়ে হিটলারের মৃত্যু ঘটে এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মান রক্ষাব্যূহের চতুর্দ্দিকে ভাঙ্গন ধরে। তাহার অল্প পরেই যুদ্ধসমাপ্তি ঘটে।

এই পাঁচ বৎসর আট মাস ব্যাপী প্রলয় কাণ্ডের আদি ও অন্ত দুইই অতি আশ্চর্য্যজনক। তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস যদি কোনও দিন বাহির হয় তবে তাহা অন্ততঃপক্ষে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের আগে হইবে না। এখন সেইজন্ত ঐ সুদীর্ঘ ইতিহাসের আলোচনা বৃথা। জার্ম্মানীর শক্তির গঠন এবং ভাঙ্গনের মধ্যে নাৎসীদলের প্রচণ্ড কার্য্যশক্তির উত্থান-পতনের সমস্ত কিছু জড়িত আছে। নাৎসীদলের কার্য্যাবলীর আরম্ভের গোড়ায় জার্ম্মান রণনায়কগণের অতি সূক্ষ্ম কার্য্যকল্পনা, তাহাদের যুদ্ধবিশারদ এবং অস্ত্রবিশারদগণের যুদ্ধবিচার ইত্যাদির পরিচয় জগৎবাসিগণ বিশেষ কিছু পায় নাই। কি ভাবে হিটলারের দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইল তাহা এখন ইতিহাস-লেখকের গবেষণার পর্য্যায়ে রহিয়াছে। ইহা মাত্র বলা চলে যে যখন যুদ্ধারম্ভ হয় তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ-বিশারদগণ এই "দেউলিয়া" জার্ম্মান জাতির স্পর্দ্ধাকে বাতুলের প্রলাপের কোঠায় ফেলিয়াছিলেন। তখনকার হিসাবে সৈন্য-সংখ্যায় এবং অস্ত্রবলে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধশক্তিই জার্ম্মানী ও ইটালীর সম্মিলিত শক্তি অপেক্ষা অধিক ছিল এবং আকাশশক্তিতে সোভিয়েট জগতে অদ্বিতীয় ছিল। রুশকে ছাড়িয়া দিলে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং পোলাণ্ড এই তিনটির মিলিত শক্তি জার্ম্মানী অপেক্ষা অত্যধিক বলিয়াই মিত্র-পক্ষের যুদ্ধবিশারদগণ মনে করিতেন। তাঁহাদের ভুল ভাঙে ফ্রান্সের উপর জার্ম্মানীর রুদ্রপ্রতাপে "ঝটিকা" অভিযানে। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেবলমাত্র ইহাই বলা চলে যে জার্ম্মানী প্রায় তাহার দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিয়া ফেলে। ফ্রান্স ভাঙিয়া পড়ে, ইউরোপের ছোটবড় দেশগুলির মধ্যে সুইডেন, স্পেন, পর্ত্তুগাল এবং সুইজারল্যাণ্ড অক্ষশক্তির প্রতাপের বাহিরে থাকে। সোভিয়েট রুশ প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যখন অবসন্নপ্রায় তখন ষ্টালিনগ্রাডের পথে অকালবর্ষায় জার্ম্মানীর ভাগ্যসূর্য্য দৈববশে অস্তাচলের দিকে প্রথম ঝুঁকিতে থাকে। কিন্তু তখনও জার্ম্মানী প্রবল শক্তি ধারণ করে এবং তাহার চাপ সোভিয়েটের পক্ষে দুঃসহ হইয়া পড়ে। ব্রিটেন বাঁচিয়া যায় তাহার সমুদ্র-পরিখার জোরে। ইতিমধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মার্কিন যন্ত্র-শিল্পের উৎপাদন-শক্তি প্রযোজিত হয় যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানীর বিজয়-পরিকল্পনা ক্রমে ম্লান হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়। মার্কিন যন্ত্রশিল্পের দানবীয় উৎপাদন-শক্তি এবং সোভিয়েট গণ-সেনার অলোকবিশ্রুত শৌর্য্য ও সহ্য-শক্তি এই দুইয়ের পরিমাণ জার্ম্মান রণবিশারদগণের কল্পনার অতীত হওয়ায় অক্ষশক্তির অস্তাচল গমন ঘটে। মিত্রপক্ষের বিমান অভিযান এবং সোভিয়েট রুশের অগণিত সৈন্তবলে স্থল অভিযান এই দুইয়েরই মূলে মার্কিন যন্ত্রশিল্পের অসাধারণ বিস্তৃতি ও নৈপুণ্য।

পশ্চিমের যুদ্ধের অবসান হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের যুদ্ধ সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে কত দিনে জাপানের পতন ঘটিবে। বর্ত্তমানে যে যে স্থানে জাপানী সেনার সহিত যুদ্ধ চলিতেছে, সেই সেই স্থানের যুদ্ধের গতি এবং ধরণ দেখিয়া মনে হয় জাপান এখনও তাহার যুদ্ধব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। বিশেষতঃ তাহার আকাশশক্তি এখনও পরিমাণে অনেক পিছাইয়া আছে। সুতরাং মিত্রপক্ষের এখনও সময় আছে দ্রুত অভিযান গঠন করিয়া সৈন্তসংখ্যার গরিষ্ঠতায় এবং অস্ত্রবলের ওজনে জাপানের শক্তিকে ভাঙিয়া ফেলার জন্ত। জাপানের সৈন্তবল এখনও প্রচণ্ড এবং তাহারা সকল ক্ষেত্রেই অতি দুর্দ্ধর্ষভাবে যুঝিতে সক্ষম। কিন্তু তাহাদের অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের অভাব এখনও বিশেষভাবে দেখা যায় এবং তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বিষম অভাব আকাশপথে সাহায্যের।

বস্তুতপক্ষে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় আকাশপথেই হইয়াছে এবং তাহা মার্কিন যন্ত্রশিল্পের পুঞ্জীভূত উৎপাদন-ব্যবস্থার গুণে। অক্ষশক্তি অন্ত সকল ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষের প্রত্যেক চাল অন্ত চাল দিয়া রোধ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু আকাশপথে গুরুভারবাহী বোমাক্ষেপকবিমান সম্পর্কে জার্ম্মানী ও জাপান সংখ্যা ও ওজন দুই হিসাবেই হটিতে আরম্ভ করে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে। মার্কিন সমরবিভাগ আকাশবাহিনীকে বহু বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি কাজের জন্ত বিশেষভাবে পরিকল্পনা এবং নির্ম্মাণকার্য্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ করার সঙ্গেই আকাশপথে অক্ষশক্তির পরাজয়ের সূত্রপাত হয়। পোতবাহিত দ্রুতগামী বোমাক্ষেপক এবং তাহার রক্ষী প্রচণ্ড অস্ত্রসজ্জিত বিমানের নির্ম্মাণকার্য্য সফল হইবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন নৌ-সমর বিভাগ ও বিস্তৃত নৌ-অভিযান চালনের উদ্দেশ্যে অতি-বৃহৎ বিমানবাহী রণপোতবহর গঠন আরম্ভ করিলেন। জাপানের নৌবিভাগ এই বিরাট আয়োজনের কথা হয় জানিতে পারে

নাই নয় উহার পাল্টা জবাব দেওয়া তাহার ক্ষমতার বাহিরে ছিল। যাহাই হউক এই নির্ম্মাণকার্য্য দুই বৎসর ধরিয়া চলিবার পর ১৯৪৪ সালের গোড়ায় দেখা গেল যে আকাশপথে আক্রমণের পন্থা মার্কিন বিমান-বিশারদগণ বহু বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেকটি অংশের জন্য বিশেষ উপযুক্ত বিমান অগণিত সংখ্যায় যোগাইতে সমর্থ হইয়াছেন। অতি উচ্চ বায়ুস্তর হইতে বৃহৎ বোমা-ক্ষেপণের জন্য সশস্ত্র "উড়ন্ত কেল্লা" অগণিত সংখ্যায় ইউরোপে আসিতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে আসিল অসংখ্য প্রকারের লড়াইকারী এবং ধ্বংসকারী বিমান। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর খোঁজ হইতে অসীম মহাসমুদ্রে সাবমেরীন ধ্বংস পর্য্যন্ত সকল কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত আকাশ-সেনা, বিশেষভাবে নির্ম্মিত ও অস্ত্রসজ্জিত বিরাট বিমানবাহিনী লইয়া যুদ্ধদানে অগ্রসর হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অক্ষশক্তির আকাশ-আধিপত্য শেষ হইল। প্রথমেই যুদ্ধারম্ভের অধিকার (initiative) আয়ত্তের বাহিরে যাওয়ায় জার্ম্মানী ও জাপানকে খুঁজিতে হইল মিত্রপক্ষের আকাশযুদ্ধের সমরাহ্বানের উত্তর। একটির উত্তর দিতে দিতে নূতনতর অস্ত্রসজ্জা দ্রুততর বিমান বা বৃহত্তর বোমাক্ষেপকের সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে চলিল আকাশপথে অস্ত্রনির্ম্মাণকেন্দ্র, নৌবহর-বন্দর এবং নৌবহরের উপর ব্যাপক আক্রমণ, যাহার ফলে জার্ম্মানী ও জাপান নিত্য নূতন ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে থাকিল।



মণ্টগোমারীর গফ অভিযানকালে ক্লিভের দক্ষিণ দিক দিয়া অগ্রসর সাঁজোয়া গাড়ী এবং ব্রিটিশ-কানাডীয় পদাতিক সৈন্যদল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এবং প্রতিপদে তাহার বিশেষ সহায়তার ফলে ব্রিটেন—সুদীর্ঘ দুই বৎসরব্যাপী সমরসজ্জার অবসর পাইয়াছিল বলিয়াই এইরূপ আকাশ-যুদ্ধের আয়োজন করিতে সমর্থ হয় এবং সেই সঙ্গে স্থল ও জল যুদ্ধের ব্যবস্থাও হয় অনুরূপভাবে। এই অবসর আসে পশ্চিমে সোভিয়েট সেনা এবং পূর্ব্বে স্বাধীন চীন সেনার অভূতপূর্ব্ব প্রতিরোধ-চেষ্টার ফলে। এই প্রতিরোধ-চেষ্টায় সোভিয়েট সেনা যে ক্ষতি স্বীকার ও সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহা বর্ণনার অতীত। বলা বাহুল্য সোভিয়েট বা স্বাধীন চীন অস্ত্রত্যাগ করিলে মার্কিন ও ব্রিটেনের পক্ষে এরূপ নির্ব্বিবাদে সমস্যা নির্ণয় করিয়া, ঢালিয়া, সাজিয়া, যথাযথ ভাবে পরিকল্পনা করিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার ব্যবহার দেখিয়া কার্য্যব্যবস্থা বিচার তো অসম্ভব হইতই উপরন্তু অক্ষশক্তির আধিপত্য অতিক্রম করাও অতি দুরূহ ব্যাপার দাঁড়াইত। অক্ষশক্তি যখন মিত্রপক্ষের অস্ত্রগরিষ্ঠতার সম্মুখীন হইল তখন তাহাদের মধ্যে সোভিয়েট বা চীনের মত অসীম ক্ষতিস্বীকার করিয়া অন্যের অবসর যোগাইবার মত কেহ ছিল না। একই সঙ্গে যুদ্ধচালনা, ক্ষতি সহ্য করা, চলতি অস্ত্রের পুনরাদত্তর যোগান দেওয়া এবং নূতন অস্ত্র নির্ম্মাণ—এই সকল কার্য্য চালাইতে গিয়া জার্ম্মানী অস্ত্রের ওজনে হটিতে আরম্ভ করিল। শেষদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মান যুদ্ধাস্ত্র মিত্রপক্ষের তুলনায় সমকক্ষ এমন কি অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর ছিল। কিন্তু সংখ্যায় তাহা ক্রমেই পিছাইতে আরম্ভ করে, কেননা, মার্কিন সোভিয়েট ও ব্রিটেন এই তিন দেশের সমবেত উৎপাদন-ক্ষমতার সহিত একা জার্ম্মানীর প্রতিযোগিতা দাঁড়াইতে পারে নাই।

জাপান এতদিন কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আংশিক ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় ছিল। সুতরাং সে কিছু অংশে অবসর পাইয়াছে। সম্পূর্ণ অবসর পাইলে তাহার অবস্থা এতদিনে অতি প্রবল হইয়া দাঁড়াইত নিশ্চয়। কিন্তু সে ব্যাপারে মার্কিন নৌ এবং আকাশ-অভিযান বিলক্ষণ বাধা দিয়াছে। এখন জাপানের অস্ত্র-নির্ম্মাণ ব্যবস্থা কতটা অগ্রসর হইয়াছে তাহা অনিশ্চিত, তবে মনে হয় তাহা এখনও অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। সুতরাং মার্কিন ও ব্রিটিশ অভিযান যদি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইয়া ব্যাপকভাব গ্রহণ করে তবে জাপান বেশী দিন সে ভার সহ্য করিতে পারিবে না। অন্য দিকে যে সকল নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় জাপান বসিয়া নাই, তাহার নূতন নূতন অস্ত্রনির্ম্মাণকেন্দ্র—অধিকাংশ মাঞ্চুকুয়োতে—ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে এবং নূতন নূতন অস্ত্রও ক্রমেই তাহার সমরবিভাগের হস্তগত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান ক্রমেই প্রবলতর প্রতিরোধের সম্মুখীন হইবে মনে হয় এবং সেই কারণে মার্কিন অধিকারীবর্গের সতর্কবাণী সমীচীন বলিয়াই গ্রাহ্য করা উচিত মনে হয়। স্থলে জাপান দ্রুত প্রবলতর হইতেছে তাহার প্রমাণ ওকিনাওয়ায় যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে। আকাশেও এবং সেই কারণে জলেও—তাহার শক্তি বৃদ্ধি অল্পে অল্পে হইতেছে।

ডাইনীর ছেলে

শ্রীকালীপদ ঘটক

মানুষের মনে যে-কোন কারণে কোন রকমে যদি একবার সন্দেহের ছায়া পড়ে, তাকে একেবারে মন থেকে মুছে ফেলা সহজ কথা নয়। মনের অবচেতন অবস্থার মধ্যে আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকে সেই সন্দেহের বিষ, মাঝে মাঝে সময় বুঝে সে এক একবার উঁকি মারে। রাগদা জানে মা-বুড়ী তার নিষ্পাপ, কিন্তু তবু মিতন মাঝির কথাগুলো সে একেবারে ভুলে যেতে পারে না। আহারে রাগদার রুচি নাই, তীর ধনুক কাঁধে ফেলে শিকারে বেরিয়ে জঙ্গলের ধার থেকে ফিরে আসে রাগদা, শিকারে ওর মন ওঠে না, নাচগান আমোদ-আহ্লাদ রাগদা প্রায় ভুলতে বসেছে। থেকে থেকে রাগদার মনে এই প্রশ্নটা জেগে ওঠে,—লোকে বলে রাগদার মা ডাইনী, কেন বলে? এতকাল ত বলে নি, আজ তবে এমন কথা কেন বলে? শুধু মিতন মাঝি নয়, পাড়ার আরও দু-একটা লোকের কাছ থেকেও রাগদা আভাস পেয়েছে। স্পষ্ট কেউ বলতে চায় না, কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে বক্তব্য তাদের একই।

সেদিন রাগদার চোখে পড়ল ঘরের এক কোণে চুপড়িতে সাজানো রয়েছে ফুল বেলপাতা ধুপ ধুনা আতপ চাল হলুদ-বাটা সিন্দুর—আরও কত কি। রাগদার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল, মিতন মাঝির কাছে শুনেছে ডাইনীরা মাঝে মাঝে শ্মশান-বুড়ীর পুজো দিতে যায়। এসব উপচার কি তবে—না না, এসব রাগদা কি ভাবতে যাচ্ছে, এ কখনও হতে পারে না।

সকাল সকাল স্নান সেরে বুড়ী আজ একখানা হলুদ রঙের শাড়ী পরেছে। ছোট একটা পূর্ণঘট হাতে নিয়ে সে রাগদার সামনে এসে দাঁড়াতেই রাগদা জিজ্ঞাসা করলে—এগুলো কি হবে মা?

বুড়ী জবাব দিল—জাহির থানে পুজো দেব বেটা, ভাল দিন আজ—মঙ্গলবার; দেওতার দয়ায় বহু মায়ের আমার স্পর্শ হতে কোন বিঘ্ন হবেক নাই।

রাগদার বৌ সন্তানসম্ভবা, নবম মাসে পড়েছে। এ সময় একবার দেবস্থানে পুজা দিতে হয়। রাগদার এ কথা খেয়াল ছিল না, ওর মা-বুড়ী কিন্তু ভোলে নি, রাগদার ভবিষ্যৎ সন্তানের মঙ্গল-কামনায় দেবতার মনস্তুষ্টির আয়োজন করেছে বুড়ী।

রাগদার মা বললে, মুর্গি একটা ধরে দে বেটা! জাহির থানে বলি চাই।

রাগদার ছেলের জন্ত মানত, কোন্ মুর্গিটা দেওয়া হবে আগে থেকে রাগদা ভেবে রেখেছিল। মা-বুড়ীর কথা শুনে মনে মনে খুশী হয়ে উঠল রাগদা। তাড়াতাড়ি সে ছুটে গিয়ে বৌকে ডেকে বললে, মুর্গির ঘরের ঝাঁপটা একবার খোল্ ত।

রাগদার যে মুর্গিটা পালের সেরা সেটার ঠ্যাং দুটো কুক্রমের দড়ি দিয়ে বেঁধে চুপড়ির উপর চাপিয়ে দিলে রাগদা। রাগদার মা দেবস্থানে পুজা দিতে বেরিয়ে গেল।

রাগদার ছেলে হলে, বুড়ী বলে, ওর নাম রাখব টুয়াই, আর যদি মেয়ে হয় ত নাম হবে তার সুকুরমণি, ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক বুড়ীর কোন আপত্তি নাই, ও দুটোর উপরেই আগ্রহ বুড়ীর সমান। রাগদারই বা আপত্তি কি! হয় ছেলে, না হয় মেয়ে যা হোক একটা হলেই হচ্ছে। তবু যেন ছেলে হলেই রাগদা একটু খুশী হত। ছেলে ঠিক হবেই—রাগদার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকে বলবে টুয়াই মাঝি, রাগদা মাঝির বেটা।

অপূর্ব্ব এক পুলক-দোলায় রাগদার মন নেচে ওঠে। রাগদার ঐ ছেলের জন্তই মা-বুড়ী আজ ওর পুজা দিতে গেছে। মুংলীর বিয়েটা আগে চুকে যাক, তারপর আর একদিন বেশ ঘটা করে পুজোর ব্যবস্থা করবে রাগদা।

রাগদার মন খুশীর আমেজে ভরে ওঠে। চুপচাপ আজ আর বাড়ীতে বসে থাকতে পারলে না রাগদা, একপেট পান্তা ভাত খেয়ে নিয়ে তীর ধনুক কাঁধে ফেলে সে শিকার করতে বেরিয়ে গেল।

রাগদার মা পুজো দিয়ে বাড়ী ফিরছে, মাঝপথে রাগদার সঙ্গে দেখা। বুড়ী বললে—শিগগীর ফিরে আসিস বেটা, দেওতার পরসাদি লিবি এসে।

দেবতার প্রসাদ রাগদাকে নিতে হবে বৈকি। মা-বুড়ী তার পুজা দিয়ে এল রাগদারই ভালর জন্ত, রাগদারই সন্তানের মঙ্গলকামনায়। রাগদা মনে মনে একটা প্রণাম করলে জাহির থানের দেবতাকে। রাগদা বললে, চল্ মা, তুই ঘরে চল্, আমি এলাম বলে। জঙ্গল থেকে পারি ত একটা শশা-টশা মেরে নিয়ে আসি।

রাগদার মা ঘরে ফিরল, নদীতীরের পথ ধরে এগিয়ে চলল রাগদা। পাশের গাঁয়ের সাঁওতালদের কার একটা ছেলে মরেছে, কয়েক জনে মিলে শ্মশানে তাকে মাটি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল রাগদার। দূরে ঐ 'খাই রাক্ষসী'র শ্মশান, এ পর্য্যন্ত কত শতই না মৃতদেহ সমাহিত হয়ে গেছে ঐ শ্মশানের বুকে। আজ আর তাদের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নাই, শ্মশানের চিতায় ধুলো হয়ে মিশে গেছে সব। রাগদার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, ঐ শ্মশানেই আবার পুজা দিতে যায় ডাইনীর দল, পিশাচীরা নাকি ডাইনী-দের সঙ্গে খেলা করে ঐ শ্মশানের বুকে।

থমকে খানিক দাঁড়াল রাগদা—ওর মা-বুড়ী আজ পুজা দিয়ে গেছে গাঁয়ের বাইরে জাহির থানে। না না—পুজা সে নিশ্চয় জাহির থানেই দিয়ে গেছে বৈকি। শ্মশানে কি সে যেতে পারে, ভয় করবে যে! গাঁয়ের লোকের কথা বিশ্বাস করে না রাগদা, ওরা সব ডাঁহা মিথ্যাবাদী।

গাঁয়ের লোকে সত্যিই বলুক আর মিথ্যেই বলুক শিকার করতে আর যাওয়া হ'ল না রাগদার, বাঁ-দিকে মুখ ফিরিয়ে জাহির থানের শুঁড়ি পথ ধরে ধীরে ধীরে সে এগিয়ে চলল—জাহির থানটা একবার দেখতে হবে—সত্যিই সেখানে পুজা দেওয়া হয়েছে কি না।

বিস্তীর্ণ ফাঁকা ময়দানের এক প্রান্তে কতকগুলো শাল আর মহুল গাছ খানিকটা জায়গাকে প্রায় দুর্ভেদ্য করে রেখেছে। এক সময় এ সমস্ত ময়দানটাই হয়ত দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিল, গাছ-

গুলো সব বহুকাল আগে কাটা পড়ে গেছে। যে কয়েকটা নিশ্চিন্তে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর বয়স যে কত সে সম্বন্ধে সঠিক খবর আজ আর কেউ দিতে পারে না। এই ওদের দেবস্থান। মাঝখানে একটা মাটির বেদি, বেদির উপর শালকাঠে জড়ান আকার-প্রকারহীন খড়ের একটা কাঠামো, ঠিক মধ্যস্থলে খাড়া করে দেওয়া আছে। এই সাঁওতালদের বংহা, এরই সামনে এসে ভক্তিভরে পূজা দিয়ে যায় আশ-পাশের চার-পাঁচখানা গাঁয়ের লোক।

রাগদা চেয়ে দেখে বেদির আশেপাশে ছড়ান রয়েছে আতপ চাল ফুল বেলপাতা। তেল সিঁদুর গুলে বেদির সামনে খানিকটা লেপে দেওয়া হয়েছে। বেদির এক কোণে মাটির ধূপদানিতে একটু একটু তখনও ধোঁয়া উঠছে। বেদির সামনে মাটির উপর রক্ত—লাল টকটকে তাজারক্ত, রাগদার মানত করা মুর্গীটাকে এইখানেই বলি দেওয়া হয়েছে। রাগদার মা তাহলে পূজা দিয়ে গেছে ঠিকই। অথচ রাগদা ছাইভস্ম যা তা কি সব ভেবে মরছিল এতখানি। রাগদা কি তবে অবিশ্বাস করেছে ওর মাকে? না না—রাগদা ত তাকে অবিশ্বাস করে নি কোনদিনই, গাঁয়ের লোকে যাই বলুক—রাগদা আজও বিশ্বাস হারায় নি ওর মায়ের ওপর।

এর জন্ত যদি অজ্ঞাতে কোন অপরাধ ঘটে থাকে—'দেওতা'র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে রাগদা। বেদির সামনে সে গড় হয়ে একটা প্রণাম করলে। লোকের কথায় মা-বুড়ীকে সে ভুল বুঝবে না, মায়ের ওপর অবিচার করবে না রাগদা। মনে মনে একবার শ্রদ্ধাভরে মা-বুড়ীকে তার স্মরণ করলে রাগদা, মনটা অনেক হাল্কা হয়ে গেল।

এর পর আর শিকারে যেতে ধৈর্য্য থাকল না রাগদার, বেলা হয়ে গেছে অনেকখানি। কয়েক দিন ধরে শিকারে তার ক্রমাগতই বাগড়া পড়ছে। জাহির থান থেকে বাড়ী ফিরবার মতলব করে সবেমাত্র সে পা-টি বাড়িয়েছে এমন সময় মাথার ওপর একটা পাখী ডেকে উঠল। রাগদা চেয়ে দেখে গাছের ওপর এক জোড়া হরিতাল, মগডালে পাশাপাশি বসে, আছে দু'টোতে। রাগদার শিকারী হাত নিশপিশ ক'রে উঠল। তাড়াতাড়ি ধনুকে গুণ টেনে উপর দিকে তীর একটা ছেড়ে দিলে রাগদা, বাণবিদ্ধ হরিতাল ঝটপট করতে করতে নীচে এসে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু এ কি, পাখীশুদ্ধ তীরটা যে সজোরে এসে পড়ল সেই বেদির মাঝখানে। সাঁওতালদের বংহা—বেদিমধ্যস্থ ঐ খড়ের মূর্ত্তি, তারই গায়ে ঘ্যাচ ক'রে এসে বসে গেল তীরটা। হরিতালের তাজা রক্ত দেবমূর্ত্তির গা বেয়ে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল খানিকটা বেদির উপর।

রাগদা শিউরে উঠল। পাখী মারতে গিয়ে হঠাৎ সে আজ একি করে বসল। বংহার বেদি সে অপবিত্র করেছে, না বুঝে দেওতার গায়ে তীর মেরেছে। দেবস্থানে এসে আজ একটা এতবড় অনাচার যে সে করে বসবে, এ তার ধারণাতীত। অমঙ্গল—ঘোর অমঙ্গলচিহ্ন। এ পাপের যে কি ভয়ানক শাস্তি রাগদার জন্ত অপেক্ষা করছে—বংহাই জানে।

তীরটা তাড়াতাড়ি টেনে বের করে ফেললে রাগদা, পাখীটা ততক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। এক জোড়া পাখী, একটাকে তার একটি তীরেই শেষ ক'রে দিলে রাগদা, আর একটা তখন বাণবিদ্ধ তার সাথীটির দিকে চেয়ে চেয়ে মাথার উপর কাতর ভাবে চীৎকার করতে করতে এ ডাল ও ডাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল রাগদার, এমন তো কখন হয় না। এ হয়ত দেবতার অভিশাপ, মা-বুড়ীকে তার অবিশ্বাস করেছিল রাগদা, এ হয়ত তারই প্রতিফল।

অপরাধীর মত বেদির সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বার বার মাথা নুইয়ে গড় করতে লাগল রাগদা, মনে মনে একান্ত ভাবে সে প্রার্থনা করলে বংহা যেন তার অনিচ্ছাকৃত পাপের বোঝা হালকা ক'রে দেয়। রাগদা বলে যেতে লাগল —হা বংহা, অপরাধটে নাই লিবি ঠাকুর! পাখী মারতে গিয়ে তোর বুকে যে কাঁড় বিঁধবে, এ আমি ভাবতে পারি নাই। আমাকে তুই মাপ করিস—মাপ করিস দেওতা!

রাগদার বোন মুংলীর বিয়ের দিন কাছিয়ে এল। বরের বাপ 'লগন' বেঁধে গেছে সুতোয় সাতটা গেরো দিয়ে, সাত দিনের দিন 'মাড়োয়া'*—সন্ধ্যা বেলা 'সুলুংসালাং'†। তিন দিনে তিনটে গেরো ত খুলেই গেল, মাঝে আর চারটে দিন বাকি, তার পর দিন বিয়ে। যাবতীয় আয়োজন প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছে রাগদা, বোনের বিয়েতে কোন দিক দিয়েই অঙ্গহানি সে ঘটতে দেবে না। মহুলপাহাড়ীর হাঁসদারা নামকরা বনিয়াদি ঘর, 'হরকবাদির' সময় তাদের স্বীকার ক'রে যেতে হয়েছে যে রাগদা সরেস আদর আপ্যায়ন ও কুটুম্বিতায় তাদের চেয়ে খাটো হবে না। মুংলীর জন্তে ভাল ভাল গয়না গড়িয়েছে রাগদা, জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও বরিয়াতদের ভোজনাদির আয়োজন করে রেখেছে প্রচুর।

রাগদার বাড়ীতে মুংলীর বিয়ের তোড়জোড় চলতে লাগল। বিয়ের ঠিক তিন দিন আগে মহুল পাহাড়ী থেকে লোক এসে হঠাৎ খবর দিয়ে গেল—বিয়ে এখন বন্ধ থাকবে। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ রাগদা মাঝির বোনের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে বরপক্ষের ঘোর আপত্তি আছে। কারণটা যে কি মহুলপাহাড়ীর লোক সে কথা খুলে বললে না, এইটুকু শুধু সংক্ষেপে জানিয়ে গেল যে বরপক্ষ মত পালটেছে, সবাই বলছে বাং, অর্থাৎ এই বিয়ে হতে পারে না।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল রাগদা। বিয়ের সব ঠিক-ঠাক, আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্বদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে সে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। গাঁয়ের লোকে সবাই জানে মহুলপাহাড়ীর হাঁসদাদের বাড়ী রাগদার বোনের বিয়ে। এ অবস্থায় বিয়ে বন্ধ করা মানে রাগদার অপমানের চরম। কি এমন কারণ থাকতে পারে যার জন্তে বিয়ে হঠাৎ বন্ধ করা হ'ল!

রাগদার মা খবরটা শুনে একবারে মুষড়ে পড়ল। রাগদা বললে—মা, বিয়ে কিছুতেই বন্ধ করা চলবে না, মুংলীর বিয়ে ঐখানেই দিতে হবে, আর ঐ তারিখেই।

বুড়ী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—তা কেমন করে হয় বেটা, ওদের যে কারো মত নাই।

---

* মাড়োয়া—ছানলা নির্ম্মাণ, † সুলুংসালাং—তেলহলুদ।

রাগদা রাগে ফুলে উঠল, বললে—মত করবে ওদের বাপ। 'নোয়া'* ডেকে 'লগন বাঁধা' হ'ল, 'সুলুংসালাং' হ'ল, আর এখন বলে কি না—বাং। বাং এমনি বললেই হ'ল। চললাম আমি মহুলপাহাড়ী, দেখি কোন্ বেটা বিয়ে ভাঙ্গতে পারে।

বুড়ী বললে—বেটা, মিতনকে সঙ্গে নিলে হত নাই?

মিতন মাঝি, ঠিক কথা। মহুলপাহাড়ীর হাঁসদাদের সঙ্গে মিতনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। রাগদার স্মরণ হ'ল—আখের ডগা কিনতে মহুলপাহাড়ী গিয়েছিল মিতন, কাল সন্ধ্যায় সে বাড়ী ফিরেছে। সেখানকার খবরাদি মিতন হয়ত বলতে পারে। সংবাদটা জানতে হবে মিতনের কাছ থেকে।

তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল রাগদা। মিতনকে শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে সে মহুলপাহাড়ী রওনা হবে, বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে তবে সেখান থেকে বাড়ী ফিরবে রাগদা। মা-বুড়ীকে সে জানিয়ে গেল সন্ধ্যার আগে সে ফিরতে পারবে না।

মনে মনে দেওতার কাছে প্রার্থনা করলে বুড়ী। মুংলীর বিয়ের পাকা খবর নিয়ে রাগদা যেন বাড়ী ফিরে।

কিছুক্ষণ পরেই মিতনের বাড়ী থেকে ফিরে এল রাগদা, মহুলপাহাড়ী আর যাওয়া হ'ল না। মিতন মাঝি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে—বিয়ে ওরা কোনমতেই দেবে না।

বিয়ে যদি তারা না-ও দিত তবু রাগদার মনঃকষ্টের কারণ ছিল না ততখানি, কিন্তু যে কারণে তারা বিয়ে বন্ধ করেছে, রাগদার পক্ষে তা একান্তই মর্ম্মান্তিক। মিতন মাঝি সব কথাই খুলে বললে, চারি দিকে গুজব রটেছে রাগদার মা নাকি—ওঃ—এও রাগদাকে শুনতে হ'ল!

বাড়ী ফিরে রাগদা একটা খাটিয়ার উপর মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। বুকের ভিতরটা আঁকুপাকু করছে রাগদার, দম যেন ওর বন্ধ হয়ে আসছে, মিতন মাঝির কথাগুলো মনের মধ্যে ভেসে উঠে ওর মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরায় যেন এক একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। ডাইনী—ডাইনী—কি ভয়ানক কথা!

রাগদার মা খাটিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল। রাগদাকে হতাশ ভাবে শুয়ে পড়তে দেখে চিন্তিত হয়ে উঠল বুড়ী, ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে বেটা, অমন করে শুয়ে পড়লি যে?

বুকের ভিতরটা গুর গুর করে উঠল রাগদার, তাড়াতাড়ি সে উঠে বসল খাটিয়ার উপর, তীব্র ভাবে কিছুক্ষণ সে চেয়ে থাকল সাঁওতাল বুড়ীর মুখের দিকে।

রাগদার মা জিজ্ঞাসা করলে—বিয়ের কি হ'ল বেটা, ফিরে এলি যে?

কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল রাগদা—বিয়ে-টিয়ে হবেক নাই মুংলীর, সাফ ওরা জবাব দিয়েছে।

বুড়ী বিস্মিত হয়ে বললে—কেনে বেটা, অসময়ে জবাব দিলেক কেনে?

রাগদা বললে—তুঁয়েই জানিস।

—আমি? আমি কেমন করে জানব সে কথা!

* নোয়া—পুরোহিত।

সবিস্ময়ে বললে বুড়ী।

রাগদার দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল, তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল সে—তুই জানিস—বিলকুল তুই জানিস। তুই বেঁচে থাকতে আমার আর কল্যাণ নাই, তুই আমার মা নস—মহা শত্তুর। বেরো—বেরো তুই আমার সামনে থেকে।

অবাক হয়ে গেল বুড়ী। জীবনে কখনও ছেলের কাছ থেকে এমন কথা সে শোনে নি। বুক ফেটে কান্না এল বুড়ীর, বললে, বেটা।

রাগদা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, বললে, দূর হ—দূর হ তুই এখান থেকে, আমি তোর মুখ দেখতে চাই না।

রাগদার ভাবগতিক দেখে ওর সামনে দাঁড়াতে আর সাহস হ'ল না বুড়ীর। কে জানে, হয়ত বা সে অতিরিক্ত নেশা করেছে আজ কিম্বা হয়ত মাথাটা ওর একেবারেই খারাপ হয়ে গেল—কে বলতে পারে।

রাগদার সামনে থেকে সরে গেল বুড়ী।

মুখ গুঁজে আরও কিছুক্ষণ পড়ে থাকল রাগদা, মনটা আজ ওর ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে। মা-বুড়ীকে জীবনে সে এমনধারা অপমান করে নি কখনও। কাজটা কি ভাল হ'ল? রাগের মাথায় রাগদা গালাগালি দিয়ে সামনে থেকে দূর করে দিলে বুড়ীকে। কি তার অধিকার আছে বুড়ো-হাবড়া মায়ের উপর এমনধারা দুর্ব্যবহার করবার, কি এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যার জন্য সে অতটা কঠোর হয়ে উঠতে পারে। পরের কথায় নির্ভর করে এত উত্তেজিত হওয়া উচিত হয় নি রাগদার।

রাগদা আবার শান্তকণ্ঠে ডাক দিল—মা!

বুড়ী এসে সামনে দাঁড়াল।

রাগদা বললে—জল খাব—এক গেলাস জল।

কতকটা যেন আশ্বস্ত হল বুড়ী। রাগদার পাশে খাটিয়ার উপর বসে পড়ে বুড়ী একটা ডাক দিল—বহু!

রাগদা তাড়াতাড়ি বলে উঠল—তুই, তুই আমাকে জল এনে খাওয়া—নিজের হাতে।

বুড়ী মাটির কলসি থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে এনে রাগদার মুখের কাছে ধরে দিলে। রাগদা চোঁ চোঁ করে এক নিঃশ্বাসে গেলাসটা খালি করে দিয়ে মা-বুড়ীর দিকে চেয়ে বলে উঠল—মা, বল্ তুই রাগ করিস নাই।

আঁচল দিয়ে রাগদার মুখটা মুছিয়ে দিয়ে হেসে বললে বুড়ী—না বেটা তোর উপর কি রাগ করতে পারি!

রাগদার মুখেও ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল।

বিয়ে মুংলীর ভেঙ্গে গেছে, যাক—রাগদার তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু পাড়ায় রাগদা যেন আর মাথা উঁচু করে বেরুতে পারে না। ওর মা-বুড়ী সম্বন্ধে অপবাদ যে ভাল রকমেই রটেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সামনাসামনি ওকথা বলুক আর নাই বলুক, অন্তরালে অনেক কথাই বলে ওরা। প্রতিকারের উপায় নাই রাগদার, কার মুখ সে জোর করে চেপে রাখবে। লজ্জার সঙ্কোচে রাগদা যেন মিশে যায় মাটির সঙ্গে। ভাবতে ভাবতে রাগদার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে—মা-বুড়ী তার ডাইনী! লোকে বলে, কিন্তু বিশ্বাস হয় না রাগ-

দায়। বুড়ীকে সে একথা কোন দিন মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করতে পারে নি—যদি ভুল হয়। এর চেয়ে বুড়ীর গলা টিপে মেরে ফেলাও যে অনেক সহজ। কেউ বলে—সাঁওতাল বুড়ী ছেলে খায়, কেউ বলে লোকের উপর কুনজর দেয়, কেউ বলে বুড়ী রামা সাঁওতালের মেয়েটাকে আস্ত মেরে ফেলেছে। কেউ কেউ বা এমন কথাও বলে থাকে যে রাগদার মাকে তারা নিজের চোখে শ্মশানে যেতে দেখেছে—রাত্তির বেলা—ঘুরঘুটে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে। শুধু লোকের কথাই নয়, মিতন মাঝিও ওই কথাই বলে। কিন্তু কৈ রাগদাকে ডেকে ত কেউ দেখিয়ে দেয় নি কোন দিন। কত দিন রাগদা বিছানায় পড়ে পড়ে রাত জেগে কাটিয়ে দিয়েছে, বুড়ীকে ত কোন দিন বাড়ী থেকে বের হতে দেখা যায় নি। নিজের চোখে ওসব কিছু দেখলে ত বেঁচে যেত রাগদা, সন্দেহের দোলায় দিনরাত তাকে দুলতে হত না, সঙ্গে সঙ্গে এর একটা হিসেব নিকেশ হয়ে যেত।

মিতন মাঝি আবার নতুন কথা বলে—রাগদার বৌটাও নাকি খারাপ হয়ে গেছে, ওকেও নাকি ডান-মন্তর শেখাতে আরম্ভ করেছে বুড়ী, বৌটাকে সে গুণ করেছে। হয়ত একথা সত্যি, অথবা মিথ্যেও যে হতে পারে না তারও কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু রাগদার বৌটাকে শুদ্ধ মিতন মাঝির কেমন যেন সন্দেহ হয়।

সাংসারিক কাজকর্ম্মে রাগদার বৌ চব্বিশ ঘণ্টা সঙ্গে সঙ্গে ফেরে বুড়ীর, যেখানে যায় বৌটাকে বুড়ী সঙ্গে নিয়ে যায়। সংসারের জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওরা দু-জনেই, রাগদার তা ভাল রকমই জানা আছে। কিন্তু এর মধ্যে যে অপর কোন রহস্ত অজ্ঞাতে লুকিয়ে থাকতে পারে, বাইরে থেকে তা বোঝ-বার কোন উপায় নাই। বৌটা শুদ্ধ যদি সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে যায় তাহলে আর রাগদা সাঁওতাল বাঁচবে কি নিয়ে। ওই যে গর্ভস্থ সন্তান—রাগদার ছেলে—মায়ের পেটে যে লুকিয়ে আছে আজ, সেই বা আর ভূমিষ্ঠ হয়ে কোন্ কাজে লাগবে। সেও হয়ত একটা দানাদৈত্য বা ভূত-প্রেত হয়ে জন্মাবে অভিশপ্ত জীবন নিয়ে ধূমকেতুর মত। কি তার আবশ্তকতা।

রাগদার সোনার স্বপ্ন ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে যায়। ভেবে সে এর কূল-কিনারা পায় না। না না—এও কি কখনও হতে পারে, রাগদার ছেলে—সে হবে বাপকা বেটা, রাগদার ঔরসে যে তার জন্ম, বাপের মত তাকে হতেই হবে। যে যা বলে বলুক, বিলকুল সব বাজে কথা।

নিজের মনকে নানা প্রকারে বোঝাবার চেষ্টা করে রাগদা, কিন্তু তবু মন যেন সহজে বুঝতে চায় না, কোথায় যেন একটু-খানি ফাঁক থেকে যায়।

শিকারের নেশা ভুলে গেছে রাগদা, নাচগান ওর বন্ধ হয়ে গেছে, মাদলে আজ চাটি পড়েনি কতদিন। আগেকার মত নেশা করে আর আনন্দ মিলে কৈ, সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। রাগদা যে আজও বেঁচে আছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন রকমে চোখ বুজে সে দিন কাটিয়ে যায়।

সেদিন হঠাৎ মিতন মাঝি এসে রাগদাকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গেল। জঙ্গলের ধারে একটা নিরিবিলি ফাঁকা জায়গায় বসে কতকগুলো দরকারী কথা রাগদাকে জানিয়ে দিলে মিতন। রাগদার সাবধান হওয়া দরকার, তার মান-ইজ্জত এমন কি তার জীবন পর্য্যন্ত সবই আজ বিপন্ন। পাড়ার লোকে ব্যবস্থা করেছে খয়েরবনির জিতু হাড়ামকে ডেকে এনে গাঁ থেকে ওরা ডাইনী তাড়াবে, ডাইনীকে মন্ত্রের জোরে বাড়ী থেকে আকর্ষণ করে এনে উলঙ্গ অবস্থায় তাকে দশ জনের সামনে নাচানো হবে। জিতু হাড়াম মস্ত ওঝা, সব পারে ও। ডানডাকিনী চালনা করে জিতুর মাথার চুল পেকে গেছে। আর একটা কথা, জিতু হাড়াম গুণে বলেছে ডাইনী আর কেউ নয়, সে রাগদার মা টুসকি মেঝেন। দু-এক দিনের মধ্যেই জিতু হাড়াম এসে পড়বে, ডাইনীকে সে জব্দ করে ছেড়ে দেবে, কথা দিয়েছে।

নানা কথা শুনতে শুনতে রাগদা কতকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, এ পর্য্যন্ত সে ধৈর্য্য হারায় নি। কিন্তু নতুন এই সংবাদটা শোনার পর সত্যই রাগদা বিচলিত হয়ে পড়ল। তার মা গিয়ে নাচ করবে দশ জনের সামনে? উলঙ্গ অবস্থায়? ধিক্ রাগদার জীবনে। এমন মাকে—এমন মাকে রাগদা,—কি যে সে করবে, কি যে তার করা উচিত ভেবে রাগদা ঠিক করতে পারে না। তাই হোক—হাতে-নাতে আগে প্রমাণ হয়ে যাক, তার পর ভেবেচিন্তে যাহোক একটা কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলবে রাগদা। সে কর্ত্তব্য যত কঠোরই হোক, রাগদাকে তা পালন করতে হবে হাসিমুখে—অম্লান বদনে। তার জন্তে রাগদা প্রস্তুত।

মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য চারিদিকে যেন আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। চোখের সামনে খাঁ-খাঁ করছে বিস্তীর্ণ ময়দান, বনের হাওয়া গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঝড়ের দোলায় শোঁ-শোঁ শব্দে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শাল পিয়াল আর তালগাছের ডগাগুলোকে। রাগদার বুকটাও যেন সেই সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে, ঝলসে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ওর মনের ভিতরটা। রাগদার কপাল দিয়ে ঝর ঝর করে ঘাম ঝরছে।

মিতন মাঝি রাগদার দিকে চেয়ে একটু চিন্তিত ভাবে বলে উঠল—রাগদা, তুই বাঁচ, যেমন করে হোক নিজেকে তুই বাঁচা। তোরই যদি কোন ভালমন্দ ঘটে যায়, কে বলতে পারে।

ডাইনীর ছেলে, ভালমন্দ ঘটতে পারে বৈকি। ওদেরকে যে বিশ্বাস করা কঠিন।

রাগদা বললে—বাঁচব, যেমন করে হোক আমাকে বাঁচতেই হবে, মরতে ত আমি চাই না, মিতন।

মিতন মাঝি বলে উঠল, মা-বুড়ীকে তোর দূর করে দে বাড়ী থেকে, বৌটাকেও বের করে দে সেই সঙ্গে, আপদ লেঠা সব চুকে যাক।

বৌটাকেও? তা কেমন করে হতে পারে। মা-বুড়ীকেই বা সে কেমন করে বাড়ী থেকে দূর করে দেবে। তাদের অপরাধ?

মুখ চোখ রাগদার লাল হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে যেন তার আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। মিতন মাঝি আবার বললে—আমার

কথা শোন্ রাগদা, বিশ্বাস কর্ আমাকে, মা বুড়ী তোর নিঘ্যাত ডাইনী।

—কে বলে?

—সবাই বলে, আমিও বলি, ও বুড়ী ডাইনী।

—মিথ্যে কথা, বিশ্বাস করি না আমি।

রাগদার কণ্ঠস্বর আরও কঠোর হয়ে উঠল।

মিতন বললে—আমরা ওকে শ্মশানে যেতে দেখেছি, রাত্তির বেলা।

রাগদা চোখ পাকিয়ে বললে—হুঁসিয়ার মিতন, হুঁসিয়ার।

মিতন মাঝি থামল না, বললে—ও বুড়ী ছেলে খায়, আমরা ওকে—

—মি—ত—ন!

ক্ষেপে উঠল রাগদা, তাড়াতাড়ি সে দু-হাত দিয়ে মিতন মাঝির গলাটা হঠাৎ চেপে ধরে বললে—তোকে আজ আমি খুন করে ফেলব।

অবাক হয়ে গেল মিতন মাঝি, এতটা সে আশা করে নি। রাগদার হাত দুটো টান মেরে সে কোন রকমে সরিয়ে দিলে। রাগদা গম্ভীর গলায় বলে উঠল—সব শালাকেই চেনা গেল আজ, সব শালাই মিথ্যেবাদী। কিন্তু হুঁসিয়ার মিতন, রাগদা মাঝির খপ্পরে পড়লে সহজে তার নিস্তার নাই, জেনে রাখিস এ কথাটা।

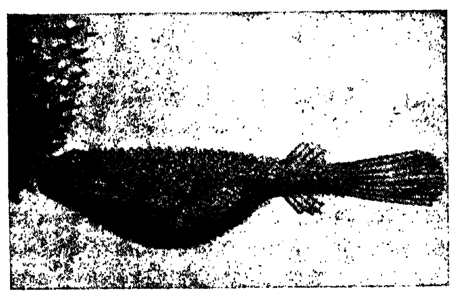
রাগদার সঙ্গে আর বাগ্‌বিতণ্ডা করতে প্রবৃত্তি হ'ল না মিতন মাঝির। বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে সে সরে পড়ল রাগদার সামনে থেকে। দাঁতে দাঁত চেপে রাগদা সেইখানেই ধপ করে বসে পড়ল।

ক্রমশঃ

ছিপ-শিকারী মাছ

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

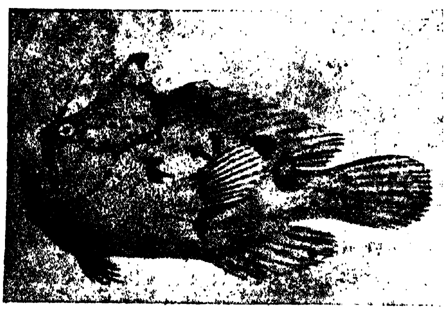
মাংসাশী পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদের মত বিভিন্ন জাতীয় মাছও শিকার ধরিবার জন্য বিবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। বিড়াল জাতীয় শিকারী প্রাণীরা প্রথমে যেমন গুড়ি মারিয়া শিকারের দিকে অগ্রসর হয় এবং সুযোগ বুঝিলেই তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে শিকারী মাছেরাও সাধারণতঃ সেইরূপ ভাবেই শিকার আয়ত্ত করে। চিল, বাজ প্রভৃতি পাখীরা যেমন উড়িতে উড়িতে অকস্মাৎ ছোঁ মারিয়া শিকার ধরিয়া লইয়া যায়, আমাদের দেশের চেলা জাতীয় সাধারণ বাতাসী মাছও সেরূপ ছুটাছুটি করিবার সময় অকস্মাৎ জলের উপর লাফাইয়া উঠিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে উড়ন্ত মশা-মাছি ধরিয়া উদরসাৎ করে। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অগভীর জলের কাঠ-কই বা তীরন্দাজ মাছের শিকার-কৌশলও অতীব বিস্ময়কর। জলের নিকটবর্ত্তী লতাপাতার উপর কোন কীট-পতঙ্গকে বসিতে দেখিলে দূর হইতে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তীরন্দাজ মাছ অতি সন্তর্পণে নিকটে অগ্রসর হইতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট পাল্লায় উপস্থিত হইবার পর মুখ হইতে খানিকটা জল পিচকিরির মত করিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে পোকাটার উপর ছুঁড়িয়া মারে। ডানা ভিজিয়া আকস্মিক ধাক্কায় পোকাটা জলে পড়িবামাত্রই শিকারী তাহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে। কোন কোন মাছ তাহাদের শরীরের বিষাক্ত কাঁটার ঘায়ে শিকারকে অসাড় করিয়া ধীরে ধীরে উদরস্থ করে। কয়েক জাতীয় মাছের শরীরে তড়িৎশক্তি সঞ্চিত থাকে। তাহাদের শরীরোৎপন্ন এই তড়িৎশক্তির আঘাতে তাহারা বৃহদাকার শিকারকেও অনায়াসে অচেতন করিয়া ফেলে। এইরূপ বিভিন্ন জাতীয় অন্যান্য অনেক মাছ তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিকার ধরিবার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যেরূপ ছিপ ফেলিয়া মাছ শিকার করে কোন মাছের পক্ষে শিকার ধরিবার জন্য সেরূপ কোন কৌশল অবলম্বন করা যে সম্ভব—সহসা একথা বিশ্বাস করিতে অনেকেই ইতস্ততঃ করিতে পারেন। কিন্তু কেবল দুই-এক রকমের নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন জাতীয় রকমারি এমন অনেক মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহারা ছিপ ফেলিয়া এবং ছিপের মাথায় আলোর টোপ দোলাইয়া শিকার সংগ্রহ করিয়া থাকে।



'সেরাটিয়াস্' জাতীয় পুরুষ মাছটি স্ত্রী-মাছের গায়ের অর্দ্ধদেহের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে

এই জাতীয় শিকারী মাছেরা সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের অধিবাসী। তবে অগভীর জলেও যে ছিপ-শিকারী মাছ দেখিতে পাওয়া যায় না এমন নহে। ছিপ ফেলিয়া শিকার আয়ত্ত করিবার মত একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন না করিলেও আমাদের দেশের জলাশয়ে কোন কোন মাছকে শিকার ধরিবার সময় এরূপ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। আমাদের দেশের জলাশয়ে চ্যাকভ্যাকা নামে পরিচিত অদ্ভুত একপ্রকার বিকট-দর্শন মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কখনও জলের মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায় না; জলাশয়ের তলদেশে কর্দ্দমের মধ্যেই

সর্ব্বদা আত্মগোপন করিয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং গাঢ় ধূসর অথবা কালো। মাথা ও মুখের দিক সম্পূর্ণ চেপ্টা এবং অসম্ভব রকমের চওড়া। মুখের হা এত বড় যে প্রধানত: উহার প্রতিই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কাদা-মাটির সঙ্গে ইহারা এমন বেমালুম মিশিয়া থাকে যে সতর্ক দৃষ্টি দিয়াও সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। ইহাদের মুখের উপরিভাগের শুঁড়গুলি ছোট ছোট ছিপের মত এমন ভাবে খাড়া হইয়া থাকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছেরা উহাদিগকে জলজ উদ্ভিদ বা অন্য কোন খাদ্যোপযোগী পদার্থ মনে করিয়া খুঁটিয়া খাইবার জন্য নিকটে আসিবামাত্রই তাহারা উহাদিগকে বিরাট্ মুখ-গহ্বরে পুরিয়া ফেলে।



এক জাতীয় ছিপ-শিকারী মাছ

বৃহৎ কাচের চৌবাচ্চায় অন্যান্য মাছের সঙ্গে বোয়াল মাছের বাচ্চা পুষিয়াছিলাম। একদিন দেখা গেল, প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা একটা বাচ্চা-বোয়াল জলজ লতাপাতার মধ্যে চুপ করিয়া রহিয়াছে। মনে হইল যেন মাছটা বিশ্রাম করিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই অতি ক্ষুদ্র এক ঝাঁক পুঁটি মাছের বাচ্চা সেদিকে আসিয়া উদ্ভিদের গায়ের শ্যাওলা খুঁটিয়া খাইতে লাগিল। কতকগুলি বাচ্চা, বোয়াল মাছটার ছিপের মত লম্বা শুঁড় দুইটিকেও খুঁটিতে আরম্ভ করিল। এতগুলি মাছ শুঁড় দুইটাকে খুঁটিতেছে অথচ তাহার যেন ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে যে মোটেই উদাসীন ছিল না, তাহার কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া পরক্ষণেই সে কথা বুঝিতে পারা গেল। বোয়াল মাছটা প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া চক্ষের নিমেষে বাচ্চা মাছগুলির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একসঙ্গে কয়েকটা মাছকে গিলিয়া ফেলিল। বাচ্চা মাছগুলি ভয় পাইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং যে যেখানে পারে লতাপাতার আড়ালে গা-ঢাকা দিল। এ ব্যাপারটা ছিপ ফেলিয়া শিকার আকৃষ্ট করার অনুরূপ হইলেও সর্ব্বদা যে তাহারা এরূপ ভাবেই শিকার করে তাহা নহে। বোয়াল-মাছ অনেক সময়েই ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে এবং সুযোগমত শিকারের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে।

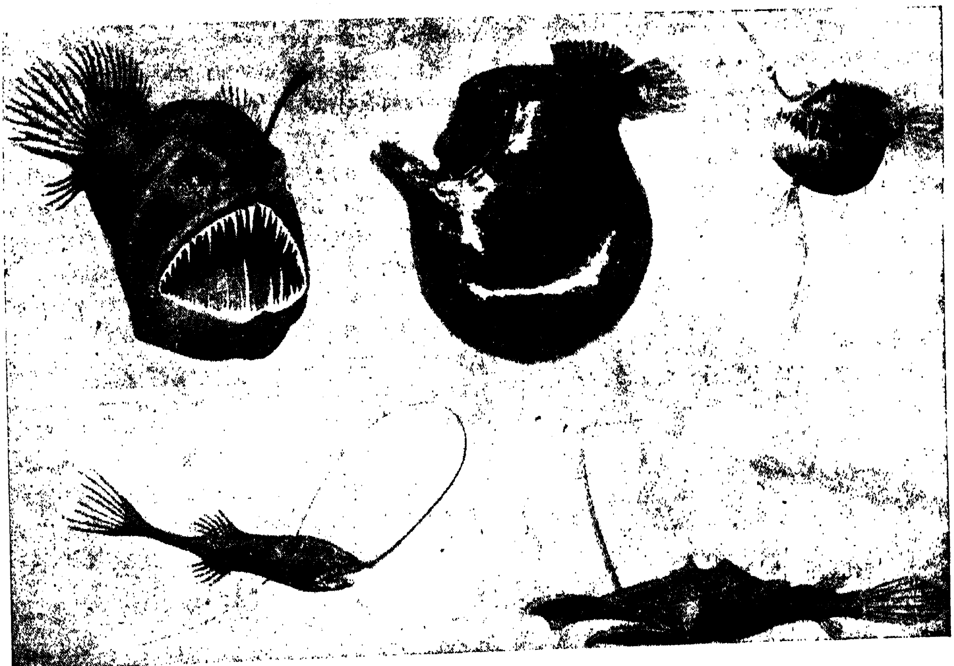
প্রকৃত ছিপ-শিকারী মাছেরা কিন্তু ছিপ ফেলিয়াই অন্যান্য মাছগুলিকে তাহাদের নিকটে আসিতে প্ররোচিত করে এবং নিকটে আসিবামাত্রই তাহাদিগকে ধরিয়া উদরস্থ করে। ইহারা গভীর সমুদ্রের মাছ। ছিপ-শিকারী মাছেরা সমুদ্রের যে অংশে বাস করে এত জল ভেদ করিয়া সেখানে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতে পারে না। সমুদ্রের সেই অন্ধকার তলদেশে তাহারা ছিপের সহায়তায় আলোর টোপ দেখাইয়া অন্যান্য মাছকে নিকটে আকৃষ্ট করে। ইহাই হইল তাহাদের শিকার ধরিবার একমাত্র কৌশল। সমুদ্র-জলের গভীরতা অনেক স্থলেই এত বেশী যে, সেখানে সাধারণত: মাইলের হিসাবেই পরিমাপ করিতে হয়। এরূপ গভীরতায় সূর্য্য-কিরণ প্রায় ২৫০ ফ্যাদম বা ৫০০ গজের নীচে প্রবেশ করিতে পারে না। সমুদ্রের গভীরতা যেখানে ৫০০ গজের মধ্যে সেখানেও নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার নীচে কোন প্রকার জলজ উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নাই। কারণ আলোর অভাব সেখানে উদ্ভিদের 'ফটো-সিন্থেসিস্' হওয়া সম্ভব নয়। মনে হইতে পারে, যেখানে উদ্ভিদের উৎপত্তি সম্ভব নয় সেখানে কোন প্রাণীরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু সেকথা ঠিক নহে। সমুদ্রজলের ৫০০ গজ নীচে এমন কি মাইলখানেক বা তারও নীচে অনেক রকম প্রাণী বিচরণ করিয়া থাকে। সমুদ্রের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীরতায় মৎস্য জাতীয় যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি সাধারণ মৎস্য অপেক্ষা অনেক বিষয়েই অদ্ভুত। জলের উপরের স্তরে যে সকল প্রাণী বাস করে তাহাদের পিঠের রং পেটের রং অপেক্ষা গাঢ়তর হইয়া থাকে। কিন্তু গভীর সমুদ্রের এই সকল মৎস্য জাতীয় প্রাণীদের পেট ও পিঠের রং সর্ব্বত্রই এক রকম—কালচে ধরণের। গভীর সমুদ্রের অন্ধকার



এই ছিপ-শিকারী মাছ তাহার মস্তকের আলোক-বর্ত্তিকাটিকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া অন্যান্য মাছকে নিকটে আসিতে প্রলোভিত করে

তলদেশে বিচরণকারী অনেক মাছের আলো-বিকিরণকারী কতকগুলি বিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে। অন্ধকারে এগুলিকে উজ্জ্বল আলোক-বিন্দুর মত দেখা যায়। 'ষ্টোমিয়াটয়েড' শ্রেণীর কয়েক জাতীয় মাছের শরীরের উভয় পার্শ্বে লম্বালম্বি সারবন্দি ভাবে এক অথবা একাধিক সারিতে কতকগুলি আলোক-বিন্দু সজ্জিত থাকে। অন্ধকারে জাহাজের আলোকিত পোর্টহোলগুলিকে যেমন সারবন্দি আলোকমালায় সজ্জিত দেখা যায় এই মাছগুলিও দেখিতে অনেকটা সেইরূপ। ইহারা সাধারণত: দলবদ্ধ হইয়া চলাফেরা করে। কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও এই আলোকরশ্মি দেখিয়া পুনরায় তাহারা একত্রিত হইতে পারে।

গভীর সমুদ্রের যাবতীয় মাছই হিংস্র মাংসাশী প্রাণী। ইহারা



উপরে—২৫০ হইতে ১০০০ ফ্যাদম জলের নীচে বিচরণকারী আলোকবর্ত্তিকাবাহী ছিপ-শিকারী মাছ,
বামে—'মেলানোসেটাস্' জাতীয় মাছ, দক্ষিণে—'লিনোফ্রাইন' জাতীয় মাছ

নীচে—
বামে—'জায়গ্যান্টিকাস্' এবং দক্ষিণে—'ল্যাসিওগ্ন্যাথাস্' নামক ছিপ-শিকারী মাছ

একে অন্যকে উদরসাৎ করিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গভীর সমুদ্রে ৫০০ গজের নীচে আলোর অভাবে গাছ-পালা জন্মিতে পারে না। ইহা হইতে স্বভাবতঃই একথা মনে হয়—সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে প্রাণীদের জীবিকানির্ব্বাহের মূল উপাদান কি? খুব সম্ভব জলের উপরিভাগ হইতে নিম্নে পতিত বিভিন্ন জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহই সমুদ্রতলবাসী প্রাণীদের জীবনরক্ষার মৌলিক উপাদান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরা এই সকল পদার্থ হইতে তাহাদের জীবনধারণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাদিগকে উদরসাৎ করিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর প্রাণীরা জীবিকানির্ব্বাহ করে। কথাটা একটু অদ্ভুত মনে হইলেও বাতাসের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ 'কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড' রহিয়াছে তাহা হইতে 'কার্ব্বন' বা অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া বিশালকায় উদ্ভিদাদির বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ব্যাপার হইতে বেশী অদ্ভুত নহে।

যাহা হউক, ৫০০ গজ বা তারও বেশী নীচে জলের চাপ অসম্ভব। তথাপি কিন্তু এত নীচে যে সকল মাছ বিচরণ করে তাহাদের পক্ষে এই চাপ সহ্য করিবার মত দৈহিক গঠনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। যখন টানা-জালের সাহায্যে যান্ত্রিক-কৌশলে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই মাছগুলিকে ধীরে ধীরে টানিয়া তোলা হয় তখন তাহাদিগকে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায়ই পাওয়া যায়। কারণ ধীরে ধীরে উত্তোলন করিবার কালে উপর ও নীচের চাপের তারতম্য তাহাদের শরীরের উপর খুব কমই ক্রিয়া করিতে পারে; কিন্তু টানা-বঁড়শীর সাহায্যে মাছগুলিকে যখন নীচ হইতে খুব তাড়াতাড়ি টানিয়া তোলা হয় তখন উপরের কম চাপে শরীরের বায়বীয় পদার্থসমূহ দ্রুত গতিতে বাহির হইবার সুযোগ পায় না বলিয়াই সেগুলিকে অসম্ভব রকমের স্ফীত দেখায় এবং ভিতরের চাপে চোখগুলিও কোটরের বাহিরে আসিয়া পড়ে।

সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত অগভীর জলে যে সকল ছিপ-শিকারী মাছ দেখা যায় তাহাদের মস্তকের সম্মুখভাগ হইতে প্রসারিত ছিপের নমনীয় প্রান্তভাগে টোপের মত ক্ষুদ্র একটি থলি ঝুলিয়া থাকে। মাছগুলি আশেপাশের অবস্থার সহিত গায়ের রং মিলাইয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু মস্তক হইতে প্রসারিত ছিপের সাহায্যে টোপটিকে অনবরত ধীরে ধীরে নাচাইতে থাকে। অন্য মাছেরা সেটিকে কোন জীবন্ত প্রাণী মনে করিয়া খাইবার লোভে সেখানে উপস্থিত হইবামাত্রই লুক্কায়িত শিকারী তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। আগন্তুক কোনক্রমেই টোপটিকে স্পর্শ করিবারও সুযোগ পায় না। ইহাদের মুখ-গহ্বরও বিশেষ প্রশস্ত; কাজেই শিকার সহজেই মুখের ভিতরে চলিয়া

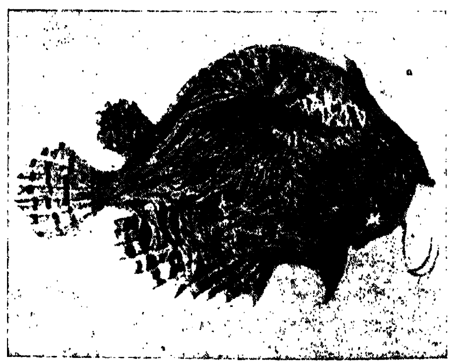
যায়। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশের মাছগুলি বিচরণ করে অন্ধকারে। এখানে টোপ ফেলিলে অন্য মাছের তাহা দেখিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রকৃতি এক অদ্ভুত উপায়ে তাহাদের এই অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। তাহাদের মস্তক হইতে প্রলম্বিত ছিপের ডগায় টোপের মত যে পদার্থটি থাকে তাহা কিঞ্চিৎ স্ফীত ছোট্ট একটি বিজলী-বাতির মত। এই বাতির মত স্ফীত স্থানে অবস্থিত এক প্রকার গ্রন্থি হইতে আলো-বিকিরক রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহার ফলেই স্ফীত পদার্থটাকে



'ফটোকোরিনাস্' জাতীয় ছিপ-শিকারী মাছ

আলোক-বর্তিকার মত মনে হয়। ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এই মাছেরা তাহাদের টোপের আলোটাকে ইলেকট্রিক বাতির ন্যায় ইচ্ছামত জ্বালাইতে ও নিবাইতে পারে। ওষ্ঠসংলগ্ন যান্ত্রিক কৌশলে ইহারা আলোক নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। টোপের আলোটি প্রজ্জ্বলিত হইলে অন্যান্য মাছেরা দূর হইতে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিকটে উপস্থিত হয়। নিকটে আসিয়া যাহাতে ইহারা টোপটিকে ঠোকরাইয়া নষ্ট না করিতে পারে সেজন্য তৎক্ষণাৎ আলো বন্ধ করিয়া দেয়। গভীর সমুদ্রের এই আলোর টোপ সংযুক্ত ছিপ-শিকারী মাছেরা 'সেরাটিয়ডিস্' নামক শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। এই 'সেরাটিয়ডিস্' শ্রেণীতে অন্ততঃ পক্ষে ৬০ রকমের বিভিন্ন জাতীয় ছিপ-শিকারী মাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই জাতীয় মাছের মুখ অসম্ভব রকমের চওড়া হইয়া থাকে এবং মুখের উপরে ও নীচে থাকে অনেকগুলি সূচ্যগ্র দাঁত। বোয়াল মাছের দাঁত হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহাদের উপর ও নীচের চোয়ালে পিছনের দিকে হেলানো অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাঁত থাকে। একটু চাপ দিলেই দাঁতগুলি পিছনের দিকে মুইয়া পড়ে; কিন্তু সামনের দিকে টানিলে দৃঢ় ভাবে খাড়া হইয়া থাকে। এই জন্যই শিকার বড় হইলেও অনায়াসে মুখের ভিতরে ঢুকিয়া যায়, কিন্তু বাহির হইবার উপায় থাকে না। গভীর জলের ছিপ-শিকারী মাছের দাঁতও ঠিক বোয়াল মাছের মত। একটু চাপ পড়িলেই পিছনের দিকে মুইয়া পড়ে; কিন্তু সামনের দিকে শক্ত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাদের মুখের হা যে কেবল চওড়া তাহা নহে, ইহা রবারের মত প্রসরণশীল এবং নমনীয়। কাজেই ইহারা নিজের দেহ অপেক্ষা বৃহত্তর মাছকে অনায়াসে উদরস্থ করিতে পারে। 'সেরাটিয়ডিস্' শ্রেণীর 'মেলানোসেটাস' এবং 'লিনোফ্রাইন্' গণভুক্ত এই ধরণের মাছ অনেক বার উপরের জলভাগে ধরা পড়িয়াছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, শরীর অসম্ভব স্ফীত হইবার ফলেই তাহারা উপরি ভাগের জলে ভাসিতেছিল। খুব সম্ভব বৃহত্তর শিকার লেজের দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া শিকারীসহ প্রাণপণ শক্তিতে উপরের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছিল। দাঁতের অপূর্ব্ব গঠনের জন্য চেষ্টা করিয়াও শিকারী শিকারকে ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। উপরের জলের চাপ কম হওয়ায়, শিকার সম্পূর্ণরূপে উদরস্থ হইবার পর অসম্ভব শরীর স্ফীতির দরুণ শিকারীর পক্ষে আর স্বস্থানে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

কয়েক জাতীয় ছিপ-শিকারী মাছের আলোক-বর্তিকা বা লণ্ঠনটি থাকে মাথার উপর ঠিক মুখের কাছে। কিন্তু অপরাপর কতকগুলি মাছের লণ্ঠনটি থাকে সম্মুখের দিকে প্রসারিত ছিপের মত একটি লম্বা দণ্ডের অগ্রভাগে। মাঝে মাঝে তাহারা লণ্ঠন দোলাইয়াও অন্যান্য মাছকে নিকটে আসিতে প্রলুব্ধ করে। 'ল্যাসিওগ্‌ন্যাথাস্' গণভুক্ত ছিপ-শিকারী মাছের লম্বা ছিপের মত নমনীয় দণ্ডটির অগ্রভাগে বঁড়শীর মত কয়েকটি পদার্থ ত্রিভুজাকারে সজ্জিত থাকে। ইহাদের মাথার উপরের প্রসারিত হাড়টি ছিপের গোড়ার দিকটির মতই শক্ত। তার পরে থাকে লম্বা সূতার মত

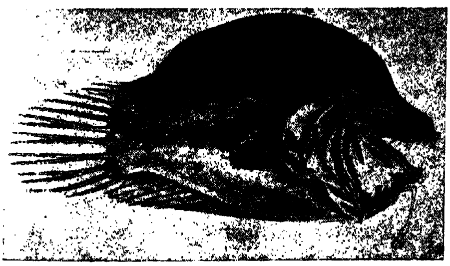


'ম্যাণ্টেনেরিয়াস্' নামক গভীর সমুদ্রের ছিপ-শিকারী মাছ

একটি পদার্থ এবং তাহারই ডগায় ঝুলিয়া থাকে বঁড়শীর টোপ। ইহাদের মধ্যে 'জাইগ্যানটিকাস' নামক মাছের ছিপের দৈর্ঘ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহাদের ছিপটা বাহির হয় ঠিক উপরের ঠোঁটের সম্মুখ ভাগ হইতে এবং সূতার মত পদার্থটা অসম্ভব রকমের লম্বা হইয়া থাকে।

ছিপ-শিকারী মাছেরা সাধারণতঃ আকৃতিতে খুবই ছোট হইয়া থাকে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকৃতির মাছও বিরল নহে। ইহাদের মধ্যে 'সেরাটিয়াস' গণভুক্ত মাছগুলি ৪০ ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হইয়া থাকে। সমুদ্রের তলদেশে খাদ্যের অভাব ঘটিলে এই জাতীয় পরিণতবয়স্ক মাছেরা সময় সময় কড্ জাতীয় মাছ শিকারের আশায় উপরের দিকে চলিয়া আসে।

ছিপ-শিকারী মাছের মধ্যে পুরুষজাতীয় মাছ বড় একটা দেখা যায় না। পুরুষ-মাছের সংখ্যা খুবই কম। বিশেষতঃ অন্যান্য সাধারণ মাছের মত ইহাদের পুরুষ-মাছগুলি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে না। ছিপ-শিকারী অধিকাংশ মাছের পুরুষেরা পূর্ণমাত্রায় পরভোজী। ইহারা স্ত্রী-মাছের সহিত চিরকাল অঙ্গাঙ্গীভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে। আকৃতিতেও ইহারা স্ত্রী-মাছ অপেক্ষা অসম্ভব রকমের ছোট। ৪০।৪৫ ইঞ্চি লম্বা যে কয়টি ছিপ-শিকারী 'সেরাটিয়াস' মাছ ধরা পড়িয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেরই উদর দেশে অথবা ঘাড়ের কাছে একটি করিয়া ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা পুরুষ-মাছ সংলগ্ন ছিল। কোন কোন স্ত্রী-মাছের গায়ে একাধিক পুরুষ-মাছ সংলগ্ন থাকিতে দেখা গিয়াছে। 'সেরাটিয়াস' এবং 'ফটোকোরিনাস'



প্রায় ২০০ গজ জলের নীচে বিচরণকারী ছিপ-শিকারী মাছ

জাতীয় পুরুষ-মাছের মুখের সম্মুখ ভাগ হইতে ছোট্ট একটি অর্ব্বুদ বাহির হয়। এই অর্ব্বুদটি স্ত্রী-মাছের গায়ের কোন একটি কোমল চর্ম্ম-গুটিকার সহিত মিলিত হইয়া কালক্রমে স্থায়ী ভাবে সংলগ্ন হইয়া যায়। তখন পুরুষ-মাছটির আর পৃথক সত্তা থাকে না। স্ত্রীর শরীর হইতে পরিচালিত রস-রক্ত দ্বারাই তাহার শরীর পুষ্টি-পুষ্ট হইয়া থাকে।

'এডিওলিকনাস' নামক পুরুষ-মাছেরা তাহাদের মুখের অভ্যন্তরস্থ শোষণ-যন্ত্র সাহায্যে স্ত্রী-মাছের গায়ে স্থায়ী ভাবে আঁটিয়া থাকে। ডিম হইতে বাহির হইবার পরই পুরুষ-মাছেরা স্ত্রী-মাছের গাত্রসংলগ্ন হইবার চেষ্টা করে। যাহারা কৃতকার্য্য হয় তাহারাই বাঁচিয়া যায় অন্যথায় মৃত্যু অনিবার্য্য। কারণ পুরুষ-মাছগুলির স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিবার কোনই যোগ্যতা নাই। ছিপ-শিকারী স্ত্রী-মাছেরা একবারে হাজার হাজার ডিম পাড়ে। তাহার গাত্রসংলগ্ন পুরুষ-মাছের দ্বারা ডিমগুলি নিষিক্ত হইবার পর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চাগুলি কিছুকাল একসঙ্গেই থাকে। কিন্তু উপযুক্ত খাদ্যাভাবেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক মাত্র দুই চারিটি বাচ্চাকে বড় হইতে দেখা যায়। এই সময়েই পুরুষ-বাচ্চাগুলি স্ত্রী বাচ্চার গাত্র সংলগ্ন হইতে চেষ্টা করে। নচেৎ একটু বড় হইবার পর পৃথক হইয়া পড়িলে পরস্পরের মিলিত হইবার সম্ভাবনা খুবই কমিয়া যায়। গাত্রসংলগ্ন হইবার প্রাক্কালে স্ত্রী-মাছের কিছু অস্বস্তিবোধ করা স্বাভাবিক; কিন্তু কিছুকাল পরে সংযোগস্থল মিলিত হইয়া গেলে স্ত্রী-মাছের পক্ষে পুরুষ-মাছ একটা বর্দ্ধিত উপাঙ্গ ছাড়া আর বেশী কিছু মনে হয় না। পৃথক ভাবে জন্মগ্রহণ করিলেও পুরুষ-মাছ পরে স্ত্রী-মাছের উপাঙ্গ হিসাবেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। স্ত্রী-মাছের মৃত্যুতে পুরুষ-মাছেরও মৃত্যু অবধারিত।

বৈশাখ

শ্রীগোপাললাল দে

বৈশাখ! এসেছ কি ?
উদয়ের পথে রক্তমাতাল কেন এ মূরতি দেখি ?
শ্যামলা ধরণী লাল হয়ে যায়, নবারুণ হয় কালো,
প্রভাতে প্রদোষে সহস্র হাতে কেবলি অনল ঢালো।
রোদনে তোমার বাজিবে বোধন ? চাহিয়া দেখ না ফিরে,
হাহাকার জাগে দেশ দেশ ভরি শত সিন্ধুর তীরে!
অন্ন বসন গৃহ সামান্য তাই নিয়ে তারা থাক্,
অল্প জীবনে স্বল্প এ সুখ ভাঙিও না বৈশাখ।

এই বৈশাখে এসেছে 'বুদ্ধ', উদিয়াছে নব 'রবি',
'অহিংসা' আর 'বিশ্বমৈত্রী' তোমারি আরেক ছবি;
একদা রচেছ বর্ণশরণ বিশাল ভারত তরি,
মহামানবের সাগরের তীরে বেয়েছ সোনার তরী;
কেমনে এমন বিষ হয়ে গেল মানবে মিলন-মেলা,
যুগ যুগ পূত আদর্শ দলি' ভৈরব! এ কি খেলা ?
এত যাওয়া আসা মিছে ভাব ভাষা, এত ঋষি হতবাক্,
কি আনিলে বৈশাখ ?

এ কি বিস্ময়! এ দিনেও পাখী ডাকে ?
শিরীষে পলাশে নিমে কাঞ্চনে কচি ফুল পাতা জাগে!
নব বারিধারে শীতল সমীরে ফিরে আসে মনোবল,
কাল-বোশেখীর ঝড় রেখে যায় শান্তিরে অচপল।
আমরা মানুষ, আশা আশ্বাসে বিশ্বাসে বেঁচে থাকি,
তবে কি এ দিনে ধ্বংসের মাঝে সৃজন রেখেছে ঢাকি ?
আহা তাই থাক্ থাক্,
যুগান্ত-ভয়-আবরণ টুটি এস নব বৈশাখ।

দুর্ভিক্ষের মৃত্যুসংখ্যা

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

"In any case there can be no dispute as to the broad fact, a dreadful fact, that in Bengal last year something like 700,000 human beings died as the consequence directly of starvation or to a much large extent to the effect of the ever-present epidemic diseases on constitutions impaired by under-nourishment."

এই কথা কয়টি ভারত-সচিব আমেরী সাহেব গত ২৮শে জুলাই বিলাতের কমন্স সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড়ই ব্যথার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মহামারীতে গত বৎসর বাংলায় মোট ৭ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে। এ দৃশ্যকে অতি ভয়াবহ ঘটনা বলে বর্ণনা করে ভারত-সচিব অতিরিক্ত দুঃখের সঙ্গে এ সত্যকে বক্তৃতার মধ্যে উদ্ঘাটিত করেছেন। বিলাতের সভ্যসমাজের নিকট ক্ষুধার জ্বালায় সাত লক্ষ লোকের মৃত্যু-সংবাদ অবশ্যই একটি ভয়াবহ ঘটনা ("a dreadful fact")। আসলে যে অনাহারে মৃত্যুসংখ্যা ও তার নিদারুণ দৃশ্যগুলি আরও কত ভয়াবহ ও নির্মম হয়েছিল যে সত্য প্রকাশ করার সৎসাহস ও নৈতিক জ্ঞান আর যারই থাকুক আমাদের ভারত-সচিবের যে নাই তা তিনি তাঁর এই দীর্ঘ দিনের কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে বারে বারেই প্রমাণ করে এসেছেন। তাঁর এই সাত লক্ষের মৃত্যুর হিসাব তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন তা আমরা জানি। তাঁর এই সংখ্যা যে কতখানি ভুয়া ও কাল্পনিক, এ প্রবন্ধে আমরা তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করব।

বাংলার দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা ও তার নির্মম দৃশ্যগুলিকে বিশ্বের সমক্ষে হাল্কা করে প্রচার করবার জন্য আমেরী সাহেব গত এক বৎসর ধরে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করে আসছেন। গত দুর্ভিক্ষের সময় যখন শুধু কলিকাতার প্রকাশ্য রাজপথের উপরেই দৈনিক একশতেরও উপর (সরকারী ঘোষণানুযায়ী) লোক অনাহারে মৃত্যুকে বরণ করছিল, ভারত-সচিবের হিসাবে সেদিন ছিল সমগ্র বাংলায় অনশনে মৃত্যুসংখ্যা প্রতি সপ্তাহে মাত্র এক হাজার বা দু হাজার। কিন্তু এ রকম একটা আন্দাজী খবরে সন্তুষ্ট না হয়ে বিলাতের জনসমাজ দুর্ভিক্ষের প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য আমেরী সাহেবকে চেপে ধরল। মিঃ আমেরী বেগতিক দেখে তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য নিজের মনগড়া তথ্য প্রচার করলেন যে, এই দুর্ভিক্ষ ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগ ইত্যাদিতে বাংলায় গত বৎসর মোট দশ লক্ষ লোক মারা গেছে। বিলাতের লোকে ভাবল যে আমেরী সাহেব যখন ভারতের ভাগ্যবিধাতারূপে উপবিষ্ট, তখন নিশ্চয় তিনি এই মৃত্যু-সংখ্যাটি ভারতীয় সরকারের নিকট থেকে সঠিক ভাবে পেয়েছেন। তাই তারাও সবাই চুপ করে গেল। তারা যে কতখানি প্রতারিত হ'ল তা বোঝা গেল ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের পরবর্তী এক বৈঠকে। প্রশ্নোত্তরে সেখানে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে এই সংখ্যা বঙ্গীয় সরকার বা ভারতীয় সরকার কেউই ভারত-সচিবকে দেন নাই। সুতরাং এ তাঁর এক মনগড়া সংখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নানারূপ সমালোচনা ও তীব্র নিন্দার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে আমেরী সাহেব যেন হঠাৎ অকূল পাথারে কূল পেলেন। ইতিমধ্যে বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগ (Directorate of Public Health in Bengal) তাঁদের ১৯৪৩ সনের মৃত্যুসংখ্যার রিপোর্ট সম্পূর্ণ করে দাখিল করলেন। মিঃ আমেরী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেই রিপোর্ট থেকে হিসাব-নিকাশ করে গত ২৩শে মার্চ কমন্স সভায় প্রমাণ করে দেখালেন যে, বাংলার দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মহামারীতে মাত্র ছয় লক্ষ অষ্টাশী হাজার আট-শ ছেচল্লিশ (৬,৮৮,৮৪৬) জন লোক সর্বসমেত মারা গেছে। তাই তিনি আনন্দের সঙ্গে সেদিন আরও বললেন যে ভগবানের ইচ্ছায় পূর্ব্বে যে সমস্ত বেশী মৃত্যুসংখ্যার হিসাব দেওয়া হয়েছিল, আজ সে সমস্তই ভুল প্রমাণ হয়ে গেল। সেদিনকার ভারত-সচিবের সেই আনন্দোচ্ছ্বাসের বাণী তাঁরই ভাষায় এখানে তুলে দিলাম। ঐ ছয় লক্ষ অষ্টাশী হাজার মৃত্যুসংখ্যার কথা উল্লেখ করে তিনি ঘোষণা করলেন,

"It is an approximate measure of the great economic disaster which afflicted Bengal last year. *I am glad, as all must be, that very much larger figures quoted in some quarters have turned out to be erroneous . . .*"

গত ২৮শে জুলাইয়ের বক্তৃতায় তিনি যে আবার সাত লক্ষ মৃত্যুসংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন, তা আর কিছুই নয় পূর্ব্বেকার ঐ বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের সেই ছয় লক্ষ অষ্টাশী হাজারেরই একটা পুরোপুরি হিসাব। আমরা এইবার এই প্রবন্ধে জন-স্বাস্থ্য বিভাগের এই মৃত্যুসংখ্যার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করব।

বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগ উপরোক্ত মৃত্যুর হিসাব দাখিল করেছেন প্রতিদিন জন্মমৃত্যুর যে রিপোর্ট (vital statistics) লিখান হয় তার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ এখানে সেই সব মৃত্যুরই উল্লেখ থাকে, যা মৃতের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধব মৃত্যু-রেজেষ্ট্রি অফিসে (Death Registration Office) গিয়ে লিখিয়ে আসে। এইরূপ মৃত্যুসংখ্যার উপর নির্ভর করে জনস্বাস্থ্য বিভাগ হিসাব করে দেখাচ্ছেন যে গত পাঁচ বৎসরে বাংলায় গড়পড়তা যত লোক মারা গেছে, ১৯৪৩ সনে তার থেকে মারা গেছে ৬,৮৮,৮৪৬ জন বেশী। সুতরাং তাঁদের মতে বুঝতে হবে যে এই সংখ্যক লোকই দুর্ভিক্ষে মারা গেছে।

এটা ঠিক জনস্বাস্থ্য বিভাগ বুঝিয়েছেন কি না বলতে পারি না, তবে আমেরী সাহেব কমন্স সভায় ঠিক এরূপ ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তাই সে দিন বক্তৃতা প্রসঙ্গে খুব জোরগলায় তিনি বলেছিলেন যে এই দুর্ভিক্ষে মাত্র ছয় লক্ষ উননব্বই হাজার লোক মারা গেছে, কারণ তিনি দেখালেন,

"The *recorded* deaths in 1943 from all causes exceeded the average *recorded* mortality during the previous five years by this figure."

কিন্তু বাইরে থেকে এই যুক্তি যতই সুকঠিন মনে হউক না কেন এর ভিতরে যে প্রকাণ্ড এক গলদ ও ভুল রয়ে গেল তা ভারত-সচিবের মত বিচক্ষণ ব্যক্তিরও যে অজ্ঞাত এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থিচর্মসার লোকগুলি হাটে মাঠে ঘাটে নালায় নদীতে পতঙ্গের মত ছটফট করে যখন একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল, সেই সময় তাদের

তদ্রূপ অবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে এই মৃত্যুসংবাদ বহন করে বহুদূরে অবস্থিত মৃত্যু-রেজিষ্ট্রী অফিসে হেঁটে গিয়ে এ খবর লিখিয়ে আসা একটা অসম্ভব ও হাস্যকর কল্পনা নয় কি?

আসলে যে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর কোন নামই রেজেষ্ট্রী অফিসে গিয়ে লিখান হয় নি, তার প্রমাণ পাই যদি আমরা এই জন-স্বাস্থ্য বিভাগের প্রদত্ত মৃত্যুসংখ্যা ও তাদের রিপোর্ট আরও বিশদভাবে আলোচনা করে তলিয়ে দেখি। দেখা যায় যে এই ৬,৮৮,৮৪৬ অতিরিক্ত মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে, কলেরায় মারা গেছে ১৬০,৯০৯, ম্যালেরিয়ায় ২৮৫,৭৯২ এবং বসন্তে ১৪,০৭৫। সুতরাং এই তিনটি রোগেই অতিরিক্ত মারা গেছে চার লক্ষ ষাট হাজার সাত-শ ছিয়াত্তর (৪,৬০,৭৭৬) জন। বাকি রইল ৬,৮৮,৮৪৬ — ৪,৬০,৭৭৬ = ২,২৮,০৭০ জন। উপরোক্ত তিনটি মহামারী ছাড়া আরও বহুবিধ রোগ আছে এবং বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে অন্যান্য রোগে দু'লক্ষ আটাশ হাজার সত্তর জন লোকের মৃত্যু হয়ে থাকবে। আর তাই যদি হয়, তবে আমেরী সাহেবের যুক্তি অনুসারে বলতে হয় যে দুর্ভিক্ষে বাংলায় একটি লোকেরও মৃত্যু হয় নি! ভারত-সচিব এ সংবাদে আরও উৎফুল্ল হবেন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলেছি, জনস্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট থেকে দুর্ভিক্ষের সঠিক মৃত্যুসংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। সুতরাং অন্যান্য বে-সরকারী লোকের দ্বারা প্রচারিত মৃত্যুসংখ্যাকে ভুল প্রমাণ করে ভারত-সচিব যে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন তা তাঁর নিম্নের উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে।

"I am glad, as all must be, that very much larger figures quoted in some quarters have turned to be erroneous . . "

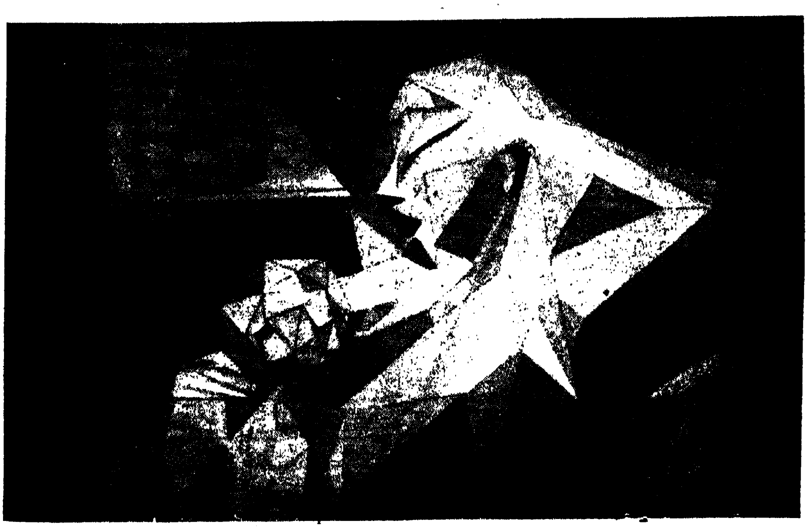
এ কথায় কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আসলে দেখা গেল ভারত-সচিব-প্রদত্ত সংখ্যাই কতখানি ভুল ও অস্বাভাবিক। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান ও দায়িত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শী লোকেরা বরাবরই বলে আসছেন যে দুর্ভিক্ষে প্রতি সপ্তাহে বাংলায় অন্যূন পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালী মতে গৃহীত সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে। এই বিভাগ দশটি দুর্ভিক্ষকবলিত জেলার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে ও দুর্গতদের হিসাব নিয়ে (Sample Survey) মন্তব্য করেছেন যে, সমস্ত বাংলায় তিন ভাগের দুই ভাগ লোক দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং অন্তত ৩৫ লক্ষ লোক ছয় মাসের মধ্যেই এর ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে:

"It will probably be an under-estimate of the famine to say that two-thirds of the total population were affected more or less by it and that probable total number of deaths above the normal comes to well over 3½ millions" in about six months.

সুতরাং যদি অনাহারেই শুধু ছয় মাসের মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়ে থাকে তবে তজ্জনিত দুর্ব্বলতা ও মহামারী দ্বারা যে কত লোকের প্রাণহানি হচ্ছে ও ভবিষ্যতে আরও হবে তা অনুমান করা অসম্ভব নয়। দুর্ভিক্ষের সময় এলাহাবাদের একটি সভায় বর্ত্তমান লেখক একটি প্রবন্ধে বলেছেন:

"The food crisis is being followed by a medical crisis. Those who escape to-day may die tomorrow in the grip of a countrywide epidemic which is already rampant, and this chapter of Indian history will be tainted with the horrible presence of a Black-death in Bengal."

আজকের দিনের দেশব্যাপী রোগ ও মহামারী বাংলার সেই চরম সঙ্কটের অগ্রদূত রূপে উপস্থিত হয়েছে। আজও যদি আমেরী সাহেবের একটু চৈতন্য হয়!



দুর্ভিক্ষে অনশনক্লিষ্ট সন্তান সহ মাতা [শিল্পী—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ

শ্রীঅমরবন্ধু রায়চৌধুরী, এম-এ

আজ আমরা ইতিহাসের একটি সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি। ইউরোপের রণাঙ্গনে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহা প্রাচ্য দেশসমূহকেও গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। শান্তিকামী অহিংস ভারতও শত্রুর আক্রমণ হইতে নিস্তার পায় নাই। শত বৎসরের নিরস্ত্রীকরণের ফলে আমরা হীনবল হইয়া পড়িয়াছি। পরাধীনতা আমাদিগকে জাতীয় সামরিক ঐতিহ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

ভারতে আবার স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হইতেছে। ভারতে আজ নবজাগরণ আসিয়াছে। রাষ্ট্রে ও সমাজে আমরা স্বাধীন হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। জাতীয় জীবনের এই শুভ সন্ধিক্ষণে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে, বুঝিতে হইবে কি করিয়া ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। সেই পটভূমিকায় স্থির করিতে হইবে ভবিষ্যৎ ভারতীয় সমাজের আদর্শ কি হইবে।

ইন্দোরে নিখিল-ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতিরূপে মাননীয় এম. আর. জয়াকর বলিয়াছিলেন যে, শিক্ষাপ্রণালী এমন হইবে যে তাহা স্বাধীনতা, সত্য ও সুন্দরের জন্য জ্বলন্ত বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে, যাহা জাতীয় শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের এই প্রকৃষ্ট সুযোগ। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই জগতের সমগ্র দেশের ন্যায় ভারতীয় সমাজেরও আমূল পরিবর্তন হইবে। সুতরাং আমাদের এখনই স্থির করা উচিত আমাদের জাতীয় শিক্ষার কি আদর্শ হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে আমাদের শিক্ষার আদর্শ স্থির করিতে হইলে প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তাহার উপরই ভিত্তি করিয়া শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনা করিতে হইবে। প্রাচীন শাস্ত্রীয় শিক্ষার আদর্শ হইল ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন করিয়া তোলা, স্বাধীনভাবে বিচার করিতে ও বিশ্বাস করিতে সক্ষম করা, ধ্যান-ধারণায় ও নিষ্ঠায় স্বাধীন করিয়া তোলা এবং আত্মবিকাশ ও আত্মানুভূতির প্রকাশে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা। (প্রবাসী মাঘ, ১৩৪৯)।

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে সেখানে বড় বড় বিদ্যালয় চলিতেছে অথচ সেখানে ছাত্রদের বেতন খুবই অল্প। "য়ুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য শিক্ষার উপায় আছে। কেবল গরীব বলিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশী দুর্মূল্য হইল? অথচ এই ভারতবর্ষেই একদিন বিদ্যা টাকা লইয়া বেচাকেনা হইত না' (শিক্ষার বাহন—রবীন্দ্রনাথ)।

'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, অথচ এই য়ুনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়াছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তার নিশ্চিতকাল নির্ণয় এখনও হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে য়ুরোপীয় য়ুনিভার্সিটির পূর্ব্বেই তাদের আবির্ভাব।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, দেড় শত বৎসর ইংরেজ রাজত্বের ফলে আমাদের দেশে শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ হার শতকরা মাত্র ষোল জন, তাহাও একমাত্র বাংলা দেশে। যে ভারতে একদিন জ্ঞানের দীপ প্রথম জ্বলিয়াছিল, যে ভারতের বন উপবন সামরবে মুখরিত হইয়াছিল সেই ভারত আজ পৃথিবীর অনেক দেশের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ব্রিটিশ রাজত্ব আমাদিগকে শুধু হীনবলই করে নাই, আমাদিগকে অমূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চ্চা হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে। আজ আমরা সত্যই 'নিজ দেশে পরবাসী' হইয়াছি।

ইংরেজ শাসনে ও ইংরেজ অনুপ্রেরণায় যে শিক্ষা এদেশে প্রচলিত হইয়াছে তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক ও অনাবশ্যক। 'শিক্ষা সমালোচনা' নামক পুস্তকে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে তাহা বলিতে গিয়া একথা বলিয়াছেন যে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কিনা তাহা স্থির করিতে হইলে একথা জানিতে হইবে যে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি জাতীয় স্বভাবের উপযোগী কিনা এবং উচ্চতম শিক্ষার আয়োজনে জাতীয় ভাষা ব্যবহারের বিধান আছে কিনা। এইভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা নয়। শিক্ষার কর্ত্তব্য সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য দেওয়া এবং মানবের মনকে আনন্দ দেওয়া। সৃষ্টিশক্তির বিকাশে যাহা সহায়ক হয় না তাহা প্রকৃত শিক্ষা নয়। প্রকৃত শিক্ষা তাহাই যাহা মনকে পরিপূর্ণ করে এবং তাহার পরিপূর্ণতা লাভে সহায়ক হয়।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার অস্বাভাবিক ফলাফলের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হের ফের' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না, ইহার অর্থ এই যে স্তূপ উচ্চ করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না। ইট, সুরকি, কড়ি, বরগা, বালি, চুণ যখন পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতলার ছাদ প্রস্তুত করো। অমনি আমরা সেই উপকরণ-স্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মত দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে?"

সুতরাং আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের ভাষা ও জীবনের এবং চিন্তাধারার কোন সামঞ্জস্য নাই।

পটভূমিকা হিসাবে এই কথাগুলি আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ বুঝিতে হইলে তখনকার সমাজের কথাও জানা দরকার। ভারতের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে তপোবনে, প্রাসাদে নয়। আমাদের প্রতিভা অন্তর্মুখী। রবীন্দ্রনাথ 'তপোবন' শীর্ষক নিবন্ধে বলিয়াছেন, "তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতরূপে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কি। সে সত্য প্রধানত বণিকবৃত্তি নয়, স্বারাজ্য

নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্য ব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্ত তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যত দিন তা না ঘটবে তত দিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, তত দিন নানাদিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি এক দিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদরূপে ছিল না, প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্ত অনুশাসন ছিল, সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই আমাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষাকে যদি সেই অনুশাসনের অনুগত করি—তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন ভাবে লাভ করবে এবং কোন সাময়িক বাহ্য অবস্থা তাহা বিলুপ্ত করতে পারবে না।

জ্ঞানের জন্ত ব্যাকুলতা ভারতের চিরন্তন ধর্ম্ম। শিক্ষালাভের জন্ত উপনিষদাদি গ্রন্থে তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই। কাশী, পাঞ্চাল, বিদেহ প্রভৃতি স্থানেই আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষার সমস্ত ভার সে যুগে রাজা ও সমাজ বহন করিতেন। শিক্ষার জন্ত কাহাকেও গলগ্রহ হইতে হইত না। শিক্ষাদান যেরূপ কর্ত্তব্য ছিল শিক্ষককে পালন করাও সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন 'শিক্ষার স্বদেশীরূপ' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, "গ্রীকদের মত জ্ঞান আমাদের দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। ইহার ক্রয় বিক্রয় চলে না। জ্ঞান ছিল এদেশে সবারই সাধনার ধন, সাধারণ সম্পদ। প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের অবসানে তপোবনের স্থানে গড়িয়া উঠিল বৌদ্ধ ও জৈন মঠ। বৌদ্ধরাজত্ব যখন হীনবল হইয়া আসিল তখন শৈব শাক্ত বৈষ্ণবাদি গুরুগণ নিজস্থানেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপে চতুষ্পাঠির সূচনা ভারতে হয়। অন্নসত্র ও জলসত্রের ন্যায় সর্বত্র ধনীরা জ্ঞানসত্র ও চতুষ্পাঠির প্রতিষ্ঠা করিতেন।…অধ্যাপক ও অধ্যাপক পত্নীদের স্নেহ ও প্রীতিতে ও ছাত্রদের শ্রদ্ধায় এই চতুষ্পাঠিগুলি ছিল জীবন্ত। বাহিরে তাহার জীবনযাত্রা একান্ত সাদাসিধা হইলেও তাহার অন্তরের প্রাণ সম্পদ ছিল অপরিমিত। এই চতুষ্পাঠিগুলির প্রাণের পরিচয় কয় জনে জানেন ?"

শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ওয়ার্ড নামক একজন ইংরাজ "হিন্দুর ইতিহাস, সাহিত্য ও পৌরাণিক ইতিকথা" নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তিনি কাশীতে ৮০টি এবং বাংলাদেশের শতাধিক চতুষ্পাঠির পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞানদীপ্ত কাশী যখন মধ্যযুগে জ্ঞান-গৌরব হইয়া যায় তখন মহিমময়ী রাণী ভবানী ও অহল্যাবাঈ ৩৬০ জন অধ্যাপককে কাশীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশীকে আবার হিন্দুর জ্ঞানতীর্থ করিয়া গিয়াছেন। আজও বারাণসীতে এই মহাজ্ঞানী পণ্ডিতেরা ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। সহস্র বৎসরের নির্যাতনের পরেও যে এদেশে জ্ঞানের আলোক প্রদীপ্ত আছে তাহাই ভারতীয় শাশ্বত কৃষ্টির নিদর্শন। যে জ্ঞান ও সভ্যতা সহস্র বৎসরের এত কঠোর নির্যাতনেও কণ্ঠরুদ্ধ হয় নাই তাহাতে অমৃত আছে।

মনুসংহিতায় জাতিভেদ ও প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ কর্ত্তব্যের কথা উল্লেখ আছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখেও এই কথা ব্যক্ত হইয়াছে—চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ। মনুসংহিতার শ্লোকগুলি এবং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে গুণ ও কর্ম্ম হিসাবেই চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ থাকা সত্বেও শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে বিদ্যার্জ্জন করা অবশ্য করণীয় ছিল। শিক্ষাদান করাও ব্রাহ্মণের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ছিল।

উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুগৃহে শিক্ষা ইত্যাদি হইতে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ বুঝিতে পারা যাইবে। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলেই বিদ্যারম্ভ করাইতে হইবে। উপনয়ন হওয়ার পরেই শিক্ষা আরম্ভ হইত। উপনয়ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ১৪৬-১৪৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে জন্মদাতা ও দীক্ষাদাতার মধ্যে যিনি বেদজ্ঞান দান করেন তিনি পূজ্যতর এবং সবিতার আরাধনা করিয়া দীক্ষাগুরু যে নূতন জন্মদান করেন তাহাই উত্তম জন্ম এবং সে জন্ম জরা মৃত্যু হইতে মুক্ত। যাহারা যথোপযুক্তকালে দীক্ষিত না হইতেন তাঁহাদের 'পতিত সাবিত্রিক' বলিয়া অভিহিত করা হইত। তাঁহারা সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে যোগ দিতে পারিতেন না।

উপনয়নের সময় যে বসন পরিধান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করা হইত তাহা ব্রহ্মচর্য্যের প্রতীক ছিল। পরাসর এইরূপ বলিয়াছেন, 'বৃহস্পতি যেরূপ ইন্দ্রের দেহের উপর অমর বসন পরিবৃত করিয়াছিলেন আমিও তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া এই বসনদ্বারা তোমাকে পরিবৃত করিতেছি। তুমি বলবান হও যশস্বী হও।" হিরণ্যকেশীর মতে ইহার তাৎপর্য্য আরও বেশী। ইহা শুধু দীর্ঘজীবনেরই নয়, ইহা সম্পদ মান এবং নিরাপত্তারও সূচক। ব্রহ্মচারী বালকের কোমরে যে উত্তরীয় বাঁধা হয় তাহার তাৎপর্য্য হিরণ্যকেশী এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে ইহা সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত ও সর্ব্ববাধা পরিত্রাণ করিবে।

শিক্ষাব্রতে দীক্ষিত হইতে হইলে ছাত্রকে কতকগুলি সর্ত্ত পালন করিতে হইত; তাহা হইলেই গুরু তাহাকে শিক্ষা দিতেন। ছাত্রকে সংযমী, মনোযোগী, মেধাবী, পবিত্র, ভক্তিমান হইতে হইত। মনুসংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ১০৯, ১১২ এবং ১১৫ শ্লোকেও তাহার উল্লেখ আছে। গুরুগৃহে শিক্ষারম্ভের যে অনুষ্ঠান হইত তাহার মন্ত্রগুলি পড়িলে মনে হয় যে আদর্শ চরিত্র গঠনই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল।

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে পবিত্র সম্বন্ধ ছিল তাহা শিষ্যকে

গ্রহণ করার সময় গুরু যে কথা বলিতেন তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। হৃদয়ের মধ্যে, মনে, বাক্যে, আনন্দে তিনি শিষ্যের সঙ্গে এক হইতে প্রার্থনা করিতেন। দীক্ষিত শিষ্যকে ব্রহ্মচারীর মত জীবনযাপন করিতে ও শ্রদ্ধা সহকারে বেদ অধ্যয়ন করিতে আদেশ দিয়া গুরু উপনয়ন কার্য্য সমাধা করিতেন।

তারপর তাহার ব্রহ্মচর্য্য ও স্বাবলম্বনের জীবন আরম্ভ হইত। মনুসংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ৫৩-৫৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে হৃষ্টচিত্তে মনোযোগ সহকারে ও কৃতজ্ঞ চিত্তে আহার করিতে হইবে। আহার অতি পরিমিত হইবে এবং উচ্ছিষ্টান্ন কাহাকেও দিতে পারিবে না।

ব্রহ্মচারীর ভিক্ষা করিতে হইত। প্রাণের সম্পদ যে ধনের সম্পদ হইতে বড় তাহা ভারতের মুক্তিকামী ঋষি বারবার প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীকেও গুরু সেই শিক্ষাই দিতেন। খাদ্য ও পানীয়ের মত ব্রহ্মচারীর বসনও তাহার কৃচ্ছ্র সাধনের উপযোগী ছিল।

তাহাকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিতে হইত। ত্রিসন্ধ্যায় স্নান অবসানে দেহ ও মনে তাহাকে ভগবানের প্রার্থনা করিতে হইত। এই প্রার্থনা অতি সমাহিত চিত্তে পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া করিতে হইত। নক্ষত্রগুলি অস্ত যাওয়ার পূর্ব্বে প্রার্থনা আরম্ভ করিতে হইত। সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনাও এই রূপ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রগুলি উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত করিতে হইত।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিলাসিতা নিষিদ্ধ ছিল। দিবানিদ্রা, আলস্য, বাচালতা, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিকে কঠোরভাবে বর্জ্জন করিতে হইত। তাহাকে বিনয়ী, সদালাপী, মৃদুভাষী ও ভক্তিমান হইতে শিক্ষা দেওয়া হইত। সমগ্রভাবে মানব শক্তির বিকাশ সাধন করিয়া মানবের কল্যাণ সাধন করাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল।

মনুসংহিতার দ্বিতীয় সর্গের ১৬৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মচারীকে সমগ্র বেদ ও রহস্যগুলি পড়িতে হইবে। ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাচীন ভারতে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তিনটি বেদ ছাড়াও সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠ করিতে হইত। জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির আলোচনায় মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সহায়তা হইত।

শিক্ষক ছাত্রের নিকট হইতে সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে কোন প্রণামী নিতে পারিতেন না। আর্থিক কোন লাভ না থাকাতে শিক্ষা শুধু শিক্ষার জন্যই দেওয়া হইত। শিক্ষকের ছাত্র নির্ব্বাচনেও স্বাধীনতা ছিল। তিনি ব্রহ্মচারীকে পরীক্ষা করিয়া মেধাবী ও সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত এবং বিদ্যাদানের উপযুক্ত মনে করিলেই শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন। শিক্ষায় ও শিক্ষকতায় এই ভাবে পবিত্রতা ও স্বাধীনতা থাকাতে ভারতীয় কৃষ্টির উৎস কোন দিন ধূলিমলিন হয় নাই।

মানসিক শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত পূর্ণ হইতে পারে না। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ ছিল পূর্ণ মানবিকতার বিকাশ। বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম্ম শিক্ষার ও আধ্যাত্মজ্ঞান বিকাশের কোন সুযোগ নাই। প্রাচীন শিক্ষার আদর্শ যে কত উদার ছিল তাহা প্রার্থনার মন্ত্র হইতেও হৃদয়ঙ্গম হইবে। গায়ত্রী মন্ত্রে প্রাতঃসূর্য্যের অরুণিমাকে প্রাণরসের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। তার পর মেধার জন্য ভাস্করের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। নিষ্ঠাবান হিন্দুর তর্পণের বিধি আছে। প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া বিশ্বজীবের তৃপ্ত্যর্থে এক গণ্ডূষ জল দিতে হয়। পিত্রাদির তর্পণের পর ত্রিভুবনের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করিতে হয়।

ব্রহ্মচর্য্য পালন, নিয়মিত বেদ উপনিষদাদি পাঠ ও উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষা পাওয়াতে শিক্ষাব্রতী অতি অল্প সময়েই শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে শিক্ষা এক রকম বাধ্যতামূলক ছিল বলিয়া মনে হয়। অব্রাহ্মণও যে মহাজ্ঞানী হইতে পারিতেন তাহা বিদেহরাজ জনক ও অজাতশত্রুর দৃষ্টান্ত হইতেই প্রমাণিত হয়। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কালক্রমে জাতিভেদ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রত্যেকেই স্ব স্ব কার্য্যেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভের দিকে মনোযোগ দেয়। তাহাতে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রালোচনায়, ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বিদ্যালোচনায় এবং বৈশ্য শিল্প বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সূচনা ভারতবর্ষেও হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সমাজে নানা কারণে স্ত্রী-স্বাধীনতা খর্ব্ব হওয়াতে অনেকেরই এই ধারণা জন্মিয়াছে যে প্রাচীন ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না। প্রাচীন কালেও যে স্ত্রী-শিক্ষা ছিল এবং অতি উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল তাহারও প্রমাণ আছে। লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা প্রভৃতি বিদুষী মহিলারা বেদের স্তোত্র পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন বলিয়া পণ্ডিতদের বিশ্বাস। বিদেহরাজ জনকের উপস্থিতিতে মহাজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সহিত তর্ক আলোচনা করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী বিদুষী মৈত্রেয়ীর নাম চিরস্মরণীয়। কালক্রমে সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্ত্রী-শিক্ষার ও স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও নারী তাহার মর্য্যাদা ভারতে পাইয়াছে। মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪৭-১৪৯ শ্লোকে তাহার অধীনতার কথা আছে। কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধিৎসা তাহার মন হইতে কোন দিনই তিরোহিত হয় নাই। শত বাধা অতিক্রম করিয়াও এই দেশেই অহল্যা বাঈ রাণী ভবানীর মত তেজস্বিনী নারীর এবং মীরাবাঈয়ের মত মহিমময়ী বিদুষী নারীর জন্ম হইয়াছিল।

আজ আবার ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতার বাণী জাগিয়া উঠিয়াছে। ভারতের প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা এবং স্বাধীনতার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। শত সহস্র বিদুষী ও মহিমময়ী মৈত্রেয়ী সীতা সাবিত্রীর গুণগানে ভারত আবার মুখরিত হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের 'কমলা স্মৃতি অভিভাষণে' ডাঃ অ্যানি বেশান্ত বলিয়াছিলেন যে, ভারতের সভ্যতার উৎস প্রাসাদ নয়, তপোবন। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'তপোবন' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, "তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ী ভাবে আঁকা পড়েছে

ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্ত্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান মূর্ত্তি।" এই বিলাস-মোহমুক্ত আনন্দের বাণীই ছিল ভারতের মুনিঋষিদের আদর্শ এবং সেই শিক্ষার স্মৃতিই এত সহস্র বৎসরের নির্যাতনের পরেও আজও ভারতকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা যাহারা বহু ক্লেশে এবং অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত সংরক্ষণ করিতেছেন তাঁহাদের কথা আজ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি না। 'শিক্ষার স্বদেশীরূপ' প্রবন্ধে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "আমরা দরিদ্র, যথেষ্ট ধন দান করিতে অসমর্থ, কিন্তু শ্রদ্ধা ও সম্মানও যদি না দেই তবে যোগ্য পাত্রদের পাইব কেমন করিয়া?...আমাদের ভবিষ্যৎ সাধনার জন্ত যে-সব বাধা জমিয়া উঠিয়াছে চতুষ্পাঠিকে সেই সব হইতে মুক্ত করিতে হইবে। জাতি বর্ণ নারী পুরুষ নির্বিশেষে চতুষ্পাঠির দ্বার সকলের কাছেই করিতে হইবে অবারিত। বায়ু, আলোক, আকাশের ন্তায় শাশ্বত প্রাণবস্তুতে সকলেরই যে সমান অধিকার।"

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে যে চিরন্তন সত্য ছিল তাহার প্রমাণ আমরা এ যুগেও পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের বাণী বেদ ও উপনিষদের অমৃতময়ী বাণীরই সুষ্ঠু প্রতিধ্বনি। আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করিয়াও পাশ্চাত্য শিক্ষায় পারদর্শী হইতে পারি। মুসলমান রাজত্বেও আমরা তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যকে অবহেলা করি নাই। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম হইতেই আমরা তাহাদের যাহা কিছু উত্তম তাহা গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা নয়। ইংরেজী অথবা বিদেশী ভাষা আমরা আগ্রহ সহকারে শিক্ষা করিব। কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের উচ্চতম শিক্ষায়ও মাতৃভাষার আদর না হয় তত দিন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত শিক্ষা পাইব না। মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়াতে কিরূপ কুফল ফলিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার বাহন' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন। তাহাতে শিক্ষা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দেশী খাঁড়া ভরবার ব্যায়াম।...তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া গোটা ইংরেজী বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সে রকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব কয়জনের কাছে আশা করা যায়?"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে শুভ সমন্বয় হইতে পারে তাহা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনে ও কর্ম্মে প্রতিভাত হইয়াছে।

'প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা' নামক ইংরেজীতে লেখা পুস্তকে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার অধ্যাপক ডাঃ অল্টেকার প্রাচীন ভারতে সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ স্নাতকদিগকে উদ্দেশ করিয়া যে কথা বলিতেন তাহার একটি উদাহরণ তৈত্তিরীয় উপনিষদ হইতে তুলিয়া দিয়াছেন :

"সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥ ১।১১।১

—["সত্য বলিবে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে না। আচার্য্যের জন্ত অভীষ্ট ধন আহরণান্তে (গৃহস্থাশ্রমে গিয়া) সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। আত্মরক্ষা বিষয়ে অনবহিত হইও না। বিত্তবলাভার্থক মঙ্গলজনক কার্য্যে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হইও না।—স্বামী গম্ভীরানন্দের অনুবাদ]।

প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি আত্মসম্মান, ব্যক্তিত্ব, সংযম, আত্মনির্ভরশীলতা, পরোপকার এবং নিজের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়া জাতীয় চরিত্র গঠনে সহায় হইয়াছিল। এই চরিত্রগঠনের ফলেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বীরত্ব ও ত্যাগের মহিমা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এই চরিত্রবল এবং আত্মশক্তিই রাজপুত, মারাঠা এবং শিখ জাতির জীবনের উৎস, এই শিক্ষাই তাহাদিগকে দেশ ও সংস্কৃতির জন্ত আত্মবিসর্জ্জন দিতে প্রেরণা দিয়াছিল। রাজপুত বীরাঙ্গনাদের কাহিনী ইতিহাস চিরকাল স্মরণ করিবে। যত দিন মানুষ সত্য, স্বাধীনতা ও পবিত্রতার পূজা করিবে তত দিন সশ্রদ্ধ ভাবে এই পুণ্য কথা স্মরণ করিবে।

আজ আবার আমাদের জাতিকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। অখণ্ড ভারতের মহিমময়ী মূর্ত্তি আজ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের জাতির লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে আজ আবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। যে দেশে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত লিখিত হয়, যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন সে দেশ কোন দিন মরিতে পারে না। আমরা অমৃতের পুত্র। সহস্র বৎসরের নির্যাতনের ফলেও যে দেশে 'মৈত্রী করুণার মন্ত্র দিতে দান' ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, যে দেশে শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাব হয় সে দেশের মৃত্যু নাই। আজও সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। আজও পঞ্চনদীর দেশে অহিংসার জীবন্ত বাণী লইয়া মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জাতির দুঃখদিন অবসানে সৌভাগ্যের দিনমণি আবার উদিত হইবে। ভারতের শুভদিন আগতপ্রায়।

সমগ্র পৃথিবী আজ আতঙ্কগ্রস্ত। সভ্যতার উত্তুঙ্গ সৌধ আজ মুহূর্ত্তে ধ্বসিয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার যাহা কিছু উত্তম তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। পৃথিবীকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইতে মুক্তি দিতে হইবে। 'সভ্যতার সঙ্কট' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জ্বালাময়ী ভাষায় সাম্রাজ্যবাদের শোচনীয় পরিণামের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আশা করিয়া গিয়াছেন যে পরিত্রাণকর্ত্তার আবির্ভাব আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরেই হইবে। এ যুগের মহামানব মহাত্মা গান্ধী সেই মুক্তির বাণীই প্রচার করিতেছেন।

আমরা আমাদের জাতীয় প্রাণরস হইতে বঞ্চিত। হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইবার মত শিক্ষা ও সাধনার সুযোগ আজ আমাদের নাই। শতবৎসরের নির্যাতনের পরেও আমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রকৃত শিক্ষার প্রদীপ ভারতের প্রত্যেকটি কুটীরে জ্বালাইতে হইবে—যেন সেই দীপালোকে ভারত ভারতীকে বরণ করিয়া লইতে পারি। সে শুভদিন আগতপ্রায়।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

অধ্যাপক এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী

আজ কয়েক বছর যাবৎই এই দিনে নববিধান ব্রাহ্ম-মন্দিরের সম্পাদক মহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে আমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের সুযোগ দিয়ে বাধিত করেছেন। ইতিপূর্ব্বে আমার মতামতও "নববিধান" কাগজে ছেপে আমাকে ধন্য করেছেন। প্রত্যেক বছরই নতুন কিছু বলা শক্ত। এ সত্ত্বেও এবারও মহাত্মা কেশবের এই স্মৃতিবার্ষিকী সভাতে উপস্থিত হবার লোভ সামলাতে পারিনি।

ইংরেজী ভাষায় কেশবচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা বিশ্ব-বিশ্রুত। যে কয়জন মুষ্টিমেয় ভারতবাসী এই বিদেশী ভাষায় অপূর্ব্ব অধিকার অর্জ্জন করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম—এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু কেউ কেউ যে বলেন, কেশবচন্দ্রের বাংলা ভাষার উপর বিশেষ অধিকার ছিল না একথা ঠিক নয়। রবীন্দ্রপূর্ব্ব যুগে যে-সব বাঙালী গন্ত লিখে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি তাঁদের এক জন। কেশবচন্দ্রের বাংলা লেখা ইদানীং আমার পড়বার সুযোগ হয়েছে। তিনি অতি চমৎকার প্রাঞ্জল বাংলা লিখতেন। তিনি ঠিক কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন নি, কিন্তু চল্‌তি ভাষার দিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক। পরবর্ত্তী যুগে বীরবল প্রভৃতি কথ্য ভাষার লেখকেরা কেশবচন্দ্র থেকে যে-কোন প্রেরণাই লাভ করেন নি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না।

আর একটি মতের সঙ্গেও আমি সায় দিতে পারি না। বলা হয়েছে যে কেশবচন্দ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে খুব পরিচিত ছিলেন না। সে হেতু হিন্দু দর্শনের প্রাণবস্তুর সঙ্গেও তাঁর কোনোদিন বিশেষ পরিচয় ঘটে নি।

সংস্কৃত-সাহিত্য বা হিন্দু দর্শনের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কতখানি পরিচয় ছিল তা আমার ঠিক জানা নেই। তবে তিনি যে একান্ত ভাবেই ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং তিনি যে ছিলেন ভারতীয় কৃষ্টিরই প্রতীক—এ বিষয়ে আমার মনে কোনোদিনই কোনো সন্দেহ জাগে নি।

কীট্‌স গ্রীক সাহিত্য বা দর্শন সম্বন্ধে পড়াশুনা না করেও হেলেনিক সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র ত ছিলেন এই ভারতেরই সন্তান। আমাদের অজ্ঞাতসারেই যেমন আমরা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করি, সামাজিক বা ধর্ম্মীয় ভাবধারাও তেমনি আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করে থাকি। কয়জন হিন্দু বা মুসলমান তাঁদের স্ব-স্ব ধর্ম্মগ্রন্থ পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পড়েছেন জানি না, কিন্তু তাঁদের ধর্ম্মের বিশিষ্ট ভাব-ধারার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত নন এ কথা বলার দাম্ভিকতা আমার নেই। ধর্ম্মভাব চিরকাল পুঁথিপত্রেই আবদ্ধ থাকে না। জন্ম-ভূমির আকাশে-বাতাসেই জাতীয় কৃষ্টির ভাবধারা ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে থাকে এবং জন্মের পর থেকেই মানবশিশু তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে।

কেশবচন্দ্র যে সমন্বয়ের ধর্ম্ম প্রচার করে গেছেন সে যে একান্তভাবে এই ভারতেরই জিনিস সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ এঁরা কেউই নূতন কোন কথা ভারতকে শুনান নি—এরা ভারতের চির-পুরাতন আদর্শকেই নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে গেছেন। তাঁদের কৃতিত্ব এখানে যে, যে সনাতন আদর্শ লোকে প্রায় ভুলে গিয়েছিল সেই আদর্শ তাঁরা আবার দেশবাসীকে শুনিয়ে গেলেন। এরা আকবর, কবীর, দাদু, দেবরাজ প্রভৃতিরই উত্তর-সাধক—ধর্ম্মে সমন্বয় স্থাপন ভারতীয় কৃষ্টিরই এক বিশিষ্ট দিক।

পাশ্চাত্ত্যের সংঘাতে যে মনীষার উদ্ভব তিনি হলেন রাজা রামমোহন। রামমোহনকে দেখি আমরা সাধারণতঃ যুক্তিবাদী হিসাবে, বুদ্ধির অপূর্ব্ব প্রাখর্য্য তাতে দেখা যায়। কিন্তু তার ভিতর যে ভাবাবেগ আদৌ ছিল না একথাও বলা চলে না। রামমোহনের গান ও প্রার্থনাগুলির সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন কত নিবিড় ভাবাবেগ তাঁর মধ্যে ছিল। তবে যে যুগে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে-যুগে তাঁকে যুক্তির খর তরবারি হাতেই ঘুরতে হয়েছিল বিভ্রান্ত জাতিকে নিশ্চেষ্টতা ও গতানুগতিকতার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে। ঐ যুক্তিবাদীর আদর্শ অনুসরণ করাই ছিল তাঁর পক্ষে প্রকৃষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিগত ভক্তিবাদ অনেকটা সামঞ্জস্য লাভ করে। কেশবচন্দ্র ভক্তিবাদের দিকেই বেশী ঝুঁকেছেন, কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মমতকে তখন বিশিষ্ট মতবাদে দাঁড় করাবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনে কেশবচন্দ্রের নিজস্ব দান এইটুকুই এবং তাঁর ভাবতন্ময়তার কথা ভাবতে গেলে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে আমি তাঁর চারিত্রিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে থাকি।

রামমোহনের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম করায় হয়ত অনেকে আশ্চর্য্য হয়েছেন, কারণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মমত রামকৃষ্ণের আন্দোলনের পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এঁরা আদৌ বিরোধী মত আশ্রয় করে ছিলেন না। কেবল তাঁদের লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছবার পথ অবলম্বনে যা ছিল পার্থক্য। রামমোহন চেয়েছিলেন তৌহিদ বা উপনিষদের দর্শনের ভিত্তিতে ধর্ম্মের সমন্বয় স্থাপন করতে; রামকৃষ্ণ পৌঁছে-ছিলেন এই সমন্বয়ে ভক্তিবাদের ভিতর দিয়ে। মূলতঃ তাঁদের আদর্শ ছিল একই। তাঁরা যে ভাবে জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন তা ছিল অনেকটা যুগোপযোগী। কেশবচন্দ্র যেন রামমোহন ও রামকৃষ্ণের মাঝখানে সেতুস্বরূপ: যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ অপূর্ব্ব সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর জীবনে।

কেশবচন্দ্র বাংলা তথা ভারতের গৌরব, যে ব্রাহ্মমতবাদ এই সব মহাপুরুষ প্রচার করে গেছেন তা ভারতীয় দর্শনেরই সত্যিকার রূপ। এই সহজ সত্যটি যিনি অস্বীকার করতে চান তাঁর সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যের আসল সুরটাই ধরতে পারেন নি।*

---

* ৮ই জানুয়ারি (১৯৪৫) তারিখে ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠিত কেশবস্মৃতিবার্ষিকী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

(স্মৃতিকথা)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বাইবেলে আছে এই কথা যে God created man after his own image—ঈশ্বর মানুষকে নিজের ছাঁচে তৈরি করেছিলেন। ঈশ্বরের কারখানা-বাড়ির খবর রাখি, এ কথা বললে মিথ্যা বড়াই করা হবে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত জানি যে অনেক সময় Man creates God in his own image মানুষ তার ভগবানকে গড়ে আপনারই মনের মতো ক'রে। কবিও বলেন—

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা
তুমি আমারি যে তুমি আমারি
মম অসীম গগন-বিহারী।"

ভক্তও তেমনি ভক্তির পাত্রকে অনেক সময়ে সৃষ্টি করেন তাঁর আপনার মনের মতো ক'রে। "জীবন-সঙ্গিনী"তে মতিবাবু অরবিন্দের যে ছবি দিয়েছেন সে ছবি অরবিন্দের নয়, মতিবাবুরই মনের মাধুরী দিয়ে তৈরি তাঁরই মনের মতো এক অপরূপ জীবের। এ গ্রন্থ পাঠের পর অরবিন্দ সম্বন্ধে যে ধারণা হয় সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁর গদগদ ভাব, আধ আধ হাস, ঢুলু ঢুলু আঁখি, বাচালতাও তাঁর মধ্যে কিছু কিঞ্চিৎ আছে এবং তাঁর গায়েপড়া স্বভাব। এবং মতিবাবু অরবিন্দের মুখ দিয়ে যেমন ভাবে "তোমার হবে" "তোমার হবে" বলিয়াছেন তাতে আর সন্দেহমাত্র থাকে না যে তিনি অর্থাৎ অরবিন্দ বটতলানিবাসী জটাজুটসমন্বিত ধুনি জ্বালানো সন্ন্যাসীদেরই এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। একেবারে "রামনাম লাড্ডু ঔর গোপাল নাম ঘি" জাতীয় ব্যাপার। বলা বাহুল্য অরবিন্দের চরিত্র থেকে সুদূরতম যদি কিছু থাকে তবে সে এই চিত্র। মতিবাবু সম্ভবতঃ অবাক হবেন শুনে যে "জীবন সঙ্গিনী"তে তিনি তাঁর জীবন-সঙ্গিনীকে প্রকাশ করেন নি, অরবিন্দকে প্রকাশ করেন নি, আর কাউকে প্রকাশ করেন নি—প্রকাশ করেছেন একমাত্র নিজেকে। এই গ্রন্থের নানা ঘটনা নানা ব্যক্তিকে আশ্রয় ক'রে ফুটে উঠেছে মতিবাবুরই নিজের ছবি—তাঁর নিজের মনের আলেখ্য। এই অতি স্বচ্ছ সত্যটা যদি আজও মতিবাবু বুঝে উঠতে না পেরে থাকেন তবে তাঁর জীবনের বিশিষ্ট ব্যাপারটাই বুঝবার বাকি রয়ে গেছে। মতিবাবুর মনের আয়নাতে অরবিন্দের এক কিম্ভূতকিমাকার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। যার অস্তিত্ব অরবিন্দের মধ্যে নেই, আছে মতিবাবুরই মনে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। মতিবাবু কল্পনা-প্রবণ। এবং তাঁর মধ্যে কিছু কাব্যরস ও বিশেষ পরিমাণে নাট্যরস আছে। এখন, কল্পনা-প্রবণ নাট্যরসিক ও কাব্যরসিক মতিবাবুর স্মৃতি যে তাঁর সঙ্গে কেমন প্রবঞ্চনা করে তার গোটা তিনেক উদাহরণ আমি "জীবন-সঙ্গিনী" গ্রন্থ থেকে তুলে দেখাচ্ছি।

প্রথম উদাহরণ। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ। পণ্ডিচারীর দশ নম্বর র‍্যু স্যাঁ লুইর (Rue Saint Louis) বাড়ি। মতিবাবুর পণ্ডিচেরীতে প্রথম আগমন। এবং ঐ বাড়িতে অরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। বাড়িতে প্রবেশ ক'রে—তাঁর কথাতেই বলি—

"আমাদের পায়ের সাড়া পাইয়া যে ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার নাম সুরেশ; ওরফে মণি। সঙ্গে নলিনী আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'আজ ইনিই আমাদের সৈরিন্ধ্রী'—অর্থাৎ পালা করিয়া প্রত্যেককে রাঁধিতে হয়। রাঁধার বালাই বেশী নহে—একবার উনানে হাঁড়িটা চড়াইয়া দেওয়ার ওয়াস্তা। খাওয়াদাওয়ার দিকটা যে একেবারেই আমলে নাই তাহা কথার আঁচেই বুঝিলাম। সেদিন চালে ডালে খিচুড়ী পাক হইতেছিল।" ("জীবন-সঙ্গিনী" প্রথম খণ্ড ২০৬ পৃষ্ঠা)।

নলিনীর মুখ দিয়ে মতিবাবু ভুল মহাভারত বলিয়েছেন। ইচ্ছা করলে নলিনী মতিবাবুর বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা ও খেসারতের দাবি করতে পারেন। বিরাট্ গৃহে সৈরিন্ধ্রী সূপকারের কাজ করতেন না; করতেন বল্লভ নামধারী মধ্যম পাণ্ডব। কিম্বা হয়তো মতিবাবু ওটা রসিকতা হিসেবেই ব'লে থাকবেন। সে যা হোক, হাতা-খুন্তি-প্রহরণধারীরূপে মতিবাবুর সঙ্গে আমার এই সাক্ষাতের কথা আমার কিন্তু কিছু মাত্র মনে নেই। এই বাড়িতে কিম্বা বাড়ির বাইরে কোথাও সে-বার মতিবাবুর সঙ্গে আমার সামনাসামনি সাক্ষাৎ ঘটেছিল এটা আমি স্মরণ করতে পারছিনে। আর নলিনীর ঐ রকমের একটা রসাল রসিকতা যে আমি একেবারে বিস্মৃত হব, সেটাও একটু আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু যা হোক্ আমি ধ'রে নিচ্ছি যে আমি সত্য সত্যই এ-সব ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এ সম্পর্কে একটা ব্যাপার ভুল করবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ব্যাপারটা হয়তো অদ্ভুত শোনাবে এবং অবিশ্বাস্য মনে হবে, এমন কি বাঙালীর পক্ষে কলঙ্ক-স্বরূপও মনে হ'তে পারে। কিন্তু কথাটা যে সত্য সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। সে কথাটা হচ্ছে এই যে ১৯১০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত আমরা নির্জলা বাঙালী হলেও কোনোদিন খিচুড়ী খাই নি। সুতরাং ঐ ঘটনাতে খিচুড়ী না থাকলে ওটা সত্য ব'লে চ'লে যেতে পারত—কিন্তু ঐ খিচুড়িতেই গোল বাধিয়েছে। বোঝা যায় মতিবাবুর অঘটনঘটনপটীয়সী কল্পনাদেবী এখানে সক্রিয় হয়েছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ। একুশ নম্বর র‍্যু ফ্রাঁসোয়া মারতাঁ (Rue Francois Martin)র বাড়ি। মতিবাবুর দ্বিতীয় বার পণ্ডিচারী আগমন এবং অরবিন্দের সঙ্গেই বাস। মতিবাবুর কথা উদ্ধৃত করছি—

"দুইজনে ভোরবেলায় শ্রীঅরবিন্দের বাড়ী গিয়া উপনীত হইলাম। বন্ধু বিদায় লইলেন। আমি উপরে উঠিয়া যাহাকে দেখিলাম, সে মাদ্রাজী যুবক অমৃত। সে আমায় জড়াইয়া ধরিয়া আমার সাহেবী বেশের ভূয়সী প্রশংসা করিল।" ("জীবন-সঙ্গিনী" প্রথম খণ্ড ২৪০ পৃষ্ঠা)।

অমৃত এ বাড়িতে বাস করতে আসেন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং ১৯১৩তে মতিবাবুর পক্ষে ঐ সময়ে ঐভাবে অমৃতকে

দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই। এবং অমৃতকে আমরা যে রকম জানি তাতে তাঁর পক্ষে অপরিচিত কিম্বা পরিচিত কাউকে প্রথম দর্শনে বা শততম দর্শনেও জড়িয়ে ধরা সম্ভব মনে হয় না। অমৃত একে তামিল তার উপর ব্রাহ্মণ, তাঁর পক্ষে এমন gushing (ভাবপ্রবণতার আধিক্য) হওয়া দৈবদুর্ঘটনার মতো শোনাবে।

তৃতীয় উদাহরণ। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ। একুশ নম্বর র‍্যু ফ্রাঁসোয়া মারতাঁ (Rue Francois Martin)র বাড়ি। মতিবাবুর তৃতীয় বার পণ্ডিচারী আগমন এবং অরবিন্দের বাড়িতেই অবস্থান। সেই সময়ের কথা, মতিবাবু লিখছেন—

"কর্মের বৃহত্তর ক্ষেত্র রচনার প্রেরণায় আমি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম। 'প্রবর্ত্তক' বাংলায় কর্মক্ষেত্র সৃজনের উপযোগী হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় তাহা ভারতব্যাপী করার প্রবৃত্তি হইল। ইহার জন্ম আমি একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক বাহির করার প্রস্তাব করিলাম। শ্রীঅরবিন্দ সম্মত হইলেন। গোল বাধিল নাম লইয়া। সুরেশ ও নলিনী নাম স্থির করিল 'Path-finder' কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ হঠাৎ বলিলেন 'প্রবর্ত্তক'এর অনুরূপ ইংরাজী 'Standard bearer'। এই নাম লইয়াই বিজয়ী বীরের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের পদবন্দনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থির দৃষ্টিতে দাঁড়াইলাম। সেই বিস্তৃত বারান্দায় তখন শুধু তিনি আর আমি। তিনি প্রসারিত বাহুযুগলে আমায় হৃদয়ে লইয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন।' ইত্যাদি। ('প্রবর্ত্তক' বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ মাঘ সংখ্যা)।

বোঝা যাচ্ছে অরবিন্দ ষ্ট্যানডার্ড বেয়ারার (Standrard-bearer) এই কথাটা মুখ দিয়ে বের করার সঙ্গে সঙ্গে মতিবাবুকে নিরিবিলি বিজয়ী বীরের অভিনয় করবার সুযোগ দেবার জন্তে আমরা সবাই সেই বারন্দা থেকে discreetly স'রে পড়েছিলাম। তারপর মতিবাবু অরবিন্দকে দিয়ে তাঁর নিজেকে বাহুযুগলে ধ'রে যে রকম শিরশ্চুম্বন করিয়েছেন তাতে স্পষ্ট মনে হয় যে অরবিন্দ আর অরবিন্দ নেই—তিনি বাঙালী-সুলভ প্যাচ্ প্যেচে ভাবালুতার মাদকরসে টইটুম্বুর হয়ে মতিবাবুর প্রাণারাম মনের মতো এক মানুষে পরিবর্তিত হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, অরবিন্দ রাশি রাশি লিখেছেন; কিন্তু তাঁর সেই রাশি রাশি লেখার মধ্যেকার কোনো একটিমাত্র ছত্রেও তাঁর এই নব চরিত্রের ভাঁজ পাওয়া যায় না। আর অরবিন্দ যদি ঐ রকমের চরিত্রের মানুষ হয়ে উঠে থাকতেন তবে তাঁর সঙ্গে মতিবাবুর বিচ্ছেদ ঘটত না এটা প্রায় নিশ্চয় ক'রে বলা যায়।

কিন্তু আসলে মতিবাবুর ঐ গল্পটি স্রেপ তাঁর কল্পনাপ্রসূত। ষ্ট্যানডার্ড বেয়ারার নাম সম্পর্কে আসল যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এই:

এক দিন আমরা যখন অরবিন্দের সঙ্গে টেবিলের চারপাশে বসেছিলাম তখন মতিবাবু ইংরাজী কাগজ বের করবার কথা উঠান। তারপর অবশ্য এর নাম কি হবে স্বভাবতই এ প্রশ্ন ওঠে। তখন আমার মনে পড়ে যায় শ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে একদিনকার অটোম্যাটিক রাইটিঙের কথা। একদিন এক spirit বা আত্মা এসে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপ্রণালীর এক বিরাট প্ল্যান দেন। তার মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল এই যে ভারতের তিন প্রান্ত থেকে তিনখানি কাগজ বের হবে। তার একখানির নাম হবে ক্লেরিয়ন (Clarion), আর একখানির হবে ষ্ট্যানডার্ড বেয়ারার (Standard-bearer), তৃতীয়খানির নাম আমি মনে করতে পারলাম না। কিন্তু মনে করবার বিশেষ দরকারও ছিল না। কেননা যেই ষ্ট্যানডার্ড বেয়ারার কথাটি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে অমনি মতিবাবু যেন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন—ইংরাজীতে যাকে বলে pounched upon it। আর ঝাঁপিয়ে পড়বার কথাও বটে। এমন একটা নাম স্বর্ণ পতাকার মতো পৎ পৎ শব্দে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যাবে তার চতুর্দিকে সুবর্ণ রশ্মি বিকীরণ করতে করতে আর ভাবী কাগজ-প্রকাশ-উৎসুক ব্যক্তি নিষ্কাম নির্লিপ্ত চোখে শুধু তাই দেখে যাবেন তা আশা করা যায় না। কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র সফরীরা আপত্তি করেছিলাম কাগজের ঐ নাম দেওয়ার প্রস্তাবে। কেননা তখনও আমাদের এই ধারণা ছিল যে, অরবিন্দ কোনো একদিন আবার রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে নামবেন। সুতরাং ও-নামটা তাঁর কাগজের জন্তে এখন তুলে রাখাই সমীচীন। অরবিন্দ, যেমন তাঁর স্বভাব, হাঁ না কিছুই বললেন না। কিন্তু আমরা তখনই আঁচ করেছিলাম যে ও-নাম যখন একবার মতিবাবুর কানে গিয়েছে তখন ক্ষুদ্র সফরী বা বৃহৎ রুই কাতলাও কিছু করতে পারবে না। ফলে অবশ্য ঐ নামেই কাগজ বেরুল। পরে শুনেছিলাম যে, মতিবাবু চিঠি লিখে অরবিন্দের কাছ থেকে কাগজের ঐ নাম রাখার অনুমতি চেয়েছিলেন ও পেয়েছিলেন।

এ ব্যাপারটি আমার এত স্পষ্ট মনে আছে যে এ সম্বন্ধে কোনো ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

বলা বাহুল্য মাত্র যে, "জীবন-সঙ্গিনী"তে মতিবাবুর দ্বারা বর্ণিত ঐ সকল ঘটনা নাটকীয়তার দিক থেকে খুবই রস-সমাকুল কিন্তু ঘটনার দিক থেকে সত্য নয়।

মতিবাবুর স্বভাবসিদ্ধ নাট্যরস-সিক্ত কল্পনা-বিলাসের আরও উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। সুতরাং মতিবাবুর কাব্যরস নাট্য-রস ও কল্পনা-বিলাস এইখানে পরিহার ক'রে—এবং অতঃপর মতিবাবু যা-কিছু লিখছেন সমস্তই বেদবাক্য পাঠকেরা এটা মনে করবেন না, এই আশা পোষণ ক'রে—আমি আমার কাহিনীর মূল সূত্রে ফিরছি।

মতিবাবুর বাড়িতে অরবিন্দ, অন্ততঃ তখনকার মতো, নিরাপদে অধিষ্ঠিত হ'লে পর বীরেন ও আমি সেই নৌকাতেই কলিকাতা রওনা হলাম। আমরা অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমাদের কারও চন্দননগরে থাকার প্রয়োজন হবে কি না? তাতে চন্দননগরের ওঁরা বললেন যে, সেখানে নতুন লোক দেখলে লোকের মনে সন্দেহ উঠবে। অরবিন্দের পরিচর্যার ভার তাঁরাই নেবেন। সুতরাং আমরা নৌকাযোগে ফেরত-ডাকে আসবার মতো বা পত্রপাঠ বিদায়ের মতো কলিকাতার দিকে রওনা হলাম। মনে লাগছে সেদিন প্রাতঃকালটায় পূর্ব দিকটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল। কেননা, অরুণরাগরঞ্জিত পূর্বাকাশ বা জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতির কোনো ছাপ মনে নেই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে চতুর্দিক রৌদ্রকরোজ্জ্বল হয়ে উঠল। নীল নির্মল আকাশ, রোদে চারিদিক ঝলমল করছে, নদীর ছোট ছোট

ঢেউগুলি ঝিকমিক্ করছে—তখনকার দিনের সেই বহুগীত গানের একটা ছত্র কেবলই যেন মনে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে —"মা তোর আঁচল খোলে আকাশতলে রৌদ্র-বসনী।" কিন্তু আকাশ ধরণী ঘিরে যতই কবিত্ব থাক না কেন, তখন মরণশীল মনুষ্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় একটা ব্যাপারের কথা মনে পড়ে গেল—অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণা।

এই নিবন্ধে পূর্বে এক স্থানে আমি বলেছি যে, সাহেব মাছ আর বাঙালী মাছে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু তৃষ্ণা সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। বাঙালী-তৃষ্ণা গ্রীষ্মকালেই লাগে, শীতকালে সাধারণতঃ লাগে না বললেই হয়। কিন্তু সাহেবী তৃষ্ণা শীতগ্রীষ্ম প্রভেদ করে না। বরং গ্রীষ্মের চাইতে শীতেই তার বেশি পুলক। সুতরাং ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের বাঙালী তৃষ্ণায় তৃষিত হয়ে উঠবার তেমন কথা নয়। কিন্তু ক্ষুধার সম্বন্ধে এমন কথা বলা চলে না। কেননা, ক্ষুধা নামক আধিভৌতিক ব্যাপারটা শীত গ্রীষ্মে বা বসন্ত বাদলে কোনোই পার্থক্য করে না—সকল ঋতুতেই ওটা সমান উৎসাহী, সমান কর্মক্ষম।

সুতরাং মনে পড়ল, গেল কাল সেই যে দুপুরবেলা খেয়েছিলাম, তার পর রাত্রে কিম্বা আজ সকালে কোনো রকমের আহার্য বস্তুই উদরসাৎ হয় নি। কাজেই দেহ নামক ইঞ্জিনটিতে খাদ্যরূপ কয়লা কিঞ্চিৎ সরবরাহ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তখন বোধ হয় দুপুর গড়িয়ে গিয়ে থাকবে। উত্তরপাড়ার ঘাটে এসে একটা ছায়াসুশীতল জায়গায় নৌকা লাগানো হ'ল। ঘাটের উপরেই একটা মিঠাইয়ের দোকান ছিল। সেখান থেকে কিছু খাবার কিনে নিয়ে এসে দুজনে উদরসাৎ করা গেল। আমরা এইখানে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম—বোধ হয় ঘণ্টাখানেকের উপর হবে। আমাদের অপেক্ষা কিন্তু মাঝিদের বিশ্রাম।

তার পর সেখান থেকে নৌকা খুলে কলিকাতায় যখন এসে পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে—বোধ হয় রাত আটটা হবে। আবার সেই মহানগরী, সেই উত্তাল তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ প্রাণ-জগৎ, সেই পথে পথে জন-স্রোত, আকাশে আকাশে কল-রোল, বাতাসে বাতাসে তপ্তশ্বাস—আমরা প্রকৃতির মুক্ত উদার মহাসভা থেকে আবার সেই মহানগরীর ক্ষুব্ধ খিন্ন ক্লিষ্ট কুক্ষিতে প্রবেশ করলাম এবং যথাকালে চার নম্বর শ্যামপুকুর লেনের বাড়িতে পৌঁছিলাম—বাড়িটা যেন ঠিক পুজো-বাড়ির বিজয়া দশমী-রজনীর অবস্থায়।

এর পর—ঠিক মনে নেই—তার পরের দিন কিম্বা তার পরের পরের দিন, অন্ততঃ চার পাঁচ দিনের মধ্যে তো বটেই, আমরা ঐ বাড়িতে যারা বাস করছিলাম তারা সবাই ও-বাড়ি ত্যাগ ক'রে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেলাম।

এর প্রায় এক মাস পরে আমি যখন ছয় নম্বর ক্রাউচ লেনের একটি মেসে অবস্থান করছিলাম তখন হঠাৎ একদিন একটি ছোট্ট টুকরো কাগজে—দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দুই ইঞ্চি আন্দাজ ক'রে হবে—অরবিন্দের হাতের লেখা তিন চার লাইন পেলাম। তাতে এই নির্দেশ ছিল যে, আমাকে পণ্ডিচারীতে যেতে হবে তাঁর জন্তে একটি বাড়ি ঠিক ক'রে রাখতে। আর বন্ধুমুখে শুনলাম যে নেপথ্যে থেকে সুকুমার (৺কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পুত্র) এবং পাদপ্রদীপের সম্মুখে থেকে সৌরীন আমার পণ্ডিচারী যাত্রার সকল বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন, আমাকে কেবল কষ্ট ক'রে আমার দেহটিকে বহন ক'রে হাওড়ায় গিয়ে মাদ্রাজ-গামী মেল ট্রেনে উঠতে হবে। সুকুমার নেপথ্যে ছিলেন কি না তা আমার জানবার উপায় ছিল না কিন্তু এই বন্দোবস্তের ব্যাপারে যে সৌরীন প্রত্যক্ষে ছিলেন সেটা আমার প্রত্যক্ষ।

এই ছয় নম্বর ক্রাউচ লেনের মেসে আমি যাঁর 'গেস্ট' হয়ে থাকতাম তাঁর নাম হচ্ছে কনিষ্ঠ পাণ্ডব। আশা করি পাঠক-দের মধ্যে যাঁরা নিতান্ত গৌড়ীয় তাঁরা 'এ্যাঁ' ব'লে এবং যাঁরা কেতা-দুরস্ত তাঁরা 'বাই জোভ' (By Jove) উচ্চারণ ক'রে এবং পাঠিকাদের সবাই 'ওমা' ব'লে তাঁদের চম্পকনিন্দিত তর্জনী তাঁদের পুষ্প-মসৃণ গণ্ডে ঠেকিয়ে ভাববেন না যে, কনিষ্ঠ পাণ্ডবের ঐ নামই তাঁর পিতামাতারা রেখেছিলেন। না, কনিষ্ঠ পাণ্ডবের আর দশজনের মতোই আর একটা ভদ্র রকমের নাম ছিল যা তাঁর পিতামাতারা রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে নাম আমি কোনো দিন শুনি নি, তাঁর পদবী কি তাও কোনো দিন জানি নি। আমরা তাঁকে সবাই কনিষ্ঠ পাণ্ডব ব'লেই জানতাম এবং কনিষ্ঠ ব'লে ডাকতাম। পরে তাঁর সম্পর্কে পদবীহীন দু' তিনটে নামের এক তালিকা শুনেছিলাম কিন্তু তার কোনো একটি তাঁর পিতৃমাতৃদত্ত নাম কিনা কিম্বা ওসব ঐ কনিষ্ঠ পাণ্ডব জাতীয়ই ব্যাপার কিনা তা জানতে পারি নি। মধ্যম দৈর্ঘ্যের ময়লা রঙের পাতলা ছিপছিপে মানুষটি এই কনিষ্ঠ পাণ্ডব। বয়েস কুড়ি পেরিয়েছে কিন্তু পঁচিশ পেরোয় নি ব'লে মনে হয়। পোষাক পরিচ্ছদে উদাসীন, কেশকলাপের পরিচর্চায় বৈরাগ্য-প্রবণ, আহার জীবন ধারণার্থে এবং বিহার অবান্তর। চোখ দুটিতে মাঝে মাঝে একটা দৃষ্টি ফুটে ওঠে যা দেখে ইংরাজী ক্রিয়াপদ 'drill' শব্দটি মনে পড়ে—drill কুচ-কাওয়াজ অর্থে নয়, তীক্ষ্ণ অস্ত্রে শক্ত ধাতু ভেদ অর্থে—তাঁর সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে যেন গুপ্ত পুলিসের কোনো ছদ্ম-পোষাকই অব্যাহতি পাবে না। কনিষ্ঠ ১৯১০-এর শেষের দিকে পণ্ডিচারীতে এসে অনেক কয় মাস আমাদের সঙ্গে এক বাড়িতে ছিলেন। এবং টিন্নেভেলির কালেক্টার অ্যাশ (Ashe) সাহেবের হত্যার পর যখন গুপ্ত পুলিসেরা দু-একজন ক'রে ঘোরতর প্রকাশ্য ভাবে আমাদের বাড়ির রাস্তায় সলজ্জ বঁধুর মত আনাগোনা সুরু করলেন তখন সেই যে কনিষ্ঠ একদিন সন্ধ্যার আবছায়াতে তাঁর সুটকেসটি হাতে ক'রে পণ্ডিচারী থেকে এক স্টেশন এগিয়ে গিয়ে ট্রেন ধরে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন তার পর এই বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁর কোন খবর পাই নি। তিনি জীবিত আছেন কিনা, তাও জানি নে। এবং জীবিত থাকলে আজ তিনি হিমালয়ের কোনো গিরিগুহায় জটাজুট-সমন্বিত হ'য়ে ধ্যানমগ্ন কিম্বা রবীন্দ্র-নাথের 'দুরাশা' গল্পের কেশরলালের মত অবশেষে—অবশ্য ভুটিয়া পল্লীতে নয়—কোনো বঙ্গপল্লীতে এক বঙ্গকুমারীর পাণিপীড়ন ক'রে আজ নাসিকার প্রান্তভাগে চশমা বসিয়ে নাতনীর বিয়ের ফর্দ রচনায় ব্যাপৃত তাও অবগত নই। জানি না, জীবিত থাকলে এই লেখা তাঁর চোখে পড়বে কিনা!

আমি কনিষ্ঠের সঙ্গে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে কিম্বা অন্য কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে আমি যুগপৎ বোবা এবং কালা বনে' যাই—এই রকমের একটা কথা কনিষ্ঠ পাণ্ডব মেসে রাষ্ট্র ক'রে দিয়েছিলেন কিনা, জানি নে। কিন্তু আমি যত দিন সে মেসে ছিলাম তত দিন কেউ আমার সঙ্গে আলাপ করবার কোনো উৎসাহ দেখান নি। আমি নিজে খুব 'গল্পিক' নই। আমার প্রকৃতিও নতুন লোকের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ জমাবার পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়, এমন কি প্রতিকূলই বলা যায়। সুতরাং আমার দিক থেকে তাঁদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেওয়া একেবারেই প্রশ্ন-বহির্ভূত ব্যাপার। কিন্তু "মহাশয়ের নাম কি ?" "নিবাস কোথায় ?" "মহাশয়ের কি করা হয় ?" "ছেলেমেয়ে কটি ?" "নাত-জামাইটি কি করে ?" ইত্যাদি সৌজন্যসূচক প্রশ্নের একটিও সে মেসের কেউ আমাকে কোনো দিন করেন নি। তাঁদের কাছে আমার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেটা যেন স্রেপ ব্রহ্মের মত—অর্থাৎ নির্গুণ নিরালম্ব ও নিরবয়ব। তবে অবশ্য আমার সালোক্যে তাঁরা চিদ্‌ঘন আনন্দ উপলব্ধি করতেন কি না, তা জানতে পারি নি।

কনিষ্ঠ প্রায় সারাদিন বাইরে-বাইরেই থাকতেন। স্নানাহার এবং নিদ্রার সময়ই তাঁকে মেসে দেখা যেত। কোনো কলেজের রেজেষ্ট্রি বহিতে তাঁর পিতামাতার দেওয়া নামটা সগৌরবে বিরাজ করত কিনা তাও জানি নি। তবে তাঁকে কোনো দিন হ্যানিবলের ইউরোপ ভূখণ্ডে অবতরণের তারিখ নিয়ে মাথা ঘামাতে বা শেলী বা সেক্সপীয়রের কাব্যাংশ নিয়ে পুলকোচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে দেখি নি। সে যা হোক, অতিথি-বৎসল কনিষ্ঠ আমাকে একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন। এই উপন্যাসখানি হচ্ছে ভিক্টর হিউগোর লে মিজেরাবল্—যা শিক্ষিত বাঙালীর মুখে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—লা মিজারেব্‌ল্। বইখানা অবশ্য ইংরাজী অনুবাদ। সুতরাং মোটামুটি এমন কথা বলতে পারি যে, মেসের সুপ্রসিদ্ধ রান্না, সেই অপ্রশস্ত বদ্ধ গলির (blind lane) রুদ্ধ প্রান্তে অবস্থিত বাড়িতে কলিকাতার মার্চ মাসের গরম, রাতের বেলায় অগণিত মশককুলের রুধির অন্বেষণে অভিযান (মশারিটা তখন বিলাস বস্তুর তালিকাভুক্ত ছিল) এবং সর্বশেষে মেসের সামনে অপ্রশস্ত গলির অপর দিকের বাড়ির ভদ্রলোকটির কোনো উত্তেজক আরক বিশেষ উদরস্থ ক'রে প্রতি রাত্রে রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত তাঁর বাড়ি প্রবেশের সিঁড়িতে বসে উচ্চকণ্ঠে বীর করুণ বা হাস্য রসের স্বগতোক্তি—মাত্র এই কয়েকটি অসুবিধার কথা বাদ দিলে, ভিক্টর হিউগোর সাহচর্যে সেই মেসে আমি বেশ ভালই ছিলাম।

কিন্তু বঙ্কিম লিখেছেন—সময় কারও বসে থাকে না—এই রকমের একটা কথা। সুতরাং মেসের রান্না খেয়ে—মশাদের কামড় খেয়ে (কোনটা বেশি সুস্বাদু তা নির্ণয় দুঃসাধ্য) এবং আরক-সেবী প্রতিবেশীর প্রতি রাত্রের বীর করুণ ও হাস্য রসযুক্ত নানা স্বগতোক্তি শুনে জিন ভালজিনের ভাগ্য অনুসরণ করতে করতে অবশেষে আটাশে মার্চ তারিখ এসে গেল। এই তারিখেই আমার পণ্ডিচারী রওনা হওয়ার দিন ধার্য করা হয়েছিল।

এই মেসে থাকতে আমি কোনো দিন সন্ধ্যার আগে বাড়ি থেকে বেরুতাম না। কিন্তু সেদিন দিনের বেলায় চুল ছাঁটবার সেলুনে গিয়ে চুল ছাঁটিয়ে এলাম। নতুন জামা কাপড়ও কেনা হয়েছিল। ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ মেসে প্রচার ক'রে দিয়েছেন যে, আমার বাড়ি পাবনা এবং আমি সেদিন বিকেলে দারজিলিং মেলে পাবনা যাচ্ছি একটা বিয়েতে। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে কোনো শারলক্ হোম্‌স্ ছিলেন না। থাকলে তিনি আমার শেয়াল দ' স্টেশনে যাবার কথা শুনে নিশ্চয় বন্ধু ওয়াট্‌সন্ সহ হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ব'সে থাকতেন। "পাবনা"টা বোধ হয় পণ্ডিচারীর সঙ্গে 'প'এ 'প'এ মিল রেখে নির্বাচিত করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ কনিষ্ঠের বিবেক সত্যের অপলাপে অত্যন্ত বেদনা বোধ করত। সুতরাং টেনে-টুনে সত্যকে যত দূর সম্ভব রক্ষা ক'রে কার্যোদ্ধার করা ছিল তাঁর কর্মনীতি। 'পাবনা'তে পণ্ডিচারীর 'প' পর্যন্ত সত্যটা অব্যাহত রইল তো—সেটা বিবেকী মানুষের পক্ষে একটা কম আরামের কথা নয়। অবশ্য এ সব আমার অনুমান মাত্র। কিন্তু কনিষ্ঠ-প্রচারিত বিয়ের কথাটার তাৎপর্য তখন আমি বুঝতে পারি নি। মনে হয়েছিল ওটা কনিষ্ঠের অহৈতুকী বাক্য-রচনায় অলঙ্কারপ্রিয়তা। কিন্তু আজ অনুমান করি, ওটা ছিল আমার কেতা-দুরস্ত চুল ছাঁটাই ও নতুন জামা কাপড়ের একটা পরোক্ষ কৈফিয়ৎ। অর্থাৎ "ঠাকুর ঘরে কে ?—" ইত্যাদি।

পূর্বেই বলেছি যে ক্রাউচ লেনটা একটা বদ্ধ গলি, ইংরাজীতে যাকে বলে blind lane। এর দক্ষিণং মুখং অবরুদ্ধ এবং এর উত্তর মুখ গিয়ে পড়েছে বউবাজার স্ট্রীটে। তখন হাওড়া স্টেশন থেকে মাদ্রাজ মেল সন্ধ্যার সময় ছাড়ত। আমি বিকেলের দিকে নতুন জামা-কাপড়ে সজ্জিত হয়ে খালি হাতে বাড়ি থেকে বেরুলাম। আমার পকেটে মাত্র একটি সঙ্কীর্ণ মানিব্যাগ। (এই মানিব্যাগটি আজও আমার কাছে আছে)। তার ভিতর তিনখানি দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরা টাকা-পয়সা। এবং এক টুকরো কাগজ তাতে অরবিন্দের হাতের লেখা কয়েক লাইন—আমার পরিচয়পত্র অর্থাৎ Introduction letter পণ্ডিচারীর বন্ধুদের কাছে। আমি ক্রাউচ লেন দিয়ে গিয়ে বৌবাজার স্ট্রীটে পড়লাম এবং বৌবাজার স্ট্রীট পার হয়ে একটা নিরিবিলি রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। রাস্তাটার নাম মনে নেই। সেই রাস্তায় কিছু দূর এগিয়ে একটা খাবারের দোকান পেয়ে সেইখানে গিয়ে কিছু কালোজাম নামক মিষ্টান্ন উদরে প্রেরণ করলাম। তারপর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে শেয়াল দ'র মোড়ে পৌঁছে হ্যারিসন রোডের ট্রামে উঠে বসলাম। যথা-সময়ে ট্রাম স্ট্র্যাণ্ড রোডে পৌঁছে গেল। আমি নেমে সরাসরি হাওড়া স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন ট্রেন প্ল্যাটফরমে এসে গেছে। যাত্রীদের ব্যস্ততা-ক্ষিপ্রতা কল-কোলাহলে চারি দিক সরগরম হয়ে উঠেছে। আমি একটু এদিক-ওদিক খোঁজ করতেই সৌরীনের সাক্ষাৎ পেলাম—একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার সম্মুখে তিনি একটি ট্রাঙ্ক ও ছোটখাট বিছানা নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সৌরীনের কাছ থেকে আমি পেলাম সেই ট্রাঙ্ক—শূন্য নয়, তার ভিতরে বস্ত্র ছিল—

সেই বিছানা, একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট (দ্বিতীয় শ্রেণীটা অবশ্য কামুফ্লাজ—Camouflage) এবং বুকস্টল থেকে সস্তা-কেনা গাই বুথবির (Guy Boothby) খুব রঙচঙে মলাট-ওয়ালা লাভ মেড ম্যানিফেস্ট (Love made manifest) নামে একখানি ছ' আনা দামের নভেল। হাঁ্যা, ভাল কথা, আর একটি বস্তুও আমি পেয়েছিলাম। তবে সেটা স্টেশনে সৌরীনের কাছ থেকে, না, মেসে কনিষ্ঠের কাছ থেকে তা মনে নেই। বোধ হয় কনিষ্ঠের কাছ থেকেই হবে।

এই বস্তুটি হচ্ছে খুব সরু রুপোর তৈরি চার-সমন্বিত একটি নিকেলের পকেট-ঘড়ি। বোধ হয় এঁদের কারও মনে হয়ে থাকবে যে ঐ রকমের একটি রুপোর চার আভিজাত্যের একটা প্রচণ্ড অভিজ্ঞান। এবং ঐ রকমের একটি রৌপ্য অলঙ্কার গলায় ঝুলান থাকলে প্লিবিয়ান্ (plebeian) গুপ্ত পুলিসের সাধ্য নেই যে কাছে ঘেঁসে বা সন্দেহ করে। এবং আমি সেই রৌপ্যালঙ্কারটি গলায় ঝুলিয়ে অম্লান বদনে বার-শ মাইল রেলপথ পাড়ি দিলাম। পৃথিবীর ইতিহাসে সৎসাহসের এ একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ সন্দেহ নেই।

সৌরীন যে কামরাটির সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন আমি সেই কামরাতেই উঠে পড়লাম। সম্ভবতঃ সৌরীন সেই কামরাটিই আমার জন্যে নির্বাচিত করেছিলেন। কামরাটিতে বেজায় ভিড়। এবং সেটা সাহেবদের ভিড়। সবাই ইউরোপীয়ান কিনা জানি নে, তবে গায়ের রঙে সবাই ইউরোপীয়ান ব'লে চ'লে যেতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে এই রকমের ভিড় আমার কল্পনার মধ্যে ছিল না। একটি ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ সাহেব সস্ত্রীক উঠেছিলেন এবং প্ল্যাটফরমের থেকে উলটো দিকের একটি নিরিবিলি কোণ অধিকার করে ঠিক যেন একজোড়া কপোত কপোতীর মত ব'সে ছিলেন—সম্ভবতঃ মনে ছিল আশা-আরামে সময় যাবে। কিন্তু আহা বেচারী! তাঁকে অবশেষে বেগতিক দেখে স্ত্রীটিকে লেডিজ কম্পার্টমেন্টে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে হ'ল একাকী।

নিদ নাহি আঁখিপাতে

আমিও একাকী তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে—

এ-গান সম্ভবতঃ তখন রচিত হয় নি এবং সাহেবটিও সম্ভবতঃ বাংলা গান জানতেন না। নইলে তিনি নিশ্চয়ই ঐ রকমের একটা গান ধ'রে দিয়ে মনের ভার কতকটা লাঘব করতেন। এই সাহেবদের ভিড়ের মধ্যে সেই কামরায় আর একটিমাত্র বাঙালী ছিলেন তবে পোষাক তাঁরও ছিল সাহেবী। কিন্তু মুখ দেখেই বোঝা যায় যে তিনি গৌড়ীয়, ফেরঙ্গ-সমাজের কেউ নন। আমি তাঁরি পাশে একটু স্থান ক'রে ব'সে পড়লাম। যথাসময়ে ঘণ্টি পড়ল, গার্ডের বাঁশি বাজল, সবুজ নিশান উড়ল। ট্রেন দুলে উঠে চলতে সুরু করল এবং সৌরীনের মুখ অপস্রিয়মাণ হ'তে থাকল। ট্রেনটি প্ল্যাটফরম ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় এসে পড়ল এবং আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বাঙালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হ'ল অর্থাৎ তিনি আলাপ সুরু করলেন। দুঃখের বিষয় তাঁর নামটি মনে নেই। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার, বয়েস সাতাশ আটাশের মত হবে। তিনি ট্রিচিনাপোলিতে তাঁর কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। এঁরই কৃপায় আমি সেবার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম এবং ডাইনিং-কার, রিফ্রেশমেণ্ট রুম, ছুরি কাঁটা ন্যাপকিন্ সল্ট-সেলার (salt cellar), ক্রুইট-স্ট্যাণ্ড (cruet stand) প্রচুর দাড়ি-গোঁফ-সমন্বিত 'বয়' ইত্যাদির রহস্য-সঙ্কুল ও উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নির্বিবাদে পরিহার ক'রে আড়াই দিনের রেলপথ পাড়ি দিয়ে নিরাপদে পণ্ডিচারী পৌঁছেছিলাম। স্বাধীন ভারতে যদি ডাইনিং-কারগুলিতে পুরু নরম কার্পেটের আসন পেতে চাঁদির মত ঝক্‌ঝকে কাঁসার থালায় পরিপাটি ক'রে ভাত বেড়ে পঞ্চব্যঞ্জনের বাটি সাজিয়ে মেঝেতে ব'সে আহারের ব্যবস্থা হয় তবে সাহেবদের কি অবস্থা দাঁড়ায় তা মনে মনে কল্পনা করি। ৺কেশব সেন-জামাতা ৺নৃপেন্দ্রনারায়ণ যখন কুচবেহারের মহারাজা তখন তিনি তাঁর সাহেব বন্ধুদের কখনও-সখনও খাস বাঙালী কায়দায় ভোজ দিতেন এ গল্প আমরা বাল্যে শুনতাম। এবং ঐ ভোজ সমাপ্তির মুখে যে অপূর্ব দৃশ্যটা পরিদৃশ্যমান হ'ত প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে তার বর্ণনাও শুনেছি। এই দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করলে প্রতীচ্যবাসীদের ভোজন-কক্ষ থেকে যে আমরা গৌরব অর্জন করেই ফিরে আসি তা বলতে পারা যায়। আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে একটা নমনীয়তা, একটা সহজ পটুতা আছে যা ইউরোপীয়ানদের অঙ্গে নেই। উপযুক্ত চর্চায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই নমনীয়তা এই পটুতা যে ইউরোপীয়ানদের চাইতে বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিক ভাবে বলা যায়। সে যা হোক ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় প্রচুর পরিমাণে লুচি সন্দেশ এবং দু'বেলার উপযুক্ত ভাজাভুজি (মার্চ-শেষের গরমে যে ওর বেশি ভাজাভুজির খাদ্যমূল্য থাকত না সে সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় আগে থেকেই অবহিত ছিলেন) সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় আরব্য-রজনী-কথিত আবুহোসেনের মত আহারের সময়ে একজন সঙ্গী না পেলে আরাম বোধ করতেন না কি না জানি নে। তবে তিনি সাগ্রহে তাঁর লুচি সন্দেশের সৎকার কার্যে সাহায্য করতে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন। বলা বাহুল্য তাঁর সে আমন্ত্রণ ছুরি কাঁটা ন্যাপকিন এবং প্রচুর গোঁফদাড়ি-বিভূষিত 'বয়' ইত্যাদির কথা স্মরণ ক'রে আমি ততোধিক আগ্রহে গ্রহণ করলাম। এই গম্ভীর-বদন 'বয়'রা মূক বটে কিন্তু এরা আসলে হচ্ছে এক একটি মুখর সমালোচনা। ধুতি দেখলে এদের মুখ হয় এক একটি নীরব জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

ট্রেনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভিড় কমতে লাগল এবং খড়গপুর পৌঁছে আমরা পাঁচ ছ' জন মাত্র রইলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাটা আপন আভিজাত্যে আবার প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর লুচি সন্দেশের সৎকার কার্যে উৎসাহের সঙ্গে সাহায্য করতে করতে বি এন রেলপথ এবং এম্ এস এম্ রেলপথের উপর দিয়ে চিল্কা-হ্রদের ধার ঘেঁসে পূর্বঘাট গিরিমালার ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত পাহাড়গুলি দেখতে দেখতে গোদাবরীর দীর্ঘ পুল পার হয়ে অবশেষে ত্রিশে মার্চ তারিখে বেলা প্রায় এগারটার সময়ে আমরা মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌঁছিলাম। সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় ও আমি একখানি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলপথের

এগমোর স্টেশনে পৌঁছিলাম। এবং সেখানে ওয়েটিং রুমে লুচি সন্দেশের আর একবার সদ্ব্যবহার ক'রে দিনের অবশিষ্ট কাল কাটিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার সময় ধনুষ্কোটিগামী বোট মেলের যাত্রী হলাম। কিন্তু এইখানে আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'ল। করিডর-যুক্ত 'কুপে' ধরণের গাড়ি। প্রতি কামরায় দুটি ক'রে বার্থ, একটি নিচে একটি উপরে। এরই এক কামরায় তিনি এবং অন্য এক কামরায় আমি স্থান পেলাম। মাঝরাত্রে আমাকে পণ্ডিচারীগামী ট্রেন ধরবার জন্যে ভিল্লিপুরাম স্টেশনে নামতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের গন্তব্যস্থান আরও দক্ষিণে।

ট্রেন চলতে আরম্ভ করলে ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় করিডর দিয়ে এসে আমাকে ডেকে নিলেন, বললেন—আসুন, শেষবারের মত একবার লুচি সন্দেশ একসঙ্গে খাওয়া যাক। আমি তাঁর কামরায় গেলাম। সেখানে লুচি সন্দেশের যথারীতি সৎকার সাধন ক'রে যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ কামরায় ফিরে এলাম তখন রাত প্রায় ন'টা। সেই যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ত্রিশে মার্চ রাত ন'টার সময় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম তার পর আর তাঁর সঙ্গে কোনো দিন সাক্ষাৎ হয় নি কিম্বা তাঁর কোনো খোঁজখবরও পাই নি। বাল্যকালে যাত্রা-গানে শোনা গীতের একটা পদ কেবলই মনে হ'তে থাকে—

জীবের আসা যাওয়া স্বকর্ম-গতিকে
কে রোধিবে সেই আবর্ত-গতিকে
যাতায়াতের পথে কার বা সাথী কে
পথিকে পথিকে পথের আলাপন।

জানি না তিনি আজ জীবিত আছেন কি না, এবং জীবিত থাকলে এই লেখা তাঁর চোখে পড়বে কি না এবং প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের পূর্বের ঘটনা তাঁর স্মরণে পড়বে কি না।

রাত আন্দাজ বারটার সময় ট্রেনটি এসে ভিল্লিপুরামে পৌঁছল। এইখান থেকে মাইল পঁচিশেক দীর্ঘ একটি ব্রাঞ্চ লাইন পূর্বমুখে সমুদ্রতীরে পণ্ডিচারী পর্যন্ত গিয়েছে। মাঝে তিনটি কি চারটি স্টেশন। আমি বোট মেল থেকে নেমে পণ্ডিচারীগামী ট্রেনে উঠে পড়লাম। যথাসময়ে গাড়ি চলতে সুরু করল। একে একে স্টেশন কয়টি পার হয়ে পণ্ডি-চারীর ঠিক আগের স্টেশন ভিল্লিয়ানুরও অতিক্রম করল। কিছুক্ষণ পরে, রাত তখন প্রায় আড়াইটে, ইঞ্জিন থেকে হুইস্‌লের শব্দ শোনা গেল। তার পর ট্রেনখানির গতি-বেগ ধীরে ধীরে মন্দীভূত হতে লাগল। তার পর আরও মন্দ, আরও মন্দ—মন্দ—মন্দতর—মন্দতম হয়ে অবশেষে থেমে পিছনের দিকে এক ধাক্কা লাগিয়ে আবার সামনের দিকে একটু পা বাড়িয়ে ট্রেনখানি একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়াল। বোঝা গেল এই ট্রেনটিতে ভ্যাকুয়াম ব্রেকের কোনো বালাই নেই। আমি কামরার দরজা খুলে প্লাটফরমে নেমে পড়লাম। এই হচ্ছে পণ্ডিচারীর রেলওয়ে স্টেশন।

বাকি রাতটুকু আমি স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন অর্থাৎ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ ভোরে স্টেশনের বাইরে এসে পুশ্‌পুশ্‌ নামে মানুষ-ঠেলা এক অপূর্ব যানে আরোহণ করলাম। এই অপূর্ব যানের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে এ যান পণ্ডিচারীর বাইরে মাদ্রাজ প্রদেশের আর কোথাও এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য কোনখানে নেই। এর একটি বর্ণনা এইখানে দেওয়া কর্তব্য মনে করছি। কেননা, পণ্ডিচারী থেকেও এই যান আজ ডাইনোসোরদের (Dinosaur) মতই বিলুপ্তপ্রায়। আজ কচিৎ কদাচিৎ এর দু-একখানি চোখে পড়ে, রিক্‌শা এর স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করে নিয়েছে। ঘোড়ায় টানা পাল্কীগাড়ির পিছনের বসবার স্থান, পৃষ্ঠরক্ষা এবং পা রাখবার জায়গা মাত্র রেখে আর সব যদি উড়িয়ে দেওয়া যায় তবে যা থাকে তাই চারটি চাকার উপর স্থাপিত। এর চার কোণ থেকে কড়ে আঙুলের মতো সরু চারটি লৌহদণ্ড উঠে মাথার উপরে একটি আচ্ছাদন রক্ষা করছে—এমনি উঁচু যে আরোহী স্বচ্ছন্দে তার নীচে বসতে পারে কিন্তু দাঁড়াতে পারে না। সম্মুখের চাকা দুটির অক্ষদণ্ডের সঙ্গে যুক্ত লৌহ-নির্মিত তৃতীয় ব্র্যাকেটের মতো একটি কায়দা। এই ব্র্যাকেটের মধ্য-স্থান থেকে একটি লৌহদণ্ড আরোহীর হাত পর্যন্ত পৌঁছেছে। ধরবার সুবিধার জন্যে এই দণ্ডের প্রান্তভাগে কাষ্ঠের একটি আবরণী। এই দণ্ডটিরই প্রান্তভাগ ধ'রে ডানে বাঁয়ে সরালে যানটিও বাঁয়ে ডানে ঘুরে যায়। এ দণ্ডটিই এই স্থলযানের হাল।

সে যা হোক, এই গাড়িতে চ'ড়ে আমি যাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম তাঁর নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আচারীয়া। ইনি তামিল ব্রাহ্মণ। খাঁটি আর্য-চেহারা। মধ্যম দৈর্ঘ্যের আকৃতি। বয়েস আন্দাজ ত্রিশ হবে। গৌরবর্ণ, আয়ত চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, টিকলো নাসা, মুণ্ডিত মুখমণ্ডল, মাথার চারদিকে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি পরিমিত স্থান কামানো এবং বাকি অংশে মধ্যস্থলে এক গুচ্ছ দীর্ঘ কেশ—ঠিক বাংলাদেশে আগত উড়িয়া ঠাকুরদের যেমন দেখা যায়। এঁর চেহারা দেখে কেন যেন পেশোয়াদের কথা মনে উদয় হয়। ইনি মাদ্রাজে 'ইণ্ডিয়া' নামে একখানি তামিল সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করতেন। বলা বাহুল্য সেই 'স্বদেশী' যুগে কথায় কথায় 'সিডিশান' অর্থাৎ রাজদ্রোহ হ'ত। সুতরাং যথারীতি সিডিশানের জন্য যখন এঁর নামে ওয়ারেন্ট বেরুল এবং সাজা হ'ল তখন ইনি পণ্ডিচারীতে এসে এইখান থেকে তাঁর কাগজ বের করতে লাগলেন। এই হচ্ছে এঁর পূর্ব রাজনৈতিক ইতিহাস। 'স্বদেশী'-যুগে দেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে লাখখানেক টাকা লোকসান দিয়ে ও-ক্ষেত্রের বাস্তবের অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন বলেও শুনেছিলাম। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর যখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পুরাতন সকল হাঙ্গামা মিটিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নতুন পৃষ্ঠা ওল্‌টালেন তখন ইনি মাদ্রাজে ফিরে যান এবং বর্তমানে সেইখানেই আছেন। এঁরই হাতে আমি অরবিন্দ-লিখিত আমার পরিচয়-পত্রখানি দিলাম।

ঠিক এর চারদিন পর অর্থাৎ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে কলিকাতা থেকে কলম্বোগামী ফরাসী যাত্রীবাহী মেল-স্টীমার ডুপ্লেক্স (Dupleix) যখন পণ্ডিচারীর বন্দরে এসে বিকেল আন্দাজ চারটের সময় নোঙর ফেলল তখন সেই স্টীমার থেকে যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বসাক নামে দুটি বাঙালী যাত্রী পণ্ডিচারীতে অবতরণ করলেন। এই বঙ্কিমচন্দ্র বসাকের আসল নাম হচ্ছে বিজয়কুমার নাগ আর এই যতীন্দ্রনাথ মিত্র হচ্ছেন—অরবিন্দ।

সোভিয়েট সংস্কৃতি

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে এক একটা খণ্ড প্রলয়কে অবলম্বন করিয়া সমাজের রূপান্তর ঘটে। এই রূপায়ণ মানব-সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে অভিনব পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না। ১৪৫৩ সালে কনষ্ট্যান্টিনোপলের পতনের কথা ধরা যাক্। ইহার পরেই আসিল রেনেসাঁ আন্দোলন। এই আন্দোলন শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, দর্শন, এক কথায় জীবনের যাবতীয় ক্ষেত্রে, এক অভিনব ভাব-বন্যার প্লাবন বহাইয়া দিয়া সমগ্র ইউরোপখণ্ডে এক নবীন চেতনার সঞ্চার করিয়াছিল। সার্দ্ধ ত্রিশতাব্দী ব্যবধানে ফরাসী বিপ্লবোখ সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার অভিনব বাণী আবার ইউরোপীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটাইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যে এই ধরণের যুগান্তকারী ঘটনাগুলি সংস্কৃতির রূপান্তরের মূল কারণ নহে, উপলক্ষ্য মাত্র।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সময়ে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে মানব-সভ্যতার আবার অভিনব রূপায়ণ আরম্ভ হয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের কথা মৃত্যুঞ্জয়ী মহাকালের খাতায় অমর অক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে। দীর্ঘ যুগের নিদ্রাবসানে জাগ্রত রুশিয়ার গণ-শক্তি মানবের বন্ধন-মুক্তির মহাব্রত গ্রহণ করে।

অক্টোবর বিপ্লবের নায়কগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মানবের বন্ধনমুক্তির জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব। এই চতুর্ব্বিধ বিপ্লবের সাহায্যেই যে হৃতমান মানব-মহিমাকে গৌরবের আসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে এ সত্যও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই।

প্রাক্-বিপ্লব রুশিয়াতে সংস্কৃতির, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান, চারুশিল্প, সাহিত্য এবং সঙ্গীতের দ্বার জনসাধারণের নিকট রুদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রুশিয়াতে কোন মানস-সম্পদই এখন আর শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। লেনিন বলিতেন যে সংস্কৃতি জনসাধারণের সম্পদ এবং মানবমনের সৌন্দর্য্যবোধকে সচেতন করিয়া উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়া মানুষকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাওয়াতেই তাহার সার্থকতা।

সংস্কৃতি-বিপ্লবের অগ্রদূতগণের সম্মুখে সমস্যা ছিল প্রধানতঃ দুইটি—সংস্কৃতির মানের উন্নয়ন এবং অনগ্রসর জাতি(Nationality)গুলির পক্ষে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাহাতে বিপ্লবের পথে উন্নততর জাতিগুলির সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া চলা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব না হয়।

এই দ্বিবিধ সমস্যার সমাধানের কৃতিত্ব মুখ্যতঃ ষ্টালিনের প্রাপ্য। তিনি নির্দ্দেশ দিলেন যে USSR-এর প্রতিটি জাতিকে স্বকীয় সংস্কৃতি সৃষ্টি করিয়া তাহার বিকাশ সাধন করিতে হইবে। এই সংস্কৃতি দৃশ্যতঃ জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করিলেও সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক বিধান প্রচলিত থাকিবার ফলে মূলতঃ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সাম্যবাদী সংস্কৃতি।

লেনিন বলিলেন যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাইতে না পারিলে সাম্যবাদের বিজয় অভিযান সফলতামণ্ডিত হইবে না। ১৯২০ সালে ইয়ং কম্যুনিষ্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন যে মার্কসবাদ আয়ত্ত না করিয়া সাম্যবাদী হওয়ার আশা দুরাশা মাত্র, কিন্তু শুধু মার্কসবাদ আয়ত্ত করিলেই চলিবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দীর সাধনার ফলে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে যে অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে, সেই ঐশ্বর্য্যে ব্যক্তি এবং জাতি-মানসকে নিষিক্ত এবং সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

সংস্কৃতির ভিত্তি শিক্ষা। ১৯১৮ সালেই ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও অন্তর্বিরোধ এবং জটিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ১৯৩০-এর পূর্ব্বে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৩০-এর পর হইতে কি বিদ্যুৎগতিতে শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছে ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ১৯১৭ হইতে ১৯৪৪ এই ২৭ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র ৫ লক্ষ নাগরিককে শিক্ষাব্রতী হইবার উপযোগী শিক্ষা দিয়াছে। এই সময়ে ৪ কোটিরও অধিক নিরক্ষর লোক সাক্ষর হইয়াছে এবং বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শিক্ষার জন্য বহুসংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্তী বৎসরে (১৯৩৬-৪০) ১০ হাজার বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। জীবন-পণ যুদ্ধের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার অব্যাহত রহিয়াছে। ১৮৯৭ সালে যে রাশিয়াতে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ২১.২ জন, ১৯৪৪ সালে সেই রুশদেশ হইতেই নিরক্ষরতা নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক নববিধান প্রবর্ত্তনের ফলেই শিক্ষার সুযোগ, অবসরের প্রাচুর্য্য এবং বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্ভব হইয়াছে। আর এই সমুদয়েরই ফলে বাড়িয়াছে সোভিয়েট নাগরিকের জীবনের মাধুর্য্য। তাহার সমগ্র জীবন হইয়া উঠিয়াছে আনন্দময়। পুস্তক রচনা এবং পাঠানুরাগ এই আনন্দেরই প্রকাশ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে যখন রূপ দেওয়া হইতেছিল (১৯২৮-৩৩) তখন এক রাশিয়াতে যত পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহার সংখ্যা ঐ সময়ে জাপান, জার্ম্মাণী এবং ইংলণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। সাধারণের পাঠানুরাগ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে মস্কোর একটি পুস্তকের দোকানে এক দিনেই টলষ্টয়ের *Resurrection*-এর ১ হাজার খণ্ড এবং অপর একটি দোকানে পুশকিনের সমগ্র রচনাবলীর ৬০০ খণ্ড তিন ঘণ্টারও কম সময়ে বিক্রীত হইয়া যাওয়া কবিকল্পনা নহে। ১৯১৯ সালে রুশিয়াতে সর্ব্বমোট ২৬ হাজার পুস্তকের ৮ কোটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ২০ বৎসর পরে ১৯৩৯ সালে সেই সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ৪৫ হাজার এবং ৭০ কোটিতে দাঁড়ায়। ১৯১৭-১৮ হইতে আজ পর্য্যন্ত পুশকিন, টলষ্টয়, শেখভ, টুর্গেনিভ, গগল ইহাদের প্রত্যেকের গ্রন্থাবলীরই বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যগুলিরও আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে ১১১টি বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক প্রকাশিত হয়। মস্কোর ইণ্টার ন্যাশন্যাল বুক-হাউস একাই ৮৫টি বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করে। ইহার মধ্যে পাঠ্যপুস্তক, উপন্যাস, রূপকথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ, বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের—প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের—গ্রন্থরাজির অনুবাদ এই সমস্তই রহিয়াছে। আইনষ্টাইনের বইয়ের কাট্‌তি কোন দেশেই বেশী নয়। ইংলণ্ডে বিক্রীত তাঁহার বইয়ের সংখ্যা নির্দ্ধারণ শ'য়ের হিসাবে করাই সমীচীন হইবে। আর রাশিয়াতে ১৯২৭ হইতে ১৯৩৬-এর মধ্যে তাঁহার পুস্তক বিক্রীত হয় ৫৫০০ খণ্ড। আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার, ভিক্টর হুগো, বালজাক, ডারউইন, ওয়েলস্‌, হাইনরিখ মান, গুস্তাভ, রিজিয়ার, ইঁহাদের প্রত্যেকের রচিত গ্রন্থই সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। ১৯১৩-৩৭ এই পাদ শতাব্দী কালে সাহিত্যবিষয়ক, কৃষিবিষয়ক, সমাজবিজ্ঞান ও রাজনীতিসংক্রান্ত এবং যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশ যথাক্রমে ৭ গুণ, প্রায় ৮ গুণ, ১৭ গুণ এবং ২৭ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

অভিযোগ করা হয় যে অতীন্দ্রিয় জগৎ বা অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থের প্রকাশ এবং প্রচার সোভিয়েট ভূমিতে নিষিদ্ধ। কথাটি সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে অশ্লীল বা কুরুচি-পূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশ এবং প্রচার সোভিয়েট আইন অনুসারে দণ্ডার্হ।

তার পর মুদ্রাযন্ত্রের কথা। মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থা দ্বারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন দেশ অগ্রসর না পশ্চাৎপদ, প্রগতিশীল না প্রতি-ক্রিয়াশীল তাহা বুঝা যায়। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মুদ্রাযন্ত্র বিত্তবান সম্প্রদায়ের করতলগত এবং তাঁহাদের স্বার্থের রক্ষক। সোভি-য়েট ভূমিতে সর্ব্বপ্রথম এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সোভিয়েট-তন্ত্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই আইন করিয়া দেশের সমস্ত মুদ্রাযন্ত্র, সংবাদপত্র এবং পুস্তক প্রকাশ ও প্রচারব্যবস্থার কর্ত্তৃত্ব সোভিয়েটগুলিকে দিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে বর্ত্তমান যুগে সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহন মুদ্রাযন্ত্রের উপর জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে গ্রন্থাগার, পাঠমন্দির, রঙ্গ-মঞ্চ এবং চিত্রগৃহের উপর কর্ত্তৃত্ব রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। (তুলনীয়—

". . . The citizens of the U.S.S.R. are guaranteed by law: (a) freedom of speech; (b) freedom of the press; (c) freedom of assembly, including the holding of mass meetings; (d) freedom of street processions and demonstrations.

"These civil rights are ensured by placing at the disposal of the working people and their organisations printing press, stocks of paper, public buildings, the streets, communication facilities and other material requisites for the exercise of these rights."—(*Article 125 of the Soviet Constitution.*)

১৯১৩ সালে অর্থাৎ প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে সমগ্র রুশিয়াতে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত ৮৫৯খানা আর ১৯৩৯ সালে রুশিয়ায় ৮৫৫০খানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। প্রথমোক্ত বৎসরে দৈনিক ২৭ লক্ষ এবং শেষোক্ত বৎসরে দৈনিক ৪৭,৫২০,০০০ খানা সংবাদপত্র বিক্রীত হইত। বিখ্যাত বিখ্যাত পত্রিকাগুলির গ্রাহকসংখ্যার কথা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ *Pravda* (দৈনিক বিক্রয় ২০ লক্ষের বেশী), *Izvestia* (দৈনিক মুদ্রণ-সংখ্যা ১৬,০০০০০) এবং *Trud* (দৈনিক মুদ্রণ-সংখ্যা ৪৮০০০০) এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শিশু সংবাদপত্র *Pionerskya Pravda* (The Pioneer Truth)-র গ্রাহক সংখ্যা ৯০০০০০। আমাদের দেশের সর্ব্বা-পেক্ষা বহুল প্রচারিত পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা ইহার দশ ভাগের এক ভাগ হইলেও কর্ত্তৃপক্ষ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিবেন। রুশিয়াতে ১৮৮০ খানা সাময়িক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাদের মোট প্রচারসংখ্যা ২৫ কোটি।

বড় বড় কারখানা এবং শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব সংবাদপত্র আছে, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাপ্তাহিক এবং কতকগুলি একদিন অন্তর একদিন প্রকাশিত হয়। ১৯৩৭ সালে এই ধরণের সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৪৬০৪। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান, যৌথ কৃষি-কেন্দ্র ও বিদ্যালয়সমূহের হাতে বা টাইপরাইটারে লেখা প্রাচীর সংবাদপত্র (Wall News paper) আছে। বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান-গুলির প্রত্যেক বিভাগই নিজস্ব প্রাচীর সংবাদপত্র প্রকাশ করে। ইহা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ সংবাদপত্রের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। বীজ বপন এবং শস্য সংগ্রহ কালে Motor Truck-এ বসান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রাযন্ত্র ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে বেতার-যন্ত্রের ব্যবস্থাও থাকে। তাহার সাহায্যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া সংবাদপত্রাকারে মুদ্রিত করিয়া কর্ম্মরত নরনারীর মধ্যে প্রচার করা হয়। লালফৌজ এবং লালনৌবহরের নিজস্ব সংবাদপত্র আছে। ইহাদের নাম যথাক্রমে 'The Red Star' ও 'The Navy'। এই সমস্ত সংবাদপত্র উদীয়মান লেখক-দিগকে স্ব স্ব সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিয়া থাকে এবং প্রধানতঃ ইহাদেরই সাহায্যে এক বিরাট্ সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে। কারখানাসংলগ্ন মুদ্রাযন্ত্রগুলি কর্ম্মী-দিগের রচিত কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি প্রকাশ করে। এই ভাবে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কর্ম্মীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ এবং প্রকৃতই গণ-সাহিত্য পদ-বাচ্য।

জনসাধারণের সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত সোভিয়েট মুদ্রা-যন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে উদার করিয়া তোলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখা হয় যে এই উদারতা যেন গণ-স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। উৎকোচের সাহায্যে ইহাকে বশীভূত করা চলে না। যাবতীয় ভণ্ডামি, অসত্য, দুর্নীতি এবং মানববিদ্বেষের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে ইহা অতুলনীয়। কেবলমাত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারার বাহক বলিয়া পৃথিবীর যে-কোন দেশের মুদ্রাযন্ত্রের তুলনায় সোভিয়েট মুদ্রাযন্ত্র অধিকতর গণতান্ত্রিক; রাষ্ট্রের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সোভিয়েট মুদ্রাযন্ত্র প্রকৃতই গণ-স্বার্থের রক্ষক হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার উন্নতিও হইয়াছে অভাবনীয়। বর্ত্তমান যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে রুশিয়া

হইতে ৭০টি বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত সাধারণতন্ত্রের প্রাক্-বিপ্লব যুগে কোন বর্ণমালা ছিল না অথবা যাহাদের ভাষায় অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক বা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত বিগত সপ্তবিংশতি বৎসরে তাহাদের মধ্যে ৪০টি সাধারণতন্ত্র নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। অক্টোবর বিপ্লব সোভিয়েট ভূমিতে প্রচলিত যাবতীয় ভাষা এবং সাহিত্যকে নূতন প্রেরণা দান করিয়া পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে। উৎকৃষ্ট অথচ বহুকালবিস্মৃত গ্রন্থরাজি নূতন করিয়া প্রকাশিত, পঠিত এবং আলোচিত হইতেছে। বিভিন্ন ভাষার চারণ কবিদের রচনা ইহার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আজেরবাইজান, ককেশাস প্রভৃতি অঞ্চলের চারণ কবিদিগের রচনা সাহিত্য-ভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করিয়া রুশ-সাহিত্যকে জগতের অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে।

এই সাহিত্য গণদেবতার জীবন-আলেখ্য এবং আদর্শের দিক হইতে ইহা যে-কোন সাহিত্য অপেক্ষা প্রগতিশীল। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে ইহা করিয়াছে সমৃদ্ধ। স্বীয় আদর্শ প্রচার করিবার জন্য ইহা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছে। এই উপায়ের নাম দেওয়া যাইতে পারে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ (Socialist Realism)।

সোভিয়েট সাহিত্যিক এবং বার্ত্তাজীবী সম্প্রদায় সমাজের একটা বিশেষ সম্মানভাজন অঙ্গ। এই ত সেদিন Presidium of the Supreme Soviet of the U. S. S. R.-এর আদেশে ১৭২ জন লেখককে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সোভিয়েট রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'অর্ডার অব্ লেনিন' এবং 'অর্ডার অব্ দি রেড ব্যানার অব্ লেবার' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। আলেক্সি টলষ্টয়, মিখাইল শোলোখভ প্রভৃতি খ্যাতনামা সাহিত্যিক Supreme Soviet of the U. S. S. R.-এর সদস্য।

সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানও সমান তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞানের কোন বিভাগই আজ আর উপেক্ষিত বা অনাদৃত নয়। রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান মস্কোর 'একাডেমি অব্ সায়েন্সেস-এর সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানাগারগুলি আধুনিকতম যন্ত্রপাতি এবং বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে সুসজ্জিত এবং সুসমৃদ্ধ। ১৯৪০ সালে রুশিয়ার ৭০০ বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে মোট ৪০০০০ গবেষক গবেষণা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ৫০০ পরীক্ষামূলক কৃষিকেন্দ্র, ৩৪টি মানমন্দির, দুই শতেরও অধিক যাদুঘর এবং সরকারী গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা চলিতেছিল।

সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গ এবং বাহন—রঙ্গমঞ্চ, চলচ্চিত্র ইত্যাদিও উপেক্ষিত হয় নাই। অনেকেরই হয়ত ধারণা যে সোভিয়েট ভূমি Puritan অথবা শুচিবাদীর দেশ। তাঁহারা হয়ত মনে করেন যে সেদেশে সকলেই বিজ্ঞান, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও অন্নবস্ত্রসমস্যার সমাধানকল্পে নিজেদের সমগ্র শক্তি-সামর্থ্য এবং সময় নিয়োজিত করিয়া থাকেন। এ ধারণা কিন্তু একেবারেই ভ্রান্ত। সঙ্গীত এবং অন্যান্য চারু ও কারু শিল্প এত প্রসার লাভ করিয়াছে যে পূর্ব্বে যাহারা যাবতীয় মানস-সম্পদের উপভোগ হইতে বঞ্চিত ছিল, তাহাদেরই বিরাট্ একটি অংশ আজ শিল্পানুরাগী এবং শিল্পরসিক।

বিশ্বের সংস্কৃতিভাণ্ডারে সোভিয়েট নট এবং নাট্যকারদের দানও অপরিসীম। রুশীয় নাট্য-সাহিত্য পৃথিবীর যে-কোন শ্রেষ্ঠ নাট্য-সাহিত্যের সহিত সমকক্ষতার দাবি করিতে পারে। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নটদের নাম করিতে হইলে Moskvin, Kachalov এবং Osluzhevকে বাদ দেওয়া চলে না। নাট্যোন্নতির জন্য সোভিয়েট সরকার অকৃপণ হস্তে অর্থব্যয় করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারী রাশিয়াতে মোট ৮২৫টি রঙ্গালয় ছিল আর ১৯১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫৩। পূর্ব্বে যে মস্কোতে ৭।৮টি মাত্র রঙ্গালয় ছিল, আজ সেখানে রঙ্গালয়ের সংখ্যা চল্লিশটি। গত সাতাশ বৎসরে মস্কো, লেনিনগ্রাড, ইরেভান, মিনস্ক, ইবানোভো, কিয়ভ, স্মোলেনস্ক, রস্টভ tov প্রভৃতি স্থানে বহু নূতন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লেলিনগ্রাড, মস্কো এবং কিয়ভের Opera ও Ballet এবং মস্কোর বিশ্ববিখ্যাত আর্ট থিয়েটারের সঙ্গীত ও অভিনয়ের মান (standard) ইউরোপের যে-কোন রাজধানীর তুলনায় উন্নততর ধরণের।

প্রায় প্রত্যেক সোভিয়েট নাট্যালয়েরই নিজস্ব নাট্যবিদ্যালয় আছে। ফলে ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব নাট্যভঙ্গী গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় রঙ্গালয়গুলি Commissariat of Education-এর অধীন হইলেও ইহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা বহুলাংশে রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বমুক্ত।

বিখ্যাত অভিনেতৃ সজ্ঘগুলি ছোট শহর, যৌথ কৃষিক্ষেত্র (Collective Farm), যুদ্ধক্ষেত্র, নৌঘাঁটি প্রভৃতি স্থানে অভিনয় করিবার জন্য গ্রীষ্মকালে শহরে বাহির হয়। ইহারা শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান এবং যৌথ কৃষিক্ষেত্রসংলগ্ন নাট্যালয়সমূহকে মধ্যে মধ্যে নিজেদের অভিনেতা পাঠাইয়া এবং অন্যান্য নানা ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহার ফলে সর্ব্বত্র নাট্যকলার দ্রুত উন্নতি ঘটিয়াছে। লালফৌজ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি নিজেরাই রঙ্গালয় পরিচালিত করে। এই প্রসঙ্গে লালফৌজ পরিচালিত অর্কেষ্ট্রার কথাও উল্লেখযোগ্য।

বন্ধনমুক্ত সোভিয়েট নরনারীই প্রধানতঃ আধুনিক রুশীয় নাটকের পাত্রপাত্রী। অভিনব স্বাধীনতা ও জীবনের অন্তহীন সম্ভাবনার আনন্দে উৎফুল্ল এবং প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্যে চঞ্চল এই মানব-মানবীর দল কিন্তু সাম্যবাদী সমাজসৃষ্টির পথে যে সমস্ত অন্তরায় আছে তাহার প্রতি উদাসীন নহে।

দেশ-বিদেশের প্রাচীন নাটকের কদরও রুশিয়াতে কম নহে। মস্কোর রঙ্গালয়গুলিতে শেক্সপীয়ারের নাটক যত অভিনীত হয় তত বোধ হয় লণ্ডনেও হয় না। ১৯৪২-৪৩এর স্মরণীয় শীতকালে যখন ভীষণ সমরতরঙ্গ মস্কো এবং লেনিনগ্রাডের দ্বারপ্রান্তে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল তখনও ভল্গাতীরে যুদ্ধকালীন রাজধানী কুইবিশেভ এবং জর্জ্জিয়ার টাইফ্লিস্-এ গোল্ডস্মিথের "She stoops to conquer" এবং শেক্স-

পীয়ারের অমর নাটক হ্যামলেটের অভিনয় উপলক্ষ্যে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের অভাব ঘটে নাই।

চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্যও চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। চলচ্চিত্রের মস্ত সুবিধা এই যে, ইহা অত্যন্ত সহজেই সাধারণ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সোভিয়েট ভূমির জীবনধারা সুন্দর এবং নিখুঁত ভাবে চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। কাজেই দেশের নাড়ীর সহিত ইহার যোগ ঘনিষ্ঠ। তুলনীয়—

"The virtue and significance of Soviet cinematography is that it gives a true portrayal of life in our own Soviet country and has really become, of all arts, the closest to the masses; that it is actively contributing to the further consideration of our new system of society; that it has a great formative influence on the mind of the Soviet people. To this is due its immense popularity among the peoples of the U.S.S.R., their high opinion and encouragement of the art."—(*U.S.S.R. Speaks for Itself—p. 311.*)

বিগত এবং চলিত যুগের স্মরণীয় ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া বহু চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'Lenin in October' 'Lenin in 1918' এবং 'Defence of Tsaritsyn'-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে রুশিয়াতে চিত্রগৃহের সংখ্যা প্রায় ৪০০০।

প্রযোজক, কার্য্যপরিচালক, দৃশ্যচিত্র লেখক এবং ষ্টুডিও শিল্পীদের শিক্ষার জন্য মস্কোতে State Institute of Cinematography প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার শিক্ষা অবৈতনিক এবং শিক্ষার্থিগণ সরকার হইতে নিয়মিত ভাতা পাইয়া থাকেন। চলচ্চিত্রযন্ত্র শিল্পীদিগের শিক্ষার জন্য লেনিনগ্রাডে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান এবং চলচ্চিত্রের উন্নতিবিধানের জন্য মস্কোতে গবেষণাগার' রহিয়াছে (দ্রষ্টব্য—*U. S. S. R. Speaks of Itself*—p. 331)।

সংস্কৃতি-বিপ্লবের ফলে বিগত সপ্তবিংশতি বৎসরে রুশিয়াতে এক অভিনব বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে ষ্টালিন বলেন যে জনগণের মধ্য হইতে উদ্ভূত এই বুদ্ধিজীবীর দল সংস্কৃতি-বিপ্লবের এক অভিনব ফল। ধনতান্ত্রিক সমাজে বুদ্ধিজীবীর দল জনসাধারণ হইতে বিযুক্ত। কিন্তু সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বৃহত্তর সমাজেরই একটা অংশ এবং সমাজ-সেবা ইহার আদর্শ। সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিস্তার যে ভাবে ঘটিতেছে, আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র সমাজ পরিপূর্ণ ভাবে শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান হইয়া উঠিবে।

De Hewlitt বলেন যে রুশীয় ভাষায় সংস্কৃতি কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা বহুলব্যবহৃত শব্দ। ধনতান্ত্রিক সমাজে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি এবং শ্রেণীর কথা শোনা যায়। সোভিয়েট ভূমিতে কিন্তু সংস্কৃতিকে এই ভাবে খর্ব্ব বা সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। সংস্কৃতিবান গোটা একটা জাতি সৃষ্টি করা সোভিয়েটের সাধনা। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অবসর, নিরাপত্তা এবং সুযোগের ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এই আদর্শের রূপায়ণ। তুলনীয়—

"There is one word more than all others on the lips of Soviet people. It is the word 'culture'. * * * We speak of men of culture. We speak of the cultured classes. The Soviet people limit neither the word nor the thing for which it stands. The Soviet people have no cultured classes and seek none. They seek a wholly cultured people, and in order to arrive at that result they seek to give leisure, security and opportunity to all."—(*Socialist Sixth of the World* by De Hewlitt—pp. 127-8.)

সাম্যবাদী সংস্কৃতি জাতি-মানসকে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাতে অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। আর তাহারই ফলে জাতীয় জীবনের দারুণ দুর্দ্দিনেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে জীবন-মরণ যুদ্ধের সর্ব্ববিধ দাবি পূরণ করা অসম্ভব হয় নাই। লাল ফৌজ, লাল নৌ এবং বিমানবহরের পক্ষে কোন দিনই যথাসময়ে এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিমান, ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ ইত্যাদির যোগান পাওয়া কঠিন হয় নাই।

দেশের যাবতীয় সংস্কৃতিমূলক এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, সমস্ত বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং শিল্পী সকলেই আজ সমররত বাহিনীর প্রয়োজনে এবং চিত্তবিনোদনে নিজেদের বিশেষ ক্ষমতাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। কাজেই দেখিতে পাই যে Komarov, Fersman, Lysenko, Bach প্রভৃতি প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক U. S. S. R.-এর নূতন নূতন অঞ্চলের শিল্পোৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি সাধন, শ্রমশিল্পের পক্ষে অপরিহার্য্য কাঁচা মালের সন্ধান, ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত গবেষণায় নিযুক্ত রহিয়াছেন।

এই যুদ্ধকালেই রচিত Dmitri Shortakovich রচিত 'Ninth Symphony' সঙ্গীত-জগতের একটি অনবদ্য এবং অনুপম সৃষ্টি। M. Sholokhov, A. Tolstoy, I. Erhenbourg, Wanda Wasilewske, K Simonov প্রভৃতি খ্যাতনামা সোভিয়েট সাহিত্যসেবী বহুলাংশে বর্ত্তমান যুদ্ধের ঘটনাবলী হইতে তাঁহাদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা পাইয়াছেন। আবার ইঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যই সমররত বাহিনীকে মহৎ হইতে মহত্তর আত্মোৎসর্গের অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে।

টেনেসী নদীর কথা

(১)

শ্রীকমলেশ রায়

বর্ত্তমানে চারদিকে নানারূপ পরিকল্পনা বা প্ল্যানিঙের কথাবার্তা চলছে। সেই সূত্রে টেনেসী নদী ও টেনেসী ভ্যালি অথরিটি—সংক্ষেপে টি ভি এ-র (TVA) নাম প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের বহু পাঠকের মনেই টেনেসী নদীর

পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছে। এই কারণে টি ভি এ র কার্য্যকলাপের একটি মোটামুটি বিবরণ দেওয়া এ সময় প্রয়োজন বোধ করছি।

দেশের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার কারণ ও প্রতিকারের কথা ভাবতে গেলে দেখা যায় মানুষকে বাঁচতে হবে প্রকৃতির সম্পদকে অবলম্বন করে। মানুষের প্রয়োজন নানারূপ, প্রকৃতির ধনসম্পদও অল্প নয়। কৃষিজাত দ্রব্য, খনিজ সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যেমন বর্ত্তমান সভ্য জাতির পক্ষে প্রয়োজন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশ্রাম, অবসরও তেমনি কাম্য। এই সমস্ত পেতে হলে প্রকৃতিকে জয় করতে হবে—তাকে অবহেলা করে বা তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নয়—তাকে বুঝে বৈজ্ঞানিক ধারায় বাগ মানিয়ে। প্রকৃতির সম্পদ ধারাবাহিক ভাবে আহরণ করা এবং জনমণ্ডলীতে বণ্টন করা একটি বিরাট্ জাতীয় পরিকল্পনা।

বিগত মহাযুদ্ধের দশ বছর পরে সারা পৃথিবীতে ভয়াবহ অর্থনৈতিক অনটনের গভীর ছায়া নেমে আসে। অর্থাভাব, বেকার-সমস্যা মহামারী রূপ ধারণ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও সীনেটর জর্জ নরিস ১৯৩৩ সালে দেশের বিভিন্ন অংশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের পরিকল্পনা করেন। এইরূপ পরিকল্পনায় দেশাংশ বা region বেছে নেওয়া হবে প্রাকৃতিক খণ্ড অনুসারে,—রাজনৈতিক প্রদেশ, বিভাগ বা জেলা হিসাবে নয়। কারণ লোহার খনি, তেলের খনি, কয়লা, বনজঙ্গল, নদনদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ রাজনৈতিক ধারা বা সীমারেখা মেনে চলে না।

রুজভেল্ট ও নরিসের মতে এই প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের পরিকল্পনা করা হবে এক একটি নদীর অববাহিকা ধরে। নদীর অববাহিকাকে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি স্বাভাবিক ভূখণ্ড মনে করবার বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ কৃষি ও জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে জলের বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্যেক নদীই বর্ষার দু-তিন মাস ভয়াবহ বন্যা আনে এবং প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সাধন করে এবং মানুষ ও গবাদি পশুর প্রাণ নাশ করে। আবার বর্ষার পরেই নদী অচিরেই এত নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে তা থেকে চাষের জল ও পানের যোগ্য পরিষ্কার জল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না। ফলে জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয় না ও দেশে মহামারী দেখা দেয়। আবার নদীর এই দুই চরম অবস্থা, অর্থাৎ বন্যা ও শুষ্কতা, নৌকা ষ্টীমার চলাচলের পক্ষে একেবারেই উপযুক্ত নয়। সুগম জলপথের অভাবে কাঁচামাল সরবরাহে ও বাণিজ্যদ্রব্যসম্ভার গমনাগমনে বিশেষ বাধা ঘটে। নদীকে সারা বছর বাঁচিয়ে রাখতে হলে বর্ষার জল সঞ্চয় করে রাখতে হবে। অধিকন্তু এই জলাধারের সঞ্চিত জল হতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যেতে পারে—যা বর্ত্তমান শিল্পকারখানায় প্রাণস্বরূপ। অতএব দেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিল্প বাণিজ্যের পরিকল্পনায় নদীর মূল্য কতখানি এবং নদীর অববাহিকাকে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ভূখণ্ড বলে মনে করবার যুক্তি কি তা স্পষ্টভাবে দেখা গেল।

এই বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বিশ্লেষণ করে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলসমূহ অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে, এবং প্রস্তাব করেন এই পরিকল্পনা টেনেসী নদীর অববাহিকাতে প্রথমে প্রয়োগ করা হোক। এই জন্য প্রয়োজন 'টেনেসী ভ্যালি অথরিটি' (Tennessee Valley Authority) নামে একটি সমিতি গঠন করা। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে টেনেসী নদীর অববাহিকাকে (৪১,০০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ বাংলা দেশের অর্দ্ধেক) পুনরুজ্জীবিত করা; সেখানকার ও সমগ্র জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা। সমিতির হাতে যেমন এই বিরাট্ দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তাকে তা পালন করবার মত স্বাধীনতা ও ক্ষমতাও দেওয়া প্রয়োজন হবে। টি ভি এ-র মুখ্য উদ্দেশ্য হবে সম্পূর্ণ টেনেসী নদীতে ৬৫০ মাইল অবধি বৎসরের সকল সময় অন্ততঃ ৯ ফুট গভীর জলস্রোত পোষণ করা। সঙ্গে সঙ্গে বন্যা নিবারণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বনরক্ষা, আবাদী জমির ধ্বস ও ক্ষয় নিবারণ ইত্যাদিও তাকে দেখতে হবে।

গোড়ায় এ নিয়ে অনেক বিরোধিতা হয়েছিল। এরূপ জাতীয়তাবাদী দূরদৃষ্টি সকলের থাকে না। কেউ কেউ ভাবলেন তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগবে। প্রথমতঃ, নদী রাজনৈতিক



নরিস বাঁধ, ২৬৫ ফুট উঁচু, ১৮৬০ ফুট দীর্ঘ। ১ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করে। এই বাঁধের সাহায্যে ৬৩০ বর্গমাইল পরিমিত পার্ব্বত্য অঞ্চল বিশাল সুরম্য হ্রদে পরিণত হয়েছে।

গণ্ডি মেনে চলে না। টেনেসী নদী সাতটি বিভিন্ন প্রদেশ বা ষ্টেটের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে—টেনেসী প্রদেশ, মিসিসিপি, কেণ্টুকি, আলাবামা, জর্জ্জিয়া, উত্তর ক্যারোলিনা ও ভার্জিনিয়া। ষ্টেটের কর্ম্মসচিবরা ভাবলেন বুঝি বা তাঁদের ক্ষমতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ হতে চলেছে। এছাড়া ছোট ছোট বিদ্যুৎ কোম্পানীরা ভাবল তাদের একচেটে ব্যবসা বুঝি মারা যায়। কয়লার খনির মালিকরা ভাবল টি ভি এ-র সস্তা বিদ্যুৎ হলে বুঝি তাদের কয়লা বিক্রী কমে যাবে (কিন্তু পরে দেখা গেল প্রকৃত পক্ষে কয়লার চাহিদা আরও বেড়ে গিয়েছে)। কিন্তু কোনও বিরোধিতা টিকল না; ক্ষুদ্র স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বলি দিতে যুক্তরাষ্ট্র গবর্মেণ্ট মোটেই রাজি নয়। ১৯৩৩ সালের ১৮ই মে 'টেনেসী ভ্যালি অথরিটি' সৃষ্টি করে কংগ্রেস থেকে 'এক্ট্' পাস হ'ল। অবশ্য গোড়ার দিকে টি ভি একে নানান বিনিযুক্ত স্বার্থের (vested interst) বিরুদ্ধে অনেক মামলা মোকদ্দমা লড়তে হয়েছিল।



টেনেসী নদীতে বাঁধের সাহায্যে জল-নিয়ন্ত্রণের উপায়

টি ভি এ হ'ল একটি স্বায়ত্ত সমিতি: বহু বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর, আদর্শবাদী, অর্থনীতিবিদ প্রমুখ বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত। উদ্দেশ্য শাই, সকলে কাজ করছেন দেশের ও জাতির উদ্দেশে। প্রকৃতির সম্পদ আহরণ করতে হবে, দেশের লোকদের কলপ্রসূ কাজ দিতে হবে, জাতির সুখ সমৃদ্ধি বাড়াতে হবে। এর জন্য যে ভাবে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন তা টি ভি এ নিজেই ঠিক করবে। তারা পরের দেওয়া বা 'উপরওয়ালাদের' পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে না, লাল ফিতের বালাই নেই, পলিটিক্স নেই। টি ভি এ হ'ল বিশেষজ্ঞদের সমিতি, এখানে পলিটিক্স ঢুকলেই সমূহ বিপদ। তাই বুঝে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস গোড়াতেই বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছে যে এই বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের সমিতির মধ্যে রাজনৈতিক বা ধর্ম বর্ণ ভেদাভেদ দলাদলির বিষ যেন প্রবেশ না করে। কর্ম্মীদের নিয়োগ ও উন্নতিতে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত গুণাবলিই একমাত্র বিবেচ্য হবে।

বার বছরের কাজের হিসাব

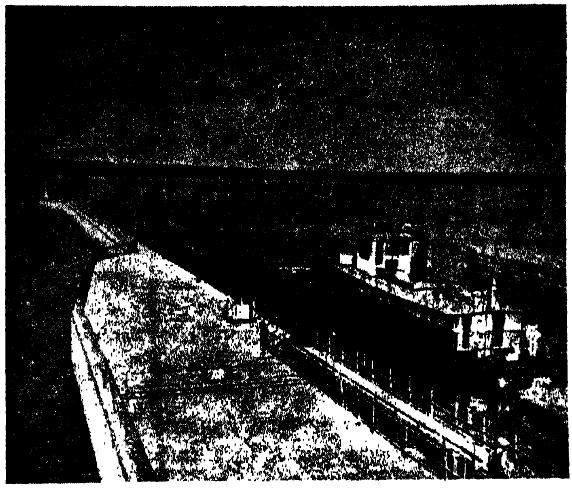
১৯৩৩ সালে টি ভি এ গঠিত হবার পরে প্রায় বার বছর কেটে গিয়েছে। টি ভি এ গঠিত হবার আগে এত বড় জায়গাটি ছিল বন্যাপীড়িত অথচ অনুর্ব্বর, ধূসর বালুকাময়। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল দুর্দশাগ্রস্ত এবং সাধারণ আমেরিকাবাসীদের চেয়ে অনেক গরীব। যুক্তরাষ্ট্রের এই অংশে নানারূপ খনিজ সম্পদও আছে, কিন্তু তা উত্তোলনের ব্যবস্থা ছিল না।

টি ভি এ-র পরিকল্পনার গুণে এই কয় বছরে সেখানকার অধিবাসীদের মাথা পিছু শতকরা ৭৩ ভাগ আয় বেড়েছে, যেখানে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের গড়পড়তা আয় বেড়েছে ৫৬ ভাগ মাত্র।

টেনেসী নদী ও তার উপশাখাগুলির মুখে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করবার পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে ঐ অঞ্চলে আর বন্যা হয় না। এতে দেশ বছরে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বন্যা হবার ভয় না থাকায় অধিক পরিমাণ জমি চাষের ও বাসের কাজে লাগছে; নির্ভয়ে অন্যান্য শিল্পও গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে।

এই 'বাঁধ' বা dam কি ব্যাপার সেকথা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। বাংলা ভাষায় বাঁধ বললে দু' রকম বাঁধই বোঝায়। একটি হ'ল নদীর পাড় বরাবর, যাকে বলে embankment। অন্যটি নদীর প্রবাহমুখে আড়াআড়ি প্রাচীর বিশেষ—যা দিয়ে জলকে আটকে রাখা যায়। শেষোক্ত বাঁধকেই ইংরেজীতে ড্যাম বলে, এই বাঁধের কথাই বলছি। নদী যেখানে পার্ব্বত্য অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত সেখানে এমন কতকগুলি সুযোগ্য স্থান পাওয়া যেতে

পারে যেখানে দু-তিন-শ থেকে দু-তিন হাজার গজ দীর্ঘ বাঁধ দিয়ে নদীর মুখ আটকে দিতে পারলেই পাহাড়ের বুকে বিশাল জলাধার (reservoir) বা কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হ'তে পারে। পারিপার্শ্বিক পাহাড়ের উচ্চতা অনুসারে বাঁধ পঞ্চাশ-ষাট বা দেড়-শ দু-শ ফুট বা আরও উঁচু করা যেতে পারে। এই বাঁধে আটকানো জল পাহাড়ের কোলে পঞ্চাশ-ষাট বা শতাধিক মাইল দীর্ঘ আর দেড় মাইল দু'মাইল প্রস্থ বিস্তৃত হয়ে বিশাল মনোরম হ্রদ সৃষ্টি করে।



বাঁধের মধ্য দিয়ে এক হ্রদ থেকে অন্য হ্রদে নৌকা জাহাজ ওঠা নামা করবার লক্‌-গেট

টেনেসী নদী ও তার উপশাখা নদীর মুখে এতাবৎ একুশ বাঁধ নির্ম্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ষোলটি টি ভি এ-র আমলে তৈয়ারী, আর পাঁচটি পুরাতন বাঁধকে নূতন ছাঁচে মেরামত করা হয়েছে। এই সব বাঁধ নির্ম্মাণ করতে ও বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রাদি বসাতে কি ধরণের খরচ হয়েছে তার কিছু নমুনা দিচ্ছি। নরিস বাঁধে খরচ হয় তিন কোটি ডলার বা দশ কোটি টাকা। হিউয়াসী বাঁধে খরচ পড়েছে ছ'কোটি টাকা। হুইলার বাঁধ, চিকামাউগা বাঁধ ও পিকুইক বাঁধের প্রত্যেকটিতে খরচ পড়েছে বার কোটি টাকা ক'রে।

টেনেসী নদীর অববাহিকাতে বছরে ১১ কোটি একর ফুট বারিপাত হয় (১ 'একর ফুট' = ৪৩,০০০ ঘন ফুট)। অর্দ্ধেক পরিমাণ জল মাটিতে শুষে নেয়, অপরার্দ্ধ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচকোটি একর ফুট জল নদীপথে প্রবাহিত হয়। বর্ত্তমানে টি ভি এ বাঁধ সমূহে সবশুদ্ধ দুইকোটি একর ফুট বা মোট প্রবাহ বারির শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ এককালীন ধারণ করা যায়।

টি ভি এ বাঁধগুলি বর্ষার দানবীয় বন্যাস্রোতকে আটকে রাখে। সেই সঞ্চিত জল সারা বছর ধরে ধীরে ধীরে নদীকে প্রবাহ যোগায়। এই উপায়ে টেনেসী নদীকে সারাবছর নৌকা জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে প্রবাহিত রাখা সম্ভব হয়েছে। টি ভি এ গঠিত হবার পরে নদীতে দ্রব্যসম্ভার গমনাগমন এখন পূর্ব্বের তুলনায় পাঁচ গুণ হয়েছে। প্রধান টেনেসী নদীর উপর নয়টি বাঁধ আছে, অর্থাৎ সমস্ত নদীটি নয়টি বিশাল হ্রদের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার গুণে নৌকা জাহাজগুলি সকল হ্রদের মধ্য দিয়েই ওঠানামা করতে পারে লক-গেটের মধ্য দিয়ে। এক হ্রদ থেকে অন্য হ্রদের উচ্চতা একশ দেড়শ ফুট ক'রে।

টি ভি এ হ্রদের সঞ্চিত জল থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। ১৯৩৮ সালে এক বছরে ৭০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়; ১৯৪০ সালে করা হয় ৩৬০ কোটি ইউনিট; বর্ত্তমানে বছরে প্রায় ১২০০ কোটি ইউনিট করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। ১৯৪৩ সালের হিসাবে দেখা যায় খরচখরচা বাদ দিয়ে টি ভি এ-র বিদ্যুৎ বিক্রী থেকে আয় হয় এক বছরে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ উৎপাদন নিজেই একটি প্রধান শিল্পবিশেষ, এ থেকে আয় হয় প্রচুর। কিন্তু আরও বড় কথা এই যে, এই শিল্প সহস্র শিল্পের জনক। বিদ্যুৎশক্তি ব্যতিরেকে অন্যান্য আধুনিক শিল্পকারখানা গড়ে ওঠা অসম্ভব। টি ভি এ বিদ্যুতের সাহায্যে এই অঞ্চলে যে সব ধাতুশিল্প, কলকারখানা, জমির সার উৎপাদনের ফ্যাক্টরী, গোলাবারুদের কারখানা, এরোপ্লেন ফ্যাক্টরী ইত্যাদি গড়ে উঠেছে তাদের অধিকাংশই এখন পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব'লে পরিগণিত।

জমির ক্ষয় নিবারণ ও কৃষির উন্নতি সাধন করা টি ভি এ-র একটি প্রধান দায়িত্ব। জমি তৃণাবরণ হীন উন্মুক্ত হ'লে বৃষ্টিতে কাদামাটি ধুয়ে যায়, পড়ে থাকে বালি ও কাঁকড়। এই ভাবে টেনেসী অববাহিকা দিন দিন অনুর্ব্বর হয়ে পড়ছিল। এই সব অঞ্চল অধিকাংশই পার্ব্বত্য। ঢালু জমিতে বর্ষায় ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ স্বাভাবতঃই বেশী এবং উর্ব্বরতার ক্ষতি আরো মারাত্মক ধরণের হ'য়ে থাকে। টি ভি এ পরিকল্পনা অনুসারে বনরক্ষা, বৃক্ষরোপণ, ঢালু জমিতে আল ও স্তর নির্ম্মাণ, বৈজ্ঞানিক কৃষি-যন্ত্রের ও কৃষিপদ্ধতির প্রচলন, রাসায়নিক সার ব্যবহার ইত্যাদি দ্বারা এই অঞ্চলকে শুধু মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা হয় নি, একে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবাদী জমিতে পরিণত করা হয়েছে। সস্তা বিদ্যুতের সাহায্যে ফস্‌ফেট সার প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে ও তা চাষীদের কাছে বণ্টন করা হচ্ছে টি ভি এ প্রতিষ্ঠিত আদর্শ কৃষি বিভাগ থেকে। এই বিভাগগুলি (demonstration farms) গ্রামে গ্রামে চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকে। দেশের নানা স্থানে টি ভি এ-র বহু আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত

হয়েছে এই উদ্দেশ্যে। ১৯৩৪ সালে এই অঞ্চলে সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা প্রস্তুত সারের পরিমাণ ছিল বছরে ৩০ লক্ষ টন, ১৯৫২ সালে টি ভি এ ফ্যাক্টরীতে উৎপন্ন সারের পরিমাণ হয় ৫১ লক্ষ টন। টি ভি এ প্রস্তুত সারের প্রয়োগ শুধু এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বহু প্রদেশে এই সার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টি ভি এ বিদ্যুতের সাহায্যে শুধু যে বড় বড় শিল্প কারখানাই গড়ে উঠেছে তা নয়, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের প্রচলনে সকলের সুখসুবিধা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে এবং নানারূপ কুটির শিল্প গড়ে উঠবার সুযোগ পেয়েছে।

টি ভি এ হ্রদে এখন যত জাতের ও যত পরিমাণ মাছ উৎপন্ন হচ্ছে তা কোনদিন কল্পনা করা যায় নি। এখন সবসুদ্ধ প্রায় চল্লিশ জাতের মাছ এই সব হ্রদে জন্মায়। ১৯৪৩ সালে এক বছরে ৭৫০০০ মণ মাছ ধরা হয়। মাছের চাষ সম্বন্ধে টি ভি এ বিভাগে নানারূপ গবেষণা চলছে। তাঁরা আশা করেন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার ফলে অদূর ভবিষ্যতে টি ভি এ বাঁধের হ্রদগুলি থেকে বছরে তিন লক্ষ মণ করে মাছ পাওয়া যাবে।

টি ভি এ-র সুরম্য হ্রদগুলি ক্রীড়ামোদী ও পর্য্যটকদের বিশেষ প্রিয় স্থান। দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব টি ভি এ ও গবর্মেণ্টের। আমরা শহরে কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্বাধীনে পার্ক ও পুকুর রক্ষা করবার ব্যবস্থাগুলিই জানি। টি ভি এ-র বিশাল হ্রদ ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলগুলি নয়নাভিরাম করে তুলবার জন্য টি ভি এ ও ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট অব কনজারভেশন কর্তৃপক্ষ যেরূপ যত্ন নিয়ে থাকেন তা' বাস্তবিক প্রশংসনীয়।

পরিকল্পনার মূল সূত্র

প্রকৃতির সম্পদ আহরণের প্রধান উপায় বৈজ্ঞানিক বিধির প্রয়োগ। প্রকৃতির দেওয়া জলচক্র, অর্থাৎ—বৃষ্টিপাত, নদী প্রবাহ, পুনরায় মেঘ ও বৃষ্টি—এই অফুরন্ত চক্র কতখানি শক্তি ও কল্যাণের আধার সে কথা মাত্র কিছুকাল হতে মানুষ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে। নদীর প্রবাহমুখে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করা এবং সঞ্চিত জলকে মানুষের নানা কাজে ব্যবহার করাই হ'ল টি ভি এ পরিকল্পনার মূল সূত্র। একই জলাধার থেকে কতরকম কাজ পাওয়া যায় তা পূর্ব্বে বিশ্লেষণ করেছি—বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসরবরাহ ও সেচন, বাণিজ্যের জলপথ বিস্তার, মৎস্য পালন ইত্যাদি।

টি ভি এ-র কর্ম্মপদ্ধতি থেকে এ কথাও স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হলে এমন একটি বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ গঠিত স্বায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যার হাতে সমস্ত সমস্যা একত্রিত ভাবে বিচার ও ব্যবস্থা করবার সুযোগ ও শক্তি আছে। বিষয়টি আর একটু ব্যাখ্যা করে বলছি। দেশের সমস্যাগুলি পরস্পর নির্ভরশীল। অতএব সমাধানের পরিকল্পনাও হওয়া চাই সব দিক বুঝে। পাঁচটি বিভিন্ন সমিতিকে পাঁচটি বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ভার দিলে কোন সমাধান হওয়াই সম্ভব নয়। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক, এক 'দপ্তরে' ভার দেওয়া হ'ল বিদ্যুৎ উৎপাদনের, আর এক 'পায়রার খোপে' ভার পড়ল বন্যা নিয়ন্ত্রণের, আর এক আপিসে পড়ল কৃষির জল সেচনের, ইত্যাদি। কারও সঙ্গে কারও সংযোগ নেই, সকলেই নিজের নিজের 'দায়িত্ব' নিয়ে বিব্রত। অতঃপর দেখা গেল হাইড্রোইলেকট্রিক বিভাগ যে ভাবে বাঁধের পরিকল্পনা করেছেন, বন্যানিয়ন্ত্রণের বিভাগ করেছেন একেবারে অন্য ধাঁচে, কৃষি বিভাগ চায় তৃতীয় প্রকার। সামঞ্জস্য নেই, সমন্বয় নেই। কিন্তু সমস্ত দিক ভেবে করতে পারলে, সমস্ত বিভাগ একই সমিতির অধীনে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে তবেই জাতীয় পরিকল্পনা সফল হতে পারে। টি ভি এ এই মূল মন্ত্রটি পৃথিবীকে শেখাচ্ছে। টি ভি এ একটি বিরাট বিশেষজ্ঞদের প্রতিষ্ঠান। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এরূপ বৈজ্ঞানিক-বিশেষজ্ঞের এত বড় প্রতিষ্ঠান আর কখনও সৃষ্টি হয় নাই।

টি ভি এ পরিকল্পনার বিশালতা ও আয়ব্যয়

এতাবৎ টি ভি এ প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ ও সাফল্যের কিছু পরিচয় দিয়েছি। এত বড় পরিকল্পনা 'একদা মধুর প্রভাতে' অকস্মাৎ হাতে এসে পড়ে নি সে কথা বলাই বাহুল্য। টি ভি এ গঠিত হবার মূলে রুজভেল্টের দূরদৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং নানা বিনিযুক্ত স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা কিছু উল্লেখ করেছি।

১৯৪৩ সালের জুন মাস অবধি টি ভি এ প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় হয় ৪৭॥ কোটি ডলার বা প্রায় ১৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রথম দশ বছরে খরচ হয় গড়পড়তা ১৬ কোটি টাকা হিসাবে। পর বৎসর প্রধানতঃ যুদ্ধের কারণে আরও প্রায় ৬৫ কোটি টাকা খরচ হয়। এই ভাবে প্রথম এগারো বা সাড়ে এগারো বছরে টি ভি এ-র মোট ব্যয়ের হিসাব দাঁড়ায় ২২৫ কোটি টাকার কাছাকাছি।

প্রধান কার্য্যাবলী হিসাবে ভাগ করলে দাঁড়ায়, উপরোক্ত ব্যয়ের শতকরা ৬৫ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা নিযুক্ত হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে, শতকরা ২০ ভাগ বন্যা নিয়ন্ত্রণে এবং ১৫ ভাগ খরচ হয়েছে নৌকা জাহাজ চলাচলের নদীপথ রক্ষা করবার জন্য।

এই ব্যয় হতে আয় কতটা হয়েছে সে কথা জানবার জন্য পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই উৎসুক হবেন। কিন্তু সে খতিয়ান সর্ব্বক্ষেত্রে কাগজে কলমে টাকা আনা পাই হিসাবে দেখান যাবে না। এ কথা বলবার অর্থ এই যে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য যদি বেড়ে থাকে তাকে টাকা আনার মাপকাঠিতে ফেলা শক্ত হবে। যদি জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হয়ে থাকে তাকেও জমাখরচের খাতায় দেখতে পাওয়া যাবে না, দেখা যাবে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের দেহে ও কর্ম্মঠতার মধ্য দিয়ে। যদি বন্যা প্রশমিত হয়ে থাকে তা থেকে নগদ লাভের কোনও আশা নেই; বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের মানুষদের শোক তাপের পরিমাপও টাকা আনা পাই দিয়ে হবে না এবং তা থেকে রক্ষা পেলে জমার কোঠায় কোন অঙ্ক ভর্তি হবে না। তবে এটুকু মাত্র হিসাব করা যেতে পারে যে টি ভি এ পরিকল্পনা দ্বারা বন্যানিয়ন্ত্রণের ফলে ঐ অঞ্চল

বছরে ৩৫ লক্ষ টাকা পার্থিব ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে, এ কথা পূর্ব্বে বলেছি, তা ছাড়া এ অঞ্চলের অধিবাসীদের গড়-পড়তা আয় কতটা বেড়েছে সে কথাও উল্লেখ করেছি। অধিবাসীরা ট্যাক্স বা খাজনাতে যে টাকা ব্যয় করে (প্রকৃতপক্ষে 'টাকা খাটায়' বলা উচিত) তার প্রতিদান তারা সব সময় টাকাতেই ফিরে পায় তা নয়, পায় সুবিধায়, উপকারে ও নানা রূপ দেশের উন্নতির মধ্য দিয়ে।

টি ভি এ-র এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় থেকে টাকা আনায় আয় হয় একমাত্র বিদ্যুৎ বিক্রয় থেকে। এতাবৎ সবশুদ্ধ ১৩॥ কোটি টাকার বিদ্যুৎ বিক্রী হয়েছে। প্রথম চার বছর বিদ্যুৎ বিক্রী থেকে খরচ ওঠে নি, তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ যখন বিদ্যুতের সুবিধা ছিল না, শিল্পও গড়ে উঠতে পারে নি। টি ভি এ-র বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ায় শিল্পকারখানাও গড়ে উঠেছে এবং বিদ্যুৎশক্তির চাহিদাও অসম্ভব বেড়ে চলেছে। গত বছরেই খরচখরচা বাদ দিয়ে টি ভি এ-র লাভ হয়েছে ৪॥ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিক্রী থেকে। বিদ্যুতের চাহিদা ও লভ্যাংশ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।

টি ভি এ একটি বিরাট্ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় ইন্‌ভেষ্টমেন্ট। এর লাভ-লোকসানের কথা আলোচনা করতে হলে তাকাতে হবে দেশের দিকে। দেশের ও জনসাধারণের উন্নতি ও অবনতি থেকেই লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলবে। তারাই আজ সাক্ষ্য দেবে টি ভি এ জাতির কি উপকার সাধন করেছে এবং টি ভি এ-র কার্য্যকলাপের জন্ত ব্যয়গুলি সদ্ব্যয় হয়েছে কিনা। এর উত্তর তাঁরা স্বীকৃতিমূলক ভাবেই দেবেন এবং এই কারণে টি ভি এ-র আয় এবং ব্যয় দুই-ই ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে।

টি ভি এ প্রতিষ্ঠানের বিশালতা দেখতে গেলে শুধু তার আয়-ব্যয়ের দিকেই যে দৃষ্টি পড়ে তা নয়, তার কর্ম্মীদলের দিকেও দৃষ্টি পড়বে। ১৯৪০ সালে টি ভি এ প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীসংখ্যা ছিল চোদ্দ হাজার, ১৯৪১ সালে ছিল সাড়ে বাইশ হাজার, ১৯৪২ সালে ছিল চল্লিশ হাজার। সকলেই কাজ করছে একই লক্ষ্যাভিমুখে—নিজের জন্ত, দেশের জন্ত, সকলের জন্ত।

(আগামী বারে সমাপ্য)

আগন্তুক

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেজারে অঙ্কপাত করতে করতে চশমার ফাঁকে সাধনবাবু একবার চোখ তুললেন, সামনের টেবিলে ডিবে থেকে পান তুলে মুখে পুরছিলেন গোপালবাবু, তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি দাদা, কিছু বলছেন ?"

কোঁচার খুঁটে পানের রস ভাল করে মুছে নিতে নিতে উত্তর দিলেন গোপালবাবু, "বলি দিনক্ষণগুলো একটু দেখে রাখুন সাধনবাবু, আখেরে কাজে লাগবে।"

ওপাশ থেকে বগলাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, অবশ্য চাপা গলায় যতদূর পারা যায়, "যা বলেছেন, পাঁজিটা দেখে রাখা ভাল, মৃত্যুযোগটা কবে সেটা এখন থেকেই গুণে রাখা দরকার!"

নস্তির কৌটোর ওপর দুটো আঙুল ঠুকতে ঠুকতে পাশ থেকে রাখালবাবু বলে উঠলেন, "দিনটা ভাল হে, শুক্রবার, আর মাসটাও ভাল, শুভ ফাল্গুন।"

"একটু ভুল করলেন দাদা, শুভ 'মার্চ' বলুন। উড্ সাহেবের ছায়ায় কোথাও ফাল্গুনের স্থান নেই। আর 'শুক্রবার' না বলে বলুন—'ফ্রাই-ডে',—সাহেবের বাড়ীর খিড়কি দিয়ে কত রঙ-বেরঙের 'ফ্রাই' ঘুষ যায়, একবার দেখুন!"

চাপা হাসির একটা ঢেউ উঠল। ঘনশ্যামবাবু বললেন, "সাহেবের বাড়ী পর্য্যন্ত যাবে না হে, বড়বাবু স্বয়ং নাক ঢুকিয়েছেন কি সাধ ক'রে। যা কিছু ঢুকবার তা বড়বাবুরই খিড়কি দিয়ে ঢুকবে, ও আমি বলে দিলুম।"

"ঠিক বলেছেন দাদা, বড়বাবু নিজে বেশ 'ইন্‌টারেষ্ট' নিয়েছেন —তলে তলে একটা কিছু ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে।"

"দেখ। আমরা হাঁসফাঁস করে মরছি ওদিকে হয়ত বড়বাবুরই কোন ভায়রা-ভাইয়ের মাসতুত ভাই কিম্বা খুড়শ্বশুরের ভাগ্‌নে, কিম্বা দূর সম্পর্কের বড় সম্বন্ধী, তাই বা কে বলতে পারে?"

"তাহলে নিশ্চিন্ত। বুঝলেন বগলাবাবু, আপনার মৃত্যুযোগের কথাটা দেখছি কাজে লাগল না, বড়বাবু যখন স্বয়ং হাত গলিয়েছেন, তখন ছোক্‌রার পোয়াবারো!"

"আরে ভাই, উড্ সাহেবের মেজাজ, ও দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ! বেটা পয়লা নম্বরের বেনে, কখন কাকে রাখে কাকে মারে তার ঠিক আছে কি?"

তারিণীবাবু বাইরে গিয়েছিলেন নাক ঝাড়তে, গোঁফের ওপর রুমাল ঘষতে ঘষতে ফিরে এলেন, বললেন, "ওহে সন্তোষ, বড়বাবুর ঘরে কাকে দেখলুম, হ্যাঁ? ছোক্‌রা মত বেশ ফরসা-পানা ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ চেহারা?"

"আর দাদা, যা দেখেছেন তা সেরা মাল। ঝাঁক বাড়ল, দাদা, ঝাঁক বাড়ল। এ ঘরের চেয়ার একটি বেশী হ'ল।"

"বটে! কিন্তু বড্ড ছোকরা, আমাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খাবে না।"

কোণ থেকে টাইপিষ্ট অমূল্য ফোড়ন কাটল, "ঠিক খাপ খেয়ে যাবে দাদা, দুদিন বাদে দেখবেন, সব এক ছাঁচে ঢেলে গেছি, এ বাবা উড্ সাহেবের খানাবাড়ী,—ও চুয়ান্ন আর চব্বিশে একটুও তফাৎ থাকবে না!"

হাসি উঠল। সন্তোষবাবু বললেন, "ও মশাই, শুনলেন কিছু? কি পাস-টাস? আজকাল সাহেব নাকি গ্রাজুয়েট ছাড়া চোখে দেখছেন না!"

"আরে রেখে দিন মশাই গ্রাজুয়েট! ও ব্যাটা লালমুখো রাক্ষস গ্রাজুয়েটের কদর বুঝবে কি?"

সাধনবাবু মুখ তুললেন, "আঃ, বড্ড গোল হচ্ছে !"

কৌতুকে গোপালবাবুর চক্ষু নেচে উঠল, বললেন, "একটু সবুর করুন মশাইরা, ফাইলের তাড়া বগলে নিয়ে আমাদের রসিকদা বড়বাবুর ঘরে সেঁধিয়েছেন, হাঁড়ির খবর এই এল বলে !"

"তা বটে, বেঁচে থাকুন আমাদের রসিকদা, মূর্তিমান গেজেট।"

ওদিককার টেবিলে মুখোমুখি দুই শালা-ভগ্নীপতি কাজ করেন। যুগলবাবু ও মাখনবাবু। একজন ঈষৎ চিক্কণ, অপর জন ঈষৎ স্থূল। স্থূলকায় মাখনবাবু বললেন, "সত্যি কথা মশাই, ও রসিকদা মশাই সোজা লোক নন। এই সেদিন মশাই···।"

"আঃ !"—চিক্কণ যুগলবাবু ধমকে উঠলেন, "কোন রিমার্ক পাস ক'রো না, কে কোথা দিয়ে কানে তুলে দেবে। রসিককে চেন না ত, আস্ত দু' মুখো সাপ, এদিকেও কামড়ায়, ওদিকেও কামড়ায়।"

গোপালবাবু হেঁকে উঠলেন, "কই হে মাখন, কথাটা শেষ কর।"

"আজ্ঞে না, মানে—" মাখনবাবু প্রকাণ্ড একটা একাউণ্ট-বইয়ে ঝুঁকে পড়লেন, "লেখ, ছ শ' তের টন, তিন হন্দর, চৌদ্দ পাউণ্ড। তার পর,—ছ শ' দশ টন, চৌদ্দ······।" তার পরেই থেমে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে "রসিক আসছে, ব্যাটা বাঁচবে খুব !"

"আঃ !" যুগলবাবু ধমকে উঠলেন।

"কি আশ্চর্য, শুনছে কে ?"—মাখনবাবু মধ্যমে উঠলেন, "ছ শ' দশ টন চৌদ্দ হন্দর এক কোয়ার্টার সাত পাউণ্ড।"

"কি রসিকদা, কিছু যোগাড় হ'ল ?"

ফাইলগুলো রেখে টাইপিষ্ট অমূল্যবাবুর পকেটে বিনা দ্বিধায় হাত চালিয়ে দিয়ে নস্যির কৌটোটা বের করতে করতে রসিকদা বললেন, "নাম, দিবাকর ব্যানার্জী।"

"তারপর ?"

"বি-এ পাস।"

"তারপর ?"

"আর কোথাও কাজ করেনি, একেবারে আনকোরা নতুন।"

"কথাবার্তায় ?"

"মিছরির ছুরি, ভয়ানক হুসিয়ার !"

"দেশ ?"

"জানা গেল না।"

"বয়স ?"

"চব্বিশেরও নীচে।"

"হুম্। কই হে হালদার, বই তোলো, বিলটা চেক ক'রে নি।"

"এই চুপ চুপ, বড়বাবু।"

"গোপালদা,—এই কন্‌সাইনমেন্টের এগেনষ্টে কোন রেলওয়ে রিসিট পেয়েছেন ?"

"দেখি ?"

বড়বাবু এগিয়ে এলেন নবাগত দিবাকরকে সঙ্গে নিয়ে।

"এস দিবাকরবাবু। এই টেবিলে তুমি কাজ করবে। এই বেয়ারা ?"

বেয়ারা এল চেয়ার নিয়ে।

"ব'স তুমি।"

কুণ্ঠিত হাস্যে দিবাকর বললে, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন।"

"তাতে কি হয়েছে ? এটা অফিস, এখানে কাজটাই আসল। তুমি ব'স। তোমার কাজ বুঝিয়ে দিয়েছি, লেখালেখির কাজটাই তুমি বেশী করবে। এই যে, সাধনবাবু ?"

"ডাকছেন ?"

"হ্যাঁ। ইনি দিবাকর ব্যানার্জী, বি-এ—আজ থেকে কাজ করবেন। আর দিবাকর,—ইনি মিষ্টার সাধনকুমার রায়,—এ সেক্‌শানের ইন্-চার্জ।"

"নমস্কার !"

ঘুরতে লাগল ঘড়ির কাঁটা, সময় পার হতে লাগল টিক্‌টিক্, —টাইপ হতে থাকল খটাখট—অফিস চলতে লাগল।

২

একটা বেজে কয়েক মিনিট পার হতে না হতেই লিফটের দরজায় ছোটখাট ভীড় জমে গেল, যেমন রোজই জমে। সাহেবরা বসেছে লাঞ্চে, বাবুর দল বেশির ভাগই নিচে নামে, কেউ কেউ রেষ্টুরেণ্টে আসর জমায়।

হলটা প্রায় খালি, দিবাকর আস্তে আস্তে মুখ তুলল, সামনের কাঁচের জানালা ভেদ করে দৃষ্টি অনেক দূরে চলে যায়। বাড়ীর পর বাড়ী, আকাশের ঐ কোণ দিয়ে গোটাচারেক টহলদারী এরোপ্লেন যাচ্ছে। আর আসছে শব্দ, ট্রাম, বাস, মোটর, ট্রাক, —নগরীর ঘর্ঘর শব্দ চলেছে অবিরাম। বিরাট একটা প্রবাহ যেন দেখতে পায় দিবাকর, সে প্রবাহের বেগে ভেসে চলেছে ঐ মেঘ, এই বিশ্ব, এই নগর, এই বাড়ী, এই গাড়ী, এই আমি-তুমি-র দল, কেউ বসে নেই !

ধীরে ধীরে অতুলবাবু কাছে এলেন। পূর্বতন দলের মধ্যে ইনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ, বয়স এখনও ত্রিশ পার হয় নি। আস্তে আস্তে একখানা হাত রাখলেন ওর কাঁধে, বললেন, "কি করছেন, দিবাকরবাবু ?"

"ও, আপনি, অতুলদা ?"

"একেবারে 'দাদা' করে নিলেন ভাই, বেশ। দেখুন, একটা কথা বলি, অত খাটেন কেন আপনি ?"

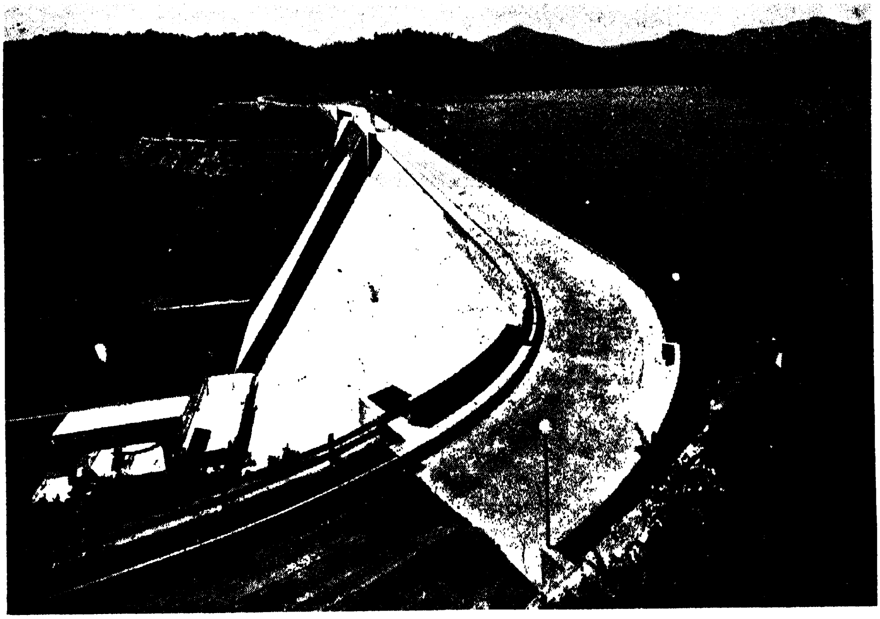
হাসল দিবাকর, বলল, "করুণাময় যখন খাটতেই পাঠিয়েছেন, তখন ফাঁকি দিয়ে লাভ কি অতুলদা ?"

টেবিলের দিকে নজর পড়ল অতুলের, বলল, "ওটা কি, টুকরো কাগজটা ?"

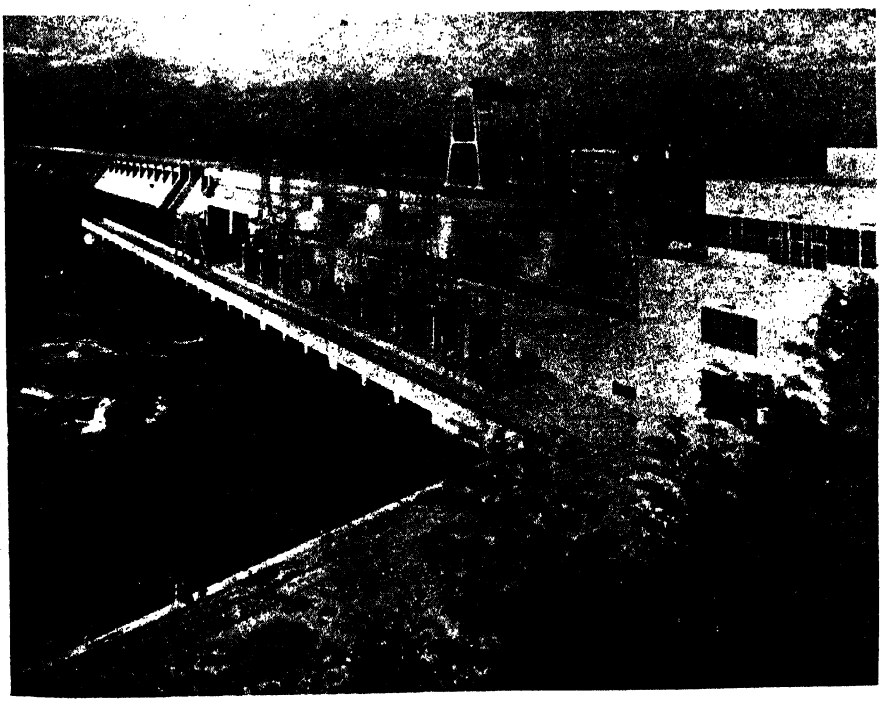
"ও কিছু নয়।"

"দেখিই না ?"

"তার চেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন অতুলদা। কেমন খুশী হয়ে হাসছে দেখেছেন। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে যখন চাই, তখন অবাক্ হয়ে যাই। এত রঙ পায় কোথা থেকে।"



হিওয়াসী নদীর বাঁধ, ৩০৭ ফুট উঁচু, ১২৮৭ ফুট দীর্ঘ



হুইলার বাঁধ, ১ মাইল ২১০০ গজ দীর্ঘ, ৭২ ফুট উচ্চ



তৃতীয় ইউ এস সৈন্যবাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ডেষ্ট্রয়ারের জার্ম্মেনীতে মোজেল নদী অতিক্রমণ



জার্ম্মেনীতে আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে বিমানবাহিত মার্কিন সৈন্যদের রাইনের পূর্ব্বতীরে অবতরণ

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অতুল, অতি সাধারণ মানুষের মতই ত ওকে দেখতে, অথচ চোখে-মুখে এ কি অপূর্ব জ্যোতির আভাস!

"জানেন অতুলদা? 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' কাল একটা জিনিস দেখলুম। এসপ্লানেডের ঐখানে যে এ-আর-পি শেলটারটা আছে না, তার কাছে একটি লোক বসে ছিল, জীর্ণ শীর্ণ একটি লোক। গায়ে একটা আধময়লা ফতুয়া, আর হাতে ছিল কি একটা, জানেন? রঙীন ছেঁড়া পুরনো ফ্রক! না অতুলদা, চোখে তার জল ছিল না। কিন্তু তার চোখ—তার মুখ—! মানুষের চোখে যে এত শূন্যতা থাকতে পারে, মুখ হতে পারে এত করুণ, তা এর আগে এত স্পষ্ট আমি উপলব্ধি করতে পারি নি!"

"বাঃ! বেশ সংগ্রহ করতে পারেন ত আপনি!"

"ঠিক ধরেছেন অতুলদা, এ জীবনভোর আমি শুধু সংগ্রহই করে চলেছি। মানুষের বেদনা, মানুষের দুঃখ, মানুষের ব্যর্থতা, আমাকে ভীষণ দোলা দেয়, আমি তাই দিয়েই আমার ভিক্ষার ঝুলি বোঝাই করছি অতুলদা। আমি গরীব, কিছু করতে পারি না, কিন্তু অনশন-ক্লিষ্ট মানুষের হাহাকারে আমার কান্না আসে! আপনাদের 'দাদা' বলি, আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমার এ সংগ্রহ যেন ব্যর্থ না হয়, জীবনে যেন কিছু একটা করে যেতে পারি!"

একটুক্ষণ স্তব্ধ থেকে অতুল বললে, "আপনি তা পারবেন। কিন্তু যাক্,—টুকরো কাগজটা দেখি ত? কিছু লিখেছেন নাকি?"

"কাউকে বলবেন না অতুলদা। লুকিয়ে লুকিয়ে একটা কবিতা লিখছিলাম। শুনবেন?"

"নিশ্চয়ই শুনব। নিন্, পড়ুন।"

"মাত্র চার লাইন,—

এ মধ্যাহ্ন ধন্য হ'ল ওগো স্বপ্নময়ী,
তোমার কুন্তল-জালে জড়ালে কি মোরে?
মধুর আহ্বান তব, হ'ল কি বিজয়ী,
মুক্তির আস্বাদ পাই বাঁধনের ডোরে!…

—কেমন লাগল?"

"বেশ। আমি একটু নীচে যাচ্ছি, আপনি আসবেন?"

"না। ভীড় ভাল লাগবে না। পকেটে কৌটোয় মার তৈরি খাবার রয়েছে, তাই খেয়ে জল খাব'খন।"

"আচ্ছা।"

অতুলবাবু চলে গেলেন। না, কবিতা এখন থাক্—কাগজটা পকেটে পুরল দিবাকর, ঐ ঘড়িটা টিকটিক করছে আর ওই দূরে ফাল্গুনের অপূর্ব আকাশ,—এরই মধ্যে চুপচাপ ডুবে থাকতে ভাল লাগছে! কি করতে যেন ওদিককার ঘরে গিয়েছিলেন রাখালবাবু, বেঁটে-খাটো মানুষটি তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন পাশ কাটিয়ে, বললেন, "দিবাকরবাবু যে? এখনও বসে আছেন?"

"এই যে দাদা। বসে থাকতেই ভাল লাগছে, নীচে যাব না, আপনি যাচ্ছেন বুঝি?"

"তা যাচ্ছি বৈ কি। এক কাপ চা অন্তত পেটে না পড়লে তো চলছে না।"

হেসে উঠল দিবাকর। রাখালবাবু অতি কাছে সরে এলেন, "বড়বাবুর কেউ হন না কি আপনি?"

"আজ্ঞে, না।"

"কোন আত্মীয়তা নেই! আগের থেকে আলাপ ছিল বুঝি?"

"আজ্ঞে, তা-ও না। আমার বাবার বন্ধু হরিবাবু, তাঁর সঙ্গে বড়বাবুর সামান্য আলাপ ছিল। সেই সূত্রে এই যোগাযোগ।"

"অ,—তা আপনার বাবা কি করেন?"

"স্কুল-মাষ্টারী করতেন, গত বছর মারা গেছেন।"

"অ,—আপনার বিয়ে হয় নি?"

"আজ্ঞে না, বাড়ীতে আমার মা, বোন্ আর আমি, এই তিনটি প্রাণী ছাড়া আর কেউই নেই।"

"অ,—বোনের বিয়ে দিয়েছেন কোথায়?"

"আমি বড় গরীব, বোনের বিয়ে দিতে এখনও পারছি না।"

দরজার কাছ থেকে ঘনশ্যামবাবুর হাঁক এল, "কই হে রাখালবাবু, আসুন?"

"এই যে, যাই"—বলে রাখালবাবু স্বরটা আরও নীচু করলেন, মাইনে ত দিল মোটে ষাট টাকা, এ যুদ্ধের বাজারে ও আর কি, —বিশেষ ক'রে আপনাদের মত শিক্ষিত লোকেদের পক্ষে। তা বড়বাবু যখন পেছনে রয়েছেন, মাইনে শীগ্‌গির বাড়বে বই কি।"

"সে আপনাদেরই আশীর্বাদ, দাদা। বড়বাবু ত কথা দিয়েছেন……।"

"ব্যস্-ব্যস্, বড়বাবু নিজেই যখন…। যাই হে, ঘনশ্যামবাবু, যাই। চলি ভাই দিবাকরবাবু, পরে কথা হবে।"

রাখালবাবু ঘনশ্যামবাবুর কাছে এসে ঠোঁট ওলটালেন, "রসিকদা ঠিকই বলেছেন, ছেলেটা পয়লানম্বরের ন্যাকা, মুখ যেন মিছরীর ছুরি, বাবা, চালাকি এই রাখাল বোসের কাছে। বড়বাবুকে আচ্ছা ক'রে তেল লাগিয়েছে, বুঝলে হে? এই লিফ্‌ট্,—আস্তে।"

লিফট নামল, থামল নীচে,—সামনে সুবিখ্যাত ক্লাইভ ষ্ট্রীট, রেষ্টুরেণ্ট অনতিদূরেই। সেখানে বিরাট মজলিস বসেছে। তিন-চারটে ছোকরা চা নিয়ে খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাখালবাবুরা আসরে প্রবেশ করলেন।

"ওহে ছুটো চপ এদিকে।"

"এদিকে এক কাপ চা,—ছোট।"

"ওহে রাখালবাবু, এ দিকে সরে আসুন।"

"এরই মধ্যে কি গরম পড়েছে দাদা, বাপ্‌স্!"

"ওদিকে কাগজ দেখেছেন?"

"রেখে দিন কাগজ। যা হবার তাই হবে, ভেবে লাভ কি?"

"এই ছোকরা, এই, কথা কানে নিচ্ছিস্ না, না কি? ডিম আছে? মামলেট কর্ দু'খানা।"

"শুনছেন তারিণীবাবু, আমাদের দিবাকর যে-সে লোক ন'ন, একটু-আধটু লেখার বাতিক আছে।"

"আরে ছোঃ! লেখে না কে? যদু—মধু—হ'রে—সবাই লিখছে।"

"কে, আমাদের দিবাকর-ছোক্‌রা! আর বল্‌বেন না, আস্ত পাগলা! সে দিন হয়েছে কি জানেন?···"

"বাদ দিন, বাদ দিন! মুরোদ ত ঐ ষাট-টাকা, তা-ও বড়-বাবুর হাতে-পায়ে ধ'রে! কোথা থেকে টুকে লেখে তার নেই ঠিক, ও'রকম লেখা চেষ্টা করলে আমরাও লিখতে পারি, নেহাৎ-ই 'ছা-পোষা' মানুষ, সময় পাই না, তাই!"

"যাই বলুন দাদা, ভড়ংটি ষোলো আনা আছে।"

"ওহে রসিকদা, একটা বিড়ি ধরাও দেখি, মাথাটা নিঃঝুম মেরে আছে।"

চায়ের কাপটা এক চুমুকে শেষ ক'রে রসিকবাবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, "লজ্জা দেবেন না দাদা, আমিই চাইতে যাচ্ছিলাম আপনার কাছে। ওহে অমূল্য, খুব ত চপ গিলছ, বলি বিড়ি-টিড়ি আছে?"

"এই নিয়ে ক'টা বিড়ি নিলে সকাল থেকে, বলো ত?"

"আরে ভাই, ভাবছ কেন, সব একেবারে সুদে-আসলে শোধ দেব।"

"আর দিয়েছ! এ যাবৎ যা নিয়েছ, শোধ দিতে গেলে সামর্থ্যে কুলোবে না, বুঝেছ?"

বিড়িটা ধরিয়ে পরম তৃপ্তিতে একটা টান দিয়ে রসিক বললে, "আঃ, বাঁচালে! জান অমূল্য, তোমাদের ঐ দিবাকর ছোক্‌রার স্বভাব-চরিত্র তত সুবিধের নয়। কি একটা কাগজে গল্প দেখছিলুম, আচ্ছা। গল্প লিখেছে যা হোক—মনে কালি না থাক্‌লে কি আর ও'সব কেউ লিখতে পারে, এ আমি ব'লে দিচ্ছি কিন্তু।"

"এই ছোক্‌রা, চা আর এক কাপ, বেশ কড়া দেখে, বুঝলি?"

"ওরে, এদিকে এক চামচে চিনি।"

"জানেন রাখালবাবু?"—রসিকদা এগিয়ে এল—"দিবাকর বাবাজীবন আমাদের অবিবাহিত।"

"তাই নাকি! তা'হলে ব্যাপারটা একটু নাটকীয়-নাটকীয় মনে হচ্ছে। উপাধি ত ব্যানার্জী—দি আইডিয়া!"

রাখালবাবু মুচকি হাসছিলেন, বললেন, "আইডিয়াটা অনেক-ক্ষণ বোঝা গেছে। বুঝলে হে, বড়বাবু এক মস্ত চাল চেলেছেন!"

"স্থূলকায় মাখনবাবু একটা গোটা চপের অর্দ্ধেকটা মুখে পুরে-ছিলেন, বললেন, "তাই দাদা, ছুটির পরও বড়বাবুর ঘরে অত গুজুর গুজুর—!"

"অরে!" চিক্কণ যুগলবাবু তীক্ষ্ণ চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, "হচ্ছে কি! ছু'মুখো সাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে না, এখখুনি লাগিয়ে দেবে।"

সাধনবাবু বললেন, "যাই বলুন, ছোক্‌রা অমায়িক, দেখেছেন ত, 'দাদা' ছাড়া কথা বলে না কাউকে।"

"তা আপনার কাছে একটু অমায়িক হবে না ত হবে কার কাছে? আপনি হচ্ছেন 'ইন্‌-চার্জ', আপনাকে হাতের মুঠোয় না আন্‌লে চলবে কেন? ছোক্‌রা মহা ধুরন্ধর, এ আমি বলে দিচ্ছি।"

"যাই হোক্‌, বড়বাবু জাল ফেলেছেন বেশ কায়দা ক'রে, কি বলেন?"

"এইবার থামুন মশাই, ঘড়ীর কাঁটা ছুটোর কাছাকাছি হচ্ছে, উড সাহেবের হাতছানি এখুনি পড়বে—এবার উঠুন।"

দল উঠল। দরজার কাছে একটা বেয়ারা গেলাসে ঢেলে চা খাচ্ছিল, রসিকদা তাকে অনেক খোসামোদ ক'রে একটা বিড়ি সংগ্রহ করেছেন, তারিণীবাবু চলতে চলতে গোপালবাবুর খুব কাছে এসে নীচু গলায় মন্তব্য করলেন, "রসিকদা একটা কিপটের জাসু!"

"যা বলেছেন। নিন্‌, চলুন।"

—বাজল ছুটো, পড়ল ঘণ্টি, যথারীতি অফিস বসল।

৩

কয়েকটা দিন ধরে ভয়ানক খাটছিল দিবাকর, সেদিন অফি-সের শেষে টেবিল ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়াল, কপালের পাশের রগ-দুটো ঝিম ঝিম করছে, ডান হাতের আঙুলগুলো আড়ষ্ট। ঘন-শ্যামবাবু বললেন, "ও ভাই দিবাকর, একটা উপকার করতে হবে। ছোট ছেলেটার একটু অসুখ হয়েছে বুঝলে, কাল ছুটো নাগাৎ পালাব। আড়াইটায় আসছে ওয়েমেণ্ট-নোটগুলি, তুমি ভাই আমার টেবিলে একটু এসে পোষ্টিং করে রেখে যেও, লক্ষ্মী দাদাটি আমার, কেমন?"

"অত করে বলতে হবে কেন দাদা? আমি ঠিক সাম্‌লে নেব'খন, আমাদের বিপদে-আপদে আমরাই যদি পরস্পর পর-স্পরকে না দেখি ত দেখবে কে?"

"বল ত ভাই, বল ত!"

ঘনশ্যামবাবুর দল চলে গেল। হেঁটমুখে ড্রয়ারগুলো বন্ধ করতে লাগল দিবাকর। কোথা থেকে ঘুর ঘুর করতে করতে রাখালবাবু আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ালেন, "কি ভাই কিছু ইন্‌ক্রিমেণ্ট হ'ল?"

"কই, না!"

"হবে হে, শীগগিরই হবে, তোমার এই দাদাটির জিহ্বা কখনো মিছে কথা বলে না। তখন কিন্তু বেশ করে খাইয়ে দিতে হবে, মনে থাকে যেন।"

রাখালবাবুর প্রস্থান। টেবিলটা সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিবাকর সবে পা বাড়িয়েছে, আস্তে আস্তে রসিকদা এসে ধরলেন ওকে।

"বেশ আছেন মশাই আপনি!"

দিবাকর একটু বিস্মিত হ'ল, বললে, "কি রকম!"

"এই খাচ্ছেন-দাচ্ছেন লিখছেন-পড়ছেন, ইয়ংম্যান, বিয়ে-থা করেন নি, খুব ফূর্ত্তিতে আছেন, তাই নয়?"

"যে রকম দেখছেন দাদা, আমার আর বলার কি আছে।"

"আচ্ছা, এই যে এখানে-সেখানে লেখেন আপনি, কিছু পান ত?"

"সে দুঃখের কথা শুনে আর আপনার লাভ কি, রসিকদা?"

"আশ্চর্য, পান না কিছুই! তা'হলে আরও ভূতের ব্যাগার

খেটে লাভ কি! ছেড়ে দিন মশাই ছেড়ে দিন, মন দিয়ে অফিসের কাজ করুন, লাভ হবে।"

"অফিসের কাজে কোন দিন শৈথিল্য দেখিয়েছি বলে ত মনে পড়ে না রসিকদা, সেইজন্য একটা কথা শুনে বড় আঘাত পেয়েছি। আমারই দুর্ভাগ্য। আপনি নাকি বড়বাবুকে বলেছেন, আমি কাজকর্ম্ম কিছুই করি না, বসে বসে খালি কবিতাই লিখি!"

"মিথ্যা কথা! আমি বলতে পারি অমন কথা, আপনি বিশ্বাস করেন?"

"বড়বাবু নিজে সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে রসিকদার কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে গেল, বললে, "লোক চেনেন না ত? ও হচ্ছে বড়বাবুর মস্ত একটা চাল। নিজের কথাটাই অপরের ওপর দিয়ে বলা হ'ল। এই ত স্বভাব, চিরকাল দেখে আসছি! আপনার মন অতি উঁচু, এ সব বাজে ব্যাপারে আপনার মন নেই তাই, নইলে সহজেই আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারতেন!"

"কি বলছেন, অবিশ্বাস কেন করব!"

"এই ত ছোট ভাইটির মত কথা! জানেন না ত, আমি সকলের কাছে আপনার কত প্রশংসা করি! যাই হোক্ ভাই, ভুল বুঝবেন না, আমি সাদাসিদে লোক, কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই।"

"এই রকম লোকই আমি ভালবাসি। যাই হোক্, এখন যাই, ঐ লিফটের গোড়ায় অতুলদা ডাকছেন।"

"আরে শুনুন, শুনুন। একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। কিছু মনে করবেন না ভাই দিবাকরবাবু, জরুরি দরকার, গোটা পাঁচেক টাকা দিতে পারেন ধার? বড্ড উপকার হয়। বৌটার ক'দিন ধরে···।"

"পাঁচ টাকা! অত ত নেই রসিকদা, গোটা তিনেক কোন-ক্রমে হতে পারে।"

"আচ্ছা ভাই, তাই-ই দিন।"

"কিন্তু তা-ও যে···আমার বোনটার আবার একখানাও জামা নেই, সব ছিঁড়ে গেছে···আপনার কি খুবই দরকার, রসিকদা?"

"হ্যাঁ ভাই, এই মাইনেতেই আপনাকে দিয়ে দেব, আর ক'টা দিন।"

"তা'হলে এই নিন্। কয়েক দিন পরেই না হয় জামা কিনব।

কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে টাকা নিয়ে রসিকদা চলে গেলেন। অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বগলাবাবু, বললেন, "কি হে, পাগলাটার সঙ্গে কি অত কথা হচ্ছিল?"

রসিকদা উত্তর দিলেন, "ও কিছু নয়, একটু রসিকতা করছিলুম।"

লিফটের কাছে অতুল দাঁড়িয়ে ছিল। দিবাকর কাছে এসে বললে, "অতুলদা, অফিস ত নির্জন, ওখানে বসলে হয় না?"

"না। এখানে জানালা আছে বটে, কিন্তু বাতাস নেই। ও যা দেখছেন তা হচ্ছে পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস। চলুন, কার্জন পার্কের একটা নিভৃতি খুঁজে নিয়ে বসা যাবে।"

একটা নিরালা ঝোপের কাছে ওরা বসল পাশাপাশি। পরি-বেশটা চমৎকার! অগুনতি লোক, ট্রাম-বাস-মোটর—কিন্তু কেউ কারুর খোঁজ রাখে না, তারা শুধু চলেছে! যারা বসে আছে তারাও চলেছে, তবে দেহে নয়, মনে। পকেট থেকে দিবাকর ঈষৎ নীল বর্ণের একখানা খাম বের করলে। অতুল বললে, "দাঁড়ান, একটা কথা আছে।"

"বলুন?"

"কথাটা অবশ্য অপ্রাসঙ্গিক। কাণাঘুষো শুনলাম আপনি নাকি বড়বাবুর জামাই হতে চলেছেন?"

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল দিবাকর, বললে, "সে কি! এমন বাজে কথা শুনলেন কোথা থেকে!"

"কেন, বড়বাবুর বাড়ীও ত প্রায়ই যান আপনি।"

"মাত্র তিনবার গিয়েছি। হরিবাবুর মধ্যস্থতায় আলাপ, বড়-বাবু কেমন যেন স্নেহের চক্ষে দেখেন আমাকে—কিন্তু তা বলে কখনো এমন কথা ত হয়নি!"

"হয়ত হয় নি, হতেও ত পারে পরে।"

দিবাকর হাসল, বলল, "না। আমার লেখা তাঁদের নাকি ভাল লাগে, এইজন্যই মাঝে মাঝে আহ্বান, আর সেটা স্বাভাবিকও। তা বলে তাঁদের মত বড়ঘরের জামাই হতে পারি কি আমি! আমার দিকে মনোযোগ দেওয়াও তাঁদের পক্ষে গ্লানিকর! সুতরাং আমার মন বলছে, এ আপনার মিথ্যা ধারণা।"

"কিন্তু রটনা কি রকম, তা জানেন?"

"রটনা? আশ্চর্য!"

"যাক, ওসব যেতে দিন। বুঝতে পারছি, এসব শুধু আমাদের অফিস-বাবুদের অলস মস্তিষ্কের জল্পনা। নিন্, আরম্ভ করুন আপনার চিঠি।"

"তার পূর্বে একটু ভূমিকা আছে। যে মেয়েটির চিঠি এখন খুলছি তার নাম কমলা। একটা কথা অতুলদা। যদি মনে মনে না হাসেন ত বলি—এ মেয়েটিকে আমি খুব ভালবাসি।"

"সে আপনার বলার আগেই আন্দাজ করেছি। নিন্, পড়ুন।"

পড়তে লাগল দিবাকর:—

শ্রীচরণকমলেষু—দিবুদা, তোমার এবারকার চিঠিটা এত সুন্দর লেগেছে যে কি বলব। কি চমৎকার ভাষা! তার কাছে আমার এই উচ্ছ্বাস একেবারে বাজে লাগবে। আর সুমতিও এমন সুন্দর লিখেছে! হবে না-ই বা কেন, কার বোন দেখতে হবে ত!

যে পত্রিকাটি সেদিন পাঠিয়েছ, তার মধ্যে অনেক নাম-করা লেখকদের চেয়েও তোমার গল্প ভাল লাগল। তোমার নায়িকা জ্যোৎস্নার মধ্যে আমি যেন নিজেকে দেখতে পেলাম। দিবুদা, সত্যি বল ত, আমার অনুমান কি মিথ্যা? মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়ে যাই, আমাকে তুমি কতবার কত ভাবেই তোমার নিপুণ তুলির টানে এঁকে তুলছ! কিন্তু যথার্থই কি আমি তার তুল্য! না দিবুদা, অত বড় ক'রে আমাকে তুমি দেখো না, তা হ'লে ঠকবে! যে দৃষ্টিতে তুমি আমাকে দেখ, আমি যদি তার শতাংশের এক অংশও হ'তে পারতাম!

দিবুদা, তোমার স্নেহের দান "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ",—আমি বহুমূল্য সম্পদের মত যত্ন ক'রে রেখেছি। বইখানা পড়ে যখন শেষ করলুম, মনে হ'ল যেন সত্যসত্যই কবির সান্নিধ্য থেকে এইমাত্র

উঠে এলাম, এত জীবন্ত হয়েছে সমগ্র চিত্রটি! কিন্তু দিবুদা, তোমাকে একটু বকব, নতুন চাকরী পেয়ে এত দান-ধ্যান আরম্ভ হ'ল কেন? আমার অনুরোধ, এভাবে এখন পয়সা নষ্ট করো না। সময় আসুক, তখন তোমার কাছে নিজে থেকেই অনেক কিছু চেয়ে নেবো। লক্ষ্মীটি, এখন বেশ বুঝে-শুনে চলবে। আমি এখানকার লাইব্রেরীর মেম্বার হয়েছি বাবাকে বলে কয়ে। যে বই তুমি আমাকে পড়াতে চাও, তার নাম জানিও, আমি এখান থেকে ঠিক পড়ে নেবো।

আমাদের কথা কি লিখব বল? বাবার স্কুলের অবস্থা খারাপ, সে রকম ছেলে ভর্ত্তি হচ্ছে না। সুতরাং মাইনে-পত্তর কেমন যে পাওয়া যাবে তা ত বুঝতেই পারছ। মার শরীর একটু খারাপ যাচ্ছে। জানো দিবুদা, আজকাল অনেক নতুন নতুন খাবার করতে শিখছি, তুমি এলে বেশ করে রেঁধে খাওয়াব। তখন যদি দুষ্টুমী করে বল যে খাবারগুলো নিতান্তই বাজে হয়েছে, তা'হলে মনে ভারি দুঃখ হবে।

ভাল কথা দিবুদা, একটা ব্যাপার হয়েছে। কে এক বাবার বন্ধু এক সম্বন্ধ এনে হাজির। ছেলেটিকে দেখে বাবার ত প্রায় মত হয়ে যায় আর কি! তখন আমি কি করলুম জান? এক দিন স্রেফ কিছু না খেয়ে-দেয়ে ঘরে খিল দিয়ে পড়ে রইলুম। ব্যাস্, বাবার টনক নড়ল, সম্বন্ধের ভূত নেমে গেল ঘাড় থেকে। বর্ত্তমানে এসব উৎপাত থেকে আশ্চর্য্যরকম মুক্ত আছি।

সুমতির চিঠিতে জানলাম, তুমি আজকাল দারুণ রাত জাগতে আরম্ভ করেছ। এতে যে স্বাস্থ্য একেবারে যাবে। লক্ষ্মীটি, আর ও রকম ক'রো না। যদি করো বলে শুনতে পাই, তা'হলে সত্যি বলছি, একদম চিঠি দেওয়া বন্ধ ক'রে দেবো।

দিবুদা, আমার মাথা খাও, শরীরের ওপর অতটা অত্যাচার আর ক'রো না। আজ এখানেই শেষ করি।

আমরা ভাল আছি। মাকে আমার প্রণাম দিও। সুমতিকে পৃথক পত্র দিলাম। তুমি আমার প্রণাম নিও, ভালোবাসা নিও। ইতি তোমার কমলা।"

চিঠিটা মুড়ে রেখে দিবাকর জিজ্ঞাসা করল, "কেমন লাগল?"

"বেশ। কিন্তু তারপর, বিয়েটা কবে হচ্ছে?"

"বিয়ে! আমার মত গরীবের পক্ষে...।"

"কি আশ্চর্য, বিয়ে করবেন না!"

"তবে শুনুন অতুলদা, কাউকে বলবেন না যেন। যদি মাইনে-টাইনে বাড়ে, অবস্থা একটু ভাল হয়, তা'হলে আগে বোনের বিয়েটা দিয়েই...বুঝলেন?"

"বুঝেছি। কিন্তু আপনার বাজে যুক্তি।"

"না অতুলদা, আমার যা অবস্থা তাতে আমার ঘরে এলে কষ্ট পাবে।"

হাসল অতুল, বললে, "একেবারে ছেলেমানুষ আপনি!"

"আচ্ছা অতুলদা?"

"বলুন?"

"এখন ত 'প্রবেশনারি পিরিয়ড' চলছে, আপনার কি মনে হয়

"দূর, বড়বাবু নিজে যখন আপনার পেছনে রয়েছেন তখন ওসব কেন ভাবছেন? বড়বাবুর ক্ষমতা অসীম, সাহেব ওর কথায় ওঠে-বসে।"

"সত্যি, বড়বাবু আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন। আর ওঁর স্ত্রী, তাঁকে আমি জ্যেঠাইমা বলি, অতি চমৎকার মানুষ। আর ওঁর মেয়েরা, তাঁরাও ভাল, বেশ শিক্ষিতা, লেখাপড়ার চর্চা নিয়েই থাকেন।"

অতুল উঠে দাঁড়াল, বললে, "সন্ধ্যা হ'ল, এবার ওঠা যাক্। দেরি হয়ে গেলে আপনার বৌদি আবার...।"

"হ্যাঁ, এবার চলুন।"

৪

দিবাকরের ডাক পড়েছিল বড়বাবুর ঘরে। সে চলে যেতেই ঘরের অস্ফুট গুঞ্জন স্পষ্ট হয়ে উঠল। উত্তেজনায় টেবিলটা প্রায় সজোরে চাপড়ে ফেলেছিলেন সাধনবাবু, হঠাৎ মনে পড়ল এটা অফিস, সামলে নিয়ে বললেন,—"বাজে কথা! বড়বাবুর সাম্‌নে আমি নিজে কথাটা পেড়েছিলুম, অবশ্য একটু ঘুরিয়েই। আরে তাই কি হ'তে পারে, এত বড় বড় লোক থাকতে উনি শেষকালে পাকড়াবেন ঐ বাচ্চা কেরানী দিবাকরকে! বলি একখানা শাড়ী যোগাতে পারবে বড়বাবুর মতন লোকের মেয়ের? ওর আছে কি? আপনারাও যেমন।"

"না না, ও আপনার ভুল। বড়বাবু কি ওকে ঐ ষাট টাকাতেই রাখবেন না কি মনে করছেন? উড সাহেবকে বলে তিন দিনে ওকে মগ্‌ডালে তুলে দেবেন মশাই, বড়বাবুকে আপনি চেনেন না!"

"অত সোজা নয় স্যর। তা ছাড়া, শুনুন বলি, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে বড়বাবুর আলাপ, কত ছোকরা ডেপুটি কি ব্যারিষ্টার ওঁর বাড়ীতে যাতায়াত করে তা জানেন? সে খবর রাখি আমি, আপনারা বুঝবেন আর কতটুকু?"

"কিছু মনে করবেন না সাধনবাবু, মার্চেণ্ট অফিসের একটা তিনশো টাকার হেডক্লার্ক, তার মূল্য আর বড়লোকদের দরবারে কতটুকু? তাঁর পক্ষে..."

"তার মানে! তিনশো টাকা! ওঁর আয় কত বলতে পারেন? কন্‌ট্রাক্‌টারদের যখন বিল পেমেণ্ট হয় তখন বড়বাবুর পকেট দেখেছেন? কি আর বলব আপনাকে!"

"এই আস্তে, দিবাকর আসছে।"

তখনো হাসি লেগে রয়েছে দিবাকরের ঠোঁটে, কাছাকাছি হতেই অতুল ওর জামার প্রান্তে টান দিল, "কি ব্যাপার, অত হাসিখুশি?"

"বড়বাবু দারুণ হাসিয়েছে আজকে।"

ওপাশে গোপালবাবুর কলম থেমে গেল। এপাশ থেকে বক্রদৃষ্টি হানলেন ঘনশ্যামবাবু। অতুল বললে, "কি রকম?"

"সামান্য একটু ভুল করেছিলাম কন্‌ট্রাক্‌টারদের বিলে ন'য়ের জায়গায় ছয়। বড়বাবু হেসে হেসে বললেন, "ওহে, মন উড়ছে কোন্ দেশে, নয়কে ছয় ক'রে দিলে একেবারে!"

"এইজন্য ডেকেছিলেন?"

"না। কাজ দিলেন। কতগুলি চিঠি ড্রাফ্‌ট করতে হবে।"

"খুব খাটিয়ে নিচ্ছেন কিন্তু আপনাকে।"

মৃদুহাস্যে দিবাকর বললে, "তাতে কি?"

অতুল হেসে কলম তুলে নিল।

ছুটির পর কার্জন পার্কের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে এক সময় অতুল বললে, চলুন দিবাকরবাবু, আমাদের বাসায়। আপনার বৌদি আপনাকে একবারটি দেখতে চায়।"

"তাই নাকি! বেশ চলুন। আপনার ওখানে যাব তাতে আর দ্বিধা কি?"

দুজনে হেসে ট্রাম ধরল। খানিকক্ষণ পরে দিবাকর বললে, "জানেন অতুলদা, বড়বাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে বোধ হয় ঠিক হয়ে গেল।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, পাত্রটিও খুব ভাল, ব্যারিষ্টার।"

"বেশ। এইটি হলেই ত বড়বাবুর কন্যাদায় শেষ, কি বলেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি শুনলেন কোথা থেকে?"

"কাল ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম। দিদিরাই খবর দিলেন।"

ট্রাম তখন মোড় ঘুরছিল। অতুল বললে, "আপনার কমলার খবর কি?"

সলজ্জ হাস্যে দিবাকর বললে, "বলব কেন? চিঠি দেখতে চেয়েছিলেন? চিঠি এসেছে যে আজ!"

"বটে! বলেন নি এতক্ষণ?"

হেসে উঠল দুজনেই।

৫

পনেরো টাকা মাইনে বাড়ল দিবাকরের। টিফিনের পর কাগজটা পকেটে রেখে অতুলের কাছে খবরটা বিজ্ঞাপিত করতেই অতুল হেসে বললে, "শুনেছি। শুধু তাই নয়, অফিসের বেয়ারাটা পর্যন্ত জেনে গেছে।"

"কি করে?"

"কেন, আমাদের রসিকদা?"

দূর থেকে রসিকদার চাপা গলা ভেসে এল, "সন্দেশ খাওয়াতে হবে কিন্তু।"

গোপালবাবু বললেন, "না ভাই দিবাকর, ভাল 'লেডিক্যানি', বুঝলে?"

বগলাবাবু বললেন, "তার চেয়ে একপেট পোলাও, দিব্যি কচি পাঁঠার···।"

"যা বলেছেন, জমবে ভাল।"

"দিনটাও বেশ, মেঘলা মেঘলা—শীত-শীত।"

"কই হে দিবাকর, একটা কিছু মুখের কথা খসাও।"

দিবাকর হাসছিল, বললে, "এখনো একটা মাস পুরো। সামনের মাসের মাইনে পাই।"

ঢোঁক গিলে বগলাবাবু বললেন, ততদিন উপোসি রাখবে ভাই।"

টাইপিষ্ট অমূল্য তার 'খটাখট' থামিয়ে বললে, "দাদার যেমন কথা! আগের থেকে জল্পনা সুরু। ভাই দিবাকর, ওদের কথা শুনো না। ও বুড়োদের খাইয়ে লাভ কি? একেবারে 'চাওওয়া' বুঝলে? না না, এখনই নয়, বাড়তি পয়সাটা আগে হাতে আসুক।"

মাখনবাবু হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বললেন, "লাকি চ্যাপ! দুদিন যেতে না যেতেই···।"

"আঃ!"—যুগলবাবু ধমকে উঠলেন, "বেশী বকো না, মনে করবে হিংসে করছি। হিংসে করলেই মুশকিল। দু-মুখো সাপটা রয়েছে, বড়বাবুর কানে উঠবে। দিবাকর বড়বাবুর পেয়ারের লোক, বোঝ না কেন?"

রসিকদা আস্তে আস্তে উঠে এসেছিলেন কাছে, বললেন, "সকাল থেকে আকাশটা কেমন ঘেরাটোপ পরে আছে দেখেছ!"

হেসে উঠল অতুল, "দিবাকরবাবুর ছোঁয়াচ লাগল যে রসিকদা, এ যে রীতিমত কবি-কবি ভাব!"

নস্যি নিতে নিতে গোপালবাবুও চলে এসেছেন কাছে, "তা কবি হবার যোগাড়ই বটে। কিন্তু ব্যাপার কি, অকালে বৃষ্টি নামবে নাকি?"

বগলাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে নস্যির কৌটার দিকে হাত বাড়ালেন, "হাওয়ার কি রকম জোর দেখছেন?"

দিবাকর বললে, "সত্যি অতুলদা, দেখেছেন আকাশ! মেঘের পর মেঘ এসে জুটল।"

সাধনবাবু মুখ ফেরালেন, "এক জায়গায় অত জটলা করবেন না, সাহেব-টাহেব বেরিয়ে পড়তে পারে।"

"আরে বাপ্, এ যে জল এসে গেল!"

"বেয়ারারা কই, জানালার কাচের পাল্লাগুলো টেনে দিক্।"

"এই বেয়ারা, বেয়ারা?"

বেয়ারারা ছুটে এল। আর খানিকক্ষণ পরেই আরম্ভ হ'ল বৃষ্টি। জানালার কাচের ওপর তীরের মত এসে পড়ে, তার পরে ধারা বেয়ে নেমে যায়। দূরের বাড়ীঘর দেখতে দেখতে ঝাপ্‌সা হয়ে গেল।

তারিণীবাবু কলমটা রেখে একবার সোজা হয়ে বসলেন। বাড়ীতে বড় মেয়েটাকে দেখতে আসবে আজ, কিন্তু যে বৃষ্টি, তারা কি আসতে পারবে? দিবাকর কাছে এসে দাঁড়াল, চোখ যেন তার বেশী জল্ জল্ করে উঠেছে মনে হ'ল, বললে—"দাদা, রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন?"

"অ্যাঁ?"

"ওগো সন্ন্যাসী কী গান ঘনালো মনে!
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু বাজিল ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারংবার,
বাদল-আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে ওঠে চমকিয়া!"

কলমটা তুলে নিলেন তারিণীবাবু, বললেন, "সরো, কাজ আছে।

টাইপিষ্ট অমূল্য টাইপরাইটারের আড়ালে ফাইল খুলল। তার মধ্যে লুকানো রয়েছে একখানা বই। ডিটেক্‌টিভ হিল্লোল চট্টোর

রোমহর্ষক দুঃসাহসের কাহিনী। সবে পড়তে সুরু করেছে, চমকে দেখল দিবাকর আসছে।

"অমূল্যদা কি চমৎকার বর্ষা দেখেছেন?"

নস্যি নিয়ে অমূল্য বললে, "তা বটে।"

"মানুষের মনে বর্ষার প্রভাব সত্যিই অপূর্ব! ছোট সাহেবের ঘরের পাশ দিয়ে আসছি দেখলুম, টেবিলের ওপর দু'পা তুলে দিয়ে জানালার দিকে চেয়ে গুন্‌গুন্ করে সুর ভাঁজছে, 'My hearts in the high lands!'...কি চমৎকার বলুন ত! ওর বাড়ী স্কট-ল্যাণ্ডে, হয়ত এমনি ভাবে ওক বনের ওপর দিয়ে ঝাপসা কুয়াশা নেমেছে এই সময়, পাহাড়ী ঝরণারা দুষ্টু মেয়ের মত কল্ কল্ করে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে!"

বোকার মত হাসল অমূল্য, "ওদের কাণ্ড!"

"রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন অমূল্য দা?...

"ওগো সন্ন্যাসী পথ যায় ভাসি ঝরঝর ধারাজলে
তমালবনের শ্যামল তিমির তলে।
দ্যুলোকে ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি চির বিরহের কথা,
বিরহিনী তার নত আঁখি ছলছলি নীপ অঞ্জলি রচে বসি গৃহকোনে,
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় আকুলতা!"

"না ভাই ফাঁকি নয়, কাজ করি,—অনেক টাইপ করার আছে।"

রাখালবাবু ফাইলের ওপর একখানা কাগজ টেনে নিয়ে এ মাসের ব্যক্তিগত ঋণের পরিমাণটা হিসাব করছিলেন। ধোবি, তিন কি সাড়ে তিনের বেশী নয়, মুদী, কমসে কম পঁচিশ ত বটেই, গোয়ালা—আটের কম নয়, হ'ল,—পঁচিশ আর তিনে আটাশ আর আটে—ছত্রিশ!

দিবাকর এলো,—"দাদা, কবিগুরুর 'আবির্ভাব' মনে আছে?...

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায় সঘন সজল বিশাল মাথায়,
আকুল করেছ শ্যাম-সমারোহে হৃদয় সাগর উপকূল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল!"

রাখালবাবু কাগজটার ওপরে ততক্ষণে হাত চাপা দিয়েছেন, বললেন, "তোমার ঐ দোষ বড্ড বাজে বকো। নাও, সরো কাজ আছে।"

পাশ কাটিয়ে দিবাকর চলল আবার অতুলের কাছে। সাধন-বাবুর কাছে একটা বেয়ারা দাঁড়িয়েছিল, সাধনবাবু বললেন "ওহে দিবাকরবাবু, একবার শুনে এসো, বড়বাবু ডাকছেন।"

"আমাকে? যাচ্ছি।"

অতুল কাজ করছিল, মুখ তুলে বললে, "একি, কাছে এসেও চলে যাচ্ছেন কোথায়?"

"এখুনি আসছি অতুলদা।"

হাতের কয়েকটি টুকিটাকি কাজ শেষ করে রাখছিল অতুল। বাইরে অবিশ্রাম ঝমঝম্ চলেছে। বাতাসে ভিজে মাটির গন্ধ। দিবাকর বলেছিল একদিন, এইরকম একটানা রিমিঝিমি বর্ষণের মধ্যে এই যন্ত্রশাসিত গৃহকোণে বসেও নাকি বাতাসে ভেসে-আসা কোন দূর অরণ্যের গন্ধ পাওয়া যায়! আসছে নাকি এখন সত্যই কোন বিশাল মুক্ত অরণ্যানীর বার্তা? কে জানে!

দিবাকর এলো, "ছুটির পর বড়বাবু একবার দেখা করতে বললেন, অতুলদা।"

"হঠাৎ?

"কি জানি!"

"থাক্‌গে টুলটা টেনে বসুন।"

"না অতুলদা, আমার ওখানে চলুন, বেশ গল্প করা যাবে।

"একটু কাজ রয়েছে যে।"

"খুব জরুরী নয়ত? তবে কাল করবেন। এখন কে কাজ করছে বলুন ত? নিন্ আসুন।"

দিবাকরের টেবিলে এসে দু'জনে বসল। অতুল টেনে নিল একটা ফাইল, বলা যায় না, সাহেবরা কে কখন বেরিয়ে পড়ে, আগে থেকেই সাবধানতা প্রয়োজন। বিপদ আসন্ন হলে অনায়াসেই দুজনে মিলে ষ্টেটমেণ্টগুলো কম্‌পেয়ার করা চলতে পারবে। হাসল দিবাকর, বললে, শুধুই কি আমরা? এই দেখুন সন্তোষবাবু উঠে গোপালবাবুর কাছে গেছেন, রাখালবাবু সাধনবাবুর কাছে, বগলাবাবু তারিণীবাবুর কাছে। খেলোয়াড় উঠে যাওয়া তাসের আসরের মত লাগছে এখন ঘরখানাকে।

"তা-ই বটে।"

"আচ্ছা অতুলদা, একটা কথা বলতে পারেন? এই ঘন-বর্ষণের মধ্যে মন ঠিক এখন কাকে ভাবতে চায়?"

হাসল অতুল, "কথাটা আমাদের পক্ষে পুরনো। আপনারা নবীন, আপনাদের কাছ থেকেই কথাটা নূতনতর ভাষায় শুনতে চাই।"

একটা লজ্জামিশ্রিত আনন্দের আভায় ভরে গেল দিবাকরের মুখ; কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে দিয়ে বললে, "শুনবেন অতুলদা, আমার প্ল্যান?"

"নিশ্চয়ই।"

বাড়্‌তি মাইনের কথাটা বাড়ীতে জানাব না, লুকিয়ে লুকিয়ে ওটা জমাতে পারা যায় কিনা দেখব।"

"বটে, বিয়ের বন্দোবস্ত?"

হাসল দিবাকর—"আমার নয়, বোনের। জানেন অতুলদা, একটি পাত্র পাওয়া গেছে, বেশ ভাল ছেলে। বেশী কিছু তারা চায় না, তবে কিছু না করেও একটা খরচ আছে ত?"

"মাসে এই ক'টা টাকা জমিয়ে কত দিনে আপনি...?

"ভুল করলেন অতুলদা। প্ল্যান আরও আছে। অনেক ভাবতে হবে। পরে একদিন আপনাকে সব বলব।"

"বেশ। প্রতীক্ষায় রইলাম।"

বৃষ্টিটা ততক্ষণে অনেকটা ধরে এসেছে। অতুল বললে, "উঠি। ওদিকে পাঁচটাও বাজে। আজ ধরে নিয়ে যেতাম আপনাকে আমার ওখানে, বসে বসে আপনার কমলার কথা শুনতাম কিন্তু আপনি ত আবার যাবেন বড়বাবুর কাছে।

দিবাকর হাসল একটু, কিছু বলতে পারল না।

পরের দিন। দশটার কাঁটা এগারোটায় গেল, এগারো গেল বারোয়, বারো গেল একটায়, আশ্চর্য, দিবাকর অনুপস্থিত। অতুল একবার জিজ্ঞাসা করেছিল অমূল্যকে। হাত উল্‌টিয়ে অমূল্য বললে, "গড্ নোজ্।"

গোপালবাবু হাঁকলেন, "দিবাকর যে হঠাৎ আজ ডুব মারল, ব্যাপার কি ?"

"অসুস্থ গেছেন খুব সম্ভব।"

"ওসব 'কবিওয়ালা' ছেলে, ওদের কথাই আলাদা।"

"কবি কি! মহাপাগ্‌লা!"

"যা বলেছেন। সেদিন একটা বিল চেক করছি, কোথা থেকে এসে ঝেড়ে দিলে এক কবিতা, সেই হৃদয়-নাচার কবিতা বুঝলেন মশাই, ময়ূরের মত হৃদয় নেচে উঠল, সেই কবিতা।"

"কিন্তু হ'ল কি, খবরটা নিতে হচ্ছে ত।"

"ওহে গেজেট-দাদা, বলতে পার, আমাদের 'দিনমণি' কোথায় লুকালো ? বলি, নাটক-টাটক কিছু ?"

রসিকদা রহস্যপূর্ণ একটু হেসে বললেন, "আর তিন মিনিট, টিফিনের ঘণ্টি বাজুক, সব বলছি, দস্তুরমত নাটক।"

টিফিন হতে না হতেই রসিকদাকে ঘিরে ফেললেন সকলে। নাসিকা-গহ্বরে সজোরে নস্যি টেনে নিয়ে রুমাল দিয়ে গোঁফ মুছতে মুছতে রসিকদা বললেন, "অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা।"

"তার মানে।"

"দিবাকরবাবু যে-সে লোক নন, স্বয়ং বড়বাবুর জামাই হতে চলেছেন।"

"তাই নাকি।"

রাখালবাবু চোখ পিট্ পিট্ করে বললেন, "কেমন, আগেই বলেছিলুম।"

অতুল এগিয়ে এল, বললে, "রসিকদা ভুল শুনেছেন। বড়বাবুর মনোনীত পাত্র দিবাকর নন, এক তরুণ ব্যারিষ্টার।"

"জিজ্ঞাসা করুন ঐ সাধনবাবুকে, বড়বাবু নিজে আজ বলেছেন ওঁকে। আর সে পাত্রকেও জানি মশাই, সে লোক আলাদা, তাকে বড়বাবু করবেন জামাই ? রেখে দিন মশাই, বলি তার চরিত্তির-করিত্তির কিছু আছে।"

মাখনবাবু বললেন, "ছোক্‌রা কপাল করেছিল বটে একখানা।"

যুগলবাবু ধমকে উঠলেন, "আঃ! বাজে কথায় থেক না, চল নীচে যাই।"

তারিণীবাবু বললেন, "এবার থেকে ওকে একটু সমীহ করে চল হে, হাজার হোক বড়কর্তার জামাই।"

"তা আর বলতে।"

"হয়েছে মশাই, জামাই ত জামাই, লাটসাহেব নাকি ?"

"যা বলেছেন।"

স্রোত নামতে লাগল। যখন নামে, উপলখণ্ডেও রোধ করা যায় না, তা সে জলস্রোতই হোক আর জনস্রোতই হোক।

পরদিন দিবাকর এল প্রায় বারোটায়। এসেই অনেকক্ষণ কাটাল বড়বাবুর ঘরে। অফিস-হলে যখন এল, তখন সমস্ত ঔৎ তিতিক্ষার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে বলা যায়।

"ওভাবে হবে না মশাই, আগে মিষ্টিমুখ করিয়ে তবে সুসংবাদ শোনানর নিয়ম।"

"ও দিবাকরবাবু, এদিকে আসুন, বলি, তারিখ কবে পড়ল ?"

"শুনুন ভাই, বরযাত্রী নিতে হবে কিন্তু আমাদের।"

"জিতা রহো দাদা, বলি, পণ কত পাচ্ছো ?"

"ও মশাই শুনুন, শুনুন, দানসামগ্রী কেমন পাচ্ছেন ?"

"কি বলছেন রাখালদা, বেল পাকলে কাকের কি।"

মাখনবাবু বললেন, "যা বলেছেন মশাই, তখন কি আমাদের মনে থাকবে ওঁর ?"

যুগলবাবু ধমকে উঠলেন, "আঃ! ফের কপ্ চাচ্ছ ?"

সাধনবাবু বললেন, "কবে থেকে ছুটি নিচ্ছেন দিবাকরবাবু ?"

অতুল বললে, "স্বাগতম্! এ কি, এত গম্ভীর কেন ?"

দিবাকর বললে, "এদিকে একবার আসুন অতুলদা, কথা আছে।"

"কোথায় ?"

"বারান্দায়।"

অতুল এল। দিবাকর বললে, "ব্যাপার শুনেছেন ?"

"হ্যাঁ, এ ত সুসংবাদ, খাইয়ে দিন।"

ম্লান হাসল দিবাকর, বললে, "এইমাত্র রিজাইন দিয়ে এলুম, অতুলদা।"

"রিজাইন! কেন ?"

"বড়বাবু বললেন, রিজাইন না দিলে যে-কোন ছুতোয় ডিসচার্জ করতেন।"

"এর অর্থ! খুলে বলবেন একটু ঘটনাটা ?"

"বড়বাবু তাঁর ছোট মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব এনেছিলেন। হয়ত ফলটা ভালই হ'ত, বোনের বিয়ের জন্য ভাবতে হ'ত না, সংসারের প্রচণ্ড অভাব থেকে কিঞ্চিৎ রেহাই পেতুম। ছোট মেয়ে ওঁর অতি আদরের। অনেক অর্থ আর অনেক সম্পদের ভারে হয়ত ভরে যেত আমার ভাঙা ঘর।"

"সে ত সত্য কথাই।"

"কিন্তু সেই সত্য দিয়ে আমার জীবনের নিদারুণ মিথ্যাকে বড় করে তুলতে পারলুম না অতুলদা। আমি বড়বাবুকে বলে এলুম, এ অসম্ভব।"

"হ্যাঁ। কমলার স্নিগ্ধ হাসি-উজ্জ্বল মুখখানা মনে পড়ল অতুলদা। কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ একটা দিন আমি ভাববার সময় নিয়েছিলাম।"

"ভাববার সময়।"

"হ্যাঁ, দারিদ্র্য বড় দুঃসহ। ভাঙা ঘরের ভাঙা খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে অনেক চিন্তা করতে হ'ল অতুলদা। যা করেছি, অতি সহজেই তা করি নি।"

"ঐ ছোটসাহেব বেরিয়েছে বুঝি! আমি যাই।"

পেছনে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে রসিকদা চুপচাপ সব শুনছিলেন, ছোটসাহেবের পদশব্দে তাঁর আত্মগোপনের যবনিকা উন্মোচিত হয়ে পড়ল। দিবাকর বললে, "চললাম রসিকদা।"

রসিকদা উত্তর দেবার অবকাশ পেলেন না। দিবাকর হলের মধ্যে প্রবেশ করল। হল পার হয়েই সিঁড়ি। ঐ পাশে ঐ গোপালবাবু, রাখালবাবু, সাধনবাবু, তারিণীবাবু, ঘনশ্যামবাবু, রসিকবাবু। ওপাশে সন্তোষবাবু, বগলাবাবু, মাখনবাবু যুগল-বাবু, অমূল্যবাবু। ছোটসাহেব অদূরে দাঁড়িয়ে। ওঁদের কলম চলতে লাগল খস্‌খস্‌। অভিবাদনের ভঙ্গীতে একবার হাতখানা তুলে ধীরে ধীরে কক্ষ পার হয়ে সিঁড়ির অভিমুখে এগিয়ে গেল দিবাকর। রসিকদা চাপা গলায় কেবল বললেন, বাঁচা গেল।"

তারিণীবাবু বললেন, "তচ্‌নচ্‌ করে তুলেছিল আপিসটা।"

গোপালবাবু বললেন, "আস্ত পাগল।"

রাখালবাবু বললেন, "বোকা।"

কেবল অতুলই কিছু বলতে পারল না।

হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে ব্ল্যাক মার্কেট

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

যখন মরণাপন্ন রোগীর প্রাণরক্ষার জন্য চার আনার এম-বি ট্যাবলেট বারো আনায় কিনিতে বাধ্য হই, দুই পয়সার বরফের জন্য এক টাকা কবুল করিয়া পাঁড়েজীর অনুকম্পা ভিক্ষা করি, কুইনাইনের জন্য অফিসের কেরাণীর অথবা থার্ম্মোমিটারের জন্য ইনসিওরেন্সের দালালের শরণাপন্ন হই, চাউলের জন্য মুড়ি ওয়ালাকে সাদরে ঘরে ডাকিয়া মোড়া পাতিয়া বসিতে দিই, আড়াই ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াইয়া আড়াই সেরের দাম দিয়া সের দুয়েক জলে চুবচুবে কয়লা লইয়া রাস্তায় কালো জলের রেখা আঁকিয়া বিরস বদনে বাড়ী ফিরি, সরিষার তেলের দাম দিয়া শিয়াকুল-কাঁটার তেল খাইয়া বেরিবেরিতে ভুগি, কাপড়ের জন্য বিড়ি-ওয়ালার খোসামোদ করি, তখনই আমরা বলি ব্ল্যাক মার্কেট চলিতেছে। ইহার চেয়ে বড় ব্ল্যাক মার্কেটও অবশ্য আছে। যেখানে আমাদেরই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ বিদেশী ৩০ টাকায় কেনা সোনা ৭০ টাকায় বিক্রয় করিয়া ভরিপ্রতি ৪০ টাকা লাভ করে, এ দেশে লক্ষ লক্ষ লোককে দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে মরিতে দেখিয়াও যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ পুনর্গঠনের নামে এ দেশ হইতেই ৮ কোটি টাকা বাহির হইয়া যায়, দেশের লোকের টাকায় যে রেল চলে সেই রেলগাড়ীতে দেশবাসীর ভ্রমণ দুর্ব্বহ করিয়া সাহেবদের জন্য এয়ার-কণ্ডিসাণ্ড গাড়ীর বন্দোবস্ত হয়, ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস করিয়া বিলাতী স্বার্থের পুষ্টিসাধন হয় সেই বড় ও রাজনৈতিক ব্ল্যাক মার্কেটের কথা আজ বলিব না। নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের ব্ল্যাক মার্কেট নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বে কিরূপ চেষ্টা হইয়াছে আজ তাহারই শুধু একটু তুলনামূলক আলোচনা করিব।

হিন্দু রাজত্বে ব্ল্যাক মার্কেট নিয়ন্ত্রণের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। চাহিদা সমান থাকিতে সরবরাহ হঠাৎ কমিয়া গেলে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে এবং সরবরাহ বাড়িলে দাম কমে—অর্থনীতির এই মূল সত্য কৌটিল্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও তিনি ভাল ভাবেই দিয়া গিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিধান এই যে, উৎপাদক ন্যায্য লাভ ও শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পাইবে এবং ক্রেতা ন্যায্য মূল্যে সমস্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে। তাঁহার ধারণা ছিল ব্যবসায়ীরা নামে না হইলেও কার্য্যতঃ চোর ভিন্ন আর কিছু নয়, ইহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিলেই ইহারা ক্রেতৃবৃন্দকে ঠকাইবে। (এবং চোরানচোরাখ্যান্ বণিক্কারুকুশীলবান্। ভিক্ষুকান্ কুহকাংশ্চান্যানারয়েৎ দেশপীড়নাৎ ॥) কৌটিল্যের ধারণা দৃষ্টিকটু মনে হইলেও উহা যে কঠোর সত্য যুদ্ধের সময় আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিদিন ইহা অনুভব করিয়াছি। মূল্যের সমতা রক্ষার জন্য কৌটিল্য অনেকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। খনি খনিজ শিল্প ও লবণের উপর গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া অধিকার ছিল—এখানে কোন ব্যবসায়ীকে ঢুকিতে দেওয়া হইত না। ইহা ছাড়া নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যেরও অনেকগুলি কারখানা গবর্ণমেণ্ট নিজে চালাইতেন। সরকারী কারখানার জিনিষ ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় হইত বলিয়া অসাধু ব্যবসায়ীরা বেশী দাম আদায় করিবার সুযোগ পাইত না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বাজারে সাময়িক অভাব ঘটাইয়া পরে উহা চড়া দরে বিক্রয়ের যে ফন্দীর জোরে বর্ত্তমান যুদ্ধে সাদা কালো সর্ব্ববিধ ব্যবসায়ী কাঁপিয়া লাল হইয়াছে, কৌটিল্য তাহা একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের দোকান খুলিতে চাহিলে আগে লাইসেন্স লইতে হইত এবং দোকান ভিন্ন অন্যত্র এমন কি বাড়ীতেও কেহ কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য কেহ কখনও সঞ্চয় করিতে পারিত না, করিলে সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত হইত। উৎপাদকেরা কারখানাতেও মাল বিক্রয় করিতে পারিত না। উৎপন্ন দ্রব্য আগে প্রকাশ্য বাজারে আনিতে হইত, সরকারী কর্ম্মচারীরা পরীক্ষা করিয়া মূল্য অনুমোদন করিলে তবেই উহা বিক্রয় করা চলিত। উৎপাদন হ্রাসের ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে তৎক্ষণাৎ উৎপাদন বাড়াইবার এবং বাহির হইতে আমদানীর চেষ্টা হইত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে মূল্য হ্রাস ঘটিলে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত দ্রব্যের বিক্রয় ভার গ্রহণ করিতেন। পণ্যাধ্যক্ষ ধীরে ধীরে বাজারের চাহিদানুসারে উহা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিতেন। অতিরিক্ত দ্রব্য সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বিক্রয় হইয়া গেলে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া হইত। অস্বাভাবিক উপায়ে মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিলে ব্যবসায়িগণকে গুরুতর অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। ক্রেতারাও প্রকাশ্য বাজার ভিন্ন অন্যত্র কোন জিনিষ ক্রয় করিলে দণ্ডনীয় হইতেন। শুধু মূল্য নিয়ন্ত্রণ নয়, কেহ যাহাতে ওজনে কম না দিতে পারে এবং ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় না করে তৎপ্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইত।

কৌটিল্যের বিধানাবলী যাহাতে কার্য্যক্ষেত্রে উত্তমরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। শুল্কাধ্যক্ষ বাজারে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য ও উৎকর্ষ

পরীক্ষা করিতেন ও সরকারী শুল্ক আদায় করিতেন। পণ্যাধ্যক্ষ সরবরাহ ও বিক্রয় তদারক করিতেন, ন্যায্য মূল্যের অতিরিক্ত কেহ আদায় করিতেছে কি না অথবা অতিরিক্ত দ্রব্য কেহ মজুত করিতেছে কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, দোকান খুলিবার লাইসেন্স দিতেন, এবং ভেজাল দ্রব্য কেহ বিক্রয় করিলে তাহাকে শাস্তি দিতেন। সংস্থাধ্যক্ষ পুরাণো জিনিষ বিক্রয় তদারক করিতেন, কেহ নিকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে কিনা দেখিতেন এবং ওজনে কেহ কম দিলে তাহাকে ধরিতেন। পৌটবাধ্যক্ষ ওজন ও মাপের সমতা বিধান করিতেন। অন্তপালেরা পার্শ্ববর্ত্তী দেশ হইতে আমদানী দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া উহার মূল্য নির্দ্ধারণ ও ট্যাক্স আদায় করিতেন। সরকারের তরফ হইতে চোরা কারবার বন্ধ করিবার জন্য যেমন বিশদ বন্দোবস্ত ছিল, জনসাধারণের পক্ষেও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে নালিশ জানাইবার সুযোগ ছিল। ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করিবার জন্য কৌটিল্যের ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল গ্রীক পর্য্যটকেরা তাহার সাক্ষী।

মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে আলাউদ্দীন খল্‌জী ব্ল্যাক মার্কেট দমনের জন্য সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করেন এবং সফলও হন। জিয়াউদ্দীন বারনি কৃত তারিখ-ই-ফিরুজশাহী গ্রন্থে ইহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আলাউদ্দীন প্রথমে খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করেন। সর্ব্বাগ্রে তিনি দিল্লীর বাজার নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ করেন এবং উহাতে সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বলের বাজার আপনিই সায়েস্তা হইয়া যায়। তিনি নিম্নলিখিত সাতটি অর্ডিনান্স জারী করেন: (১) সমস্ত ফসল বাজারে নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় হইবে; (২) বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, শিহ্‌নাহ্‌-ই-মণ্ডি, নিযুক্ত হইবেন; (৩) রাজকীয় শস্যভাণ্ডার গঠিত হইবে; (৪) বাজারের প্রকাশিত দর অপেক্ষা অধিক মূল্যে কেহ ফসল বিক্রয় করিতে পারিবে না; (৫) মফঃস্বল হইতে ব্যবসায়ীরা যে-সব ফসল বাজারে আনিবে বিক্রয়ের পূর্ব্বে উহা শিহ্‌নাহ্‌-ই-মণ্ডি পরীক্ষা করিবেন; (৬) কৃষকেরা নিজ নিজ কৃষিক্ষেত্রে ফসল বিক্রয় করিবে এবং (৭) সম্রাট দরবারে বসিলে প্রতিদিন তাঁহাকে বাজারদর জানাইতে হইবে।

এই অর্ডিনান্স অনুসারে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয় নিম্নোক্তরূপ,

গম—	এক পয়সা	মণ
বার্লি—	এক পয়সায়	তিন মণ
চাউল—	এক পয়সায়	আড়াই মণ
মাষ কলাই—	এক পয়সায়	আড়াই মণ

অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হইলেও আলাউদ্দীন খল্‌জীর শাসনকালে এই সব দর এক দিনের জন্যও এক তিল বাড়ে নাই।

সরকারী শস্যভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবার জন্য খাসমহল জমি হইতে রাজস্ব হিসাবে শুধু ফসল লওয়া হইত এবং অপর জমি হইতে অর্দ্ধেক ফসল লওয়া হইত। এই সমস্ত ফসল ক্যারাভানে করিয়া দিল্লী প্রেরিত হইত এবং পথে প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে স্থানীয় প্রয়োজনানুরূপ শস্য মজুত রাখিয়া যাওয়া হইত। কোন গ্রামে বা শহরে খাদ্যাভাব ঘটিলে তৎক্ষণাৎ এই সব সরকারী গোলা হইতে ফসল বাহির করিয়া নির্দ্দিষ্ট দরে উহা বাজারে বিক্রয় করা হইত। পরে যথাসময়ে ক্যারাভান আসিলে ঘাট্‌তি পূরণ করা হইত। এই ব্যবস্থায় দেশের কোন স্থানে কখনও খাদ্যশস্যের অভাব ঘটিবার অথবা উহার মূল্য বৃদ্ধির উপায় ছিল না।

খাদ্যশস্য কেহ কোথাও যাহাতে গোপনে মজুত করিয়া চড়া দরে বিক্রয় করিতে না পারে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইত। কৃষকেরা নিজ নিজ ক্ষেতে এবং ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্য বাজারে ফসল বিক্রয় করিবে ইহাই ছিল নিয়ম, নিজের বাড়ীতে বা উক্ত দুই স্থান ভিন্ন অপর কোথাও কেহ ফসল বিক্রয় করিলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইত।

সরকারী কর্ম্মচারীরা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ করা কঠিন হয় না আলাউদ্দীন খল্‌জী এই সত্য উত্তমরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যে এলাকায় কোন মজুতদার ধরা পড়িত সেখানকার ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারিগণকেও ইহার জন্য দোষী করা হইত এবং তাহাদিগকে সম্রাটের নিকট জবাবদিহি করিতে হইত। [If anybody was detected at this (hoarding) practice, the officials themselves should be considered at fault, and have to answer for it before the throne.]*

বাজারে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, শিহ্‌নাহ্‌-ই-মণ্ডি, ছাড়া আরও কর্ম্মচারী ছিল। একজন বারিদ-ই-মণ্ডি থাকিত, তাহার কাজ ছিল কেহ কোন জিনিষে ভেজাল দিয়াছে কি না তাহা ধরা। এই দুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ভিন্ন বাজারদর ও জিনিষের উৎকর্ষ সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবার জন্য বহু গোয়েন্দা থাকিত। সম্রাট আলাউদ্দীন ইহাতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি নিজের বিশ্বাসভাজন লোক পাঠাইয়া স্বয়ং বাজারদর যাচাই করিতেন। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণি লিখিয়াছেন যে, আলাউদ্দিনের শাসনকালে কোন কারণে একদিনের জন্যও বাজারের নির্দ্দিষ্ট দরের ব্যতিক্রম হয় নাই, শুধু তাই নয় এক বার অনাবৃষ্টিতে দেশে দুর্ভিক্ষ আসন্ন বলিয়া লোকে শঙ্কিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ হওয়া দূরে থাকুক কোন জিনিষের দর এক দামড়িও বাড়িতে পারে নাই। একবার একজন শিহ্‌নাহ্‌-ই-মণ্ডি সম্রাটকে বাজারদর সামান্য কিছু বাড়াইবার সুপারিশ করিতে গিয়া বিশ ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন লেখাপড়া জানিতেন না, আই-সি-এসও পাস করেন নাই কিন্তু রেশনিং-এর মূল নীতি তিনি ভালই বুঝিতেন। শস্যাভাব ঘটিলে সমানভাবে প্রত্যেককে একসঙ্গে আধ মণ করিয়া ধান দেওয়া হইত।

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের প্রতিও আলাউদ্দীন নজর দিয়াছিলেন। কাপড়, চিনি, তেল প্রভৃতি যাহাতে দরিদ্রতম লোকটিও নির্দ্দিষ্ট দরে পাইতে পারে তাহারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে পাঁচটি অর্ডিনান্স জারী হয়:—

১। সরাই আদল প্রতিষ্ঠা। দিল্লীর একটি স্থানের নাম

* Translations from the *Tarikh-i-Firus Shahi*, J.A.S.B., 1870, Pt. I, p. 27.

দেওয়া হয় সরাই আদল এবং হুকুম হয় যে সমস্ত নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য বিক্রয়ের আগে এখানে আনিয়া জমা করিতে হইবে। এখানে উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইত এবং এই ঘরে সমস্ত জিনিষ বিক্রয় হইত। সরাই আদল ভিন্ন অপর কোন স্থানে এমন কি নিজ গৃহেও কেহ কাপড়, চিনি তেল প্রভৃতি বিক্রয় করিলে জিনিষ ত বাজেয়াপ্ত হইতই, অধিকন্তু অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত।

২। নির্দ্দিষ্ট মূল্যে নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য বিক্রয়। দ্রব্যমূল্য মোটামুটি এইরূপ ছিল :

মিহি লংক্লথ—	টাকায়	২০ গজ
মোটা লংক্লথ—	,,	৪০ গজ
সাদা চিনি—	পয়সায়	৬ সের
বাদামী চিনি—	,,	১০ ,,
তিসির তেল—	,,	৩৫ ,,
লবণ—	,,	২৫ মণ

সরাই আদল সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খোলা থাকিত। প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে পারিত, কাহাকেও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হইত না।

৩। রাজ্যের সমস্ত ব্যবসায়ীদের নাম রেজেষ্ট্রি। শহরের ও গ্রামের হিন্দু এবং মুসলমান প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সমান ভাবে সরকারের খাতায় নাম রেজেষ্ট্রি করিতে হইত। সরাই আদলে কোন জিনিষ কম পড়িবার উপক্রম হইলে যথোপযুক্ত ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্ণে তাহা সংগ্রহ করা হইত।

৪। মুলতানী ব্যবসায়ীদের রাজকোষ হইতে অগ্রিম মূল্য দানের ব্যবস্থা। দেশের ব্যবসায়ীরা একজোট হইয়া যাহাতে সরাই আদল ভাঙ্গিয়া দিতে না পারে সেজন্য আলাউদ্দীন মুলতানী বণিকদের হাতে রাখিয়াছিলেন। ইহাদিগকেও অবশ্য নির্দ্দিষ্ট দরেই জিনিষ বিক্রয় করিতে হইত, কিন্তু প্রয়োজনানুসারে ইহাদিগকে রাজকোষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত আগাম দেওয়া হইত।

৫। ধনীরা দামী জিনিষ কিনিতে চাহিলে তাহার জন্য লাইসেন্স দান। মূল্যবান বস্ত্র সিল্ক প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য আমীর, মালিক প্রভৃতিকে আগে অনুমতি লইতে হইত। নিজেদের ব্যবহারের জন্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের অনুমতি লাভে অসুবিধা হইত না, কিন্তু কেহ উহা কিনিয়া আরও চড়া দরে বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে বলিয়া সন্ধান পাইলে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইত না।

সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজত্বে বাজার সায়েস্তা রাখিবার জন্য পুলিশের এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চও ছিল। সমস্ত বাজারে পুলিশ থাকিত এবং প্রতিদিনকার সংবাদ সম্রাটকে ইহাদের জানাইতে হইত। পুলিশের প্রত্যেকটি রিপোর্ট আলাউদ্দীন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেন। বাজারের প্রত্যেকটি জিনিষ টুপী, মোজা, চিরুণী, ছুঁচ, শাকসব্জী, সন্দেশ, কেক, রুটি, মাছ, পান, সুপারী, এমন কি গোলাপ ফুলেরও নির্দ্দিষ্ট মূল্য ছিল।

দিনের মধ্যে দশ-পনর-কুড়িবার পর্য্যন্ত দাম যাচাই করা হইত, এবং বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ অপরাধী দোকানদারকে বেত্রাঘাত করা হইত। ওজনে চুরি যাহাতে না চলে সে দিকেও আলাউদ্দীন খল্জীর যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। এক অর্ডিনান্স অনুসারে কেহ ওজনে কম দিলে সেই দোকানদারের গালের মাংস কাটিয়া লইয়া বাকী ওজন পূরণ করা হইত। আলাউদ্দীন স্বয়ং হালুয়া, তরমুজ, শসা প্রভৃতি অতি সাধারণ জিনিষ ক্রয়ের জন্য বিশ্বাসী দাস পাঠাইতেন এবং তাঁহার সম্মুখে উহা আনিয়া ওজন করা হইত। কম ওজন ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ সেই দোকানে পুলিশ পাঠানো হইত, দোকানদারের গালের মাংস কাটিয়া লইয়া লাথি মারিয়া তাহাকে দোকান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থায় অল্পদিনের মধ্যেই দোকানদারেরা সংযত হয়, ওজনে চুরি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

তারপর ইংরেজ আমল। ভারতবর্ষে দুইশত বৎসরের ইংরেজ শাসনে এক টাকার চাউল একশ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তাহার সরকারী দর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ষোল টাকা। কাপড়ের অভাবে দেশের লোক বিবস্ত্র হইতে চলিয়াছে। কয়লা, তেল, ঘি, মাছ, মাংস, তরকারী প্রভৃতি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য্য প্রত্যেকটি বস্তু অগ্নিমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। অধিকাংশ দ্রব্যই বাজারে মেলে না, সরকারী অন্ধকারে গা ঢাকিয়া তদ্বির করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। দুশো বছরেও ভারতের সর্ব্বত্র এক ওজন ও মাপ প্রবর্ত্তন এবং ওজনে চুরি ও ভেজাল নিবারণ সম্ভব হয় নাই। তার জন্য উল্লেখযোগ্য চেষ্টাও হয় নাই। যানবাহনের বহু উন্নতি সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষ নিবারণ ইংরেজ রাজত্বে দুই একবার ভিন্ন হয় নাই। চাউলের দর যখন একশ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছে তখন রেশনিং হয় নাই, পর বৎসর পর্য্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন হইয়া ১০।১২ টাকায় নামিয়া গেলে রেশনিং আরম্ভ হইয়াছে এবং লোকে অখাদ্য কুখাদ্য ১৬ টাকায় কিনিয়া রেশনিং-এর মাহাত্ম্য গাহিয়াছে। বিলাতে চার কোটি লোকের মধ্যে যেখানে কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, শিশু, বৃদ্ধ, রোগী, প্রসূতি প্রভৃতি প্রত্যেকের জন্য পৃথক খাদ্য বরাদ্দ হইয়াছে, এখানে মাত্র ৪০ লক্ষ লোকের বেলায় তাহা সম্ভব হয় নাই। বিলাতী এক্সপার্টের তত্ত্বাবধানে শিশু ও রোগীকেও সেই একই কুখাদ্য গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। ঘুষ ও চুরি অবাধে চলিয়াছে। এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ পুলিশের পিছন দিয়া বড় বড় হাতী পার হইয়া গিয়াছে, আইনভঙ্গের নামে ধরা পড়িয়াছে নিরীহ গ্রামবাসী এবং ক্ষুদে দোকানদার। জিনিষপত্রের দর বাঁধা হইয়াছে, প্রয়োগ করা হয় নাই; ব্যবসা বাণিজ্যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন নাই।

দেশের আপামর জনসাধারণের উপর দরদ ও কর্ত্তব্যবোধ থাকিলে ব্ল্যাক মার্কেট বন্ধ অনায়াসেই করা যায়, কৌটিল্য এবং আলাউদ্দীন খল্জীর ব্যবস্থা তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যক্ষ্মা রোগীদের উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীমায়া দাশগুপ্তা

যক্ষ্মা রোগীদের উপনিবেশ বলতে কি বোঝায় তা আমাদের দেশে অনেকেই জানেন না এবং খবরাদি রাখবার প্রয়োজন বোধ করেন না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান যক্ষ্মা রোগীদের জন্য (১) অসুস্থ রোগী, (২) সুস্থ রোগী, এই দুটি শব্দ সৃষ্টি করেছেন, কারণ এই রোগ যাদের দেহে একবার আশ্রয় লাভ করে তারা চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থতা লাভ করলেও তাদের পক্ষে পরবর্ত্তী জীবনে ঐ সুস্থতা বজায় রেখে চলা প্রায় অসম্ভবই হয়ে পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যক্ষ্মা রোগীরা স্বাস্থ্যনিবাস কিংবা হাসপাতাল থেকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থ হয়ে ফিরে এলেও তাদের ভাগ্যে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করা প্রায়ই ঘটে ওঠে না। সুস্থ হয়েও যক্ষ্মা রোগীদের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সংযোগ রেখে বাকি জীবনটা কাটাতে হয়। স্বাস্থ্যনিবাস কিংবা হাসপাতালের বাইরে এসে যক্ষ্মা রোগীরা সে সুযোগের সাহায্য পায় না, কারণ সে প্রকার কোনও প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে নেই। ফলে উক্ত সুস্থরোগীদের বাধ্য হয়েই সুস্থ মানবের সঙ্গে বাস করতে হয় এবং স্বাস্থ্যবানদের সঙ্গে সমান তালে না হলেও কিছুটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়—এতে তাদের দুর্ভোগেরও অন্ত থাকে না। সুস্থ মানবের পক্ষে সুস্থ যক্ষ্মা রোগীদের জীবন-পথে চলবার সীমা উপলব্ধি করা সহজ নয়, তাই তারা যখন দেখে সুস্থ রোগীরা আপন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে তখন সেটা তাদের পক্ষে বাড়াবাড়িই ঠেকে। অনেককে বলতে শুনেছি যক্ষ্মা রোগীরা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এত খুঁৎখুতে হয় যে ব্যাধির সম্বন্ধে কাল্পনিক ভীতি তাদের জীবনকে বাতিকগ্রস্ত করে তোলে। এ কথা ভাবা সুস্থ লোকদের পক্ষে হয়ত স্বাভাবিকই কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানেন এই ব্যাধি তাঁদের পর-বর্ত্তী জীবনে সাথী স্বরূপই হয়ে থাকবে এবং যখনই সুযোগ পাবে সে তার স্বরূপ প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করবে না। পারি-পার্শ্বিক অবস্থার জন্য তাদের বাধ্য হয়েই চিকিৎসকদের উপদেশ অমান্য করে চলতে হয় এবং তার জন্য তারা বারেবারেই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একেই এ রোগে চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থতা লাভের জন্য দীর্ঘ সময়ের ও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন—আমাদের মত দরিদ্র দেশে এ চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও বা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থ ব্যয় করে দীর্ঘকাল পরে সুস্থতা লাভ করে, কিন্তু সে সুস্থতা বজায় রাখার সুযোগ আমাদের দেশ দেয় না, উপরন্তু নানাভাবে তাদের প্রচুর ক্ষতি করে। সুস্থ যক্ষ্মা রোগীরা সুস্থ মানবের সঙ্গে বাস করায় যে শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করে তা নয়, এতে তারা অজানিত ভাবে সমাজেরও প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় রোগীদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না কখন সে পুনরায় সুস্থ মানবের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এই ভাবে তারা আরও দশজনের মধ্যে রোগ ছড়ায়। সুস্থ যক্ষ্মারোগীরা সুস্থ হয়ে ফিরে এলেও সর্ব্বপ্রকার কাজের উপযুক্ত হয় না কিন্তু কর্ম্মব্যস্ত মনুষ্য-সমাজে এসে তাদের বাধ্য হয়েই চিকিৎসকদের সতর্ক-বাণী অমান্য করে চলতে হয়, কারণ তারা দেখে জীবিকা উপার্জ্জন করে বেঁচে থাকতে হলে তাদেরও সুস্থমানবের মতই কঠিন পরিশ্রম করতে হবে, কারণ তাদের ব্যাধির গুরুত্ব বুঝে কেউ তাদের কর্ম্মময় জীবনে আর পাঁচজন থেকে পৃথক ভাবে দেখবে না, তা দেখা হয়ত সম্ভবও নয়।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই উপনিবেশ গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এই উপনিবেশ দ্বারা সমস্ত সুস্থ রোগী জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পেতে পারবেন। কিন্তু এই প্রকার উপনিবেশ কোনও স্বাস্থ্যনিবাসের নিকটে প্রতিষ্ঠা না করলে এর সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে, কারণ সুস্থ রোগীরা সত্য সত্যই সুস্থতা বজায় রাখতে পারছে কি না তা বোঝা এবং তাদের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা একমাত্র স্বাস্থ্যনিবাসের পক্ষেই সম্ভব। কোন একজন বিশেষ চিকিৎসক দ্বারা এ সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ যক্ষ্মা রোগীদের ব্যাধি শুধু স্টেথিস্‌কোপ দ্বারা নির্ণয় করা যেমন কঠিন তেমনি একজন চিকিৎসকের পক্ষেও যক্ষ্মা রোগী-দের প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখাও অসম্ভব। যদি স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সংযোগ না রেখে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা হয় তা হলে উক্ত পরীক্ষাগুলি প্রত্যেক সুস্থ রোগীকেই প্রতি মাসে একবার কিংবা প্রতি তিন মাসে একবার স্বাস্থ্য-নিবাসে বা যক্ষ্মা হাসপাতালে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আসতে হবে, তাতে রোগীর শারীরিক ও আর্থিক প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যনিবাসের সহযোগিতাও উপনিবেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সাধারণতঃ যদি স্বাস্থ্যনিবাসের কর্ত্তৃপক্ষ সুস্থ রোগীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে থাকেন তবে তাঁদের সাহায্যে উপনিবেশের আর্থিক অবস্থাও বিশেষ উন্নতি লাভ করবে সন্দেহ নেই। স্বাস্থ্যনিবাসের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এই উপনিবেশের কাছ থেকে স্বাস্থ্যনিবাস কিনে নিতে পারবে এবং শুধু মাত্র জিনিসপত্র কেনা নয় আরও নানা ভাবে উপনি-বেশের রোগীদের উপার্জ্জনের সাহায্য স্বাস্থ্যনিবাসের দ্বারা পাওয়া সম্ভব হবে। নিম্নে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন:—১। স্বাস্থ্যনিবাসের রোগীদের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের জন্য দোকানের আবশ্যক, সেই প্রকার দোকান প্রতিষ্ঠা করে সুস্থ রোগীরা উপার্জ্জনের সুযোগ পেতে পারেন।

২। চাল ডাল তেল নুন ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবন ধারণের খাদ্যদ্রব্যের দোকানও তাঁরা করতে পারেন।

৩। শিক্ষিত সুস্থ রোগীরা স্বাস্থ্যনিবাসের আপিস সংক্রান্ত কাজে সুযোগ পেতে পারেন।

৪। শারীরিক অবস্থা অনুকূল হলে কম্পাউণ্ডার ও নার্স শ্রেণীর সুস্থ রোগীরাও স্বাস্থ্যনিবাসের কাজে যোগদান করে অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবেন।

৫। উপনিবেশের রোগীদের দ্বারা উৎপাদিত তরিতরকারি, Poultryর মুরগী, হাঁস, ডিম, Dairyর দুধ মাখন ঘি ইত্যাদি স্বাস্থ্যনিবাস কিনে নিতে পারেন।

৬। স্বাস্থ্যনিবাসের সকল প্রকার মুদ্রণ-কার্য্য উপনিবেশের ছাপাখানা থেকে হতে পারে।

৭। স্বাস্থ্যনিবাসের প্রয়োজনীয় ব্যাণ্ডেজ (bandage), তোয়ালে, ঝাড়ন, বেডশীট ইত্যাদি উপনিবেশের কাছ থেকে তাঁরা নিতে পারেন। অবশ্য কেবলমাত্র স্বাস্থ্যনিবাস থেকেই যে তাঁরা আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্পূর্ণ সাহায্য পাবেন সে আশা করাও ঠিক নয়, বাইরের নানা প্রকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁদের যোগ রেখে চলতে হবে সন্দেহ নেই।

উপনিবেশের সুস্থ রোগীরা বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থেকে ধীরে ধীরে তাঁদের শারীরিক ক্ষমতা অনুযায়ী কাজকর্ম্ম করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারবেন, উপনিবেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তাঁদের মানসিক অবস্থাকে সহজ ও সরল করে তুলবে। কেবলমাত্র পেটের খোরাকই নয় মনের খোরাকের ব্যবস্থাও উপনিবেশ রোগীদের জন্ম করবেন। উপনিবেশের কোন রোগীকেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে অলস জীবন যাপন করতে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই তাঁদের উপযোগী পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতে হবে, এতে কারুরই আত্মসম্মান ক্ষুন্ন হবার প্রশ্ন উঠতে পারবে না। অবশ্য এমন অনেক সুস্থ রোগী হয়ত থাকবেন যাঁদের পরিশ্রম করবার মত শারীরিক শক্তির অভাব আছে সেই সব সুস্থ রোগীর যথাসম্ভব সাহায্য উপনিবেশ করবেন তাতেও সন্দেহ নেই। প্রায়ই দেখা যায় যক্ষ্মা রোগীদের সুস্থ মানব মাত্রেই করুণার চক্ষে, দয়ার চক্ষে দেখেন, তাঁরা ভুলে যান কোনও যক্ষ্মা রোগীরই আত্মসম্মান তাঁদের চেয়ে কম নয়, সর্ব্বোপরি তাঁরা এ কথাও ভুলে যান যে ব্যাধি জাতিধর্ম্ম বিচার করে দেখা দেয় না। এই উপনিবেশ শেখাবে রোগীদের আত্মনির্ভরতা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, উদার মনোবৃত্তি, তখন আর বাইরের জগতের আঘাত মুখ বুজে তাদের সইতে হবে না, তারা নিজেদের মাঝেই লাভ করবে জীবনের পূর্ণতা।

আমাদের দেশে দিন দিন যেমন দ্রুত গতিতে যক্ষ্মা রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আর দ্বিরুক্তি না করে এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া জনসাধারণ ও সরকারের একান্ত প্রয়োজন। সরকারী সাহায্য ব্যতীত হয়ত ছোট একটি উপনিবেশ গঠন করা সম্ভব কিন্তু আমি প্রথমেই বলেছি স্বাস্থ্যনিবাসের সঙ্গে সংযোগ না রেখে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করলে এ উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আশা খুবই কম, কাজেই প্রথমেই চেষ্টা করা প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার। স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার জন্ম যেমন সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন জনসাধারণের সহযোগিতা। আমাদের দেশে বহু বিরাট্ বিরাট্ প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের অর্থে গড়ে উঠেছে, এদিকেও তাঁদের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, এ দিকটা উপেক্ষা করে তাঁরা জাতির অমঙ্গল ডেকে আনছেন। বর্ত্তমানে জনসাধারণ ও সরকারের কাছ থেকে কিছু কিছু সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু তা সমগ্র জাতির কল্যাণের পক্ষে অতি নগণ্য। বর্ত্তমানে যক্ষ্মা রোগীর মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী, এর অন্যতম প্রধান কারণই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা। এ সম্বন্ধে 'নতুন জীবনে'র শারদীয় সংখ্যায় অভিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র অধিকারী "যক্ষ্মার অর্থনৈতিক সমস্যা" নামক প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন, আমি সেদিকে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জনসাধারণ ও বিশেষ করে অর্থশালী ব্যক্তিরা এ দিকে আগ্রহ না দেখালে এ গুরুতর সমস্যার সমাধান সত্যই অসম্ভব।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যনিবাসের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু যত দিন স্বাস্থ্যনিবাসের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাচ্ছে তত দিন অসহায়ের মত চুপ করে বসে থাকলে দেশের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধিই পাবে। যাঁরা বহু কষ্টে ভিটে মাটি বিক্রী করে স্বাস্থ্যনিবাসের চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করে সুস্থ হয়ে আসছেন তাঁরাও ব্যবস্থার অভাবে সে সুস্থতা বজায় রেখে ত চলতেই পারছেন না, উপরন্তু আরও দশজনের সর্ব্বনাশ করছেন।

আমার মনে হয় যত দিন আমরা সে রকম সুব্যবস্থার সুযোগ না পাচ্ছি তত দিন যদি কোনও যক্ষ্মা হাসপাতালের কাছেই এরূপ একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তাতে অন্ততঃ কিছু লোকেরও উপকার হবে সন্দেহ নেই, তাই এসব বিষয়ে আমরা বিত্তশালীদের ও যক্ষ্মা হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের সহৃদয় সহযোগিতার জন্ম আবেদন জানাচ্ছি। উপরোক্ত সমস্যাগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মতালিকা প্রস্তুত করে অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ কথা সর্ব্বপ্রথম মনে রাখা প্রয়োজন সরকারী সাহায্য না পেলে যেমন কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব নয় তেমনি জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্যোগ না থাকলে সরকারের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়াও সম্ভব নয়। আশা করি আমাদের এই আবেদন জনসাধারণ ও ধনবান ব্যক্তিরা সহৃদয়তার সহিত বিচার করে জাতির কল্যাণের জন্ম সাহায্যে বিমুখ হবেন না।

রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একত্রিংশত্তম প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন ডিল্যানো রুজভেণ্ট আর ইহলোকে নাই। তিনি বিগত ১২ই এপ্রিল আমেরিকার রাষ্ট্রাকাশ হইতে অস্তমিত হইয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে যুদ্ধলিপ্ত ইউরোপ ও অন্যান্য মিত্ররাজ্যসমূহের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। সত্যই যে তিনি ছিলেন, "একজন মহান্ ব্যক্তি এবং স্বাধীনতার পূজারী" তাহা তাঁহার ব্যবহার এবং কার্য্যকলাপের দ্বারাই বুঝা যায়। তিনি ছিলেন যুদ্ধোত্তর জগতের শান্তির অগ্রদূত। 'পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক', ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত কামনা।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে নিউ-ইয়র্কের নিকটবর্ত্তী হাইড পার্ক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জেমস রুজভেল্ট। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুজভেল্টের ভ্রাতা।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাস করিয়া তিনি কলম্বিয়া আইন-বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং তথায় তিন বৎসর আইন অধ্যয়ন করেন। আইন অধ্যয়ন শেষ হইলে ১৯০৭ সালে অর্থাৎ মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি নিউইয়র্কে আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। অবশেষে ১৯১০ সালে নিউইয়র্ক সিনেটের সভ্য নির্বাচিত হওয়ায় তিনি ওকালতি ছাড়িয়া দেন। কিন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া তিনি নৌ-বিভাগের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন এবং গত পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধে উ. পদেই অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ইউরোপের জল-ভাগে আমেরিকার নৌবল পরিদর্শনকার্যে ব্যাপৃত থাকার পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে রুজভেল্ট ইউরোপ হইতে আমেরিকান সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা করেন। ইহার এক বৎসর পরে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রেসিডেণ্টের পদপ্রার্থী হন এবং এই বিষয়ে ডেমোক্র্যাটিক দলের সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু রিপাব্লিকান দল ভোটাধিক্যে জয়-লাভ করায় রুজভেল্ট উক্ত পদে মনোনীত হইতে পারিলেন না।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা জলে সাঁতার দেওয়ায় তিনি ইনফেণ্টাইল প্যারালিসিস রোগে আক্রান্ত হন। ইহাতে তাঁহার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তিনি হাল ছাড়িলেন না। অতঃপর রুজভেল্ট চিকিৎসার জোরে আরোগ্য হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পা দুইটি একেবারে অকেজো হইয়া পড়িল। অবশেষে এগার বৎসরকাল এইরূপে জীবন যাপন করিবার পর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার হারান শক্তি ফিরিয়া পাইলেন। তখন হইতে তিনি রোজই ঘোড়ায় চড়িতেন এবং পূর্ণোদ্যমে সাঁতার কাটিতেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ অল স্মিথ রুজভেল্টকে নিউইয়র্কের গবর্ণর-পদপ্রার্থী হইবার নিমিত্ত প্ররোচিত করেন। তিনি উক্ত পদে মনোনীত হইলেন বটে, কিন্তু ১৯৩০ সালে সাধুতা ও কর্ম্মদক্ষতার জয়টিকা ললাটে পরিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

রুজভেল্ট ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে মিঃ অল স্মিথকে ৯৪৫—১৯০২ ভোটে পরাজিত করায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট-পদপ্রার্থী বলিয়া ডেমোক্র্যাটিক দলের সমর্থন লাভ করেন। এই সময় তিনি 'ভলষ্টেড অ্যাক্টে'র উচ্ছেদসাধন করিবেন এবং দেশের আর্থিক উন্নতিসাধন করিবেন বলিয়া দেশবাসীকে আশ্বাস দেন। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে মিঃ রুজভেল্টের সহিত মিঃ অল স্মিথের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। অবশেষে ঐ বৎসরেই নভেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিবার নিমিত্ত ভোট লইলে মিঃ রুজভেল্ট প্রতিদ্বন্দ্বী হুভার অপেক্ষা ৬,৫০০,০০ ভোট বেশী পাইলেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি শিল্পের উন্নতিসাধন এবং বেকার-সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত এক বিরাট্ পরিকল্পনা করেন। এই মাসেই যখন রুজভেল্ট মিয়ামি, ফ্লোরিডা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন জিনগারা নামক ইটা-লির একজন ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু রুজভেল্ট সে যাত্রা রক্ষা পান। জিনগারা অতঃপর হত্যা-প্রচেষ্টার অভিযোগে আশি বৎসরের জন্য কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

রুজভেল্ট ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে প্রেসি-ডেণ্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় অর্থনৈতিক সঙ্কট-কাল উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের সহযোগিতায় দৃঢ়হস্তে তাহা দমন করেন। তিনি কর্ম্মীদিগের মাহিনা কমাইয়া দিলেন এবং কার্যসময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ইহা লইয়া কংগ্রেসের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের মাহিনা কমাইতে রাজী হইলেন না। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের দাবি কিছুতেই মানিয়া লইলেন না। তিনি স্বীয় উদ্ভাবিত পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি ১৯৩৩ সালের মে মাস হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যাবলী লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইটালী ও আবিসিনিয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি যুধ্যমান জাতিদিগের নিকট সমরোপকরণ প্রেরণ একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। ১৯৩৬ সালের নবেম্বর মাসে পুনরায় প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিবার নিমিত্ত ভোট লইলে রুজভেল্ট ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণর ল্যাণ্ডন যথাক্রমে ২৫,৯৩৬,২৭৭ ও ১৫,৮৩৯,৬০৯ ভোট পান। সুতরাং রুজভেল্ট বিনাবাধায় পুনরায় দ্বিতীয় বারের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন।

ইহার পরবৎসর তাঁহার সহিত কংগ্রেসের বিবাদ বাধে এবং তাহাতে তিনি পরাজিত হন। ১৯৩৭ সালে তাঁহার পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক কার্যের সূত্রপাত হইল। পররাষ্ট্র ব্যাপারে তিনি ছিলেন শান্তির পক্ষপাতী। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় তিনি তাহাতে যোগদান করেন নাই। কিন্তু তিনি ইটালীকে আবিসিনিয়ার সহিত যুদ্ধ হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট যখন মিউনিক-সঙ্কট উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল তখন তিনি একটি আবেগ-পূর্ণ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "কানাডা আক্রান্ত হইলে যুক্তরাষ্ট্র চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।"

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য এক আবেদন করেন। সেই বৎসরেই এপ্রিল মাসে তিনি হিটলার ও মুসোলিনীর নিকট এক বার্ত্তা প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে দশ বৎসরের নিমিত্ত এক শান্তিপূর্ণ চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষ ইহাকে পররাষ্ট্রক্ষেত্রে অকারণ হস্তক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করেন।

বর্তমান মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসকে "Neutrality Act"-এর পরিবর্তন করিতে বলেন কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে যুদ্ধ ঘোষণার তিন সপ্তাহ পরে তিনি ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা

দেন এবং তাহাতে কংগ্রেসকে "Neutrality Act"-এর বহুবিধ পরিবর্তন সাধনে বাধ্য করেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই সময় ব্রিটেনকে বর্তমান যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সাহায্য করিবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ করেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি তৃতীয় বারের জন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এইবার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রিপাব্লিকান দলের সমর্থনপ্রাপ্ত মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি। রুজভেল্ট তাঁহাকে ২৭,২৪১,৯৩৯—২২,৩২৭,২২৬ ভোটে পরাজিত করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তিনি এক বক্তৃতায় প্রকাশ করেন যে, আমেরিকা ব্রিটেনকে খাদ্যদ্রব্য ও যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা যথাশক্তি সাহায্য করিবে।

এইজন্ম মার্চ মাসে "Lease-Lend Bill"-এর দ্বারা গ্রেট ব্রিটেন ও মিত্ররাজ্যসমূহকে নগদ অর্থ না দিয়াও আমেরিকা হইতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহার তিন মাস পরে মিঃ রুজভেল্ট ইংলণ্ডের জলপথগুলিকে শত্রুর অধিকার হইতে বাঁচাইবার নিমিত্ত আমেরিকান নৌবহর নিযুক্ত করেন। জার্মানগণ রাশিয়া আক্রমণ করিলে রুজভেল্ট রাশিয়াকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মিঃ রুজভেল্ট মিঃ চার্চিলের সহিত আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের বুকে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ আটলাণ্টিক চার্টার নামে খ্যাত।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপানীগণ অতর্কিতে পার্ল-হারবার আক্রমণ করে। ইহার পরদিনই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জাপ সম্রাটকে শান্তি স্থাপন করিবার নিমিত্ত আবেদন জানান। কিন্তু তাহার কোন উত্তর না পাইয়া তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন্-চীফ বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হন।

ইহার কিছুদিন বাদে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইনস্টন চার্চিল ওয়াশিংটনে আগমন করেন এবং কয়েকটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন, নেদারল্যাণ্ডস এবং অপর ২১টি অক্ষশক্তির বিরোধী রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ একত্র মিলিত হইয়া এক ঘোষণার দ্বারা প্রকাশ করেন যে তাঁহারা একযোগে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সিঙ্গাপুর ও মালয় প্রদেশ শত্রুর হস্তগত হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়া ভীষণ বিচলিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ ওয়াশিংটন নগরে এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করেন। ইহাতে অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস, রাশিয়া, গ্রেট বিটেন, ক্যানাডা, চীন ও আমেরিকার প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হন।

জুন মাসের শেষের দিকে মিঃ চার্চিল ওয়াশিংটনে পুনরাগমন করেন। এই সময় গ্রেট ব্রিটেন ও রাশিয়া কুড়ি বৎসরের জন্ত এক মিত্রতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে মলোটোভও ওয়াশিংটনে আসিয়া মিলিত হন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে মিঃ রুজভেল্ট মিঃ চার্চিলের সহিত মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত বিমানযোগে কাসাব্লাকায় আগমন করেন। উক্ত মন্ত্রণা দশ দিন ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। যে মাসে মিঃ চার্চিল পুনরায় ওয়াশিংটনে আগমন করিয়া মিঃ রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইহার পর পুনরায় আগষ্ট মাসে কুইবেকে আগমন করেন এবং চার্চিল ও রাশিয়া এবং চীনের প্রতিনিধিগণের সহিত মন্ত্রণা করেন। ইহা কুয়েবেক কন্‌ফারেন্স নামে খ্যাত। ইতিপূর্বে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর আর কোন মন্ত্রণাসভা মিত্রশক্তির ইতিহাসে আহূত হয় নাই। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে অটোয়া নগরে গমন করেন। তথায় ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ চার্চিল তাঁহার সহিত মিলিত হন। ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইটালীর আত্মসমর্পণ ঘোষিত হয়। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তেহারানে আগমন করেন এবং সেখানে চার্চিল ও মার্শাল ষ্টালিনের সহিত মিলিত হন। ইহাই তিনটি রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের প্রথম মিলন। ইহার ছয় মাস পরেই ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যবাহিনী পশ্চিম ইউরোপে অবতরণ করে।

তেহারানে যাইবার পথে রুজভেল্ট চার্চিল ও মার্শাল চিয়াং-কাই-শেকের সহিত কায়রোতে মন্ত্রণা করেন। এই সময় তিনি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইনেনুর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ইহার পর পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন লইয়া গোল বাধে। ডেমোক্র্যাটিক দলের সমর্থনপ্রাপ্ত তিন জন প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী ছিলেন। তাঁহারা হইলেন যথাক্রমে মিঃ রুজভেল্ট, সিনেটর বার্ড ও মিঃ জে. এ. ফারলে। কিন্তু অবশেষে রুজভেল্টই সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট লাভ করায় ডেমোক্র্যাটিক দল কর্তৃক প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী বলিয়া মনোনীত হন। রিপাব্লিকান দলের সমর্থনপ্রাপ্ত মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্‌কিও এই সময় প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী হইতে অস্বীকার করেন। এই বৎসরেই অক্টোবর মাসে মিঃ উইল্‌কি পরলোকগমন করেন। এখন বাকী রহিলেন মাত্র একজন প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী; ইনি নিউইয়র্কের গভর্ণর মিঃ টমাস ই. ডিউই। দেশবাসী অনেকেই ভাবিল যে, তিনিই এইবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন। কিন্তু মিঃ রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিঃ ডিউইকে ২৩,৪৩৭,২৭০—২০,৬২৮,৪৪৪ ভোটে পরাজিত করিয়া রেকর্ড স্থাপন করেন। ইতিপূর্বে আর কোন প্রেসিডেন্টই পর-পর চারি বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নাই।

১৯৪৪ সালে রুজভেল্টের শাসন-প্রণালীর মধ্যে কয়েকটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। তিনি রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের মধ্যস্থতা স্বীকার করেন। এই সময় বলিভিয়া প্রদেশে একটি নূতন গবর্ণমেন্ট স্থাপিত হয়। কিন্তু রুজভেল্ট তাহাকে মানিয়া লন নাই। স্পেনেও এই সময় তৈলপ্রেরণ স্থগিত করিয়া দেওয়া হয়। রুজভেল্ট ডি ভেলেরাকে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি ডি ভেলেরাকে ডাবলিন হইতে অক্ষ-শক্তির প্রতিনিধিগণকে অপসারিত করিবার জন্ত অনুরোধ করেন। এই সময় জেনারেল দ্য গলে ওয়াশিংটনে আগমন করেন।

বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে চার্চিল ও ষ্ট্যালিনের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করেন। ইহাই ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্স নামে খ্যাত। এই পরামর্শ-সভায় শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত এক প্রস্তাব গৃহীত

হয় এবং এপ্রিল মাসে সান ফ্রান্সিস্কোতে যুদ্ধোত্তর নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য এক সভা আহূত হইবে বলিয়া স্বীকৃত হয়।

আমেরিকায় ফিরিবার পথে তিনি পুনরায় মিশরে এক সভা আহ্বান করেন। এই সময় তিনি রাজা ফারুক ও ইবন সাউদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জানিতেন যে, যুদ্ধ হইল মানব মনের সুপ্ত দানবের পূর্ণ বিকাশ। তিনি শান্তিপ্রিয় নেতৃবৃন্দের ন্যায়, শান্তি কিরূপ মধুর এবং কাম্য তাহা মনে মনে উপলব্ধি করিতেন। "Let the nations live in peace", ইহা তাঁহারই উক্তি।

রুজভেল্টের ব্যক্তিগত জীবনও ছিল অসাধারণ। তিনি তাঁহার চারিটি পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। তিনি এক সময় বলিয়াছেন—

"There are four freedoms to be won. The freedom of speech; the freedom from hunger; the freedom of God's worship, the freedom from fear."

দেশবাসী সকলেই জানিতেন যে তিনি যাহা বলিতেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। তাঁহার উপর প্রজা-সাধারণের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে যতদিন পৃথিবীর ছোট-বড় সমগ্র জাতিগুলি শান্তি না পাইবে ততদিন আমেরিকাবাসীগণ প্রকৃত শান্তি ভোগ করিতে পারিবে না।

ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্ব হইতেই রুজভেল্ট শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ বাধিতেই তিনি জার্ম্মানীর রাজ্য-জয়ের অন্যতম প্রবল প্রতি-দ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশে আমে-রিকান সৈন্যগণ দেশের পর দেশ জয় করিয়া জার্ম্মানীর রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল।

তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রও ছিল অসাধারণ। তাঁহার মৃত্যুতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যথার্থই বলিয়াছেন—

"The man of destiny has passed from our midst. Not alone because of the pre-eminent authority and prestige of his great office, but chiefly for his own remarkable personality and character Mr. Roosevelt stood out above the most of his contemporaries and comrades."

তোমারে ভুলিতে হবে

শ্রীকরুণাময় বসু

তোমারে ভুলিতে হবে এই মোর আজন্ম সাধনা,
দিগন্তের পটভূমে জ্বলিতেছে নিঃসঙ্গ আকাশ;
মনের স্বপ্নের হাঁস শূন্যপথে করে আনাগোনা,
স্মৃতির জানালাপথে দেখা যায় দীর্ঘ অবকাশ।

তোমারে যে ভালোবাসি, তাই তোমা ছেড়ে চলে যাই,
তোমার প্রেমের মাঝে পৃথিবীর রূপ হেরিয়াছি;
মানুষের দেবতারে মোর প্রেমে প্রণাম জানাই,
তুমি নাই, তবু জানি চিরদিন রবো কাছাকাছি।

'ভালোবাসি' এই বাণী দূর হ'তে যায় দূরান্তরে,
চাঁদের ঘুমন্ত মুখে রেখে যায় আভার আভাস;
যে মানুষ ঘরছাড়া, দীপ জ্বালে তার শূন্য ঘরে,
সন্ধ্যার মালতী বনে ফেলে যায় উতলা নিশ্বাস।

ওগো প্রেম, তুমি পথ, সেই পথে বাঁধিব কি ঘর?
অগণ্য মানুষ দেখি সেই পথে করিয়াছে ভিড়;
সুবিশাল পটভূমি, ভূমিকায় রয়েছে স্বাক্ষর
তোমার আমার নাম; ভেঙে গেছে ছায়াঘেরা নীড়।

মনে মনে দেখিতেছি জীবনের আগামী অধ্যায়,
সর্পিল পথের রেখা মিশে গেছে ঝড়ের সন্ধ্যায়।

স্তূপ *

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

স্তূপ! ওগো স্মরণীয় স্তূপ!
বাণী কেন নাহি মুখে, কেন মৌন চুপ?
রহ কি সমাধিমগ্ন, হে মহাস্থবির!
আনি যত স্তবস্তুতি, একান্ত বধির—
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তাহে; ধ্যান শুধু ধ্যান!
স্তব্ধ লোকে লভিতেছ কোন সত্য জ্ঞান?
কার পুণ্য স্মৃতি-চিহ্ন যুগ যুগ ধরি'
ধরিয়া রেখেছ নিজ উচ্চ শিরোপরি?

উষা আসি নিবেদন করিল তোমায়,
'রহ রহ, তিষ্ঠ, রহ'; ক্ষয় নাহি পায়
এ মহা প্রতীক; ভিজি শিশিরের জলে
স্নিগ্ধ রয়, নাহি যায় খর তাপে জ্ব'লে।
সন্ধ্যায় মন্থর দিক, শান্তি কূলে কূলে;
প্রদীপ জ্বালায়ে দিল স্তূপপাদমূলে।
ধ্বনিল দিগন্তে, এই সেই পুণ্য স্থান
বিশ্বযোগে মানবের মহা পরিত্রাণ
বিরাট্ মানব ঘোষে বাহু প্রসারিয়া,
নির্ব্বাণের অনির্ব্বাণ বাণী উচ্চারিয়া।

* সারনাথে বৌদ্ধস্তূপ দর্শনে।

পুস্তক-পরিচয়

রাজকৃষ্ণ রায়—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৫০। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

রাজকৃষ্ণ রায়ের মত নাট্যকার ও কবি-সাহিত্যিকের কথা আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। সে যুগের এই খ্যাতনামা লেখকের শক্তির অজস্রতায় বিস্মিত হইতে হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। মাত্র ৪৪ বৎসর ব্যাপী জীবনের মধ্যে তিনি শতাধিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার-রূপে নাম নাই তাঁহার-লেখা এমন অনেক গ্রন্থও আছে। "তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল; গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, গল্পে, অনুবাদে, উপন্যাসে তাঁহার সমান হাত ছিল।" তখনকার দিনে নাট্যকার হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও সু-অভিনেতা ছিলেন। 'বীণা' রঙ্গভূমির তিনি প্রতিষ্ঠাতা। 'সমাজ-দর্পণ', 'বীণা', 'গল্পকল্পতরু' প্রভৃতি সাময়িক-পত্র তিনি পরিচালনা করেন। রাজকৃষ্ণ রায় বাল্মীকির রামায়ণ এবং বেদব্যাসের মহাভারতের পদ্যানুবাদ করেন। একখানি পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কবিকে লিখিয়াছিলেন, "অনুবাদ সকলের বোধগম্য অথচ সকলের পক্ষে মনোহর হইতেছে।" তাঁহার জাতীয়তামূলক কবিতাগুলি আজও পাঠক উপভোগ করিতে পারিবে। "ভূতলে বাঙালী অধম জাতি" তাঁহারই রচনা। রাজকৃষ্ণ রায়ের কতকগুলি কবিতা ও গান এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

জাতিস্মর—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। রমেশ ঘোষাল, ৩৫ বাদুড় বাগান রো। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য দুই টাকা।

বইখানিতে তিনটি গল্প আছে। প্রথম যখন "জাতিস্মর" প্রকাশিত হয় এই শক্তিশালী লেখকের গল্প বলিবার নূতন ভঙ্গী ও পদ্ধতি পাঠকের মনকে চমৎকৃত করিয়াছিল। আজও বইখানি তেমনি আনন্দ দান করে। নানারূপ মতামতের মাঝখানে পড়িয়া ছোটগল্প যেন আজ নিজত্ব হারাইতে বসিয়াছে। বাস্তব হোক, রোমান্টিক হোক, গল্প যখন গল্প হইয়া উঠে তখনই তাহা সার্থক হয়, নহিলে নয়। "রুমাহরণ" আদিম যুগের গল্প; লেখক ভূমিকায় বলিতেছেন, "এই গল্পে মানব-সভ্যতার গোড়ার কথাটা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।" 'অমিতাভ' গল্পটি অজাতশত্রুর আমলে পাটলিপুত্র-নগরী-প্রতিষ্ঠার কল্পনা-রঙীন আখ্যায়িকা। ঐ প্রাচীন নগরীর এক অধঃপতনের দিনের কাহিনী "মৃৎপ্রদীপে" রূপায়িত হইয়াছে। লেখকের প্রাচীন অতীতের আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে।

কায়কল্প—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু-চিত্রিত। ৩৫, বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

পুস্তকখানি এগারটি ছোটগল্পের সমষ্টি। বিভূতিভূষণের গল্পগুলি স্নিগ্ধ হাস্যকৌতুকের নির্ঝর। শুধু হাস্যরস পরিবেশন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকেন না, গল্পের ঘটনার সঙ্গে গল্পান্তর্গত চরিত্রগুলিও উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠে। প্রথম গল্পের নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। আবির্ভাব মাত্রেই এ গল্পের ঠানদিদি আমাদের মনকে জয় করিয়া লয়। শিশু-চরিত্রের বিশেষজ্ঞ বিভূতিভূষণ 'কালস্য গতিঃ' গল্পে 'খোকাকে

আঁকিয়াছেন। একটি পুরাতন প্রচলিত গল্পকে কেমন করিয়া নূতন রূপ দিয়া উপভোগ্য করিয়া তুলিতে হয়, গ্রন্থকার 'কালিকা' গল্পে তাহা দেখাইয়াছেন। গেছো মেয়ে রাধারাণীর সাহস সকল পাঠকের মনোহরণ করিবে। 'দাদুর সমস্যা'য় আজিকার দিনের পূর্ব্বরাগ-অনুরাগ-ঘটিত সমস্যাটির একটি সরস সমাধান আছে। 'কায়কল্পে'র গল্পগুলি এবং গল্পের সহিত ছবিগুলি পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

গল্পের মত—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

'গঙ্গার ইলিশ', 'পূজা সংখ্যা' নামক দুইটি সরস গল্প, 'দ্বিতীয় পক্ষ,' 'উ'টা-সাড়ি', 'আরোগ্য-স্নান' নামক তিনটি মনস্তত্ত্ব-মূলক গল্প—'মাধবী মাসী'র চিত্র—এবং গল্পের মত—তথা গল্প হইতেও অধিকতর চিত্তাকর্ষক 'কীটাণুতত্ত্ব' ও 'ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথ'—নামক দুইটি নিবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। লেখক বাংলায় নাটক, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহার সেই সুনাম বর্দ্ধিত করিবে। 'কীটাণুতত্ত্বে'র মত রচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

লেখকের ভাষা সরস ও সাবলীল। কিন্তু এরূপ মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা শুনিতে শুনিতে যখন হঠাৎ কানে আসে—'পুছিল' বা 'পুছিয়াছি' তখন মনে হয় সঙ্গীতের আসরে উচ্চাঙ্গের সুরশিল্পীর কোথায় যেন তাল কাটিয়া গেল।

শ্রীতারাপদ রাহা

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত—প্রথম খণ্ড। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত। সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা(২)। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত গ্রন্থগুলির সহিত পরিচিত হওয়ার ও তাহাদের রস গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা অনেক শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে বর্ত্তমান থাকিলেও বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া তাহা পূরণ করিবার উপায় বিরল। বিশ্বভারতী সেই অভাব দূর করিতে প্রয়াসী হইয়া বাঙালী পাঠক-সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কালিদাসের মেঘদূতের অনুবাদের দ্বারা তাঁহারা এই শুভ প্রচেষ্টার উদ্বোধন করিয়াছেন। কালিদাসেরও পূর্ববর্তী এবং আদর্শ বলিয়া অনুমিত অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত নামক প্রসিদ্ধ কাব্যের প্রথম সাত সর্গের অনুবাদ আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয় ইতঃপূর্বেই অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ নামক আর একখানি কাব্যের অনুবাদ করিয়া অশ্বঘোষের সহিত বাঙালী পাঠকের পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের সাহায্যে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কাজলী—শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়। ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বাংলা কথা-সাহিত্যে গৃহপালিত প্রাণীরা খুব বেশী পরিচিত নহে, যদিও সংসার-যাত্রার বহু ঘটনার সঙ্গে তাহারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুখের বিষয়, লেখক এমনই একটি প্রাণীকে গল্পের উপাদান হিসাবে লইয়াছেন। গাভীটির নাম কাজলী; বিনু নামক একটি ছোট ছেলের

সে খেলার সাথী। এই গাভী ও ছেলেটির সৌহার্দ্যকে আশ্রয় করিয়া নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখ-ভরা ছবি গল্পটির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গল্পটি করুণ বলিয়াই মনকে বেশ একটু গভীর ভাবেই নাড়া দেয়।

মরুতৃষ্ণা—শ্রীপুষ্পলতা দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল লেখিকার গল্প বলিবার একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে। সেই ভঙ্গী উপন্যাসটির পরিচ্ছেদ হইতে পরিচ্ছেদান্তরে কৌতূহলাক্রান্ত পাঠককে অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ-ঘেঁষা একটি পরিবারের আবহাওয়ায় উচ্চাভিলাষিণী একটি পল্লীমেয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভালবাসার কাহিনী নিপুণ ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। সামাজিক রীতি-নীতির মধ্য দিয়া কতকগুলি চরিত্র—যেমন রত্না, অমলা, অনিল, মিসেস গোস্বামী সুচিত্রিত। আদর্শবাদের দিক দিয়া অমিয়ও উপভোগ্য। তবে বই শেষ হইলে পাঠকের মনে এই প্রশ্ন জাগা বিচিত্র নহে যে, রক্ষণশীল সমাজের শুচিতা রক্ষার জন্যই চরম ত্যাগের মধ্য দিয়া করুণ-রসাশ্রিত কাহিনীটি এই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভুখাহুঁ—শ্রীঅশোক সেন। ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১৩৪, মূল্য—২৷৹।

উপন্যাস। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে দুর্দশা ঘটিয়াছে লতিকা তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল নহে। মন্বন্তরকে উপলক্ষ্য করিয়া অতি আধুনিকা নায়িকার ভূমিকা মাত্র সে লইয়াছে। প্রতারণার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় এবং সেই অর্থে চিত্র-তারকার পদে উন্নীত হওয়ার সৌভাগ্য-লাভ বিপ্লবের সুস্থ রূপ নহে। লতিকার যে পরিণাম লেখক আঁকিয়াছেন তাহা বহুব্যবহৃত ও কষ্টকল্পনাপ্রসূত। পঞ্চাশের মন্বন্তর বা নায়িকার দুর্ভাগ্য কোনটাই করুণ রসকে তেমন জমাইতে পারে নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অর্থনৈতিক পরিভাষা: শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। শিল্পসম্পদ প্রকাশনী, ২, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২০, মূল্য ।৵০

ইহাতে ৭৫১টী পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে বি-কম পরীক্ষার আট বৎসরের (১৯৩৭-৪৪) প্রশ্নোত্তর আছে। বাংলা ভাষায় আরও দুই একখানি এই রকমের পুস্তিকা আছে, কিন্তু এই সংগ্রহগুলির মধ্যে পরস্পরের কিছু কিছু অমিল থাকার দরুন এবং কোন কোন শব্দ বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত হয় বলিয়া পাঠকমহলে অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি পরিভাষা চালু করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সম্পাদকগণ পরিভাষা সংগ্রহ ও সংগঠন করিলে তাহাতে লেখক, পাঠক ও ছাত্রমণ্ডল সকলেরই সুবিধা হইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

রাশিয়ার রাজদূত—লেখক জুলে ভার্নে। অনুবাদক—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী। সরস্বতী লাইব্রেরী—সি ১৮।১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

ভিক্টর হুগো ও আলেকজাণ্ডার ডুমার সগোত্র ফরাসী কথাসাহিত্যিক জুলে ভার্ণের মাইকেল ষ্ট্রগফ বিশ্বসাহিত্যে অমর অবদান। প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরেই উপন্যাসটি নাটকাকারে এবং ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত হয় এবং তখন হইতেই অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। উনিশটি ভাষায় অনূদিত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের

পাঠক-সম্প্রদায়ের সাহিত্যরসপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়া আসিতেছে। চীনা এবং জাপানী ভাষায়ও ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সাইবেরিয়ার বিপৎসঙ্কুল দুরধিগম্য তুষার-ভূমির উপর দিয়া রাশিয়ার রাজদূত মাইকেল ষ্ট্রগফের রোমাঞ্চকর অভিযান এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কাহিনীর চমৎকারিত্বে, চরিত্র-সৃষ্টির সার্থকতায়, নিসর্গচিত্রণনৈপুণ্যে এবং ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদির সরস বর্ণনায় উপন্যাসটি এমনি উপভোগ্য যে পড়িতে আরম্ভ করিলে এক নিঃশ্বাসে শেষ না করিয়া পারা যায় না। শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী বিশ্ব-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ আহরণ করিয়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের হাত নিপুণ, ভাষা সাবলীল স্বচ্ছন্দগতি এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট। বিদেশী নামগুলিই শুধু মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দেয় যে ইহা মৌলিক সৃষ্টি নহে। বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে রাশিয়ার রাজদূত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

বাংলার ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও ঘোষদস্তিদার বংশ—শ্রীদক্ষিণাচরণ ঘোষদস্তিদার। ৫৭।১ বি, হরিশমুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

বহুদিন আগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। বাস্তবিকই আমরা আমাদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সম্যক সচেতন নই, এমন কি পিতৃপুরুষের নাম-ধাম এবং কৃতির কথা পর্য্যন্ত ভুলিতে বসিয়াছি। সপ্ততিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ ঘোষদস্তিদার মহাশয় পুরানো কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পুস্তকখানিতে তাঁহার প্রচুর অধ্যয়ন এবং তথ্যসমাহরণনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কায়স্থ জাতি সম্বন্ধেই ইহাতে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কায়স্থ সমাজের লেখক লেখিকা সাধু গুরু ইত্যাদির বিবরণ খুবই চিত্তাকর্ষক। বাংলাদেশে বরিশালের অন্তঃপাতী গাভার ঘোষদস্তিদার বংশ আভিজাত্যের জন্য বিখ্যাত। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপের বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। জাতিতত্ত্ব (Ethnology) সম্বন্ধে গবেষক এবং সাধারণ পাঠক উভয়েই ইহা পাঠে আনন্দলাভ করিবেন এবং উপকৃত হইবেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বেদান্তদর্শন—শ্রীরমাচৌধুরী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

এই পুস্তিকাতে আচার্য্য শঙ্কর রামানুজ এবং নিম্বার্কের ভাষ্য অনুসারে বেদান্তদর্শনের তত্ত্বসকল বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা অনায়াসে বেদান্তশাস্ত্রের পরিচয় পাইতে চান তাঁহারা এ পুস্তিকা পাঠে তৃপ্তিলাভ করিবেন। এত সংক্ষেপে অথচ এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বেদান্তের দুরূহ তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা করা শাস্ত্রের পারদৃশ্বা ভিন্ন অপরের পক্ষে সম্ভব নহে। বিশ্বভারতী এই পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উপকারসাধন ও বেদান্তশাস্ত্র প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন।

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (তৃতীয়ভাগ)—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। স্বামী আত্মবোধানন্দ কর্ত্তৃক উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, মূল্য পাঁচ টাকা।

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলীর এই শেষভাগে বৃহদারণ্যক প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতেও পূর্ব্ববৎ মূল, অনুবাদ অন্বয় ও শঙ্করভাষ্য অনুসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকাতে স্বামীজি মধুকাণ্ড, মুনিকাণ্ড এবং খিলকাণ্ডের বিষয়বস্তুর এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনাতে সমগ্রভাবে বৃহদারণ্যকের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইবে। উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যকের যে স্থান উপনিষদ্ভাষ্যের মধ্যে বৃহদারণ্যক ভাষ্যেরও তাহাই। যাঁহারা এই ভাষ্য অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পান না তাঁহারা স্বামীজীর টীকা পাঠ করিলেও ভাষ্যের মর্ম্ম সংক্ষেপে জানিতে পারিবেন।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

প্রস্তাবিত হিন্দু আইন

শ্রীরমা চৌধুরী

রাও কমিটি প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সংস্কার লইয়া বহু বাগ্‌-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। যত দূর জানা যাইতেছে, হিন্দু, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দু পুরুষদের অনেকেই, এবং মহিলাদের মধ্যেও কেহ কেহ এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মত দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, হিন্দু জনসাধারণ সত্যই এই প্রস্তাবিত সংস্কারের আমূল বিরোধী নহে। যে মূল তত্ত্বের উপর এই প্রস্তাবিত আইন প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ হিন্দুনারীর সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতি ও নরনারীর সমান অধিকার, তাহাতে তাহাদের আপত্তি থাকিতে পারে না, কোনও কোনও বিশেষ আইনের নির্দ্দেশাবলী সর্ব্বসম্মত না হইতে পারে মাত্র। যাহা হউক, এইরূপ আশা করা অন্যায় যে, দেশের আইন, প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কার ও পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই সর্ব্বজনসম্মত হইবে। কোন দেশেই তাহা হয় না। আমাদের দেশেও সতীদাহের ন্যায় পৈশাচিক প্রথা রদ এবং বিধবা বিবাহের ন্যায় অত্যাবশ্যক প্রথা প্রবর্ত্তনও প্রবল জনমতের বিরুদ্ধেই সংঘটিত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য সমাজ ধ্বংসীভূত হওয়া দূরে থাকুক, ইহার অশেষ কল্যাণই সাধিত হইয়াছে। যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ ও সমাজ-সংস্কারকগণ সাধারণ মানব অপেক্ষা সুদূরদর্শী; এবং সমাজের উন্নতির জন্য তাঁহারা কালোপযোগী যে-সকল বিধান দিয়া থাকেন, তাহা বর্ত্তমানে না হইলেও ভবিষ্যতে জনসাধারণ দ্বারা সমর্থিত এবং তাহাদের কল্যাণের কারণ হয়। ন্যায়, ধর্ম্ম ও বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। তবে সুখের বিষয় এই যে, সতীদাহপ্রথা নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রচেষ্টাকালে যেরূপ প্রবল বিরুদ্ধ আন্দোলন হইয়াছিল, বর্ত্তমান সংস্কার সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। বহু শিক্ষিত পুরুষ ও নারী ইহা বিশেষভাবে সমর্থনও করিতেছেন।

প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের বিরুদ্ধে দুইটি প্রধান আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ, ইহা সর্ব্ববিষয়ে সমাজের অনিষ্টকারক। (১) প্রথম আপত্তিটি সম্পূর্ণ যুক্তিশূন্য।। 'হিন্দুশাস্ত্র' বলিতে আমরা প্রথমতঃ 'বেদই' বুঝিয়া থাকি। বেদোপদিষ্ট তথ্যের প্রপঞ্চনা এবং বৈদিক মতানুসারী বিধিবিধান ব্যবস্থা করে বলিয়া 'স্মৃতি'ও শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হয়। প্রথমতঃ, বেদের কথাই ধরা যাউক। প্রস্তাবিত হিন্দু আইনে নারীদের উন্নতির জন্য যে-সকল বিধান দেওয়া হইয়াছে। তাহা বৈদিক বিধানের বিরোধী ত নহেই, উপরন্তু সে-সকল হইতে বহুলাংশে নিকৃষ্ট ও কঠোরতর। বৈদিক যুগে নারীগণ যেরূপ সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইন সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন, প্রস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ হইলেও বর্ত্তমান হিন্দু নারীগণ তাহা সম্পূর্ণ পাইবেন না। সকলেই জানেন যে, বৈদিক যুগে নরনারীর সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার ছিল। কন্যা পুত্রের ন্যায়ই আকাঙ্ক্ষিত ছিল, এবং কন্যালাভের জন্যও মাতাপিতা 'পুংসবন' ব্রত করিতেন। কন্যা পুত্রেরই ন্যায় সমান যত্নে লালিতপালিত হইত, শিক্ষা লাভ করিত, উপনয়ন ও শাস্ত্রপাঠে অধিকারী ছিল, এবং সকল বিষয়েই তাহার সমান দাবি ছিল। বাল্যবিবাহ সমাজে অজ্ঞাত ছিল, এবং বিবাহই নারীজীবনের একমাত্র অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলিয়া পরিগণিত হইত না। রুচি ও মতভেদে নারী আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া "ব্রহ্মবাদিনী" অথবা "আচার্য্যা" হইতে পারিতেন। বিবাহের সময়ে তিনি নিজেই নিজের 'বর' মনোনীত করিতে পারিতেন এবং প্রয়োজন হইলে পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীতই বিবাহিতা হইতে পারিতেন। বিবাহিতা নারী প্রকৃতই স্বামীর ধর্ম্মপত্নী ছিলেন এবং সামাজিক সকল বিষয়েই সমান অধিকার দাবি করিতেন। পত্নীর সাহায্য ব্যতীত পতি যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্মকার্য্যে ব্রতী হইতে পারিতেন না। সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু নর ও নারী উভয়েরই তাহাতে সমান অধিকার ছিল, অর্থাৎ যেরূপ পুরুষ বহু পত্নী গ্রহণ করিতে পারিতেন, সেরূপ নারীরও বহু স্বামীতে অধিকার ছিল। পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার বিষয়ে অবশ্য মতভেদ ছিল। এই সম্বন্ধে যাস্ক (নিরুক্ত ৩-৪) তিনটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন: (ক) পুত্র ও কন্যার সমান অধিকার, (খ) কেবল পুত্রেরই অধিকার, (গ) পুত্রের অভাবে বা অবর্ত্তমানে কন্যার পূর্ণ অধিকার। প্রথম ও তৃতীয় মত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কন্যার সম্পত্তিতে অধিকার সর্ব্বজনসম্মত না হইলেও সাধারণতঃ স্বীকৃত হইত। বৈদিক যুগে নারীর অবস্থার কথা কিঞ্চিৎমাত্র আলোচনা করিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত হিন্দু আইন বেদবিরুদ্ধ নহে। এইরূপ ভূরি ভূরি স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যে কোন্ যুক্তি অনুসারে কোনও কোনও পণ্ডিত ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন তাহা বুদ্ধির অগম্য।

বৈদিক যুগের পরে স্মৃতি যুগের প্রারম্ভ। এই সময় হইতেই বৈদিক সুবর্ণ যুগের অবসান হইয়া সমাজে ভাঙন ধরিতে আরম্ভ করে এবং নারীজাতিও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বেকার গৌরবময় অবস্থা ও সমান অধিকার হইতে বিচ্যুত হয়। সামাজিক আইনকানুনেও এই অবনতির ছাপ পড়ে। যদিও স্মার্ত্ত সমাজপতিগণ সজোরে প্রচার করেন যে তাঁহাদের বিধিবিধান বেদানুমোদিত তথাপি কার্য্যতঃ তাঁহারা বহুস্থলেই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মান রক্ষা করেন নাই। বহুস্থলেই তাঁহারা বৈদিক মন্ত্রের যথেচ্ছ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করিয়া নারীর পূর্ব্বতন সকল ন্যায্য অধিকার অত্যন্ত অন্যায় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ ভাবে হরণ করিলেন। দু'এক স্থলে তাঁহারা স্বীয় মন্দ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৈদিক মন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধনে পর্য্যন্ত প্রয়াসী হন। যথা স্মার্ত্ত রঘুনন্দন সতীদাহ প্রথা যে বেদসম্মত তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রকৃত বৈদিক পাঠ "আরোহন্ত জনয়ো যোনিম্ অগ্রে" স্থলে আরোহন্ত জনয়ো: যোনিম্ অগ্নেঃ" এই পাঠই প্রকৃত পাঠ বলিয়া প্রচার করিলেন। এই বাক্যটির প্রকৃত অর্থ—(শ্মশান হইতে) নারীরা অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু রঘুনন্দন "অগ্রে" স্থলে অগ্নেঃ পাঠ গ্রহণ করিয়া এই অর্থ করিলেন যে বিধবা নারীকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। এইরূপে, সতীদাহ কস্মিন্‌কালেও বেদ

সমর্থিত না হইলেও ইহাকে বেদোপদিষ্ট বলিয়া সমাজে প্রচলন করা হইল। "য়" এর স্থলে "ন"—এই সামান্য একটি অক্ষরের পরিবর্ত্তন দ্বারা শত শত বৎসর ধরিয়া সমাজের বুকে ধর্মের নামে যে অতি বীভৎস, পৈশাচিক, নিষ্ঠুরতম নারীহত্যাকাণ্ড সাধিত হইল তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। হিন্দু সমাজের ইতিহাস হইতে এই দুরপনেয় কলঙ্ক মুছিবার নহে। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অতি জঘন্য অমানুষিক প্রথার উচ্ছেদের জন্যও তৎকালীন সমাজ-সংস্কারকগণকে অতি প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, সুখের বিষয় এই যে, নারীজাতির এই ঘোরতর দুর্গতির দিনেও কতিপয় উদারহৃদয় স্মার্ত্ত সমাজপতি নারীর সম্পত্তিতে অধিকার, বিধবা বিবাহ, অবস্থাবিশেষে স্বামিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে ন্যায্য বিধিবিধানের ব্যবস্থা করেন। স্থানাভাবে সে সকল উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। যথা, পরাশর স্মৃতিতে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে যে, স্বামী নষ্ট বা মৃত হইলে, স্ত্রী পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব বা স্বধর্মত্যাগী হইলে নারী পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী। সুতরাং বিধবা বিবাহ, স্বামিত্যাগ প্রভৃতি যে একেবারেই স্মৃতি-অনুমোদিত নহে, ইহা ভ্রম। বস্তুতঃ নারীর অধিকারের দিক্ হইতে স্মৃতি দ্বিবিধ—নারীর অধিকার বিরোধী ও নারীর অধিকার অনুমোদক। পূর্ব্বশ্রেণীর স্মৃতিসমুদয় প্রকৃতপক্ষে বেদ-বিরুদ্ধ, কারণ বেদ যে নরনারীর সমান অধিকার প্রপঞ্চনা করেন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্মৃতিই কেবল বেদ সম্মত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম বেদসম্মত স্মৃতি উপেক্ষা করিয়া বেদবিরুদ্ধ স্মৃতিই সাদরে বরণ পূর্ব্বক অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহার কোনই ন্যায্য কারণ নাই। শরৎচন্দ্রের ভাষায়, এস্থলে পছন্দ করি না এইটাই আসল কারণ। বাস্তবিক কোন শাস্ত্রই পুরুষে অধিক দিন মানিয়া চলে না যদি না তাহা তাহাদের আন্তরিক অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিশ খায়। পুরুষের এই অখণ্ড স্বার্থপরতা হইতে মুক্তিলাভের দিন আজ নারীর আসিয়াছে। যাহা হউক, প্রস্তাবিত হিন্দু আইন যে বেদবিরুদ্ধ ও সকল স্মৃতিবিরুদ্ধ, এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

(২) উক্ত আইন যে কোনোক্রমেই সমাজধ্বংসকারী নহে তাহা অতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ, বহুবিবাহের কথা আলোচনীয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য যে, আধ্যাত্মিক দিক হইতে একপত্নীত্বই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। সকল ধর্ম্মেই একনিষ্ঠতার স্থান অতি উচ্চে। বৈদিক যুগে বহুপত্নীত্ব অনুমোদিত হইলেও, স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে একপত্নীত্বই সমধিক কাম্য ও ন্যায্য বলিয়া পরিগণিত হইত। বস্তুতঃ ইহাই ছিল সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ—মানবের দৈহিক বাসনা কামনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই কেবল বহুপত্নীত্বের বিধান হইয়াছিল, কোনোরূপ আধ্যাত্মিক মূল্য ইহার ছিল না। ইহা প্রথমা স্ত্রী ও অন্যান্য স্ত্রীর আধ্যাত্মিক পদমর্য্যাদা তুলনা করিলেই স্পষ্ট হইবে। কেবল প্রথমা স্ত্রীই ছিলেন "পত্নী" অর্থাৎ যজ্ঞসহকারিণী, প্রকৃত সহ-ধর্ম্মিণী। অন্যান্য স্ত্রী ছিলেন মাত্র "ভোগিনী" অর্থাৎ বিলাস-সঙ্গিনী, যজ্ঞাদি ধর্ম্মাচারে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার ছিল না। ন্যায়বিচার ও নীতির দিক হইতেও পুরুষের বহুপত্নীত্ব সম্পূর্ণ অন্যায্য। পুরুষের যদি একত্রে বহুপত্নী গ্রহণে বাধা না থাকে, তাহা হইলে নারীরও একত্রে বহু স্বামী গ্রহণে আপত্তি চলে না (যেরূপ বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল); অথবা নারীর বহুস্বামী গ্রহণে বাধা থাকিলে পুরুষেরও তদ্রূপ বাধা থাকা উচিত (যেরূপ পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত আছে)। বলা বাহুল্য যে, এই শেষের বিধানটিই গ্রহণযোগ্য, প্রথমটি নহে। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমানে এক স্ত্রী জীবিত থাকিতেও অকারণে শত স্ত্রী গ্রহণে পুরুষের বাধা নাই, অথচ বালিকা স্ত্রীরও বিধবা বিবাহ সমাজে নিন্দিত ও অপ্রচলিত। শরৎচন্দ্রের ভাষায়, "এই ব্যবস্থা এ দেশের সমস্ত নারী জাতিকে যে কত হীন, কত অগৌরবের স্থানে টানিয়া আনিয়াছে, সে কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না।" অর্থনৈতিক দিক হইতে বহু স্ত্রী ও তাহাদের অসংখ্য সন্তান প্রতিপালন বর্ত্তমান যুগে সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে; এবং প্রধানতঃ এই কারণ বশতঃই বহুবিবাহ সমাজের নিম্নস্তর হইতে পর্য্যন্ত প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। আইনের দিক হইতে অশান্তি, কলহ, মামলা মোকদ্দমা ও সম্পত্তিবিভাগ বহুবিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল। কন্যা সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইলে মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি অতি বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া যাঁহারা সম্প্রতি অতীব চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের এই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি। দয়া-ধর্ম্মের দিক হইতে বহুবিবাহ যে কত শত শত নারীকে জ্বলন্ত তুষানলে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কোথায়? কুলীনপ্রথার বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার কথা সকলেই জানেন। পরিশেষে রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে যে আপত্তি একপত্নীত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপিত করা হইয়াছে তাহা সত্যই অতি অপূর্ব্ব! আশ্চর্য্য যে, কলিকাতায় রাও কমিটির সম্মুখে কোন কোন শিক্ষিত বাঙালীই এই অতি জঘন্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের মতে মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলে, কিন্তু হিন্দু সমাজে ইহা আইনতঃ নিষিদ্ধ হইলে, মুসলমানগণ হিন্দুগণ অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এবং রাজনৈতিক দিক হইতে হিন্দুর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে। এই অতি উৎসাহী দেশপ্রেমিকগণের হিন্দু সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ধর্ম্ম, নীতি, ন্যায় ও দয়াধর্ম্ম সমস্তই বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এই যে মহতী প্রচেষ্টা, তাহা আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন প্রত্যেক নারীই ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিবেন। যাঁহারা এই বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে পর্য্যন্ত নারীকে একমাত্র সন্তানলাভের যন্ত্রস্বরূপই মূল্য দেন, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করা পর্য্যন্ত বৃথা। আইন হউক, আর না হউক, বর্ত্তমানে বহু বিবাহ সমাজ হইতে কার্য্যতঃ লোপ পাইয়াছে। অতএব এই সকল স্বদেশপ্রেমিক বহুবিবাহ প্রচার ব্রতে ব্রতী হন না কেন? যাহা হউক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায়বিচার বা দয়াধর্ম্ম—কোন দিক হইতেই একপত্নীত্ব দোষাবহ নহে, উপরন্তু প্রভূত কল্যাণকর।

কেহ কেহ বলেন যে, সমাজ হইতে বহুবিবাহ প্রায় লোপ পাইয়াছে, সুতরাং আইনের আর প্রয়োজন কি? প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। যে অল্পসংখ্যক বহুবিবাহ হইয়া থাকে, তাহারও আইন দ্বারা নিষেধ আবশ্যক। জনমত গঠন অত্যাবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্ব্যতীত আইনের প্রয়োজন অস্বীকারও অসম্ভব। প্রলোভন নিবারণ ও পাপের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য

আইনের সাহায্য গ্রহণ অনিবার্য্য। কোন পাপ ক্রমশঃ দূরীভূত হইলেই যে তৎসম্বন্ধীয় আইন রদ করা প্রয়োজন, এরূপ কেহই মনে করে না। বহুবিবাহ আইনতঃ রদ হইলে নারীর সামাজিক অবস্থা বহুগুণে উন্নত হইবে, এবং নারীর প্রতি অত্যাচারও বহুলাংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। এ স্থলে কেহ কেহ একপত্নীকত্বের সর্ব্বাঙ্গীন ন্যায্যতা স্বীকার করিলেও, ইহাকে আইনতঃ বিধিবদ্ধ করিতে আপত্তি করেন। এই আপত্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর। যদি একপত্নীকত্বের ন্যায্যতা স্বীকৃতই হয়, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল আইন হইলে হানি কি? আইন হইলেই যে তাহা অহিন্দু, অশাস্ত্রীয়, অধার্ম্মিক ও অন্যায্য হইয়া গেল, এই যুক্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কার্য্যতঃ একপত্নীকত্ব যদি অন্য সমাজের ধ্বংসের কারণ না হয়, তাহা হইলে আইনতঃ বিধিবদ্ধ একপত্নীকত্ব কিরূপে হঠাৎ কল্য সমাজ-ধ্বংসকারী হইয়া উঠিবে তাহা বুদ্ধির অগম্য।

স্থলবিশেষে স্বামী বা পত্নী ত্যাগ (divorce) সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু-একটি কথা আলোচ্য। বিবাহবন্ধনচ্ছেদ অবশ্য সুখের বিষয় অথবা কাম্য নহে; কিন্তু ইহা একবিবাহ আইনের অনিবার্য্য অঙ্গ। সারাজীবন একই স্বামী বা স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে হইলে কয়েকটি অপ্রতিকার্য্য অবস্থায়, প্রতিকারের একমাত্র ব্যবস্থাস্বরূপ বিবাহবিচ্ছেদকে অনুমোদন করা ব্যতীত আর উপায় নাই। বর্ত্তমানে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক পুরুষের একপত্নীকত্বের চিন্তা মাত্রেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন! "হায়, হায়, যদি সে স্ত্রী বন্ধ্যা, অসতী বা রুগ্না হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষপ্রবরের সারাজীবনের উপায় কি?"—এই তাঁহাদের যুক্তি। কিন্তু সেই একই দোষে দুষ্ট স্বামীর সহিত স্ত্রী কি করিয়া সারাজীবন কাটাইতেছেন, সে সম্বন্ধে চিন্তার হিন্দুপুরুষের প্রয়োজন নাই! বর্ত্তমানে হিন্দুপুরুষ অনায়াসেই বিবাহবিচ্ছেদ না করিয়াই বিনাদোষে পত্নীত্যাগ ও শত পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু অভাগা হিন্দু নারীর কোন পথই খোলা নাই। এই অন্যায়ের প্রতিকার অত্যাবশ্যক। বিবাহবিচ্ছেদ আইন হইলেই যে হিন্দুনারীগণ অকারণে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্‌গ্রীব হইবেন, এরূপ মনে করা ভুল। ব্রাহ্ম, মুসলমান ও খ্রীস্টান মহিলাগণ এই সুযোগ পাইলেও অতি অল্পক্ষেত্রেই, উপায়ান্তরবিহীনা হইয়াই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন। প্রস্তাবিত বিবাহবিচ্ছেদ আইন অত্যন্ত সুকঠোর সর্ত্তবদ্ধ—অতি অল্পক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। এই সর্ত্তসমূহ প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোর বলিয়াই বোধ হয়, এবং তজ্জন্য এই আইনের অন্যায় ও অকারণ প্রয়োগ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিবাহবিচ্ছেদ থাকিবে, অথচ সে সম্বন্ধে আইন থাকিবে না, এই যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

পরিশেষে, নারীর পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধে কতিপয় প্রধান আপত্তি সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। প্রথম আপত্তি যে, ইহাতে সম্পত্তির বিভাগ সংঘটিত হইবে। ইহার উত্তর এই যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার ব্যতীত সম্পত্তি বিভাগ অনিবার্য্য। বর্ত্তমান যুগে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা প্রায় লোপ পাইয়াছে। এ স্থলে ভগ্নী সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইলে নূতন ক্ষতি বিশেষ কিছুই নাই। ভগ্নীপতির সহিত একত্রে বসবাসে ভ্রাতার যে অসুবিধা, অপর ভ্রাতা বসতবাটীর অংশ বাহিরের লোকের নিকট বিক্রয় করিলে তাহার অপেক্ষা অধিকতর অসুবিধা। ইহার একমাত্র প্রতীকার আইন দ্বারা একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা পুনঃপ্রচলিত করা, অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই একমাত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা। ইহা যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব, সে-স্থলে কন্যাকে ন্যায্য দাবি হইতে বঞ্চিত করা অতীব অন্যায়। দ্বিতীয় অপত্তি যে, ইহাতে মামলা-মোকদ্দমা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। ইহা একই ভাবে খণ্ডন করা যায়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহবিবাদ ও মামলা-মোকদ্দমা আমাদের সমাজে এরূপ অতি সাধারণ ও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা যে, উক্ত আপত্তির কোনই অর্থ নাই। যদি ন্যায়ধর্ম্ম নীতি বিচার ও নারী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব অবিসংবাদী সত্য হয় তাহা হইলে কেবলমাত্র সম্পত্তির অল্পাধিক বিভাগ ও মামলা মোকদ্দমার অল্প বৃদ্ধির জন্য নারীকে সম্পত্তিতে বঞ্চিত করার অপেক্ষা হীন কাজ আর কি হইতে পারে? যদি এই একই কারণে দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুত্রকে সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে কে তাহা অনুমোদন করিবে? তৃতীয় আপত্তি যে, ইহাতে ভ্রাতা-ভগ্নীর সুমধুর সম্বন্ধের ব্যাঘাত হইবে। ইহা এরূপ তুচ্ছ ও হাস্যকর যে, সে সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনই হইত না যদি না বহু লোকে ইহা অতি গম্ভীরভাবে উত্থাপন করিতেন। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ভ্রাতার ভগ্নী-স্নেহ যদি এতই ক্ষণভঙ্গুর হয় যে, স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগিলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহা হইলে সেই স্নেহের মূল্য কতটুকু? এই স্বার্থসর্ব্বস্ব স্নেহ অপেক্ষা পৈতৃক সম্পত্তিই ভগ্নীর পক্ষে অধিক শ্রেয়ঃ! বস্তুতঃ, হিন্দুভ্রাতা মুসলমান ভ্রাতা অপেক্ষা অধিকতর স্বার্থপর—এই মত গ্রহণ করা কঠিন। চতুর্থ আপত্তি যে, হিন্দু নারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইহা অপরকে ক্ষমতা প্রদানে বিমুখ শাসকসম্প্রদায়ের শাশ্বত যুক্তিমাত্র। অযোগ্যতার দোহাই দিয়া রাজা প্রজাকে, ক্ষমতাশালী জাতি দুর্ব্বলতর জাতিকে, ধনী দরিদ্রকে চিরদিনই ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। পুত্র কর্ত্তৃক পিতার সম্পত্তি ধ্বংসের বহু উদাহরণের যেরূপ অভাব নাই, সেরূপ নারীচালিত জমিদারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির বহুল উন্নতিরও যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। অযোগ্যতার দোহাই দিয়া নারীকে যোগ্যতা অর্জ্জনের সুযোগ পর্য্যন্ত হইতে চিরবঞ্চিত করা যুক্তিনামগণ্যই নহে, স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতার নামান্তর মাত্র।

প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সম্বন্ধে সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে নারীর আইনতঃ অধিকার অতি স্বল্প। সেই স্মৃতির যুগ হইতেই হিন্দুসমাজ নারীর প্রতি ক্রমান্বয়ে অন্যায্য ও পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর কোনো সমাজেই পুরুষ ও স্ত্রীর ভিতর কেবল সেই কারণেই এরূপ আকাশ-পাতাল পার্থক্য করা হয় নাই। পৃথিবীর কোনো সমাজেই পুরুষের ক্ষেত্রে এরূপ অত্যধিক পক্ষপাত, অনুগ্রহ, নিয়মকানুনে শৈথিল্য অথচ নারীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা, নিগ্রহ ও অত্যন্ত অধিক বাঁধাবাঁধি ও কড়াকড়ি

দৃষ্ট হয় না। হিন্দুসমাজ যেরূপ শতসহস্র দোষেও পুরুষের শাস্তিবিধান করে না, সেইরূপ নারীকে বিনাদোষেই ব্রজকঠোর মুষ্টিতে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই অতীব অন্যায্য বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অবিলম্বেই আবশ্যক। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দুনারীর পুরুষের উপর সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বতোভাবে যে নির্ভরশীলতা দৃষ্ট হয় তাহা কোনো যুক্তি অনুসারেই অনুমোদনযোগ্য নহে। হিন্দু নারীর সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও আইনতঃ অধিকার অচিরেই বর্ত্তমান যুগোপযোগী রূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য এবং যে আইন নরনারীর সমানাধিকারের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাহার অনুমোদন প্রত্যেক সমাজহিতৈষী ব্যক্তিরই প্রথম করণীয় কার্য্য। "নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"—এই ঋষিবাক্যকে শূন্যগর্ভ বচনেই কেবল পর্য্যবসিত করিলে চলিবে না, নারীর ন্যায্য সম্মান ও অধিকারকে সত্যই জাতির জীবনে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। নারী যেদিন পুরুষের পার্শ্বে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণীরূপে স্বীয় ন্যায্য স্থান অধিকার করিবে সেইদিনই আসিবে জাতির জীবনে নব সুবর্ণ যুগ, তাহার পূর্ব্বে নহে।

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্মেলন সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অগাধ সমুদ্র মন্থন করে গুটিকয়েক শ্রেষ্ঠ গান নির্ব্বাচন করতে না পারলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই দিশেহারা হয়ে পড়তে হয়। সেই উদ্দেশ্যে আমরা কিছুদিন থেকে মনে করছি যে, তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকপ্রিয় অন্ততঃ একশত গান যদি চয়ন করবার ব্যবস্থা করা যায় তবে সাধারণের উপকার হয়।

কবিগুরু নিজেই 'গীতবিতানে' তাঁর গানকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন, পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশ। এর সঙ্গে 'বিবিধ' বলে আর একশ্রেণীর সঙ্গীত জুড়ে যদি প্রত্যেক ভাগে ঠিক কুড়িটি না হলেও, সবসুদ্ধ একশটি নিজ নিজ প্রিয় সঙ্গীত নির্ব্বাচন করে আগামী আষাঢ় মাসের মধ্যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুরাগীরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন তাহলে আমরা ২২শে শ্রাবণের মধ্যে তালিকাটির মধ্যে অধিকাংশের অভিপ্রেত গানগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করে সকলের গোচর করাতে পারি।

ঠিকানা—শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
শান্তিনিকেতন পোঃ (বীরভূম)

রবীন্দ্র পাঠচক্রের বৃত্তি ঘোষণা

বালিগঞ্জস্থ রবীন্দ্র পাঠচক্র হইতে রবীন্দ্র সাহিত্যে গবেষণার জন্য বৃত্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। বিষয়—"রবীন্দ্র-সাহিত্যে কালিদাসের অভিব্যক্তি ও প্রভাব।" এক বৎসরের জন্য মাসিক ৭৫ টাকার বৃত্তি দেওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ৯৯-৫-১৩, বালিগঞ্জ প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে।

বাঁকুড়ায় কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন

বাংলাদেশের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায়ই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত সংক্রামক রোগীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বর্ত্তমানে এই সংখ্যা ছয় সাত হাজারে দাঁড়াইয়াছে। এই ভয়াবহ ব্যাধি যাহাতে ব্যাপকভাবে সংক্রামিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে পাঁচ শত রোগীর জন্য একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইতেছে। শহর হইতে ছয় মাইল দূরে তিন শত বিঘা জমি ক্রয়েরও বন্দোবস্ত হইয়াছে। এ উদ্দেশ্যে গোয়েঙ্কা ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে ৫০,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কমিটি যদি জনসাধারণের নিকট হইতে ৫০,০০০ টাকা চাঁদা তুলিতে পারেন তাহা হইলে উক্ত ফণ্ড হইতে আর এক দফায় আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা। এই কুষ্ঠাশ্রম গড়িয়া তুলিতে আরও দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন। সমাজের এই কল্যাণ কর্ম্মে অর্থ সাহায্য করা দেশবাসী মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। টাকাপয়সা 'বাঁকুড়া লেপার কলোনি কমিটি'র সভাপতি অথবা সম্পাদক, বাঁকুড়া—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

কিষাণসভা ও কৃষকের প্রকৃত মঙ্গল

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

কিষাণসভার যে অধিবেশন ২৫শে ও ২৬শে চৈত্র নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাহার বক্তৃতার বিবরণ পাঠ করিলে বুঝা যায় কৃষকের দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ উদ্যোক্তারা ধরিতে না পারিয়া কতকগুলি যুক্তিহীন সুলভ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন মাত্র। জমিদারী প্রথার উপর অনেক দোষ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু ভারতের অধিকাংশ স্থলে জমীদারী প্রথা নাই, সেখানকার কৃষকের অবস্থা জমিদারীর কৃষকের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বাংলার খাসমহলের প্রজার খাজনা কিছু বাকি পড়িলে 'সার্টিফিকেট' জারি করিয়া অবিলম্বে আদায় করা হয়, জমিদারের নিকট অধিকাংশ প্রজা দুই তিন বৎসরের খাজনা বাকি ফেলিয়া রাখিয়া তামাদি বাঁচাইয়া এক বৎসর করিয়া দিয়া থাকে। এই টাকার পরিমাণ অন্ততঃ ২০ কোটি হইবে। ইহাকে বিনা সুদে বা অল্প সুদে কৃষিঋণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা-সরকার ৫টির অধিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন নাই। এগুলির প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। নিজে চাষ করেন না পরন্তু জমির আয় পাইয়া থাকেন এরূপ জমিদারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে বার্ষিক আয় মোটামুটি ১৫ হাজার টাকার কম নহে এবং ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগে ১০ হাজার টকার কম নহে এরূপ জমিদারের মোট সংখ্যা এক হাজারের অধিক হইবে না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদে বিরাট্ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই নষ্ট হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ পল্লী-গ্রামে বাস করে। ভারতের অর্থনীতির শোচনীয় পরিণতি হইতেছে শহর ও গ্রামের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান ধনবৈষম্য। জমিদার ও কৃষ-কের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না করিয়া শহরের শিল্পপতিরা (যেমন কাপড় ও পাটের কলওয়ালারা) যে অন্যায় ভাবে পল্লীবাসীকে শোষণ করিতেছে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। জমিদার বৎসরে ১২ কোটি টাকার অধিক পান না কিন্তু এক পাটেই প্রধানতঃ ইংরেজ কলওয়ালারা বৎসরে ৪০ কোটি টাকা অন্যায় ভাবে লাভ করিতেছে। অথচ কিষাণসভার সভাপতি এইমাত্র বলিয়াছেন যে, পাটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য কৃষক যাহা পাইবে সেই হিসাবে বাঁধা উচিত। কলিকাতায় ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থলে অনেক সময়ে কৃষক নিজে আসিয়া চটকলে পাট বেচে। সুতরাং এ বিষয়ে সরকার কোন ভুল করেন নাই, কলিকাতার অনুপাতে অন্যত্র দর হইবে এ কথাও তাঁহারা বলিয়াছেন। বড় বড় ইউরোপীয় ব্যবসায়ী পল্লীগ্রামে নিজেদের শাখায় দুই মণ অবধি পাট কিনে। সরকারের যেখানে ঘোর অন্যায় তাহা হইতেছে এই, চটের মূল্যের তুলনায় পাটের অত্যল্প মূল্যনির্দ্ধারণ। এই বিষয়ে কিষাণসভা কিছু বলিতে পারেন নাই। কৃষকের জটিল সমস্যাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য যে পরিশ্রম ও অভিনিবেশ প্রয়োজন তাহার জন্য এই সকল নেতা প্রস্তুত নহেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন শ্রমিক নেতাদের আন্দো-লনের ফলে আজ দেশে শ্রমিকের অবস্থা যত মন্দ এরূপ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। কৃষককে লইয়া সেই খেলা আরম্ভ হইয়াছে। কিষাণসভায় মহাজনের নিন্দা করা হইয়াছে। আবার বলা হইয়াছে গত দুর্ভিক্ষে ১৫ লক্ষ কৃষক গৃহ ও ভূমি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী কে? মহাজনী আইন ও চাষীখাতক আইন এই সকল কৃষকবন্ধুর কীর্ত্তি। এই দুইটি আইন যখন ছিল না তখন কৃষক উচ্চ সুদে হইলেও ঋণ পাইত ও অনেক সময়ে দুই তিন পুরুষে শোধ করিত। এবার এই আইন দুইটির জন্য কেহ টাকা ধার দিতে সাহস করে নাই। বিক্রয় কোবালা লিখিয়া লইয়া টাকা দিয়াছে। তাহা না হইলে আজও এই সকল কৃষক নিজের জমি চাষ করিত। কেবলমাত্র বিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত হইলে কাহারও মঙ্গল করা যায় না। শ্রমসাধ্য গঠনমূলক কার্য্যের প্রয়োজন। সহস্র সহস্র জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারিলে মহাজনের সুদের হার আপনি কমিয়া যাইত। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের আংশিক কারণ স্বরূপ ধান চাউলের সঞ্চয়কারী ব্যবসায়ীকে দোষ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ঠিক হইয়াছে কিন্তু ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের দুর্মূল্যতার প্রকৃত কারণ চাপিয়া যাওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত বৎসরে অধিক জমি নিজে চাষ করে (ইহারা জমিদার নহে) এরূপ মাতব্বর চাষীরা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ধান চাউল মজুত করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া চাউলের মূল্য হ্রাস পায় নাই ও তাহাতেই ভূমিহীন কৃষক, ধীবর, তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রভৃতি অপুষ্টিজনিত রোগে পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে শতকরা ৯০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় সমান সমান মরিয়াছে। কিষাণসভা তাহা হইলে কাহাকে লইয়া সভা করিবেন? জমিদার ও মহাজন অপেক্ষা ভূমিহীন কৃষক ও পল্লীবাসী শ্রমিকের অনেক বেশী শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই সকল মাতব্বর চাষী। ইহারাই অনেক জমি কিনিয়া লইয়াছে। ভূমিহীন-কৃষক-সমিতি গঠনের আশু প্রয়োজন। ফ্লাউড কমিশনের নির্দ্দেশ পালিত হইলে প্রজা যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিবে, একটি পয়সাও খাজনা কমিবে না, কেবল প্রায় ৮ লক্ষ দেশবাসীকে ন্যায়সঙ্গত অধিকারে বঞ্চিত করা হইবে। তাঁহাদের স্থান বিদেশীয় সরকার অথবা তদপেক্ষা অধম সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন, অতিরিক্ত ইউরোপীয় ভোট ও অপরিবর্ত্তনীয় রাজকর্ম্মচারিকণ্টকিত মেকী স্বায়ত্ত শাসনের প্রতীক—অপব্যয়শীল মন্ত্রিমণ্ডল গ্রহণ করিবে। খাসমহলে করভার জমিদারী অপেক্ষা সাধারণতঃ অধিক।

ভারতের তথা বাংলার বৃহৎ শিল্প

শ্রীশক্তিব্রত সিংহ রায়

অবশেষে ব্রিটিশরাজ ভারতীয় রায়তের আর্থিক উন্নতিকল্পে প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করাও তাহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া ধার্য্য করিয়াছে। বিদেশীয়দের কাছে এবং নিজের দেশের শ্রেণী-বিশেষ লোকের কাছে মান বাঁচানই শুধু তাহার উদ্দেশ্য নয়, স্বীয় অস্তিত্ব অটুট রাখিতে এবং ভবিষ্যৎ দোহনের কার্য্য সমান ভাবে চালাইয়া যাইতেও এহেন চেষ্টার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাই-পরিকল্পনার অনুকূলে মত প্রকাশ, এই পরিকল্পনার অন্যতম রচয়িতা, সর আরদেশির দালালের সদস্যরূপে নিয়োগ, কতিপয় ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান দর্শন করিবার সুযোগ প্রদান এবং পরিশেষে কয়েক শত ভারতীয় যুবককে বিদেশে লইয়া গিয়া কৃষি শিল্প ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ করিয়া আনিবার চেষ্টা ইতিমধ্যেই সরকারের সঙ্কল্পের সাধুতা ও অকৃত্রিমতা ঘোষণা করিতেছে। যুদ্ধের অজুহাতে ভারতের রাজনৈতিক দাবির সমূহ উপেক্ষা এবং সেই যুদ্ধকালেই আর্থিক পরিকল্পনার এরূপ ব্যাপক চেষ্টা স্বভাবতঃই একটু অসমঞ্জস ঠেকে। তাই মনে হয় রাজনৈতিক সমস্যায় শুধু এক পক্ষের স্বার্থ এবং অর্থ-নৈতিক সমস্যায় দুই পক্ষেরই স্বার্থ জড়িত আছে বলিয়া সরকার এখন উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার এরূপ সমাধানই প্রয়োজন যাহাতে ভারতে মালিকানাজনিত ব্রিটিশের কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক স্বার্থে কোনরকম আঘাত না লাগে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শ্বেতজাতি-অধ্যুষিত দেশ যখন যুদ্ধের বাজারে যথাশক্তি এরোপ্লেন, মোটর গাড়ী সমুদ্রজাহাজ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধোত্তর জগতে শিল্পসংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছে, ভারতবর্ষ তখন জোগাইয়াছে শুধু কাঁচামাল এবং কতকগুলি নিকৃষ্ট শিল্পসামগ্রী, যুদ্ধের পর যেসব শিল্প এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে। ভারতের কতিপয় শিল্পনেতার উৎকৃষ্টতর শিল্প-স্থাপনের চেষ্টাতে বাধা প্রদানের ইতিহাস কাহারও অবিদিত নাই। ইহা অতি পরিতাপের বিষয় যে, এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে স্বাধীন দেশগুলি যেখানে উৎপাদন-প্রণালীর প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, নব নব শিল্প উদ্ভাবন করিয়া যুদ্ধের চারি বৎসরে শিল্প-বিজ্ঞানে পঁচিশ বৎসর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর শিল্পসামগ্রী নিকৃষ্ট প্রণালীতে উৎপাদন করিয়া ভারতীয় শিল্পনেতা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেই অর্থ সংরক্ষণের ক্ষমতা তাহারা অর্জ্জন করে নাই। যুদ্ধোত্তর জগতে প্রতিযোগিতায় হার মানিয়া সেই অর্থের বিনিময়ে অতি সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিষও তাহাকে বিদেশী শিল্পনেতা হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

যুদ্ধের বাজারে ভারতবর্ষকে শিল্পোন্নতির কোন সুযোগ না দেওয়া যুদ্ধকালীন ব্রিটিশ নীতির অঙ্গস্বরূপ বলিয়া অনেকে মনে করেন। এমতাবস্থায় যুদ্ধশান্তির প্রাক্কালে ভারত-সরকারের বোম্বাই-পরিকল্পনার অনুকূলে মত প্রকাশ এবং ভবিষ্যতের বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা অপর কোন গূঢ় উদ্দেশ্যেরই সূচনা করে। কেহ কেহ মনে করেন অর্থনৈতিক সমস্যার উপর বেশী জোর দিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনকে খানিকটা চাপা দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য। সাময়িক সুবিধার জন্য ভবিষ্যতে হানিকর কোন নীতি গ্রহণ করিবার মত দুর্ব্বলতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিদ্‌দের আছে বলিয়া তাহাদের শত্রুরাও স্বীকার করে না। সুতরাং ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিলে তাহাদের কূটনীতি-জ্ঞানের অমর্য্যাদা করা হয়।

যুদ্ধশান্তির পর ব্রিটিশ শিল্প-নেতার অধীনে এবং ভারতীয় শিল্প-নেতার সহযোগে ভারতবর্ষে উন্নততর কল-কারখানা স্থাপনপূর্ব্বক ভারত-শোষণের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হওয়া বিচিত্র নয়। এরূপ প্রতিষ্ঠানে যদি বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকতর ভারতীয় যুবককে উচ্চপদে নিযুক্ত করা যায় কিংবা যথেষ্ট শেয়ারও যদি ভারতীয় বাজারে বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে ব্রিটিশের ক্ষতি না করিয়াও ভারতীয় জনসাধারণের অনেককে খুশী রাখা যায়। প্রতিষ্ঠানটি আসলে জাতীয় না হইলেও জাতীয় বলিয়া বাহিরে প্রচার করা খুব কঠিন হইবে না। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অনেক শেয়ার ভারতীয়ের হাতে। অনবরত আন্দোলনের চাপে অনেক ভারতীয়কে উচ্চপদে লওয়া হইয়াছে। তাহা হইলেও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই, ব্রিটিশ স্বার্থানুযায়ী কাজ করিতে পারে। আই. সি. এস. পদে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনেক ভারতীয়কে লইতে হইয়াছে। এই নিয়োগের দরুন গবর্ণমেণ্ট জাতীয় গবর্ণমেণ্টে পরিণত হয় নাই, বা ব্রিটিশ-স্বার্থের বিপরীত কোন কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই। চাবিকাঠি নিজেদের হাতে রাখিলে এদেশে শেয়ার বিক্রয়, উচ্চপদে ভারতীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং দুই-চারি জন ভারতীয় ডাইরেক্টর নিয়োগ করিয়াও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভব হইতে পারে।

অথবা যুদ্ধে অর্জ্জিত এবং বিলাতে রক্ষিত ধনে, সরকারের অব্যবসায়িক পরিচালনে বৃহৎ কলকারখানা স্থাপন এবং অচিরেই প্রতিযোগিতার বাজারে সেগুলির অবলুপ্তি, এই উপায়ে অতি সুনিপুণভাবে ঋণ পরিশোধের কল্পনাকেও অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইতিমধ্যেই দেখিতেছি দেশীয় আই. সি. এস. গণ যাহাদের ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা শিশুদেরই তুল্য, গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাহারাই কোটি কোটি টাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের খসড়া তৈরি করিতে ব্যস্ত আছেন। এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকারী খরচে কয়েক শত ভারতীয় যুবককে বিদেশে সস্তা শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইবে। বিলাতে ভারতীয় যুবককে শিক্ষার জন্য প্রেরণের ইতিহাস নূতন নহে। সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্যে এবং নিজেদের অর্থে অসংখ্য ভারতীয় যুবক বিলাতে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বেই বিলাতের কোন কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে নাকি ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ভারতীয়ই ছিল

অর্দ্ধেক। ঠিক যুদ্ধের পূর্ব্বেই বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় যুবকদের মধ্যেও বেকার-সমস্যা ভীষণ ভাবে দেখা দিয়াছিল। তবুও সরকারী সাহায্য না পাইলেও ব্রিটিশশাসন বজায় থাকিলে বিলাতে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইবে। সুতরাং সরকারী ব্যয়ে নূতন করিয়া শিক্ষার্থী প্রেরণের কোন প্রয়োজন ছিল না। আই. সি. এস.-পরিকল্পিত, সরকার-পরিচালিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, সরকারী সাহায্যে বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের নিযুক্ত করা হইবে। এই বিরাট ছাত্রবাহিনীর শিক্ষার ব্যয়ের বিনিময়ে ভারতের কাছে বিলাতের যুদ্ধজনিত ঋণও খানিকটা শোধ হইবে। বাকি ঋণটা শোধ হইবে কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ে। যুদ্ধশান্তির পর প্রতিযোগিতায় সরকারী অব্যবসায়িক নীতিতে পরিচালিত এই কারখানাগুলি যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তখন এই ভারতীয় যুবকদের অক্ষমতার উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া সরকারের মান বাঁচাইবার পথও হয়তো খোলা থাকিবে। অর্থাৎ যুদ্ধ-ঋণের পরিবর্ত্তে প্রদত্ত বিলাতী শিক্ষা ও কলকারখানার বিলাতী যন্ত্রপাতি, দুয়েরই অপচয়ে হইবে যুদ্ধজনিত ভারতীয় সমস্যার সমাধান।

টাটার লৌহশিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে দলে দলে ভারতীয় যুবককে বিলাতে প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। জামশেদজী লৌহশিল্পে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না। প্রয়োজন অনুযায়ী বিদেশ হইতে শিল্পী ও যন্ত্রপাতি আনয়ন করিয়া এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গ'ড়িয়া তুলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে করিয়াছেন ভারতীয় যুবকের শিক্ষার ব্যবস্থা, এবং ক্রমে ক্রমে সুবিধামত করিয়াছেন বিদেশী বিশেষজ্ঞের জায়গায় ভারতীয় নিয়োগ। আজ দেখিতেছি পৃথিবীর এই অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ভারতীয়দের দ্বারাই অতি সুনিপুণ ভাবে পরিচালিত হইতেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে রাশিয়ার পরিণত হওয়ার মূলেও আছে এই একই নীতির অবলম্বন। বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ ও যন্ত্রপাতি আনাইয়া কারখানা স্থাপন, সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় লোকের শিক্ষা প্রদান এবং সুবিধামত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের স্থলে তাহাদের নিয়োগ—এই পন্থায়েই রাশিয়াতে আজ বৃহত্তম শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে।

আমরা চাই কালবিলম্ব না করিয়া এই দেশে অতি আধুনিকতম বৃহৎ বৃহৎ কারখানার প্রতিষ্ঠা—সেখানে কিছু দিনের মধ্যেই তৈরি আরম্ভ হইবে জাহাজ, এরোপ্লেন, মোটর-কার, ট্রাক্টর, যন্ত্রপাতি, কাঁচের দ্রব্যাদি, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি। বিদেশী বিশেষজ্ঞ যাঁহারা অর্থের বিনিময়ে আমাদের কারখানা চালাইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহাদিগকে আমরা যে-কোন পারিশ্রমিকে ভারতে আনাইতে এবং এরূপ কারখানা স্থাপন করিতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আবশ্যক, যে-কোন মূল্যে আমরা সেগুলি বিদেশ হইতে খরিদ করিতে প্রস্তুত আছি। বর্ত্তমান সরকারের পরিচালনায় বা অধীনে কোন কলকারখানা স্থাপনের আমরা পক্ষপাতী নহি। তাহাদের সামর্থ্য, এবং উদ্দেশ্যের উপর আমাদের আস্থা নাই। বৃহৎ শিল্প-পরিচালনায় যে-সকল ভারতীয় শিল্পনেতা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, আমরা চাই একমাত্র তাঁহাদের উপরই সমস্ত ভয় পাইবার কিছুই নাই। বৃহৎ বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে তাহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যে-কোন সময়েই সহজসাধ্য। টাটার মত প্রতিষ্ঠানকেও যে-কোন মুহূর্ত্তে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়।

ভারত-সরকার হইতে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা। যুদ্ধের সময় প্রতিযোগিতার কোনই বালাই ছিল না। ভারতবর্ষে এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল। সরকার শুধু সাহায্য করিতে বিরত থাকেন নাই, ভারতীয় শিল্পনেতা যাঁহারা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, যুদ্ধজনিত নানাবিধ অর্ডিন্যান্স অস্ত্র-সাহায্যে তাঁহাদের চেষ্টাকে বিফল করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন।

সরকারের ঔদাসীন্যের প্রতিবন্ধকতার বা বিপথগামিতার প্রতিবাদেই আমাদের কর্ত্তব্যের অবসান হয় না। রাজনৈতিক সমস্যাই অবশ্য সকল সমস্যার মূল। যাঁহারা এই সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা আমাদের নমস্য। কিন্তু এই পরাধীনতার মধ্যেও যে-সকল মহাপ্রাণ টাটার মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহাদের দানও অতি বৃহৎ। বিরলা, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ প্রমুখ শিল্পনেতাগণ এত বাধাবিপত্তির ভিতরেও ভারতের শিল্পোন্নতির পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। বাংলাদেশে এঁদের মত বিত্তশালী নেতার নিতান্ত অভাব। অথচ স্বদেশী আমল হইতে বাঙালী যুবকের দ্বারা বাংলা দেশে নানাবিধ শিল্পস্থাপনার চেষ্টা যতটা হইয়াছে অন্য প্রদেশে তার তুলনা পাওয়া ভার। উপযুক্ত নেতার অভাবে এই চেষ্টার প্রয়োগ হইয়াছিল অতি বিচ্ছিন্নভাবে। তাই বাঙালী শিল্পজগতে তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই। কলিকাতা এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে কাঁচ, রাসায়নিক দ্রব্য, চামড়া, চিনামাটির যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হাজার রকম জিনিষের ছোট ছোট দীর্ণ জীর্ণ, কি অধুনা অবলুপ্ত কারখানার ইতিহাস বাঙালীর বিফল শিল্প-প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। ইহাদের স্থাপয়িতারা ছিলেন ভারতের শিল্পযুগের অগ্রদূত, এবং এমন কি, কোন কোন শিল্প ছিল প্রায় জাপানী শিল্পের সমসাময়িক। এক ভদ্রলোককে জানি তিনি বহুদিন জাপানে ছিলেন এবং সেখানে নানাবিধ কারখানা স্থাপন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কি ব্যাকুল আগ্রহ ছিল তাঁহার বাংলা দেশে কাঁচশিল্প স্থাপনা করিবার। এই আগ্রহাতিশয্যে জাপানের সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া তিনি ২৫।৩০ বৎসর আগে প্রচুর অর্থব্যয়ে জাপান হইতে মালমশলা ও কয়েকজন জাপানী কারিগর আনিয়া দমদমে কারখানা স্থাপন করেন। তাঁহাকে ১৫।২০ বৎসর যাবৎ অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত বছরের পর বছর লোকসান দিতে দেখিয়াছি। ব্যক্তিবিশেষের শক্তিসামর্থ্যই আর কতটুকু? শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সব ছাড়িতে হইয়াছে। বিচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্ত এরূপ কত শক্তিরই যে অপচয় হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। তবুও শিল্পজগতে অগ্রসর হইয়াছি আমরা যৎসামান্যই; নিষ্ঠা, একাগ্রতা কিংবা নিপুণতার ত্রুটি এদের ছিল না। ত্রুটি ছিল একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধতার। এই বিচ্ছিন্ন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কারখানা স্থাপনের ছিল উপযুক্ত নেতার অভাব।

[illegible] চিনামাটি,

ইত্যাদি জিনিষের বৃহত্তম বাঙালী কারখানা স্থাপিত হইতে পারে না? বাংলাদেশে বোম্বাইয়ের মত বিত্তশালী লোক না থাকিলেও আজ বেঙ্গল কেমিক্যালের মত কারখানা সম্ভব হইয়াছে। বাংলার কতকগুলি ব্যাঙ্ক আজ ভারতবর্ষে বিশিষ্ট স্থান দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার কারণ, বাঙালীর বাংলা প্রতিষ্ঠানের উপর অনুরাগ সমভাবেই বিদ্যমান। বোম্বাইএ যাহা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সম্ভব, বাংলাদেশে তাহা সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্ভব। তাই মনে হয় বাঙালী শিল্পনেতা যে কয়জন আছেন, যাঁহারা বাঙালী জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, বাঙালী কয়েকটি ব্যাঙ্কের পরিচালক যাঁহাদের উপর বাঙালী জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, এবং বাঙালী বৈজ্ঞানিক যাঁহারা কিছুকাল আগে বিদেশে সব কারখানা দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, ইহারা মিলিত হইয়া যদি একটি বোর্ড গঠন করেন এবং বাংলাদেশে আধুনিক প্রণালীতে কোন্ কোন্ বৃহৎ শিল্প স্থাপনের উপাদান বর্ত্তমান তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানপূর্ব্বক কোম্পানী গঠন করেন, তাহা হইলে শেয়ার কিনিয়া অর্থ যোগাইতে বাঙালী জনসাধারণ কুণ্ঠিত হইবে না। কোম্পানী গঠন, অনুসন্ধান ইত্যাদি প্রারম্ভিক কার্য্য করিবার এখনই উপযুক্ত সময়। যুদ্ধশান্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে কারখানার যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞ আনয়ন করিয়া উৎপাদনের কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। বিশ্বাস হয়,—বাংলাদেশে বৃহত্তম শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার সমস্ত উপাদানই বর্ত্তমান। শুধু চাই সেই উপাদানগুলিকে একত্রিত করিয়া বিরাট শক্তিতে পরিণত করিবার উপযুক্ত নেতা।

কবিয়িত্রী মহাদেবী

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

বর্ত্তমান যুগে যাঁরা হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তন্মধ্যে শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা এম. এ.-র নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মহাদেবীর কবিতার সমাদর ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর রচিত মধুনিষ্যন্দী, সুছন্দিত কবিতাবলী শুধু যে লালিত্যময়ী তা নয়, ছায়াবাদ ও প্রসাদগুণে তা অপূর্ব্ব।

তাঁর কবিতার গতি বহির্মুখী নয়; বিশ্ব-বেদনার অন্তরতম নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত—তাঁর ভাষায় 'নিঃসীম প্রিয়-তমে'র খোঁজে সর্ব্বদা সতৃষ্ণ।

অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণ করবার জন্যে মীরাবাঈ যে সাধনা আরম্ভ করেছিলেন, মহাদেবীও তাঁর সমস্ত ভাবনা ও শক্তি সেই সাধন-ব্রতের উদ্‌যাপনে নিয়োগ করেছেন। তাঁর রচিত কবিতায় কবীর ও রবীন্দ্রনাথের সদৃশ ছায়াবাদ ও রহস্যবাদ প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয় যদিও মহাদেবী বলেন যে তাঁর কবিতা 'বাদ' বা 'রহস্যে'র শ্রেণীতে পড়ে না।

মীরা যেমন গিরধর প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করে বাহ্যিক সংসারকে ভুলে গিয়েছিলেন, মহাদেবীও নিজেকে 'অনন্তলোক-বাসী প্রিয়তমের' প্রেয়সীরূপে সাধনায় অগ্রসর হয়ে চলেছেন। তাঁরই ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে কবিতায় তাঁরই নিকটে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

মীরার ন্যায় মহাদেবীও আরাধ্যকে দর্শন করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

মীরা বলেছেন—

মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
মিল কর বিছুড় ন জাবৈ

মহাদেবীও তেমনি বলছেন—

এক বার আও ইস্ পথ মে,
মলয় অনিল বন হে চির চঞ্চল
(নীরজা)

মীরা যেমন নিজকে প্রিয়তমের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে-ছিলেন মহাদেবীও তেমনি তাঁর অসীম প্রিয়তমের মধ্যে বিলীন হয়ে আছেন—

আজ য়হ জীবন কিসী নিঃসীম প্রিয়তম মেঁ সমায়া
(সান্ধ্য-গীত)

মহাদেবীর হৃদয়-ফলকে প্রিয়তমের ছবি অঙ্কিত রয়েছে কিন্তু কবিয়িত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্যক্ পরিচয় এখনো হয় নি; তাই মহাদেবী বলছেন—

কৌন তুম মেরে হৃদয় মেঁ?

মহাদেবীর প্রথম কবিতা-সংগ্রহের নাম 'রশ্মি'। এই সংগ্রহে তাঁর প্রথম বয়সের রচনাবলী একত্রিত—তা কতকগুলি গীতি-কবিতা ও গান। বিশ্ব-বেদনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে মহাদেবী মৌনব্রত অবলম্বন করে নিজের অন্তরকে উদ্দেশ করে বলছেন—

অব সীখকে মৌন কা মন্ত্র নয়া
য়হ পী-পী ঘনোঁ কো সুহাতা নহী
(রশ্মি)

'রশ্মি'র পরে তাঁর কবিতা-সংগ্রহ 'নীহার' ও কাব্য-গ্রন্থ 'নীরজা' প্রকাশিত হয়। এই বই দু'খানি পড়লেই চোখে পড়ে যে কবিয়িত্রীর সমস্ত চিন্তা ও ভাবনা তাঁর প্রিয়তমের উদ্দেশে যুক্ত হয়ে আছে। তাই বলছেন—

পথ দেখ বিতা দী রৈন, মৈঁ প্রিয় পহিচানী নহীঁ।
(নীরজা)

প্রিয়তমের স্মরণে তাঁর সমস্ত হৃদয়ে ও দেহে শিহরণ জাগে। তাই তিনি বলছেন—

য়হ সুখ-দুখ-ময় রাগ বজা জাতে হো ক্যোঁ অলবেলে
(সান্ধ্য-গীত)

জীবনব্যাপী সাধনায় যখন প্রিয়তমকে পাওয়া গেল না তখন মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে মিলন হবে এই আশায় কবিয়িত্রী বলছেন—

আ মেরী চির মিলন যামিনী
তমোময়ী, থির আ ধীরে-ধীরে
আজ ন সজ্ অলকোঁ মে হিঁরে
ঢোঁকা দে জগ শ্বাস ন শীরে ;
হীরক বনরে শিথিল কবরী মেঁ
গুঁথেঁ হর শৃঙ্গার কামিনী।

প্রিয়তমকে লাভ করবার পথের কণ্টক ও বাধাও তাঁকে আনন্দ দেয় ; কণ্টকাকীর্ণ পথ, তপস্যা-ক্লিষ্ট কৃশ তনু ও মনের দুর্বলতা কিছুতেই তাঁকে পথবিচ্যুত করতে পারে না। দুঃখেই যদি আরাধ্য-দেবকে পাওয়া যায় তবে সেই পথই কবির পক্ষে আনন্দের। তাই তিনি বলছেন—

তুম দুখ বন ইস পথ মেঁ আনা
শূলোঁ মেঁ নিত মৃদু পাটল সা খিলনে দেনা
(নয়া জীবন)
ক্যা হার বনেগা বহ জিসনে সীখা ন হৃদয় কো
বিঁধবানা

মহাদেবীর বাঞ্ছিত প্রিয়তম তাঁর সমস্ত মনে ও দেহে সীমাবদ্ধ ; তাঁর বাহির-বিশ্বের সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই। কবিয়িত্রীর এই প্রিয়তমকে সু-স্বাগত করবার জন্যে সকল বিশ্ব উদ্গ্রীব। মহাদেবীর অন্তর-বেদনা যে কবিতার ধারা-প্রবাহ সৃষ্টি করেছে তাকে প্রকৃতি ও বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করতে বেগ পেতে হয় না—এইখানেই কবির কুশল-লেখনীর সার্থকতা। এখানেই তাঁর সাধনা জয়যুক্ত হয়েছে।

সীহর সীহর উঠতা সরিতা-উর,
খুল খুল পড়তে সুমন সুধা ভর,
মচল মচল আতে পল ফির-ফির,
সুন প্রিয়কী পদ চাপ হো গই পুলকিত যহ অবনী।

'সান্ধ্য-গীত কবির' অনুপম সৃষ্টি। এই সঙ্গীতাবলীতে কাব্যকলা চরমে পৌঁছে গিয়েছে। বহির্জগৎ ও অন্তরের এই মিলন অন্য কবির কাব্যে এমন সার্থকতা লাভ করে নি।

যহ ক্ষিতিজ বনা ধুঁধলা বিরাগ
নব অরুণ, অরুণ মেরা সুহাগ
ছায়া কী কায়া বীত রাগ
সুধি ভীনে স্বপ্ন রঁগীলে ঘন।
প্রিয় সান্ধ্য গগন মেরা জীবন।

যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করে অন্য কবি সকলের চিত্ত-বিনোদন করেছেন, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে মহাদেবী নিজের কবিতায় আবদ্ধ করে তাঁর অসীম প্রিয়তমের চরণে অঞ্জলি দিয়েছেন ও প্রার্থনা করেছেন। তাই বলছেন—

ক্যা ন তুমনে দীপ বালা ?
ক্যা ন ইসকে শীত অধরোঁ মেঁ লগাই অমর জ্বালা ?

'রশ্মি'র ভূমিকায় কবিয়িত্রী লিখেছেন—'যহ সুখ-দুখ কে ধূপছাঁহী ডোরোঁ সে বুনে জীবন মেঁ মুঝে বহুত দুলার মিলা হায়' কিন্তু তবুও তাঁর জীবনে অনেক দুঃখ-দুর্দশার 'অমা-রজনী' ঘিরে আছে। তাই ব্যক্ত করেছেন এই কয় পঙক্তিতে—

আজ ইন তন্দ্রিল পালোঁ মেঁ
উলঝতী অলকেঁ সুনহলী
অসিত নিশি কে কুন্তলোঁ মেঁ
রাত নভ কে ফুল লাই
আঁসুওঁ সে কর সজীলে।
(সান্ধ্য-গীত)

মানব-মনের সহস্র ভাবনা সংসারের অসংখ্য বন্ধনে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। মন যা চায়, বাহির-বিশ্ব তাকে মেনে নিতে নারাজ ও অনেক সময় অসমর্থ। আন্তরিক বিচারধারাকে মর্য্যাদা না দিয়ে সংসার তার বিনাশেই ব্যাপৃত ও তাতেই গৌরব বোধ করে। তাই অনেক সময় মনে হয় কবির কাল্পনিক সৃষ্টির সঙ্গে কি আমাদের সংযোগ নেই—কবির মৌন অন্তরবাণী কি আমাদের স্পর্শ করে না ?

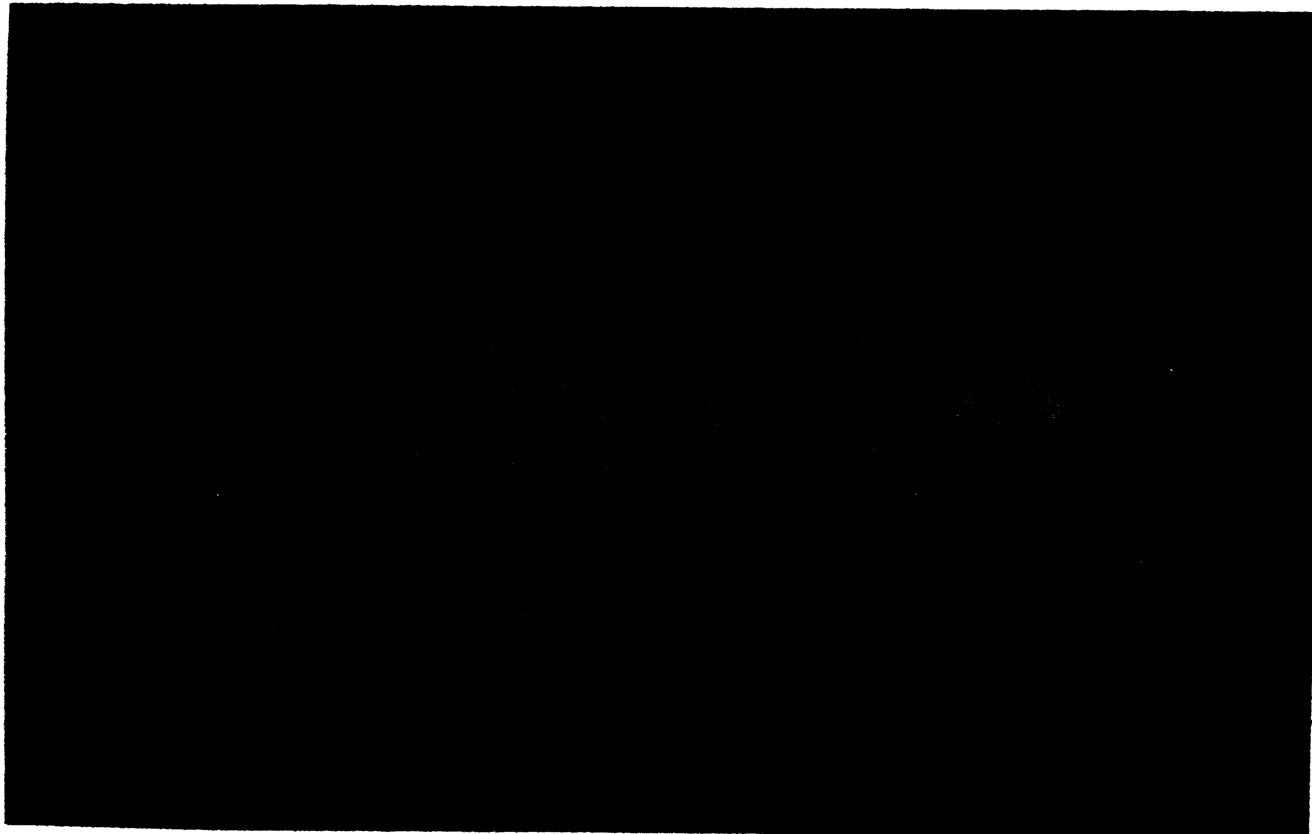
তাই মহাদেবী এক জায়গায় বলছেন—"কবিকে পাস এক ব্যাবহারিক বাহ্য সংসার হয়, দুসরা কল্পনানির্ম্মিত আন্তরিক। পরন্তু যে দোনোঁ সংসার পরস্পর বিরোধী ন হোকর এক দুসরে কী পূর্ত্তি করতে হঁয়। এক কল্পনা পর যথার্থতা কা রং চঢ়া কর উসমেঁ জীবন ডালতা রহতা হয় তো দুসরা বাস্তবিকতা কী দুরূপতা পর অপনী সুনহলী কিরনেঁ ডাল কর উসে চমকা দেতা হয়।"

মহাদেবীর চিত্রাঙ্কন-কলাও অপূর্ব্ব। তাঁর অঙ্কিত ছবির অনেক প্রদর্শনী হয়ে গেছে ও তা দেশে-বিদেশে পরম সমাদর লাভ করেছে। কবিতা রচনা ও চিত্রাঙ্কন এ দুই বিভাগেই মহাদেবীর অতুল প্রতিভা ও কৃতিত্ব সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছে।

মানবসমাজে কাব্যসাহিত্যই যুগান্তর ঘটায়, নব-নব সৃষ্টির প্রেরণা যোগায় ; অনাগত ভবিষ্যতের মানবগোষ্ঠীর অসীম কল্যাণ সাধন করে।

বহুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদে গিয়েছিলেন। তখন তিনি প্রয়াগ মহিলা-বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করেন ও মহাদেবীকে আশীর্ব্বাদ করেন। মহাদেবী এই বিদ্যাপীঠের কর্ণধার ও অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

মহাদেবীর কাব্য সাহিত্য কালজয়ী হবে এ আশা অনেকে পোষণ করে।



দাদীর কবর

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের পর সাংবাদিকগণ এবং জনসাধারণ পরিবেষ্টিত মহাত্মা গান্ধী



সিমলা-সম্মেলনের উদ্বোধন-দিবসে বড়লাট লর্ড ওয়াভে ও রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ



বড়লাট ও মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৫২

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা

সিমলায় নেতৃসম্মেলন যে উদ্দেশ্যে আহূত হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে, লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবানুযায়ী অস্থায়ী ভারত-সরকার গঠন সম্ভব হয় নাই। মুসলিম লীগের অনমনীয় জিদই এই অসাফল্যের কারণ।

ভারতবর্ষের বর্তমান শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা অবসানের জন্য বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের আগ্রহের আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, এই ব্যাপারে ন্যায় নীতি ও যুক্তির মর্যাদা রক্ষার জন্য যে দৃঢ়তার পরিচয় দেশ তাঁহার নিকট আশা করিয়াছিল তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদও বলিয়াছেন লর্ড ওয়াভেলের দুর্বলতা এই ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

এখানে তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব ভুলিলে চলিবে না। ওয়াভেল-প্রস্তাবটি ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে ঘোষিত হয় এবং ইহার সুযোগ চার্চিল ও আমেরী উভয়েই তাঁহাদের নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম দিকে সম্মেলনের আবহাওয়া যে ভাবে চলিতেছিল তাহাতে সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে সদ্যুক্তির প্রকাশ্য পথেই আলোচনা অগ্রসর হইবে। বিলাতের নির্বাচন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া বদলাইয়া যায়। খবর আসে, হোয়াইট হলের সহিত ভারতবর্ষের সংবাদ আদান-প্রদান চলিতেছে। মিঃ জিন্না প্রথমে অনেকটা নমনীয় ভাব দেখাইয়াছিলেন, বড়লাটও তাঁহার অযৌক্তিক জিদকে ততটা প্রশ্রয় দেন নাই। উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখি জিন্না সাহেবের সুর সপ্তমে উঠিয়াছে, প্রথমে তিনি পাঁচটির মধ্যে একটি আসন লীগবহির্ভূত মুসলমানদের জন্য ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন। পরে পাঁচটি আসনই তিনি নিজের দলের জন্য দাবি করিয়া বসেন এবং তদপেক্ষা আরও মারাত্মক দাবি তুলেন এই বলিয়া যে, প্রস্তাবিত শাসন-পরিষদে কোন বিষয়ে লীগের সহিত মতভেদ হইলে বড়লাট অধিকাংশের মত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ বড়লাটের ভিটো জিন্না সাহেবের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। গণতন্ত্রের ধ্বজাবাহক ব্রিটিশ প্রতিনিধি এই অতিশয় অন্যায় অসঙ্গত এবং অর্থহীন জিদকে যুক্তি বলিয়া কি কারণে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। এই সময়েই আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ দেন যে, লণ্ডনস্থ ভারতীয় কংগ্রেস মহলের ধারণা, যে কংগ্রেস সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভা, বিশেষ করিয়া তাহাকেই একটি নিছক হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার হীন প্রচেষ্টায় মিঃ আমেরী মিঃ জিন্নাকে সমর্থন করিতেছেন। এদেশের কোন কোন ব্রিটিশ মুখপত্রে অকস্মাৎ মিঃ জিন্নার ও তাঁহার খ্যাত-অখ্যাত সমর্থকবৃন্দের বিবৃতি প্রভৃতি সাড়ম্বরে ছাপা আরম্ভ হয় এবং কলিকাতার সাম্রাজ্য-বাদের মুখপত্র সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখেন যে, "জিন্না সাহেবের আচরণ অযৌক্তিক বলা চলে না। পাকিস্থানের দাবি ছাড়িয়া দিয়া শাসন-পরিষদে প্রবেশের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া জিন্না সাহেব যে স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন কংগ্রেস ততটা স্বার্থ ত্যাগ করে নাই।" মুসলমানের একচ্ছত্র প্রতিনিধিত্বের ও ভিটো পাওয়ারের দাবি স্বীকৃত হইলে পাকিস্থানের প্রয়োজন হইত না, সমগ্র ভারতবর্ষই "দিনিয়া"র অর্থাৎ পাকিস্থানে পরিণত হইবার পথ পরিষ্কার হইত।

সিমলা সম্মেলনে একথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে যে ভারত-বর্ষের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় জিন্না সাহেবের নেতৃত্ব মানে না। ভারতবর্ষের একটি প্রদেশেও তাঁহার তাঁবেদার কোন মন্ত্রী-মণ্ডল নাই। দেশের স্বাবলম্বী মুসলমানেরা লীগের অন্যায় দাবির প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিয়াছেন। স্বাবলম্বী মুসলমান বলিতে আমরা বুঝি ডাঃ খাঁ সাহেব, মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ প্রভৃতিকে, ব্রিটিশ বেয়নেট অথবা অপর কাহারও দয়ার উপর যাঁহাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নির্ভর করে না। সর নাজী-

মুদ্দীন, সর গোলাম হোসেন এবং সর সাদুল্লাকে স্বাবলম্বী বলিতে পারা যায় না এই জন্ত যে ইঁহাদিগকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্ত বরাবরই শ্বেতাঙ্গ বণিকস্বার্থের নিকট দাসখত লিখিয়া দিতে হয়, নৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হয় না।

যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাইলেও লীগ তাহা দেশের স্বার্থে প্রয়োগ করিতে পারে না ইহা তের-শ' পঞ্চাশের বাংলায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। বাংলার এই চরম দুর্বৎসরে যে লীগ মন্ত্রিসভা দেশে বহাল ছিল, বাংলার কোন উপকার তাহারা করিতে পারে নাই। ইহাদেরই শাসনাধীনে লক্ষ লক্ষ লোক মশামাছির মত পথে ঘাটে মাঠে পড়িয়া মরিয়াছে। মৃতদেহ শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করিয়াছে। আর ইহাদিগকে খাদ্য সরবরাহ করিবার নামে এই লীগেরই বড় বড় চাঁইয়েরা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করিয়াছেন। মিঃ জিন্না একবারের জন্তও বাংলায় আসিয়া লীগ শাসনের চেহারা উন্নত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কংগ্রেসের আমলে ইহা হইত না দেশ তাহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে। কংগ্রেসের হাতে শাসনভার থাকিলে এবং কংগ্রেস মুক্ত থাকিলে ঐ দুর্বৎসরে সমগ্র নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস বাংলাকে রক্ষা করিবার জন্ত অগ্রসর হইত ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কংগ্রেস দেশের সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান, লীগ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দলের ন্যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর নেকনজরের উপর কংগ্রেসের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এদেশে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের স্বষ্টি ও পুষ্টির ইতিহাস আজ সমগ্র জগতে সুবিদিত।

সিমলা সম্মেলনের শিক্ষা

সিমলা সম্মেলনে লীগ-তোষণের ব্যর্থতা ও বিপদ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। রাজাগোপালাচারী, ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতি যাঁহারা শাসন-পরিষদে আসন লাভের আশায় লীগের সহিত ভাগে কারবার করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশকে রসাতলের কোন্ অতলে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিলেন সিমলায় তাহার সমুচিত দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে। ইঁহাদের কুপরামর্শে গান্ধীজী পর্যন্ত জিন্না-তোষণে দেশের যে ক্ষতি করিয়াছেন তাহা পূরণ করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। কংগ্রেসকে আজ মনে রাখিতে হইবে যে উহা ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান। সেখানে হিন্দু মুসলমান অস্পৃশ্য বর্ণশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি কোন ভেদাভেদ নাই। উহার লক্ষ্য স্বাধীনতা। স্বাধীনতা-সংগ্রামে সকল ব্যক্তি সকল দল, সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের স্থান কংগ্রেসে আছে। উহাদের মধ্যে যে বা যাহারা দেশের মুক্তি সংগ্রামে নামিয়া যতটুকু স্বার্থত্যাগ করিবে, দেশের ভবিষ্যৎ স্বাধীন গবর্মেণ্টে তাহার স্থান ঠিক সেই অনুপাতে নির্দিষ্ট হইবে। পদে পদে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাধা দিয়া দেশদ্রোহিতার কাজ করিব অথচ গবর্মেণ্ট গঠনের বেলায় শুধু ধর্মের দোহাই পাড়িয়া সবচেয়ে উঁচু আসন দখল করিব—লীগের এই মারাত্মক নীতি অনুসরণ করিয়া যাহারা চলিবে তাহাদের সহিত কোন আপোষ কখনও চলিতে পারে না। মহাত্মাই হউন আর যিনিই হউন ভবিষ্যতে আর কেহ কখনও এরূপ চেষ্টা করিলে দেশবাসী তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না।

হিন্দু কখনও দেশের স্বাধীনতাকে নিজের সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা বলিয়া মনে করে নাই। গত মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত তুরস্কে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মুসলমানের চেয়ে হিন্দু কম গৌরব অনুভব করে নাই। ইহুদী ও পারসী, যখন নিজের দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে তখন সে আশ্রয় পাইয়াছে এই ভারতবর্ষে। শক, হুন, চীনা প্রভৃতি বহু জাতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া এ দেশেই বসবাস করিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত বিরাট্ ও উদার হিন্দু সমাজেই মিশিয়া গিয়াছে। মোগল আমলেও দেখিতে পাই কোন কোন রাজা বা সম্রাট ভ্রান্তনীতির বশে হিন্দুর উপর অত্যাচার করিলেও রাজদরবারে হিন্দু শ্রেষ্ঠ আসন লাভে বঞ্চিত হয় নাই। মোগল দরবারে হিন্দু মন্ত্রী ও সেনাপতি এবং মারাঠা বীর শিবাজীর সেনাদলে মুসলমান সেনাপতির অভাব ছিল না। ইহা সম্ভব ছিল এইজন্ত যে ইঁহাদের নিকট দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন ছিল সকলের উর্ধ্বে, সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করা ইঁহাদের রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য ছিল না। কংগ্রেসেও আমরা ঠিক এই একই নীতি দেখিতে পাই। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুসলমান বা অস্পৃশ্য কেহ আসিলে কংগ্রেসের হিন্দু তাহাকে ভাই বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছে, তাহার জন্ত পর্যাপ্ত ত্যাগ স্বীকারে সে কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই। রাজাগোপাল, ভুলাভাই প্রভৃতি একদল সুবিধাবাদী নেতা এই উজ্জ্বল আদর্শে কালিমা লেপনের যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত রাখিতে না পারিলে দেশের সর্বনাশ অনিবার্য। কংগ্রেসের প্রাণশক্তির এই মূল উৎসের সন্ধান চক্রী সাম্রাজ্যবাদী মর্মে মর্মে অবগত আছে বলিয়াই ভারতবর্ষের রাজনীতিকে সাম্প্রদায়িক সুবিধাবাদের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিবার জন্ত তাহার এই অহেতুকী আগ্রহ।

মুসলিম লীগের কোন আদর্শের সন্ধান দেশ কখনও পায় নাই। মুসলমানের নিজের কোন সুবিধাও লীগের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আসিবার পর হয় নাই। বাংলায় লীগ মন্ত্রিত্বে বড় বড় সরকারী চাকুরি এবং কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতি পাইয়াছে পঞ্জাবী ও অবাঙালী মুসলমান। বাঙালী মুসলমানের ভাগ্যে জুটিয়াছে বড় জোর রেশন দোকানের মুদীগিরি বা এ আর-পি'র কয়েকটি সাময়িক চাকুরি। এই 'ইসলমাইজেসনে'র জন্ত বাঙালী মুসলমানকেও যে ভয়াবহ মূল্য দিতে হইয়াছে এবং আজও দিতে হইতেছে বুদ্ধিমান বাঙালী মুসলমান তাহা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহার যথেষ্ট পরিচয় মিলিতেছে।

ভারত বিভাগের দাবি তুলিয়াছে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান, হিন্দু নয়, স্বাবলম্বী মুসলমানও নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতার ফলে সকলেরই জানা আছে সম্পত্তি বিভাগের জন্ত প্রথমে যে অগ্রসর হয় তাহাকেই নিজের ভাগ বাড়াইবার জন্ত মিথ্যা সাক্ষী, জাল দলিল প্রভৃতি দাখিল করিতে হয়। লীগের পাকিস্থানী বাঁটোয়ারার বেলাতেও তাহারই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখিতে পাই। পাকিস্থানী দাবিতে প্রকাশ্যে আছে এক ভয়গ্রস্ত চিত্তের ছবি কিন্তু অন্তরালে আছে পরের রুটি টানিয়া লইয়া নিজের উদর পূর্তির অন্যায় ও কদর্য আগ্রহ।

প্রাণপাত পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারে অপরে যাহা অর্জন করিয়াছে বিনা আয়াসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গীনের ভরসায় সেই শ্রমার্জিত ফলে ভাগ বসাইবার চেষ্টা সমর্থন ও বাহবা পাইবে শুধু সাম্রাজ্যবাদীর ইংরেজের ও তাহাদের তাঁবেদারদের কাছে; কংগ্রেস এবং স্বাবলম্বী মুসলমান যেন তাহা হইতে দূরে থাকে। সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার পর মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত জওহরলালের বিবৃতিতে দৃঢ় চিত্ততার যে ক্ষীণ আলোক দেখা গিয়াছে তাহা অম্লান রাখিবার পবিত্র দায়িত্ব যেন আর কখনও কোন লোভে, কোন আপাত স্বার্থসাধনের মোহে পরিত্যক্ত না হয়। ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের যে তোষণনীতি আরম্ভ হয় এবং স্বরাজ্যদল গঠনের সময় যাহা চরমে ওঠে তাহার বিষময় ফল ফলিয়াছে। এই তোষণনীতির ফলেই মুসলিম লীগের প্রভাব বাড়িয়াছে, কংগ্রেসের মধ্যে ভেদসৃষ্টি হইয়াছে এবং দেশও অধঃপাতের পথে চলিয়াছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানের প্রতি এই তোষণনীতি বিশ্বাসঘাতকতার পথ, ইহা ভিন্ন তোষণনীতির অন্য কোন গতি নাই। আমাদের দেশের একমাত্র আশা যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশাই-রাজাগোপালাচারী ঠুলি চক্ষু হইতে খুলিয়া মানবসমাজের আদি ও অনন্তকালের স্বাধীনতা লাভের যে দুরূহ ও সঙ্কীর্ণ পথ আছে তাহাতেই অগ্রসর হইবেন। সঙ্কীর্ণ পথেই মোক্ষলাভ হইতে পারে, তোষণনীতির উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ রসাতলের দিকেই যাইবে।

ধর্ম ও রাজনীতি

রাজনীতি ও ধর্মকে এক সঙ্গে জড়াইয়া রাখিবার মধ্যযুগীয় নীতি পৃথিবীর প্রত্যেক প্রগতিশীল দেশ পরিত্যাগ করিয়াছে। একমাত্র ভারতবর্ষেই ব্রিটেন-রচিত শাসনতন্ত্রে উহা বজায় রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। ইহা দ্বারা আমাদের দেশের কি ক্ষতি হইয়াছে প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে 'স্বদেশী যুগের স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়াছেন। ইহা হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত হইল :—

"স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় ঐক্যের বাণী ছিল, হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথাও ছিল। কিন্তু পুনরুত্থানবাদী হিন্দুত্ব স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গীভূত হওয়ায়, উহা দ্বারা হিন্দুভাবাবেগ চরিতার্থ হইলেও মুসলমানদের মনে আর্য্যবিভূতি ঘোষণা কোন রেখাপাত করে নাই। বহু বর্ষ পরে খিলাফৎ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী মুসলিম ধর্মের ভাবাবেগ জাগ্রত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভেদনীতির চাতুর্য্যে মুসলমানদিগকে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ করিয়া ১৯২০-২১এ গান্ধীজী সেই শক্তিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"বহু শতাব্দীর চেষ্টায় ইয়োরোপ তাহার রাজনীতিকে ধর্ম হইতে পৃথক করিয়াছে, লৌকিক ব্যাপারে পারলৌকিক প্রশ্ন জড়িত করিবার অভ্যাস হইতে ইয়োরোপ মুক্ত হইলেও, আমরা এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ায়, স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় উন্নতির জন্য আর্য্য জাতির অতীত মহিমা দ্বারা ভাবাবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিল। পরবর্তী কালে অসহযোগ আন্দোলনেও গান্ধীজীর আধ্যাত্মিক জীবন ও সত্যাগ্রহের নৈতিক আদর্শের মিলিত প্রভাব রাজনৈতিক আন্দোলনে দেখা গিয়াছে। কংগ্রেসে, রাজনৈতিক সভায়,—মৌলনা ও স্বামীজীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্মের ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী কালে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক ধর্মোন্মাদনা অভিভূত করিয়াছে। মুসলিম লীগ ও হিন্দু-মহাসভা এই দুই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান তাহার সাক্ষ্য। বহুতর ধর্মমত এবং উপসম্প্রদায়-প্লাবিত ভারতে—ধর্মকে রাজনীতি হইতে পৃথক করা কঠিন। এখন পর্য্যন্ত আমাদের নেতা গান্ধীজী উপবাসের আধ্যাত্মিক শক্তি, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়া দেশবাসীকে বিমূঢ় ও বিহ্বল করিয়া ফেলেন। ইন্দ্রিয় পীড়ন, নিরামিষ আহার, বিবর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যায়াম গান্ধীজীর দৃষ্টান্তে অনেক দেশকর্ম্মী অনুকরণ করেন। ধর্ম্মাচরণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং অনেকাংশে সামাজিকও বটে। কিন্তু সর্ব্বভারতীয় নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিত উহার মিলন মিশ্রণের ফল শুভ হয় নাই। পরাধীন জাতির মধ্যে প্রবল ধর্ম্মানুরাগ অথবা মৌখিক আনুগত্য আত্মাবমাননা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অথবা হীনতা ভুলিবার এক প্রধান অবলম্বন। সম্ভবতঃ এই কারণেই স্বদেশী যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি—যেখানে চাপে পড়িয়া অনেকেই আধ্যাত্মিকতার পথে রাজনীতি হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। কেবল কংগ্রেসে নহে, মুসলিম লীগে ইহা অতিমাত্রায় অধিক প্রকট। স্বদেশকে দেবী মূর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া ভাবানন্দে বিগলিত হওয়া, আর "বিপন্ন ইসলাম"কে তাহার অতীত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখা—একই মানসিক অবস্থা হইতে উদ্ভূত; এবং এ দুই-ই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূল নহে।"

ধর্ম ও রাজনীতির সংঘাত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঝড়ঝঞ্ঝায় বিপর্য্যস্ত পৃথিবী যখন পুনরায় আত্মস্থ হইতে চলিয়াছে, সেই সময়েও ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে খণ্ডবিখণ্ড করিবার প্রস্তাব উঠিতেছে। ধর্ম ও রাজনীতির সংঘাতে হিন্দু মুসলমান উভয়েই বিহ্বল। গত মহাযুদ্ধে পরাজিত সাম্রাজ্যহীন তুর্কী জাতি কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে পৃথক করিয়াই বিশ্বের দরবারে আসন করিয়া লইয়াছে। ভারতেও আমরা তেমনি নেতৃত্বের প্রত্যাশা করিতেছি যাহা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে পৃথক করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার সমস্যা সমাধান করিবে। এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন :—

"ধর্ম্ম নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিবলে টিকিয়া আছে। ধর্ম্মের নামে পরস্পরের প্রতি বৈরিতা প্রকাশকে ধর্ম্মানুরাগ বলিয়া বা ধর্ম্মরক্ষার, প্রতিষ্ঠার বা বিস্তারের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে মাতামাতি করিলে চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না।। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি কৌশলে এড়াইয়া যাইবার উপায় হিসাবে ধর্ম্মকে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অপকৌশল প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়াছে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ-

মনকে ইহা প্রচুর বিদ্বেষ ও অন্ধ-গোঁড়ামি দিয়া অভিভূত করিয়াছে। ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ধর্মকে যথাস্থানে রাখিয়া, জনসাধারণের লৌকিক স্বার্থ ও অধিকারের দিক্ হইতে জাতীয় সমস্যা সমাধানের যাঁহারা পক্ষপাতী—তাঁহারা এ পর্য্যন্ত, ধর্ম্মের আবরণে প্রকাশিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে ব্যর্থ করিতে পারেন নাই। বৈদেশিক শাসকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহও ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর পুনরুত্থানবাদী ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়াছিল স্বাভাবিক কারণে; কোন নেতা বা নেতৃবৃন্দ উহা সৃষ্টি করেন নাই; বরং তাঁহারাই উহা দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে সচেতন ও সক্রিয় ভাবে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মানুরাগকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন, হিন্দু-মুসলমান মিলিত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধের নৈতিক শক্তির কথা শুনিল স্বরাজ রামরাজ্য, তুর্কী-সুলতানকে খলিফার পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অতএব হিন্দু-মুসলমান এক হও। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ভাটার মুখে দেখা গেল, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল। গান্ধীজী তিন সপ্তাহ উপবাস করিয়া ধর্ম্মান্দোলন-সঞ্জাত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঠেকাইতে পারিলেন না। সমস্ত বিংশ-দশক উত্তর-ভারতের বৃহৎ নগরগুলি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হাঙ্গামায় অশান্তি-সঙ্কুল হইয়া উঠিল, জাতীয় স্বাধীনতা অপেক্ষা আরতি, নামাজ, মসজিদের সম্মুখে বাদ্য প্রভৃতি মুখ্য হইয়া উঠিল। এই সুযোগে ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের উপর নির্ভরশীল দালালেরা আবার রাজনীতির আসরে জাঁকিয়া বসিল। আজ পর্য্যন্ত আমরা এই দুর্বুদ্ধির জের টানিয়া চলিয়াছি।"

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ

ব্রিটিশ ও ভারত-সরকারের সম্মিলিত প্রচারকার্য্য বড় বড় প্রপাগাণ্ডা-বিশারদদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয়ে ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের স্বরূপকে অন্য রূপ দিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ভারত-গবর্মেণ্ট যে নিছক ও নিখুঁত সামরিক এবং আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত এই নিষ্ঠুর সত্য পদে পদে প্রকাশিত হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের দুই শ্রেষ্ঠ নায়ক ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল হইতে ভারতে যে শাসনের নামে শোষণ চলিয়া আসিতেছে আজিও তাহার অবসান ঘটে নাই, বাংলার দুর্ভিক্ষে নিঃসংশয়ে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যে সামান্য খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল, নবগঠিত সরকার তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিয়াছিল; তের শ' পঞ্চাশের মন্বন্তরেও ইহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। কি ভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য দেশবাসীকে বঞ্চিত করিয়া সিপাহীর জন্য ছাড়াও ইংরেজের কারখানার কুলি মজুরদের জন্য মজুত করিয়া রাখা হইয়াছিল উডহেড কমিশন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সাগরপারের স্বাধীনচেতা লোকেরা ভারতে ইংরেজ শাসনকে কি চোখে দেখিয়া থাকেন বিলাতের স্বতন্ত্র শ্রমিক দলের মুখপত্র নিউ লীডারে প্রকাশিত বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক ঐতিহাসিক ফারিডলি কর্তৃক লিখিত এক প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ফারিডলি লিখিয়াছেন:

"ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা সেই দুই তস্কর রবার্ট ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারত-সরকার নিখুঁতভাবে সামরিক এবং আমলাতান্ত্রিক স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে যদি 'ফ্যাসিজম' বলা না যায় তবে তাহার একমাত্র কারণ 'ফ্যাসিজম' মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে বিংশ শতাব্দীতে কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি ঊনবিংশ শতাব্দীকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্যই নাই। ফ্যাসিষ্টগণ তাহাদের স্মরণীয় বন্দীশিবিরের মাহাত্ম্য শিক্ষা করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া এই দেশকে স্বাধীনতার বাণী শোনান হইতেছে। এক কথায় ইংরেজ ভদ্রলোকেরা যদি একথা লজ্ঘনও করেন তাহা হইলেও বিস্ময়ের কিছুই নাই। এখনও ইহা সম্ভব যে, ব্রিটিশ সরকার পাশবিক শক্তির বলে ভারতের বিদ্রোহকে বিচূর্ণ করিবেন। এমন কি নিরস্ত্র ভারতীয় জনগণের অহিংস সংগ্রামকেও তাহারা পশু শক্তির সাহায্যে স্তব্ধ করিতে সক্ষম। কিন্তু আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এমনই এক অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে যে এমন কি মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গই তাহার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রকাশ করিতেছে। আজ তাহারা সকলেই চায় যে, ব্রিটেন ভারত হইতে দূর হউক। কারণ, চীন আজ এসিয়াকে এসিয়াবাসীর জন্য দেখিতে চায়, রাশিয়া তাহার ইউরোপের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে এসিয়ার বাহিরেই রাখিতে চায়, যুক্তরাষ্ট্রও শিল্পোন্নয়নের নামে প্রাচ্যের বাজার প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হইয়া শোষণ করিতে চাহে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময়ে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের যে সন্দেহ ও অভিযোগ ছিল তাহা শীঘ্রই ভঞ্জিত হইবে। মতবাদের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আজ সমস্ত পৃথিবী একটি বিষয়ে একমত যে, ব্রিটিশ ভারত ছাড়িয়া যাক। শান্তভাবেই হউক বা রক্তপাতের মধ্য দিয়াই হউক ব্রিটিশকে শীঘ্রই ভারত ত্যাগ করিতে হইবে।"

ভারতে ব্রিটিশ শাসননীতির মূল সূত্রই এই যে দেশের অর্থনৈতিক শোষণে যাহারা সহায়তা করিয়াছে তাহারাই পুরস্কৃত হইয়াছে, সাম্রাজ্যবাদীর বাঁধান রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সত্যপথে দেশের মঙ্গল কামনায় যাঁহারা পদক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহাদের স্থান হইয়াছে কারাগারে। দেশের স্বার্থ বলি দিয়া আত্মস্বার্থ সাধনের পথ হেষ্টিংসের আমল হইতেই এদেশে খোলা আছে, আত্মস্বার্থ পরিহার করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনের প্রতিটি ক্ষেত্র আজও সমান ভাবেই কণ্টকাকীর্ণ।

বাংলার গবর্ণরের বক্তৃতা

বাংলার গবর্ণর মিঃ কেসী সম্প্রতি এক বেতার-বক্তৃতায় দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনা করিয়াছেন এবং পরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তাহার কোন কোন অংশ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। লাটসাহেব রাজনীতির কথা বলেন নাই, মন্ত্রীদের ক্ষমতাবিহীন দায়িত্ব ও সিভিল সার্ভিসের দায়িত্ববিহীন ক্ষমতা বাংলা দেশের কি সর্বনাশ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করেন নাই, ব্লাকমার্কেট এবং চুরি ও লুঠ বন্ধ করিবার জন্য তিনি কি করিয়াছেন তাহারও কোন পরিচয় দেন নাই। লাটসাহেবের বক্তৃতা পড়িলে মনে হয় সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের বিজ্ঞাপন ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া শেষ পর্যন্ত লাটসাহেবকে তাহাদের ব্যর্থতার সাফাই গাহিবার জন্য আসরে নামাইতে হইয়াছে।

মিঃ কেসী দেড় বৎসর এবং বাংলার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতশাসন আইনে মন্ত্রীদের সহযোগে এবং মন্ত্রীদের বাদ দিয়া যে দুই রকমের শাসন-ব্যবস্থার বিধি আছে তাহার উভয়টিরই সুযোগ তিনি পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন্‌টিকে ভাল বলিবে বাঙালী তাহা আজও বুঝিতে পারে নাই। এই দুই প্রকারের শাসনাধীনেই দেশবাসীকে সমানে লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অবিচার ও লুঠ সহ্য করিতে হইয়াছে।

গবর্ণরের বক্তৃতায় দেশের কঠিনতম সমস্যাগুলির উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য বক্তৃতার ন্যায় আসল সমস্যা বাদ দিবার চেষ্টা যেন ইহার মধ্যেও দেখা যায়। পর পর দুই বৎসরের পর্যাপ্ত ফসল খাদ্য সমস্যার সমাধান স্বাভাবিক ভাবে যেটুকু করিতে পারিত সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে তাহা হয় নাই। কলিকাতার লোককে এখনও ১৬/০ আনা দরে কাঁকরমিশ্রিত অখাদ্য চাউল কিনিতে হইতেছে, ২৫ টাকা দরে ভাল চাউল প্রাপ্তির আশ্বাস লাটসাহেবের বক্তৃতায় মিলিয়াছে। বাংলা দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় ২৫ টাকা দরে চাউল কিনিয়া খাইতে হইবে, মিঃ কেসী ইহা ঘোষণা না করিলে লোকে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিত না। সিভিল সাপ্লাই যে চাউল সরবরাহ করিতেছেন স্বাভাবিক অবস্থার সাধারণ চাউলের তুলনায় তাহার খাদ্য মূল্য শতকরা ৬০ভাগের বেশী নয়। খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে বাংলা সরকার খাদ্যবস্তুর পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিকারিতা এবং অকৃত্রিমতার প্রতি কখনও কিছু মাত্র দৃষ্টি দেন নাই, বরং ভেজাল ও নোংরামির যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছেন।

বস্ত্রাভাব এখনও সমান তীব্র রহিয়াছে। মাঝে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল যে "এমপ্লয়ার্স শপ" হইতে রেশন কার্ডে কাপড় দেওয়া হইবে। অর্থাৎ দেশী বিদেশী পুঁজিপতির যুদ্ধসরবরাহ কার্যে যাহারা লিপ্ত আছে, তাহারা কাপড় পাইবে, দেশের লোক ওয়ার্ড কমিটি বা ফুড কমিটির দ্বারে হাঁটাহাঁটি করিয়া মরিলেও ক্ষতি নাই। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে দেখা গিয়াছে দুর্ভিক্ষের মুখে মন্ত্রীসম্বলিত বাংলা সরকার শ্বেতাঙ্গ মিলমালিকদের পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিতে দিয়াছিলেন, এবার দেখিতেছি মন্ত্রীবিহীন বাংলা-সরকার সেই মন্বন্তরী পন্থা অনুসরণ করিয়াই মিলমালিক প্রভৃতিকে কাপড় সরাইয়া রাখিবার সুযোগ দিতেছেন। গত তিন বৎসরের শাসনে দেশবাসীকে বেশ বুঝান হইয়াছে যে সক্রিয় ভাবে যাহারা সরকারের সাহায্য করিবে ভাত কাপড় শুধু তাহাদেরই মিলিবে। কাপড়ের দুর্ভিক্ষেও চাউলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় কতকগুলি লোক লক্ষপতি হইতেছে। তফাৎ এই যে এবার এই লুঠে খবরের কাগজগুলিরও কিছু ভাগ মিলিয়াছে। কিন্তু খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন সেলাই করিয়া পরিলে লোকের লজ্জা নিবারণ হইবে না, লাটসাহেবের এটা বুঝা উচিত।

তারপর যানবাহনের অবস্থা। রেলে ভ্রমণ যে কি ভীষণ দুঃসহ তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। কামরায় স্থানাভাবে পা-দানিতে ঝুলিয়া আসিতে গিয়া চাকার নীচে পড়িয়া বা লাইনের পাশের পোষ্টে আঘাত পাইয়া প্রাণ হারানোর বহু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ট্রেনের ভিড়ে মৃত মানুষের দেহ টানিয়া বাহির করিবার সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীতে আলোর অভাবে অন্ধকারে মালপত্র লইয়া ওঠানামা করিতে গিয়া মাথায় হাতে পায়ে আঘাত লাগা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বাংলার লাট হয়তো বলিবেন রেল তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে। ভাল কথা। কিন্তু বাস, ট্রাম, রিক্সা, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি তো তাঁহার এলাকার বাহিরে নয়? উহাদের কি উন্নতি গত দেড় বৎসরে তিনি করিতে পারিয়াছেন? সার্কাস ও জিমনাষ্টিক না জানিলে ট্রামে বাসে ভ্রমণ অসাধ্য। মেয়েদের শালীনতা রক্ষা করিয়া চলাফেরা আরও দুরূহ। ট্যাক্সি পাওয়া যায় না, পাইলে অতিরিক্ত ভাড়া না দিলে যায় না। আড়াই শো মাইল ট্রেনে আসিতে যে ভাড়া লাগে তার দ্বিগুণ না দিলে ঘোড়ার গাড়ী মেলে না। রিক্সা পর্যন্ত পাওয়া কঠিন। যে রাস্তা রিক্সা আগে এক আনায় যাইত এখন সেখানে বারো আনা দাবি করে। রিক্সার মালিকেরা কি পরিমাণ ভাড়া বাড়াইয়াছে এবং রিক্সা-চালকেরাই বা তদনুপাতে কি হারে আদায় করিতেছে তাহার অনুসন্ধান হওয়া দরকার। রিক্সা ভাড়া সস্তা হইলে বহু লোক উহার সাহায্যে ভ্রমণ করিত, ট্রাম বাসে ভিড় তদনুপাতে কমিত।

ঔষধ এখনও দুষ্প্রাপ্য। সাগু, বার্লি প্রভৃতি রোগীর পথ্য আজও সহজলভ্য হয় নাই। দুধ তো রোগীর পক্ষেও পাওয়া অসাধ্য। বড় বড় কর্মচারীদের জন্য বহু আপিসে ও কারখানায় দৈনিক দশ সের করিয়া বরফ বরাদ্দ আছে। কিন্তু রোগীর জন্য এখনও বাজারে বরফ পাওয়া যায় না। কলিকাতায় বাসস্থান সমস্যার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই। বাড়ী তৈরির সাজসরঞ্জাম সহজলভ্য করিয়া দিলে এই ভীষণ অসুবিধা হইতে লোকে কতকটা অন্ততঃ রেহাই পাইতে পারিত।

দেশে গবর্মেণ্ট নামের উপযুক্ত কোন শাসনযন্ত্র থাকিলে গত তিন বৎসরে এই অবস্থার অন্ততঃ খানিকটা উন্নতি হইত ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। অন্ন বস্ত্র ও ঔষধ সমস্যা সমাধানে তিন বৎসর সময় কম নয়। গবর্ণরের যুক্তি ও মন্ত্রণাদাতার বদলের বড়ই দরকার মনে হয়।

খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে মিঃ কেসীর বক্তব্য

মিঃ কেসী বলিয়াছেন:

"বর্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির দিনে খাদ্য সমস্যাই হইতেছে

বাংলার সর্বপ্রধান সমস্যা। যাহা হউক, আজ আমি আনন্দের সহিত এ কথা আপনাদিগকে বলিতে পারিতেছি যে, এই প্রদেশে আমার আগমনের পর গত ১৮ মাসের মধ্যে কোন সময়েই খাদ্যসমস্যা বর্তমানের মত এত সহজ হইয়া আসে নাই। ঘটনাচক্রে স্বাভাবিকভাবে এই অবস্থা আসে নাই; বরং এই সমস্যার সহিত প্রত্যক্ষভাবে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম ও চিন্তার বিরাটত্বই এহেন অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই বৎসর আমরা কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ টন অর্থাৎ ২ কোটি ৭০ লক্ষ মণেরও বেশী চাউল ক্রয় করিয়াছিলাম। ১৯৪৫ সালের সূচনায় ৫ লক্ষ টনের কিছু বেশী পরিমাণ চাউল গবর্মেণ্টের হাতে মজুত ছিল। ১৯৪৫ সালের প্রথম ছয় মাসে নূতন চাউল ক্রয় এবং মজুত চাউল ব্যয়ের পরিমাণ যাহা হইবে বলিয়া আমরা পূর্বে হিসাব করিয়াছিলাম, প্রায় সেইরূপই হইয়াছে এবং অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, যে পরিমাণ মজুত চাউল লইয়া আমরা বর্ষারম্ভ করিয়াছিলাম বর্তমানে তদপেক্ষা অনেক বেশী চাউল আমাদের হাতে রহিয়াছে।

"ভালভাবে গুদামজাত করিয়া রাখিতে না পারায় ১৯৪৪ সালে কিছু পরিমাণ চাউল ও অন্যান্য শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা প্রকৃতই দুঃখজনক; কিন্তু যুদ্ধের জন্য মাল-মসলা না পাওয়ায় উপযুক্তরূপ গুদাম প্রস্তুত করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সংক্ষেপতঃ বলা চলে—অতঃপর গবর্মেণ্টের কর্তৃত্বে ও পরিচালনায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টন শস্য মজুত রাখার উপযোগী গুদাম থাকিবে।

"গবর্মেণ্টের কর্তৃত্বে যে বহুসংখ্যক গুদাম আমরা তৈরি করিয়াছি, সেগুলি যে কেবল যুদ্ধের সময়েই আমাদের বিশেষ কাজে লাগিবে তাহা নহে, যুদ্ধের দরুন বর্তমানে খাদ্য সমস্যার যে জরুরী অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহা কাটিয়া যাওয়ার পরও দুর্গতদের সাহায্যকল্পে এবং প্রাকৃতিক বিপদ আপদ ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকার-ব্যবস্থা হিসাবে গবর্মেণ্টের পক্ষে নিজেদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল ও ধান্য মজুত রাখা একান্ত উচিত হইবে বলিয়া আমি মনে করি।

"গত কয়েক মাস যাবৎ এই একটি বিষয় বিশেষভাবে অনুভব করা যাইতেছে যে, আমাদের বর্তমান মজুত চাউলের অধিকাংশই বেশ উত্তম হইলেও যদি আমরা আরও দ্রুততার সহিত গুদাম হইতে চাউল বাহির করিয়া দিয়া নূতন আমদানী চাউল দ্বারা গুদাম ভর্তি করিতে না পারি, তাহা হইলে গুদামজাত করার ব্যবস্থা ভাল হওয়া সত্ত্বেও বেশী দিন মজুত চাউল ভাল থাকিতে পারে না। এইজন্যই আমাদের অপেক্ষা খারাপ অবস্থায় পতিত ভারতের অন্য কোন কোন অংশের সাহায্যার্থ এবং মহামান্য সম্রাটের গবর্মেণ্ট ও ভারত-সরকারের মধ্যে ব্যবস্থাক্রমে ঋণ হিসাবে সিংহলে প্রেরণের জন্য ভারত-সরকারকে আমরা ১০০০০০ টন পরিমাণ চাউল প্রদান করিতেছি।

"আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমরা আসাম হইতে প্রায় ৪০,০০০ টন চাউল পাইব।"

প্রথমেই আমরা বলিতে বাধ্য চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও এজেণ্টদের গবর্ণর যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন তাহার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে আমরা অক্ষম। চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের সমস্ত হিসাব অত্যন্ত গোপন রাখা হইয়াছে, বার বার দাবি করা সত্ত্বেও বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উহার পূর্ণ হিসাব দাখিল করা হয় নাই। এজেণ্টের মারফৎ চাউল ক্রয়ের তীব্র নিন্দা দুর্ভিক্ষ কমিশন করিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও এই বন্দোবস্তই এখনও বহাল আছে। কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা পাকা, এজেণ্টদের লাভও সুনিশ্চিত, ক্ষতি বহন করিবে একা দেশবাসী, চাউলের ব্যবসায়ে গবর্মেণ্ট এই ধারা অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছেন, এখনও চলিতেছেন।

মজুত চাউলের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ভারত সরকারকে এক লক্ষ টন চাউল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার আসাম হইতে ৪০ হাজার টন চাউল আমদানীর কারণ কি? এখানে গবর্মেণ্ট লাভের টাকা কাহার পকেটে দিতে চান? আসামের চাউল ক্রয় সিণ্ডিকেটের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে তদন্ত হইতেছে তাহার বিবরণীতে দেখিতেছি সেখানে গুদামজাত মজুত চাউলের অর্দ্ধেক পচিয়াছে, অপর অর্দ্ধেকও পচিবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া বিভাগীয় ইনস্পেক্টরই অভিযোগ করিতেছে। আসাম হইতে চাউল রপ্তানীর নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া দেওয়ার পরও বাংলা হইতে চাউল লইবার জন্য কোন নৌকা আসে নাই বলিয়া লোকে অভিযোগ করিতেছে। এই অবস্থায় হঠাৎ আসাম হইতে চাউল আমদানীর প্রয়োজন ঘটিল কেন? মিঃ কেসী নিজেই বলিতেছেন, "যে পরিমাণ মজুত চাউল লইয়া আমরা বর্ষারম্ভ করিয়াছিলাম বর্তমানে তদপেক্ষা অনেক বেশী চাউল আমাদের হাতে রহিয়াছে।" চাউল সোনা নয় যে যত দিন ইচ্ছা রাখা চলিবে। যত শীঘ্র সম্ভব পুরানো চাউল বিক্রয় করিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করা দরকার। ফসল যেভাবে প্রতি বৎসরই ভালর দিকে চলিয়াছে তাহাতে বর্ষারম্ভে মজুত চাউল অপেক্ষা বর্ষশেষে মজুত চাউলের পরিমাণ কম হওয়াই উচিত। অথচ মিঃ কেসী যাঁহাদের কর্ম ও চিন্তার বিরাটত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের কর্মকৌশলে উহার বিপরীত অবস্থা ঘটিতেছে। ১৩৷৷০ টাকা দরে কেনা চাউল গুদামজাত হইতে ১৬ টাকার কম নিশ্চয়ই পড়ে না। আগামী বৎসর ফসলের দাম যথেষ্ট পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, তখন এই চক্রবৃদ্ধি হারে বর্দ্ধিত মজুত চাউলের লোকসান বহন করিবে কে?

এক লক্ষ টন চাউল ভারত-সরকারকে দিয়া অনাবশ্যক বোঝা নামাইবার চেষ্টা আসামের চাউল আমদানীর দ্বারা ব্যর্থ করা হইতেছে কাহার বা কাহাদের স্বার্থে তাহা প্রকাশিত হওয়া দরকার। দুর্ভিক্ষের বৎসরে চাউল ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে উডহেড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর উহাদিগকে সার্টিফিকেট না দিয়া মিঃ কেসীর উচিত ছিল চাউলের এজেণ্ট ও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত করা। আসাম সরকার ইহা করিয়াছেন, কিন্তু বাংলায় চাউলের ব্যবসায়ে যাহারা এক একটি প্রাণের বিনিময়ে হাজার টাকা হিসাবে দেড়শো কোটি টাকা লাভ করিয়াছে মিঃ কেসী তাহাদিগকে আজও পক্ষপুটাশ্রয়ে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিতেছেন।

সর নাজিমুদ্দীনের অভিমতের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-নিবেদন অনুসরণ করিলে এই বেতার-বক্তৃতার উৎসের সন্ধান মেলা হয়ত কঠিন হইবে না।

বস্ত্র সমস্যা সম্বন্ধে মিঃ কেসী

বস্ত্র সমস্যা সম্পর্কে মিঃ কেসী বলেন, "যদি মুনাফাখোরী ও চোরাবাজারী অত্যাচার নাও থাকিত তথাপি আমাদিগকে কাপড়ের বিরাট্ ঘাট্‌তির সম্মুখীন হইতেই হইত। বিশ্বের সর্বত্রই কাপড়ের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় কম। কয়লা ও শ্রমিকের সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় এবং বাহিরের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় সমগ্র ভারতেই বস্ত্রের ঘাট্‌তি দেখা দিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন এবং বিশ্বের আরও অনেক দেশকেও অনুরূপভাবেই বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং সে-সব দেশও হয়ত 'বস্ত্র দুর্ভিক্ষে'র কথা বলিতে পারে।

"অস্থায়ী বস্ত্র বণ্টন পরিকল্পনা অনুযায়ী—যাহাদের সবচেয়ে প্রয়োজন বেশী এমন লোকদের মধ্যে—আমরা যতটা সম্ভব কাপড় বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। যত শীঘ্র সম্ভব হয় সমগ্র প্রদেশেই পরিপূর্ণ বস্ত্র বরাদ্দ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করার উদ্যোগ-আয়োজন করা হইতেছে। ইতিমধ্যে কলিকাতা ও মফস্বলের সর্বত্রই ন্যায্যভাবে বস্ত্র বণ্টনের অস্থায়ী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলিতেছে।"

বেতার-বক্তৃতার ব্যাখ্যার জন্য লাটপ্রাসাদে আহূত এক সাংবাদিক বৈঠকে মিঃ কেসী আশ্বাস দেন যে পূজার পূর্বেই বস্ত্র রেশনিং প্রবর্তিত হইবে। মিঃ কেসী ইহাও বলেন যে বস্ত্র রেশনিং শুধু কলিকাতাতেই হইবে না, কলিকাতার বাহিরে সারা বাংলায় পারিবারিক রেশন কার্ডের হিসাবে "ন্যায়সঙ্গত ভাবে" বস্ত্র বণ্টন করা হইবে। বস্ত্রাভাবে স্ত্রীলোক এবং পুরুষেরা আত্মহত্যা করিতেছে বলিয়া সংবাদপত্রসমূহে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তৎপ্রতি গবর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি বলেন যে এই সমস্ত সংবাদ তিনি দেখিয়াছেন। এইরূপ শোচনীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য মফস্বলে অবিলম্বে বস্ত্র রেশনিং প্রবর্তিত হইবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণর বলেন যে এই সব আত্মহত্যার সংবাদ সম্পর্কে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাপড়ের জন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু লোক আত্মহত্যা করিয়া থাকে এই কথা বলিয়া গবর্ণর এই গুরুতর সমস্যা থামা চাপা দিবার চেষ্টা করেন এবং বলেন যে মফস্বলে যেভাবে বস্ত্র বণ্টন করা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট আছেন। কাপড় বিলির লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপনপুষ্ট সংবাদপত্র-প্রতিনিধিবৃন্দ ইহার কোন জবাব দিয়াছিলেন বলিয়া কেহ উল্লেখ করেন নাই।

কাপড়ের অভাবে মফস্বলে আত্মহত্যা ঘটিতেছে ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ আমরা দেখি না। গবর্ণর বলিয়াছেন তিনি ইহা বিশ্বাস করেন না, যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিয়া তিনি এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করেন নাই। আত্মহত্যা ছাড়া কাপড়ের দোকান লুঠের সংবাদও মাঝে মাঝে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক স্থানে কাপড়ের জন্য প্রতীক্ষমান অসহিষ্ণু জনতার উপর গুলি চালাইবার সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

কাপড়ের অভাবে লোকের, বিশেষতঃ মেয়েদের অবস্থা অবর্ণনীয়। গ্রামবাসী দরিদ্র নারীদের অধিকাংশেরই ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই। বাড়ীর এক প্রস্থ কাপড় পরিয়া পুরুষেরা কাজে বাহির হইয়াছে, উহারা ফিরিলে সেই কাপড় পরিয়া মেয়েরা ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ সংবাদও আমরা প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি। মধ্যবিত্ত বহু পরিবারের অবস্থাও সমান সঙ্গীন। মেয়েদের বাড়ীর বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। কাপড়ের অভাবে আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখা করাও অনেকের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার লাট মিঃ কেসী ইহাকে সঙ্গীন অবস্থা মনে করেন না, বর্তমান অবস্থাতেই তিনি সন্তুষ্ট।

চোরাবাজারে এখনও কাপড় পাওয়া কঠিন হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। ওয়ার্ড কমিটিতে দিনের পর দিন এবং দোকানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরণা দিয়া কাহারও কাহারও ভাগ্যে এক আধখানা কাপড় মাত্র জুটিতেছে। করিৎকর্ম্মা লোকেরা বাকিটা চোরাবাজার হইতে সংগ্রহ করিতেছে, যাহাদের সে সাধ্য নাই তাহারা সিভিল সাপ্লাইয়ের বিজ্ঞাপন পড়িয়া ধন্য হইতেছে। বাংলায় আপাততঃ মন্ত্রী নাই; ব্যবস্থা-পরিষদও নাই। সুতরাং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইবার উপায় বন্ধ। সিভিলিয়ান গ্রিফিথ সাহেব সিভিল সার্ভিস পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। এই লুঠের বাজারে তাঁহাকে আবার সরকারী কর্মে অবতীর্ণ হইতে দেখিতেছি। কিন্তু তাঁহার কাজে দেশের কোন উপকার হইয়াছে বলিয়া কেহ বলিবে না। তাঁহারই অধীনে হাওলিং এজেন্ট ও সাব-এজেন্টদের হাতে কাপড় বিলির ভার পড়িবার পর প্রকাশ্য বাজারে কাপড় একেবারেই উধাও হইয়াছে।

গবর্ণর তাঁহার বেতার বক্তৃতার ভাষ্যে রেশনিং-এর আশাও দিয়াছেন, আবার বড় বড় পুঁজিপতিদের লইয়া কাপড়ের সিণ্ডিকেট গঠনের কথাও বলিয়াছেন। ইহার কোন্‌টি তাঁহার মনোগত প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা বুঝা দুঃসাধ্য। কাপড় রেশনিং হইলে সিণ্ডিকেটের প্রয়োজন কেন হইবে আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। সরকারী গুদামে সমস্ত কাপড় গ্রহণ করিয়া রেশনের দোকানের মারফৎ উহা বিলির ব্যবস্থা না করিয়া গবর্ণর সব পুঁজিপতিকে দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন? সিণ্ডিকেট গঠন সম্বন্ধে গবর্ণর বলেন:

এই সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চলিতেছে। গবর্মেণ্ট বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যানদের সহিত এই সম্পর্কে পরামর্শ করিতেছেন এবং তিনি আশা করেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এই প্রস্তাবিত সিণ্ডিকেটে সন্তোষজনক অংশ লাভ করিতে পারিবেন। গবর্মেণ্ট মনে করেন যে, যে সমস্ত সর্তে এই সিণ্ডিকেটকে কাজ করিতে বলা হইবে তাহার ফলে চোরাবাজারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। গবর্মেণ্ট মনে করেন যে, সরকারী তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে বহু প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে একটি প্রতিষ্ঠানেরই বস্ত্র ব্যবসায় পরিচালনা করা কা[illegible] এই কারণেই এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন[illegible]

দিয়াছে। এই সম্পর্কে গবর্ণর আরও বলেন যে, যদি এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় তাহা হইলে হ্যাণ্ডলিং এজেণ্টদের আর হ্যাণ্ডলিং এজেণ্ট হিসাবে কোন কাজ থাকিবে না; তবে তাঁহারা যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্ররক্ষাকারী হিসাবে কাজ করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

আমাদের ধারণা এইরূপ বন্দোবস্তে কাপড়ের বাজারে লুঠের ভাগীদারদের সংখ্যাই শুধু বাড়িবে, সাধারণ লোকের কাপড় প্রাপ্তির অতিরিক্ত কোন সুবিধা ইহাতে হইবে না।

পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে মিঃ কেসী

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দেশের তরুণ-তরুণীদের স্বাস্থ্য কি ভাবে নষ্ট হইতে চলিয়াছে তাহার পরিচয় এখনই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে আর কয়েক বৎসরে একটি সমগ্র বংশ পঙ্গু এবং অল্পবুদ্ধি হইয়া গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ভাবীযুগের বাঙালীর উপর ইহার অতি ভয়াবহ পরিণাম দেখা দিবে। এই যুদ্ধে ব্রিটেন এই অতিগুরুতর সমস্যাটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। বাংলায় যেভাবে উহা জানিয়া শুনিয়া উপেক্ষা করা হইয়াছে তাহাতে এই উদাসীনতা বাঙালীর ধ্বংস সাধনের প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই সন্দেহ হয়।

পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে মিঃ কেসীর বক্তব্য এই:

"বর্তমানে আমরা মাছ দুধ, শাকসব্জী প্রভৃতি দেহ-সংরক্ষণের উপযোগী অন্যান্য খাদ্যের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছি। প্রদেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে শাকসব্জীর বীজ বিতরণ করায় বর্তমান বৎসরে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে বিলাতী শাকসব্জী পাওয়া গিয়াছে এবং আমি আশা করি, বর্ষাকালের শাকসব্জী সরবরাহের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে।

"বাংলার আমিষ জাতীয় প্রধান খাদ্য হিসাবে মাছের গুরুত্বের বিষয় আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি। বিগত দুর্ভিক্ষে মৎস্যজীবীকুল বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; তাহারা যাহাতে মাছ ধরিতে পারে ও তাহাদের ব্যবসায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। উপযুক্ত পরিমাণ বরফ ব্যতীত শহর অঞ্চলে মৎস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। বরফ নিয়ন্ত্রণকারীর চেষ্টায় কলিকাতায় বরফ সরবরাহের পরিমাণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

"দুগ্ধের ব্যাপারেও কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। দুধ সরবরাহের পরিমাণ কম এবং ইহার মূল্যও বেশী। গুণের দিক দিয়াও দুধ নিকৃষ্টতর। বহু বালক-বালিকা ও সন্তানবতী নারী তাহাদের প্রয়োজন অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ দুধ পাইতেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদিগকে ভেজাল-মিশ্রিত দুধই গ্রহণ করিতে হয়।"

তিন বৎসর যাবৎ আরও ফসল ফলাইবার আন্দোলনে বিজ্ঞাপনে বেতনে ও ভাতায় কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়াছে, শাকসব্জীর উৎপাদন বাড়িয়াছে বাজারে গিয়া কেহ ইহা বলিবে না। বিলাতী শাকসব্জীর পরিমাণ বাড়িয়াছে মিঃ কেসীর এই উক্তি আমরা বিশ্বাস করি, বীজ বিতরণটা ঐ দিক দিয়াই করা হইয়াছে। কলিকাতার গত বৎসর শাকসব্জীর তীব্র দুর্ভিক্ষের সময় দার্জিলিং হইতে যে সব সব্জী আসিয়াছিল তাহা নিউমার্কেট মারফৎ সাহেবদের মধ্যেই বিক্রয় হইয়াছিল, কলিকাতাবাসী ইহা ভুলে নাই। মিঃ কেসী না বলিলেও বীজ বিতরণে সরকারী নীতি অক্ষুণ্ণ আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতাম।

মাছের অভাব দূর করিবার আগ্রহ বাংলা-সরকারের দেখা যায় না ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, এই বস্তুটির উপর সাহেবদের ততটা লোভ নাই। রুই কাতলা যতখানি তাঁহাদের দরকার ততখানি অনায়াসেই মিলিতেছে। আমরা জানি মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ হোরা বাংলার মৎস্যাভাব ঘুচাইবার জন্য একটি কার্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া বহু দিন যাবৎ গবর্মেণ্টকে উহা গ্রহণ করাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হইয়াছে, উহা কার্য্যে পরিণত হইলে যথেষ্ট সুফল হইবে ইহা নিশ্চিত। মাছ ধরিতে গেলে নৌকা চাই, এই অজুহাতে বাংলা-সরকার দুই বৎসরে সাত কোটি টাকা তাঁহাদের কতিপয় প্রিয়পাত্রের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। এই টাকায় কয়খানি নৌকা তৈরি হইয়াছে এবং কয়খানি নৌকা মাঝিদের হাতে গিয়া মাছ ধরিবার কাজে লাগিয়াছে মিঃ কেসী তাহা বলেন নাই। আমাদের আশঙ্কা এই টাকায় কাঠের নৌকা জলে ভাসানোর বদলে রূপার ও সোনার নৌকা ভাগ্যবানদের ঘরে উঠিতেছে। বাংলা গবর্মেণ্টে মানুষ থাকিলে এই লুঠের একটা সন্ধান অন্ততঃ হইত।

তারপর দুধ। প্রসূতি, শিশু, ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণীদের জন্য দুধের প্রয়োজন বলিয়া বুঝাইবার দরকার করে না। কলিকাতায় বিক্রীত দুধের শতকরা ৮০ ভাগ জলমিশ্রিত, এবং কোন কোন দুধে শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত জল ইহা সর্বজন-বিদিত। সম্প্রতি এক প্রকাশ্য বক্তৃতায় বাংলা-সরকারের দুগ্ধবিশারদ ডাঃ লালচাঁদ সিক্কাও ইহা বলিয়াছেন। বেতার-বক্তৃতার ভাষ্যে লাটসাহেব বলিয়াছেন দুগ্ধ রেশনিং সম্ভব হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তিনি বলেন এজন্য বহু বিশ্বস্ত কর্মচারী প্রয়োজন, গবর্মেণ্টের এখন ইহা নাই। যদি তাই হয়, যথেষ্ট সংখ্যায় সাধু ও বিশ্বস্ত কর্মচারী যদি গবর্মেণ্টের হাতে না থাকিয়া থাকে, তবে জনসাধারণের টাকা খরচ করিয়া ডাঃ সিক্কাকে বোম্বাইয়ের দুগ্ধ রেশনিং শিখিয়া আসিবার জন্য পাঠান হইল কেন?

মৎস্য ব্যবসায় সম্বন্ধে লাটসাহেব তাঁহার বক্তৃতার ভাষ্যে বলিয়াছেন, এখানে মৎস্যের উন্নতির সম্ভাবনা খুবই আছে তবুও ব্যবসায়ী সঙ্ঘ কেন যে গড়িয়া উঠে না তিনি বুঝিতে পারেন না। সহজ ভাবে দেখিলে না বুঝিবার কারণ ইহাতে নাই। সুন্দরবনে মাছের সের বড় জোর চারি আনা কি আট আনা, কলিকাতায় সাড়ে তিন টাকা। লাভের সবটা টাকা পায় দালাল ব্যবসায়ী। সুতরাং যে-সব শৃগাল একবার মরা মানুষের মাংসের স্বাদ পাইয়াছে তাহারা হঠাৎ বৈষ্ণব হইয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিবে এতটা দুরাশা লাটসাহেব করিলেও আমরা করিতে অক্ষম। তারপর যেখানে গবর্মেণ্টের উদাসীন্য এই লুঠের পরম সহায়, সেখানে তো কথাই নাই।

বাংলার করবৃদ্ধি সম্বন্ধে মিঃ কেসী

প্রদেশের আর্থিক অবস্থা বলিতে গিয়া মিঃ কেসী সাম্প্রতিক কর বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গবর্মেণ্ট মোটর স্পিরিট, সেলস ট্যাক্স, আবগারী বিভাগ এবং লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি করিয়াছে। জুয়াখেলার উপরেও কর বৃদ্ধি সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে।

তিনি বলেন, ঘাটতি পূরণের জন্যই কর দরকার নয়, যুদ্ধোত্তর উন্নয়ন কার্যের জন্যও কর প্রয়োজন। ভারত গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে অর্থসাহায্য করিবেন। কিন্তু নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইবার চেষ্টা না করিলে ভারত গবর্মেণ্ট তাহাদের সাহায্য করিবেন কেন? এই কর বৃদ্ধি দ্বারা গবর্মেণ্ট দুই এক কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে চান।

কিন্তু ভারত-সরকারের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হওয়া অথবা দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র জনসাধারণের শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত শোষণ করিয়া টাকা আদায়ের চেষ্টা করিবার আগে ব্যয়-সঙ্কোচের দিকে মন দেওয়া কি উচিত ছিল না? বাংলা-সরকারের অপচয় আজ হাজারে লক্ষে সীমাবদ্ধ নয়, উহা দশ বিশ কোটির অঙ্ক ছাড়াইতে চলিয়াছে ইহা আমরা বহু বার বলিয়াছি, বিবিধ প্রসঙ্গে এই সংখ্যায় অন্যত্র তাহার কিছুটা দেখানও হইয়াছে। অপচয় নিবারণে লাটসাহেব চেষ্টা জোর দিলে কর বাড়ানো দূরের কথা, কোন কোন করভার লাঘব করাও চলিত।

রেশনের দোকান হইতে কর্পোরেশনের নমুনা সংগ্রহের অধিকার

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি এলিস এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রেশনের দোকান হইতে পরীক্ষার জন্য খাদ্যদ্রব্যের নমুনা সংগ্রহের অধিকার কর্পোরেশনের আছে এবং শহরের রেশনের দোকানের দোকানদার কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ফুড ইনসপেক্টরকে মূল্য লইয়া পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নমুনা সরবরাহ করিতে বাধ্য। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের গবর্মেণ্ট ষ্টোরের ম্যানেজার কর্পোরেশনের ফুড ইনসপেক্টরকে খাদ্যদ্রব্যের নমুনা বিক্রয়ে অস্বীকার করায় এই মামলার উদ্ভব হয়। মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে প্রথমে উহার বিচার হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে রায় দিয়া বলেন যে কোন রেশন করা দ্রব্য কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার বা ফুড ইনসপেক্টরকে বিক্রয় করা যাইতে পারে না; রেশনের দোকানে বিক্রীত রেশন করা খাদ্যদ্রব্যের ভালমন্দের প্রশ্ন উত্থাপন করিবার অধিকার হেলথ অফিসারের নাই। কর্পোরেশন হাইকোর্টে আপীল করিলে প্রধান বিচারপতি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া মামলার পুনর্বিচারের আদেশ দেন।

রেশনের দোকানে যে-সব খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয় স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় তাহা বহুলাংশে নিকৃষ্ট, সময় সময় অতি অখাদ্য খাদ্যও দেওয়া হয়। ইহার প্রতিকারের কোন পথ ছিল না। রেশনের দোকানে বিক্রীত চাউল ও আটা ময়দা খাইয়া লোকের কি অবস্থা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কলিকাতার বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কলিকাতা রিলিফ কমিটির নিকট যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি। তাহার পর মাঝে মাঝে অবস্থার কতকটা উন্নতি হইলেও মোটামুটি উহা প্রায় একই প্রকার আছে। রেশনের দোকানের বাহিরে সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, ঘি, খোলা দালদা প্রভৃতিতে যে কি ভীষণ ভেজাল চলিতেছে তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। দেশে গবর্মেণ্ট নামের উপযুক্ত কোন শাসনযন্ত্র থাকিলে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিয়া মানুষের স্বাস্থ্যনাশকারী নরপশুর দলকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহাদিগকে প্রকাশ্য বাজারে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিত। কিন্তু বর্তমান "গবর্মেণ্ট" তাহা তো করেই নাই, বরং ভেজাল দ্রব্য পরীক্ষায় বাধা দিয়াছে এবং সরকারী কাউন্সেল চূড়ান্ত নির্লজ্জের ন্যায় আদালতে বলিয়াছেন যে যুদ্ধের জন্যই খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল চলিতেছে। প্রধান বিচারপতির সহিত বাংলা-সরকারের কাউন্সেল মিঃ এ. কে. বসুর কথোপকথন নিম্নে প্রদত্ত হইল, খাদ্যে ভেজালদাতাদের রক্ষা করিবার জন্য বাংলা-সরকারের অত্যুগ্র আগ্রহ ইহা হইতেই বুঝা যাইবে:

দোকানের ম্যানেজারের পক্ষে মিঃ বসু মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় সমর্থন করিয়া বলেন যে, বঙ্গীয় রেশনিং আদেশের মধ্যে ঐ তিনটি প্যারাগ্রাফ থাকায় কর্পোরেশনের কর্মচারী এই দোকান হইতে রেশন-করা কোন দ্রব্য পাইতে পারেন না।

প্রধান বিচারপতি:—জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার উপায় তাহা হইলে কি হইবে?

মিঃ বসু:—জনসাধারণের স্বার্থ সম্বন্ধে যথোচিত বিবেচনা করিয়া গবর্মেণ্ট এই রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্মেণ্ট একজন চীফ ইনস্পেক্টর ও ৪ জন ইনস্পেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। রেশনের দোকানে মাল পাঠাইবার পূর্বে তাঁহারা সেগুলি পরীক্ষা করেন এবং নমুনা গ্রহণ ও পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় ব্যবস্থাও আছে। খাদ্যদ্রব্য যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্য কর্পোরেশন অপেক্ষা গবর্মেণ্টের আগ্রহ কম, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। যুদ্ধের অবস্থার মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে জিনিসপত্র যেরূপ পাওয়া যাইত, যুদ্ধের সময় তাহা তত টা ভাল না হইতে পারে। যুদ্ধের অবস্থার জন্যই যে তাহা হইতেছে, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

প্রধান বিচারপতি—যুদ্ধের সময় গম উৎপন্ন হইলে তাহা কি নিকৃষ্ট হয়?

মিঃ বসু—না, তবে রেশন করা খাদ্যদ্রব্যে অন্য জিনিসও থাকিতে পারে; স্বাভাবিক সময়ে ঐ সকল জিনিস মিশান হয় না।

প্রধান বিচারপতি—অন্য জিনিস মিশান যাহাতে না হয় তজ্জন্য কি ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয় নহে?

মিঃ বসু উত্তরে বলেন যে, উহার জন্য গবর্মেণ্টের ব্যবস্থা আছে। যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে আইনগত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য গবর্মেণ্টের ব্যবস্থা সম্পর্কে আদালতের বিবেচনা করার প্রয়োজন নাই।

সরকারপক্ষে মিঃ অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী আইনের দিক

হইতে বিষয়টি আলোচনা করিয়া বলেন যে, গবর্মেণ্টও নাগরিকগণের স্বার্থের প্রতি অবহিত আছেন।

বিচারপতি মিঃ এলিস—তাহা হইলে এক্ষেত্রে বিরোধিতা করা হইতেছে কেন?

মিঃ রায় চৌধুরী উত্তরে বলেন যে, পরীক্ষার জন্য বঙ্গীয় রেশনিং আদেশে অন্যান্য বিধান আছে। কর্পোরেশন যথানিয়মে গবর্মেণ্টকে জানাইয়াছিলেন ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই।

প্রধান বিচারপতির রায়ের নিম্নলিখিত অংশটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অভিমত এই যে, নমুনা চাহিয়া কর্পোরেশনের ডাক্তার তাঁহার অধিকারসম্মত কাজ করিয়াছেন এবং ষ্টোরের ম্যানেজার তাঁহার নিকট আটা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারও আইনসঙ্গত হয় নাই।

প্রধান বিচারপতি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, এই মামলাটিকে কর্পোরেশন এবং গবর্মেণ্টের মধ্যে একটি সংঘর্ষ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু জনসাধারণকে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে তাহা যাহাতে খারাপ না হইতে পারে তজ্জন্য জনসাধারণের সুবিধাকল্পে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে যে বিধান রহিয়াছে তাহার সহিত এই মামলার সম্পর্ক আছে। জনসাধারণকে যাহাতে খারাপ খাদ্য-দ্রব্য লইতে না হয় তজ্জন্য ইহা ছাড়া আইনে আর কোন ব্যবস্থা নাই। জনসাধারণের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, জনসাধারণকে এইভাবে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা সঙ্গতই হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য রেশনিং পরিকল্পনা চালু করা হইয়াছে এবং জনসাধারণ যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন। জন-সাধরণকে যাহাতে খারাপ খাদ্যদ্রব্য লইতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে ঐরূপ বিধান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রামবাসীর অবস্থা

কাপড়, কেরোসিন, লবণ, চিনি ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গলার গ্রামগুলির যে দুর্দশা হইয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। কাপড়ের অভাবে স্ত্রীলোকদের আত্মহত্যার সংবাদ প্রায়ই প্রকাশিত হইতেছে। কেরোসিনের অভাবে সন্ধ্যার আগেই সকলকে সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া অন্ধকারে বসিয়া থাকিতে হয়। মাঝে মাঝে এমনও অবস্থা হয় যে রাত্রে কাহাকেও সাপে কামড়াইলেও বাতি জ্বালিয়া শুশ্রূষা করিবার উপায় থাকে না। ১২ই আষাঢ়ের দৈনিক কৃষকে জনৈক গ্রামবাসীর একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইতে গ্রামা-ঞ্চলের অবস্থা ও অত্যাচারের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত হোসেনপুর থানার অধীন মাধখলা, গোবিন্দপুর, গাঙ্গাটিয়া, আড়ুহা, পানান প্রভৃতি গ্রাম লইয়া গঠিত ৩নং গোবিন্দপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অবস্থা সম্বন্ধে পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন:

"১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে এই বোর্ডের মারফৎ কনট্রোল সিষ্টেমে কেরোসিন তৈল, চিনি প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। প্রথমে গাঙ্গাটিয়া ও গোবিন্দপুর গ্রামের জনকয়েক মেম্বার দোকান খোলেন ও অত্যন্ত চড়া দামে কেরোসিন ও লবণ বিক্রয় করেন। গরীব লোকদিগকে অল্প মূল্যে দেওয়ার জন্য যে সকল কণ্ট্রোলের কাপড় দেওয়া হইয়াছিল তাহা উক্ত বোর্ডের মেম্বরগণ নিজ নিজ অনুগৃহীত ও অনুগত লোকদিগকে যৎসামান্য দিয়াছেন, বাকী সব তাঁহারা পূজাপার্ব্বণে পুরোহিত-দিগকে দেওয়ার জন্য অল্প মূল্যের কাপড় হিসাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

"লবণ, কেরোসিন তৈল ও চিনির দুষ্প্রাপ্যতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইউনিয়ন বোর্ড হইতে তখন রেশন কার্ড দেওয়া হয়, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও প্রায় ৫০০ শত লোক রেশন কার্ড পায় নাই। রেশন কার্ড ছাপা নাই—এই অজুহাতে ৫০০ লোককে ২ বৎসর যাবৎ রেশন কার্ড হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। দরখাস্ত দিয়া এবং মৌখিক ভাবে প্রেসিডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। এই রেশন কার্ড বিলি করার সময় প্রত্যেকের নিকট হইতে চৌকিদারী ট্যাক্সের জন্য টাকা প্রতি ২ সের করিয়া ধান জুলুম করিয়া আদায় করা হয়।"

গ্রামে কাপড় সরবরাহ

বাংলা-সরকার জেলায় জেলায় কয়েক বেল করিয়া কাপড় পাঠাইয়া হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া কৃতিত্ব জাহির করিতেছেন। সে সমস্ত কাপড়ের কতটা গ্রাম-বাসীর হাতে পৌঁছিতেছে এবং উহাতে প্রকৃতপক্ষে কাহারা লাভবান হইতেছে সে সম্বন্ধে পূর্ব্বেও আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। উপরোক্ত পত্রে দেখা যায় আমাদের আশঙ্কা অমূলক নয়। কর্ত্তৃপক্ষের অনুগৃহীত জনকয়েক ভাগ্যবান লোকের ভাগ্যেই কাপড় মিলিতেছে, প্রয়োজনানুসারে কাপড় বিক্রয়ের কোন বন্দোবস্তই হয় নাই। পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন:

"কয়েক মাস হইল মাণ্টি পারপাস সোসাইটী লিঃ নামে একটি কোম্পানী মহকুমায় রেশন সাপ্লাই-এর ভার নিয়াছে এবং গোবিন্দপুর ইউনিয়নের রেশন সাপ্লাই-এর জন্য গাঙ্গাটিয়ায় একটি মাত্র দোকান খোলা হইয়াছে। এই মাণ্টি-পারপাস সোসাইটী কি ভাবে গঠিত, শেয়ারের টাকার জন্য কাহারা দায়ী তাহা আমরা অবগত নহি। ইহার কোন নিয়মাবলী নাই। ইহার উদ্দেশ্য, গঠনপ্রণালী, শেয়ারের টাকার জন্য কে বা কাহারা দায়ী এবং কি ভাবে ইহা পরিচালিত হইবে তাহা ঢোল সহরতে ঘোষণা দ্বারাও গ্রামবাসীদের জানাইয়া দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমানে শুনা যায় যে, উক্ত দোকান হইতে সোডা, দেশলাই এবং নারিকেল তৈলও সরবরাহ করা হয়। কিন্তু দোকান কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে যে, যাহারা এই কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়াছে শুধু তাহাদিগকেই এই সকল জিনিষ দেওয়া হইবে। সম্প্রতি এই বোর্ডের মারফৎ কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়াও শুনা গিয়াছে। বস্ত্র-সঙ্কটের তীব্রতা সারা বাংলায়ই দেখা দিয়াছে কিন্তু যাহারা শহরে বাস করে তাহারা চোরাবাজার হইতেও কাপড় সংগ্রহ করিয়া নিজেদের প্রয়োজন হয়ত মিটাইতে পারে। কিন্তু আমাদের

সুদূর মফঃস্বলবাসীদের কোথাও কাপড় সংগ্রহ করার উপায় নাই। সম্প্রতি বোর্ডে যে কাপড় আসিতেছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প হইলেও যদি রেশন কার্ড দিয়া কাপড় দেওয়া হয় তবে প্রত্যেক লোকেই কাপড় পাইতে পারে বা পাওয়ার একটা আশা থাকে। কিন্তু বর্তমানে বস্ত্র বণ্টন শুধু দোকানের কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের মেম্বরগণ, তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও অনুগত এবং অনুগৃহীতগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। অন্য কেহ চাহিলে হয় তাঁহারা বলেন যে, কাপড় নাই, অথবা মাল্টি-পারপাস সোসাইটীর মেম্বরগণই শুধু কাপড় পাইবে।"

কাপড় ও সূতার অভাবে গ্রামের অবস্থা

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার এক সংবাদেও প্রকাশ (কৃষক, ৬ই আষাঢ়):

"হরিণখোলা ইউনিয়নের সারাটী গ্রামের এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর একখানিও কাপড় যোগাড় করিতে না পারায় স্ত্রীলোকটি লজ্জা নিবারণের উপায়াভাবে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাইয়া স্থানীয় রিলিফ কমিটির কর্ম্মীরা তাহাকে ঘর হইতে দরজা ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া আনিয়া রক্ষা করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাঁদা তুলিয়া তাহাকে একখানি শাড়ী কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাপড়ের অভাবে সমগ্র মহকুমায় হাজার হাজার মেয়ে লজ্জা নিবারণের জন্য ২খানি করিয়া গামছা ব্যবহার করিতেছে এবং শবাচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রখণ্ডের অভাবে কলাপাতা ঢাকা দিয়া মৃতের সংকার করা হইতেছে।

"বর্ত্তমানে চোরাবাজারে গামছা ২॥০-৩৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে এবং মাধবপুর ইউনিয়নে শাড়ী ৩৬৲ এবং ধুতি ২৫৲ পর্যন্ত দামে বিক্রয় হইতেছে।"

সূতার অভাবে তাঁতিদের কি অবস্থা হইয়াছে ঐ সংবাদেই তাহার প্রমাণ আছে:

"হরিণখোলা ইউনিয়নের হরাদিত্য সাহাবাগ অঞ্চলে ২৮৫ ঘর তাঁতী বহুদিন যাবৎ কন্ট্রোল দরে সূতা না পাওয়ার ফলে অধিকাংশ তাঁতেই মাসে দুই সপ্তাহ করিয়া কাজ বন্ধ থাকে। সূতার ব্যবসায়ীরা চোরাবাজারে ৬০।৭০ টাকা দরে সূতা বিক্রী করিতেছে। ইহার ফলে প্রায় সমস্ত তাঁতই বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিশেষ করিয়া যে-সব মুসলমান পরিবারের পুরুষরা সিঙ্গাপুরে আট্‌কা পড়িয়াছিল তাদের মেয়েরা এই ভীষণ অবস্থার মধ্যে অসহায় হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহকুমার সর্ব্বত্র চোরাবাজারে ১৩৲ টাকার সূতা ৩০৲ টাকা বিক্রয় হইতেছে।"

কাপড়ের অভাবে গ্রামবাসীকে কি লাঞ্ছনা ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে নিম্নোদ্ধৃত পত্রটি তাহার পরিচয়। পত্রটি ১৪ই আষাঢ়ের 'কৃষকে' প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন:

"বর্দ্ধমান জেলার সীতাহাটী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত সাকাই, বজরাডাঙ্গা বেনেপাড়া, উদ্ধারণপুর প্রভৃতি গ্রামের চাষী ও দিনমজুরগণ উদ্ধারণপুর ফুড কমিটির মারফৎ কাটোয়ার মহকুমা হাকিমের নিকট কাতর আবেদন জানায় যে, তাহাদিগকে মাথা পিছু অন্ততঃ একখানা করিয়া কাপড় দেওয়া হউক। উত্তরে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ২১শে জুন বৃহস্পতিবার টেক্সটাইল ইন্সপেক্টর বাহাদুর সীতাহাটী বোর্ড অফিসে গিয়া বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা করিবেন। এতদনুসারে প্রায় দুই শত লোক নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সীতাহাটীতে যাইয়া জমা হয়। কিন্তু দুপুর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও টেক্সটাইল ইন্সপেক্টর (পাড়াগাঁয়ে উহাকে কাপুড়ে হাকিম বলা হয়) বা কাপড়ের দেখা পাওয়া যায় না। লোকগুলি হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। এজন্য প্রত্যেককে দেড় টাকা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত মজুরী খোয়াইতে হইয়াছে। এ দিকে শোনা যায় যে, কাটোয়ায় চারি শাঁইট কাপড় দীর্ঘকাল গুদামজাত থাকায় একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেগুলিকে দোকনদাররা পুরা দামে বিক্রয় করিতেছে। অর্দ্ধোলঙ্গ ব্যক্তিরা তাহাই কিনিতে পাইয়া ভাগ্য মনে করিতেছে।"

গ্রামে রেশন সরবরাহের নমুনা

গ্রামে রেশন সরবরাহের যে নমুনা 'কৃষকে'র উক্ত পত্রপ্রেরক দিয়াছে তাহাও প্রণিধানযোগ্য। পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন:

"৫।৬টি গ্রাম লইয়া এই ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত এবং এই ইউনিয়নের ৫।৬টি গ্রামের রেশন সাপ্লাই-এর জন্য গাঙ্গাটিয়ায় একটি মাত্র দোকান খোলা হইয়াছে। প্রান্তের গ্রাম হইতে ইহার দূরত্ব ৪ মাইলের উপর। এখানে ২ সপ্তাহে একদিন করিয়া রেশন দেওয়া হয় কোন্ গ্রামে কবে রেশন দেওয়া হইবে তাহার কোন ঠিক নাই। কবে রেশন দিবে তাহা গাঙ্গাটীয়ায় গিয়া মাঝে মাঝে খোঁজ নিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনেও কখন রেশন দিবে তাহার কোন ঠিক নাই। কোন দিন সকালে কোন দিন দুপুরে আবার কোন দিন বিকালে কর্তৃপক্ষের খেয়াল মত রেশন দিয়া থাকে। এমনও হয় যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে লোক-জন সারাদিন বসিয়া রহিল।·বিকালে কর্তৃপক্ষ জানাইয়া দিলেন যে, ঐ দিন রেশন দেওয়া হইবে না। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, ২।৩ দিন ঘুরিয়াও রেশন পাওয়া যায় না। রেশন দেওয়ার সময় কর্তৃপক্ষ লোকের সহিত এমন দুর্ব্যবহার করেন যে, তাঁহারা যেন লোকদিগকে ভিক্ষা দিতেছেন। ইতিমধ্যে মাধখলা রেটপেয়ার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মাল্টি-পারপাস সোসাইটীর প্রেসিডেন্টের নিকট কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে জানিবার জন্য একখানা চিঠি দিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত সোসাইটীর প্রেসিডেন্ট তাহার কোন জবাব দেন নাই। উক্ত চিঠি দেওয়ার পর রেশন শপে এক চুরি হইয়াছে বলিয়া জনরব উঠিয়াছে এবং যে যে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য চিঠি দেওয়া হইয়াছিল ঐ সকল জিনিষই নাকি চুরি হইয়াছে। এই চুরির সংবাদে অনেকের মনেই দারুণ সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে।"

বাংলার লাট মিঃ কেসি কলিকাতার পথঘাটের পরিচ্ছন্নতা, বাজার, বস্তি প্রভৃতি লইয়া অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াছেন। বস্তির উন্নতির জন্য একটা আইনের খসড়াও তৈরি করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা বারবার বলিয়াছি যে কলিকাতা লইয়া এই মাতামাতিতে দেশের আসল সমস্যা গ্রামের দুঃখ চাপা পড়িতেছে, ইহা ঘোরতর অন্যায়। কলিকাতার অসুবিধা সম্পর্কে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের উপায় আছে, কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে গ্রামের

কথা কেহ বলে না। কলিকাতার ক্ষুদ্র সমস্যা লইয়া মাতামাতি করিলে গ্রাম একেবারে চাপা পড়িবে, গ্রামবাসীর লাঞ্ছনা নরক যন্ত্রণার সামিল হইবে ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। উপরোক্ত পত্রখানিতে একটি মাত্র ইউনিয়নের যে রূপ প্রকটিত হইয়াছে তাহা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে, বাংলার প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক ইউনিয়নের স্বাভাবিক অবস্থাই এই। অসৎ ঘুষখোর ও ব্লাক-মার্কেটিয়ারদের উপর বাংলা-সরকার যে করুণা দেখাইয়া আসিয়াছেন ইউনিয়ন বোর্ডের অসাধু প্রেসিডেন্টরাও তাহা হইতে বঞ্চিত হন নাই। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার হরিণখোলা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সম্বন্ধে দৈনিক কৃষকের রিপোর্ট এই (৬ই আষাঢ়), "প্রেসিডেন্ট এক জনের নিকট হইতেই তিনটি টিপসহি লইয়া এবং তাহাকে একখানি কাপড় দিয়া বাকী দুই জনের কাপড় আত্মসাৎ করার অপরাধে পদচ্যুত হন। প্রকাশ—আবার তাঁহাকেই প্রেসিডেন্ট পদে বহাল করা হইয়াছে।"

মিঃ কেসিকে বারবার এই কথাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে তিনি বাংলার গবর্ণর, কলিকাতার লাট নহেন। সমগ্র বাংলার শাসনসৌকর্য বিধান তাঁহার কর্তব্য। কলিকাতার রাস্তা, বস্তি বা বাজার পরিষ্কার রাখিলেই বাংলার গবর্ণরের দায়িত্ব শেষ হয় না।

বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

বর্ষা আসিয়াছে, উহার অবসানও আগতপ্রায়। বর্ষাবসানে দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িবে। এখন হইতেই এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়া গবর্মেণ্টকে তাঁহাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন :

"বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে এখন হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

"ম্যালেরিয়া ও বসন্ত যাহাতে মহামারীর আকারে দেখা না দিতে পারে সেজন্য আমাদের চেষ্টা সফল হইলেও, আমার মনে হয় এই বৎসর বাংলা দেশে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা শক্ত হইবে। কারণ বাংলা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন পাঠান হয় নাই এবং প্রতি রোগীকে 'লীগ অব নেশন্সে'র ব্যবস্থা অনুযায়ী ৭০ গ্রেণ কুইনাইনও দেওয়া হইবে না। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কর্তৃপক্ষ ঔষধালয়গুলিতে যে পরিমাণ ম্যাপাক্রিন রাখিতে বলিয়াছেন, তাহা না রাখিলে কুইনাইন দিতে চাহেন না। অথচ ঔষধালয়গুলির অভিযোগ এই যে, তাহাদের যে পরিমাণ ম্যাপাক্রিন দেওয়া হয় তাহা বিক্রয় করা সহজসাধ্য নহে, কারণ কোন চিকিৎসকই তাহা কিনিতে চাহেন না। অবশ্য এই ঔষধটি ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের ন্যায়ই কার্য্যকরী কি না তাহা এখনও জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু বাংলা দেশের চিকিৎসকরা এখনও পর্যন্ত উক্ত ঔষধকে কুইনাইনের সমতুল্য বলিয়া মনে করেন না। সেইজন্য সরকারের উচিত যথেষ্ট পরিমাণে কুইনাইন যাহাতে পাওয়া যায়, সেরূপ বন্দোবস্ত করা। ইহা না করিলে বাংলা দেশকে অশেষ দুঃখ পাইতে হইবে।"

ব্লাকমার্কেটের সঙ্গে বাংলা-সরকারের নাড়ীর টান লইয়া এ যাবৎ বহু আলোচনা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে নির্বিকার ও নীরব হইলেও এই পাপ যে দূর হইয়াছে তাহা মনে করিবার উপায় নাই। ডাঃ বিধান রায়ের উপরোক্ত বিবৃতিও তাহারই প্রমাণ। বাংলার চলতি বাজেটে দেখিতেছি গত বৎসর ২৯ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকার ম্যাপাক্রিণ কেনা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার বড়ি বিলি হইয়াছে, অবশিষ্ট ১৯ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ম্যাপাক্রিণ বিক্রয় বাবদ খরচ ধরা হইয়াছে (Expenses on sale of Mapacrin)। বিক্রয়লব্ধ অর্থ আশা করা হইয়াছে বৎসরে ২৫ লক্ষ হিসাবে দুই বৎসরে ৫০ লক্ষ। এ বৎসর বরাদ্দ হইয়াছে ৬৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার বড়ি বিক্রয় এবং ১০ লক্ষ টাকার বিলি। দুই বৎসরে এই যে এক কোটি টাকার ম্যাপাক্রিণ বিক্রয় হইবার কথা তাহার অধিকাংশই বিলাতী কোম্পানী হইতে আসিবে এটা আশা করা অন্যায় নয় এবং সম্ভবতঃ উহার সবটাই কেনাও হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই টাকার অন্ততঃ খানিকটা তুলিবার জন্য ম্যাপাক্রিণ না লইলে কুইনাইন পাইবে না বাংলা-সরকার এই জিদ ধরিলে তাহাতে কেহই আশ্চর্য হইবে না।

কিছুদিন পূর্বে সাহেব সওদাগরদের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' ব্লাকমার্কেটে এই ধরণের কেনাবেচার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। চট ও থলের কোন কোনটির উপর কণ্ট্রোল আছে কোনটির উপর নাই। ব্যবসায়ীরা ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া ক্রেতাকে কণ্ট্রোল দরে জিনিষ বিক্রয় করিবার সময় তাহাকে অতিরিক্ত দরে অপর জিনিষটি তাহার প্রয়োজন না থাকিলেও ক্রয় করিতে বাধ্য করে। এই ভাবে উভয় দ্রব্যের বিক্রয়ের দ্বারা ব্যবসায়ীরা কণ্ট্রোল দরে মাল বিক্রয়ের কাল্পনিক ক্ষতি পোষাইয়া লয়। শ্বেতাঙ্গ চট কল সমিতি বহু চেষ্টা করিয়াও এই পাপ বন্ধ করিতে পারেন নাই।

বাংলা-সরকারের কুইনাইন চাষের হিসাবে দেখা যায় ১৯৪৩-৪৪-এ গবর্মেণ্ট ২৮,৬৭,২৫২ টাকার সিঙ্কোনা এবং ৩,৪০,৫৩০ টাকার কুইনাইন বড়ি বিক্রয় করিয়াছেন। এ বৎসর ২৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার সিঙ্কোনা এবং সাড়ে তিন লক্ষ টাকার কুইনাইন বড়ি বিক্রয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সঙ্গে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার কুইনাইন ইঞ্জেকসন বিক্রয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। এবার তাহার কোন উল্লেখ পর্যন্ত নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, জাপানী যুদ্ধের পর গত তিন বৎসরেও কুইনাইন চাষ বাড়ান হয় নাই। এবার উহা বরং কমিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

শ্বেতাঙ্গ ডাচ কিনা বুরোর স্বার্থে বাংলায় কুইনাইন চাষ দাবাইয়া রাখিবার ইতিহাস সুবিদিত। এদেশের আর একটি শ্বেতাঙ্গ কোম্পানী শ' ওয়ালেসের সহিত বাংলা-সরকারের কি সম্পর্ক তাঁহারা আজকাল উহা প্রকাশ করেন না। বাংলার বাজেটে সিঙ্কোনা চাষের হিসাবে Sale of Cinchona supplied by Shaw Wallace & Co.-র একটা ঘর আছে, কিন্তু উহার টাকার অঙ্ক নাই। (বাজেট, ১৯৪৫-৪৬, পৃঃ ৩২।)

বাংলা দেশে বিক্রয় কর বৃদ্ধি

বিক্রয়-কর প্রথমে যখন ধার্য হয় তখন ইহার পরিমাণ ছিল টাকায় এক পয়সা। বাংলা-সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে এই করের টাকা জাতিগঠনমূলক কার্যে ব্যয়িত হইবে। এই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই, অন্যান্য করের টাকার ন্যায় ইহাও সাধারণ রাজস্ব খাতেই চলিয়া গিয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে বিক্রয়-কর বাড়াইয়া দুই পয়সা করা হইয়াছিল, সম্প্রতি উহা আরও বাড়িয়া টাকাপ্রতি তিন পয়সায় দাঁড়াইয়াছে।

দেশে অতিমাত্রায় বিরক্তিজনক করগুলির মধ্যে বিক্রয়-কর অন্যতম। ইহাতে ধনীদরিদ্রে তারতম্য নাই, সকলের নিকট হইতেই এক হারে কর আদায় হয়। আদায়ের ব্যবস্থাও অত্যাচারেরই নামান্তর। আট আনার জিনিষ কিনিলেই পুরো টাকার কর দিতে হইবে অর্থাৎ তিন পয়সা স্থলে প্রকৃত পক্ষে টাকায় ছয় পয়সা হারে কর দিতে হইবে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যগুলিকে বিক্রয়-কর হইতে রেহাই দেওয়া হয় নাই, ফলে দুর্ভিক্ষে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের ঘাড়েই বেশী করিয়া এই বোঝা আসিয়া চাপিয়াছে। এখনও পয়সা যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত হয় নাই। করের পরিমাণ টাকায় তিন পয়সা হইলেও পয়সার অভাবে বহুক্ষেত্রে লোককে বাধ্য হইয়া চার পয়সা দিতে হইতেছে। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যগুলিকে রেহাই দিয়া বিলাস দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর বাড়াইলে হয়ত এতটা আপত্তি হইত না। তাঁতের কাপড় পর্যন্ত বিক্রয়-করের আওতা হইতে বাদ পড়ে নাই।

বিক্রয়-কর বাড়ানোতে বাংলা-সরকারের এক কোটি টাকা আয় বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। আয় বাড়াইবার জন্য বাংলা-সরকার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের ঘাড়ে কর বসাইতে দ্বিধা করেন নাই। তাঁহাদের বিভিন্ন বিভাগে যে কোটি কোটি টাকা অপচয় হইতেছে তাহা নিবারণ করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ করিবার সামান্য মাত্র চেষ্টাও তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া বলেন নাই। অযোগ্যতা অকর্ম্মণ্যতা ও অপদার্থতা ঢাকিবার জন্য বাংলা-সরকার সতত মুখর, বিজ্ঞাপন ও প্রেসনোট মারফৎ নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করিতেও তাঁহারা সমান তৎপর। ব্যয়-সঙ্কোচের দ্বারা দেশের করভার লাঘবের কোন চেষ্টা করিয়া থাকিলে তাঁহারা বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়া তাহা জাহির করিতেন ইহা নিশ্চিত।

চাউল কেনা-বেচায় অপচয়

বাংলা-সরকারের প্রত্যেক বিভাগে ব্যয়-সঙ্কোচের ক্ষেত্র আছে বলিয়া দেশবাসী বিশ্বাস করে। অপচয় নিবারণের চেষ্টা না করিয়া দুর্নীতির ব্যয় নির্বাহের জন্য নূতন কর বসান লোকে কোনমতেই সমর্থন করিবে না। বাংলা-সরকার সব জিনিষেরই উপর কন্ট্রোল বসাইয়াছেন। এবার দুর্নীতি, চুরি ও ঘুষ কন্ট্রোল করুন, নূতন কর বসাইবার প্রয়োজন হইবে না।

একমাত্র চাউল কেনা-বেচাতেই অপচয় হইয়াছে নিয়োক্ত রূপ :

১৯৪৩-৪৪		৩ কোটি	৫০ লক্ষ	টাকা	লোকসান
১৯৪৪-৪৫	(মূল বাজেট)	৫ "		"	"
১৯৪৪-৪৫	(সংশোধিত বাজেট)	১৩ কোটি	৩৯ লক্ষ		"
১৯৪৫-৪৬	(মূল বাজেট)	৫ "	৫৩	"	"

১৯৪৪-এ পর্য্যাপ্ত ফসল ফলিবার পর চাউলের দরের ওঠা-নামা বন্ধ হইয়া মূল্য প্রায় একই রূপ আছে। তথাপি মূল বাজেটে লোকসান ধরা হইল ৫ কোটি টাকা, এবং কয়েক মাস পরেই উহা তিন গুণ বাড়িয়া ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মূল ও সংশোধিত বাজেট হিসাবের এই অনুপাত ধরিয়া লইলে আগামী বৎসর লোকসান হইবার কথা ১৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ যে বাংলায় স্বাভাবিক অবস্থায় ১২।১৩ কোটি টাকা রাজস্বে সরকারের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইয়াছে। সেখানে একমাত্র চাউলের কারবারেই বৎসরে ১৩-১৪ কোটি টাকা করিয়া লোকসান চলিয়াছে। এখানে বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে এই চাউলের ব্যবসায় এজেন্টদের হাতে, লাভের টাকা তাহাদের, লোকসান দেশবাসীর। দুর্ভিক্ষ কমিশন এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করা সত্ত্বেও বাংলা-সরকার তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তন করেন নাই। বাংলার গবর্ণর চাউল ক্রয়-বিক্রয়ের চুরি ও অপচয় নিবারণের আন্তরিক চেষ্টা করিলে দুর্ভিক্ষে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত দরিদ্র দেশবাসীর ঘাড়ে অতিরিক্ত কর বসাইবার প্রয়োজন হইত না ইহা নিশ্চিত।

আর একটি অনাবশ্যক ব্যাপারে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইতেছে এবং আমাদের আশঙ্কা এখানেও ৫।৭ কোটি টাকা অপচয় হইবে। বাংলা-সরকার নৌকা তৈরীর জন্য গত বৎসর প্রায় তিন কোটি এবং এ বৎসর পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এই কার্যের ভার যাহাদের উপর পড়িয়াছে তাহাদের সততা সম্বন্ধে দেশবাসী কোন প্রমাণ তো পায়ই নাই, বরং বিপরীত ধারণারই যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। সরকারী শিল্প বিভাগ, বিশেষতঃ উহার ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর এবং যে দুই জন চেক ও হাঙ্গেরিয়ান ইহুদী এই আট কোটি টাকা ব্যয়ের ভার পাইয়াছেন তাঁহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বহু সমালোচনাও হইয়াছে। তথাপি গবর্ন্মেণ্ট ইহার অনুসন্ধান করিয়া জনসাধারণের আশঙ্কা দূর করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন মনে হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল এবার অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে দুই দিক দিয়া। প্রথমতঃ, অন্যান্য বারের তুলনায় এবার অনেক কম ছাত্র ছাত্রী পাস করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক বেশী ছাত্র এবার অসদুপায়ে পরীক্ষা পাসের চেষ্টা করিয়াছে। নানাজনে ইহার নানাবিধ কারণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট জনৈক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আনন্দবাজার পত্রিকার নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আলোচনা-যোগ্য। তাঁহার মতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর হার এত কম হওয়ার তিনটি কারণ আছে।

প্রথমতঃ, তিনি মনে করেন যে, অধুনা সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠে মনঃসংযোগ করার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব এবং পড়াশুনার প্রতি তাহাদের মধ্যে একটা বিরাগ দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহাদের পরীক্ষার উত্তর-পত্রগুলির উপর একবার চোখ বুলাইলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহাদের উত্তর-পত্রগুলি হইতে দেখা যায় যে, তাহারা বিশেষ পড়াশুনা করে নাই। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি অবশ্য ইহা স্বীকার করেন যে, ১৯৪৪ সালে যে-সব ছাত্রছাত্রী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের অবস্থার দরুণ তাহাদের পড়াশুনায় যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যে-সব ছাত্রছাত্রী এই বৎসর (১৯৪৫) পরীক্ষা দিয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই অজুহাত দেওয়া চলিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার এইরূপ মনে হয় যে, ভাল অধ্যাপনার অভাব অথবা অনুপযুক্ত অধ্যাপনাও কিছু পরিমাণে উত্তীর্ণের শতকরা হার এরূপ কম হওয়ার কারণ। এই সময় তিনি বিশেষভাবে বলেন যে, এতৎসম্পর্কে ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে অক্ষম হইয়া অনেক ভাল শিক্ষক গত জরুরী অবস্থার সময়ে স্কুলসমূহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চাকুরী লইয়াছেন এবং যাঁহারা স্কুলে থাকিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আগ্রহ ও শক্তি—একদিকে অল্প আয় এবং অপর দিকে জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি—এই দুই সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া নিজেদের পরিবারবর্গ প্রতিপালনের কঠিন কার্যেই বহুল পরিমাণে বিনিয়োগ করিতে হইয়াছে। এই অবস্থার দরুন অধ্যাপনার মান ক্ষুণ্ণ হইতে অবশ্যই বাধ্য।

তৃতীয়তঃ, তাঁহার এইরূপ মনে হয় যে, স্ব-স্ব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে অভিভাবকদের সুষ্ঠু তদারক ও পর্যবেক্ষণেরও একটা অভাব সাধারণভাবে দেখা দিয়াছে।

আমাদের মনে হয় এই কারণগুলিই সব নয়। ছাত্রদের অসুবিধার দিকটাও দেখা দরকার। এ বিষয়ে একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ম্যাট্রিকুলেশনে কলিকাতা অপেক্ষা মফঃস্বলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল অনেক খারাপ হইয়াছে। আমরা মনে করি বাংলার গ্রামাঞ্চলের ভয়াবহ অবস্থা ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। ১৯৪৪-এ চাউল সহজলভ্য হইলেও দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর অন্যান্য প্রত্যেকটি খাদ্যের একান্ত অভাব সর্বত্র ঘটিয়াছে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তরুণ-তরুণীদের স্বাস্থ্যহানি ঘটা অনিবার্য। ইহাতে একটি সমগ্র বংশ পঙ্গু হইয়া গড়িয়া উঠার আশঙ্কা আছে ইহা আমরা পূর্বেও কয়েকবার বলিয়াছি। বিলাতে খাদ্যাভাবের সময় ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য পাইতে পারে রেশনিং কর্তৃপক্ষ তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। এখানে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা তো হয়ই নাই, বরং বার বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও ইহাতে সরকারের গভীর ঔদাসীন্যকে লোকে অর্থপূর্ণ বলিয়াই মনে করিবে। বাংলা ও বাংলা দেশের ধ্বংস সাধনের ইচ্ছা সাম্রাজ্যবাদী শাসকের নাই ইহা মনে করা কঠিন। ভাতে মারার ব্যবস্থা সর্বত্রই প্রচলিত আছে। জার্মানী দখলের পর দুইটি অতি অর্থপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম, ইউরোপের খাদ্যাভাবের কাহিনী; দ্বিতীয়, জেনারেল আইসেনহাওয়ারের আশা যে জার্মানীকে আপাততঃ খাদ্য সংগ্রহে এত বেশী মনোযোগ দিতে হইবে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় তাহাদের থাকিবে না। বাংলার দুর্ভিক্ষে, দুর্ভিক্ষ নিবারণে ভারত-সচিব হইতে সুরু করিয়া বাংলার সিভিলিয়ান চক্র পর্যন্ত প্রত্যেকের ঔদাসীন্য প্রদর্শনের পিছনে ঐরূপ কোন কারণ ছিল না এরূপ সন্দেহ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নহে।

আর একটি কারণও আছে। কাপড়, চিনি, লবণ, কেরোসিন, ঔষধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য প্রত্যেকটি জিনিষ গ্রামে দুষ্প্রাপ্য। কণ্ট্রোলের দৌলতে উধাও হওয়া জিনিষ খুঁজিয়া সংগ্রহ করিবার জন্য বাড়ীর ছেলেদেরই ভুগিতে হইয়াছে বেশী। কোন একটি জিনিষ সংগ্রহের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন কি সপ্তাহের পর সপ্তাহ কি ভাবে নষ্ট করিতে হয় গ্রামের সহিত প্রত্যক্ষ সংস্রববিহীন লোকে তাহা বুঝিবে না। ছাত্রদের এই অবস্থা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যেন-তেন-প্রকারেণ অতিরিক্ত আয়ের পথ খুঁজিবার আগ্রহ, এই সব মিলিয়া এমন একটা কদর্য আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে যে উহাতে আর যাহাই হউক লেখাপড়া হয় না। বাংলার আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা এই ভাবে চলিতে থাকিলে পরীক্ষায় পাসের হার আরও কমিবে, বাড়িবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল আরও খারাপ হইয়াছে। কলিকাতার একটি কলেজের জনৈক অভিজ্ঞ অধ্যাপক বলিয়াছেন ম্যাট্রিকে বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে প্রবর্তনের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী কম শিখিতেছে, কাজেই ইংরেজীতেই বেশী ফেল করিতেছে। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ছেলেরা ইংরেজী শেখে না মানিলাম, কিন্তু বাংলা শিক্ষার বাহন হওয়ার পর বাংলাও তো ভাল শেখে না। অঙ্কে পাসের হারও খুব কম। শিক্ষার বাহন ইংরেজী না হইলে ইংরেজী শেখা যায় না, ইহা অসার কথা। বিলাতের কলেজের ছাত্রকে ইংরেজী ছাড়া ফরাসী ও জর্মান শিখিতে হয়। ম্যাট্রিকে ইংরেজী ভাষা একটি পাঠ্য বিষয়, সুতরাং মন দিয়া পড়িলে এবং ভাল ভাবে পড়াইলে উহা না শিখিবার কোন কারণ নাই। কলেজে ইংরেজী ছাড়া অর্থনীতি, ইতিহাস, ন্যায়শাস্ত্র, অর্থনৈতিক ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের উত্তর-পত্রে ছাত্রেরা যেরূপ ইংরেজী লিখিতে পারে, ইংরেজী প্রশ্ন-পত্রের বেলায় তাহা পারে না। ইহার গলদ অন্যত্র, ইংরেজী ভাল ভাবে পড়াইলে এই ত্রুটি থাকিবে না।

কলেজগুলির পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার একটি প্রধান কারণ অধ্যাপকদের উদাসীনতা ইহাতে সন্দেহ নাই। এখানে একটি দুষ্ট চক্রের সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপকেরা যে বেতন পান তাহাতে তাঁহাদের সংসারযাত্রা এই দুর্মূল্যের দিনে নির্বাহ করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। সুতরাং তাঁহাদিগকে আয়ের অতিরিক্ত পথ খুঁজিতে হয়, সেদিকে অনেকটা সময় যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, অধ্যাপকদের

সাধারণতঃ দিনে দুই ঘণ্টার বেশী পড়াইতে হয় না, তাছাড়া বৎসরে মাসছয়েক ছুটি থাকে। কলেজের এই সময়টুকু যদি তাঁহারা নিষ্ঠার সহিত পড়ান তাহা হইলে ইণ্টারমিডিয়েট বা বি-এ পরীক্ষার ফল এরূপ মারাত্মক হয় না। পারিশ্রমিক কম বলিয়া পড়াইতে ইচ্ছা করে না এই যুক্তি একেবারে গ্রাহ্য হইতে পারে না এই কারণে যে না পড়াইলে বেতন বাড়িবে না। বরং আজিকার যে তরুণ দল হইতে ভাবী যুগের নেতা গড়িয়া উঠিবে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে ভবিষ্যৎ-বংশীয় শিক্ষকদের বাঁচিবার পথ হইবে।

কলিকাতার ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা হইতে মন বিক্ষিপ্ত হওয়ার বহু কারণও আছে। সিনেমা ও ফুটবল ত আছেই। তা ছাড়া নিজের বা পাশের বাড়ীর রেডিও, বাসগৃহ-সমস্যার ফলে বহু বাড়ীতে জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িবার স্থানাভাব, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সংগ্রহে ছেলেদের অযথা সময় নষ্ট ইত্যাদিও সামান্য কারণ নয়। পড়াশুনার সুযোগ যেখানে মিলে নাই, সেখানে মরিয়া হইয়া অসদুপায় অবলম্বনের দ্বারা পাসের চেষ্টা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের হার অকস্মাৎ এই ভাবে কমিয়া যাওয়ার অপরাধ শুধু ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষক অধ্যাপকদের ঘাড়ে চাপানো অবিচার হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। ইহার কারণ আরও গভীর, আরও ব্যাপক। এই সমস্যার সহিত দেশের সমগ্র নবীন বংশের মঙ্গলামঙ্গল জড়িত রহিয়াছে। ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

সর তারকনাথ পালিতের বাড়ী বিক্রয়ের প্রস্তাব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক দিন পূর্বে ৩৫ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৩৫ বিঘা জমি "with structures" বিক্রয়ের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনটি আপাত-দৃষ্টিতে অতিশয় নিরীহ। বুঝিবার উপায় নাই যে ইহা সর তারকনাথ পালিতের বাড়ী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন। যাঁহার সর্বস্ব দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা ও পুষ্টি,"Structures"টি তাঁহার প্রাসাদোপম বাসভবন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাসভবনটিকে ঋণমুক্ত করিয়া দেশবাসী উহাকে জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষা করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বাসভবন রক্ষা করিবার আয়োজন চলিতেছে। এই সময়ে সর তারকনাথ পালিতের বাস্তুভিটা বিক্রয় করিবার চেষ্টা দেশের লোকে আপত্তিজনক বলিয়াই মনে করিবে। ইহা লইয়া আন্দোলনও সুরু হইয়াছে, এ সম্বন্ধে প্রচারিত পত্রী প্রভৃতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাজ আজকাল তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাখনলাল চন্দের মৃত্যু সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কণ্ট্রোলার এবং এসিস্টাণ্ট কণ্ট্রোলার যে ভীরুতা, অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন বহু সংবাদপত্র তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এবারকার পরীক্ষার ফলাফল লইয়াও বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে। কলেজগুলিতে ভাল ভাবে পড়াশুনার ব্যবস্থা করিবার পূর্বে পরীক্ষার খাতা কড়া ভাবে দেখা উচিত হইতেছে কিনা তাহা লইয়াও আলোচনা চলিতেছে। আজকাল অধিকাংশ স্কুল কলেজেই ভালভাবে লেখাপড়া হয় না ইহা সর্বজনবিদিত। কলিকাতায় বহু কলেজে আমরা দেখিয়াছি পাঠ্যবস্তু পড়ানো শেষ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ানোর মান উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিবার পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে ষোল আনা উৎকৃষ্ট উত্তর আশা করিতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যালয় এ দিকে মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

কলিকাতায় ছাত্রদের, বিশেষতঃ ছাত্রীদের, বাসস্থান এক বিরাট্ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাড়ীর অভাবে নূতন হোস্টেল খোলা অসম্ভব অথচ ছাত্র-ছাত্রীসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। সর তারকনাথের বাড়ী ও জমি বিক্রয় না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে নূতন ছাত্র-ছাত্রীনিবাস নির্মাণের চেষ্টা করিলে এই সমস্যা সমাধানে তাঁহাদের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাহাও তাঁহারা করেন নাই।

কলিকাতায় বালিগঞ্জ অঞ্চলে একসঙ্গে ২৩ বিঘা জমি আজকালকার দিনে এক দুর্লভ বস্তু। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের পরিধি বাড়িতেছে। কালক্রমে আরও বাড়িবে। বালিগঞ্জ এখন আর পাড়াগাঁ নয়; কলিকাতার সকল স্থানেই এখান হইতে দ্রুত যাতায়াতের সুবিধা আছে। এই বাড়ীতে ছাত্র বা ছাত্রীনিবাস গঠিত হইলে এক বিরাট্ সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। বাড়ী তৈরির টাকার অভাবের মামুলী অজুহাত শুনিতে আমরা প্রস্তুত নহি, জমিটার সামান্য একটা অংশ বিক্রয় করিলেই বাড়ী তৈরির টাকা উঠিয়া আসিবে। বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা করিলে ঋণ করিয়া বাড়ী তৈরি করিয়া সীট-রেণ্টের টাকাতেও উহা শোধ করিতে পারেন।

সর্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, সর তারকনাথ তাঁহার বাড়ী ও জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ট্রাষ্টী হিসাবে দিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে উহা বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইলেও ট্রাষ্ট-ডীডে ৫ (খ) ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাষ্টী হিসাবে ট্রাষ্ট ডীডে বর্ণিত সর্তানুসারে উহা দখল করিবেন। প্রথমে সম্পত্তির তিন জন ট্রাষ্টী ছিলেন—সর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার মল্লিক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

সমস্ত প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীকে একসঙ্গে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিশ্বের শান্তিভঙ্গের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিচার করিবার যে প্রস্তাব যুদ্ধাপরাধ কমিশনের মার্কিণ প্রতিনিধি করিয়াছিলেন, ব্রিটিশ, ফরাসী ও রুশ প্রতিনিধিরা তাহা মানিয়া লইয়াছেন।

বাংলা দেশের ১৫ লক্ষ নরনারীকে হত্যা করিয়া যাহারা দেড়শো কোটি টাকা লাভ করিয়াছে দুর্ভিক্ষ কমিশন তাহাদের নিন্দা করিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন। ইহাদিগকে দণ্ডদানের কোন চেষ্টা বা আয়োজন গবর্মেণ্ট করেন নাই।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের প্রগতি

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হইবার পর জাপানের সহিত কত দিন যুদ্ধ চলিবে এ বিষয়ে কয়েক মাস যাবৎ অনেক প্রকার বিচার গবেষণা চলিয়াছে। জার্ম্মানীর আত্মসমর্পণের পর প্রায় দুই মাসকাল কাটিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রধানতঃ কোন্ পথে চলিবে তাহার দিক নিরূপণের কোনও নিশ্চিত ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই। একদিকে ওকিনাওয়ার যুদ্ধের সমাপ্তির পর জাপানের উপর বিমান আক্রমণ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং তাহার আকার-প্রকার ক্রমেই ইউরোপীয় যুদ্ধের "সাচুরেশন বম্বিং" রূপ ধারণ করিতেছে। এইরূপ বিমান আক্রমণের অর্থ ধ্বংসে পরিসমাপ্তি, অর্থাৎ আক্রান্ত অঞ্চলে মেরামতের উপযোগী কিছুই না রাখা। এই জাতীয় বিমান অভিযানের দুই প্রকার উদ্দেশ্য থাকে ; প্রথমতঃ অস্ত্রনির্ম্মাণ, সৈন্যদল গঠন এবং রসদ ও যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ কার্য্যে প্রবল বাধাদান এবং দ্বিতীয়তঃ যেখানে বিজয় অভিযান সীমান্ত অতিক্রম করিবে—জাপানের ক্ষেত্রে সীমান্ত তাহার সমুদ্র উপকূল—সেখানকার দুর্গমালা চূর্ণ এবং রক্ষীসেনা ও আকাশ-বাহিনীর ঘাঁটিগুলি বিধ্বস্ত করা। যেভাবে এখন অষ্টপ্রহর বিমান আক্রমণ করার উদ্যোগ দেখা দিয়াছে তাহাতে দুই প্রকার কারণই সম্ভব মনে করা চলে, তবে কোন্‌টা মুখ্য কোন্‌টা গৌণ তাহা স্থির করার নির্দ্দেশ এখনও পাওয়া যায় নাই। টোকিও যাহা বলিতেছে তাহাতে মনে হয় তাহারা জাপান সাম্রাজ্যের মর্ম্মস্থলে, অর্থাৎ নিপ্পনের পিতৃভূমির উপর ব্যাপক আক্রমণের জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকিতে বলিতেছে। এইরূপ আক্রমণ সফল হওয়ার জন্য যে সকল অনুকূল অবস্থা থাকা উচিত তাহার মধ্যে প্রধান হইল জাপানী নৌ এবং বিমান বহরের কার্য্যতঃ ধ্বংসসাধন। সে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার সঠিক সংবাদ জানিবার কোনও উপায় আমাদের নাই। মার্কিন যুদ্ধ বিভাগ নিশ্চয়ই সে বিষয়ে অত্যন্ত তৎপর ভাবে বিচার করিতেছে এবং সেই বিচারের ফলাফল অদূর ভবিষ্যতের কার্য্য চালনা পদ্ধতিতেই প্রকাশ পাইবে।

জাপানের পিতৃভূমি আক্রমণ সমুদ্রপথে করিতে হইলে যেভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন তাহা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বিদেশী যুদ্ধ-বিশারদগণ বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতামতের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে কিন্তু এখন তাঁহারা ক্রমেই এক বিষয়ে একমত হইতেছেন এবং সেটা এই যে, সোভিয়েট রুশ যুদ্ধে না নামিলে জাপানের মূল দেশে অভিযান চালনা অতি দুরূহ এবং অত্যন্ত বল ও অস্ত্রক্ষয় সাপেক্ষ ব্যাপারে দাঁড়ানই সম্ভব। সোভিয়েট রুশ যুদ্ধে নামিবে কিনা সে বিষয়ে অনেক বিচারের পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছেন যে রুশের পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই এবং মার্কিন যুদ্ধবিশারদগণের মধ্যে অনেকে একথাও বলিয়াছেন যে জাপানের বিরুদ্ধে রুশের যুদ্ধ ঘোষণা এখন আর কয়েক মাসের কথা মাত্র। বাস্তবিক ইউরোপীয় কূটরাষ্ট্রনীতির চাল এতই জটিলভাবে চলে যে সম্ভব-অসম্ভব বলিয়া কিছু চির-স্থায়ী—এমন কি কিছুকাল স্থায়ী—এরূপ বলা চলে না। সুতরাং একথা মাত্র বলা চলে যে রুশ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে কিনা তাহা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কগণের রাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্তের উপর। বর্ত্তমানে সোভিয়েটের সে বিষয়ে কোন দিকেই বাধ্যবাধকতা আছে বলা চলে না।

জাপানের আত্মরক্ষা চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত কি রূপ ধারণ করিবে সে কথায় বিশেষ মতান্তর নাই। জাপানী সৈন্য "মরিয়া যুদ্ধ" সকল ক্ষেত্রেই সমান ভাবে করিতেছে, এবং এখন সকলেই প্রায় একমত যে জাপানী যোদ্ধা শেষ পর্য্যন্ত ঐ প্রকার যুদ্ধ করিয়াই চলিবে। এখন অস্ত্রবলের বৈষম্য—গুণে এবং ওজনে—বিশেষ ভাবে মিত্রপক্ষের অনুকূল এবং একথা খুবই সত্য যে জার্ম্মানীর পতনের পর ঐরূপ বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু মিত্রপক্ষের অভিযান চালনায় প্রধান বাধা তাহাদের শক্তিকেন্দ্রগুলির রণাঙ্গন হইতে দূরত্ব এবং এই প্রতিকূল অবস্থার লাঘব কোন প্রকারেই করা সম্ভব নহে। সুতরাং জাপান যদি তাহার শক্তিকেন্দ্রগুলি সচল রাখিতে পারে এবং তাহার আকাশ ও বর্ম্মবাহিনীগুলিকে অধিক-সংখ্যক এবং উৎকৃষ্টতর অস্ত্রে সজ্জিত করিতে পারে তবে মিত্র-পক্ষের অস্ত্রবল বেশী থাকা সত্ত্বেও সে প্রবল বাধাদান করিতে সমর্থ হইবে। এই কারণে অনেকে সন্দেহ করেন যে জাপান তাহার মূল শক্তিকেন্দ্র মাঞ্চুরিয়ায় লইয়া গিয়াছে, এবং জাপানের শেষ যুদ্ধ উত্তর চীন এবং মাঞ্চুরিয়াতেই হইবে। ঐ অঞ্চল এখনও মার্কিন বিমান আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া আছে এবং সোভিয়েট রুশের সাহায্য ভিন্ন সেখানে দ্রুত কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব নহে।

এসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে এখন অপেক্ষাকৃত মন্দা চলিতেছে, তাহা কতকটা মরসুমের প্রতিকূল ভাবের জন্য এবং অনেকটা দুই পক্ষের উদ্যোগপর্ব্ব চরমে এখনও উঠে নাই বলিয়া। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন খণ্ড অভিযানগুলি শেষ হইয়া আসিয়াছে, নূতন অভিযান কোন্ মুখে চলিবে তাহা এখনও বুঝা যায় নাই। চীনে পূর্ব্বের ন্যায়ই ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে এবং তাহার কোন দিকেই বিশেষ শক্তি বৃদ্ধির কোনও চিহ্ন দেখা যায় নাই। ভারত মহাসাগরে একটি নূতন খণ্ড অভিযান গঠিত হইতেছে যাহা ব্যাপক আক্রমণে পরিণত হইলে জাপানের কাঁচা মাল সরবরাহের মূল আকর অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মদেশে এক প্রকার যুদ্ধবিরতিই চলিতেছে তবে জাপান প্রাকৃতিক অবস্থার সুযোগে অর্থাৎ মিত্রপক্ষের বিমানবহরের চলাফেরার পথে মরসুমের প্রাকৃতিক বাধাদানের অবকাশে তাহার পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কিছু চেষ্টা করিতেছে এবং সে কাজে কিছুমাত্রায় সাফল্যলাভও করিয়াছে। এই কার্য্যে তাহারা কোনও ব্যাপক চেষ্টা এখনও করে নাই এবং সেরূপ কার্য্যোপযোগী ক্ষমতা যে তাহাদের আছে তাহারও কোন নির্দ্দেশ নাই।



ওকিনাওয়ার গুহামধ্যে লুক্কায়িত জাপানী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে মার্কিন নৌ-সেনাদের গুলিবর্ষণ



ওকিনাওয়ার রাজধানী নাহার উপরে পর্য্যবেক্ষক মার্কিন বিমান। পশ্চাতে জলমগ্ন পোতসমূহ দৃশ্যমান



স্যান ফ্রান্সিস্কোতে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিনিধিবৃন্দ। বাম হইতে—সাউদি আরবের ফয়জল ইব্ন আব্দুল আজিজ, আবদালা ইয়াফ্ত, যোশেফ সালেম, আরশাদ আল-ওমারী ও শেখ হাফিজ ওয়াহ্বা



সামগান

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

এ সামগান নিয়ে পণ্ডিতদের ভেতর গণ্ডগোলের এখনও অবসান হয় নি। সামগান থেকে সঙ্গীতকলার জন্ম হয়েছে একথা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আসলে সামগানের রূপ যে কি রকম ছিল, কি রকম করেই যে সামগান থেকে বর্ত্তমান বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত সঙ্গীত রূপলাভ করল, সে সম্বন্ধে ভারতে বা ভারতের বাইরেও কোন পণ্ডিত সূক্ষ্ম বিচারের মানদণ্ড নিয়ে এখনও আলোচনা করেন নি।

সামবেদই যে সঙ্গীতের প্রথম রূপ একথা আমরা সকলেই জানি। ঋক্‌বেদ প্রথমে, তার পর সেই ঋক্‌ছন্দগুলোতে স্বর-সংযোগ করে উচ্চারণ বা আবৃত্তি করা হত। একেই বলা হত সামগান।

সামবেদের প্রধানতঃ ছিল দুটো রূপ: পূর্ব্বার্চ্চিক ও উত্তরার্চ্চিক। এই দুটোর মধ্যে কোন্‌টা আবার আগে ও পরে এ নিয়েও বিতণ্ডা বড় কম নেই। তবে মিঃ ক্যালাণ্ডের মতে উত্তরার্চ্চিকই হল আগে, সুতরাং প্রাচীন। পূর্ব্বার্চ্চিক ও উত্তরার্চ্চিকের আবার দুটি দুটি করে ভাগ ছিল: (১) পূর্ব্বার্চ্চিক—গ্রামেগেয় ও অরণ্যেগেয়, (২) উত্তরার্চ্চিক—উহ ও উহ্য। অথবা আরও পরিষ্কার করে দেখালে বলা যায়:

সামবেদ

- পূর্ব্বার্চ্চিক
  - গ্রামেগেয় গান
  - অরণ্যেগেয় গান
- উত্তরার্চ্চিক
  - উহ
  - উহ্য

গ্রামেগেয় গান ও অরণ্যেগেয় গান নিয়েও ব্রাহ্মণ—বিশেষতঃ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আলোচনা ও উদাহরণ আছে। মিঃ ক্যালাণ্ড তাঁর তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশব্রাহ্মণের ইংরেজী সংস্করণে এদের নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। উহই হল আসলে আবৃত্তি আর উহ ও রহস্যগানের সমাবেশে উহের উৎপত্তি।

মিঃ ক্যালাণ্ড কিন্তু এই সামবেদের ভাগ করেছেন আর এক রকমে। যেমন,

সামবেদ

- ংহিতা—
  - (ক) পূর্ব্বার্চ্চিক
  - (খ) আরণ্যক-সংহিতা
  - (গ) উত্তরার্চ্চিক
- গান (সাম) —
  - (ক) গ্রামেগেয়
  - (খ) অরণ্যেগেয়
  - (গ) উহ
  - (ঘ) উহ্য

মোট কথা, বিশেষ করে মিঃ ক্যালাণ্ডের মতে উত্তরার্চ্চিক গে, তার পর পূর্ব্বার্চ্চিক ও আরণ্যক-সংহিতা, তার পরে মেগেয়, অরণ্যেগেয়, উহ ও উহ্যগানের উৎপত্তি বা প্রচলন।

সামগানকে সাধারণভাবে আবার সাতটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। যেমন: (১) হুঙ্কার; অর্থাৎ আবৃত্তির প্রথম 'হুম্' শব্দটি সমস্ত যাজ্ঞিক পুরোহিতরাই উচ্চারণ করবেন, (২) প্রস্তা, অর্থাৎ প্রস্তোতৃগণ সামগানের সূচনাতেই যা গান করেন, (৩) উদ্‌গীথ, অর্থাৎ উদ্‌গাত্রীরা যে সুর আবৃত্তি করত, (৪) প্রতিহার, অর্থাৎ প্রতিহর্ত্রীরা সামের তৃতীয় চরণের শেষে যে গান গাইত, (৫) উপদ্রব, অর্থাৎ যা উদ্‌গাত্রীরা গান করত তৃতীয় চরণের শেষে, (৬) নিধান, অর্থাৎ যা সমস্ত যাজ্ঞিক পুরোহিতই সামের পরিশেষে গান করত, (৭) প্রণব, অর্থাৎ ওঙ্কারগান। এ সাতটা ছিল সামগানের মোটামুটি অংশ বা বিভাগ।

তার পর সামগানে ক'টা স্বর দেওয়া হত এ নিয়েও বাক্‌-বিতণ্ডার এখনও শেষ হয় নি। আসলে মীমাংসাও কিছু হয় নি—যদিও অনেক পণ্ডিত বলে থাকেন নাকি তার সমস্যার সমাধান হয়েছে। মতামতের অন্ত নেই। কেউ বলেন তিন স্বরে বা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতে সাম গান করা হত। কিন্তু এ মীমাংসাও একেবারে সমীচীন নয়, কেননা এদের থেকেই আবার লৌকিক স্বর ষড়্‌জাদির উৎপত্তি হয়েছে। যেমন, যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষাকার বলেছেন:

"উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
শেষাস্ত স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য গান্ধর্ব্ববেদের সপ্ত স্বরকে উদাত্তাদির অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। কিন্তু গান্ধর্ব্ববেদে প্রচলিত সাত স্বর ও গান্ধর্ব্বগানে প্রচলিত সাত স্বর নামে ও উচ্চারণে ঠিক এক কি-না এ নিয়ে প্রাচীন প্রাতিশাখ্যে, শিক্ষায় ও তৎপরবর্ত্তী নাট্যশাস্ত্র, রত্নাকর প্রভৃতিতে আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছে। অবশ্য সে বিশদ আলোচনার অবতারণা এখানে করা সমীচীন নয় ভেবে আমরা উল্লেখমাত্র করেই নিরস্ত হলাম।

উদাত্তাদি তিন স্বর (?) থেকে লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরের উৎপত্তি নারদী, পাণিনীয়, মাণ্ডুকী প্রভৃতি শিক্ষাকারেরা সকলে উল্লেখ করেছেন। এদের ঠিক ঠিক বিভাগ করে দেখালে এই পাওয়া যায়:

রধ	সমপ	নগ
অনুদাত্ত (মন্দ্র)	স্বরিত (মধ্য)	উদাত্ত (তার)

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়, পরবর্ত্তীকালে ভরতাদি যখন নাট্যশাস্ত্রে শ্রুতির বিভাগ করে দেখালেন তখন দেখা গেল: "চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্‌জমধ্যমপঞ্চমাঃ। দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রি-ঋর্ষভধৈবতৌ॥" অনুদাত্তাদি বিভাগের মধ্যে তা হলে দেখা যায়, তিনটি করে শ্রুতি অনুদাত্তে, চারটি করে স্বরিতে ও দুটি করে উদাত্তে শ্রুতি সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রয়েছে। অনেকটা বৈজ্ঞানিক প্রণালীরও অনুবর্ত্তন বটে।

তবে একথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই উদাত্তাদি স্বর অথবা উচ্চারণ স্থান নিয়েও মতভেদ অনেক আছে। এর আলোচনা চলেছে, কিন্তু আসল মীমাংসায় এখনও কেউ এসে পৌঁছান নি। অনেকের মতে এই উদাত্তাদি স্বরত্রয়, উচ্চ নীচ ও মধ্য করে উচ্চারণ করা হত। কারও

মতে তিনটি স্থান এবং এদের উল্লেখ পাই আমরা ঋক্ বা তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যে : "ত্রীণি মন্দ্রং মধ্যমমুত্তমশ্চ।" উর, কণ্ঠ ও মস্তকে এদের উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু অনেকে তা আবার স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, স্বরবিচারস্থলে কাশিকাবৃত্তিকার পরিষ্কারই উল্লেখ করেছেন : "উচ্চৈরীতি চ শ্রুতি প্রকর্ষো ন গৃহ্যতে। উচ্চৈর্ভাষতে উচ্চৈঃ পঠতীতি।"* উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে—এরূপ কর্ণগোচর উচ্চতাকে উদাত্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। কেউ কেউ কম্‌প্রোমাইজিং নীতির চাপে পড়ে ইংরেজী মেজর, মাইনর ও সেমী টোনের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যও প্রাণান্ত পরিশ্রম বড় কম করেন নি। তার পর আবার পাণিনীয় বৃত্তিকার পাণিনির ৪।২।২৯ সূত্রের বৃত্তিতে : "উদাত্তাদিশব্দঃ স্বরে বর্ণধর্মে লোকবেদয়ো প্রসিদ্ধঃ" প্রভৃতি কথাগুলিও বলেছেন। কিন্তু এই "লোকবেদয়ো প্রসিদ্ধঃ" বাক্যটি প্রয়োগ করে তিনি ফ্যাসাদ বড় কম বাধান নি। কেননা, লৌকিক ও বৈদিক স্বর যা প্রয়োগ করা হত লোকসঙ্গীত (বেণুস্বরে) ও সামগানে তা যে ঠিক এক নয় একথা সকলেই স্বীকার করেন। লৌকিক স্বর হল ষড়্জাদি সপ্ত স্বর, আর বৈদিক হল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট। এই উভয়ের স্বরসংস্থান এবং উচ্চারণও আবার এক নয়। তবে ভরতেরও আগে নারদ তাঁর নারদীশিক্ষায় নানান গোলমাল লক্ষ্য করে উভয়ের মধ্যে একটা ঘরোয়া আপোস করবার চেষ্টা করেছেন। যেমন, তিনি নির্দিষ্ট করলেন :

> "যঃ সামগানাং প্রথমঃ সবেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ।
> যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয়স্ত্বষভঃ স্মৃতঃ॥
> চতুর্থঃ ষড়্জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমীধৈবতো ভবেৎ।
> ষষ্ঠে নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ,

সামস্বর—	বেণু বা লৌকিক স্বর
ক্রুষ্ট	পঞ্চম
প্রথম	মধ্যম
দ্বিতীয়	গান্ধার
তৃতীয়	ঋষভ
চতুর্থ	ষড়্জ
মন্দ্র	ধৈবত
অতিস্বার্য	নিষাদ

শিক্ষাকারদের ভেতর নারদেরই একমাত্র এ বিষয়ে কৃতিত্ব ও আকুলতা দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য, মাণ্ডুকী প্রভৃতি এঁরা এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামান নি। প্রতিশাখ্যকাররা তো বটেই।

সামস্বর ও লৌকিক স্বর—এ দুয়ে একটি কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আধুনিক† পারম্পর্য্য অনুযায়ী যে বিভাগ তা কিন্তু রাখা হয় নি—অন্ততঃ এক জায়গায় যেমন, ষড়্জ, ধৈবত ও নিষাদের বেলায়। কেননা পারম্পর্য্য অনুযায়ী হওয়া উচিত ষড়্জের পরই নিষাদ ও তারপর ধৈবত ও পঞ্চম। কিন্তু নারদীশিক্ষাকার তদানীন্তন কালে (তাঁরই সময়ে) প্রচলিত পদ্ধতি দেখিয়েছেন, স ন ধ প। এর বিস্তৃত আলোচনা করাও ঠিক এখানে সম্ভবপর নয়। তবে একথা সত্য যে, নারদ নিজে কিন্তু আধুনিক পারম্পর্য্যধারা জানতেন, কেননা তাঁর শিক্ষার দ্বিতীয় কণ্ডিকার পঞ্চম শ্লোকে তিনি পরিষ্কারই তার আভাস দিয়েছেন এই বলে যে, "ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যম স্তথা। পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদ সপ্তমঃ স্বরঃ॥" কাজেই এ থেকে অবশ্য অনুমান করা যেতে পারে যে, লৌকিক ষড়্জাদি স্বরের ক্রমসন্নিবেশ বোধ হয় ঠিকই ছিল, তবে বৈদিক প্রথমাদির সঙ্গে সমান্তরাল করবার জন্যে তাঁকে বাধ্য হয়ে ঐ রকম ষড়্জের পর নিষাদ ও পরে ধৈবত ও পঞ্চম দেখাতে হয়েছে।

তবে আর একটা কথা, ভাষ্যকার সায়ণ কিন্তু নারদের এ বিভাগকে গ্রহণ করতে পারেন নি। যদিও সামবেদ ভাষ্যোপক্রমণিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, "সামশব্দবাচ্যস্য গানস্য স্বরূপমুৎপক্ষরেষু ক্রুষ্টাদিভিঃ সপ্তভিঃ স্বরৈঃ অক্ষরবিকারাদিভিশ্চ নিষ্পাদ্যতে।" এখানে সায়ণ প্রথম থেকে সপ্তম পর্য্যন্তই স্বরের নাম নির্দ্দেশ করেছেন, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট বলেন নি। কিন্তু তিনি যে এদের আসল নাম জানতেন না, একথাও ঠিক নয়। সামবিধানব্রাহ্মণের ভাষ্যে তিনি ক্রুষ্টাদিরই কিন্তু নামোল্লেখ করেছেন। কাজেই এ কথাই সমীচীন যে, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্টের নাম যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম নামেও তদানীন্তন অর্থাৎ বৈদিক সমাজে প্রচলিত ছিল।

সামবিধানব্রাহ্মণের ভাষ্যোপক্রমণিকায় সায়ণ নারদের মতকে সম্পূর্ণই খণ্ডন করেছেন দেখা যায়। যেমন, তিনি উল্লেখ করেছেন : "লৌকিকে যে নিষাদাদয়ঃ সপ্ত স্বরাঃ প্রসিদ্ধাঃ ত এব সাম্নি ক্রুষ্টাদয়ঃ সপ্ত স্বরা ভবন্তি। তদ্ যথা, যো নিষাদঃ স ক্রুষ্টঃ, ধৈবতঃ প্রথমঃ, পঞ্চমঃ দ্বিতীয়ঃ, মধ্যমস্তৃতীয়ঃ, গান্ধারশ্চতুর্থঃ, ঋষভো মন্দ্রঃ, ষড়্জোতিস্বার্য ইতি॥"

তাহলে এ কথা সত্য যে, নারদ ও সায়ণের ক্রমবিবর্ত্তমান সময়ের ব্যবধানে পার্থক্য ও প্রচলননীতির আভাস আমরা এইটুকু পাই যে, অবরোহণ গতি সম্পূর্ণ আরোহণ-গতিতে পরিণত হয়েছিল, কেননা সামতন্ত্র পরিষ্কারই ইঙ্গিত দিয়েছেন : "ক্রুষ্টাদয়ঃ উত্তরোত্তরং নীচা ভবন্তি।" এই নিয়মানুসারে নারদের স্বরসংস্থানের রূপ পাই আমরা এ রকম, যদিও এটা সম্পূর্ণ বৈদিক প্রথমাদিকে অনুবর্ত্তন করেই দেখান হচ্ছে :

৭	৬	৫	৪	৩	২	১
পা	নি	ধা	সা	রি	গা	মা
০	০	০				
মন্দ্র						মধ্য

অথবা নারদ ও সায়ণকে তুলনা করে দেখালে আমরা পাই :

---

* অবশ্য বৃত্তিকারের এ উক্তি কতটুকু সত্য তাও অনুশীলন-যোগ্য।

† আধুনিক মানে বলতে চাচ্ছি আমরা ভরতেরও আগে শিক্ষাকার নারদের সময় থেকেই। তবে ভরত ও ভরতের পরবর্ত্তীকালে স্বররূপ সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্টই হয়েছিল।

বৈদিক	লৌকিক	
সামস্বর	নারদ	সায়ণ
ক্রুষ্ট (৭)	পা	নি
প্রথম (১)	মা	ধা
দ্বিতীয় (২)	গা	পা
তৃতীয় (৩)	রি	মা
চতুর্থ (৪)	সা	গা
মন্দ্র (৫)	ধা	রি
অতিস্বার্য (৬)	নি	সা
নিম্নগতি	বৈদিকপ্রায়	উচ্চগতি

কিন্তু বিচারের বিষয় এই যে, নারদ কিন্তু কোথাও লৌকিক সাত স্বরকে তার (উচ্চ) বা মধ্য থেকে মন্দ্রগতি ভাবাপন্ন বলেন নি। সামস্বরের কথাও তাই। তবে সামতন্ত্রে আমরা বৈদিকের নিম্নগতি সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ পাই। কাজেই নারদের লৌকিক স্বরের উচ্চারণরীতি লৌকিকেরই মত ছিল, এখানে বিভাগে নিম্নগতি কেবল আমরা বৈদিকের সঙ্গে সমস্বারিক দেখাবার জন্যেই উল্লেখ করলাম মাত্র।

বৈদিক প্রথমাদি সপ্ত স্বরের সমপ্রকৃতিক লৌকিক স্বর নির্দেশ করতে গিয়ে যদিও নারদ ও সায়ণের ভেতর সম্পূর্ণ মত-ভেদ দেখা যায় বটে, তবু নারদ ও সায়ন উভয়েই এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, বৈদিক বা লৌকিকের গায়নরীতি ঠিক এক রকমই ছিল না: "সামবেদে সহস্রং গীত্যুপায়াঃ।" গীতিপ্রণালী বা স্বরসংখ্যাপ্রয়োগের তর-তমতা অবশ্যই আছে, বা থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা তাঁরা মোটেই বলেন নি যে, লৌকিক নিম্ন উচ্চগতিসম্পন্ন ছিল কি-না ?

যাহোক, নারদের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এই পাই যে, বৈদিকের প্রথম স্বর লৌকিক মধ্যমের সমস্বারিক ছিল ; অর্থাৎ সামগানের প্রথমের ও লৌকিকের মধ্যমের উচ্চারণ বা স্বর-কম্পন ও প্রকৃতি সমান। কিন্তু এ নিয়েও আবার মতভেদ অনেকেরই ভেতর পাওয়া যায়। মতভেদের ভেতর প্রধান ভেদ অবশ্য পাওয়া যায় মোটামুটি তিন চার রকমের। কেননা, বিকাশবাদীদের মতে অনেকে বলেন যে, সামিক যুগেই প্রকৃত-পক্ষে সামগান গাইবার রীতি প্রচলিত হয়। সামিক স্বর তাঁদের মতে গান্ধার-ঋষভ-ষড়্জ। তাঁরা লৌকিক গান্ধার স্বরকে সামের প্রথম স্বরের সঙ্গে সমান স্বীকার করেন। তার পর গান্ধার মতানুবর্তীদের ভেতরেও আবার অনেকে বলেন যে, উড়বযুগেই প্রকৃতপক্ষে সামগান গাওয়া হত, যেমন গা—রে—সা—নি—ধা। তাঁরা আবার ঐ পাঁচ স্বরে মধ্যম ও পঞ্চম এ দুটি স্বর সংযোগ করেও গান্ধারের পরিবর্তে আরম্ভ করেন মধ্যম থেকে ; যেমন মা—গা—রে—সা—নি—ধা—পা। অবশ্য এ রকম তাঁদের বলবার তাৎপর্য্য যে, এ সাতটি স্বরের সমাবেশকে তাঁরা মধ্যমগ্রামের রূপ বলে দেখাতে চান।*

কিন্তু অন্য মতাবলম্বীরা বলেন, আর্চিক, গাথিক, সামিক ইত্যাদি ক্রমে সাতটি ক্রমবিকাশ স্বরের মধ্যে হলেও তা সামিক অর্থাৎ তিন স্বরের যুগেই সামগান গাওয়া হত এবং সে তিন স্বর হচ্ছে নি—সা—রে। কিন্তু এ মত মোটেই আমরা সমীচীন বলে স্বীকার করি না, কেননা এর গতি নিম্ন দিকে নয়। তা ছাড়া এ মতের বিপক্ষে আরও যথেষ্ট যুক্তি আছে।

ক্রমবিকাশের দিক দিয়ে আরও একটি মত আবার প্রচলিত আছে। তাদের অভিমত নাকি, সামিক যুগেই সামগানের প্রথম প্রচলন হয়, তারপর তা স্বরান্তর, ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণে বিস্তৃতি লাভ করে। সামবেদের প্রতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে সম্প্রদায়-ভেদের কথার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়প্রতিশাখ্যেও তাই। নারদীশিক্ষাকারও এই বিভিন্ন স্বরসংখ্যা প্রয়োগের কথা স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন। এই শেষোক্ত মতাবলম্বীদের সিদ্ধান্ত—"সা—মা—পা"-ই হল সামিক স্বর এবং রাগবিবোধকার সোমনাথ এই স্বর তিনটিকেই 'স্বয়ম্ভু' (uncreated) নামে উল্লেখ করেছেন। সামতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী এই সামিক স্বর মন্দ্রগতিভাবাপন্ন হলে তার উচ্চারণ ও আবৃত্তিপ্রণালী হবে সা—মা—পা। ষড়্জ এখানে মধ্য সপ্তকের ও মধ্যম ও পঞ্চম মন্দ্র সপ্তকের। মধ্যম এদের কটিবন্ধ বা middle ও balancing স্বর। অবশ্য এ সিদ্ধান্তও কতটুকু সমীচীন তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখবার বিষয়।

আরো একটি মত আছে যাতে ঋষভকেই প্রথম স্বর বলা হয়। ঋষভ থেকেই হয়েছে উদাত্ত ও অনুদাত্তের উৎপত্তি। আবার এই দ্বৈতের যুগল স্বরই হল পঞ্চম। তৃতীয় বিকাশে যড়্জের জন্ম। অবশ্য এটা নিছক দর্শনের ও বিকাশের দিক থেকেই অনুমান। কেননা, সামিক যুগে তাহলে পঞ্চম, ঋষভ ও ষড়্জেরই সন্ধান পাওয়া যায়, আর বিকাশের প্রথম দিক হলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এর গতি সম্পূর্ণ মন্দ্রের দিকে নিম্নগতিতে (downward movement), আর তাহলেই আমরা পাই পা—রে—সা। কিন্তু এ মতের অনুযায়ী তাহলেও আবার পা—রে—সা ঠিক হয় না, হয় রে—সা—পা, অর্থাৎ রে—সা=মধ্য এবং পা=মন্দ্র। আর যদি বলি স্বরের উদ্ভব হয়েছিল বৈদিকের পরে একমাত্র লৌকিক আকারেই, তা হলেও ঠিক হয় না, কেননা, বৈদিক স্বরের সংখ্যা ও নাম আমরা ব্রাহ্মণ, সংহিতা, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা প্রভৃতিতে অনেক জায়গায়ই পেয়ে থাকি।

মোটকথা, সামগানে কি কি ও কতগুলি স্বরের ব্যবহার হ'ত তা নিয়ে আমাদের ঝগড়া নেই, ঝগড়ার সূত্রপাত তখনই হয় যখনই আমরা লৌকিকের ও স্বর-সংস্থানের দৃষ্টিতে বৈদিক বা সামস্বরকে বিচার করতে বসি। সামস্বরের প্রথমাদির রূপ আমাদের মোটেই জানা নেই। আর আজকাল সাম্প্রদায়িক রীতি বা রক্ষণশীলতার বৈশিষ্ট্যে সামগরা সামগান যা আবৃত্তি করে থাকেন তা নিছক আনুমানিক মাত্র এ বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই। ডাঃ আর্নল্ড এ. বেক যেমন

* এখানে উল্লেখ করা অসমীচীন হবে না যে, গ্রামত্রয়ই সাধারণতঃ শাস্ত্রে ও লোকে প্রচলিত। লেখক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'গ্রামত্রয়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে গ্রাম ছিল তিনটি নয়, সাতটিই। চারটি তখনই লুপ্ত হয়ে ছিল। পরে গান্ধারও লুপ্ত হয়।

বলেছেন : "The Indian practice of handing down melodies from guru to pupil, *leaves us to guess* how much of the old music as sung today really belonged to the original compositions of the singers of old." আমরাও একথা অস্বীকার করতে পারি নি। কেননা, প্রচলিত বর্ত্তমান সামগানেও আমরা স্বর ও রীতির ভেদ বিশেষ ভাবেই দেখতে পাই। যেমন মিঃ দেশগিরি শাস্ত্রীর দেওয়া স্বরলিপির উদাহরণ দিতে গিয়ে মিঃ এন এস. রামচন্দ্রন তাঁর *The Ragas of Karnatic Music* পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন :

(১) নি স সা রি রিসা ন সা র সা নি সা র
অগ্ নি মী — লে পু রো হি তম্ যজ্ঞ স্য —
নি স নি স সা রি
দে ব মৃ ত্বি জম্ — প্রভৃতি

কিন্তু মিঃ এম্, এস্, রামস্বামী আয়ার *Journal of the Music Academy*, Vol. V, 1934, Nos. 1-4-এ এরই আবার স্বরলিপির রূপ দিয়েছেন :

(২) ম সম রি স ন সা র স ন স র নি স
অ গ্নি মী লে পু রো হিতং যজ্ঞ স্য দেব
ন স স রি
মৃ ত্বি জং প্রভৃতি

কিন্তু এর প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে সামবেদ অনুযায়ী :

ওঁ | অ গ্নি মী লে | পু রো হি তং | য জ্ঞ স্য | দে ব ং |
ঋ ত্বি জ ং |...

মিঃ রামস্বামী আবার এই ঋকমন্ত্রেরই দ্বিতীয় রকমের একটি আধুনিক গায়নরীতিও দিয়েছেন। যেমন,

(৩) সাস সাস সাস সা স র গা রেস স গা রি স
হাউ হাউ হাউ বা | অ গ্নি মী লে পু রো হিতং
গ স গার গ স গার সগার সাস সাস সাস সা।
দে বে মৃ নি ষি মাং আহং হাউ হাউ হাউ বা।
স গা র রসগর স গ র | ইত্যাদি
য জ্ঞ স্য দেবা মৃ ত্বি জং |

এখানে কিছু কিছু উচ্চারণভেদ ও স্বরভেদ তো আছেই। যেমন (১) প্রথম উদাহরণে আমরা নি-সা-রি (তার মধ্যে নি=মন্দ্র এবং সা-রি মধ্য) স্বর তিনটিই পাই। (২) দ্বিতীয়টিতে প্রথমটিরই সম্পূর্ণ অনুরূপ এবং মনে হয় মিঃ রামস্বামী মিঃ শাস্ত্রীর উদাহরণই হুবহু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু (৩) তৃতীয়টিতে সা-রি-গা বা গা-রি-সা-ই বেশী এবং মাঝে মাঝে ধা স্বরও স্পর্শ করেছে। কাজেই নি-সা-রি এবং গা-রি-সা এই রীতিদুটির মধ্যে স্বরসংস্থানের দিক দিয়ে সামঞ্জস্য নির্দ্দেশ করা বড়ই দুরূহ।

আর একটি মন্ত্র : "ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে" প্রভৃতির গায়কীরীতি ও স্বর-ব্যবহার সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন, লক্ষণ শঙ্কর ভট্ট দ্রাবিড় সামবেদী মহাশয় এই মন্ত্রটির স্বরলিপি দিতে গিয়ে* নি-সা-রি-গা-মা এই পাঁচ স্বর লাগিয়েছেন এবং মিঃ রামস্বামী আয়ার নি-সা-রি-গা-ধা এই পাঁচ স্বরই ব্যবহার করেছেন। তবে স্বরের ভিন্নতা আছে। কিন্তু এটা ঠিক যে, গা-রি-সা এই তিন স্বরের ব্যবহারই এ গানে বেশী। কিন্তু এ থেকে তাহলেও বলা যাবে না যে, সামগানের আদিতে একমাত্র গা-রি সা স্বর তিনটিই ব্যবহৃত হত। মিঃ রামস্বামী নারদীশিক্ষার "সামসু ত্রাস্তরম্" নজির দেখিয়ে কিন্তু ঐ গা-রি-সা স্বর তিনটিকেই সামিক স্বর বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যই হল গা-রি-সা-ই পরে বিকাশলাভ করে গান্ধারগ্রামে পরিণত হয়েছে। আর এ জন্যেই অনেকে আবার এই গান্ধারগ্রামকেই বৈদিক বা সামগানের স্বরসপ্তক বা "মার্গসঙ্গীত" বলে উল্লেখ করে থাকেন।

সামগানে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের ব্যবহার ছিল এবং এখনও আছে। নারদী ও মাণ্ডুকীশিক্ষায় এই স্বর নির্দ্দেশ করবার জন্যে অঙ্গুলির ব্যবহার হত এবং বর্ত্তমান কালে সামগানকারীরাও সেই ধারা বজায় রেখেছেন। যেমন, নারদীশিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন :

"অঙ্গুষ্ঠস্যোত্তমে ক্রুষ্টোহ্যঙ্গুষ্ঠে প্রথম স্বরঃ।
প্রাদেশিন্যাং তু গান্ধারঋষভস্তদনন্তরম্॥
অনামিকায়াং ষড়্জস্তু কনিষ্ঠিকায়াং চ ধৈবতঃ।
তস্যাধস্তাচ্চ যোন্যাস্তু নিষাদং তত্র বিন্যসেৎ॥"

মাণ্ডুকী আবার "মধ্যমায়াং তু পঞ্চমঃ" বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না, তবে অঙ্গুলি ব্যবহারেও যে সম্প্রদায়ভেদ ছিল তা স্পষ্টই বুঝা যায়।

নারদীশিক্ষার এই শ্লোকগুলিতে কিন্তু আর একটি বেশ লক্ষ্য করবার বিষয় আছে। নারদ বৈদিক সামগানের পর্য্যায়ে ক্রুষ্ট ও প্রথম এই দুই স্বরের উল্লেখ করেই দ্বিতীয়, তৃতীয়াদির জায়গায় একেবারে গান্ধার, ঋষভ, ষড়্জ, ধৈবত ও নিষাদ এই এই স্বরনামগুলির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এখানে বৈদিক ও লৌকিক এ দুই বিভাগের ওপর নারদ মোটেই যেন জোর দেন নি, বরং তাঁর এই ব্যাপার থেকে আমরা এ কথাই অনুমান করতে বাধ্য হব যে, তখন সামগানের প্রথম, দ্বিতীয়াদি স্বর একরকম অপ্রচলিতই হয়ে গিয়েছিল, লৌকিকেরই ছিল একমাত্র আদর ও প্রচলন। নারদের দৃষ্টিও ছিল 'দেশীসঙ্গীত' তথা লৌকিকের ওপর। তবে "যঃ সামগানাং প্রথমঃ সবেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ" এ ইঙ্গিত বা পরিচয়কে তিনি অব্যাহতই রেখেছেন, কেননা, "অঙ্গুষ্ঠস্যোত্তমে" প্রভৃতি কথার সূচনায়ই তিনি ক্রুষ্ট তথা 'পঞ্চম' থেকেই পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন। আর সে অনুযায়ী প্রথম বৈদিক লৌকিকের 'মধ্যম' স্বরই হয়। দ্বিতীয়ের বেলায় আর তিনি বৈদিকের ক্রমকে অটুট রাখতে পারেন নি, গান্ধারের অবতারণা করে বরং একটু অধৈর্য্যেরই পরিচয় দিয়েছেন বলা যায়। যাই হোক, এ সব কথার অবতারণায় আমাদের আসল বক্তব্যই হল, আধুনিক কালের সামগানকারীরা যদিও সাম-

* *The Poona Orientalist*, Vol. IV, April-July 1939, Nos 1 & 2 দ্রষ্টব্য।

গানের আবৃত্তি পুরুষানুক্রমিক ধারাকে বজায় রেখেই করে থাকেন সত্য, কিন্তু তাহলেও আসলে তাঁরা সামগানের ক্রুষ্টাদি স্বরকে মোটেই ব্যবহার করেন না, সুতরাং তাদের স্বর-সংস্থান ও আসল রূপও জানেনই না বলা যায়। এখানকার সামগান লৌকিক স্বরকে অনুবর্ত্তন করেই গান করা হয়। তবে একথা তাঁরা অবশ্যই বলতে পারেন যে, বৈদিক সাম-স্বরেরই আবৃত্তি তাঁরা করেন, কেননা নারদের identification থেকে বৈদিকের স্বরূপ লৌকিকের মারফতে চিনে নিতে ও উচ্চারণ করতে পারা যায়—এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সামগান সম্বন্ধে আলোচনার অবতরণিকা মাত্র আজ এখানে আমরা করলাম। এ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বহু বিষয়ই কিন্তু আমাদের আলোচনা করা মোটেই হ'ল না। পরিশেষে পুনার প্রসিদ্ধ সামগায়ক লক্ষ্মণ শঙ্কর ভট্ট দ্রাবিড় মহাশয়ের দেওয়া গায়ত্রী মন্ত্রের সাম-স্বরলিপির উল্লেখ করে আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করব। যেমন,

(১)

ঋক্‌ছন্দ : ‖ ওঁ । তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহী । ধিয়ো

যো নঃ প্রচোদয়াৎ ‖

(২)

সামগান : ‖ সা — নি রি রি রি রি রি রি — রি রি
ও — — ম্ । ত ৎ স বি তু র্ব রো নি
রি – রি রি – রি রিরিরি রি রিসা – ২
যো – ম্ । ভা র্গো দেবস্য ধী মহী – – ।
সারি রি রি রি সা রিসা রিসা রি রিরি সা—
ধিয়ো যো নঃ প্রচো ১ ২ ১ ২ । হি ম্ আ ২ ।
রি রি সা নি ধ্ — প্
দা য়ো—আ — ৩ ৪ ৫ ‖

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই গায়ত্রী-সামগানে নি-রি-সা ধ্-পা অথবা নিম্ন (downward) গতিতে রি-সা নি-ধা-পা (রি সা—মধ্য ও নি-ধা-পা—মন্দ্র) এই পাঁচটি মাত্র না ওড়ব স্বর লাগছে।

ডাইনীর ছেলে

শ্রীকালীপদ ঘটক

চোখ বুজে কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকল রাগদা। একটু-খানি সে সুস্থ হ'ল, ডাইনীর ভয় ক্রমশঃ মন থেকে মুছে গেল ওর। কিন্তু কাল যখন গাঁয়ের লোকে জিতু হাড়ামকে দিয়ে ডাইনী চালাবে, তখন? রাগদার মা ত ধরা পড়েই আছে, গাঁয়ের লোকের সামনে বুড়ীকে নাচতে হবে। তারপর—তারপরও কি রাগদা বেঁচে থাকবে দুর্বিষহ অপমানের বোঝা মাথায় করে? রাগদার মা ডাইনী—একথা ঢাকে-ঢোলে প্রমাণ হয়ে যাবেই আজ না হয় কাল; জিতু হাড়ামের সঙ্গে গাঁয়ের লোকের কথাবার্ত্তা পাকা হয়ে গেছে। কালই হয়ত এসে পড়বে জিতু, ঘটা করে লোক জড়ো হবে গাঁয়ের মাঝখানে। রাগদাকেও হয়ত ডেকে নিয়ে যাবে ওরা, হয়ত বা জোর করেই ওকে টেনে বসাবে একধারে, নিজের চোখে ওর মা-বুড়ীর কীর্ত্তিকলাপ প্রত্যক্ষ করবার জন্য।

রাগদা কি জবাব দেবে অতগুলো লোকের সামনে! কৈফিয়ত দিবার কি আছে তার? কানের কাছে যেন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে জিতু হাড়ামের ডুগডুগির শব্দ, চোখের সামনে ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে ব্যাপারটা যা দাঁড়াবে। এ রাগদা সইতে পারবে না, কোনমতেই সইতে পারবে না।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রাগদা, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেশলাইটা খুঁজে নিয়ে সে আলো জ্বাললে। চারিদিক নিঝুম, জন-মানবের সাড়াশব্দ নাই, উপযুক্ত অবসর।

কুলুঙ্গি থেকে নেকড়ার ছোট একটা পুঁটুলি বের ক'রে এনে রাগদা কি হাতড়াতে লাগল। শালপাতে মোড়া ছোট একটা শিশি, শিশি খুলে দেখা গেল অর্দ্ধেকটা এখনও মজুত আছে। আলোর সামনে রেখে ধীরে ধীরে একবার শিশিটাকে নাড়া দিলে রাগদা, শিশির মধ্যে টল টল করছে সুতীব্র কালকূট। বহুকষ্টে এ বিষ সংগ্রহ করা হয়েছে এক বেদের কাছ থেকে, শিকারের সময় বিশেষ কাজে লাগে এ জিনিস। তীরে এই কালকূট মাখিয়ে কয়েকটাই ঝিঙেফুলী বাঘ মেরেছে রাগদা, বড় বড় শিকারকে সে এক লহমায় ঘায়েল করে দিয়েছে।

তীব্র এই বিষ—সাক্ষাৎ কাল এই কালকূট—একমাত্র এটাই আজ রাগদাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে সকল দুঃখ থেকে, একে-বারে জুড়িয়ে দিতে পারে তার মনের জ্বালা। এতটুকু—একটি ফোঁটা কোন রকমে গিলে ফেলতে পারলেই—ব্যস, আর দেখতে হবে না।

বিষ খাবে রাগদা? রাগদা বিষ খাবে?

কেন খাবে না! বেঁচে থেকে লাভ কি তার, লোকসানের বোঝা ক্রমশই যে ভারী হয়ে উঠছে। ঘরে যার শত্রু—বাইরে যার দুশ্‌মন—একসঙ্গে যে এরা সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে রাগদার বিরুদ্ধে, রাগদাকে ওরা মেরে ফেলতেই চায়। আবার সেই শব্দ একেবারে কানের কাছে—ডুগ্‌-ডুগ্‌-ডুগ্‌ ডুগ্‌—ডুগ্‌-ডুগ্‌-ডুগ্‌-ডুগ্‌—কি বাজছে ওটা? জিতু হাড়াম এসে পড়ল নাকি! ও আসবেই, সাঁওতাল বুড়ীকে দশজনের সামনে টেনে নিয়ে গিয়ে ন্যাংটো করে নাচাবেই জিতু হাড়াম, হয়ত বা কালই। জিতু হাড়াম মন্ত্র পড়ছে—আজ থেকেই মন্ত্র পড়ছে, রাগদার চোখের সামনে জিতু হাড়ামের ঠোঁট দুটো যে নড়ছে, বিড় বিড় করে বকে যাচ্ছে সে। রাগদার মা ধরা পড়ল

বলে, ছি ছি ছি ছি—কি কেলেঙ্কারি! রাগদার ঘরে ডাইনী, একটা নয় দুটো, দুটোই আজ সমান। ওরা পারে ত বাঁচুক—জিতু হাড়ামের হাত থেকে পারে ত ওরা বাঁচুক, কিন্তু রাগদার আর বাঁচবার কোন উপায় নাই। ওই যে আবার,—ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্—ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ—

কালকূটের শিশিটা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলে রাগদা, কোন রকমে একটি ফোঁটা—এক ফোঁটা—ব্যস্।

রাগদার হাত থর থর করে কেঁপে উঠল, কে যেন ওর হাতটা চেপে ধরে নীচের দিকে টানছে। কার জন্য মরতে যাবে রাগদা? মায়ের জন্য? কে মা? ডাইনীরা কারও মা হয় না, দুনিয়ার শত্রু ওরা। তবে রাগদা মিছামিছি পরের জন্য নিজের জীবনটা খোয়াতে যাবে কেন! লোকলজ্জা—অপমান কেলেঙ্কারি বংশের দুর্নাম? অন্যভাবেও ত এর প্রতিকার হতে পারে, তাই হোক—তাই হওয়াই উচিত।

বিষের শিশিটা মাটির উপর নামিয়ে দিলে রাগদা। কিন্তু মাথাটা ওর কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে, না না, ভাববার কিছু নাই আর।

দেওয়ালে লটকানো বাঁশের চোঙা থেকে ধারাল দেখে দুটো তীর বেছে নিয়ে এল রাগদা। এই তীরে ও বাঘ মেরেছে, ভাল্লুক মেরেছে, দুর্দ্ধর্ষ জানোয়ারকে চোখের পলকে ধরাশায়ী করে ছেড়ে দিয়েছে এই তীরের আঘাতে। এরাই পারবে রাগদার মান-সম্ভ্রম রক্ষা করতে—রাগদাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে যদি কেউ পারে, সে আজ এরাই পারবে।

ঝামা পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে তীর দুটোতে একবার শাণ দিয়ে নিলে রাগদা, তীরের ডগা দুটো ছুঁচের মত ধারাল হয়ে উঠল। তারপর শিশি থেকে কালকূট ঢেলে তীরের ফলা দুটোতে বেশ করে মাখিয়ে দিলে এক পোঁচ—দু পোঁচ, তিন পোঁচ—ব্যস, আর দেখতে হবে না।

ধনুকে ছিলা পরিয়ে তীর দুটো দোরের পাশে হেলান দিয়ে রেখে দিলে রাগদা।

রাগদা আজ কঠোর, আরও কঠোর হতে হবে তাকে। দয়া মায়া স্নেহ-মমতা বলে আজ আর কিছু নাই তার কাছে, সামনে তার কঠোর কর্ত্তব্য।

খানিকটা পচুই মদ বের করে উগ্র বাখর মিশিয়ে চোঁ চোঁ করে খেয়ে নিলে রাগদা। পা তার টলবে না, হাত আর কাঁপবে না রাগদার, এইবার ঠিক হয়েছে।

আলো নিবিয়ে তীরধনুক হাতে নিয়ে দাওয়ার উপর এসে অন্ধকারে বসে থাকল রাগদা প্রেতের মত—সদর দোরের দিকে মুখ করে। ডাইনীর জড় একেবারে নির্ম্মূল করে তবে সে আজ ক্ষান্ত হবে।

রাত্রি আড়াই প্রহর। অন্ধকার একটু ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। বনের ধারে আর একবার শেয়াল ডেকে উঠল। রাগদা কান খাড়া করে আছে। পাতা ঝরার শব্দে রাগদা চমকে উঠে, ঐ বুঝি এল—ডাইনীরা হয়ত ঘরে ফিরছে। আসুক, আরও কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসে ত আসুক। ঘরে আর ওদের ফিরতে হবে না, রাগদা সাঁওতাল আজ ঘাঁটি আগলে বসে আছে।

দূরে কার গলার আওয়াজ, ফিস্ ফিস্ করে কে যেন কথা কইছে, তার পর আবার চুপচাপ হয়ে গেল। কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। চুপে চুপে উঠে গিয়ে জানলা খুললে রাগদা, উঁকি মেরে বাইরের দিকে একবার তাকালে। আবছা ওর চোখে পড়ল কারা যেন দু'জন এই দিকেই হেঁটে আসছে। ওই ত মাথায় ওদের একটা করে ঝুড়ি, স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওরা বাড়ী ফিরছে—ডাইনীরা শ্মশান থেকে বাড়ী ফিরছে।

তীরধনুক হাতে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল রাগদা। দাঁতে দাঁত চেপে চালাঘরের এক পাশে নিজেকে সে আড়াল করে দাঁড়াল। দোরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে রুদ্ধশ্বাসে এক একটি মুহূর্ত্ত গুনতে লাগল রাগদা। চারি দিক নিথর, নিস্পন্দ।

খড় খড় করে শব্দ হ'ল দরজায়। তালপাতার আগড়টা ধীরে ধীরে সরে গেল সামনে থেকে। ওরা বাড়ী ঢুকল।

রাগদা তাড়াতাড়ি ধনুকে টান দিয়ে সামনের দিকে সোঁ করে ছেড়ে দিলে একটা তীর। লক্ষ্যটা বিঁধল যার বুকে—সে তারই মা-বুড়ী।

বুড়ী চীৎকার করে উঠল—ও-ও-ও—

তার পর ধপ্ করে পড়ল সে মাটির উপর।

পিছনে তার আর একজন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তীর, কাজ রাগদা শেষ করে দিলে একটি মুহূর্ত্তে।

ঝুড়ি মাথায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল রাগদার বৌ—মা—গো—!

রাগদা কি করবে এবার? এগিয়ে যাবে ওদের কাছে, না, ছুটে কোথাও পালিয়ে যাবে? রাগদা খুন করেছে—ডাইনীদের খুন করেছে; ভালই করেছে। কিন্তু এরা যে চীৎকার করে, যন্ত্রণায় ছটফট করছে যে!

মুংলীর ঘুম ভেঙে গেছে, গোঙানির শব্দ শুনে বাইরে এসে ডাক দিলে মুংলী—দাদা!

ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে রাগদা, বললে—মুংলী, আলোটা আন—শিগগীর আন।

তাড়াতাড়ি লম্প জ্বেলে মুংলী এগিয়ে এল, রাগদা বললে—এ দিকে।

দু'জনেই ওরা এগিয়ে গেল দোরের দিকে। আঁত্কে উঠল মুংলী। মাটিতে পড়ে ছটফট করছে ওর মা-বুড়ী, বৌটাও তারি পাশে গড়িয়ে পড়েছে, বুকে ওদের তীর। মহুলের ঝুড়ি দুটো পড়ে রয়েছে পাশে, অজস্র মহুল এদিক ওদিক ছিটকে পড়েছে।

মুংলী চীৎকার করে উঠল—বাইয়া!

রাগদা বললে—চুপ, ওদের আমি খুন করেছি—ডাইনীদের খুন করেছি।

বুড়ী তখনও কাতরাচ্ছে। মুংলী গিয়ে তার পাশে ধপ্ করে বসে পড়ল, কপালে হাত চাপড়ে মুংলী বললে—কি করলি বাইয়া, কি করলি!

রাগদা বললে—ডাইনী ওরা, সরে আয় মুংলী, সরে আয়।

কান্নায় ভেঙে পড়ল মুংলী, বললে—ভুল—ভুল করেছিস বাইয়া, লোকের কথা শুনে এ আজ তুই কি করে বসলি।

রাগদা বললে—কোথায় গিয়েছিল এরা, এত রাত্রে ?

মুংলী কেঁদে জবাব দিলে—মহুল কুড়ুতে, পোয়া বাগানে।

মহুল ! রাত্রে এরা মহুল কুড়ুতে বেরোয় ? ঐ ত ঝুড়ি মহুল ওদের পাশেই পড়ে রয়েছে। কিন্তু রাগদা তা জানবে কেমন করে, রাগদাকে ত ওরা বলে যায় নি।

ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল রাগদা। ছিলা-আঁটা ধনুকটা আপনা থেকেই খসে পড়ল ওর হাত হতে। চারদিকে যে রক্ত, টকটকে তাজা রক্তে সদর দোরের শুকনো মাটি রাঙা হয়ে উঠেছে।

রাগদা বললে—জল—জল।

এক ঘটী জল নিয়ে ছুটে এল মুংলী। মা-বুড়ীর মুখে-চোখে জল দিয়ে সে ডাকতে লাগল মা, ওমা !

মাথা নেড়ে সাড়া দিলে বুড়ী। মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না, শুধু অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ।

রাগদা ওদের মাঝখানে বসে পড়ল, আলো নিয়ে একবার ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখে নিলে ওদের। বৌটার সাড়া-শব্দ নাই, তীরটা গিয়ে বিঁধেছে ওর পেটের মধ্যে। শেষ হয়ে গেছে—বৌটা আগেই শেষ হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ওর পেটের ছেলেটাও।

রাগদার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। মা-বুড়ীর বুকের তীরটা টেনে তুললে রাগদা, তার মুখের কাছে আলোটা ধরে ভাঙা গলায় একবার ডাক দিলে,—মা !

চোখ মেলে তাকাল বুড়ী, চারদিক ঝাপসা হয়ে আসছে। রাগদার দিকে চেয়ে ঠোঁট দুটো বুড়ীর নড়ে উঠল, গলার স্বর টেনে বললে বুড়ী—বে-টা—।

ডুকরে কেঁদে উঠল রাগদা। মা-বুড়ীর গলাটা একবার জড়িয়ে ধরে আবার সে ডেকে উঠল,—মা, মা গো—!

—বে-টা—!

একেবারেই চুপ হয়ে গেল বুড়ী, মুখ দিয়ে আর একটিও কথা সরল না।

মুংলী আবার কেঁদে উঠল, বাইয়া, কি করলি বাইয়া !

বুক চাপড়ে বলে উঠল রাগদা—কি করলুম, হা বংহা—এ আমি কি করলুম !

রাগদার বুকে একেবারে ভেঙে পড়ল মুংলী,—বাইয়া ও বাইয়া !

রাগদা ওকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কেঁদে উঠল, বহিন !

সকালবেলা পুলিস এসে কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেল রাগদাকে। দারোগার হাতে পায়ে ধরে মুংলীর সে কি কান্না ! দারোগার পা দুটো জড়িয়ে ধরে সে আছাড় খেয়ে পড়ল, বললে,—হেই হে, বাইয়াকে তোরা ছেড়ে দে' বাবু—হেই হে !

কে শোনে মুংলীর কথা। সেপাই এসে একটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলে মুংলীকে। অবুঝ মেয়ে বোঝে না যে আইনের কাছে দয়ামায়া নাই, অপরাধীর জন্ত আত্মীয়স্বজনের অহেতুক কাকুতির কোন মূল্য দেয় না আইন। করুণ দৃষ্টিতে মুংলীর দিকে চেয়ে চেয়ে রাগদার চোখ ফেটে জল আসতে লাগল। কিন্তু উপায় কি, মুংলীকে ছেড়ে যেতেই হ'ল রাগদাকে।

বিচারে দশ বৎসর জেল হয়ে গেল রাগদার, সশ্রম কারাদণ্ড।

জেলেও মানুষের সময় কাটে, রাগদারও কাটল। ঘানি টেনে, পাথর ভেঙে মাটি কুপিয়ে দীর্ঘ দশটি বছর সে একভাবেই কাটিয়ে দিলে। রাগদা যেদিন খালাস পেয়ে বেরুল, মুক্তির আনন্দ তাকে অভিভূত করতে পারলে না এতটুকু। সংসারে তার কি মোহই বা আছে, সবই ত সে নির্মমভাবে চুকিয়ে দিয়ে এসেছে নিজের হাতে। মাঝে মাঝে অভাগী বোনটার কথা মনে পড়ে। শুধু মুংলীর জন্তই রাগদা আজও মরতে পারে নি, এত দুঃখ সহ্য করেও কোন রকমে সে বেঁচে আছে। আহা বেচারী, রাগদা ছাড়া মেয়েটাকে দেখবার যে আর কেউ নাই। কে জানে সে আজ কোথায়, কি অবস্থায় !

জেল থেকে বেরিয়ে রাগদা সোজা হাঁটিতে আরম্ভ করলে গাঁয়ের দিকে মুখ করে। দশ বৎসর জেল খাটার পর তিন দিন পথ হেঁটে সে গাঁয়ে পৌঁছুল। বাড়ীর কাছাকাছি এসে অবাক হয়ে গেল রাগদা, তার ঘরবাড়ির চিহ্ন মাত্র নাই, ধুলো হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে সব। পাড়ার লোক হৈ হৈ করে ছুটে এল রাগদাকে দেখতে। মিশুন মাঝি তাকে দেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। রাগদা গাঁ ছেড়ে যাওয়ার পর ডাইনীর ভিটে বলে ওর ঘর-দোর সব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, রাগদার মা মরবার সময় নাকি ডান-মন্তর দিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মুংলীকে। বেঁচে থাকলে মুংলীও হয়ত ওর মায়ের মতই ডাইনী হয়ে উঠত, তাই গাঁয়ের লোকে ঠেঙ্গিয়ে ওকে মেরে ফেলেছে।

রাগদা পাথরের মূর্তির মত অসাড় হয়ে গেল, কারও কথার কোন জবাব দিলে না। নিজের মনেই সে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল একবার,—মুংলী নাই—মুংলীও নাই, হা বংহা !

গাঁয়ের লোকের কথা শুনে কি না করেছে রাগদা ! নির্দোষ দুটো মানুষকে সে নিজের হাতে বলি দিয়েছে। তাতেও এদের তৃপ্তি হয় নি, তাই এক ফোঁটা মেয়েটাকেও এরা শেষ করে দিয়েছে। বেশ করেছে, ভালই করেছে।

রাগদার বুকটা যে এখনও ভেঙে চৌচির হয়ে যায় নি এও হয়ত বংহার দয়া। কি আশায় আর দাঁড়িয়ে আছে রাগদা, গাঁয়ের সঙ্গে আর সম্পর্ক কি ওর !

রাগদা ধীরে ধীরে পা চালিয়ে দিলে। যাবার সময় ভিটের উপর গড় হয়ে কাকে যেন প্রণাম করে গেল। টস টস করে দু-ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল মাটির উপর।

পথে এসে দাঁড়াল রাগদা, কোথায় যে তাকে যেতে হবে কিছুমাত্র জানা নাই। যেখানে হোক—এ গাঁয়ে আর থাকা চলে না, এখানে থাকতে হলে কোনদিন হয় ত গোটা গাঁয়ের লোককেই খুন করে বসবে রাগদা। তার চেয়ে দূরে কোথাও সরে যাওয়াই ভাল।

রাগদা চলল নদীতীরের পথ ধরে। মহুল-বনের পাশ দিয়ে সতীজাঙ্গাল বাঁয়ে রেখে ছেলেপোতার মাঠ পার হয়ে তেমুণ্ডির চরে গিয়ে উঠল রাগদা। সামনে তার চোখে পড়ল খাই-রাক্ষসীর শ্মশান। চোখ বুজে থমকে সে খানিক দাঁড়াল। সোজা পথটা ছেড়ে দিলে রাগদা, খিন্নিতলা পিছনে রেখে বাবলাবনের ভিতর দিয়ে বে ঘাটে গিয়ে রাগদা নদী পার হ'ল। হিঙ্গুল নদী পার হয়ে সোজা সে হাঁটতে আরম্ভ করলে সামনের দিকে মুখ করে। পথঘাটের বালাই নাই, রাগদা শুধু চলল, যেদিকে দু'চোখ যায় সেই দিকেই চলল।

ঈশান কোণে মেঘ করেছে। গর্জ্জে উঠল কালবৈশাখীর ঝড়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঝম্ ঝম করে বৃষ্টি পড়তে সুরু হ'ল। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই রাগদার, ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে একটানা সে হেঁটে চলেছে। ঝড়ের ঝাপ্টায় হোঁচট খেয়ে পড়ল রাগদা। পায়ের আঙুল কেটে ঝর ঝর ক'রে রক্ত পড়তে লাগল। মনে পড়ল সেই রাত্রির কথা, যেদিন সে নিজের হাতে দু' দুটো মহাপ্রাণী বধ করে সদর দোরে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিল। রাগদা আর ভাবতে পারে না, বুকের শিরাগুলোয় কে যেন মোচড় দিয়ে টানছে। চোখ ফেটে জল এল রাগদার, পাগলের মত বুক চাপড়ে ভাঙা গলায় হঠাৎ সে একবার বলে উঠল,—হা বংহা!

মেঘ ডেকে উঠল গুড়গুড় শব্দে। কে জানে রাগদার ডাক বংহার কাছ পর্য্যন্ত পৌছল কি না!

ডান-ডাকিনীর উপদ্রবের কথা বহুকাল আর শোনা যায় নি। এ সব কাহিনী পুরান হয়ে গেছে। সাঁওতাল পাড়ায় কোথা থেকে হঠাৎ জুটেছে এক পাগলা এসে। বদ্ধ পাগল বুড়োহাবড়া ঐ লোকটাকে নিয়ে ছেলেমেয়েরা তামাশা করে, পাগলাকে দেখে মুখ ভ্যাংচায় ওরা, দূর থেকে ধুলো ছোঁড়ে, কেউ কেউ বা হাসতে হাসতে ছুটে গিয়ে টান দেয় ওর দাড়ি ধরে। পাগলার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই কোন দিকে। ওদেরই আবার নানারকম খেলা দেখায় পাগলা, বাঁশের একটা আড় বাঁশীতে জোরে ফুঁ দেয় ওদের সামনে, ঝোলা থেকে টিনের একটা কৌটা বের করে আঙুলের চাটি মেরে ওদের বাজনা শোনায়। ওটা নাকি ওর ডুগডুগি। পাগলা নিজের পরিচয় দেয় জিতু হাড়ামের বাপ পিতু হাড়াম বলে। ডান-ডাকিনীর ও নাকি একজন মস্ত বড় ওঝা। পাগলের প্রলাপ! আবোল তাবোল কত কি সব বকে যায় পাগলা, কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও বা নিজের উপর বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে বকতে বকতে মনের আক্ষেপে চুল ছিঁড়তে থাকে। সে-দৃশ্য কিন্তু অতিশয় মর্ম্মান্তিক, থেকে থেকে চোখ ফেটে যেন জল আসে পাগলার। কে জানে কি দুঃসহ ব্যথা—কি এক অব্যক্ত বেদনার অশ্রুভরা ইতিহাস নিভৃতে লুকিয়ে আছে বৃদ্ধের ওই জরাজীর্ণ বুকখানার মধ্যে। কে-বা ওকে চেনে, কেই-বা ওর খোঁজ রাখে। লোকের চোখে আজ ও শুধু পাগল। আমরা কিন্তু চেষ্টা করলে এখনও ওকে চিনতে পারি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেকার যবনিকা তুলে ধরলে লোকটাকে আমরা অন্য চেহারায় দেখতে পাব। সাঁওতাল পাড়ায় ওর আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত নয় মোটেই, এ গ্রাম ওর চেনা। যে পড়ো জমিটার উপর দাঁড়িয়ে পাগলা ওই ডুগডুগি বাজিয়ে খেলা দেখাচ্ছে একদিন ঐ জমির সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, নাড়ীর সম্বন্ধ ছিল ওর এখানকার আলো হাওয়ার সঙ্গে। ওই ওর ভিটে, এই সেই রাগদা মাঝি।

সমাপ্ত

রবীন্দ্রনাথের "রাজা"

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের অশান্ত মন-পাখীটি জড়ের খাঁচায় বাহিরের আলোর জন্য কত মাথা কুটিয়াছে, বাহিরের স্বপন-সাথী অচিন পাখীটির জন্য অজস্র আকুলি ব্যাকুলি করিয়াছে, সহস্র কলকাকলি তুলিয়াছে। খাঁচায় ধরা-বাঁধা আবার তাহাকে শান্ত রাখিতে পারে নাই। এই যে সংসারের সকল পাওয়ার মাঝে কি যেন কি না পাওয়ার দুঃখ গুনগুনানি, কখনও বা পাওয়ার প্রবল আশায় পাওয়ারই মত আনন্দ রনুরনি, আবার কখন পাওয়ার ভাবাবেশে তৃপ্তির শিহরণী—এ সমস্তই প্রিয়ের বিরহ, প্রিয়ের মিলন-আশা ও প্রিয়ের মিলনের বিচিত্র উদগ্র অনুভূতির মতই আমাদিগকে কাঁদায়, নাচায়, হাসায়। বাহ্য জগতের প্রেমিক-প্রেমিকা লইয়া নাটকের মত অন্তর জগতের এই নাটকও চমৎকার। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' মানবমনের এই চিরন্তন নাটক।

অন্তরের বিরহিণী যাহাকে একান্তভাবে চায়, সে ত নামরূপের অতীত, অব্যক্ত। "আমি যারে চাই, তার নাম না বলিতে পারি।" তবু তাহাকে ডাকিবার জন্য, ভাবিবার জন্য, নিদিধ্যাসনের জন্য একটি নাম দিতে হয়। আহা! পারস্য কবি কি সুন্দর কথাটি বলিয়াছেন—

"বনামে আঁকে হেচ নামে নদারদ।
বহর্ নামে কে খ্বানি সর্বর্ আরদ॥"

অর্থাৎ—তাঁহার নামে শুরু করি, যাঁহার কোনই নাম নাই। যে নামে তাঁহাকে ডাক, সেই নামেই তিনি মাথা তোলেন।

এই অনামীর নাম দিয়াছেন কবি 'রাজা'। নূতন সংস্করণে রাজা হইয়াছেন অরূপ রতন। গীতাঞ্জলিতে কবি গাহিয়াছিলেন—

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি

'রাজা' নাটকে সেই গানের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি গুঞ্জন করিতেছে।

সুদর্শনা রাণী, কিন্তু রাজাকে কখন চোখে দেখেন নাই।

রাজাকে তিনি পান সকল সময় আঁধার ঘরে। সেই ঘর মাটির আবরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈয়ারি। রাণীর বড় সাধ, রাজার মুখখানি দেখিতে বাহিরের আলোয়। সুরঙ্গমা রাজার আঁধার ঘরের দাসী।

একদিন রাজা আসিতেছেন তাঁহার আঁধার ঘরে। সুরঙ্গমা নিজের বুকের মাঝে তাঁহার পায়ের শব্দ পাইয়াছে। রাণী আঁধার ঘরের দোর-জানালা কিছুই ত দেখিতে পান না। কাজেই সুরঙ্গমা রাজাকে ভেজানো দোর খুলিয়া দিল। রাজা আসিলেন। রাণী রাজাকে আলোয় দেখিবার জন্ত বায়না ধরিলেন। শেষে রাণীর জেদে তিনি বলিলেন, "আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপর দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা করো।"

বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে বড় সমারোহ। চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়াছে। রাজরাজড়ারা আসিয়াছেন, বিদেশী লোক আসিয়াছে, স্বদেশী লোক আসিয়াছে। ঠাকুর্দা ছেলের দলকে লইয়া উৎসবে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছেন। সুরঙ্গমা রাজার আদেশে উৎসবে যোগ দিয়াছে। নানা জনে নানা কথা বলাবলি করিতেছে,—সত্যই রাজা আছেন, না কেবল একটা গুজব। এমন সময় রাজবেশে মহা আড়ম্বরে একজন আসিল। তাহার ধ্বজায় কিংশুক ফুল আঁকা। সকলেই তাহাকে রাজা বলিয়া অভিনন্দন করিল। কিন্তু ঠাকুর্দা বলিলেন, "এ ত রাজা নয়। আমার রাজার ধ্বজার পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।" আর তাহাকে চিনিয়া ফেলিলেন কাঞ্চীরাজ। তখন সেই ভণ্ড রাজবেশী সমাগত রাজাদিগকে প্রণাম করিল। সকলেই উৎসবে মত্ত। কেবল ঠাকুর্দা রাত জাগিয়া দরজায় খাড়া রহিয়াছেন।

ওদিকে প্রাসাদ-শিখর হইতে রাণী সুদর্শনা সখী রোহিণীকে লইয়া ব্যগ্র ভাবে উৎসবমধ্যে রাজার সন্ধান করিতেছেন। রাজবেশীকে দেখিয়া রাণী তাহাকেই রাজা ঠাহর করিলেন। রোহিণীর কিছু সন্দেহ হইল। তবু রাণীর কথায় রোহিণী উচ্চবাচ্য না করিয়া তাঁহার দেওয়া উপহার ফুল পদ্মপাতায় করিয়া রাজবেশীর হাতে গিয়া দিল। তখন রাজবেশীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া রোহিণী তাহাকে ভণ্ড বলিয়া ধরিয়া ফেলিল। সে ফিরিয়া আসিয়া রাণীকে সমস্ত কথা বলিয়া দিল। রাণী নিজকে অপমানিত বোধ করিলেন। তবুও তিনি রোহিণীর কাছ হইতে সেই ভণ্ডের দেওয়া তাহার কণ্ঠের মালাটি নিজের হাতের কঙ্কণের বদলে লইয়া নিজের গলায় না পরিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাজবেশীর মোহন রূপে তিনি ছিলেন এমনই মুগ্ধ। অথচ তিনি ইহার জন্ত নিজকে ধিক্কার দিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

এদিকে রাণী সুদর্শনাকে পাইবার জন্ত কাঞ্চীরাজ ভণ্ডরাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া রাজপ্রাসাদে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিলেন। দৈবাৎ সেই আগুন চারিদিক ঘিরিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই বেড়াআগুনের মধ্যে রোহিণী। সে রাজবেশীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। রাজোদ্যানের অন্ত দিকে আগুনের বেড়ার মধ্যে কাঞ্চীরাজ ও ভণ্ডরাজ বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া হয়রান। রাণী সুদর্শনাও ছুটিয়াছেন বাহিরের পথের সন্ধানে। রাজবেশীকে দেখিয়া তিনি ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "রাজা রক্ষা কর। আগুনে ঘিরেছে।" তখন রাজবেশী বলিল—"কোথায় রাজা? আমি রাজা নই। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড।" এই বলিয়া সে মুকুট মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিল। এখন রাণীর অনুশোচনার আর পরিসীমা রহিল না। তিনি আগুনে পুড়িয়া মরিবার জন্ত পুনরায় প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

প্রাসাদের সেই আঁধার ঘরে রাণী পাইলেন রাজার সাক্ষাৎ। আজ রাণী দেখিলেন রাজাকে ঝড়ের মেঘের মত কাল, কূলশূন্য সমুদ্রের মত কাল। সে অতি ভয়ানক রূপ। রাজা বলিলেন, "যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালবাসা কিসের।" তখনও কিন্তু রাজবেশীর রূপের নেশা রাণীর দুই চক্ষে লাগিয়া আছে। তিনি রাজাকে সহিতে পারিলেন না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘের মত সেখান হইতে দ্রুত প্রস্থান করিলেন। রাজা তাঁহাকে একটুকুও বাধা দিলেন না। একটু পরে রাণী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু রাজা তখন চলিয়া গিয়াছেন। এখন রাণী চলিলেন বাপের বাড়ী। রোহিণীকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন, কিন্তু সে গেল না। সুরঙ্গমাকে তিনি চান না, তবু সে সঙ্গে চলিল।

রাণী পৌঁছিলেন পিত্রালয়ে। পিতা কান্তকুব্জরাজ তাঁহার কোনই আদর অভ্যর্থনা করিলেন না। দাসীগিরি করিয়া রাণীর দিন অতিকষ্টে কাটিতে লাগিল।

রাজার কথা তিনি মনে করেন আবার রাজবেশীকেও তিনি ভুলিতে পারেন না। এমন অবস্থায় একদিন কাঞ্চীরাজ রাজবেশীকে লইয়া সসৈন্যে উপস্থিত। তাঁহাদের পিঠে-পিঠে আসিলেন আরও ছ' জন রাজা। সাত রাজাই চান রাণী সুদর্শনাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতে। ফলে কান্তকুব্জরাজের সঙ্গে বাধিয়া গেল তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধ বাধিতেই কাপুরুষ রাজবেশী পলাইতে চাহিল। কাঞ্চীরাজ তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। অন্তঃপুরে বসিয়া সুদর্শনা সুরঙ্গমার সঙ্গে রাজার কথা আলোচনা করিতেছেন এমন সময় দ্বারী খবর দিল কান্তকুব্জরাজ বন্দী হইয়াছেন।

কাঞ্চীরাজ অন্ত রাজাদিগকে ডাকিয়া যুক্তি করিলেন, রাণী স্বয়ংবরা হইয়া যাহার গলায় বরমাল্য দিবেন তিনিই সুদর্শনাকে লাভ করিবেন। রাজবেশী অন্তঃপুরে আসিয়া ঐ সংবাদ পৌঁছাইয়া দিল। তখন রাজবেশীর উপর রাণীর ঘৃণা জন্মিল। আবার যখন বাতায়ন হইতে তিনি দেখিলেন স্বয়ংবর-সভায় ভণ্ডরাজ কাঞ্চীরাজের পিছনে ছাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাঁহার মনে নিজের উপর শত শত ধিক্কার বোধ হইতে লাগিল। স্বয়ংবর-সভায় যাইবার জন্ত রাণীর উপর তাগিদ হইতে লাগিল। ঘৃণায় লজ্জায় তিনি যেন মরিয়া গেলেন। তখন বারবার রাজার কথা তাঁহার মনে ভাসিয়া আসিতে লাগল। তাই কি তিনি ছুরি দিয়া আত্মহত্যা করেন। ছুরি তাঁহার বুকের কাপড়ের ভিতরই ছিল। এদিকে রাণীর এই অবস্থা, আর ওদিকে স্বয়ংবর-সভায়

রাজারা অধীর হইয়া উঠিতেছেন। এমন সময় যেন সভায় ভূমিকম্প উপস্থিত হইল। যোদ্ধ্বেশে ঠাকুর্দা সেখানে প্রবেশ করিলেন। তিনি সংবাদ দিলেন, রাজা স্বয়ং আসিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেনাপতি, আর রাজা তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। যুদ্ধের নাম শুনিয়াই ভণ্ডরাজ পলাতক। কাঞ্চী-রাজ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যেরা পলাইতে গিয়া বন্দী হইলেন। কাঞ্চীরাজ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে করিতে বুকে কঠিন আঘাত পাইয়া হার মানিলেন। তিনি প্রাণে বাঁচিলেন। কিন্তু বুকে হারের চিহ্নটা চিরস্থায়ী হইয়া আঁকা রহিল। রাজা তাঁহাকে নিজের সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া স্বহস্তে তাঁহার মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন।

রাজার জন্য রাণীর অন্তর একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। তবুও রাজা দেখা না দিয়াই চলিয়া গেলেন। রাণী সারারাত জানালার কাছে পড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিয়া কাটাইলেন। তাঁহার সমস্ত অভিমান আজ ধূলিসাৎ।

সকালে তিনি সুরঙ্গমার সঙ্গে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। চোখের জলে চলার পথ ভিজাইতে ভিজাইতে তিনি চলিয়াছেন প্রিয়তমের সহিত মিলনের জন্য। এত কষ্টের রাস্তা তবু যেন তাঁহার পায়ের তলায় সুরে সুরে বাজিয়া উঠিতেছে। ইহারই বেদনার গানে তাঁহার প্রিয় যেন সেই কঠিন পাথরে সেই শুকনা ধুলায় বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়াছেন। রাস্তা হইতে তাঁহার প্রিয়কে পাওয়া সুরু হইয়াছে। তাঁহার শরীর আনন্দে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। পথে চলিতে চলিতে দেখা হইল কাঞ্চীরাজের সহিত। তিনিও চলিয়াছেন রাজদর্শনের জন্য। পথে রাত্রি আসিল। ক্রমে রাত্রি ভোর হইল। সুরঙ্গমা বলিল, "আর দেরি নেই মা, তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।" এমন সময় ঠাকুর্দা উপস্থিত। এখন তাঁহাদের যাত্রাপথেরও অবসান। ঠাকুর্দা চাহিলেন ছুটিয়া গিয়া সুদর্শনার রাণীর বেশটা লইয়া আসেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, "না না না! যে রাণীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি আমি আজ তাঁর দাসী—যে কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নীচে।" কাঞ্চীরাজও চাহিলেন তাঁহার রাজবেশটাকে মাটি করিয়া লইয়া যাইতে। কথাবার্তা হইতে হইতে সূর্য্য উঠিল।

এই নূতন দিবসে আবার সেই আঁধার ঘরে রাজা রাণীর মিলন হইল। রাণী বলিতেছেন, "আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে সইতে পারবে?" রাণী উত্তর দিলেন, "পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদ বনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।" রাজা বলিলেন, "আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হলো। এসো এবার আমার সঙ্গে এসো বাইরে চলে এসো—আলোয়।"

এখন এই রূপক-নাট্যের অন্ত প্রধান পাত্রপাত্রীগুলির ব্যাখ্যা করি। সুদর্শনা হইতেছেন মানব-আত্মা। যে আঁধার ঘরের রাজার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় সেটি হৃদয়। এই হৃদয়ই অসীম ও সসীমের মিলন-ক্ষেত্র। অভিমান ত্যাগ করিয়া দাস্য-ভাব মনে জন্মিলে তবে ঈশ্বর-মিলন সম্ভব হয়। দুঃখ-কষ্ট, পাপ-তাপের মধ্য দিয়া মানবাত্মা পরিশুদ্ধ হইয়া যখন ভগবানের সন্ধানে বহির্গত হয় তখন তাঁহার মিলন প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হয়। দাসী সুরঙ্গমা হইতেছে ভক্তি। ভক্তি হৃদয়ের ভেজান দোর খুলিয়া পরমাত্মাকে আগু বাড়াইয়া আনে। ভক্তি কখন ভুল করে না, সে হৃদয়নাথকে নিশ্চিত জানে। দাসী রোহিণী হইতেছে বুদ্ধি। বুদ্ধি পরমপুরুষকে চিনিতে কখন কখন ভুল করিয়া বসে। এইজন্যই তাঁহার প্রাপ্য পূজার অর্ঘ্য কখনো কখনো সে অন্তকে দিয়া ফেলে। কিন্তু সে যে সকল সময়ই ভ্রান্ত হয় তাহা নয়। সে দেখিয়া ঠেকিয়া নিজের ভুল নিজেই সংশোধন করিয়া লয়। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন রাজবেশীর নাম সুবর্ণ। সুবর্ণ কেবল সোনা নয়, যাহা কিছু মানুষকে মুগ্ধ করে, ধন জন যশ সমস্তই সুবর্ণ। তাহার মোহন রূপ মানুষের চোখে নেশার সৃষ্টি করে, অন্তরে মোহ উপস্থিত করে। তখন মানুষ পরমার্থকে ছাড়িয়া তাহাকেই কামনা করে। কাঞ্চীরাজ হইতে-ছেন বীরত্ব। সুবর্ণ বীরত্বের পদে প্রণত হয়, তাহার ছত্রধারী ভৃত্য হয়। বীরত্ব মানব-আত্মাকে অধিকার করিতে চায়। সে-ই পরমাত্মার একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার এই বীরত্বই পরমাত্মার পথে মানুষের সহযাত্রী হয়। ঋষির উক্তি—"নায়-মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—বলহীন কখন পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ঠাকুর্দা হইতেছেন সরল সহজ মন। ইঁহারাই ঈশ্বরের বন্ধু। ইঁহারা সদানন্দ। ইঁহাদের সম্বন্ধে কুর্‌আনে বলা হইয়াছে "অবধান কর! নিশ্চয় যাহারা আল্লাহের বন্ধু তাহাদের কোনও ভয় নাই, তাহারা শোক পাইবে না।" যীশুখ্রীষ্ট বলেন, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় কোন আপন-ভোলা সদানন্দ বাউলকে দেখিয়া ঠাকুর্দা চরিত্রটি আঁকিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, তিনিই আমাদের সকলের ঠাকুর্দা। এই ঠাকুর্দা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি রূপক-নাট্যের একটি বিশিষ্ট চরিত্র।

রূপক ছাড়িয়া দিয়া 'রাজা'কে কেবল একখানি নাটক হিসাবে দেখিলেও আমরা ইহার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হই। ইহার প্রত্যেক চরিত্রটি স্বাভাবিক ও সজীব। রাজার চরিত্র মাহাত্ম্য-পূর্ণ। তিনি বজ্রের মত কঠিন আর ফুলের মত কোমল। তাই তাঁহার ধ্বজাচিহ্ন পদ্মের মাঝে বজ্র। কোন দীনতা, কোন হীনতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অদম্য, অনম্য; কিন্তু অন্তরে অন্তরে কত প্রেমপূর্ণ। এই রাজা বিশ্বরাজের সুন্দর প্রতীক। মঞ্চে তিনি দেখা দেন না। ইহাতে তাঁহার লোকাতীত মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন রাখা হইয়াছে। রাণী সুদর্শনা সকল রাণীরই মত অভিমানিনী, কৌতূহল চরিতার্থ করিতে ব্যগ্র। যখন তিনি বাহ্যতঃ স্বামীর প্রতি বিরাগিণী অন্তরে তিনি তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী। দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর স্বামীর প্রতি প্রাণের আকর্ষণে তাঁহার অভিমানে ছাই পড়িল। পরি-

হঠাৎ হাসিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমাগত এমন ভাবে হাসিতে থাকে যে শিক্ষক বা শিক্ষিকা অত্যন্ত বিশ্রী অবস্থায় বিমূঢ় হইয়া বসিয়া থাকেন এবং পরিশেষে পরাজিত হইয়া চলিয়া আসেন। এহেন ক্লাস নাইন নাকি তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়াই চুপ করিয়া গিয়াছে এবং সেই ক্লাসের ছাত্রীরাই দেবেনবাবুর সবচেয়ে বড় গুণগ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে। দেবেনবাবু কোন দিনই কাহাকে কটু কথা বলেন নাই, তবুও তিনি আসিতেছেন শুনিলে সকলে ভয়ে চুপ করিয়া যায়—হেড-মিস্ট্রেস মিস্ করকে দেখিলেও নাকি এত সমীহ কেহ করে না।

সুনামটা যে সর্ব্বদাই ভাল তা নয়, দুর্ভাগা লোকের সুনামই তার দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া পড়ে এমন উদাহরণের অভাব নাই। সুনাম হেতু লাঞ্ছনাও প্রচুর—বিশেষতঃ সে সুনাম যখন উপরিতন কর্ম্মচারীর নামকে ছাপাইয়া উঠে—তাহাতে চাকুরী যায়, প্রচুর পরিশ্রম করিয়াও অপযশ মাত্র মিলে।

সেদিন দেবেনবাবু ক্লাস নাইনে অঙ্ক কষাইতেছিলেন। একটা অঙ্ক দুরূহ, কেহই পারে নাই—তিনি সেটাকে বোর্ডে বুঝাইয়া দিয়াই মুছিয়া ফেলিয়া ছাত্রীদিগকে পুনরায় কষিতে বলিলেন—ছাত্রীরা কষিতে আরম্ভ করিল—

ঠিক এমনি সময়ে মিস্ কর ক্লাসে ঢুকিয়া ক্লাস পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন—দেবেনবাবুর হাসি পাইতেছিল। ক্লাসে পর্যবেক্ষণ ব্যাপারটার জন্ত নহে, প্রাক্‌টিস্ টিচিং-এর সময় তাহার সেই কাঁদ-কাঁদ সুন্দর মুখখানির কথা মনে পড়িয়া। আজ, এ কয় বছর পরে সে আড়ষ্টতা সে কাঁদ-কাঁদ ভাবের কিছুই নাই, আজ মিস্ কর যেন বেশ বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞতায় অনেক কিছুই জানিয়া ফেলিয়াছেন। মিস্ কর কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

ছুটির কিছু পূর্ব্বে লগ্‌বুক আসিল। তাহাতে মিস্ কর জানাইয়াছেন—তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন যে অঙ্ক পড়াইতেও বোর্ডের কোন ব্যবহার হয় নাই। ভবিষ্যতে বোর্ড ব্যবহার করিতে ও অঙ্কশাস্ত্র অধ্যাপনা সম্বন্ধে একখানা পুস্তক পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন।

দেবেনবাবু ছুটির পর লগ্‌বুকখানি হাতে করিয়া দ্বারদেশ হইতে প্রশ্ন করিলেন, আসতে পারি মিস্ কর?

—আসুন।

—লগ্‌বুকে আপনার মন্তব্যটা পড়লাম। একটু বলবার আছে—একটা অঙ্ক কষে দিয়ে বোর্ড মুছে ফেলে সেই অঙ্কটাই কষতে দিয়েছিলাম কিনা তাই বোর্ডে কিছু ছিল না।

—আমি ত বোর্ডে কিছু দেখিনি, তাই লিখেছি। মিথ্যা কথাও লিখি নি।

—অবশ্যই, কিন্তু সেটার ক্ষেত্র বিচার করবার ত একটু দরকার।

—টিচিং ইম্‌প্রুভ করতে হবে বলেই লিখেছি।

দেবেনবাবু কি জবাব দিবেন বুঝিয়া পাইলেন না, খাতাখানি হাতে করিয়া ক্ষণিক দাঁড়াইয়া থাকিলেন।

মিস কর কহিলেন, ওর পাশে সিন্ লিখে সই ক'রে দিন।

—আজ্ঞে সিন লিখলে ত ওটা স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাই ক্ষেত্রটার কথাও লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেবেনবাবু আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিয়া সই করিলেন এবং দেখেন হেড মিস্ট্রেসের হিতবাণীর মধ্যে কিছু কিছু ইংরেজীর অশুদ্ধ প্রয়োগ রহিয়াছে, অভ্যাসবশতঃ সেটাকেও সংশোধন করিয়া ফেলিলেন। দপ্তরীর হাতে খাতাটা পাঠাইয়া দিয়া ছাতা লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন এমনি সময়ে পুনরায় ডাক পড়িল।

মিস্ কর দেবেনবাবুর মুখের দিকে না চাহিয়াই কহিলেন, এ কেটেছে কে?

—আমি।

—কেন?

—ভুলটা অন্যের চোখে পড়লে একটু খারাপ হয় তাই—

—আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হবার জন্তে আপনাকে কোনও অনুরোধ জানানো হয়েছে কি?

—মানুষে বিনা অনুরোধেও অনেক সময় আপন গরজেই হিতাকাঙ্ক্ষী হয়—ওটা অনেকের বদভ্যাস—

—আপনি স্থান কাল পাত্র ভুলে যাবেন না, সেটা আপনার পক্ষে লাভের হবে না—

দেবেনবাবু কোন জবাব না দিয়াই চলিয়া আসিলেন। পথে আসিতে আসিতে তাহার মনে পড়িল, এই মেয়েটিই একদিন চা দিতে দিতে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া একটু হাসিয়া তাহাকে তারিফ করিয়াছিল—নান পড়ে আমি কিছুই বুঝিনে, অথচ আপনি বুঝালে কিন্তু বেশ বুঝে ফেলি, আপনারা কেমন করে বুঝেন।

দেবেনবাবু কি জবাব দিয়াছিলেন তা মনে নাই।

আরও কিছু দিন গেল।

মাঝে মাঝে মিস্ কর প্রেরিত লগ্‌বুক নানা উপদেশ বহন করিয়া আসে, দেবেনবাবু নির্ব্বিচারে তাহা সই করিয়া দেন, নানাবিধ নোটিশ সহি করেন এবং নিজের কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে চিঠি মারফৎ নিবেদন পেশ করেন কিন্তু নিজে কোন দিন তাহার সমীপে উপস্থিত হন না।

ইতিমধ্যে একটা নোটিশ বাহির হইয়াছে—প্রত্যেক শিক্ষককে নিয়মিত পাঠ-টীকা লিখিতে হইবে। দেবেনবাবু সংক্ষেপে অন্যান্য সহকর্ম্মীকে বলিয়াছেন, সকাল-বিকাল টিউশনি করিয়া পাঠ-টীকা লেখা সম্ভব নয়, একটু নোট রাখা চলতে পারে।

কিছু দিন পরে পাঠ-টীকার খাতা দেখাইবার আদেশ হইলে দেবেনবাবু তাঁহার সামান্য নোটবইখানা দাখিল করিলেন। যথাসময়ে ডাক পড়িল। দেবেনবাবু হাজির হইলে মিস্ কর বলিলেন, পাঠটীকা কি এমনি ভাবে লিখতে হয়? যদি নাই জানেন জিজ্ঞেস করে নিতে ত পারতেন। জানেন না এমন ত নয়, যদি ভুলে গিয়ে থাকেন—ইনস্পেকট্রেস্ এলে কি এই খাতা দেখানো যাবে?

—আমার খাতা যখন ওই তখন ওটা দেখান ছাড়া আর উপায় কি?

—তাতে আমার উপরেও ত দোষ পড়ে, যখন জিজ্ঞেস করবেন আপনি কি করেছেন তখন আমার ত কোন জবাব নেই।

দেবেনবাবু সংক্ষেপে জবাব দিলেন,—ওর চেয়ে বেশী লিখবার সময় নেই।

মিস্ কর বলিলেন, লগ্‌বুকে আবার কিছু লিখলে সেটা কি ভাল হবে।

দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, সেটা লেখা আপনার কর্ত্তব্য, না লিখলে আপনার কর্ত্তব্যপালন করা হবে না সেটা নিশ্চয়ই বোঝেন।

মিস্ কর কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকিয়া কহিলেন, নমস্কার, আমার কথা শেষ হয়েছে—দেবেনবাবু উঠিয়া আসিলেন।

সেদিন স্কুল হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার সহকর্ম্মী রাখালবাবু প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা দেবেনবাবু মেয়েদের অভিভাবকেরা সকলেই ত আপনার গুণগান করে অথচ লগ্‌বুকে নিয়তই আপনার শ্রাদ্ধ চলছে আপনি এর কোন প্রতিবাদ করেন না কেন?

—প্রতিবাদ করে লাভ। তাতে শ্রাদ্ধটা লেপা জায়গা ছেড়ে যাবে, আমি ত জানি ওসব না লিখে ওর নিস্তার নেই।

—কেন?

—উনি নিজেও জানেন যে মিথ্যা এবং ভুল লিখছেন তথাপি উনি লিখছেন এবং লিখবেনও।

—তাও কি সম্ভব? এটা মনে হয় তার বেশীরকম আত্মশ্লাঘার লক্ষণ, তিনি মনে করেন যেহেতু তিনি হেড মিস্ট্রেস সেই হেতুই তিনি সবকিছু সবার চেয়ে ভাল জানেন এবং বোঝেন।

দেবেনবাবু প্রতিবাদ করিলেন, না না তা নয়। আপনারা ভুল বুঝবেন না ওটা আত্মম্ভরিতার লক্ষণ মোটেই নয়। যারা নিজের সম্বন্ধে খুব বড় ধারণা করে তারা কখনই অধমকে লাঞ্ছিত করে না, উত্তমকে আক্রমণ করে।

—তবে কেন এমন হয়?

—কেন? নাই বা শুনলেন।

—বলুন না।

—এর কারণ কি জানেন? উনি মনে করেন আমি ওর চেয়ে বেশী জানি এবং ভাল পড়াই সেই জন্যেই লগ্‌বুকে আমার শ্রাদ্ধটা এত ঘন ঘন হয়, কিন্তু সে ধারণা অমূলক, তিনি এতদিন ইস্কুল চালাচ্ছেন তাঁরই বেশী জানা সম্ভব—কিন্তু সে আত্মপ্রত্যয়টা যেন ঠিক নেই বলে মনে হয়।

—আপনি প্রতিবাদ করেন না কেন? আপনিও যদি এসব সহ্য করেন তবে আমরা ত নেই।

দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, আমি জানি প্রতিবাদ করাটা নিরর্থক আর তা ছাড়া প্রতিবাদ করেই কি মানুষের মনকে অন্যরকম করে গড়া চলে—বুদ্ধিমান লোক যদি কেউ দেখে সে তার দীনতা ও অসমতাকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।

রাস্তার মোড়টিতে রাখালবাবু বিদায় নিলেন, দেবেনবাবু একাকী গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে পুরাতন একটি কথা ভাবিতেছিলেন। একদিন কি একটা ব্যাপার এক কথায় বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন—কিছুই বুঝলাম না—ও সব।

দেবেনবাবু পরিহাস করিয়াছিলেন যা বোঝেন সেইটে করলেই ত সব গোলমাল মিটে যায়।

—কি?

—যে যা করে ঘর-গেরস্থালি করা।

—ওঃ, আপনারা বিয়ে করে গণ্ডা কয়েক ছেলেপুলের বাপ হয়ে ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে ফেলেছেন মনে করেন নাকি।

—আপনারা সেজেগুজে ট্রামে-বাসে চলে এবং মহর্ষিগণের বইগুলি বদহজম করে ছেলেগুলোর মন বিগড়ে দিয়েই কি ভয়ঙ্কর একটা কিছু করেছেন মনে করেন?

—মন কি আপনারও বিগড়েছে?

—সে বয়স নেই, তবে আপনারও যে বিগড়ে যায় নি এমন কোন প্রমাণ—

পরিহাস করিয়া মিস্ কর বলিয়াছিলেন, আর যাকে দেখেই বিগড়ে যাই আপনাকে দেখে নয়—

—বলা বাহুল্য মাত্র, দেবেনবাবু হাসিয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছিলেন। আজ তিনি মনে মনে ভাবেন, সেদিনের সে স্নেহ বা ভালবাসা নেহাত বিবাহিত বলিয়াই প্রতিহত হইয়াছিল নহিলে কি হইত বলা যায় না।

আবার কিছুদিন গিয়াছে—

ইস্কুলে পুরস্কার বিতরণ হইবে, সেই সঙ্গে একটি নাটিকা ও কিছু নাচ-গানের বন্দোবস্ত থাকিবে। মহলা চলিবে ঠিক হইল, কিন্তু নাটিকা ঠিক হয় নাই। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে, তিনি কেবল মাত্র স্বীকার করিয়াছেন তাহাই নহে, যে দিন দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত নিকট—অর্থাৎ ছয় সাত দিন মাত্র আছে। এই সঙ্কটে অকস্মাৎ মিস্ কর অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, স্কুলে আর এমন কেহ নাই যে সমস্ত উৎসবটিকে সুসম্পন্ন করিতে পারে। মিস্ কর প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া সেদিন বলিলেন—এখন কি হবে?

দেবেনবাবু কহিলেন, ভালমন্দ বলে যদি অভিযোগ না করেন তবে কাজটা আমি চালিয়ে দিতে পারি—আপনাদের মত হয়ত হবে না, তবে একটা কিছু হবে।

অতএব তাহাই স্থির হইল। দেবেনবাবু নিজে নাটক লিখিয়া কবিতা নির্ব্বাচন করিয়া গান লিখিয়া সুর দেখাইয়া সমস্ত প্রস্তুত করিয়া দিলেন। সকাল দুপুর বৈকাল অক্লান্ত ভাবে মহলা দিলেন, কেবল তাহাই নহে নিজ হাতে সমস্ত রঙ্গমঞ্চ সাজাইয়া দিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিলেন।

উৎসবান্তে একজন অভিভাবক বক্তৃতা দিতে উঠিয়া কহিলেন, আজ প্রায় পনর বৎসর এখানকার এই অনুষ্ঠান আমি দেখছি কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান কোনদিন দেখি নি, যেমন কবিতা নির্ব্বাচন তেমনি তার আবৃত্তি, যেমন নাটক তেমন তার অভিনয়। যাঁরা এই উৎসবকে এমন সুন্দর করে তুলেছেন তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

সমবেত অতিথিগণ চলিয়া গেলে উক্ত অভিভাবক দেবেন

বাবুকে কহিলেন, ধন্যবাদ আপনাকে, আপনিই এর সমস্ত প্রশংসাবাদ পেতে পারেন।

দেবেনবাবু জিহ্বায় কামড় দিয়া কহিলেন, না না, আমি কিছু করিনি, এ সমস্তই মিস্ কর করেছেন, সমস্ত সাধুবাদ তাঁরই প্রাপ্য।

মিস্ কর অদূরে দাঁড়াইয়া শুনিলেন এবং দেবেনবাবুর দিকে একবার তাকাইয়া একটু গম্ভীরভাবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেক্রেটারী আসিয়া বলিলেন, মিস্ কর, সকলে কি বলছে জানেন? চমৎকার, এমনটি হয় না। যাক, আপনার পরিশ্রমে আমরাও সুনাম কিনে ফেল্‌লাম। কিন্তু এত অল্প সময়ে এত করলেন কি করে?

মিস্ কর হাসিলেন, কোনও কথা বলিলেন না। প্রশংসাটাকে ফাঁকি দিয়া পাইয়াছেন এমন কোন বিনয়সূচক কথাও প্রকাশ করিলেন না। কক্ষটি প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিলে দেবেনবাবু মিস্ করের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, কাজ ত সব হয়ে গেল, এখন আমি যেতে পারি?

—হ্যাঁ, পারেন। কাল স্কুল বন্ধ থাকবে জানেন ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বিকেলে আমার সঙ্গে একটু দেখা করবেন, কাজ আছে।

—সিন-টিন সব সকালেই পাঠাবার বন্দোবস্ত করেছি, আমি সব ঠিক ঠিক পৌঁছে দেব।

—তাহোক, তবুও বিকেলে একবার আসবেন।

পরদিন বৈকালে দেবেনবাবু পূর্ব্ব কথামত উপস্থিত হইলেন। আপিস-কক্ষে বসিয়া ছিলেন, মিস্ কর আসিয়া বলিলেন, বসুন, একটু দেরি হ'ল আসতে—

—তা হোক, কেন ডেকেছিলেন?

মিস্ কর হাসিয়া কহিলেন, বসুন এত ব্যস্ত কেন?

কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে দপ্তরী চা ও খাবার লইয়া আসিল। দেবেনবাবু অবাক হইয়া কহিলেন, এ কি? এ সব আবার আমার জন্যে কেন?

—এত পরিশ্রম করেছেন তার একটু পুরস্কার পাওয়া ত উচিত।

—ও, তাই? সেটা ত পরিশ্রম করার সময়ে পেলেই ভাল হ'ত। যদি ইস্কুল থেকে খাবারের বন্দোবস্ত হ'ত তবে আর একটু পরিশ্রম বেশী করা যেত।

মিস্ কর কহিলেন, এই উৎসবের সাফল্যের জন্যে যত সাধুবাদ আমার প্রাপ্য, না?

—হ্যাঁ, আমরা আপনার সহকারীমাত্র, আপনার হয়ে আপনার নামে আমরা কাজ করি, সুনাম দুর্নাম সব আপনার—মেয়েরা পাস করলে আপনার সুনাম, ফেল করলে দুর্নাম অথচ পাস-ফেলের জন্যে আপনি তো আর একা দায়ী নন?

—কিন্তু আপনার এ উদারতা দেখাবার অর্থ আপনি বোঝেন?

—উদারতা? না—নেহাত সত্যভাষণ।

—আমাকে ছোট প্রতিপন্ন করে আপনার লাভ? তাতে করে কোনদিনই আপনি হেড-মিস্ট্রেস হবেন না বা আমার কিছুই করতে পারবেন না জানেন অথচ এ সব কেন করেন?

—আশ্চর্য্য!

—আশ্চর্য্যই, মেয়েমানুষ হ'লেও তাদের বুদ্ধি কিছু কিছু থাকে। সমস্ত প্রশংসাবাদ আমাকে অকুণ্ঠ ভাবে দান করে আপনি প্রতিপন্ন করতে চান যে অন্যান্য বার থেকে এবার যে ভাল হয়েছে তা কেবলমাত্র আপনারই জন্যে।

—এমন দুরাকাঙ্ক্ষা, আমার নেই।

—আছে বলেই সেদিন ঐ সকল কথা বলেছেন। আপনার বিদ্যাবুদ্ধি অনেক থাকতে পারে, কিন্তু যেদিন নেহাত নাবালিকা অবস্থায় আপনার কাছে নাম পড়েছি সেদিন যে আমার নেই এ কথাও আপনি বিশ্বাস করুন।

—এ বিশ্বাস করি।

—তবুও কেন এখানে চাকুরি করেন? আমি থাকতে যে আপনার চাকুরি এখানে পাকা হবে না সে কথা আপনি জানেন?

—জানি না, অনুমানও করি নি।

মিস্ করের মুখখানি সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল—স্পষ্টই বুঝা যায় তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। সহসা কম্পিত তপ্ত কণ্ঠে কহিলেন—জানেন না বটে কিন্তু জেনে রাখুন তাতে আপনার উপকার হবে—

দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেমন করে একথা বিশ্বাস করি যে, আপনিই আমার চাকুরি পাকা হতে দেবেন না। এ সম্ভব নয়—

মিস্ কর আরও উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, সম্ভব নয় শুধু—অবশ্যম্ভাবী। কেন সারা বাংলায় কি আর একটিও স্কুল নেই যেখানে আপনার চাকুরি হতে পারে?

—হতে পারে, যেমন এখানেও হতে পারে।

মিস্ কর রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, হতে পারে না, হবে না।

অকস্মাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে মিস্ কর চলিয়া গেলেন—যেন অত্যন্ত আহত ভাবে তিনি সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ করিয়া শিবিরে ফিরিয়া যাইতেছেন।

ছয় মাস পরে আজকার কমিটির মিটিঙে দেবেনবাবুর চাকুরি পাকা হইবার কথা কিন্তু মিস্ কর তাঁহার সম্বন্ধে যে লিখিত মন্তব্য পেশ করিয়াছেন তাহাতে কাহারও চাকুরি পাকা হইবার নয়—শিক্ষক হিসাবে তিনি অচল, ক্লাসে ডিসিপ্লিন থাকে না, অধিকন্তু তিনি কাহারও নির্দেশ মানেন না। সভায় দেবেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হইল এসব অভিযোগ সত্য কিনা? দেবেনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই সত্য, নহিলে আমার নামে মিথ্যা কথা লিখে ওঁর লাভ?

একজন মেম্বার কহিলেন, কিন্তু আমরা অন্য রকম শুনেছি। এস-ডি-ও সভাপতি, তিনি কহিলেন, শোনা কথার দাম নেই, অফিসিয়াল রিপোর্ট অনুযায়ী কাজ করতে হবে। ওঁর চাকুরি পাকা হবে না, এক মাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করে দিন। কাহারও উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তিনি 'প্রস্তাব পাশ' লিখিয়া ফেলিলেন—অন্যান্য সভ্যগণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া

চুপ করিয়াই রহিলেন, অকারণ এস-ডি-ও'র অপ্রীতিভাজন হইতে ইচ্ছা করিলেন না।

মিটিঙের পরে রাখালবাবু কহিলেন, আপনি এসব মিথ্যা কথা স্বীকার করলেন কেন?

—স্বীকার না করলেই বা কি হ'ত?

—আমরা দেখতুম কেমন করে ওঁ আপনাকে তাড়ায়। আপনাকে তাড়ালে ওঁর কি স্বর্গলাভ হবে—এমন যে কেউ হতে পারে এটা বিশ্বাস হয় না।

দেবেনবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভুল বুঝবেন না ওঁকে? উনি হয়ত আমাকে সত্যিই স্নেহ করেন, ওঁর হয়ত ইচ্ছা নয় যে আমি তাঁর অধীনে চাকুরি করি—আরও ভাল চাকুরি করি এই বোধ হয় ইচ্ছা তাই হয়ত আমাকে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হতে ইঙ্গিত করছেন। সত্যিই ত প্রিয়জনকে আমরা দূর করে দিতে পারি তবুও ছোট করে দেখতে চাইনে—তাই নয়?

রাখালবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, মহত্ত্ব আর আহাম্মুকির মাঝে তফাৎ যে খুব সামান্য সেটা আজ বুঝলাম। রাখালবাবু ছাতাটাকে অকারণ বগলে চাপিয়া ধরিয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন।

বিদায় লইবার দিন উপস্থিত হইল।

সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দেবেনবাবু মিস্ করের কক্ষের পর্দার অন্তরাল হইতে জিজ্ঞাসা করিল, আসতে পারি?

—আসুন।

—আজ যাচ্ছি, নমস্কার, হয় ত আর জীবনে দেখা হবে না।

—সম্ভবতঃ। চাকুরি পেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—ছেলেদের স্কুলে?

—হ্যাঁ।

—আশা করি সেখানে আপনার চাকুরি পাকা হবে, এবং মাইনেও বাড়বে।

—ভগবান দিলে হতে পারে।

মিস্ কর একটু থামিয়া কহিলেন, যদি অপরাধ কিছু করে থাকি ক্ষমা করবেন—মানুষ মাত্রেরই ত্রুটি আছে, জানেন নিশ্চয়ই?

দেবেনবাবু স্মিত হাস্যে কহিলেন, না না, অক্ষমতার জন্যে আপনাকে দোষারোপ করব কেন?

—ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছেন ত?

—হ্যাঁ।

—নমস্কার, মনে রাখবেন কি?

নিশ্চয়ই। সেদিনের কথা আজ যেমন মনে আছে, আজকের কথাও ভবিষ্যতে তেমনি থাকবে।

—নমস্কার। দেবেনবাবু স্পষ্ট দেখিলেন মিস্ করের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া আছেন।

পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইবার সময় আর একবার ফিরিয়া চাহিলেন—দুই ফোঁটা অসংযত অশ্রু গণ্ডের উপর নামিয়া আসিয়াছে।

গ্রীষ্মের ফল খরমুজ ও তরমুজ

অধ্যাপক শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ

মানবজীবনের প্রথম থেকেই আমরা দেখতে পাই যে ফল, মূল ইত্যাদি তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। তারপর শত সহস্র বৎসর পার হয়ে গিয়েছে কিন্তু তাতে তাদের খাদ্য-তালিকার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত বৎসরের সকল ঋতুতেই নানান্ জাতের ফলসম্ভার মানবের কল্যাণার্থ প্রকৃতির ভাণ্ডারে জন্মে থাকে। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে নানান্ জাতের যে-সব ফল আমরা দেখতে পাই খরমুজ ও তরমুজ তাদের অন্যতম।

খরমুজ ও তরমুজ বলতে আমরা কুমড়ো, শশা ইত্যাদি গাছের মত অর্থাৎ Cucurbitaceæ গোত্রের দুইটি বিভিন্ন গণের গাছ বুঝে থাকি। বহুরূপ (Polymorphism) এ গোত্রের বিশেষত্ব। খরমুজ এবং শশা *cucumis* গণভুক্ত হলেও এরা বিভিন্ন জাতির অন্তর্গত। খরমুজের বৈজ্ঞানিক নাম *Cucumis melo* linn, কিন্তু শশার নাম *Cucumis sativus*, linn। ফুটি, খরমুজ, কাঁকুড় ইত্যাদি সব একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় গণটির নাম হচ্ছে *Citrullus*। তরমুজ *Citrullus vulgaris*, schrad) এই গণের প্রধান ফলবান গাছ।

খরমুজ, ফুটি, কাঁকুড়* ইত্যাদি গাছগুলি দক্ষিণ এশিয়ার আদিম অধিবাসী এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সর্বত্রই এরা আপনা হতেই জন্মে। কিন্তু পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ এবং উষ্ণ অঞ্চলেই এর চাষ প্রতি বৎসর হয়ে থাকে। জ্যামেকা দ্বীপ থেকে ইংলণ্ডে এর প্রথম প্রচলন হয় ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তখন থেকে বহুদিন যাবৎ কাচের ঘরের মধ্যে চাষ হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে খরমুজের প্রচলন হয়। এর পর থেকে আমেরিকায় খরমুজের ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়।

এদের শুঁয়োওয়ালা লতা মাটির উপর দিয়ে অথবা অন্য কোন গাছ বেয়ে ওঠে। এদের পাতা হাতের পাতার মত খণ্ডিত এবং কাণ্ডের গ্রন্থিগুলিতে অনেক অবিভক্ত আকর্ষ (tendril) থাকে। এরা সহবাসী (monœcious) শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ পুরুষ এবং স্ত্রীফুল একই গাছে জন্মে থাকে। ফুলের পাপড়ি গভীর ভাবে পাঁচ ভাগে বিভক্ত এবং ঘণ্টাকৃতি। পুরুষ ফুলে তিনটি পুংকেশর থাকে। Naudin কোন কোন ক্ষেত্রে

* হিন্দীতে এদের নাম খরবুজ, তামিলে মুলম্, সিন্ধীতে ঘিদ্রো, পাঞ্জাবীতে গিলম্, মালয়ীতে লবোক্রঞ্জী এবং চীনা ভাষায় তি-এন্-কা বা হি-এন্-কা এবং ইংরেজীতে মেলন (melon)।

স্ত্রীফুলেও পুংকেশর লক্ষ্য করেছেন। এদের চাষ করা স্বজাতীয় গাছের মধ্যে পাতার এবং প্রকৃতিগত প্রকারভেদ বিস্তর, ফলের প্রকারভেদও কম নয়। ফলের আকার ছোট জলপাই থেকে আরম্ভ করে কুমড়োর চেয়েও বড় হতে পারে। এছাড়া বর্ণে গন্ধেও এদের প্রকারভেদ বিস্তর। বিভিন্ন জাতের খরমুজের ভেতর প্রজননের ফলে কুমড়োর মত বিশেষ রূপান্তরও দেখা যায়; এবং এইভাবে স্বষ্ট প্রায় সমস্ত গাছে বীজ জন্মে ও সেই বীজ থেকে পুনরায় চারা হয়ে থাকে।

খরমুজের খোসা পাতলা এবং এর জালিদার রং ফিকে সবুজ থেকে লালচে কমলার যে কোন রকম হতে পারে। ফলটির আকার অনেকটা গোল এবং খোসা অসমান; অর্থাৎ বোঁটা থেকে নীচ পর্যন্ত আড়াআড়ি ভাবে কয়েকটি অগভীর দাগ থাকে।

ফুটির খোসা কিন্তু সচরাচর সমান হয় তবে রং খরমুজের মত বিভিন্ন হতে পারে। এর আকৃতি সব সময়ই একটু লম্বাটে তাকিয়ার মত। বেশী পেকে গেলে সাধারণত এরা ফেটে যায়; এই ঘটনা অন্য আর কোন উপজাতির ফলে দেখা যায় না।

কাঁকুড় সাধারণত বনে জঙ্গলে জন্মে থাকে, বিশেষ করে অল্প উঁচু জমিতে অথবা লাল মাটিতে। কাঁকুড়ের খোসাও সমান এবং দেখতে তাকিয়ার মত তবে রং সবুজপ্রধান। এদের শাঁস মোটেই মোলায়েম নয়। এরা অনেকটা শশার মত খেতে। খরমুজ, ফুটি, কাঁকুড় ইত্যাদি উপজাতি একই জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং সাধারণত এদের মূলত বিশেষ পার্থক্য নেই। সুতরাং একটির জীবনেতিহাস আলোচনা করলে প্রায় সবগুলিরই জানা হবে।

অন্যান্য শাকসব্জীর মত এশিয়ায় খরমুজের চাষ বহুকাল যাবৎ চলে আসছে। মিশরীয়রা যে খরমুজের চাষ করত তা অনেক নিকৃষ্ট জাতের এবং সম্ভবত এশিয়া থেকেই এদের আমদানি হয়েছিল। রোমক এবং গ্রীকরাও এদের সঙ্গে পরিচিত ছিল যদিও কতকগুলো জাতকে শশা বলে ভুল করা হয়েছিল। কারো মতে কলম্বসই আমেরিকায় খরমুজ নিয়ে যান এবং পর্তুগীজরা নিয়ে যান মালয় দ্বীপপুঞ্জে।

সুদীর্ঘ গ্রীষ্মঋতু খরমুজ চাষের পক্ষে বিশেষ ভাবে উপযোগী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘঋতু পাবার জন্য প্রথমে রক্ষিত স্থানে বীজ বোনা হয় এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা কেটে গেলে চারাগুলি তুলে মাঠে লাগান হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার ইম্পিরিয়াল মালভূমিতে অগ্রহায়ণ-পৌষে বীজ বুনে সময়োচিত ফসল পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি গাছকেই 'কাচ-কাগজ' অথবা অন্য কোন প্রকার ঢাকা দিয়ে রক্ষা করতে হয় যত দিন না তুষারপাত বন্ধ হয়ে উপযুক্ত ঋতু সুরু হয়। খরমুজের চাষ ভারতবর্ষেও প্রায় ঐ সময়েই হয় তবে কিছু পরে অর্থাৎ পৌষ-মাঘে বীজ বোনা হয়ে থাকে। বাজারে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এমন কি তারও আগে ফল উঠতে আরম্ভ করে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যখন প্রতিরোপণের দরকার হয় তখন 'উষ্ণক্ষেত্র' অথবা 'কাচ-ঘরে' প্রথমে বীজ বোনা হয়। চারা খুব ছোট থাকতেই প্রতিরোপণ করা হয় খুব সাবধানে শেকড় না মড়িয়ে, কারণ এই জাতীয় গাছের প্রতিরোপণ খুব কঠিন এবং গাছ সহজেই মরে যেতে পারে। একবারে মাঠেই যখন বীজ বোনা হয় তখন মাটি গরম থাকা দরকার। ৮০° ফার্ণহিটে অঙ্কুরোদ্গম সবচেয়ে ভাল হয় এবং ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে জমিতে বীজ পচে যায়। অঙ্কুরোদ্গম হতে প্রায় ৬ থেকে ১২ দিন সময় লাগে। জমির অবস্থা অঙ্কুরোদ্গমের অনুকূলে না থাকলে বীজ একরাত ভিজিয়ে রেখে ভেজা কাপড় বা কাগজের ওপর অঙ্কুরোদ্গম করাতে হয় এবং শেকড় যখন প্রায় ১ ইঞ্চি পরিমাণ হয় তখন জমিতে দিতে হয়। সহজে চাষ করা যায় এমন ঝরঝরে সারবান জমিতে খরমুজ খুব ভাল জন্মে। সময়োচিত ফসলের জন্য ঝরঝরে দোয়াঁশ বা বেলেমাটি বেশ ভাল। সাধারণত এদের জমিতে সার বা উর্বরতা-সাধক বস্তুর ব্যবহার করা হয় না তবে শস্যাবর্ত এবং সবুজ সারের পর্যায় দিয়ে মাটির উর্বরতা বজায় রাখা হয়। ব্রিটেনে খরমুজের চাষ পাহাড়ের গহ্বর অথবা গরম ঘরে হয়ে থাকে।*

যারা একটা কাচের ঘর সম্পূর্ণভাবে খরমুজ চাষের জন্যই ব্যবহার করতে পারে তাদেরই কাচের ঢাকার নীচে খরমুজের চাষ করা উচিত, কারণ এই ঘরে তাপ সব সময়ই একভাবে রাখতে হয়। গরম জল দিয়ে গরম করা ঘরেই খরমুজ সবচেয়ে ভাল জন্মে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'কাঠাম চাষ' খুব ভাল এবং সবচেয়ে ভাল খরমুজ এইভাবে জন্মান হয়। এর চাষ অনেকটা শশার চাষের মত; তবে মনে রাখতে হবে যে শশার ফল কাঁচা কিন্তু খরমুজের ফল পাকা অবস্থায় তোলা হয়। সেইজন্য খরমুজের একটু বেশী তাপের দরকার। অক্টোবরের শেষে একে পাকানর চেষ্টা করা নিষ্ফল হয়। শশার চেয়ে খরমুজের একটু বেশী জমাট মাটি এবং কম জল দরকার। তাছাড়া জোর আলো এবং প্রচুর বাতাস খরমুজ ভালভাবে চাষ করার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। জমাট দোয়াঁশ মাটির সঙ্গে পুরনো চুণ-বালি-পাথরের টুকরো মিশিয়ে চমৎকার মিশ্রসার (compost) তৈরি হয়।

বীজ 'টবের মিশ্রসার'এ বোনা যেতে পারে কিন্তু তাতে বেশ খানিকটা ভালভাবে পচান পাতা সার মেশান দরকার। 'টবের মিশ্রসার'এর পরিমাণ হচ্ছে—

২ ভাগ কাঁকর-বালি
২ " দোয়াঁশ মাটি
২ " পচা পাতা
½ " শুকনো গোবর সার

এইভাবে মেশান ৯৷৷০ মণ সারের সঙ্গে ৫ ইঞ্চি ফুলের টবের এক টব হাড়ের গুঁড়ো মেশাতে হবে।

বেঞ্চ-এ† চারা তুললে, মাটি ৬ ইঞ্চির বেশী গভীর হলে চলবে না। কেউ কেউ প্রথমে টবে চারা তুলে তারপর উপযুক্ত

---

* আমাদের দেশে নদীর জল নেবে যাবার পর বালুকাময় তটে গর্ত করে বীজ বপন করা হয় এবং চৈত্র, বৈশাখ থেকে জল উঠে গাছগুলি মেরে ফেলার আগে পর্যন্ত গাছগুলিতে ফল ধরে।

† সাগরপারের দেশে 'কাচঘরে' কংক্রিটের তাকে মাটি ঢেলে জমি তৈরি করা হয়।

জায়গায় তাদের উঠিয়ে লাগান পছন্দ করেন। প্রথম খুব ছোট টবে আরম্ভ করে টব বদল করে যেতে হয়, যখন চারা ৫ ইঞ্চি টবের উপযুক্ত হয়ে যায় তখন তাকে তুলে কাচের ঘরে চালান দিতে হয়।

লতাগুলোকে কাচের যত দূর সম্ভব কাছে বড় হতে দিতে হয় এবং স্ত্রীফুলগুলিকে কৃত্রিমভাবে পরাগিত করতে হয় পরিষ্কার উজ্জল দিন দেখে। প্রত্যেকটি স্ত্রীফুলের নীচে গোলমত একটা অংশ আছে যেটা বড় হয়ে ফলের সৃষ্টি করে। যে ফুলে এই অংশটি নেই সেগুলিই পুরুষফুল। যেই ফল ধরে যায় এবং বড় হতে আরম্ভ করে অমনি একটা করে জাল ছাদ থেকে বেঁধে দিয়ে তার ভেতর ফলগুলিকে ঝুলিয়ে দিতে হয় নইলে ফলের ভারে লতাটি গাছ থেকে ছিঁড়ে যেতে পারে।

চারার ছোট অবস্থায় কোন সময়ই শেকড় শুকোতে দেওয়া উচিত নয়। পরিষ্কার দিনে পাতাগুলোতেও পিচকিরি দিয়ে জল দিতে হয়, বিশেষ করে সকালে এবং রাতের মত 'কাচঘর' বন্ধ করবার সময়। ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করাই ভাল। ফুল ফুটলে কম জল দেওয়া চলে কিন্তু গাছের জলাভাব হচ্ছে কিনা সেটা দেখা দরকার। খরমুজ গাছে জল খুব পরিমাণ মত দিতে হয়, কারণ বেশী জল পেলে ফল বড় ও স্বাদ খারাপ হয়ে যায় কাচের ঘরে রাত্রিতে তাপ ৭০° ডিগ্রির অন্যূন এবং দিনের বেলা ৮০°-৮৫° ডিগ্রির অনধিক থাকা দরকার। ফল পাকতে আরম্ভ করবার সময় কাচঘরের তাপ যদি ৯০° ফার্ণহিট থাকে তবে ফল খুব সুস্বাদু হয়। মার্চে বোনা গাছে ফল ধরে, পাকতে প্রায় চার মাস সময় লাগে এবং পরে বোনা গাছের ফল পাকতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে। প্রত্যেকটি গাছে ৩।৪টির বেশী ফল ধরে থাকতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাতে ভাল ফল পাওয়া যায় না। ফল ধরে পাকা পর্য্যন্ত প্রায় ৪।৫ সপ্তাহ সময় লাগে, কোন কোন সময় তার চেয়েও বেশী। ফল একদম পেকে না গেলে তোলা উচিত নয়। কারণ পাকবার সময় শাঁস নরম হয় এবং এতে চিনির পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং গাছ থেকে তুললেই কমতে আরম্ভ করে কিন্তু কাঁচা অবস্থায় তুললে চিনির পরিমাণ মোটেই বাড়তে পারে না।

কোন প্রকারের খরমুজে ফল পাকলে বোঁটা থেকে খসে আসে যা অন্যগুলিতে হয় না। খোসার রং হলদে এবং ফলের ফুল-লাগান দিকটা নরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল পাকতে আরম্ভ করে।

ভিজা আবহাওয়াতে ফুটির ফল ফেটে যেতে পারে এবং সাধারণতঃ গাছের গোড়াতে জল খুব বেশী ঢাললেই এমন হয়। এ ছাড়া ফল তোলার বিষয় একটি প্রধান নিয়ম হচ্ছে এই যে, না পাকলে ফল কখনো তুলবে না। হাটে বাজারে সেটা নেয়া নিজেদের সুবিধে মত করতে হয়। শীতের সময় ফল পাওয়ার জন্য খরমুজ চাষ করা বিশেষ সুবিধের নয়।

যত্ন নিলে খরমুজের সাধারণতঃ রোগ বা মহামারী হয় না। পাটা-শামুক (eel-worm) শেকড় কেটে দিতে পারে যাতে গাছটি আপাতঃ দৃষ্টিতে বিনা কারণে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, এ ছাড়া পোকাও ধরতে পারে। কালো পোকার আক্রমণে গাছের পাতা কোঁকড়ায় এবং রং বদলে যায়। লাল মাকড়সার জন্য পাতার রং প্রথমে হলদে তারপর রূপালী হয়ে অনেক আগেই ঝরে যায়। রোগের হাত থেকে অবশুন পুরুষকে বাঁচানর জন্য ফল তোলার পর গাছগুলি নষ্ট করে ফেলতে হয় এবং কাঠাম ইত্যাদি ভালভাবে পরিষ্কার করা ও ধোঁয়া লাগান, গাছের পোকা এবং লাল মাকড়সা ধোঁয়া লাগিয়ে অথবা spray করে মেরে ফেলা উচিত।

তরমুজ‡ হচ্ছে *Citrullus*গণের একমাত্র চাষ করা বর্ষজীবী গাছের জাত। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিশেষ করে উত্তর-ভারতে তরমুজের চাষ খুব হয় এবং পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণপ্রধান দেশেই তরমুজ খুব বেশী জন্মে থাকে।

Linnæus-এর মতে ইতালীর দক্ষিণাংশ তরমুজের আদি বাসস্থান এবং সেখান থেকেই এরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু Seringe-এর মতে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা তরমুজের আদি বাসস্থান। বহুকাল থেকে আফ্রিকায় ও এশিয়ায় তরমুজের প্রচলন আছে। এগুলি যে প্রথম কোন্ দেশে জন্মেছিল তা ঠিক বলা অসম্ভব। আমাদের দেশের পুরনো পুঁথিতে তরমুজের উল্লেখ দেখা যায়। ব্রিটেনে যোড়শ শতাব্দীর আগে তরমুজ পাওয়া যেত না এবং এখানে তরমুজের প্রচলন প্রথম কোন্ দেশ থেকে হয়েছিল তাও বলা মুশকিল। প্রাচীন মিশরীয়দের হাতে আঁকা ছবি দেখে জানা যায় যে এরা তরমুজের চাষ করত এবং ইউরোপীয় উদ্ভিদতত্ত্ববিদদের মতে চীনদেশে দশম শতাব্দীর পূর্বে তরমুজ ছিল না। মোট কথা, গ্রীষ্মপ্রধান দেশই যে তরমুজের আদি বাসস্থান সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

তরমুজের গাছটি মাটির ওপর দিয়ে লতিয়ে যায়। এদের পাতা ফুল ইত্যাদি সবই প্রায় খরমুজের মতই হয় তবে তরমুজের আকর্ষ বহুবিভক্ত (খরমুজের আকর্ষ অবিভক্ত)। তরমুজের ফল গোলাকার এবং আয়তনে খুব বড়। এর খোসা খুব মোটা মোলায়েম, এবং রং গাঢ় সবুজ। পাকা তরমুজের খাদ্যাংশ পীত, পাটল অথবা রক্তবর্ণ, আর কাঁচাগুলির মধ্যভাগ সাদা। সাধারণতঃ সব তরমুজের বীজ একই রকম হয় না, লাল, কাল ইত্যাদি নানা রঙের হয়ে থাকে। ফুটি এবং তরমুজ একই বর্গের তবে দুটি বিভিন্ন গণের গাছ এবং তরমুজের ফলে জলের ভাগ ফুটির চেয়ে অনেক বেশী থাকে।

পৌষ, মাঘ মাসে তরমুজের চাষ আরম্ভ হয় এবং গরমের প্রথম দিকেই ফল পাকতে সুরু করে। অসময়ে বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি হলে তরমুজের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আখ-ক্ষেতে জ্যৈষ্ঠ মাসে এক প্রকার তরমুজের চাষ হয়, এদের ফল পাকে কার্তিক মাসে, নাম হচ্ছে 'কালিন্দ'। ব্রিটেনে তরমুজের চাষ খুব কম। আফ্রিকায় প্রায় সব জায়গাতেই তরমুজ পাওয়া যায়। যে-সব তরমুজের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ,

‡ হিন্দী ভাষায় একে তরবুজা, তরমুজ, খঁরবুজ প্রভৃতি; গুজরাটী ভাষায় তরবুচ, তুরবুচ ও করিঙ্গ; মহারাষ্ট্রী ভাষায় তরবুজ ও কলিঙ্গদ; বাংলা ভাষায় তরবুজ ও তরমুজ এবং সংস্কৃতে তরম্বুজ বলে। পারস্য ভাষায় এর নাম হিন্দবসন্দ ও কচ রেহণ এবং ইংরেজী নাম ওয়াটার-মেলন (water-melon)।

তার চাষ চীন দেশেই বেশী পরিমাণে হয়ে থাকে। ইউরোপীয়-দের মতে Spanish Imperial ও Carolina উপজাতির তরমুজই সর্বোৎকৃষ্ট। সুদীর্ঘ গ্রীষ্ম তরমুজ-চাষের খুব উপযোগী। ফুটি যতটা উত্তরাঞ্চলে চাষ করা সম্ভবপর ততটা উত্তরে তরমুজের চাষ সম্ভবপর নয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাংশে তরমুজের চাষ হয় তবে উত্তরাংশের চাষের জন্ম যে-সব জাত তাড়াতাড়ি পাকে সেগুলি বোনা দরকার অথবা তাদের তুষার পাত থেকে রক্ষা করার জন্ম ঢাকা জায়গায় চারা তুলে পরে মাঠে নিয়ে বোনা যেতে পারে।

তরমুজের গাছ অনেকটা জায়গা নেয় সেই জন্ম সীমাবদ্ধ জায়গায় তরমুজ চাষ করা উচিত নয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি চারা সব দিক দিয়ে ৪ হাত অন্তর বোনা উচিত। সারবান বেলে-দোয়াঁশ, ক্ষারহীন জমি তরমুজ-চাষের উপযুক্ত। জমির জলনিকাশের ভাল বন্দোবস্ত থাকাও দরকার। তরল সার তরমুজের পক্ষে ভাল।*

শীতের দেশে কাচের ঘরে তরমুজের চাষ খরমুজের চাষের মতই তবে তরমুজের চাষে বেশী জায়গার দরকার।

বাংলাদেশে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে হাটে, বাজারে প্রচুর তরমুজ ওঠে। ভাল জাতের তরমুজ ভাল পাকলে গাছ থেকে তোলা উচিত তবে বেশী পেকে যাওয়া ভাল নয়। তরমুজ পাকল কি না ঠিক করা খুবই মুশ্‌কিল, কারণ ফল পাকলে তার আকার এবং রঙের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তবে কাঁচা অবস্থায় ফলটিকে হাত দিয়ে বাজালে ধাতব আওয়াজ হয় এবং যতই পাকতে থাকে আওয়াজও ক্রমেই গম্ভীর এবং মন্দীভূত হয়ে যায়। তবে এই সব এবং অন্তান্ত বিধি পরীক্ষা করতে হয় মাঝে মাঝে মাঠ থেকে ফল তুলে। এতেই সময় মত ফল তোলার একটা অভ্যাস হয়ে যায়।

তরমুজের বীজ থেকে এক প্রকার পাংশুবর্ণ পরিষ্কার তেল পাওয়া যায়। প্রদীপ জ্বালাবার জন্ম এই তেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে অনেক জায়গায় রান্নার কাজেও এর ব্যবহার দেখা যায়।†

বিকানীরে আপনা থেকেই এতবেশী তরমুজ জন্মে যে বছরের কয়েক মাস এই অঞ্চলে তরমুজ একটা প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠে। দুর্ভিক্ষের সময় তরমুজ এবং তার বীজচূর্ণ দিয়ে ময়দা তৈরি করে তাই খেয়ে অনেকে জীবনরক্ষা করে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যেমন সুস্বাদু তরমুজ পাওয়া যায় এমন আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে গোয়ালন্দের তরমুজ খুব বিখ্যাত। খুব গরমের সময় তরমুজের সরবত আমরা পান করি।

তরমুজের রোগ বেশীর ভাগই খরমুজের মত। এক প্রকার মাটিতে জানা ছত্রাক (*Fusarium* sp.)এর আক্রমণে পাতাগুলি শুকিয়ে গাছ মরে যাওয়াই (wilt) এদের প্রধান রোগ। কিন্তু এই রোগ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা যে বংশগত তা অর্টন্‌স তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী (১৮৯৯-১৯০৯) গবেষণার ফলে জানতে পারেন।

সকলপ্রকার তরমুজেই এই রোগ ধরে, বহু পরীক্ষা করে ১২০ বা তারও বেশী উপজাতির তরমুজের ভেতর থেকে একটি রোগবিরোধীও পাওয়া যায় নি। পরে পাওয়া গেল একপ্রকার অভক্ষ্য তরমুজ, যারা এই রোগমুক্ত। Citron (অভক্ষ্য) এবং Eden (ভক্ষ্য) এই দুই উপজাতির তরমুজের প্রজননের ফলে চমৎকার ফলদায়ী শঙ্কর-এর প্রথম পুরুষ (F_1 hybrid) পাওয়া গেল। এদের ফল হ'ল দুটোর মাঝামাঝি রকমের। দ্বিতীয় পুরুষ শঙ্কর (F_2 hybrid)গুলিতে সব বিষয়েই বিশেষ প্রকারান্তর দেখা গেল, তবে Citronএর গুণগুলিই বেশীর ভাগ গাছে বেশ প্রকট ভাবে দেখা গেল। প্রায় ৩০০০-৪০০০ গাছ থেকে মোট দশটি ফল বাছাই করা হ'ল তাদের রোগহীনতা এবং অন্তান্ত গুণাগুণের উপর ভিত্তি ক'রে। পরবর্তী বৎসরে বীজগুলো আলাদা সংক্রামিত জমিতে বোনা হ'ল। এই ১০ টুকরো জমির মাত্র দুটিতে একরূপ গুণ এবং আকারের তরমুজ পাওয়া গেল এবং তার ভেতর একটির Eden উপজাতির সঙ্গে মিল ছিল প্রচুর। এখন এগুলির সৃষ্টি হ'ল Eden দ্বারা নিষিক্ত প্রথম শঙ্করের পশ্চাৎ প্রজনন (back crossing)-এর ফলে। অর্থাৎ Citron এবং Eden-এর সংমিশ্রণের ফলে তৈরি প্রথম শঙ্করকে আবার Eden-এর রেণু দিয়ে নিষেক করায় যাদের সৃষ্টি হ'ল। এখন এর ভেতর সবচেয়ে ভাল তরমুজগুলি বাছাই করে আলাদা ভাবে পরবর্তী বৎসরে তাদের বীজ বোনা হ'ল এবং আরও প্রকারান্তর দেখা গেল। এই ভাবে আরও পাঁচ বৎসর নির্বাচনের ফলে একটা উপজাতি পাওয়া গেল যার ভেতর সাম্য ও রোগহীনতা দেখা গেল। স্বাদে এবং গুণে Eden উপজাতির চেয়ে এ কোন অংশেই কম নয়।

তরমুজ এবং খরমুজ গ্রীষ্মকালে পাওয়া যায় এবং খাদ্য হিসেবে এর গুণ অনেক। এইসব এবং অন্তান্য কারণে আমাদের দেশে এদের চাষ প্রচুর পরিণামে হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়—ইউরোপ, আমেরিকায় যেমন নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে এদের উৎকর্ষের চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে আমাদের দেশের উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌দেরও সেবিষয়ে সচেষ্ট হওয়া খুবই উচিত। কোন্ কোন্ অঞ্চলে এগুলির চাষ ভাল হবে এবং কি কি সার ব্যবহার করা দরকার সে-সব বিষয়ে কৃষিবিভাগ থেকে কৃষকদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, শহর থেকে দূরে যে-সব অঞ্চল এইসব ফল চাষের উপযোগী, এবং বীজ সংগ্রহে অসুবিধা যাদের হয় তাদের, এবং অন্যান্য কৃষকদের ভাল এবং উন্নত ধরণের বীজ দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। তবেই হয়ত আমরা এমন দিনের আশা করতে পারি যখন তরমুজ বা খরমুজের ব্যবসা আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আমরা জাহাজ বোঝাই করে বিদেশেও এইসব ফল চালান দিতে পারব।

---

* অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বালুকাময় নদীগর্ভে এর চাষ হয় যেখানে জলের এবং স্থানের কোন অভাব হয় না।

† স্নিগ্ধকারক, মূত্রবর্দ্ধক, বলকারক, প্রভৃতি গুণ থাকার দরুন ঔষধ প্রস্তুত করার জন্ম আইন-ই-আকবরী এবং অন্তান্ত অনেক বইএ এর চাহিদার কথা উল্লেখ আছে।

মানুষ ও সৃষ্টি

শ্রীভবানীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

একথা বিজ্ঞানে এবং দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে যে, আকাশ (space) এবং কাল (time) অনন্ত, ইহাদের আরম্ভও নাই শেষও নাই। আধুনিক বিজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আকাশ সসীম, কিন্তু উহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা আকাশ ও কালকে অসীম বলিয়াই ধরিব।

আকাশ ও কালের এই অনাদি অনন্ত রূপ যদি কেহ কল্পনা করিতে চেষ্টা করেন, তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইবেন, জগৎ-সংসার তাঁহার নিকট অতি ক্ষুদ্র মনে হইবে।

যে শূন্যের মধ্যে বিশ্বজগৎ ভাসমান, তাহার তুলনায় সমস্ত জড়জগৎকে ক্ষুদ্রায়তন বলিয়াই মনে হয়। সেই ক্ষুদ্রায়তন জড়জগতের অতিক্ষুদ্র অংশ হইতেছে আমাদের সৌরজগৎ। আর পৃথিবী হইতেছে ইহারই ক্ষুদ্র এক গ্রহ। অনন্ত শূন্যের তুলনায় বা অন্যান্য সুবৃহৎ নক্ষত্র এবং নীহারিকার তুলনায় পৃথিবী এত ক্ষুদ্র যে, বিশ্বজগতের বাহির হইতে দেখিলে ইহার অস্তিত্ব চোখে পড়িবার সম্ভাবনা কম। মানুষ হইতেছে এই অতিক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম অধিবাসী।

আনুমানিক দুই শত কোটি বৎসর পূর্ব্বে, অন্য এক বিরাট্ নক্ষত্রের আকর্ষণের ফলে, আমাদের পৃথিবী সূর্য্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অন্য গ্রহগুলিরও এইভাবে জন্ম হইয়াছিল। তখন পৃথিবী ছিল একটি উত্তপ্ত বাষ্পময় গোলক মাত্র; বহুদিন পর্য্যন্ত উহাতে জীবনের চিহ্নও ছিল না। জন্মলাভের পর হইতেই উহা সূর্য্যের আকর্ষণ-মণ্ডলীর মধ্যে নিজেও ঘুরিতে লাগিল আর সূর্য্যকেও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। তার পর বহু লক্ষ বৎসর ধরিয়া উহা ক্রমে শীতল ও কঠিন হইতে লাগিল।

তাহার পর আনুমানিক ১২৩০০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ধরা-বক্ষে প্রথম জীবনের সূচনা হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকের অনুমান। কি করিয়া এবং কেন যে জীবন পৃথিবীতে আসিল, সে কথা কেহ সঠিক জানে না। তবে এটুকু জানা গিয়াছে যে জল, carbon dioxide এবং ammonia মিশাইয়া যে পদার্থ হয়, তাহার উপর অতি-বেগনী (ultra-violet) রশ্মির ক্রিয়ার ফলে একাধিক জৈব পদার্থ (organic substance) উৎপন্ন হয়। জীবনবিহীন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে উপরিউক্ত তিনটি বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং তৎকালীন বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকায় সূর্য্য হইতে অতি-বেগনী রশ্মি বিনা বাধায় পৃথিবীর উপর আসিতে পারিত। এই ভাবে প্রভূত পরিমাণে জৈব-পদার্থের সৃষ্টি হইয়া যথাকালে জীবন সৃষ্টি হয়। ইহা হইতে পৃথিবীতে জীবনের জন্মলাভের প্রকৃত ইতিহাস না জানা গেলেও, এটুকু স্থির করিয়া বলা যায় যে, জীবনের প্রথম সূচনা সমুদ্রেই হইয়াছিল।

তারপর লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া, পৃথিবীতে জীবনের যে উত্তরোত্তর জটিল বিকাশ, যে অপূর্ব্ব উপায়ে ও অদ্ভুত পথে চলিতে থাকিল, তাহার কাহিনী যেরূপ আশ্চর্য্য তেমনই চিত্তাকর্ষক। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী, পৃথিবীর জীবকুলের দেহের যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বৎসরের পর বৎসর হইয়া চলিল, তাহারই ফলে আজ আমরা, অর্থাৎ সমস্ত জীব, আমাদের উপযুক্ত দেহ পাইয়াছি। 'মনে'র কথা বলিলাম না, কারণ উহা জড় বা জীবনের কোঠায় পড়ে না, উহার ইতিহাস আলাদা।

মানুষের বয়স পৃথিবীর বয়স অপেক্ষা লক্ষাংশেরও কম। মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর বয়সের তুলনায় অতি সামান্য সময় ব্যাপী। আবার এই সামান্য সময়ব্যাপী ইতিহাসের অধিকাংশই মানুষের কাটিয়াছে অসভ্য, বর্ব্বর ও পশুতুল্য অবস্থায়। তখন মানুষের ভাষা ছিল না। তারপর মাত্র প্রায় এক লক্ষ বৎসর হইল মনুষ্যসমাজে ভাষার জন্ম হইয়াছে। আবার সেই ভাষা ব্যবহারের উপযুক্ত হইতেও অনেক দিন গিয়াছে। এইরূপে দেখা যায়, মানুষ ও তাহার সভ্যতা পৃথিবীতে অতি অল্পদিন হইল আসিয়াছে।

বিজ্ঞান বলে, সৌরজগতের আর কোন গ্রহ-উপগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব নাই। যে-সমস্ত ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, সেগুলি এখন অস্বীকৃত হইয়াছে। অন্য গ্রহের কথাও যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় উহাতেও জীবনের চিহ্ন নাই। আর যদিও থাকে, উহা চেনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না, কারণ উহার রূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের।

যদি তাহাই হয় তবে এই অনন্ত শূন্য এবং সুবিপুল জড় স্রোতের মধ্যে আমাদের যাত্রা বা অস্তিত্ব কত নিঃসঙ্গ! শুধু তাহা নহে; মানুষ যে অবস্থায় পৃথিবীতে বাস করিতেছে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কথা একটু ভাবিলে আমরা ভীত ও চমৎকৃত হইব। সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমতঃ, আমাদের বাসস্থান পৃথিবী, অন্যান্য নক্ষত্র নীহারিকার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমাদের পৃথিবীর মত সহস্র সহস্র গ্রহের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে এরূপ বিশালকায় নক্ষত্র অনেক আছে; উহাদের বিশালতার কল্পনা মনুষ্যমনের অসাধ্য।

তার পর সুদূর তারকারাজি হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের পৃথিবীর প্রত্যেকটি জড়কণা পর্য্যন্ত, যে বিপুল জড়জগতের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অধিবাসী আমরা, সে জড়স্রোত জীবনের প্রতি একান্ত উদাসীন। পৃথিবীর ঘটনা হইতেই ইহা প্রমাণ করা যায়। এক একটা বন্যায়, এক একটা ভূমিকম্পে, সহস্র সহস্র মানুষ এবং অন্যান্য জীবের মৃত্যু ও অশেষ যন্ত্রণাভোগ হইয়া থাকে। নিষ্ঠুর জড়জগতের নিকট হইতে আমরা কোনওরূপ সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারি না। জীবনের মর্ম্ম, অন্তরের বেদনা যাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, এইরূপ একটা নির্ব্বিকার জড়স্রোতের একটি কণা (পৃথিবী) অবলম্বন করিয়া আমরা জড়জগতের প্রাণীসমূহ এই অনন্ত শূন্যে একটি নক্ষত্রের

(সূর্য্য) চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। কে বলিবে ইহার উদ্দেশ্য কি, কে বলিবে ইহার সার্থকতা কি?

আবার, যে শূন্যে আমরা ভাসিতেছি, তাহাও জীবনের প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ। শূন্যের নিজস্ব রূপ হইতেছে গভীর অন্ধকার; সে অন্ধকার আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরে। তাহার উপর উহা তীক্ষ্ণ শীতলতাময়। শূন্যের শীতলতা এত অধিক যে, তাহাতে জীবনধারণ হয় না। কেবল সূর্য্য হইতে আলোক ও উত্তাপ আসিতেছে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি। আজ যদি মাত্র কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য পৃথিবী হইতে সূর্য্যালোক সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়, তাহা হইলে সেই অল্প সময়ের মধ্যেই সকল জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

এইরূপে জড়প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া মানুষ পৃথিবীতে বাস করে। প্রকৃতির নিকট ছোট্টো পিপীলিকার প্রাণের যে মূল্য একজন সম্রাটের প্রাণেরও ঠিক সেই মূল্য, এক চুলও বেশী নয়। নরশ্রেষ্ঠ কোনও মহাত্মা আর বিষ্ঠার কীট, প্রকৃতির নিকট এ দুয়ের কোনও পার্থক্য নাই। এরূপ অপক্ষপাত শক্তি আর দেখা যায় না।

জীবনের প্রতি জড়ের এই নিষ্ঠুরতা বা ঔদাসীন্য মানুষ বিশ্বাস করিতে চায় না, কিন্তু ইহা কঠিন সত্য। ইহারই মধ্যে মানুষ তাহার ক্ষুদ্র বুকে স্নেহ, ভালবাসা, সুখদুঃখ, আনন্দের স্পন্দন জাগাইয়া দিন কাটাইতেছে। এক একটা নির্ম্মম প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে তাহার বুক ভাঙিয়া দেয়, আবার উঠিয়া মানুষ বুক বাঁধে। এই নিদারুণ অনিশ্চিতের মধ্যে আমাদের বাস। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথাভরা স্নেহময়
মানবের মন।
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে,
মধুর রবির করে কত ভালোবাসা ভরে
কতদিন খেলা করে কত সুখে দুখে।"

সত্যই, জড়জগতের এই অদ্ভুত উদাসীন রীতি, যাহা প্রাণ এবং মনের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন, তাহার মধ্যে এত কোমল মানুষ এবং আর সমস্ত জীবের জন্ম কিরূপে সম্ভব হইল? উহাদের হৃদয়-বেদনার মূল্য এখানে কে দিবে?

জীবনের এই সব মূল রহস্যের উদ্ঘাটন এখনও হয় নাই। সংসারে জন্ম হইল, সংসার করিয়া দিন কাটিল, অবশেষে মৃত্যুর কালো যবনিকা আসিয়া জীবনের দৃশ্যপট আচ্ছন্ন করিয়া দিল, ইহাই আমরা দেখিয়া থাকি। আমাদের চক্ষে জীবন-নাট্যের ঘটনা ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু পড়ে না। কিন্তু ইহাতে মানুষের অন্তর তৃপ্ত হয় না। তাই জীবনের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য সে এখনও আকুল। আজ প্রায় চার সহস্র বৎসর হইল মানুষ সৃষ্টিরহস্য জানিবার জন্য বহুবিচিত্র পথে অন্ধের মত ফিরিতেছে, কিন্তু এখনও কিছু জানিতে সক্ষম হয় নাই। মূল রহস্যসকল জানিবার পক্ষে মানুষের অক্ষমতা সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার সেদিন পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন,

"After no matter how great a progress in the colligation of facts and the establishment of generalizations ever wider and wider, the fundamental truth remains as much beyond reach as ever."

এত যত্ন, এত চেষ্টার পর, এত জানিয়াও মানুষ যে এখনো কিছুই জানিতে পারে নাই, ইহা ভাবিলে আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত হই।

দৈহিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের সকল কথা মানুষ জানিয়াছে, কিন্তু গোড়ার অনেক কথা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। বিজ্ঞান দৃশ্যমান জগতের অনেক বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে বটে, কিন্তু কোনও জ্ঞাত বিষয়ের চরম প্রশ্নের সমাধান হয় নাই। জীবন সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু বলা যায় যে, প্রায় ১২৩০০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে উহার আবির্ভাব হইয়াছিল এবং নানা রূপে ক্রমবিকাশের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া অবশেষে সুদূর ভবিষ্যতে আলোক এবং উত্তাপের অভাব হেতু একদিন ধরণীর রঙ্গমঞ্চ হইতে তাহাকে চিরকালের মত নিঃশেষে বিলুপ্ত হইতে হইবে।

সূর্য্য হইতে সর্ব্বদাই কিরণ চলিয়া যাইতেছে। প্রতি মিনিটে প্রায় ২৫০০ লক্ষ টন ওজন সূর্য্য হইতে আলোক এবং উত্তাপের রূপে বাহির হইয়া যাইতেছে। সূর্য্য-সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই এরূপ চলিতেছে। অত্যন্ত বৃহৎকায় বলিয়া এখনও উহাতে প্রচুর তাপ সঞ্চিত আছে। কিন্তু এইরূপ বিকিরণ হইতে হইতে ক্রমে এমন দিন আসিবে যখন সূর্য্যে আলোক ও উত্তাপ কিছুই থাকিবে না। তখন পৃথিবীতে জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য। তখন ধরাপৃষ্ঠে জীবনের আর কোন অস্তিত্ব থাকিবে না।

পৃথিবীর উপর জীবের অস্তিত্ব যত কোটি বৎসরব্যাপীই হোক, অনন্তকালের তুলনায় উহা সামান্য বলিয়া মনে হয়। আর পৃথিবী হইতে জীবনের অপসারণ হইলে, অন্য কোনো গ্রহতারকায় যে সে স্থান পাইবে তাহারও সম্ভাবনা কম। কারণ অন্যান্য গ্রহতারকাসমূহ জীবনের অস্তিত্বের পক্ষে উপযুক্ত নয় বলিয়া বিজ্ঞানের বিশ্বাস। তাহা হইলে, মানুষ যতটুকু জানিয়াছে তাহাতে এই কথা অনুমান করা যায় যে, অনন্ত শূন্যের মধ্যে একটি বস্তুকণার (পৃথিবী) উপর দিন কয়েকের মধ্যে মনুষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জীবের আবির্ভাব, লীলা ও মৃত্যু—ইহাই জীবনের ইতিহাস; বিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে ইহার কোনও উদ্দেশ্য, কোনও অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক দিক হইতে যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কতদূর সন্তোষজনক তাহা যোগ্যতর ব্যক্তির বিচার্য্য।

এই যে তাপ ও আলোকের অভাবে জীবনের বিলোপ, ইহা কেবল আমাদের পৃথিবীতেই হইবে না; যদি অপর কোন গ্রহতারকায় জীবন থাকে, তবে তাহাও এই একই রূপে বিনষ্ট হইবে। তাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জেম্‌স জীন্‌স এই প্রশ্ন করিয়াছেন,

"Is this, then, all that life amounts to—to stumble, almost by mistake, into a universe which was clearly not designed for life, and which, to all appearances, is either totally indifferent or definitely hostile to it, to

stay clinging on to a fragment of a grain of sand until we are frozen off, to strut our tiny hour on our tiny stage with the knowledge that our aspirations are all doomed to final frustration, and that our achievements must perish with our race, leaving the universe as though we had never been?"

এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর কে দিবে?

এই সকল বৃহৎ ব্যাপারের দিক হইতে দেখিলে মানুষের সংসারকে অতি সামান্য বস্তু বলিয়া মনে হয়। এই অতিক্ষুদ্র পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র অধিবাসী মানুষ। সেই অতি-নগণ্য দেহ-বিশিষ্ট 'মানুষ' নামক এক প্রকার জীবের মধ্যে সমাজ, শৃঙ্খলা, অত্যাচার, পাপপুণ্য, রাগ, হিংসা ইত্যাদি সব কিছুই বিদ্যমান। পৃথিবীর উপর মানুষের অস্তিত্ব মুহূর্ত্তব্যাপী মাত্র, তাহার মধ্যেই মানুষের জীবন-সংগ্রাম; কত জাতি, সমাজ ও সভ্যতার উত্থান এবং পতন; ইহারই মধ্যে আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞানের অক্লান্ত সাধনা। একটু তফাৎ হইতে দেখিলে, এই সকল অতিক্ষুদ্র নগণ্য জীবের কলরবময় সংসারের কোনো সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনের কোন সার্থকতা নাই, এ কথা জোর করিয়া বলা কঠিন। মনে হয়, মানুষের ভৌতিক তুচ্ছতা তাহার আধ্যাত্মিক মহাত্মাকে খর্ব্ব করিবে না। দৈহিক পরিচয় অপেক্ষা মহত্তর কোনও পরিচয় মানুষের যদি না থাকিত তবে এত দুর্দ্দশা সত্ত্বেও এতদিন সে বুক বাঁধিয়া আছে কিসে? জগতের মহাপুরুষেরা এত নির্যাতিত হইয়াও মানবজাতির কল্যাণসাধন-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন কিসের বলে?

বিজ্ঞান আধ্যাত্মিক দিক লইয়া মাথা ঘামায় নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা আছে বলিয়াই হয়ত মানুষ সকল ব্যর্থতার মধ্যেও সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইয়াছে, নৈরাশ্যের মধ্যে শুনিয়াছে চিরন্তন আশার বাণী।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের চিন্তার ধারা

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

বিমল সাহিত্যসভার এক অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে একদিন রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবন্ধাদি হইতে অংশবিশেষ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। এই সভায় আমি বলিয়াছিলাম যে, "যেমন 'যা নাই মহাভারতে তা নাই ভারতে'; তেমনি রবীন্দ্র সাহিত্য অপূর্ব্ব রত্নভাণ্ডার, তাহাতে যাহা নাই, মানুষ তাহা কল্পনা করিতে পারে না।" সভার শেষে চারুবাবু আমাকে বলেন, "তবু সাধন-বিষয়ক লেখাই বড় মধুর।" তাহা শুনিয়া বন্ধুবর সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কালীপদ সেন মহাশয় আমাকে আড়ালে বলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাধন পাইয়াছেন, আমরা যৌবনে মানস-সুন্দরী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেখি নাই।"

আমরা যাহা বলিতে চাহিতেছি সেই প্রসঙ্গে একটি শোনা গল্প বিবৃত করিতেছি। বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা করিতে গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সংবাদ পাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নজরুল ঘরে ঢুকিয়াই উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, 'আপনাকে আমি খুন্ ক'রব।' রবীন্দ্রনাথ ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। নজরুল দৃঢ় হাত সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, "আমি যা লিখতে চাই, তাই দেখি আপনি আগে লিখে ব'সে আছেন।"

কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল? তিনি প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া প্রচুর লিখিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তীরা তাঁহার লেখার ভঙ্গী ও বিষয়ের নূতনত্বে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে মিঃ জে কে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথকে বলেন, "আপনি চিরদিন সাহিত্যসম্রাটের একই আসন দখল ক'রে থাকবেন, নবাগতদের এ যে অসহ্য।" রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলেন, "তাদের ব'লবেন, আমি আমার আসন নিজেই কতবার বদলে বদলে পেতেছি।" মিঃ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথকে ঠিক কি ভুল খবর দিয়াছিলেন তাহার বিচার এ প্রসঙ্গে অনাবশ্যক কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার জীবন-মন তথা সাহিত্যে ক্রমবিকাশের সূত্র পাওয়া যায়।

সেই আলোচনা—সেই ক্রমপরিণতির সম্যক আলোচনা করিতে যে-কোন একজন কর্ম্মঠ ও কুশলী সাহিত্যিকের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইতে পারে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের খণ্ড খণ্ড আলোচনা তাঁহার জীবিত কালে ও পরে অনেক হইয়াছে, অতঃপর আরও যত বেশী হইবে ততই মঙ্গল। কিন্তু সমালোচনা-সাহিত্যের যত প্রয়োজনই থাকুক না কেন অবসরের স্বল্পতা যেন রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ না করার যথেষ্ট কারণ বলিয়া কখনও স্বীকৃত না হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধকে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক হিসাবেই আজ অতি সংক্ষেপে রবীন্দ্রচিত্তে শেষ-অভিব্যক্তির ধারাটি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পাঁচ-ছয় বৎসর আগেকার কথা। তখন তাঁহার শরীর আর তত সবল ছিল না, শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক-সঙ্ঘের এক সভায় তিনি আসিলেন। বিশ্বভারতীর ক্রমবিকাশের কথা বলিলেন এবং উহার স্থায়িত্ব তাঁহার কত আকাঙ্ক্ষার বস্তু তাহা বর্ণনা করিলেন। ইহার কিছুদিন পর হইতে বিশ্বভারতীতে গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল অভ্যর্থিত হইলেন। সকলেই রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যভিবাদন করিয়া প্রণাম করিয়া গেলেন, কেহ সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইতে অগ্রসর হইলেন না।

১৩৪৮ সনের ১লা বৈশাখ তিনি সভ্যতার সংকট শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহা হইতে আমি কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আজ আমার ৮০ বৎসর পূর্ণ হ'ল, আমার জীবনক্ষেত্রের স্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতন দিগন্তে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত াতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার বনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে ছে। সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।"

* * *

"আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেই ায় জন ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে ান কোন সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলাম, তাতে শুনেছি রকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি তিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম ক'রে যে প্রভাব তার ক'রেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং জকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্ব স্মৃতিকে রক্ষা করছে। ই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। ন্তু এর মধ্যে এইটুক প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের বহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি ৎ রূপ সেদিন দেখেছি তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ লেও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করাবার শক্তি আমাদের ল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ মানুষের মধ্যে কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণ কোন জাতির মধ্যে বদ্ধ হ'তে পারে ; তা' কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়।...তাই রেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ ক'রেছিল আজ ন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হ'য়েছে।"

* * *

"তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ ক'রে- লুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি শ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, এক সময় মাদের সাধকেরা স্থির ক'রেছিলেন যে, এই বিজিত স্বাধীনতার বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেন না ক সময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। রা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের াসন ছিল ইংলণ্ডে। মানব-মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি রেজ চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনও সাম্রাজ্য-মদমত্ততায় তাদের ভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।"

* * *

"এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ রম্ভ হ'ল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম সভ্যতাকে রা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার ক'রেছে, রিপুর বর্তনায় তারা তাকে কি অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।...

"নিভৃত সাহিত্যের রস সম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হ'তে কদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সে দিন রতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে দ্ঘাটিত হল তা হৃদয়-বিদারক। অন্নবস্ত্র পানীয় শিক্ষা রোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা' কিছু অত্যা- শুক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোন দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনদিন সভ্যতানামধারী মানব আদর্শের এতবড় নিষ্ঠুর বিকৃতরূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহু কোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্য জাতির অপরিসীম অজ্ঞতাপূর্ণ ঔদাসীন্য।"

* * *

"ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্য শাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে প'ড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিক- দের মতন এত বড় প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থ সাধনের জন্য, বলপূর্বক অহিফেন বিষে জর্জরিত ক'রে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ ক'রলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশঃ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কি অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যু- বৃত্তিকে তুচ্ছ ব'লে গণ্য করেছিল। পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের তলায় ইংলণ্ড কি রকম কৌশলে ছিদ্র ক'রে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে।

"* * * য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কি ক'রে হারানো গেল তারি এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হ'ল। সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্ম- বিচ্ছেদ, যার কোন তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্য আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশঃ উৎকট হ'য়ে উঠেছে—সে যদি ভারতশাসন যন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোন এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হ'ত তাহলে কখনই ভারত ইতিহাসের এত বড় অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না, যে দুর্গতির তুলনা অন্যত্র কোথাও নাই।"

* * *

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা এক দিন না এক দিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষ সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে, কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হ'য়ে যাবে, তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফল- তাকে বহন করতে থাকবে।...

"আজ পারের দিকে যাত্রা ক'রেছি—পিছনের ঘাটে কি দেখে এলুম, কি রেখে এলুম, ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা ক'রব।"

এর পর কবি আর বেশীদিন বাঁচিয়া ছিলেন না। কিন্তু শেষ- জীবনে তাঁহার চিন্তার ধারা যেদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল

মৃত্যুর মাসখানেক আগে আর একটি লেখায় তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহা মিস্ রাথবোনের চিঠির জবাব। এই ইংরেজ মহিলা এক খোলা চিঠিতে বলিয়াছিলেন যে ইংরেজ ভারতবাসীর মঙ্গলার্থী, শিক্ষা দ্বারা ভারতবাসীদের অজ্ঞানতা দূর করিতেছেন ; যুদ্ধহেতু ইংরেজের বড় দুঃখ হইতেছে ; মানবতার দিক হইতেও তাহাদের দুঃখ দূর করার জন্য ভারতবাসীদের অগ্রসর হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ রোগশয্যা হইতেই এই পত্রের এক উত্তর দেন। সে উত্তর ইংরেজী ভাষায় লেখা। তাহার যে তর্জ্জমা আষাঢ় ১৩৪৮ প্রবাসীতে বাহির হয় তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ব্রিটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিয়াও গরীব স্বদেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা আমরা এখনও করি ; আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস্ রাথবোন লজ্জায় স্তম্ভিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিন্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মহত্তম ঐতিহ্যের প্রতীক ততটুকু হইতে আমরা বাস্তবিক বহুশিক্ষা লাভ করিয়াছি। কিন্তু এ কথাও না বলিয়া থাকিতে পারি না যে আমাদের মধ্যে যাহারা এই শিক্ষা হইতে লাভবান হইয়াছেন, আমাদিগকে অশিক্ষিত করিবার সর্বপ্রকার সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। অন্ত যে কোন ইউরোপীয় ভাষার সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের অন্যান্য জাতি কি সভ্যতার আলোকের জন্য ইংরেজদের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল ? * * * কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজী ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে সেই ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিবার ফলে দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই যে ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র শতকরা একজন ইংরেজী ভাষায় লিখনপঠনক্ষম হইয়াছে।— * * * কিন্তু এই তথাকথিত সংস্কৃতির চেয়ে আজ জীবনধারণের সম্বল চাই আগে। * * * আমাদের দেশের টাকার থলি দুই শতাব্দীকাল দৃঢ় মুষ্টিতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে, তাহারা আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছে ? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্নের জন্য ক্রন্দন করিতেছে। আমি পল্লী নারীদিগকে কয়েক ফোঁটা জলের জন্য কাদা খুঁড়িতে দেখিয়াছি—কেন না ভারতের গ্রামে পাঠশালা অপেক্ষা কূপ-বিরল। আমি জানি যে ইংলণ্ডের লোক আজ দুর্ভিক্ষের দ্বারে উপস্থিত। আমি তাদের জন্য ব্যথিত। কিন্তু যখন দেখি যে, খাদ্যসম্ভারপূর্ণ জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ব্রিটিশ নৌবহরের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা হইতেছে এবং যখন এমন অবস্থাও মনে পড়ে যে এ দেশের একটা জেলার লোক অনাহারে মরিতেছে অথচ পাশের জেলা হইতে এক গাড়ী খাদ্যও তাহাদের দ্বারে পৌঁছিতে দেখি না, তখন আমি বিলাতের ইংরেজ ও ভারতের ইংরেজের মধ্যে একটা পার্থক্য না দেখিয়া থাকিতে পারি না। * * * ইংরেজেরা যে আমাদের অনাদরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা এই জন্য নহে যে, তাহারা বিদেশী, যতটা এই জন্য যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু অছির কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের স্বল্পসংখ্যক ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে।"

এই পত্র লিখিবার অল্পদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের তিরোধান হইয়াছে। [তিনি ইহার মাস দুই পরে শ্রাবণ-পূর্ণিমাতে দেহ ত্যাগ করেন।] কিন্তু এ আবার তাঁহার চিন্তাধারার আর এক রূপ তিনি দেখাইয়া গেলেন। আমাদের বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ বাহিরের জগৎ ছাড়িয়া আবার একেবারে ঘরের একান্ত আপনজন হইয়া আমাদের সুখদুঃখের অংশীদার হইয়া গেলেন।

এই সুন্দরের পূজারী, মহামানবতার সাধক, মানুষের নিত্য প্রয়োজনের তথাকথিত তুচ্ছতাকে এমন প্রধানতম আবশ্যক বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া দেশের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও আরোগ্যের জন্য আমাদের শাসকদের উপর এমন খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন কেন ? এই কথার উত্তর আজ আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার আর আলোচনার আবশ্যক নাই।

এই সুন্দরের সাধক চারি দিকের বীভৎসতা দেখিয়া বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সভ্যতার অসারতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সমগ্র সভ্যজগতের নিকট প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার বোধ হইতেছিল। তাই এই হতভাগ্য স্বদেশবাসীর দুঃখের জন্য তাঁহার মনের এত জ্বালা।

রবীন্দ্র-জন্মদিন উপলক্ষ্যে নানা স্থানে রবীন্দ্র-ভক্তগণ সমবেত হইয়া তাঁহার বরণীয় স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। 'জন্মদিন' সম্বন্ধে ১৯৪১, ৬ই মের লেখা তাঁর শেষ কবিতাটিতে তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন-যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার
দিয়েছি উজাড় করি'
যাহা কিছু আছিল দিবার
প্রতিদানে যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা,
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে,
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।"

তিনি মানুষের শেষ আশীর্ব্বাদ, প্রীতি ও স্নেহ চাহিয়াছিলেন। তাহা দিবার মত তাঁহার মত মানুষ আর আমরা কোথায় পাইব ? তিনি ভারতবাসী, ইহাই আমাদের পরম গর্ব্ব। কিন্তু তাঁহাকে আমরা আবার চাই ; এই প্রার্থনা তাঁহার অন্তরে পৌঁছুক। তিনি আমাদের মধ্যে আবার জন্মগ্রহণ করুন।

আমাদের স্বাধীনতা আজও অর্জ্জিত হইল না। আমাদের দৈন্যের, দুঃখের আর অবধি নাই। নিজবাসভূমে আমরা পরবাসী হইয়াই রহিলাম। রবীন্দ্রনাথ যখন এদেশে জন্মিয়াছিলেন তখন দেশের যে চিন্তাধারা ছিল তাহা তাঁহার তিরোধানের কালে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমাদের আশা হয় তিনি আবার আবির্ভূত হইলে তাঁহার জীবনেই ভারতবর্ষের তমসা কাটিয়া গিয়া যে সূর্য্যোদয় দেখা দিবে তাহাতে মানুষে মানুষের এই জগদ্ব্যাপী দ্বন্দ্ব ও হিংসা বিদূরিত হইয়া নূতন মানব সভ্যতার উদ্ভব হইবে।

তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ মাস আগেকার লেখা ঐকতান শীর্ষক কবিতার কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে এখানে উদ্ধৃত করি :

"সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতী ব'সে তাঁত বোনে জেলে ফেলে জাল,
বহুদূরে প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশ তার সম্মানের চির নির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিমপণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরে অপূর্ণতা
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্র গামী
কৃষাণের জীবনের সরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

জীবন-সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ এইরূপ কবিকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া অনুরোধ করিতেছেন—

"এসো কবি, অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।"

অপ্রকাশিত ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা

শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার

[প্রবন্ধের প্রতিবাদে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে আমরা তাহা সংক্ষেপে 'আলোচনা' বিভাগে প্রকাশ করিয়া থাকি। বর্ত্তমান আলোচনাটিতে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদত্ত হইয়াছে। এ জন্ত স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে ইহা আমরা পত্রস্থ করিলাম।—প্রঃ সঃ]

বর্দ্ধমান জেলায় এক সুদূর পল্লীগ্রামে কয়েক দিনের জন্ত আসিয়াছি। এখানে গত বৈশাখ সংখ্যার 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী লিখিত "অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা" শীর্ষক প্রবন্ধটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ইহাতে লেখক প্রথমে "কর্ম্মযোগিন্" আপিসে শ্রীঅরবিন্দের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ এবং পরে চন্দননগরে যাওয়ার ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে আমার নাম উল্লেখ করিয়াছে। সুরেশ কবি, সে সুললিত ভাষায় মাঝে মাঝে ঘটনাগুলি বেশ গুছাইয়া লিখিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সকল ঘটনা যথাযথ লিখিত হয় নাই। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আমি যাহা জানি, তাহা অতি সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম।

আমার মতে এই ইতিহাস অপ্রকাশিত থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু যখন প্রকাশিত হইয়াছে, তখন সকল ঘটনা সঠিক ভাবে লেখাই উচিত। সুরেশ ওরফে মণি তখনকার সময়ে বালক মাত্র। সে ইহা উল্লেখ করে নাই, পাছে বালক বলিয়া তাহার কথা সকলে উড়াইয়া দেয়। আমার এখনও তাহার হাসি হাসি মুখ মনে পড়িতেছে, তাহার মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকিত। আমাদের মধ্যে মণি ও বিজয় বয়ঃকনিষ্ঠ ছিল—within their teens। মণি ও নলিনী পণ্ডিচেরী হইতে বছর বছর কলিকাতা আসিত এবং আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত। আমার সহিত ইহাদের নিবিড় প্রীতির বন্ধন ছিল। নলিনীর প্রকৃতি গম্ভীর ও হৃদয় মহৎ এবং বিজয় কর্ম্মতৎপর ও বেপরোয়া আত্মত্যাগী ছিল। বালক হইলেও শ্রীঅরবিন্দের সহিত বিজয়ের সখ্য-সম্বন্ধ ছিল। শ্রীঅরবিন্দ ইহার সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, "I love him more than any body else in this world." আমার সহিত শ্রীঅরবিন্দের সখ্য ও দাস্য ভাব ছিল।

শ্রীঅরবিন্দ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্ত একদিন বলিলেন, "ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয় এবং আমি যদি রাজা হই, তা হলে তোমরা কি করবে?" নলিনী প্রথমেই বলিল,

"আপনার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করব।" আমি বলিলাম, "I shall stand by you unto death." 'আমি বরাবর আপনার হুকুম পালন করব।' তখন 'কর্ম্মযোগিন্' আপিসে যে কেবল 'অটোমেটিক রাইটিং' হইত তাহা নহে, এখানে আমাদের সকল প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যাহাতে আমরা মানুষ হই, এবং মানুষের মধ্যে বিশেষ মানুষ বলিয়া পরিগণিত হই এবং তাঁহার ভাষায়—যাহাতে আমরা 'instruments of Mother' হইয়া দেশের কার্য্য করি, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। "কর্ম্মযোগিন্" আপিসে নলিনী ফরাসী পড়িত এবং আমিও পড়িতাম। বিজয় সংস্কৃত পড়িত। ধীরেন বাবু ও সৌরীন ইটালিয়ান ভাষা শিখিতেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ীতে কুমারী কুমুদিনী মিত্রও ইটালিয়ান ভাষা পড়িত। শ্রীঅরবিন্দের পড়াইবার পদ্ধতিও অপূর্ব্ব ছিল। তিনি একটি খাতায় ব্যাকরণ অল্প কথায় লিখিয়া দিতেন। কতকগুলি conjugation, transitive ও intransitive verbs শিখাইতেন। মণি কি পড়িত এখন তাহা মনে নাই। সম্ভবতঃ বিজয়ের সঙ্গে সংস্কৃত পড়িত। 'অটোমেটিক রাইটিং' যে কাগজে যাহা লেখা হইত, সেইগুলি এবং শ্রীঅরবিন্দের লিখিত অনেক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আমার নিকট অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। আমি ঐগুলি প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম। ইহাতে তিনি জবাব দিয়াছিলেন, "I do not care to publish them without considerable attention since they fall below what my present critical instinct regards as perfection. পরে ঐ সব তিনি চাহিয়াছেন বলিয়া ধীরেন বাবু আমার নিকট হইতে লইয়া যান। এই অমূল্য পাণ্ডুলিপিগুলি যে কি হইয়াছে তাহা আমি জানি না। এই সকল প্রকাশিত হইলে যে অপূর্ব্ব গ্রন্থরাজী হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্ত লিখিত কয়েক পৃষ্ঠা এবং বারীনের কোষ্ঠী বিচার এখনও আমার নিকট আছে। শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী নামীয় জনৈক ভদ্রলোক আমার নিকট আসিয়া শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহার নিকট শ্রীঅরবিন্দ প্রেরিত message দেখি। এইজন্ত তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া ঐ হস্তলিখিত পুস্তক তাঁহাকে দিই। তিনি আমাকে না জানাইয়া পুস্তকখানি নকল করিয়া মূলটি আমাকে ফিরাইয়া দেন। পরে শুনিয়াছি, উহা আর্য্য পাব্লিশিং কোম্পানী প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার লেখা তাঁহারই নামে যে প্রকাশিত হইয়াছে ইহাই সুখের বিষয়।

'অটোমেটিক রাইটিং'-এর কথা বলিতেছিলাম। শ্রীঅরবিন্দ যখন এ কাজ করিতে বসিতেন তখন তাঁহার মুখ লাল হইয়া যাইত। কথায় কোন ভাব প্রকাশ পাইত না। তিনি লিখিয়া যাইতেন। পেন্সিলে লেখা হইত। প্রথমেই আসিতেন উচ্চ জগৎ হইতে Therese নামক এক ধর্ম্মপ্রাণ প্রেতাত্মা। ইনি 'মিডিয়াম' হইয়া অন্ত প্রেতাত্মাদের ডাকিয়া আনিতেন। কখনও কখনও জীবিত astral bodyও আসিতেন। একদিন আসিলেন ভৈরবানন্দ নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সূক্ষ্মাত্মা। তিনি দুই হাজার বৎসর যাবৎ জীবিত আছেন বলিলেন। নলিনী প্রশ্ন করিত এবং আমিও করিতাম। ইহা অনেকের নিকট আজগুবি বলিয়া মনে হইলেও শ্রীঅরবিন্দের বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া যাহা লেখা হইত তাহা প্রকৃতই শিক্ষাপ্রদই হইত। ইহা আমাদের শিক্ষার জন্যই তাঁহার একটি অপূর্ব্ব কৌশল। সে শিক্ষার গম্ভীরতা বুঝা সাধারণের পক্ষে অসাধ্য। বারীন বাবুও ইহা করিতে পারিতেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মত নয়। শ্রীঅরবিন্দ ছবি আঁকিতেন। কয়েকটি ছবি আমার নিকট ছিল। আমি 'স্টেট প্রিজনার' হইবার পর সেগুলি কোথায় গেল জানি না। বারীন্দ্র বাবুর মত তাঁহার ভক্ত থাকিলে এই ছবির কতই না ব্যাখ্যা হইত। একটা ছবির কথা মনে আছে, Surendra Nath Banerjee ascending the steps of Govt. house। চমৎকার ছবি। সে কি আশ্চর্য্য pose দেওয়া। সুরেন্দ্রবাবুর মন্ত্রী হইবার ভবিষ্যৎ বাণী ; ইহা সফল হইয়াছিল।

"কর্ম্মযোগিন্" আপিসে শ্রীঅরবিন্দ আমাদিগকে লইয়া নানা ভাবে আনন্দ করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেরই একটি অর্থ থাকিত। তিনি কৃষ্ণবাবুর বাড়ী হইতে আসিয়া প্রথমেই "কর্ম্মযোগিন্" কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেন এবং প্রুফও দেখিয়া দিতেন। নলিনী প্রুফ দেখিত এবং আমিও দেখিতাম। এইরূপ দুই এক ঘণ্টা আপিসের কাজ চলিত। সন্ধ্যার পর আমাদের মজলিস বসিত। শ্রীঅরবিন্দ দিন কয়েক আপিস ঘরে, তামিল ভাষা শিখিতেন। কে জানিত যে দিন কতক পরেই তাঁহাকে তামিল দেশে গিয়া বাস করিতে হইবে। দিন পনরো পরেই তাঁহার তামিল ভাষা শিক্ষা হইয়া গেল এবং তিনি তামিলে একটি কবিতা লিখিলেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "দেখ, যদি কোন একটা ভাষা আয়ত্ত থাকে, তা হলে যে কোন ভাষা অল্প দিনেই শিখা যায়।"

স্বামী বিবেকানন্দেরও এইরূপ অপূর্ব্ব মেধা ছিল। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি ব্যাকরণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আমার সময়ে সময়ে মনে হইত স্বামিজী ও অরবিন্দ এই দুই মহাপুরুষ যদি একসঙ্গে কাজ করিতেন, কিম্বা স্বামিজীর আরব্ধ কার্য্য যদি অরবিন্দ পরিচালন করিতেন, তাহা হইলে কি যুগান্তরই না উপস্থিত হইত। এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁহার অনুগামী দেবব্রত বসু বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। দেবব্রত বাবু বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী হইয়া স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকে গ্রহণ করিতে বেলুড় মঠের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্মত হন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ শ্রদ্ধা দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন, "Ramakrishna the God Himself." স্বামিজীর সম্বন্ধে বলিতেন, "Man rising to God" এবং নিজের সম্বন্ধে বলিতেন, "Man rising to humanity." "ধর্ম্ম" পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত "ভারতের প্রাণপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ" তাঁহারই লিখিত। ইহা আমি বিশেষভাবে জানি।

এই সকল কথা বলিতে গেলে একখানি গ্রন্থ হইয়া যাইবে।

এখন আমার পূর্ব্ব ঘটনার অনুসরণ করি : ৪ নং শ্যামপুকুর লেনে "কর্ম্মযোগিন্" আপিসে আমাদের দিনগুলি সুখে অতিবাহিত হইতেছিল। অনেক দিন রাত্রি হইয়া যাইত। শ্রীঅরবিন্দ বোমার মামলায় খালাস হইয়া বাহির হইলে জেলের কয়েকজন সিপাহীও কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আশ্রয় লয়। ইহাদের মধ্যে ছাপরা জেলার ধরম সিং নামে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক শ্রীঅরবিন্দের পরম ভক্ত হয়। অরবিন্দবাবু ইহাকে "কর্ম্মযোগিন্" আপিসের দ্বারবান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি ইহাদিগকে স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাড়ীতে থাকিবার এবং আমার আচার্য্যগুরু স্বর্গীয় ক্ষেত্রনাথ গুহের কুস্তির আখড়ায় কুস্তি করিবার জন্ত বলিয়া দিয়াছিলাম। ধরম সিংকে সঙ্গে লইয়া আমি শ্রীঅরবিন্দকে কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতাম। ধরম সিং গাড়ীর ছাতের উপর বসিত এবং আমি ভিতরে বসিতাম। ইহার কারণ ছিল। শ্রীঅরবিন্দের অনিষ্ট কল্পনা করিয়া আমরা ইহা করিতাম।

ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রীঅরবিন্দের এই আনন্দের মেলা ভাঙিয়া যাইবার কারণ উপস্থিত হইল। এখন তাহাই বলিব। ইহার পূর্ব্বে সুরেশ না জানিয়া যে কথা লিখিয়াছে উহার প্রতিবাদ করিব। সে লিখিয়াছে যে, শ্রীঅরবিন্দ শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীকে কখনও দেখিতে যান নাই। সুরেশ এ বিষয়ে কিছু জানে না। এই কথা সে শ্রীঅরবিন্দকেও জিজ্ঞাসা করে নাই। প্রকৃতপক্ষে অরবিন্দবাবু একাকী নহেন, সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিতে উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন। এই ঘটনা তাঁহার চন্দননগরে যাইবার কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তারিখ আমার মনে নাই বটে, কিন্তু ঘটনাটি এই সেদিন ঘটিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হইতেছে। আমার স্মৃতি-বিভ্রম এখনও হয় নাই, এবং আবার চিত্তবিভ্রম হইবার কোন কারণও ঘটে নাই। শ্রীঅরবিন্দের আগমনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবপূজিতা পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বিন্দুমাত্রও গৌরব বৃদ্ধি হইবে না। অপরন্তু, অরবিন্দবাবুও তাঁহার সাধন ভূমি হইতে এক ধাপ নামিয়া আসিবেন না। তাঁহার কি বিশ্বাস জানি না, আমার বিশ্বাস—এই দেবী দর্শনের ফলে তাঁহার যাত্রাপথ ও সাধনপথ বিঘ্নমুক্ত হইয়াছিল।

শ্রীঅরবিন্দের উদ্বোধনে আগমন সম্বন্ধে সত্য ঘটনা এই : আমি আসিয়া পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজীকে জানাইলাম, 'অরবিন্দবাবু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিতে আসিতে চান।' তিনি বলিলেন, 'লইয়া আইস।' কুমার অতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ঘোড়ার গাড়ী লইয়া আমি কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়ী গেলাম। এই সময় অরবিন্দবাবুর স্ত্রী ওখানে থাকিতেন। অরবিন্দবাবু প্রস্তুত ছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ও তাঁহার স্ত্রী গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন। আমি গাড়ীর ছাতে বসিতে যাইতেছিলাম, তিনি একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বাক্যহীন তিরস্কারে আমাকে ভিতরে আসিয়া বসিতে বলিলেন। আমি ভিতরে আসিয়া বসিলাম। তেজস্বী অশ্ব বাগবাজার অভিমুখে দৌড়িল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা উদ্বোধন আপিসে আসিয়া পৌঁছিলাম। অরবিন্দবাবু সস্ত্রীক উপরে গেলেন। সেদিন গৌরীমাও উপস্থিত ছিলেন। উভয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন, তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং উপদেশ দিলেন। অরবিন্দবাবু চৌকাঠের বাহিরে আসিলে গৌরীমা তাঁহার চিবুক ধরিয়া স্বামিজীর কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, "যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়। হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ জগতে নাহি তব স্থান।" অরবিন্দবাবু কম্পিত পদে কতকটা ভাবস্থ হইয়া নীচে আসিয়া শরৎ মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। ইহাই প্রকৃত ঘটনা। শুনিয়াছিলাম, অরবিন্দবাবুকে দেখিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "এইটুকু মানুষ, এঁকেই গবর্ণমেণ্টের এত ভয়!" আরও শুনিয়াছিলাম যে, মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার বীর ছেলে।" আমরা যখন গাড়ীতে উঠি তখন কৃষ্ণবাবু (বেদান্তচিন্তামণি) উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় নাকি শ্রীঅরবিন্দের অনুমতিক্রমে লিখিয়াছেন যে, তিনি (শ্রীঅরবিন্দ) কখনও শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে আসেন নাই। ইহা পড়িয়া আমার মনে হইল কোন শিক্ষিত মানুষ এমন কথাও লিখিতে পারেন? আমি এ বিষয় শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তিনি কখনও বলিবেন না এবং বলিতে পারেন না যে, তিনি উদ্বোধনে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন নাই।

চন্দননগরে যাইবার পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে Brotherhood স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা একটি রহস্যময় ব্যাপার, শ্রীঅরবিন্দ সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার সকল কার্য্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ থাকিত।

ইহার কয়েকদিন পরে আমি জনৈক সি-আই-ডির নিকট হইতে সংবাদ পাই যে, শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে, এবং খুব সম্ভব সামসুল আলমের হত্যার মামলায় তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে। এই সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই আরও দুই স্থান হইতে পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়ী ছুটিলাম এবং শ্রীঅরবিন্দকে সংবাদ দিলাম। তিনি ধীর চিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া "কর্ম্মযোগিন্" আপিসে আসিলেন। প্রথমে জামিনদার ঠিক করিয়া রাখিবার পরামর্শ হইল। পরে বলিলেন, 'নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।' আমি ভগিনী নিবেদিতার বাড়ী গেলাম। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। নিবেদিতা তাঁহাকে স্বামীজীর 'রাজযোগ' উপহার দেন। অরবিন্দবাবু বলিতেন যে, এই পুস্তক পড়িয়াই তাঁহার হিন্দু-দর্শন পড়িবার আগ্রহ হয়। ভগিনী নিবেদিতা "কর্ম্মযোগিনে" প্রবন্ধ লিখিতেন। যে সময়ে অরবিন্দবাবু চন্দননগরে লুকাইয়াছিলেন, সে সময়ে নিবেদিতাই কাগজখানি চালাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় "ধর্ম্ম" পত্রিকায় লিখিতেন এবং আমিও লিখিতাম। মতিবাবু "নবতন্ত্র" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখায় "ধর্ম্ম" পত্রিকার দুই হাজার টাকার সিকিউরিটি কর্ত্তারা দাবি করেন। ইহার ফলে এই পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। যাহা হউক, ভগিনী নিবেদিতাকে সকল ঘটনা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "Tell your chief to hide and the hidden chief

through intermediary shall do many things." একদিন অরবিন্দবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, "Mother Kali through Sister Nivedita ordered me to hide." সুরেশ লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, এত দীর্ঘ বৎসর পরেও আমার সকল কথা বেশ মনে আছে, আমার স্মৃতি-বিভ্রম এতটুকুও হয় নাই। এই সংবাদ লইয়া আমি আপিসে ফিরিলাম। অরবিন্দবাবু বলিলেন, "All right, arrange." পরে এ সম্বন্ধে সুরেশ যাহা লিখিয়াছে তাহা সবই ঠিক। কেবল মাত্র গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দবাবু যে ভগিনী নিবেদিতার বাসায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন, এই কথা সে লেখে নাই। বোধ হয়, নিবেদিতার সঙ্গে তিনি "কর্ম্মযোগিন্" পরিচালনার পরামর্শ করিয়াছিলেন। এই কথাবার্ত্তার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না, নীচের রোয়াকে বসিয়াছিলাম। কাজেই কি কথা হইয়াছিল তাহা জানি না। নিবেদিতার বাসা হইতে আমরা বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে যাই। অরবিন্দবাবু ও বীরেনবাবু বাগবাজারের খড়ো ঘাটে সিঁড়ির উপর বসিলেন। আমি ও মণি নৌকার সন্ধানে হাটখোলা ঘাট পর্য্যন্ত গেলাম এবং সেখান হইতে নৌকা করিয়া বাগবাজার ঘাটে আসিলাম।

নৌকা ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে অরবিন্দবাবু আমাকে বলিলেন, "Be rare in your acquaintances. Seal your lips to rigid secrecy. Don't breathe this to your nearest and dearest." নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নৌকার দিকে চাহিয়া অন্তরে গভীর বেদনা লইয়া বাড়ীতে ফিরিলাম। যে মহাত্যাগী মনীষীকে কেন্দ্র করিয়া আমরা ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। এই ঘটনা স্মরণ করিতে আজও বৃদ্ধ বয়সে চোখে জল আসিতেছে।

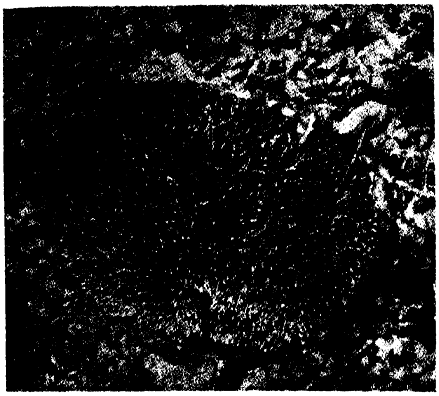
মনুষ্যেতর প্রাণীদের চাতুরি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাগানের এক পাশে মস্ত বড় একটা জাল পাতিয়া তাঁতি-বৌ মাকড়সা শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। জালটার খুব কাছে কাচ-পাত্রের ঢাকনা খুলিয়া কয়েকটা মৌমাছি ছাড়িয়া দিলাম। মৌমাছিগুলি বুলেটের মত জাল ভেদ করিয়া উড়িয়া গেল। দুই একটা মৌমাছির ডানার আঘাতে জালটা কিঞ্চিৎ কাঁপিয়া উঠিতেই মাকড়সাটা শিকারের আশায় উদগ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু একটা শিকারও জালে ধরা পড়িল না। মাকড়সাটা মোটেই হতাশ হইল না—থাপেই বসিয়া রহিল। এরূপ অবস্থা দেখিলে স্বভাবতঃই কৌতূহল বৃদ্ধি পায়, কাজেই কিছুক্ষণ চেষ্টার ফলে বড় একটা গোয়ালে-ফড়িং ধরিয়া আনিয়া জালে ছুড়িয়া দিলাম। ফড়িংটার ডানাগুলি জালের সুতায় আটকাইয়া যাইতেই মুক্ত হইবার জন্য সে প্রাণপণে ঝাপটাঝাপটি সুরু করিয়া দিল। ভয়ে মাকড়সাটা জালের একপ্রান্তে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। ফড়িংটার প্রবল আস্ফালনে জালটা অনেকখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল; আর একটু হইলেই সে পলায়ন করিতে পারিত। কিন্তু এখানেই সে চুপ করিয়া গেল এবং অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে কুড়ি, পঁচিশ মিনিট অতিবাহিত হইয়া গেল, ফড়িংটার সেই অসাড় মৃতবৎ ভাব,—দেহে প্রাণ আছে বলিয়া কোন রকমেই মনে হয় না। মাকড়সাটারও সেই অবস্থা। সে বোধ হয় স্থির করিয়াছিল—শিকারটা ক্রমশঃ নির্জীব হইয়া আসিলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিবে; কিন্তু এতক্ষণ চুপচাপ থাকায় নিশ্চয়ই তাহার সন্দেহ হইয়াছিল যে শিকারটা তাহার জালে পড়িয়া মরিয়া গেল কিনা? কারণ মাকড়সারা মৃতপ্রাণী উদরস্থ করে না। সে এক পা দুই পা করিয়া অতি সন্তর্পণে জালের উপর দিয়া ফড়িংটার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফড়িংটার নিকট হইতে প্রায় তিন চার ইঞ্চি দূরে আসিয়া থামিয়া গেল। ফড়িংটা কিন্তু তখনও নীরব, নিস্পন্দ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর মাকড়সাটা পা দিয়া জালের সুতাটাকে অতিদ্রুত কাঁপাইয়া দিল। মুহূর্ত্ত মাত্রে ফড়িঙের চাতুরি ধরা পড়িয়া গেল; ডানা কাঁপাইয়া পুনরায় সে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মাকড়সাটাও ছুটিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়া নিস্তব্ধ করিয়া দিল। মাকড়সারা ফড়িঙের এই প্রকার চাতুরির সহিত পরিচিত বলিয়াই তাহাদিগকে প্রতারিত করা সম্ভব না হইলেও মানুষ কিন্তু তাহাদের দ্বারা অনায়াসে এইভাবে প্রতারিত হইয়া থাকে। মাকড়সারাও আবার শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সুতা ছাড়িয়া জাল হইতে নীচে ঝুলিয়া পড়ে। তাহাতেও নিষ্কৃতি না পাইলে ঝুপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় এবং হাত পা গুটাইয়া একটা প্রাণহীন পদার্থের মত অবস্থান করে। মাকড়সা শিকার করিতে গিয়া তাহাদের প্রবল শত্রু কাচ-পোকাকে অনেকবার এইভাবে প্রতারিত হইতে দেখিয়াছি। ছোট ছোট জলাশয়ের উপরিভাগে জাল পাতিয়া শিকার ধরে এইরূপ মাকড়সাগুলি তাহাদের দুর্দ্ধর্ষ শত্রু কাচ-পোকা দেখিলেই তাহাদের পাগুলিকে সামনে ও পিছনে একত্র করিয়া ঠিক একটি কাঠির আকার ধারণ করিয়া নির্জীব পদার্থের মত অবস্থান করে। ইহার ফলে কেবল কাচ-পোকা কেন, মানুষেরা পর্য্যন্ত প্রতারিত হইয়া থাকে।

আলমারি, খাট, দেরাজের নীচে কাঁপুনে-পোকা নামে পরিচিত এক জাতীয় মাকড়সাকে এলোমেলো জাল পাতিয়া বাস করিতে দেখা যায়। এই জাতীয় মাকড়সার পাগুলি অসম্ভব রকমের লম্বা। সর্ব্বদাই হাঁটু মুড়িয়া জালের নীচের দিকে ঝুলিয়া থাকে। একটু স্পর্শ করিলেই ইহারা জালটাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রবলভাবে অন্দোলিত করিতে থাকে। সরু লিকলিকে ধরণের কাল-

ডের এক জাতীয় কুমোরে-পোকা ইহাদের প্রবল শত্রু। কুমোরে-পোকার আগমন টের পাইলেই ইহারা প্রবলভাবে অতিদ্রুত গতিতে জাল সমেত উপরে নীচে দোল খাইতে থাকে। এরূপ দ্রুত কম্পনের ফলে কুমোরে-পোকা সহজে ইহাদিগকে



হেজ-হগ জাতীয় জানোয়ারের প্রতারণার কৌশল। জন্তুটা বলের মত গোল হইয়া রহিয়াছে

আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু কুমোরে-পোকারা এমনই নাছোড়বান্দা যে, মাকড়সা দেখিতে পাইলে যেমন করিয়াই হউক তাহাকে আক্রমণ করিবেই। তখন তাহার কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাকড়সারা এক অপূর্ব্ব কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ছুটিয়া পলায়ন করিবার সময় সে তাহার একটি কি দুইটি ঠ্যাং ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। ঠ্যাংগুলি মাটিতে পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন্ত প্রাণীর মত ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। শত্রুর দৃষ্টি সহজেই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এই সুযোগে মাকড়সা নিরাপদ-স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। একবার এরূপ একটা মাকড়সাকে কুমোরে-পোকা দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছিলাম। মাকড়সাটা যেখানে যায় কুমোরে-পোকাটাও সেখানেই তাহাকে অনুসরণ করিতেছিল। অবশেষে মাকড়সাটা তাহার একটা লম্বা ঠ্যাং ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। ঠ্যাংটা বারংবার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া প্রবলবেগে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। কুমোরে-পোকাটা ছুটিয়া আসিয়া সেই ঠ্যাংটাকেই আক্রমণ করিল এবং প্রাণপণে কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে মাকড়সাটা যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল—বুঝিতেই পারা গেল না। কুমোরে-পোকাটা তাহার সন্ধানে অনেকবার এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে উড়িয়া চলিয়া গেল।

একদিন একটা বিড়ালকে টিকটিকির পিছনে ছুটিতে দেখিলাম। টিকটিকিটা প্রাণভয়ে কতকগুলি আবর্জ্জনার আড়ালে আত্মগোপন করিল। কিন্তু বিড়ালটা ছাড়িবার পাত্র নহে। সে অনেক কায়দা করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিতে বাধ্য করিল। বিড়ালটা তাহার উপর থাবা মারিতেই সে তাহার লেজটিকে ফেলিয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল। সেই কাটা লেজটাকে অসম্ভব রকমের দাপাদাপি করিতে দেখিয়া বিড়ালটা যেন হঠাৎ কেমন একটা হতভম্বের মত হইয়া গেল। অবশেষে কাটা-লেজটাকে লইয়াই খেলা জুড়িয়া দিল। ইতিমধ্যে লেজের মালিক যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারা গেল না। ভয়ানক বিপদে পড়িলে টিকটিকি, মাকড়সাদের প্রত্যেককেই এইরূপে আততায়ীকে প্রতারণা করিতে দেখা যায়। ইহাতে তাহাদের কোন গুরুতর অসুবিধাও নাই, কারণ টিকটিকির লেজ এবং মাকড়সার ঠ্যাং পুনরায় যথানিয়মে গজাইয়া থাকে।

আমাদের দেশে অনেক রকমের পিপড়ে-মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতারণায় ইহাদের সমকক্ষ প্রাণীর সংখ্যা খুবই কম। বিভিন্ন জাতীয় পিপড়ে-মাকড়সা বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকাকে হুবহু অনুকরণ করিয়া থাকে। দৈহিক গঠন, চাল-চলন এমন কি গায়ের রং পর্য্যন্ত ঠিক পিপীলিকার মত। অন্যান্য প্রাণী তো দূরের কথা মানুষের চক্ষুই ইহাদিগকে



পেচক জাতীয় জানোয়ারেরা সাপের মত হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া অথবা বিকট অঙ্গভঙ্গী করিয়া শত্রুকে প্রতারণা করে

পিপীলিকা বলিয়া ভুল করে। কয়েক জাতীয় কাচ-পোকা ইহাদের পরম শত্রু। এই কাচ-পোকারা বাছিয়া বাছিয়া পিপড়ে-মাকড়সাগুলিকেই শিকার করে। কিন্তু পিপীলিকার মধ্য হইতে ইহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কাচ-পোকাদের যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। কারণ একমাত্র দৈহিক গঠনে নহে—চালচলনেও ইহারা পিপীলিকার অনুকরণ করিয়া থাকে। পিপীলিকার ছয়-খানা পা; কিন্তু মাকড়সার পা আটখানা। তাছাড়া পিপীলিকার

মস্তকে দুইটি করিয়া শুঁড় আছে; মাকড়সাদের মোটেই শুঁড় নাই। পিঁপড়ে-মাকড়সারা কিন্তু পিপীলিকাদের মত ছয়খানা পা দিয়াই চলা-ফেরা করে এবং সম্মুখের পা দুইখানাকে মাথা ঘেঁসিয়া সর্ব্বদাই পিপীলিকার শুঁড়ের মত উঁচু করিয়া আন্দোলিত



সন্ন্যাসী-কাঁকড়ার লুকোচুরি

করিয়া থাকে। ইহার ফলে সকলেই ভ্রমে পতিত হয়। পিঁপড়ে মাকড়সাদের প্রতারণার কৌশল এমনই নিখুঁৎভাবে অনুষ্ঠিত হয় যে, চোখে না দেখিলে কেবল বর্ণনার সাহায্যে তাহা অনুমান করা অসম্ভব।

টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী প্রভৃতি প্রাণীরা যেরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে চলা-ফেরা করে তাহার সহিত দেহের রং মিলাইয়া নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে। ইহার ফলে তাহাদের শত্রু এবং ভক্ষণোপযোগী প্রাণীরা অনায়াসেই প্রতারিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের কাঠি-পোকা, সুতলি-পোকা, জল-কাটি প্রভৃতি প্রাণীগুলিকে অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহারা শত্রুকে ফাঁকি দিবার জন্ত অথবা শিকার সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে মৃত কাঠ-কুটার মত অবস্থান করে। হাতে ধরিয়া তুলিলে আরও শক্ত হইয়া পুরাপুরি মৃতের ভাব ধারণ করিয়া থাকে। সুতলি-পোকার প্রতারণার কৌশল আরও অদ্ভুত। ইহারা লতাপাতার মধ্যে জোঁকের মত হাঁটিয়া বেড়ায়। চড়ুই পাখীরা পরম উপাদেয় বোধে ইহাদিগকে উদরসাৎ করিয়া থাকে। শত্রুর আগমন টের পাইলেই সুতলি-পোকা শরীরের পশ্চাদ্ভাগের সাহায্যে গাছের কাণ্ড আঁকড়াইয়া ধরে এবং একটু কাৎ-ভাবে খাড়া হইয়া শক্ত বোঁটার মত অবস্থান করে। এই উপায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা শত্রুকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হয়। প্রতারণার এই কৌশল ব্যর্থ হইলে সুতলি-পোকা মাকড়সার মত সুতা ছাড়িয়া নীচে ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতেও রেহাই না পাইলে মাটিতে পড়িয়া [illegible] ভান করে। অনেক রকমের শুঁয়া-পোকা লতা-পাতার রঙের সহিত নিখুঁৎভাবে শরীরের রং মিলাইয়া শত্রুকে প্রতারিত করিয়া থাকে। কতকগুলি শুঁয়া-পোকা শরীর হইতে বিরক্তিকর রস নিক্ষেপ করিয়া, কেহ বা শরীরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে ভীষণ-দর্শন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাহির করিয়া, আবার কেহ কেহ বিষাক্ত সরীসৃপের মত অঙ্গভঙ্গী করিয়া শত্রুকে দূরে সরাইয়া রাখে।

আমাদের দেশীয় বিখ্যাত পাতা-প্রজাপতির চাতুরির কথা হয়তো অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহারা ডানা মুড়িয়া বসিলে শুষ্ক পত্রের সহিত এমনভাবে মিলিয়া যায় যে, সহজে আর খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত। ইহাদের প্রসারিত ডানার উপরের দিকের রং অতি উজ্জ্বল। রঙের ঔজ্জ্বল্যে দূর হইতে অনায়াসেই ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ডানার নীচের দিকের রং শুষ্ক পত্রের মত সমুজ্জ্বল। তাহাতে আবার বৃক্ষপত্রের মত মধ্যশিরা ও উপশিরার সুস্পষ্ট রেখা রহিয়াছে। কাজেই জানা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকেই ইহাদের দ্বারা প্রতারিত হয়। কলিকাতার আশে-পাশে বনে জঙ্গলে 'থেক্‌লা য়্যাম্‌ব্রাক্‌স' নামক মলিন সাদা রঙের ছোট ছোট এক প্রকার প্রজাপতি দেখা যায়। ইহাদের ডানার প্রান্তভাগে সূক্ষ্ম পালকের মত দুই একটি পদার্থ আছে। ডানা মুড়িয়া বসিলেই ডানার প্রান্তভাগে কৃষ্ণবর্ণের ফোঁটা এবং সূক্ষ্ম পালকগুলির দরুন মনে হয় যেন ইহার দুই দিকে দুইটি মস্তক



পিউইট পাখীর চালাকি। ইহারা ডানা-ভাঙ্গার অভিনয় করিয়া শত্রুকে বিভ্রান্ত করে

রহিয়াছে। টিকটিকি, কুমোরে-পোকা বা অন্যান্য শত্রুরা শিকারকে সাধারণতঃ পিছনের দিক হইতেই আক্রমণ করে। আক্রমণকারী পিছনের দিকের নকল মুখখানাকে আসল মুখ মনে করিয়া ঘুরিয়া সম্মুখের দিকে উপস্থিত হইবামাত্রই প্রজাপতি তাহাকে দেখিতে পাইয়া উড়িয়া যায়। আমাদের দেশের বনে জঙ্গলের অন্ধকার

ন প্রায় দেড় ইঞ্চি প্রশস্ত ডানাওয়ালা দুধের মত সাদা এক চার মথজাতীয় প্রজাপতি দেখা যায়। ইহাদের শত্রু পদে পদে। জেই সহজে ইহারা বড় একটা প্রকাশ্যস্থানে বাহির হয় না। ইর হইলেও গাছের পাতার উপর এমন ভাবে লেপ্‌টিয়া বসিয়া ক, মনে হয় যেন পাতাটার উপর পাখীর পরিত্যক্ত মল ড়য়া রহিয়াছে। কাজেই সেদিকে কেহ বড় একটা নজর দেয় । এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া যাইবার সময়ই সাধারণতঃ রা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

আমাদের দেশীয় সুড়সুড়ে-পিঁপড়ের মত অনেক জাতীয় পিলিকা দেখা যায় যাহাদের দংশন-ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। রুর সম্মুখীন হইলেই ইহারা শরীরের পশ্চাদ্দেশ হইতে বাতাসে ক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত রস ছড়াইয়া দেয়। এই দুর্গন্ধের জন্য ততায়ী তাহাদের কাছে ঘেঁসে না। উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র না কায় শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাও এক প্রকার তারণা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের দেশের লাল-পড়েরা শত্রুকে বিষাক্ত দংশনে ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিলেও



ফ্রগ-মাউথ পাখীর প্রতারণা

রীরের পশ্চাদ্ভাগ হইতে এক রকমের বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়া াহাদিগকে দূর করিয়া দিতে সমর্থ হয়। য়্যালজিরিয়ায় এক াতীয় পঙ্গপাল দেখা যায় যাহারা প্রায় দুই ফুট দূর হইতে শত্রুর তি এক প্রকার বিষাক্ত রস ছুড়িয়া মারে। এই বিষাক্ত রসের য়ে কেহ তাহাদের সম্মুখীন হইতে ভরসা পায় না। অথচ এই স ছাড়া তাহাদিগকে ভয় পাইবার মত আর কিছুই নাই। নেক প্রজাপতির বাচ্চা শরীর হইতে এরূপ বিষাক্ত রস ছুড়িয়া াত্মরক্ষার জন্য এইভাবে প্রতারণা করিয়া থাকে। কয়েক জাতীয় বরে পোকাও এইরূপে রস ছুড়িয়া শত্রুকে প্রতারিত করিয়া াকে। কয়েক রকমের প্রজাপতি এবং অন্যান্য অনেক কীট-তঙ্গ শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির করিয়া শত্রুকে প্রতারণা করে। কন্তু প্রজাপতি, গুবরে পোকা এবং অন্যান্য কীট-পতঙ্গের মধ্যে



শূকরের মত নাকওয়ালা সাপ গোখরা সাপের মত ফণা তুলিয়া বিষাক্ত সাপের অভিনয় করিতেছে

বিভিন্ন জাতীয় এমন কতকগুলি প্রাণী দেখা যায় যাহাদের আত্মরক্ষার কোন অস্ত্রশস্ত্র তো দূরের কথা শরীরে কোন বিষাক্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থেরও অস্তিত্ব নাই। তাহারা রস নিক্ষেপকারী বা বিষাক্ত প্রাণীদের দেহের বর্ণ-বৈচিত্র্য বা হালচাল অনুকরণ করিয়া শত্রুকে প্রতারণা করিয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আততায়ীরা তাহাদের এ চালাকি ধরিতে পারে না।

য়্যানড্রেনা বর্গভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় মৌমাছিরা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে মৃতের ন্যায় ভান করে। এরূপ অবস্থায় ধরিয়া তুলিলে ইহাদের শরীর হইতে এক প্রকার গন্ধ নির্গত হইতে থাকে। এই গন্ধ অনেকের নিকটই অপ্রীতিকর বলিয়া পারত-পক্ষে ইহাদিগকে স্পর্শ করে না। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই তাহারা প্রতারণার এইরূপ ফন্দী আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। একজাতীয় টিকটিকি দেখা যায় তাহাদের পাগুলি দেহের তুলনায় অসম্ভব রকমের ছোট। অন্যান্য টিকটিকিদের মত ইহারা দ্রুতবেগে ছুটিতে পারে না। কাজেই শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইহারা হাত পা ছড়াইয়া চোখ বুজিয়া মড়ার মত শক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে। মৃত মনে করিয়া শত্রু দূরে সরিয়া গেলে সুযোগ বুঝিয়া কোন কিছুর আড়ালে আত্মগোপন করে। ভার্জিনিয়ার অপোসাম



এক জাতীয় ব্যাঙ শরীর সঙ্কুচিত করিয়া শুষ্ক মৃতদেহের মত পড়িয়া রহিয়াছে

নামে এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় জানোয়ার দেখা যায়। ইহারা প্রতারণায় এমন সুপটু যে সেই দেশের লোকেরা 'পোসাম' কথাটাকে চালাকি অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। ধরা পড়িবামাত্রই ইহারা মাটিতে নেতাইয়া পড়ে এবং হাত পা ছড়াইয়া জিভ বাহির



'স্কাঙ্ক' নামক দুর্গন্ধ রস নিক্ষেপকারী জানোয়ার

করিয়া ঠিক মড়ার মত পড়িয়া থাকে। এ অবস্থায় প্রহার করিলেও কিছুমাত্র নড়াচড়া করে না। তখন মৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিবামাত্রই বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পলায়ন করে। মাউস-ডিয়ার বা সেভ্রোটেন নামক একপ্রকার জানোয়ার দেখা যায়—দেশীয় ভাষায় ইহারা 'কাকিল" নামে পরিচিত। এই জানোয়ারগুলিও ধরা পড়িলে ঠিক মৃতের মত পড়িয়া থাকে। প্রহার করিলেও পলায়ন করিবার চেষ্টা করে না। থেঁকশিয়াল এবং অষ্ট্রেলিয়ার ডিঙ্গো নামক কুকুর জাতীয় জানোয়ারেরাও অনুরূপ ভাবে আক্রমণকারীদের প্রতারণা করিয়া থাকে। প্রতারণায় ইহারা এমনই সুপটু যে, মড়ার মত পড়িয়া থাকিবার সময় শরীরের চামড়া খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেও টুঁ-শব্দটি করে না। দক্ষিণ-আমেরিকার য়্যাজারা কুকুরেরাও এইরূপভাবে শত্রুকে প্রতারণা করে।

কতকগুলি জানোয়ার এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী দূর হইতে বিষাক্ত বা দুর্গন্ধযুক্ত থুথু নিক্ষেপ করিয়া শত্রুকে প্রতারণা করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। 'রিংহলস্ কোব্রা' নামক আফ্রিকার একজাতীয় সাপ শত্রুকে দেখিবামাত্র ফণা তুলিয়া দূর হইতে অব্যর্থ লক্ষ্যে শত্রুর চোখে একপ্রকার বিষাক্ত রস নিক্ষেপ করে। শিংওয়ালা একজাতীয় টিকটিকি শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই ভয় দেখাইবার জন্য মুখটাকে হাঁ করিয়া শরীরটা প্রায় তিনগুণ ফুলাইয়া তোলে; তখন তাহার চোখের কোণ হইতে ফোয়ারার আকারে সূক্ষ্ম রক্তের ধারা প্রায় ৫.৬ ফুট দূরে ছিটকাইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় দুর্দ্ধর্ষ শত্রুও ভয়ে পিছু না হটিয়া পারে না। লামা নামক জানোয়ারেরা দূর হইতে অদ্ভুত উপায়ে থুথু নিক্ষেপ করিয়া অবাঞ্ছিতদের দূরে হটিয়া যাইতে বাধ্য করে। আমাদের দেশীয় গন্ধ-খট্টাশ বা ভামের মত উত্তর-আমেরিকায় 'স্কাঙ্ক' নামক এক প্রকার জানোয়ার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের সাদা, কালো লোম মেয়েদের পোষাক তৈয়ারীর জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই জন্তুগুলির শরীরের এক প্রকার বিশেষ গ্রন্থি হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত রস নির্গত হয়। কাপড়ে চোপড়ে একবার রস লাগিলে শত ধৌত করিলেও তাহার দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় না। এই রসের গন্ধ একটু বেশী সময় নাকে গেলে খুব সবল মানুষও অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের তাপ কমিয়া নাড়ীর গতি ক্ষীণ হইয়া যায়। সত্যিকারের ঠাট্টার মত ব্যাপারটা গুরুতর হইলেও আত্মরক্ষার জন্য ইহা একটা ফন্দী ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমেরিকায় শূকরের মত নাকওয়ালা একজাতীয় নিরীহ সাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বিষ নাই মোটেই। ইহারা প্রায় ৩।৪ ফুট লম্বা হইয়া থাকে। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে অথবা বেকায়দায় পড়িলে ইহারা ঠিক বিষধর সর্পের মত ফণা উদ্যত করে। শত্রুকে প্রতারিত করিতে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু ইহাতেও ভয় না পাইয়া শত্রু যদি আরও অগ্রসর হয় তখন ফণা গুটাইয়া চিৎভাবে মৃতের মত পড়িয়া থাকে। তখন জীবনের কোন লক্ষণই ইহাতে দেখা যায় না। তখনও শত্রু ইহাদের দ্বারা প্রতারিত হয়।

মিঃ আর. ই. ডিটমার এই সম্বন্ধে একটি চমৎকার ঘটনার কথা বলিয়াছেন। তিনি একবার স্থানীয় অসভ্যদের সঙ্গে লইয়া গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইবার সময় এই জাতীয় একটি সাপ দেখিতে পাইলেন। এই সাপের প্রতারণার ফন্দীর বিষয় তাঁহার

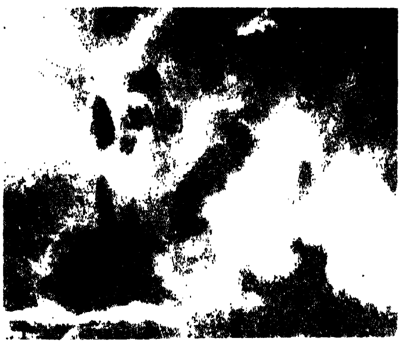


শিংওয়ালা টিকটিকি শত্রুর প্রতি চোখ হইতে রক্ত নিক্ষেপ করিয়া প্রতারণা করে

কিছুই অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু অসভ্য অনুচরেরা তাহার উদ্যত ফণা দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। অলৌকিক শক্তিবলে সাপকে বশীভূত করিতে পারেন—অনুচরদের মনে এরূপ ধারণা জন্মাইবার জন্য তিনি সাপটার সম্মুখে গিয়া কয়েকবার 'পাশ' দিতেই সে ফণা নামাইয়া মৃতের মত চিৎ ভাবে পড়িয়া রহিল, তখন তাহাকে হাতে করিয়া তুলিয়া দেখাইলেন। অনুচরেরা বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। মাটিতে ছাড়িয়া দিবার কিছুক্ষণ পরেই সে সঞ্জীবিত হইয়া ধীরে ধীরে আত্মগোপন করিল। কিন্তু ইহাতে ফল হইল

বিপরীত। অনুচরেরা তাঁহার এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া গভীর জঙ্গলে তাঁহাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে লাল অথবা হলদে বুকওয়ালা এক রকম ব্যাঙ দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য একটু ভয়ের কারণ ঘটিলেই ইহারা চিৎ হইয়া পড়ে এবং শরীরটাকে এমন ভাবে কুঁচকাইয়া রাখে মনে হয় যেন প্রাণীটা মরিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-আমেরিকার কাঁদুনে-ব্যাঙেরা আবার অদ্ভুত উপায়ে শত্রুকে

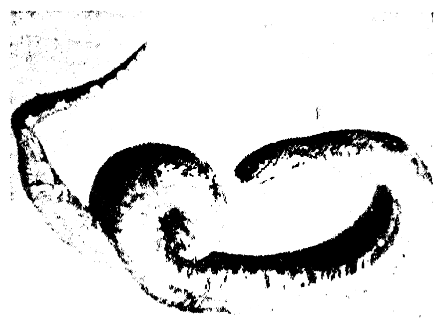


জলে কালি ছুড়িয়া কাট্‌ল্‌-ফিস্ শত্রুকে প্রতারণা করিতেছে

প্রতারণা করিয়া থাকে। কোন কারণে ভয় পাইলেই চামড়ার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে শরীর হইতে যথেষ্ট পরিমাণ জল বাহির করিয়া দিয়া আকারে ছোট হইয়া যায়, ইহার ফলে সহজেই শত্রুর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় এক প্রকার অদ্ভুত কচ্ছপ দেখা যায়। বাচ্চা বয়সে ইহাদের খোলাটা থাকে খুব শক্ত গম্বুজের মত। কিন্তু পরিণত বয়সে উপনীত হইলেই খোলাটা চেপ্টা এবং অসম্ভব রকমের নরম হইয়া যায়। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই ইহারা প্রস্তরের সূক্ষ্ম ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে এবং শরীরটাকে ফুলাইয়া ফাঁকের মধ্যে নেপটিয়া থাকে; তখন কোন রকমেই ইহাদিগকে বাহির করিবার উপায় থাকে না। আর্ম্মাডিলো, পেঙ্গোলিন এবং হেজ-হগ নামক সজারু জাতীয় প্রাণীরা ভয় পাইলেই শরীরটাকে বলের মত গুটাইয়া ফেলে, বলের চতুর্দ্দিকে শক্ত আঁস এবং কাঁটার ভয়ে শত্রুরা হাতে পাইয়াও কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না অধিকন্তু হঠাৎ আকৃতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বিভ্রান্ত হইয়া থাকে।

পাখীদের মধ্যেও অনেকে অদ্ভুত কৌশলে শত্রুকে প্রতারণা করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার 'ফ্রগ-মাউথ' নামক পাখীরা শত্রুকে দেখিলেই ঠিক এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মত আকৃতি ধারণ করে। ভয়েই হউক বা ইচ্ছায়ই হউক শরীরটা আগাগোড়া সোজা এবং শক্ত হইয়া যায়। এ অবস্থায় বিশেষ সন্ধানী চোখও ইহাদিগকে গাছের অংশ-বিশেষ মনে না করিয়া পারিবে না। অনেক পাখী তাহাদের বাচ্চাগুলিকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অদ্ভুত ফন্দীতে প্রতারণা করিয়া থাকে। শত্রুকে বাসার নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিলেই ধাড়ী পাখীটা তাহার সম্মুখে ডানা ভাঙার মত অভিনয় করিতে থাকে। শত্রু তাহাকে ধরিবার জন্য যতই অগ্রসর হয় ততই সে দূরে সরিতে থাকে। এরূপে শত্রুকে অনেক দূরে সরাইয়া অবশেষে উড়িয়া যায়। অনেক পাখী আবার শত্রুর হস্তে ধরা পড়িয়া ঠিক মড়ার মত ভান করে।

অক্টোপাস্, কাট্‌ল্‌-ফিস্ এবং স্কুইড নামক সামুদ্রিক প্রাণীরা শত্রুকে ফাঁকি দিবার জন্য অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। শত্রুর আগমন টের পাইবামাত্রই ইহারা শরীর হইতে সিপিয়া নামক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকার কালি ছাড়িয়া জল ঘোলা করিয়া দেয়। ইহার ফলে শত্রু আর তাহাদের গতিবিধি অনুসরণ করিতে পারে না। এতদ্ব্যতীত কাঁকড়া, চিংড়ি, জেলী-ফিস্, ষ্টার-ফিস্ প্রভৃতি প্রাণীরাও আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন উপায়ে শত্রুকে প্রতারণা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক প্রতারণার কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে একজাতীয় ফিতা-ক্রিমি। ইহারা



শূকরের মত নাকওয়ালা আমেরিকার এক জাতীয় সাপ
শত্রুর হাতে পড়িয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছে

প্রাণীগুলি সমুদ্রের ধারে প্রস্তরখণ্ডের নীচে আত্মগোপন করিয়া থাকে। কেহ ধরিতে গেলেই ইহারা টুকরা টুকরা হইয়া বিভিন্ন খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণীদের পরস্পরের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ বিদ্যমান। যে খাদ্য, সে চায় খাদকের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে; আবার যে খাদক, সে চায় অপরকে উদরস্থ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে। এই উভয় ব্যাপারেই যেমন শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন তেমন আবার নানা রকমের ফন্দী-ফিকিরেরও প্রয়োজন। ইহার ফলে প্রাকৃতিক উপায়েই আরও অনেক কিছু চাতুরি, কৌশল এবং ফন্দী-ফিকিরের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

কৃষিক্ষেত্রের মালিক সমস্যা

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

জমির মালিক বিশেষতঃ চাষের জমির প্রকৃত মালিক কে, বা কাহাদের উপর মালিকানা স্বত্ব ন্যস্ত করা উচিত ইহা লইয়া কয়েক বৎসর হইতে প্রচণ্ড আলোচনা চলিতেছে। মালিক অর্থে জমি যাহার দখলে আছে এবং দলিলপত্রের বলে জমির স্বত্ব স্বামিত্ব, ফলভোগ, দান-বিক্রয়ের অধিকারী। উর্দ্ধতন জমিদার বা রাজাকে খাজনা দিলেই তাহার মালিকানা রক্ষা হইল। তাহার উপরোক্ত স্বত্বে পরে যে স্বত্ববান হইল, সেই নূতন মালিক। ইহার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্বত্বে বা সর্ত্তে বিলি করিবার ব্যবস্থা আছে; সেরূপ অধিকারী নিম্নশক্তিসম্পন্ন মালিকের নিকট হইতে যতটা স্বত্ব বা শক্তি লাভ করিয়াছে, প্রচলিত আইন অনুযায়ী ভোগ দখল স্বত্ব প্রভৃতি লাভ না করা পর্য্যন্ত মালিক বা জমিদার কর্ত্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী।

সকল জমি লইয়াই বিতণ্ডা চলিতেছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর তর্ক উঠিয়াছে, চাষের উপযোগী জমি বা ক্ষেত্র লইয়া। এখন প্রবলতম মত :—হাল যার জমি তার। সংক্ষেপে কথাটা বলিলেও মূলতঃ এই যে, যে প্রজা (প্রজাই বলি) জমি চাষ করে, প্রকৃতপক্ষে মালিক সে-ই। বর্ত্তমানের আইনও সেই দিকে ঝোঁক দিতেছে এবং যতই প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কার হইতেছে, ততই নানা প্রকারে চাষী-প্রজার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া কেবল মাত্র তাহাকে উচ্ছেদ করা দুঃসাধ্য নয়, তাহার মালিকানা স্বত্বও যাহাতে কোনও মতে ক্ষুণ্ণ করা না যায়, তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে। কয়েকটা সর্ত্তে মিলিয়া গেলেই চাষী প্রজা দখলীকৃত জমিতে ইমারত নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষাদি ছেদন ও রোপণ প্রভৃতি কার্য্য বিনা বাধায় করিতে পারিবে, ইহাই প্রচলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুই নাই, করিলেই বা শোনে কে? জমি চাষীর না হইলে জমির উন্নতিসাধন হয় না; যাহারা প্রজাবিলি করিয়া জমিদার সাজিয়া আছে, তাহারা কোনও সংস্কার বা উন্নতির জন্য ব্যয় করিতে নারাজ। এবং প্রজার নিজের কোও স্বত্ব না থাকায়, সে যথেচ্ছ চাষ করিয়া যতটা ফসল পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করে না, উপরন্তু জমির কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলে তাহা রোধ করিতে চেষ্টা করে না।

এই সকল বিচার করিলে, এক কথায় বলিয়া দেওয়া যায় জমিতে যে লাঙ্গল দিল জমি তাহারই প্রাপ্য।

জমিতে আজ যে লাঙ্গল দিয়াছে, কাল দিয়াছে, বৎসরের পর বৎসর দিয়া ক্লেশ করিয়া শস্য উৎপাদন করিয়াছে, জমি তাহার। কিন্তু সে যখন চাষ ছাড়িয়া দেয়, তাহা যে-কোনও কারণেই হউক, তখন জমি কাহার হইবে, সে-বিষয়ে এক প্রশ্ন গজাইয়া উঠিয়াছে। যে লোক এক কালে চাষ করিত বলিয়া সেই সূত্রে মালিক হইয়াছে, সে ত উৎখাত না হওয়া অর্থাৎ তাহার জমি অন্য চাষীতে হস্তান্তর না হওয়া পর্য্যন্ত মালিক হইয়াই রহিল। সুতরাং কালক্রমে অথবা কয়েক বৎসরের মধ্যে যে চাষী মালিক ছিল, সে চাষ না করিয়াও মালিক দাঁড়াইয়া গেল।

এখন তাহাকে বেদখল করার কথা উঠিবে। যদি সেই চাষী সমস্ত ব্যয় বহন করিয়া অন্য মজুর দিয়া চাষ করাইয়া থাকে, তাহা হইলেও সে নিজে প্রকৃত চাষী-মালিক রহিল না। দ্বিতীয়তঃ সে যদি ভাগে চাষ করায়, তাহা হইলে লাঙ্গলের মালিক স্বতঃই জমির মালিক হইল। আর তৃতীয়তঃ যদি সে খাজনা লইয়া জমি বিলি করিয়া থাকে, তাহা হইলে নূতন ব্যবস্থামতে তাহার কোনও স্বত্ব এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নহে।

এরূপ মালিককে খেসারত দিয়া বা বিনা খেসারতে তাহার জমি লওয়া হইবে তাহা বিবেচ্য বিষয়।

তাহার পর আসিল উত্তরাধিকারীর কথা। চাষীর তিন ছেলে; একজন চাষ করে অপর দুইজন পড়াশুনা বা গৃহকর্ম্ম করে এবং চাষীর সহায়তা করে। তখনও তাহারা জমির মালিক থাকিবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরে ঐ দুই জন অন্য কর্ম্মে যোগ দিল, ফিরিবার সম্ভাবনা নাই; তখন কি তাহাদের জমির উপর কোনও দাবী থাকিবে না?

যদি ধরিয়া লওয়া যায় তাহাদের সমস্ত স্বত্ব নিজেদের দোষে নষ্ট হইল তখন কি তাহাদের খেসারত দেওয়া হইবে? চাষী-ভ্রাতার যদি এত টাকা নগদ না থাকে, তবে ত তাহাকে জমি বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করিতে হইবে?

ইহাদের মধ্যে কেহ যদি ফিরিয়া আসিয়া চাষ করিতে চাহে তাহার অবস্থা কি হইবে? যদি সে জমি না পায় এবং অপর কর্ম্ম করিবার সুযোগ সুবিধা হারাইয়া থাকে তাহা হইলে সে সপরিবারে উপবাস করিবে। তখন কি রাজ-সরকার তাহার সম্পূর্ণ ভার লইবে?

যদি তিন ভায়ের মধ্যে একজন শিশু নাবালক থাকে এবং অপর দুই ভাই চাষ পরিত্যাগ করিয়া অপর কর্ম্মে যায়, তখন নাবালকের সম্পত্তি কি জোরপূর্ব্বক হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে? ভবিষ্যতে সে যে চাষী হইবে না তাহা কি করিয়া মনে করা যাইতে পারে।

নাবালক ছাড়াও অন্যান্য অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। যদি কেহ অসুস্থ হইয়া নিজে চাষ করিতে অপারগ হয় এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি যদি তাহার একমাত্র অবলম্বন হয় তাহা হইলে কি এক সমস্যা নয়? প্রধানতঃ সে চাষ করিয়াই জীবিকার্জ্জন করিত এবং অন্য কোনও পন্থা শিক্ষালাভ করিবার সময়ও তাহার হয় নাই, সুযোগও হয় নাই, প্রয়োজন যে হয় নাই, সে কথা না-ই বলিলাম। তাহার উপর আজ সে লোক অশক্ত। এতদবস্থায় কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা জানিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছে।

হয়ত কোনও চাষী-মালিক মাত্র স্ত্রীলোক কয়েকটি রাখিয়া মারা গেল; তাহাদের চাষ করা অভ্যাস নাই এবং লোক

দিয়া চাষ করানো ছাড়া তাহাদের উপায় নাই, তখন কি করা বিধেয় ?

কার্য্যব্যপদেশে বা স্বাস্থ্যের কারণে যদি কোনও চাষী-মালিক দু'তিন বৎসর বিদেশে বাস করিতে বাধ্য হয় তবে তাহার জমি কি সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হইবে ?

তাহার উপর আরও এক সমস্যা দাঁড়াইতে পারে। কাহারও যদি জমি ভিন্ন অন্য উপার্জ্জনের পথ থাকে এবং লাভের পরিমাণ অনুযায়ী সময় সময় উপার্জ্জনের দ্বিতীয় পন্থার উপর অনুরাগী হইয়া চাষকে উপেক্ষা করিতে থাকে, তাহা হইলে কি তাহার জমির উপর স্বত্ব ত্যাগ করিতে হইবে ?

ইহা ছাড়া আরও নানা অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে, সকলগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন নাই। যে কয়েকটী অতি সাধারণ এবং প্রতিনিয়ত ঘটিতে পারে, তাহাই উল্লেখ করিয়া অসুবিধা কত রকম হইতে পারে তাহা প্রকাশ করিলাম। এরূপ সকল ক্ষেত্রেই যদি পূর্ব্বতন চাষী-মালিককে বেদখল করিয়া নূতন চাষীকে জমি বিলি করা না হয়, বা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানের ব্যবসায়ী, কেরাণী, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি মালিকদিগকে বেদখল করিয়া চাষী-মালিককে জমি ধরাইবার চেষ্টায় ফল কি ?

অন্যান্য বিষয় এই সঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন। এ সকল জমি হস্তান্তরের ব্যবস্থার ভার থাকিবে কাহার উপর ? কোথায় জমি এক বা দুই বৎসর চাষ হইল না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মালিক বদল করিবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। অত্যন্ত খর দৃষ্টি রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিলি-ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভার থাকিবে কাহার উপর ? পুলিশ পঞ্চায়েৎ ইউনিয়ন বোর্ড রাজস্ব বিভাগ কৃষি বিভাগ, না, নব-গঠিত কোনও প্রতিষ্ঠানের উপর ?

যেই-ই করুক, এই নিত্যনৈমিত্তিক অথচ গুরুভার পড়িলে লোকের "মাথা ঠিক" রাখা কষ্টকর হইবে। শক্তির নানারূপ অপব্যবহার হইবে ; উৎকোচ, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি বড় হইয়া দেখা দিবে না কি ? লোকের শান্তি নষ্ট হইয়া একটা কিম্ভূত-কিমাকার অবস্থা দাঁড়াইবে বলিয়া মনে হয়।

এ সকল হস্তান্তরের ফল—নূতন মালিকানা—কোন্ শক্তিতে স্থিতিবান্ হইবে ? প্রত্যেক মালিক পরিবর্ত্তন দস্তুরমত দলিল-পত্রাদি দ্বারা পাকা ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য স্থানীয় ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যাহাতে প্রত্যেক দলিলটি সরকারী মনোনয়ন লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ রেজেষ্টারী করা হয় তাহার ব্যবস্থা থাকিবে।

এই কার্য্যের জন্য লোকের বহু সময় নষ্ট হইবে, আরও নষ্ট হইবে অর্থ। পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব ফুটিয়া উঠিবে, সদ্ভাব গিয়া মনোমালিন্য দেখা দিবে তাহাও কি ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন নয় ?

কোন্ চাষীকে কত জমি দিলে তাহার সংসারের অভাব মিটিবে, তাহার একটা মান নির্ণয় করা প্রয়োজন। চাষীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি হাতে থাকিলে সে বিলি করিবেই এবং ক্রমে তাহার তহবিলে কিছু টাকা মজুত হইলে, সে চাষ ছাড়িয়া অন্য উপজীবিকা গ্রহণ করিবে।

চাষী হইলেই যদি জমি পাইবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে মন্দ কথা নহে। কিন্তু এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে পল্লীশিল্প দ্বারা নানা ভাবে বহু লোক জীবিকা অর্জ্জন করিত। সেই শিল্প নষ্ট হইয়া যাওয়ায় চাষের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে জমির পরিমাণের তুলনায় অধিকসংখ্যক লোক, সেখানে "লাঙ্গল" থাকিলেই অর্থাৎ গতর খাটাইয়া চাষের কাজ করিলেই জমি পাইবে, ইহা কি সম্ভব ? কতক লোককে চাষের উপস্বত্ব ভোগ করিতে হইবে, আর কতক লোক তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে। চাষের জমি হস্তান্তর করিয়া দিলে যাহারা উহার উপর নির্ভর করিয়া আছে—স্ত্রীলোক, শিশু, অশক্ত—তাহাদের কি সঙ্গে সঙ্গে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ব্যবস্থা থাকিবে ?

কথা হইতে পারে, যাহারা চাষ করে না, চাষের উপস্বত্বের উপর নির্ভর করে না, সেরূপ লক্ষ লক্ষ লোক আছে। সুতরাং তাহাদের যেভাবে চলিয়া যায়, যাহারা জমিচ্যুত হইল তাহাদেরও সেই ভাবে চলিয়া যাইবে।

কথাটা হয়ত ঠিক, কিন্তু তাহার নানা দিক ভাবিয়া দেখিবার আছে। যাহারা এরূপ লোক তাহাদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। জোয়ারের জলে তৃণের মত তাহাদের সদাসর্ব্বদা অনিশ্চয়তার উপর ভাসিয়া বেড়াইতে হইতেছে। যাহারা বড় কারখানা, সরকারী, আধা-সরকারী, বে-সরকারী আপিসে বা মাষ্টারী, ওকালতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রত আছে, তাহাদের একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা বাদে লোকের কাজ নাই, পরন্তু তাহারা, কোনও রকমে জীবন ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়, যাহাকে উচ্ছেদ করিয়া "পথে দাঁড়" করানো হইল সঙ্গে সঙ্গে তাহার যদি অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া না যায়, তাহা হইলে কি এই পথে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক পরীক্ষা বলিয়া মনে করা উচিত নয় ?

যাঁহারা এ সম্পর্কে সকল দিক ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া সকল কথা বলা প্রয়োজন। লোকের মনে ঘোর দুশ্চিন্তা দেখা দিয়াছে। হয়ত সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে এই কাজ অতি সোজা হইবে। লোকে সুবিধাগুলি বুঝিতে পারিলে বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। সমাজের অথবা রাষ্ট্রের যাহা মঙ্গল, তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিতে দিবার সুবিধা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

ইহা যে সম্ভব, অর্থাৎ প্রতিনিয়ত মালিক বদল করিয়া নূতন মালিক সৃষ্টি করা, লোকের জমির উপস্বত্ব বিলোপ করিলে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লওয়া, প্রয়োজনমত জমি বণ্টন করা প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যগুলি জমিদার, বা প্রজা স্বতন্ত্র মালিক থাকিলে হওয়া সম্ভব তাহা কার্য্যতঃ প্রমাণ করা হয়ত খুব সহজ হইবে না।

যত দিন না লোকের অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি অভাব পূরণের জন্য রাষ্ট্র মুখ্যতঃ দায়ী হইতেছে, ততদিন এক অনিশ্চিত সুবিধার জন্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া ভুল হইতে পারে।

কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না। প্রত্যেক চাষীর সহিত তাহার মাটির মায়া জড়াইয়া আছে। একজনকে

স্থানচ্যুত করিয়া অপরকে বসাইলেই যে কৃষি এবং ক্ষেত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইবে, তাহা মনে করিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। যত দিন না সমস্ত ক্ষেত্র রাষ্ট্রের অধিকারে আসে, যত দিন না সমস্ত কৃষকের শ্রমের ফল এক এক স্থানে সংগৃহীত হইয়া সকলের "এজমালি" সম্পত্তি হইয়া প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী শস্যগ্রহণের ক্ষমতা জন্মিতেছে, ততদিন কেবলমাত্র "লাঙ্গল যার, জমি তার" বলিয়া অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বর্ত্তমান মালিককে স্থানচ্যুত করিতে যাওয়ার ফল ভাল হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে "মালিকে"র ইচ্ছামত প্রজাকে উচ্ছেদ করা বা খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দিয়া "ঠিকা প্রজা" রাখার ক্ষমতা হ্রাস করা সমীচীন। তাহা ছাড়া, যাঁহারা মধ্য-স্বত্ব ধরিয়া বসিয়া আছেন এবং যাহার ফলে জমির খাজনা অহেতুক বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কতকটা লোপ করা প্রয়োজন হইতে পারে। কোন কালেই যাহাদের চাষের সহিত সংস্রব নাই, যাহাদের "খামারে" ক্ষেতের ফসল আসিয়া পড়ে না, ধান ঝাড়িয়া তুলিয়া রাখিবার গোলা নাই, তাহাদের নিকট হইতে ন্যায্য মূল্য দিয়া জমি ক্রয় করিয়া প্রজাকে বিলি করিবার ব্যবস্থা করা চলিতে পারে।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ

শ্রীউষাপতি ঘটক

যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের কথা এখন হইতেই শুনা যাইতেছে। যুদ্ধের সময়ে ভারতে অনেক ছোটখাটো শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে; যুদ্ধের পূর্ব্বে যে-সব শিল্প ভারতে ছিল সেগুলির পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। ভারতে এবং ভারতের বাহিরে অনেক ব্যক্তি এই সব শিল্পকার্য্যে ও যুদ্ধের কার্য্যে লিপ্ত আছেন। নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এই সকল ব্যক্তি যাহাতে কাজ পাইতে পারেন ভারতের সাধারণ ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান যাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয় এবং ভারত যাহাতে নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শিল্প-বিষয়ে উন্নততর হইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণ করাই নাকি এই শিল্প-প্রসারের উদ্দেশ্য।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় বিশটি শিল্পকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দেশলাই, পাট, চা প্রভৃতি কতিপয় শিল্পকে এই "কেন্দ্রীয় করণ" বা "জাতীয় করণ" পরিকল্পনার বিষয়ীভূত করা হয় নাই। এই কয়েকটি শিল্পে বিদেশী বণিকদের অনেক টাকা খাটিতেছে। কোন কোন সমালোচক বলিতেছেন যে ইহাতে বিদেশী বণিকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে।

এই জাতীয়করণ ব্যবস্থা ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্গত। কিন্তু জাতীয়করণ পরিকল্পনায় যে শিল্পগুলিকে গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইগুলি পরিচালনার জন্য মূলধন, যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞের (technical experts) প্রয়োজন। এ সবই বিদেশ হইতে আসিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। অল্প কিছুদিন হইল, ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন-পরিষদের পরিকল্পনা সদস্য (Planning Member) স্যর আরদেশীর দালাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনার জন্য যুক্তরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বে লণ্ডনের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে কলিকাতার ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্যর আলফ্রেড ওয়াটসন লিখিয়াছেন, "যখন (ভারতীয় শিল্পগুলিকে) জাতীয়করণের কথা লঘুভাবে আলোচনা করিতে শুনি, তখন সঙ্গে সঙ্গে একথা বলা চাই যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহা কার্য্যকরী করিবার উপযোগী ... নাই। এইরূপ কোন পরিকল্পনার জন্য ভারতে বিদেশী মূলধন ও বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ আমদানি করিতে হইবে।"*

এখন আমরা এই ব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করিতেছি।

প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার ফলে ভারত হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা বিশেষজ্ঞদের মাহিনা ও মূলধনের সুদ হিসাবে বিদেশে চলিয়া যাইবে। মূলধন যদি কোন যৌথ কারবারে নিয়োজিত হয় তাহা হইলে লাভের একটা বিরাট্ অংশ বিদেশের সম্পদবৃদ্ধির সহায়ক হইবে। ইহাতে আর্থিক সম্পদের দিক হইতে ভারতের ক্ষতিই হইবে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কিরূপে প্রতিপালিত হইবে তাহাই প্রশ্ন। কোন নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠায় গবর্ণমেণ্ট কি নীতিতে অনুমতি বা লাইসেন্স দিবেন তাহা হয়তো প্রশ্নই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের মনে হয় যে অনুমতি দান একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার। ভারত-সরকারের এ ক্ষমতা কোন শ্রেণীবিশেষের অনুকূলে যাইবে কিনা তাহা এখন হইতেই বলিতে পারা যায় না। আবার সাম্প্রদায়িক হারাহারির প্রশ্ন উঠিলে সমগ্র পরিকল্পনাটি জটিল আকার ধারণ করিবে।

তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নয়। ভারতবর্ষ শাসনে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের অনেকখানি প্রভাব বর্ত্তমান। জাতীয়করণ প্রচেষ্টায় যে-সব শিল্প কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে যাইতেছে, তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ ভারতের জনমতের প্রতিনিধিগণ করিবেন কি?

সরকারের বৈদেশিক (প্রধানতঃ ব্রিটিশ) উপদেষ্টাগণের নির্দ্দেশে শিল্প-সমূহ পরিচালিত হইলে তাঁহাদের উপদেশ যে অনেক স্থলে ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে না তাহা কে বলিতে পারে?

চতুর্থতঃ, যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ বিদেশে কাঁচা মাল ও খাদ্য-

* "When nationalisation is talked of lightly it must be said at once that the Government has neither the machinery technical experience nor trained men to manage the huge enterprise contemplated. For anything like this programme India will want foreign capital, men of great technical experience, who must be ..."

দ্রব্য রপ্তানি করিত। বিনিময়ে ভারত পাইত বিদেশের কলকারখানায় প্রস্তুত সামগ্রী (manufactured goods)। ইউরোপীয় বণিকদের পক্ষে ভারতের নিকট হইতে কাঁচা মাল কেনাই সুবিধাজনক; কিন্তু ভারতের পক্ষে কাঁচা মাল উৎপাদন করা যেমন প্রয়োজন, আপনার প্রয়োজনমত শিল্প-সামগ্রী ভারতে প্রস্তুত হওয়া তেমনি আবশ্যক। এই বিষয়ে ভারতের পক্ষে বেশী পরনির্ভরশীলতা ভাল নয়; আবার কাহারও কাহারও মতে ভারত যন্ত্রশিল্পে উন্নত নহে বলিয়াই আজ এত দরিদ্র ও অন্য সুসভ্য দেশ হইতে পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; আর কয়েক মাসের মধ্যে বিলাতী ও মার্কিন পণ্যে ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিবে। ভারত-সরকার যখন ভারতের জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত নহে, তখন ভারতের শিল্প যাহাতে বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে না পারে, ভারত যাহাতে কাঁচা মাল ও খাদ্য-শস্য উৎপাদনে অধিক মনোযোগী হয়,—এইরূপ ব্যবস্থারও আশঙ্কা করা যায়; ইহার কারণ,—ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু তবুও ভারতের শিল্পোন্নতি যে আবশ্যক সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই।

আমাদের মনে হয় যে এই সমস্যার একটা সমাধান হইতে পারে। এই যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের কাছে ভারত-গবর্ণমেন্টের অনেক টাকা পাওনা (sterling balances) হইয়াছে; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই টাকা আশু প্রত্যর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিলেই, ভারতের আর বিদেশে টাকা ধার করিবার প্রয়োজন থাকে না, এ কথাও অনেকে বলিতেছেন। ভারত এই টাকার বিনিময়ে যুক্তরাজ্য ও আমেরিকা হইতে কলকব্জা এবং যন্ত্রপাতি আনাইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে অবিলম্বে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিবার ইচ্ছা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নাই। ধীরে ধীরে মালপত্র সরবরাহের দ্বারা ঐ টাকা শোধ করাই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা।

ভারতকে যদি একান্তই টাকা ধার করিতে হয় তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ যে ভাবে বিদেশে টাকা ধার করিত, সেই ব্যবস্থা ভারতেরও উপযোগী হইতে পারে।* ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক আজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; এইগুলিও ভারতে শিল্পোন্নতির সহায়ক হইতে পারে।

বিশেষজ্ঞদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, ভারতের উচ্চশিক্ষিত যুবকদিগকে দলে দলে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন কলকারখানায় শিক্ষানবীস হিসাবে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হইলে ইঁহারাই পরে ভারতের শিল্প-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারেন কিংবা আপনারাই ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

সরকারী নিয়ন্ত্রণের সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুই-একটা কথা বলা প্রয়োজন। সরকারী নিয়ন্ত্রণ রুশিয়া প্রভৃতি দেশে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে,—তাহার একমাত্র কারণ সেদেশের পরিচালক-বৃন্দের দক্ষতা, নিষ্ঠা ও স্বদেশপ্রীতি। জাতীয় স্বাধীনতাও ইহার অন্যতম কারণ। ইহা মানুষের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে না। কিন্তু যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে সরকারী নিয়ন্ত্রণ সুফল দান করিতে পারে নাই। ইংলণ্ডের ন্যায় শিল্প-প্রধান দেশের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ মার্শাল বলেন, "যে সরকার নানা ব্যাপারে জড়িত সেই সরকার যে-যে শিল্পে হস্তক্ষেপ করেন, তাহার অগ্রগতি শ্লথ হইয়া আসে; অবশেষে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভাবে রাজনীতি এবং রাজনীতির প্রভাবে বাণিজ্য-নীতি দোষ-যুক্ত হইয়া পড়ার সম্ভাবনা।"*

সরকারী নিয়ন্ত্রণ কতকগুলি কর্তৃত্বাভিমানী সরকারী কর্মচারী সৃষ্টি করিতে পারে ইঁহারা মাহিনা, প্রোমোশন ও পেনসনের নির্দ্ধারিত ধাপগুলির দিকে চাহিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবেন। তাহাতে শিল্পের উন্নতির আশা কম। সরকারী নিয়ন্ত্রণের আর একটা কুফল এই যে, ইহার ফলে সাধারণ ব্যবসায়ীর আপনার প্রতি নির্ভরশীলতা ও আত্ম-বিশ্বাসের ভাব কমিয়া আসে। ব্যবসায়-ক্ষেত্র অবরুদ্ধ দেখিয়া অনেক ব্যক্তি চাকুরির মোহে অন্ধ হইয়া ভাগ্যোন্নতির এই একমাত্র পথ ত্যাগ করিতে পারেন। সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনেক স্থলে বেকার-সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারে।

অথচ, সরকারী নিয়ন্ত্রণ জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন। যে সমস্ত শিল্প-ব্যবস্থার ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে, স্বাধীন দেশে সেগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসিলেও আশঙ্কার কারণ নাই; সাধারণ ব্যক্তি সহজেই তাহার দোষগুলি দেখাইয়া দিলেই সাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল সরকার অবিলম্বে ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন।

সাধারণের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য অনেক কার্য্য করপোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি সাধারণের দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকে। যানবাহনের মধ্যে রেলওয়ে, ডাক ও তার-বিভাগ প্রভৃতির ভার প্রাথমিক অবস্থায় বে-সরকারী ভাবে পরিচালিত হইলেও পরে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আসে।

সরকারের প্রয়োজনীয় অনেক শিল্প আছে, যাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকায় সাধারণ ব্যবসায়ী মূলধন নিয়োগ করিতে চাহে না। ইহাদের পরিচালনার ভার রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু যে সকল শিল্পে সাধারণ ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণের বিচার-বুদ্ধি প্রদর্শনের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে, সেগুলি ব্যক্তিগত বা বে-সরকারী পরিচালনাধীনে থাকিলেই ভাল হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে ভারতে যেসমস্ত কুটির-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলি আজও বৈদেশিক প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়া রহিয়াছে। এগুলিকে রক্ষা করাও যেমন সরকারের দায়িত্ব, তেমনি ভারতে যাহাতে বে-সরকারী প্রচেষ্টায় কলকারখানা গড়িয়া উঠিতে পারে সেদিকে সতর্ক থাকাও সরকারের আদর্শ হওয়া উচিত।

* অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান বিদেশী মূলধন ধার করিত; কিন্তু ইহার জন্য তাহারা কেবলমাত্র সুদ দিতে বাধ্য থাকিত। লভ্যাংশের (dividend) উপর বিদেশীদের কোন হাত থাকিত না।

* "But . . . the heavy hand of Government tends to slacken progress in whatever matter it touches; and finally . . . business influences are apt to corrupt politics, and political influences are apt to corrupt business"—*Industry and Trade.*



(একাঙ্ক নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

মলিন অধ্যাপক, বয়স চল্লিশ, দেহ সুস্থ ও সুন্দর, দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে সুপণ্ডিত।

স্থান—মলিনের শোবার ঘর, কাল দুপুর।

নীচে, রাস্তা দিয়ে একখানা মোটর আসবার আওয়াজ হ'ল—মলিনের দরজায় দাঁড়াল। হঠাৎ মলিনের মনে হ'ল যেন কে এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে, মলিন উঠে দাঁড়িয়ে যা দেখল তাতে সে চমকে উঠল। দেখল এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ—কালো আলখাল্লায় সর্বাঙ্গ আবৃত, লম্বা লম্বা পাকা চুলের গোছা পড়েছে কাঁধের উপর। সবচেয়ে আশ্চর্য্য জিনিস হচ্ছে তার মুখ—পাকা চুল কিন্তু মুখে জরার চিহ্ন নাই।

মলিন। (বিস্মিত হয়ে) কে তুমি—কে তুমি ?

আগন্তুক। আমাকে চিনতে পারলে না, তুমি যে আমারই প্রতীক্ষা করছিলে ?

মলিন। না, তোমার জন্যে তো প্রতীক্ষা করছিলাম না, (ব্যস্তভাবে) আমার লাঠিগাছটা কোথায় ? তুমি চোর, গুণ্ডা।

আগন্তুক। (ইঙ্গিতে শান্ত হতে বলে) চুপ করে ব'সো, চেঁচিও না—আমি চোর বা গুণ্ডা নই।

(সে ইঙ্গিত উপেক্ষা করবার ক্ষমতা মলিনের রইল না, সে আবার প্রশ্ন করল)

মলিন। তুমি কে ?

আগন্তুক। আমি তোমার বন্ধু।

মলিন। সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; কিন্তু হে বন্ধু তুমি সদর দরজা দিয়ে না এসে দেয়াল টপ্‌কে এমন নিঃশব্দে এলে কেন ?

আগন্তুক। আমার পদশব্দ কেউ শুনতে পায়, কেউ পায় না।

মলিন। কিন্তু কষ্ট করে বৃথাই এলে, বন্ধুত্বের খাতিরে গোপন কথাটা খুলে বলছি শোন, টাকাকড়ি এমন কি স্ত্রীর গহনাপত্র সবই ব্যাঙ্কে রাখা আছে, ঘরে কিছুই নাই।

আগন্তুক। আমি যা চাই তা তোমার কাছেই আছে।

মলিন। (পকেট থেকে ব্যাগ বার করতে করতে) কাছে যা আছে তা যৎসামান্য যৎসামান্য—খান দুই দশ টাকার নোট। তা, এতে যদি তুমি খুশি হও তাহলে আমিও খুশি হব।

আগন্তুক। নশ্বর বস্তুতে আমার লোভ নাই।

মলিন। তা বটে, কাগজ জিনিসটা খেলো বটে, কিন্তু নিরেট কিছু যে কাছাকাছি নেই। তা—হ্যাঁ, একটু সবুর করতে হবে, আমি আমার স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ী ফোন করে জেনে নিচ্ছি গহনা-টহনা কিছু এখানে রেখে গেছে কিনা। (মলিন ফোনের দিকে এগিয়ে গেল)

আগন্তুক। (মলিনকে বাধা দিয়ে) তারও দরকার নাই।

মলিন। সে ভয় করো না—আমি থানায় ফোন করে পুলিস ডাকতে চাই নে। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছাটা এই যে তুমি এখন কিছু দক্ষিণা নিয়ে সদর দরজা দিয়ে শিগ্‌গীর বিদেয় হও।

আগন্তুক। আমারও তাই ইচ্ছা, আমিও বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) দুটো বেজেছে, বড়জোর তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি!

মলিন। কেনই বা অতক্ষণ কষ্ট করে অপেক্ষা করবে? (নোট ক'খানা এগিয়ে দিয়ে) এই নাও—চল দেখি ?

আগন্তুক। (অট্টহাস্য করে) মানুষ কি শেষে আমাকেও ঘুষ দিয়ে বিদেয় করবে নাকি ? না বন্ধু, ওসব জিনিস আমি নিতে আসি নি, আমি যা চাই তাই দাও।

মলিন। বলো কি চাও—বলে ফেল।

আগন্তুক। আমি চাই তোমার প্রাণ।

মলিন। (ভয়ে খানিকটা পিছনে সরে গিয়ে) বলে কি, লোকটা পাগল নাকি ?

আগন্তুক। প্রথমত আমি লোক নই—

মলিন। এ নিশ্চয় পাগল। (চিৎকার করে চাকরকে ডাকতে লাগল) ওরে ইন্দির, ইন্দির—

আগন্তুক। (বাধা দিয়ে) ইন্দ্র দেবলোকে অনুপস্থিত, ডেকে লাভ হবে না। আমি যা নিতে এসেছি তা নেবই, তাতে ইন্দ্র চন্দ্র কেউ বাধা দিতে পারবে না।

মলিন। সত্যি করে বলো—কে তুমি ? কি চাও ?

আগন্তুক। আমি মৃত্যু, চাই তোমার প্রাণ।

মলিন। (প্রথমে মুখে ফুটে উঠল অবিশ্বাসের হাসি, তারপরে সে হাসি ক্রমে মিলিয়ে গেল, তার জায়গায় প্রকাশ পেল একটা ভয়ের ভাব) তুমি মৃত্যু! না, তুমি মৃত্যু নও।

যমরাজ। আমি মৃত্যু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রেখো না।

মলিন। সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে; আপনি যদি সত্যিই মৃত্যু তাহলে হে যমরাজ আপনার বাহন মহিষটি কোথায় ?

যমরাজ। সেকালে মোষ চলত, কিন্তু একালে মোষ অচল তাই মোষ ছেড়ে মোটরকার ধরেছি।

মলিন। তাই বুঝি মোটরের আওয়াজ পেলুম, (জানালা দিয়ে নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে) মস্তবড় গাড়ী যে—রাজোচিত বটে! কিন্তু আপনার গাড়ী আমার দরজার সামনে কেন যমরাজ ? বাড়ী চিনতে ভুল করেছেন।

যমরাজ। ভুল করি নি, আমার ভুল হয় না।

মলিন। এ ক্ষেত্রে সামান্য একটু ভুল হয়েছে, ২৭নম্বরে না য়ে ২৬নম্বরে এসেছেন, কেননা পাশের বাড়ীর রোগীটিকে াক্তার জবাব দিয়েছে।

যমরাজ। ডাক্তারের জবাব শেষ জবাব নয়।

মলিন। তাহলে দয়া করে ঐ সামনের বাড়ী যান, আশি ছরের বুড়ীটির সদ্‌গতি হোক।

যমরাজ। আশি বছরের বুড়ীর আয়ু এখনও নিঃশেষ হয় নি, ন্তু তোমার পরমায়ু তিনটে বেজে সাত মিনিট পর্যন্ত।

মলিন। (চম্‌কে উঠে) আমার! আমার পরমায়ু মোটে ার এক ঘণ্টা সাত মিনিট! এও কি সম্ভব? বয়েস যে ামার মোটে আটত্রিশ! তাছাড়া আমি যে নীরোগ, আমি ্ব সুস্থ সবল, মরণের সম্পূর্ণ অযোগ্য!

যমরাজ। (হেসে) যোগ্যতার বিচার তুমি করবে?

মলিন। আমি করি নি, করেছে ডাক্তাররা—ছোটখাটো নয়, ড় বড় সব স্পেশ্যালিষ্ট। একবার একটু হার্টের গোলমাল য়েছিল, ডাক্তারদের রায় নিলুম, তাঁরা বললেন 'কোন ভয় াই, সেরে গেছে।'

যমরাজ। হয় তো সেরে গেছে।

মলিন। নিশ্চয় সেরে গেছে—আমি মরতে পারি না, কেননা ামার মরবার কোন হেতু নাই।

যমরাজ। সেজন্যে ভাবতে হবে না—তুমি নির্ভয়ে মরে াও, হেতু নির্ণয় করবে স্পেশ্যালিষ্টরা। বড় বড় গালভরা াম দেবে—Coronary Thrombosis, Massive Collapse of the Lungs, Rupture of the Charkots Artery, Angeoneurotic Oedema of the Laryngs, Abscissa

মলিন। (হেসে উঠে) আরে থামুন থামুন, Abscissa রোগ নয়, ওটা জ্যামিতির ব্যাপার, ওতে লোক মরে না।

যমরাজ। ভুলটা কি সত্যিই হাস্যকর! যখন তোমাদের স্পেশ্যালিষ্টরা বুকের রোগকে পেটের রোগ বলে চালান তখন তো কাউকে হাসতে দেখি নে। সে যাক, এখন কাজের কথা হোক, তোমাকে তিনটে বেজে সাত মিনিটের সময় প্রাণত্যাগ করতে হবে।

মলিন। কিন্তু যমরাজ ভেবে দেখুন কি অন্যায়টা আপনি করছেন। জীবনের এই মধ্যাহ্নে আমি কেমন করে মরতে পারি। শৈশব কেটেছে খেলা নিয়ে, কৈশোর কেটেছে বই নিয়ে, আজ যৌবনের মাঝামাঝি জীবনের অর্থবোধ হতে সুরু হয়েছে—রসের আস্বাদ সবেমাত্র পেতে সুরু করেছি—এরই মধ্যে যেতে হবে? আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন যমরাজ! রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'।

যমরাজ। তবু রবীন্দ্রনাথ বেঁচে নেই।

মলিন। আহা, সেটা যেন এতদিনেও বিশ্বাস হতে চায় না। আর দেখুন যমরাজ, আমার এই সাদার্ণ আভেনিউ'র বাড়ীটা প্রাচ্য পদ্ধতিতে অনেক টাকা খরচ করে করেছি, ঘরের আসবাবগুলোর গড়ন একেবারে মৌলিক, বাড়ীর নামকরণ করেছি বিখ্যাত সাহিত্যিককে দিয়ে, ফ্রেসকো আঁকিয়েছি প্রসিদ্ধ শিল্পীকে দিয়ে আর আমার লাইব্রেরির খ্যাতি বোধ হয়



আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন যমরাজ

আপনারও অবিদিত নাই। এসব ছেড়ে এই রূপ রস বর্ণ গন্ধের আয়োজনকে ফেলে রেখে আমি কি যেতে পারি?

যমরাজ। (হেসে উঠে) মনে পড়ছে একদা এক গুবরে পোকা আমাকে বলেছিল, হে বৈবস্বত, কত যত্নে আমি আমার এই নতুন ধরণের গর্ত্তটিকে খুঁড়ে গভীর করেছি, মসৃণ করেছি; আমার অফুরন্ত ভাণ্ডারে আমি নানাদিক থেকে সরস গোবর এনে সঞ্চয় করেছি—তার সৌগন্ধ বোধ হয় আপনাকেও প্রলোভিত করছে। কি সুন্দর এই পঙ্কিল ধরণী, কি শীতল ঘাসবনের নিবিড় ছায়া, দক্ষিণ বাতাসে ভেসে-আসা পচা গোবরের কি অপূর্ব সৌরভ—আহা, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। (আবার হাস্য)

মলিন। গোবরের গৌরব আমি ক্ষুণ্ণ করতে চাই না, আমি এই কথা বলতে চাই যে বেঁচে থাকবার প্রয়োজন আমার পোকামাকড়ের চেয়ে বেশী।

যমরাজ। কারণ?

মলিন। কারণ আমি যে বই লিখছি তার শেষের অধ্যায় লেখা এখনও বাকি আছে।

যমরাজ। ভয়ানক ব্যাপার! কি বই লিখছ?

মলিন। আমি লিখছি রুশ সাহিত্যে বাংলার প্রভাব—একটা নতুন জিনিস, সম্পূর্ণ নতুন জিনিস।

যমরাজ। এই সম্পূর্ণ নতুন জিনিসটা তোমার সম্পূর্ণ হতে পারল না।

মলিন। তাতে পৃথিবীর কত বড় ক্ষতি হবে সে কথা কি একবার ভেবে দেখেছেন যমরাজ!

যমরাজ। পৃথিবীর লাভক্ষতির হিসেব রাখা আমার কাজ নয়। বেচারা রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি'টা করে রেখে যেতে পারল না, ঘণ্টা বাজতেই চলে গেল। সেকেন্দারের এক দিকও বিজয় পুরো হ'ল না—এস বলতেই তলোয়ার রেখে বেরিয়ে এল। আরো শুনতে চাও? তবে শোন হংকং-এর ওয়াং চেরিবাগান করেছিল কিন্তু ফুল ফোটবার আগেই ওয়াং অন্তর্ধান হ'ল। রমেশ বিয়ে করতে যাবে দরজায় পাল্কি প্রস্তুত কিন্তু একটা আটাশ মিনিটে রমেশের

প্রস্থান, গোধূলিলগ্নের সবুর তার সইল না। গফুর মিয়ার অতিসাধের ঝিঙেগাছ ফুলে ভরে গেল, গফুর হঠাৎ সরে পড়ল। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে এরা প্রত্যেকেই প্রস্থানের সময় ঝিঙে গাছের অজুহাতে টিকে যাবার চেষ্টা করেছে।

মলিন। কেন এমন হয় এইটাই তো প্রশ্ন। এই যে মৃত্যু, এই যে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া—এর কি কোন আইন কানুন নাই, এ কি একেবারেই খামখেয়ালী? একটু গভীর ভাবে ভেবে দেখুন যমরাজ, বাঁচার ভেতরে যেমন একটা যুক্তি একটা বিচার বা একটা নিয়ম রয়েছে মরার ভেতরে তা নাই—ঐখানে কোন হিসেব চলে না—কোথায় একটা বড় রকম গলদ রয়েছে।

যমরাজ। এক সময় তোমারই মত চিন্তাশীল একটি মৎস্য সৃষ্টির কাঠামোর ভেতরে একটা বড় রকম গলদ আবিষ্কার করেছিল, বলেছিল—স্থলভাগটা একান্ত অনাবশ্যক, ওর থাকবার পক্ষে কোন যুক্তিই নাই।

মলিন। বুদ্ধিমান মৎস্যের মতটা মেনে নিতে পারলাম না। একটা উচ্চতর ক্ষেত্র থেকে, একটা বিস্তৃততর দৃষ্টিতে দেখলে মাছের ভুলটা ভেঙে যেত।

যমরাজ। তোমার মতটাও মেনে নিতে পারলাম না অধ্যাপক। উচ্চতম ক্ষেত্র থেকে বিস্তৃততম দৃষ্টিতে দেখলে তোমার ভুলটাও ভেঙে যেত।

মলিন। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিচলিতভাবে) আধঘণ্টা আয়ু কমে গেল, কথা কয়ে, কেবল কথা কয়ে! যমরাজ সত্যি করে বলুন আমার পরমায়ু কি আর সাঁইত্রিশ মিনিট মাত্র?

যমরাজ। সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মলিন। কি করেছি এতকাল? জীবনের জটিল এই অঙ্কের শেষ ফল যদি শূন্য হয় তাহলে কেন এতদিন নিজেকে বঞ্চিত করে এসেছি, অন্তর যা চেয়েছে তা পরিত্যাগ করেছি, যা চায় নি তা গ্রহণ করেছি। এই যে আনন্দ থেকে বারে বারে বঞ্চিত হয়েছি সে কেন, সে কেন?

যমরাজ। (একটু হাসি ফুটে উঠল) কি চেয়েছ আর কি চাও নি?

মলিন। গোড়াতেই গলদ যমরাজ, আমি অধ্যাপক হতে চাই নি কিন্তু হয়েছি অধ্যাপক।

যমরাজ। কি হতে চেয়েছিলে?

মলিন। আমি করতে চেয়েছিলাম বেগুনের চাষ আর আমি করছি কিনা বিদ্যার চাষ! আমি চেয়েছিলাম বাংলার কোন এক নিভৃত কোণে চাষী হয়ে আনন্দে দিন কাটাতে। আমি চেয়েছিলাম আমার ক্ষেতে সোনা ফলবে, আমি চেয়েছিলাম আমার বাগানে যে ফল ফলবে সে হবে সবচেয়ে রসালো সবচেয়ে মধুর; যে ফুল ফুটবে সে হবে সবচেয়ে সুন্দর। আমি চেয়েছিলাম সারাদিন আমার মাথার উপর থাকবে মুক্ত নীল আকাশ, আমার আশেপাশে থাকবে শ্যামল স্নিগ্ধ তরুলতা। সকালবেলা শিশিরভেজা ঘাসের গন্ধ যে কি অপূর্ব তা কি জানেন আপনি যমরাজ! প্রথম বৃষ্টির দিনে ভিজেমাটির গন্ধ। ভাবতে গেলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। এই আমি



আমি চেয়েছিলাম চাষী হতে···

শহরের এই জনারণ্যে অবিরাম কোলাহলের মধ্যে ইটের কোটরে বসে পুরনো পুঁথি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি।

যমরাজ। তুমি বেগুনের চাষ করলে পৃথিবীর মস্তবড় ক্ষতি হ'ত, রুশ সাহিত্যে বাংলার প্রভাব যে কতখানি তা কেউ জানতে পেত না।

মলিন। ক্ষতি হ'ত না কারণ মানুষের জ্ঞান আর এক দিক দিয়ে বেড়ে যেত, কেন না তখন আমার লিখবার বিষয় হ'ত পেকুর পেয়ারায় বাংলার জলবায়ুর প্রভাব।

যমরাজ। যা হতে পারত বা হলে ভাল হ'ত তা ভেবে শেষ সময়ে দুঃখ করাটা জ্ঞানীর লক্ষণ নয়।

মলিন। খুব সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে দুঃখের চেয়ে রাগটা হচ্ছে আমার বেশী। আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর কিছু একটা নিষ্ঠুর কিছু করতে। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সামনের দেয়াল থেকে ভাল ফ্রেমে বাঁধান একখানা বড় ছবি খুলে এনে) আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা ভায়সঙ্গত কিছু করতে (ছবিখানা মলিন ছুড়ে ফেলে দিলে—ঝন্ ঝন্ করে সেখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল)।

যমরাজ। তোমার মাথা কি সত্যিই খারাপ হয়ে গেল, অমন সুন্দর ছবিখানা নষ্ট করে ফেললে?

মলিন। নিশ্চয় সুন্দর ছবি—পাঁচ বছর ধরে রোজ শুনছি সুন্দর ছবি! ছবিটা কার আঁকা জানেন যমরাজ? বিখ্যাত শিল্পী বিশ্বম্ভরের আঁকা। বাংলার রসিক-সমাজের মতে ছবিখানা শিল্পীর এক অনবদ্য, অতুলনীয়, অপূর্ব অনুপম সৃষ্টি। ছবিখানা যেদিন থেকে ঘরে টাঙিয়েছি সেদিন থেকে আমিও এক জন রসিক হয়েছি, শিল্পের সমঝদার হয়েছি। না হয়ে উপায় নাই যমরাজ। অনেকে যাকে ভাল বলে তাকে ভাল বলতেই হবে নইলে রসিক-সমাজে অচল হতে হবে। (ভাঙা ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে) অপূর্ব! অনির্বচনীয়!

যমরাজ। কাজটা সুচারুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

মলিন। শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যমরাজ, কেন না পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিন ওকে গুঁড়ো করে ফেলতে আমার ইচ্ছে করছে। ঐ ছবিটা সম্বন্ধে আমার নিজের মত—খাঁটি

মত—শুনতে চান যমরাজ? এখন আমি নির্ভয়ে বলতে পারি কেননা আশেপাশে রসিক জন কেউ নাই। আমি বিচার করে দেখেছি, ছবিখানা হচ্ছে এক অপক্ক, অকিঞ্চিৎকর, অনর্থক, অভদ্র সৃষ্টি। (খুব খানিকটা হেসে নিয়ে) পাঁচ বছরের মাথা-ধরা এক মুহূর্তে ছেড়ে গেল।

যমরাজ। ওর জন্যে এত পরিশ্রম না করলেও চলত, কেন না তিনটে বেজে সাত মিনিটের সময় তোমার মাথাধরা আপনিই ছেড়ে যেত।

মলিন। তিনটে বেজে সাত মিনিট—তাই তো—তিনটে বেজে সাত মিনিট, রমার সঙ্গে বুঝি আমার আর দেখা হবে না। যমরাজ, আমি যে আমার স্ত্রীকে একবার দেখতে চাই।

যমরাজ। আমি আপত্তি করব না।

মলিন। সে যে কাছে নাই, শ্যামবাজার পর্যন্ত ছুটে যাবার মত যথেষ্ট সময় কি আছে?

যমরাজ। চেষ্টা করে দেখতে পার।

মলিন। সেখানে যাওয়াটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে? দুর্ঘটনা যদি সত্যিই ঘটে তাহলে এখানেই ঘটুক, আমার মৃত্যু আমার বাড়ীতেই হোক। রমাকে আমি ফোনে ডেকে পাঠাই—সে ছুটে আসুক, যদি আমাকে সে দেখতে চায় তাহলে ছুটে আসুক। (ফোন তুলে নিয়ে) হ্যালো, হ্যালো, ফোর এইট ফোর নাইন বড়বাজার প্লীজ, প্লীজ। হ্যালো, হ্যালো, কে? কে তুমি? দেখো—রমাকে ডেকে দাও শীগ্‌গির, হ্যাঁ—রমা-কে। হ্যালো, হ্যালো, কে? রমা? শোনো রমা, তোমাকে এখানে আসতে হবে—এখুনি আসতে হবে—এক সেকেণ্ড দেরি না করে আসতে হবে। কারণ? কারণ নাই বা শুনলে, শুনলে হয় তো তোমার অবস্থা এমন হবে যে আসতেই পারবে না। কি বলছ—অসুখ কিছু করেছে কি না? অসুখ করে নি—বেশ সুস্থই আছি। তবে কেন আসতে হবে? তর্ক ক'রো না রমা, কথা শোন, শীগ্‌গির চলে এস। আসতে পারবে না? তবে শোন কেন তোমাকে আসতে হবে—আমি মরব। কি বলছ—আত্মহত্যা—করতে যাচ্ছি কি না? মোটেই না—স্বাভাবিক ভাবেই আমার মৃত্যু হবে—স্বয়ং যমরাজ আমার সামনে দাঁড়িয়ে। জানতে চাও আমি নেশা করেছি কি না? হায় রমা, এটা কি রহস্য করবার সময়! শোন রমা, তিনটে বেজে সাত মিনিটের সময় আমার মৃত্যু হবে, আর তো সময় নেই—তুমি এস—ছুটে এস। কি বললে? (সশব্দে ফোন রেখে) এও কি সম্ভব!

যমরাজ। কি বললেন তোমার স্ত্রী?

মলিন। বললেন আসতে পারবেন না কারণ তিনটে বেজে সাত মিনিটের সময় তিনি চিড়িয়াখানায় হাতীর বাচ্চা দেখতে যাবেন।

যমরাজ। রাগ ক'রো না—তোমার স্ত্রী মোটেই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে তুমি আর কয়েক মিনিট পরে মরবে।

মলিন। অবিশ্বাস! মৃত্যুতে অবিশ্বাস! প্রতিনিয়ত দেখছি দিন নাই, রাত্রি নাই, যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু এসে প্রাণকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে—তবু মৃত্যুতে অবিশ্বাস!

যমরাজ। তোমারই কি বিশ্বাস হয়েছিল বৎস! হয় তো একটু অবিশ্বাস এখনও অবশিষ্ট আছে।

মলিন। মরতে যে ইচ্ছা হয় না যমরাজ তাই অবিশ্বাস করি।

যমরাজ। শুনতে পাই মানুষ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আশ্চর্য্যরকম উন্নতিলাভ করেছে—অনেক কাজ যা অতীতে অসম্ভব ছিল বা অত্যন্ত কঠিন ছিল তা আজকাল সম্ভব ও সহজ হয়েছে; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমার কাজ যে একটুও সহজ হ'ল না। সৃষ্টির সুরু থেকে যে টানাটানি, চিৎকার চেঁচামেচি আজও তা পুরোমাত্রায় চলছে।

মলিন। আপনি কি বলতে চান বিংশ শতাব্দীতে আপনার অভ্যর্থনার ধরণ বদলে যাওয়া উচিত ছিল!

যমরাজ। তাই তো বলতে চাই।

মলিন। কথাটা ভাববার মত। তা হলে কেমন হ'ত—এই ধরুন যদি আমরা আপনাকে শঙ্খ বাজিয়ে ফুল চন্দন দিয়ে অভ্যর্থনা করতুম, সহর্ষে বলতুম, "হে ধর্মরাজ, আপনার আগমনে আমাদের গৃহ পবিত্র হয়েছে—আমাদের ঘরে বৃদ্ধ যুবা শিশু স্ত্রী ও পুরুষ যে ক'জন আছে তাদের মধ্যে আপনি যাকে চান তাকেই আমরা আপনাকে নিবেদন করছি, আপনি কৃপা করে গ্রহণ করুন।" তার পরে আপনি আপনার নৈবেদ্য নিয়ে প্রস্থান করলে আমরা আবার সানন্দে যে যার কাজে ব্যস্ত হতুম।

যমরাজ। তাতে উভয় পক্ষেরই ভাল হ'ত।

(ঘড়িতে সশব্দে তিনটে বাজল)

মলিন। (চমকে উঠে) তিনটে বাজল—আর মাত্র সাত মিনিট আমার জীবন, আর মাত্র সাত মিনিট! (সামনে এগিয়ে এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে) হে পৃথিবী, হে আকাশ, সূর্য, চন্দ্র, আলো, ছায়া, বৃষ্টিভেজা মাটির গন্ধ—বিদায় বিদায়। (স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল)

যমরাজ। অমিতা কে?

মলিন। (চমকে উঠে) কোন অমিতা?

যমরাজ। এই মাত্র যাকে মনে মনে স্মরণ করছিলে সেই অমিতা।

মলিন। (লজ্জিত ভাবে) ওঃ, আপনি যে অন্তর্যামী সে-কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। অমিতা হচ্ছে—অবশ্য কিছু হয় না, ওকে আমি ভালবাসি।

যমরাজ। (হেসে) এরা সবাই দেখছি এক রকম!

মলিন। (হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে) উঃ—বুকের ভিতরটা হঠাৎ এমন করে উঠল কেন! (ব্যস্তভাবে) সেই ওষুধটা কোথায়, ডাক্তার রায়ের সেই ওষুধটা! (দেরাজ থেকে ওষুধ ও গেলাস বার করে) এক মাত্রা খেয়ে ফেলি—(ওষুধ ঢালতে ঢালতে) কোথায়—আর তো কিছু বোধ হচ্ছে না, (হেসে) খুব ভয় পেয়েছিলাম। (ওষুধের গেলাস মুখের কাছে পৌঁছেচে এমন সময় হাত থেকে গেলাস পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মলিন লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়—সেই মুহূর্তে অদৃশ্য হলেন যমরাজ)।

ঘড়িতে তখন ঠিক তিনটে বেজে সাত মিনিট।

বাংলার কলকারখানা

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

গত ১৯০৫ সালের কথা মনে পড়ে। বাঙালীর আত্মচেতনা লাভ করার যুগ সেটা। দিকে দিকে কলকারখানা গড়ে উঠল, বিশেষ করে বাঙালী 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে' নেবার জন্য বস্ত্রশিল্পের দিকেও দৃষ্টি দিলে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালী যে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার জন্য চেষ্টা করে আসছে তার হিসেব করলে জাতির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলেই মনে হবে। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। নানা রকম মিশন, প্ল্যান, কত কথাই আলেয়ার মত আমাদের সামনে জ্বলছে—কিন্তু দৃষ্টির ধাঁধাঁ কাটিয়ে আমরা যদি ভবিষ্যতের দিকে তাকাই তাহলে সেটা কি অন্ধকারময় মনে হবে না?

গেল মন্বন্তরের মত চলছে যে বস্ত্রদুর্ভিক্ষ, সেটাও মানুষের সৃষ্ট—সেটা অবিশ্বাস করার কারণ নেই। সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। কারখানার মালিকগণ যদি বলেন, গবর্ণমেণ্টের কাছে তাঁদের হাত-পা বাঁধা, তাও স্বীকার করব। তবু প্রশ্ন উঠবে—ভবিষ্যতে তাঁরা কি করবেন? সেদিন বেশী দূর নয়, যখন বিদেশী বস্ত্রে দেশ ছেয়ে যাবে, শুধু বস্ত্র নয়—নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসে। জনসাধারণ সবই বরণ করে নেবে কোন কিছু না ভেবে। গবর্ণমেণ্ট কিছু সাহায্য করেন নি বা করছেন না, সে কথা কেউ তখন শুনবে না। তাই কারখানার মালিকদের এখনই ভাবতে হবে, অন্তত এমন কতকগুলো পরিকল্পনাকে এখন থেকেই কার্যকরী করতে হবে চেষ্টা করলে মালিকগণ যা নিজেরাই পারেন। সে বিষয়েই কিছু বলতে চাই।

১। সব রকম কারখানার মালিকদের মিলে একটি প্রচার-সংঘ গঠিত করতে হবে। স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের জন্য জোর আন্দোলন চালাতে হবে। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে দেশী জিনিস ব্যবহার না করলে ভবিষ্যতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা কি দাঁড়াবে। যুদ্ধের সময় কি কি কারণে তাঁরা সব রকম শিল্পদ্রব্য সরবরাহ করতে পারেন নি। যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে এই স্বদেশীগ্রহণের প্রচারকার্য্য চালাতে হবে। এতে সকলেরই সহানুভূতি পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিলাসীদেরও প্রশ্রয় দেওয়ার সার্থকতা থাকে তখন—যখন বিলাস-ব্যসনের প্রত্যেকটি উপকরণ হয় স্বদেশী।

২। সুতা বা কাপড়ের কলের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য আবার কুটিরশিল্পকে জাগিয়ে তোলা। হস্তচালিত তাঁতশিল্প ধ্বংসপ্রায়। চোখের উপর আমরা দেখছি, যে সূক্ষ্ম কাজ-বংশানুক্রমে তাঁতীরা বাঁচিয়ে রাখছিল তা লুপ্ত হতে বেশী দেরি নেই। এঁদের সুতা-বণ্টনের ভার প্রথমে নিতে হবে—তার পর অন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আশ্চর্য, গবর্ণমেণ্ট এই তাঁতীদের প্রতি রহস্যজনক ভাবে উদাসীন।

৩। কারখানার বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ আমদানি করার ব্যবস্থা করা এখনই প্রয়োজন। দেশী লোক [illegible]

কোন প্রশ্ন ওঠা ঠিক নয়। নূতন ধরণের কাজ আদায় বা শিল্প ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের বিশেষজ্ঞ চাই। নূতন ধরণের কলকব্জার তো দরকার আছেই। এ বিষয়ে মালিকদের আরও আগ্রহশীল হওয়া প্রয়োজন।

৪। শ্রমিকদের কর্ম-ব্যবস্থার গতানুগতিক ধারাকে উন্নত স্তরে নেওয়া। প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে শ্রমিকদের শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষাদাতা বা ইনস্ট্রাকটার নিযুক্ত করা। শ্রমিকদের মনোভাবকে কারখানার অনুকূলে আনতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে যে তারা দেশের জন্য, দেশকে বাঁচাবার জন্য কাজ করছে। মালিক-শ্রমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব অবিলম্বে বিলুপ্ত করা দরকার। এ বিষয়ে মালিকদের দায়িত্ব বেশী। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক্—শ্রমিকেরা অন্যায় দাবি করে, তাদের দাবি মেটানো সম্ভব নয় সব সময়। কিন্তু কেন সম্ভব নয় এ কথা তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। শ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে মানতে হবে। প্রতিনিধিদের সঙ্গে অসংকোচে আলোচনা চালাতে হবে। দাবি মেটাবার পেছনে নিছক ভাঁওতা না থাকলে শ্রমিকের মনোভাব মালিকদের অনুকূলে প্রভাবিত করা একটুও অসম্ভব নয়। শ্রমিকদের মধ্যে যদি ধারণা থাকে যে তারা যে পরিমাণে খাটছে, এর বেশী খাটলেও মজুরি যা আছে তাই থাকবে, তাহলে সেটা উৎপাদনবৃদ্ধির অত্যন্ত অন্তরায়। উৎপাদন না বাড়ালে ভবিষ্যতের ফল ভাল হবে না জানা কথা। সুতরাং শ্রমিকদের মধ্যে এ ধারণা আনতে হবে যাতে তারা মনে করে পরিশ্রমের মজুরি তারা পাবেই। উপযুক্ত মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে—যেটা সাধারণত কারখানাগুলোতে নেই। সবকিছু স্বীকার করে দোষত্রুটি শোধরাবার সময়ই এটা। উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে মন দিলে—এদিকেই আগে নজর দিতে হবে।

৫। যন্ত্র বা উৎপাদন-দ্রব্যের মধ্যে উন্নত ধরণের কোন কার্য-প্রণালীর সন্ধান যদি কোন শ্রমিক দিতে পারে তবে তাকে পুরস্কৃত করতে হবে। শ্রমিক যদি জানে যে ভাল কাজে ভাল ফল আছে, পদোন্নতি আছে, তবে কেন কলকারখানার উন্নতি হবে না? কেনই বা উৎপাদনবৃদ্ধি হবে না? দেখা গেছে, কোন কিছু শ্রমিক দ্বারা আবিষ্কৃত হলে উপরিতন কর্মচারী সে বাহাদুরি কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি করেন।

শ্রমিকের মনোবল অক্ষুন্ন রাখতেই হবে। তাকে বুঝতে দিতে হবে—কারখানা তাদের, উৎপন্ন দ্রব্য তাদের। দেশের জন্য, দশের জন্য তাদের শ্রম। যা সত্য তা স্বীকার করতেই হবে। শ্রমিকদের মনোবল বা মনের প্রভাব কারখানার উপর অটুট রাখা ভবিষ্যৎ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান।

উপরিউক্ত কাজগুলোতে হাত দিলে কারখানার মালিকদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নততর পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যে বিশেষ সাহায্য হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য গবর্ণমেণ্ট কিছু সাহায্য করছেন না—এ [illegible]

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে লৌকিক দেবদেবী ও তাঁহাদের প্রভাব

শ্রীঅশোককুমার পালিত

সাহিত্যের ইতিহাসের যবনিকা উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগে প্রথম সাহিত্যের উন্মেষ হয়েছে ধর্ম্মকে ভিত্তি করে। আমাদের বাংলাদেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। প্রায় চার শতাব্দী আগেকার কথা যাকে আমরা প্রাক্‌চৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যপূর্ব্ব যুগ বলে থাকি, সে-যুগের সাহিত্যই এ কথার সাক্ষ্য দেয়। শত-সহস্র বাধা-বন্ধনের মধ্যেও একটা ধর্ম্মের ভাবুকতা সমগ্র জাতির জীবনকে তোলপাড় করে একটা স্বাধীন যু জীবনের সন্ধান দিয়েছে। এই ভাবধারাই সে-যুগের কবিদের 'বাস্তব জীবনে'র সঙ্গে 'ভাবুকতা'র একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধনে সক্ষম করেছিল দেখতে পাওয়া যায়। আর এই জন্যেই তাঁদের 'বাস্তব কবি' বা realistic poet বললে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। কারণ তাঁরা সাধারণ গার্হস্থ্য-জীবনের বেদনা ও ব্যথার, আশা ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রগুলিকে চয়ন করেই সেকালের সাধারণ বাঙালীর জন্যে তাঁদের কাব্যের অর্ঘ্য সাজিয়েছিলেন। এঁদেরই রচিত কয়েকটি বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ থেকে আমরা সেকালের দেবদেবীর সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করতে চেষ্টা করব আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেখতে হবে সেকালের বাংলা সাহিত্যে এই সব দেবদেবীর প্রভাব।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশের জনসাধারণ লৌকিক পূজার প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তা বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবতে' আমাদের জানিয়েছেন—

"ধর্ম্ম কর্ম্ম করে সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন্ জনে।"

সম্ভবতঃ সামাজিক জীবনে আমরা যখন অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম তখন বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের লৌকিক দেবতা-সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। 'দক্ষিণ রায়', 'শিবঠাকুর', 'শীতলা', 'মনসা', 'সত্যপীর', 'মঙ্গলচণ্ডী', 'অন্নপূর্ণা' প্রভৃতি প্রাচীন বাংলার লৌকিক দেবদেবী। সেকালে এই দেশ যখন শ্বাপদসঙ্কুল ও অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, তখন আত্মরক্ষার জন্য মানুষকে হিংস্র ব্যাঘ্রাদি পশুর সহিত নিয়তই যুদ্ধ করতে হ'ত। তাই বোধ করি ব্যাঘ্রের দেবতা 'দক্ষিণ রায়ে'র সৃষ্টি হয়েছিল। কবি কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' কাব্য থেকে জানা যায় 'দক্ষিণ রায়' কবিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন—

"বাঘ পীঠে আরোহণ এক মহাজন॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার।"

তৎকালে 'শিবঠাকুর' বৈদিক সংহারের দেবতা রুদ্রদেব বা পৌরাণিক মহাদেব ছিলেন না। ইনি সেকালে 'কৃষাণ দেবতা' রূপে বঙ্গীয় কৃষক-সমাজে স্থান পেয়েছিলেন দেখতে পাই। 'শূন্যপুরাণ' পরমেশ্বর ও কবীন্দ্রের 'শিবায়ন' কাব্যগ্রন্থ এক্ষেত্রে স্মরণ করবার বিষয়। 'শূন্যপুরাণে' 'শিব'কে দেখি আদর্শ কৃষক রূপে—

"ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈষাণ বলে ভাল।
চারিদণ্ডে চৌদিগ চৌরস করে চাল॥
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরা হল ধান।
হাঁটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভ নিড়ান॥"

এদিকে আবার 'শিবায়নে' হরগৌরীর পারিবারিক জীবনটি দেখুন। পার্ব্বতী শাঁখা পরবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শিব উত্তর করলেন—

"বাপ বটে বড়লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥"

নারীজাতির স্বভাবতঃ একটুতেই অভিমান হয়। এ রকম অবস্থায় সাধারণ নারী যা করে থাকে পার্ব্বতীও তাই করলেন—ক্রোধভরে পিত্রালয়ে চলে গেলেন—

"দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়।
কাস্তসনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়।"

নারী-স্বভাবসুলভ চপলতার কাছে পুরুষকে চিরকালই হার মানতে হয়েছে। শিবও মানিনীর মানভঞ্জন করতে চললেন।

"গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পাছু পাছু।
শিব ডাকে শশীমুখী শুনে নাই কিছু॥
নিদান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়।
আর গেলে চণ্ডিকা আমার মাথা খাও॥"

সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর যা হয়ে থাকে তা আহরণ করেই কবিরা সেগুলো দেবদেবীর চরিত্রে আরোপ করেছিলেন। তাই এই সকল দেবদেবী স্বর্গরাজ্য থেকে মর্ত্ত্যে অবতরণ করে প্রত্যেক বাঙালীর আঙিনায় এসে সমবেত হয়েছিলেন—সাধারণের ওপর তাঁদের 'অহেতু করুণা' ও 'অকারণ নিগ্রহ' ঢেলে দিতে। তাই এ চিত্র সে-যুগের বাঙালী সংসারের চিত্র।

লৌকিক ভীতি ও রোগশোক নিবারণার্থ 'বিস্ফোটক-জ্বর-পীড়িত' ও 'সর্পসঙ্কুল' বঙ্গদেশে 'শীতলা' ও 'মনসা' দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। দৈবকীনন্দন কবিবল্লভের শীতলা-মঙ্গলে 'শীতলা দেবী'র রূপ লক্ষ্য করুন—

"বাম হাতে হেলা মুণ্ড উলুক বাহন।"

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 'মনসামঙ্গল কাব্য' একটি উৎকৃষ্ট দান। বেহুলা ও চাঁদসদাগরের কাহিনী আজও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে জীবন্ত হয়ে আছে। বেহুলার চরিত্র আঁকতে গিয়ে 'মনসাকাব্যে'র কবি বাংলার নিভৃতে অন্তঃপুরিকাদের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। 'মনসাদেবী'র কোপে পড়িয়া কিরূপে চাঁদের ছয় পুত্র বিনষ্ট হয়, চৌদ্দ ডিঙা সমস্ত ধন-সম্পত্তি লইয়া জলমগ্ন হয়—সে কাহিনী হয় তো কাহারও অবিদিত নেই।

তারপর ধর্ম্মজ্ঞানে যখন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর একটা ঐক্যের ভাব এসেছিল, তখন তারই ফলস্বরূপ 'সত্য-পীরে'র পূজা হিন্দু-মুসলমান জাতিনির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রচলন হয়েছিল। এই দেবতা ফকিরি আলখাল্লা ব্যবহার করলেও 'হরিঠাকুর' নামে ইনি হিন্দুদের কাছে পূজা পেয়েছিলেন। কবি জয়নারায়ণ 'হরিলীলা' নামক কাব্যে সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীকাব্য' ও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গল' প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এটা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গলে' চণ্ডীর সহিত পশুদের কথোপকথন বৃত্তান্তটি পাঠ-কালে চণ্ডীর চরিত্রে যে করুণার পরিচয় পাওয়া যায়, তা আর অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'অন্নপূর্ণা' স্নিগ্ধ মাতৃমূর্ত্তির প্রতীক। আমরা 'অন্নদামঙ্গলে'র অন্নপূর্ণাকে একবার দেখিয়া লওয়া যাক,—

"বসিলেন অন্নপূর্ণা মূরতি ধরিয়া॥
মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে।
দুই হাতে পানপাত্র রত্নহাতা লয়ে।"

অন্নপূর্ণার এই রূপ মাতৃত্বের আলোকে উদ্ভাসিত অন্নদাত্রী করুণাময়ী অন্নদাত্রী রূপ।

'অন্নদামঙ্গল' পড়তে বসে আমরা দেখতে পাই মহাযোগী মহাদেবের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হয়ে উঠেছে, শিশুর দল চারদিক থেকে এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।—

"কেহ বলে জটা হইতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥"

এদিকে আবার ভারতচন্দ্র 'মেনকা'র বিকৃত রূপটিও অঙ্কিত করেছেন,—

"ধরে গিয়ে মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয়।
হাত নাড়ি গলা ছাড়ি ডাক ছেড়ে কয়॥
ওরে বুড়া আঁটিকুড়া নারদ অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥"

এমনই ভাবে দেখতে পাওয়া যায় সেকালের বাংলাদেশের কবিরা পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীগুলোকে মিশিয়ে তাঁদের ধর্ম্ম সাহিত্যের মালমশলা সংগ্রহ করেছিলেন আর এই জন্যেই সে-যুগের সাহিত্যে এই সব লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব এত স্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান।

প্রিয়ার প্রতি

শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

আকাশের দেশে বাতাসের আজ দারুণ ভিড়,
পৃথিবীর সব জমানো অনেক দীর্ঘশ্বাস।
স্বপনেরা মৃত। মনে তাই তার জেগেছে ত্রাস···
বলিবার ভাষা ছিল কিছু যাহা হ'ল বধির।
প্রণয়ী মেঘেরা ছুটে আসে তাই। মধুর মেঘ।
বাসনা-মুখর নব স্বপ্নের দৃষ্টি নত—
করিবারে দূর পৃথিবীর ব্যথা যা' আছে যত।
প্রেমের মরণে হাসে ভুঁইচাঁপা। জীবনবেগ

অশান্ত আজ, তবুও পৃথিবী ক্ষুধাকাতর।
প্রণয়ের ক্ষণ শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন।
যেই বন্ধন ছিল এত দিন হোক বিলীন।
এ মাটির বুকে নতুন করিয়া উঠুক ঝড়।

মেঘের নয়ন হ'তে নেমে এল অশ্রুধারা—
সন্ধ্যায় দেখি পুনঃ ছুটে এল সন্ধ্যাতারা।

দূরে ডাকে রৌদ্রাভ পৃথিবী

শ্রীকরুণাময় বসু

আবার যেতেছি ফিরে গ্রামান্তের মেঠোপথ বেয়ে
নিঃশব্দ গোধূলিতলে ধূসরিত পথতরুছায়;
দু-একটি তারা-পরী ক্লান্ত চোখে যেন আছে চেয়ে,
বিষণ্ণ হৃদয় মোর, মন কোথা লয়েছে বিদায়।
এই পথ, এই গ্রাম, জনহীন শ্যামল প্রান্তর,—
চঞ্চল বসন্ত বায়ু, ওই দূর গৃহদীপখানি
ছিল কত পরিচিত, তাই মোর ব্যথিত অন্তর;
স্মৃতি যত ম্লান হ'ল, মৌন হ'ল হৃদয়ের বাণী।
এখনি ফিরিতে হবে, লৌহবর্ত্মে ছুটে যাবে ট্রেন,
দিগন্তবিস্তীর্ণ পথ পড়ে আছে অজগর প্রায়;
ডুবন্ত জাহাজে কোথা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাজে সাইরেন,
নিঃশব্দ বিস্মৃতিতলে দলে দলে মানুষ হারায়।
মেঘের সমুদ্রতীরে ঘুম যায় চাঁদের কুমারী,
আমি দেখি ক্লান্ত মনে জীবনের ভাঙা জানালায়,
কিশোর কল্পনাগুলি তারা হয়ে ফুটেছে বিথারি
ধূসর স্মৃতির নভে; দিন আসে দিন চলে যায়।
সময় হয়েছে মোর, দূরে ডাকে রৌদ্রাভ পৃথিবী;
পিছনে রয়েছে পড়ে খেলাঘর, আমন্ত্রণ-লিপি।

ঔপনিবেশিক সমস্যার বর্ত্তমান রূপ

শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়

সাম্রাজ্যলিপ্সার মূলে কিসের প্ররোচনা কাজ করে তা নিয়ে নানা মতামত প্রকাশিত হয়েছে। যে-সব দেশে যুগোচিত শিল্প প্রসার লাভ করে নি সেগুলো আত্মসাৎ করে নিজের দেশে উৎপাদিত মালের জন্ত বাজার তৈরী করা এবং আত্মসাৎ করা দেশের কাঁচামাল অল্প দামে কিনে পাকা মাল তৈরি করে সেই মাল অনেক বেশী দামে সব দেশে ও বিদেশে বিক্রয় করা, এই সব হ'ল সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ধর্ম্ম। অনেকে বলেন নিজের দেশের বর্দ্ধিত লোক সংখ্যার জন্ত বাস করবার জায়গা আবিষ্কার করা সাম্রাজ্যবাদের আর একটি ধর্ম্ম যাকে হিটলার বলেছেন "লেবেন্সরম্"।

বাজার হিসাবে উপনিবেশের যোগ্যতা কতটুকু ?

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে উৎপাদিত মাল বিক্রয় করার বাজার যে-কোনও দেশে পাওয়া যায় এবং তার জন্ত মধ্যযুগীয় উপনিবেশের প্রয়োজন হয় না। আজও ব্রিটেনের বাণিজ্য বিনিময় (এবং অর্থাগম) অন্তান্ত স্বাধীন দেশের সঙ্গে যতটা হয় তার চেয়ে অনেক কম হয় তার সমগ্র সাম্রাজ্যের সঙ্গে। কাঁচামালও অন্তান্ত স্বাধীন দেশ থেকে যথেষ্ট পাওয়া যায়। আসলে সব সময়ই দেখা যায় যে প্রচুর বাড়তি উৎপাদিত মাল পড়ে থাকে যা বিক্রয় করা যায় না। তারপর বাড়তি লোকের বাস করবার জায়গার যে দোহাই দেওয়া হয় সেটাও বাজে। কারণ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অনেক জায়গাই ইউরোপীয়দের পক্ষে বাসযোগ্য নয়; তাছাড়া স্বাধীন বিদেশী রাজ্যে উপনিবেশের চেয়ে অনেক বেশী টাকা উপায় করা যায়। তবে আসল ব্যাপারটা কি ?

সাম্রাজ্যবাদের বর্ত্তমান প্রেরণা মূলধন রপ্তানী

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে সাম্রাজ্যবাদের বর্ত্তমান প্রধান প্ররোচনা সাধারণ উৎপাদিত মালের বাজার তৈরী করা নয়। সেটা হচ্ছে গৌণ। আসল হচ্ছে মূলধন খাটিতি, তাই সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের এমন একটি বিশেষ অবস্থা যখন প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলোয় একচেটে ব্যবসা বেশ জেঁকে ওঠে। পুঁজিতন্ত্রের প্রথম যুগে কলকারখানা-গুলো সেরকম বড় ছিল না। অংশীদারদের এক একটি ছোট ছোট দল অল্প পুঁজি খাটিয়ে আলাদা আলাদা কারখানা খুলত এবং মাল উৎপাদন করত। ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে কলকব্জার যত উন্নতি হতে লাগল, উৎপাদনের হার যত বাড়তে লাগল, মূলধনের দরকার হয়ে পড়ল তত বেশী। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত মালের বাজারও বাড়তে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল মূলধনের মাত্রা। বড় বড় কোম্পানী-গুলো নূতন আবিষ্কৃত উপায়ে বেশী মাল অল্প সময়ে উৎপাদন করতে পারায় ছোট ছোট কোম্পানীগুলোর চেয়ে অনেক সস্তায় মাল বাজারে ছাড়তে লাগল। ফলে ব্রিটেনের মত দেশে কুটিরশিল্প এবং ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট কলকারখানাগুলো লালবাতি জ্বালতে লাগল। আস্তে আস্তে দেশের শিল্প-ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে একচেটে ব্যবসার রূপ নিলে। শিল্পজগতে স্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থানে একচেটিয়া বৃক্ষ রোপণ করা হ'ল।

ফাইনান্স ক্যাপিট্যালের রাজত্ব

এইভাবে আমেরিকা, জার্ম্মানী ও ব্রিটেনে একচেটিয়া ব্যবসার অক্ষুণ্ণ প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হ'ল গত মহাযুদ্ধের আগে। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টীল কর্পোরেশন, ব্রিটেনের ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল, জার্ম্মানীর ক্রুপ্ ইত্যাদি একচেটিয়া কোম্পানী গবর্ণমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে (তারাও আবার গবর্ণমেন্টকে বাঁচিয়ে রাখে) একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলে। এদের কারুরই প্রাথমিক মূলধন দশ কোটি টাকার কম ছিল না। ব্যাঙ্কের মূলধন শিল্পের মূলধনের সঙ্গে মিশে গিয়ে তার নাম হ'ল "ফাইনান্স ক্যাপিট্যাল"। তার কারণ ব্যাঙ্কের মালিকেরা একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতিরাও ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনতে লাগল। ফলে বড় বড় পুঁজিপতিরা ব্যাঙ্কার বা শিল্প-পতি যে ভাবেই অর্থনৈতিক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোন না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা হয়ে উঠলেন "ব্যাঙ্ক তথা শিল্পপতি"। আস্তে আস্তে জমীদারেরাও তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাল। এক একটি বড় ব্যাঙ্ক একটি বিশিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার (loan) দিতে লাগল অর্থাৎ ব্যাঙ্কের মূলধন শিল্পে খাটতে লাগল। অন্ত অন্ত ছোটখাট কোম্পানী সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে মাল অর্ডার দেবে এই শর্ত্তে তাদেরও টাকা ধার দিতে লাগল। এই ভাবে কতক-গুলো বিরাট্ "ব্যাঙ্ক তথা শিল্পপতি" দেশের সমস্ত শিল্প জগতের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠল। তাঁরাই আইনের দ্বারা পুঁজিপতিদের গণতন্ত্র (অর্থাৎ পুঁজিপতিদের অবাধ স্বাধীনতা) স্থাপন করে ইচ্ছামত পার্লামেন্টকে ভাঙতে গড়তে লাগলেন। এক কথায় তাঁরাই নেপথ্যে থেকে তাঁদের নির্ব্বাচিত গবর্ণমেণ্ট দিয়ে দেশ শাসন করতে লাগলেন। টাকার দাম বাড়িয়ে, কমিয়ে এবং আরো নানা উপায়ে তাঁরা ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট গড়তে লাগলেন। দেশের সমস্ত সংবাদপত্র তাঁদেরই পুঁজি দিয়ে চলতে লাগল এবং ফলে দেশের জনসাধারণকে সেইসব কাগজের মারফৎ নেপথ্যে থেকে তাঁরা যেদিকে ইচ্ছা পরিচালিত করতে লাগলেন।

প্রথমে ব্রিটেন ল্যাংকাশায়ারে তৈরি কাপড় উপনিবেশ এবং অন্তান্ত দেশে বিক্রয় করে কাঁচামাল এবং খাত্ত সেই সব দেশ থেকে কিনত। কিন্তু একচেটিয়া পুঁজিপতিদের যখন আধিপত্য হ'ল তারা দেখলে যে মূলধন রপ্তানী করতে পারলে অর্থাৎ বিদেশে মূলধন খাটাতে পারলে সুদ হিসাবে প্রচুর টাকা পাওয়া যায়, তখন তারা তাদের উপনিবেশে নূতন কোম্পানী, রেল কোম্পানী, খনি ইত্যাদি তৈরি করে সেগুলোকে চালাবার জন্ত মূলধন দিতে লাগল। পুঁজি-পতিরা ব্যাঙ্কের মালিক রূপে টাকা দিতে লাগল এই শর্ত্তে যে কোম্পানীর প্রয়োজনীয় সমস্ত মাল (যেমন ইঞ্জিন, রেল,

ইত্যাদি) সেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে তৈরি করাতে হবে। অর্থাৎ পুঁজিপতিরা তখন শিল্পপতি রূপে কোম্পানীগুলোকে মাল বেচতে লাগল। ধার দেওয়া টাকার সুদ এবং বেচা মালের মুনাফা রাশীকৃত টাকা হয়ে তাঁদের ব্যাঙ্কে জমা হতে লাগল। এইভাবে নিত্যব্যবহার্য্য মাল রপ্তানীটা হয়ে গেল গৌণ; মুখ্যস্থান অধিকার করল মূলধন রপ্তানী।

আন্তর্জ্জাতিক 'কার্টেল'

তারপর ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশের (যেমন আমেরিকা, জার্ম্মানী, ব্রিটেন, জাপান) এই সব ব্যাঙ্কার তথা শিল্পপতিরা একসঙ্গে সমবায় প্রথায় সারা জগতের বাণিজ্য হস্তগত করতে উদ্যোগী হলেন। তারই ফলে হ'ল আন্তর্জ্জাতিক কার্টেলের সৃষ্টি।

ভাগ-বাঁটোয়ারার পরে নূতন সমস্যা

এইভাবে সারা জগৎটা ফাইনান্স ক্যাপিট্যালের রাজ্য হয়ে গেল। কোন্ সাম্রাজ্যবাদী দেশের ভাগে বিশ্ববাণিজ্যের কতখানি পড়বে তার একটা চুক্তি হয়ে গেল। কার ভাগে কোন্ অঞ্চলটা যাবে তা ঠিক হ'ল এবং মূল্যও ধার্য্য হ'ল। উনবিংশ শতাব্দীতে জগতে ফাইনান্স ক্যাপিট্যালের প্রভাবের বাইরে প্রায় আর কোন দেশ রইল না। আত্মসাৎ করা হয় নি এমন দেশ আর রইল না। সমস্ত মধ্যযুগীয় দেশগুলো কোন না কোন আধুনিক শক্তির উপনিবেশ হয়ে গেছে। দরাদরি ভাগ-বাঁটোয়ারা ট্যারিফ সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে। সুতরাং জগতে সম্রাজ্যবাদীদের নূতন বাজার আবিষ্কার করার চেষ্টার সেখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল, কারণ সব দেশই তো তারা আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে অন্য রকম। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্ম্মানী, জাপান ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ হওয়া তো দূরের কথা, ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তার কারণ কি ?

উৎপাদন শক্তির বৈষম্যে নূতন দ্বন্দ্বের সূচনা

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যশালী দেশের শিল্পোৎপাদন-পদ্ধতির এবং শক্তির পার্থক্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সব দেশের পুঁজিপতিরা নিজের দেশের উৎপাদন-শক্তি অনুযায়ী বিশ্ববাণিজ্যের অংশ আত্মসাৎ করেছিল। যার শক্তি যতটুকু বেশী অর্থাৎ যে যতটা শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বেশী আধুনিক হয়ে উঠেছিল এবং যার কাঁচামালের পরিমাণ যতটুকু বেশী সে ঠিক সেই অনুযায়ী বিশ্ব-বাণিজ্যে বেশী ভাগ বসিয়েছিল এবং অন্য দেশগুলো তাতে আপত্তি করে নি। কিন্তু তারপর ২০।২৫ বছর কেটে গেলে দেখা গেল সেই সব দেশের উৎপাদন-শক্তির যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। বৃটেনের চেয়ে আমেরিকা ও জার্ম্মানীর উৎপাদন শক্তি অনেক বেশী হয়ে গেল তাদের উন্নততর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে। তখন সেই দুটি দেশের শিল্পপতি অর্থাৎ পুঁজিপতিরা বিশ্ববাণিজ্যের আগেকার অংশটুকুতে আর সন্তুষ্ট [illegible] তাদের বর্দ্ধিত মূলধনকে খাটাবার জন্য তাদের আরো বেশী বাজার এবং বিশ্ববাণিজ্যের বেশী অংশ দরকার হয়ে পড়ে। তখন সেই সব অধিক উৎপাদনক্ষম দেশের উৎপাদনের মালিক ব্যাঙ্ক তথা শিল্পপতিরা পুরনো চুক্তিকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয়। তখন অন্য সাম্রাজ্যশালী রাষ্ট্রগুলো যদি সেই চুক্তিভঙ্গকে মেনে না নেয় তা হলেই বাধে যুদ্ধ। বিশ্ববাণিজ্যের নূতন করে ভাগ বাঁটোয়ারা করবার জন্য একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপুঞ্জের পুঁজিপতিরা আর একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপুঞ্জের পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে দেশের সমরশক্তিকে নিযুক্ত করেন। বেধে যায় যুদ্ধ। বাণিজ্য-সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়। যে পক্ষ জেতে সে বিশ্ববাণিজ্যের মোটা অংশ নিজের ভাগে রাখে এবং পরাজিত পক্ষকে শিল্পোৎপাদনের দিক থেকে যথাসম্ভব পঙ্গু করে ফেলার চেষ্টা করে, কারণ তা করতে পারলে বিশ্বের সমস্ত বাজারটাই তাদের হাতে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা চীৎকার করে, অমুক দেশের শিল্প ব্যবস্থা ধ্বংস না করলে সে আবার শান্তিভঙ্গ করবে, কারণ অমুক দেশের সকলেই অত্যন্ত ধাপ্পাবাজ। সুতরাং ওদের সকলকে কৃষিজীবী করে তুললে তবেই ওরা জব্দ হবে এবং ভবিষ্যতে জগতে আর যুদ্ধ হবে না। উক্ত দেশের সব সাম্রাজ্য কেড়ে নিয়ে কিছু আত্মসাৎ করা হয় এবং বাকিটাকে স্বাধীন (?) করা হয়, কারণ দুর্ব্বলের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার জন্যই বিজেতারা যুদ্ধে নেমেছিলেন! আসলে পরাজিত রাষ্ট্রকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করে সেখানে বিজেতা দেশের পুঁজিপতিরা মূলধন খাটাবার নূতন ক্ষেত্র করতে চান এবং পরাজিতের সাম্রাজ্যের দেশগুলোকে স্বাধীন করে সেখানে নিজেদের তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট বসিয়ে সেখানেও নিজেদের মূলধন খাটাবার নূতন ক্ষেত্র তৈরি করেন (ইউরোপের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এক একটি বড় রাষ্ট্রের তাঁবেদার এবং সেখানে বড় রাষ্ট্রের পুঁজিপতিদের টাকা খাটে)। এই ক্ষেত্র রক্ষা করার জন্যই ব্রিটেন গ্রীসে, বেলজিয়ামে, যুগোস্লাভিয়ায়, এবং লেভাঁতে জার্ম্মানী পরাজিত হবার আগেই আসল রণাঙ্গনকে উপেক্ষা করে মিত্রভাবাপন্ন ফ্যাসিবিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে। গ্রীসে ব্রিটেনের বহু টাকা খাটে। এইবার দেখা যাবে যে আধুনিক যুগে সাম্রাজ্যবাদের গণ্ডী তাহলে শুধু উপনিবেশগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; পাশ্চাত্য স্বাধীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের কবলিত হয়েছে। তাদের স্বাধীনতাকে তথাকথিত স্বাধীনতা বলা চলে, কারণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বৈজ্ঞানিক শিল্পোৎপাদন ক্ষমতার পার্থক্যমূলক ক্রমোন্নতিই তার কারণ। ধনতন্ত্র যত দিন থাকবে, একচেটিয়া প্রথায় পুঁজিতন্ত্র যত দিন আধিপত্য করবে তত দিন জগতের বাণিজ্যের নূতন করে ভাগাভাগি করার জন্য যুদ্ধ শেষ হতে পারে না, কারণ প্রত্যেক সাম্রাজ্যশালী দেশের উৎপাদনশক্তির উন্নতি হবে কিন্তু সাম্য হবে না। জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপানের যুদ্ধে নামার একমাত্র কারণই হ'ল এইখানে।

উপনিবেশ বাড়তি মুনাফার বাজার

আজকের দিনে উপনিবেশের অধিবাসীদের প্রভুজাতি

পুঁজিপতিরা শোষণ করে দুঃসহ দারিদ্র্য এবং দুঃখ-দুর্দ্দশায় থাকতে বাধ্য করছে। উপনিবেশে জীবিকা নির্ব্বাহের ধারা অতি নিম্নস্তরে। সেখানকার উৎপাদন-ব্যবস্থা এখনও আদিম যুগের মায়া কাটাতে পারে নি। ব্রিটেনে তৈরি যন্ত্রে প্রস্তুত এক গজ কাপড়ের জন্ত যতটা শ্রম এবং সময় লাগে তার চেয়ে অনেক বেশী লাগে ভারতবর্ষে এক গজ কাপড় হাতে চালান তাঁতে বুনতে। এক গজ বিলাতী কাপড়ের বিনিময়ে যদি এক গজ তাঁতের কাপড় বিলাতে চালান যায় তাহলে কতখানি শ্রম এবং সময় ভারতের পক্ষে লোকসান এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের পক্ষে লাভ হয় তা বেশ বোঝা যায়। ঠিক এইভাবে কাঁচামাল এবং ভারতে তৈরি অন্যান্য জি...স বিলাতে যায়। বিলাতে তৈরি এক গজ কাপড় বিলাতেই বিক্রয় করলে যা লাভ হ'ত তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয় ভারতে বিক্রয় করলে। তার উপর উন্নততর শিল্পনৈপুণ্য লাভের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে এণ্ড্রুয়্যান, যুল (Yule) প্রভৃতি পুঁজিপতিরা দু চার কোটি টাকা বাড়তি লাভ হিসাবে সঞ্চয় করেন।

পুঁজিবাদী দেশের লেবার পার্টির রূপ

বাড়তি লাভের টাকার কিছু অংশ পুঁজিপতিরা নিজেদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যারা উচ্চস্তরের (যেমন নিপুণ শ্রমিক, কারিগর, যন্ত্রবিৎ প্রভৃতি) তাদের দিতে বাধ্য হন। কারণ তাদের একটু আরামে না রাখতে পারলে উচ্চশ্রেণীর মাল পাওয়া যাবে না। ফলে এই উচ্চস্তরের শ্রমিকেরাও পুঁজিপতিদের উপনিবেশ শোষণে আপত্তি করা দূরে থাক, বরং সহায়তা করে। কারণ উপনিবেশ-শোষণলব্ধ বাড়তি লাভের টাকা থেকেই তারা অংশ পায়। ব্রিটেনে এরাই হচ্ছে পার্লামেণ্টের শ্রমিক দল। বেভিন, ম্যাকডোনাল্ড, এটলী প্রভৃতি এদেরই প্রতিনিধি। দরিদ্র শ্রমিকদের চোখে ধুলো দিয়ে এরা শ্রমিক আন্দোলনের নামে সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থ বজায় রাখে। বিলাতে 'বেভিনবয়' পাঠানর মূলে আছে কুৎসিত সাম্রাজ্যবাদী মতলব। এই বেভিনবয়রা হবে বিলাত-ফেরত কলের মিস্ত্রী যারা নিজের দেশের মজুরদের এবং মিস্ত্রীদের ছোট করে দেখতে শিখবে এবং মোটা টাকা রোজগার করবে। সত্যিকারের শ্রমিকসঙ্ঘ এক সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া কোথাও নেই।

উপনিবেশের দুর্দ্দশা

সাম্রাজ্যবাদের চরম উন্নতি আজ হয়েছে। যে-সব কুটির-শিল্প এবং অন্যান্য উপায়ে ঔপনিবেশিক দেশের লোকেরা জীবিকানির্ব্বাহ করত বিদেশী মূলধন সে-সব উপায়গুলোর গলা টিপে মেরেছে নানারকম অসাধারণ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে। ল্যাঙ্কাশায়ার মিলের উৎপাদিত মাল দেশীয় তাঁতীদের জীবিকানির্ব্বাহের পথ বন্ধ করে তাদের চাষী করে ফেলেছে। দলে দলে কুটির-শিল্পী এইভাবে চাষীতে পরিণত হয়েছে। ক্রমেই চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমে চাষের জমি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর টুকরো টুকরো জমিতে পরিণত হয়েছে। তার উপর করের ভার ক্রমশঃই বাড়ান হয়েছে। উপনিবেশে উৎপাদিত মালের দাম এত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে চাষীরা এবং অন্যান্য কুটির শিল্পীদের দুবেলা দুমুঠো ভাত পাওয়ার উপায়ও বন্ধ হয়েছে। ফলে কৃষক আন্দোলন ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। নগরে মজুরদের অসীম দৈন্য-দুর্দ্দশা এমন জায়গায় উপস্থিত হয়েছে যে দেশীয় পুঁজিপতিরা পর্য্যন্ত নিজেদের টাকার পুঁজি অবাধ ভাবে বাড়াবার পথে অত্যন্ত বাধা পাচ্ছেন। তাই বিড়লা, টাটা প্রমুখ শিল্পপতিরাও আজ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শাসন থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন। সঙ্গে সঙ্গে চাইছেন মার্কিন পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের পুঁজির পরিমাণ হু-হু করে বাড়িয়ে যেতে। আজ উপনিবেশগুলো এক অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে।

জাপানের পরাজয় চাই

একথা স্বীকার করতে হবে যে জাপানকে পরাজিত না করা পর্য্যন্ত এশিয়ায় স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে না। জাপানকে হারাবার ভিত্তিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় কায়রো বৈঠকে। সুতরাং কায়রো বৈঠকই ঔপনিবেশিক সমস্যার সমাধানের পথে প্রথম সোপান।

প্রাচ্যের মুক্তিতে ধনতন্ত্রের লাভ

আমেরিকাই যে জাপানবিরোধী যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করছে এবং করবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমেরিকা এত বড় যুদ্ধ করবে, এতটা ক্ষতি স্বীকার করবে কিসের জন্তে? একথা আজ প্রমাণিত যে আধুনিক শিল্প প্রসারের পথে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ব্যবস্থা সবচেয়ে বড় বাধা। স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না পেলে কোন দেশের পক্ষে শিল্পোন্নত হওয়া সম্ভব নয়। আমেরিকা আজকের সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পোন্নত দেশ। সুতরাং তার পুঁজি বৃদ্ধির জন্ত সবচেয়ে বেশী বাজার দরকার। কিন্তু জাপানকে হারাবার পর এশিয়ার দেশগুলোতে যদি আবার পুরনো প্রভুদের অধিকার কায়েম হয় তাহলে সে যুদ্ধে আমেরিকার এতখানি ক্ষতি স্বীকার করার তাৎপর্য্য কি? চাকরের মনিব বদলে বিশেষ কিছু আসে যায় না। যুদ্ধে এবং যুদ্ধের পরে এশিয়াবাসীর সহযোগিতার সুবিধা না নিতে পারলে প্রাচ্যের যুদ্ধে অযথা রক্ত ও শক্তিক্ষয় করে আমেরিকার পুঁজিপতিদের লাভ কি? এতে আমেরিকা শুধু ক্ষতিই স্বীকার করবে। যুদ্ধে জিতেও আমেরিকা তার পুঁজিবাদকে আরও উচ্চ স্তরে নিয়ে যাবার সুবিধা পাবে না। যুদ্ধে এশিয়াবাসীকে যোগদানে আহ্বান করলে (স্বাধীনতা দিয়ে) আমেরিকার ঘাড় থেকে যুদ্ধের বোঝাও অনেকটা কমত, সঙ্গে সঙ্গে মিত্রভাবাপন্ন স্বাধীন এশিয়ার শিল্পোন্নতিতে সাহায্য করার এবং সেই সঙ্গে নিজে নিজের পুঁজি বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ আমেরিকার আসত। স্বাধীন ভারত যে ব্রিটেনকেও যুদ্ধজয়ে অনেক বেশী সাহায্য করতে পারত তাতেও সন্দেহ নেই। ব্রিটেন নিজেও সে কথা জানে। তবু ব্রিটেনের এই অপরিবর্ত্তনীয় জিদের কারণ কি? এর একমাত্র কারণই হ'ল শক্তিশালী পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে রেষারেষি অর্থাৎ ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

অপ্রতিহত বিশাল শক্তিমান্ মার্কিন পুঁজিবাদ পাছে ব্রিটিশ পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদকে গ্রাস করে ফেলে সেই ভয়ে আজ ব্রিটেন ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা দিতে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। সে ভাবছে উপনিবেশ আঁকড়ে ধরে রাখাই "আমেরিকান শতাব্দীকে" ঠেকিয়ে রাখবার একমাত্র উপায়। সাম্রাজ্য হারিয়ে ব্রিটেন মার্কিন পুঁজির কাছে কিছুতেই পেরে উঠবে না এবং শীঘ্রই তলিয়ে যাবে বলে মনে করে। সুতরাং এই বিষয়ে অভয় না পেলে ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য ছাড়তে ভাল কথায় কিছুতেই রাজী হবে না। তাতে জাপানকে হারাতে যত দেরিই লাগুক।

ইঙ্গ-মার্কিন যুগ্মনীতি প্রয়োজন

আজ উপনিবেশগুলোর উন্নতি করতে হলে, জগৎ থেকে যুদ্ধকে নির্ব্বাসিত করতে হলে, ব্রিটেন ও আমেরিকাকে একটি যুগ্মনীতি আবিষ্কার করতে হবে যাতে দুজনেই ন্যায্য প্রাপ্য পায়। তা না হলে আমেরিকার তুলনায় দুর্ব্বল ব্রিটেন কিছুতেই তার সাম্রাজ্যের দখল ছাড়বে না। সাম্রাজ্যের দখল না ছাড়লে স্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা কিছুতেই হতে পারে না। আজ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চীন যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে এগিয়ে চলেছে, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উপনিবেশকেও সেই ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে দেওয়া উচিত। তা না হলে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উপনিবেশ একদিন না একদিন স্বাধীন হবেই এবং তখন তারা স্বাধীনতা অর্জ্জন করবে পাশ্চাত্ত্য প্রভুজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

ভারতের স্বাধীনতায় আমেরিকার লাভ

যুদ্ধের পর মার্কিন পুঁজিবাদকে উন্নততর করতে হলে বিরাট্ বাজার দরকার হবে যেখানে কোটি কোটি ডলার খাটান যাবে। এই বাজার একমাত্র এশিয়া ও আফ্রিকায় পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু 'পরাধীন' ঔপনিবেশিক এশিয়া ও আফ্রিকায় নয়—'স্বাধীন' এশিয়া ও আফ্রিকায়। স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এশিয়া ও আফ্রিকাকে না দিলে মার্কিন ধনতন্ত্র যুদ্ধের পরে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। আমেরিকা থেকে মাঝে মাঝে ব্রিটিশ ভারতে কুশাসন সম্পর্কে, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে-সব বাণী ভেসে আসে, সেগুলোর প্রেরণা ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা নয়, সেগুলোর প্রেরণা মার্কিন ধনতন্ত্র।

চীন সম্পর্কে আমেরিকার ভুল নীতি

চীনের কথা যদি ধরা যায় তা হলেও দেখা যাবে চীন এত দিন ছিল বিদেশী বণিকদের একটি আধা-উপনিবেশ। নামে স্বাধীন হলেও তার স্বাধীনতা ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। Extra-tereitorial right এবং অনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য চলত চীনে। আজ চীনে দুটি জাতীয় দল দেখা দিয়েছে। একটি কুওমিনটাং বা রক্ষণশীল দল (আজ সান-ইয়াৎ সেনের প্রগতিমূলক নীতি কুওমিনটাং কর্ত্তৃপক্ষ বর্জ্জন করেছেন)। এরাই চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে স্বাধীন চীনের অধিকাংশে আধিপত্য করেন। আর একটি হচ্ছে প্রগতিশীল কুমচানটাং বা সাম্যবাদী দল। এরা চীনের মধ্যযুগসুলভ শাসন-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী। ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন সাম্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চীনের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। বর্ত্তমান কুও-মিন-টাং কর্ত্তৃপক্ষ সে নীতি বর্জ্জন করে জাপানকে হারাবার চেয়ে সাম্যবাদী দলের দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। সান-ইয়াৎ সেন বলেছেন:—"What is the principle of livelihood? It is communism and it is socialism…" লিন উটাং বলেছেন:—"The Chinese communists will become the bedrock of Chinese democracy." চীনের সাম্যবাদীদের শাসন-ধারার গণতান্ত্রিক ভিত্তির যথেষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি এডগার স্নো ও ইজরেইল এপষ্টাইনের বিবরণে। তাঁরা নিরপেক্ষ মার্কিন সংবাদদাতা। তা ছাড়া ধনতান্ত্রিক মার্কিন মুলুকের লোক হয়ে তাঁরা অকারণে সাম্যবাদীদের প্রশংসা করবেন, এ হতে পারে না। কুওমিনটাং-এর নীতি সামন্ততন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে নীতি গণতন্ত্র-বিরোধী, সুতরাং জাতি গঠনের বিপক্ষে। চীনের ব্যবহারিক উন্নতিতে আমেরিকার কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য নিতে চেয়েছিলেন সান-ইয়াৎ সেন। তাঁর লেখা *International Development of China* বইখানিই তার প্রমাণ। কিন্তু কুওমিনটাং শাসনতন্ত্র ঠিক সে ভাবে আমেরিকার সাহায্য চায় না। কুওমিনটাং কর্ত্তৃপক্ষ আমেরিকার সাহায্যে সাম্যবাদীদের উচ্ছেদ করতে চান। অথচ এই সাম্যবাদীরাই আজ উত্তরে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেছে সমগ্র চীনে সেই শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে মার্কিন মালের জন্য চীনে বিরাট্ একটি বাজার তৈরি হ'ত সমগ্র চীনের উন্নতির জন্য। দুটি দেশের মধ্যে সত্যিকারের বন্ধুত্ব হ'ত। চীনের জাতীয় উন্নতিতে আমেরিকা সাহায্য করতে পারত, সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ধনতন্ত্রেরও লাভ হ'ত। আজ আমেরিকান গবর্ণমেণ্ট কুওমিনটাং কর্ত্তৃপক্ষের সাম্যবাদীদলনে বাধা না দিয়ে পরোক্ষে সাহায্য করছেন। মার্কিন অস্ত্রের কিছু অংশ চীনের একমাত্র গণতান্ত্রিক দলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে। কোটি কোটি ডলার তাঁরা চীনা কারেন্সিকে ধার দিচ্ছেন। সেই টাকা নিয়ে মুনাফাখোরেরা খাদ্য বস্ত্র মজুত করছে, সুদে খাটাচ্ছে, নিজেরা লক্ষপতি হচ্ছে, দেশীয় মূলধনকে (অর্থাৎ শিল্পকে) কাজের বার করে দিচ্ছে এবং ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করছে। যুদ্ধের পরে এই শাসনতন্ত্রই যদি বজায় থাকে তাতে কার কি লাভ হবে? মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী সামন্ততন্ত্র মার্কিন ধনতন্ত্রকে কতটুকু সাহায্য করতে পারবে? ব্রিটেনেরই বা কি লাভ হবে? জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নত না হলে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে ব্রিটেন বা আমেরিকার মাল কিনবে কে?

প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ

ইন্দোচীন, মালয়, ব্রহ্ম ইত্যাদি দেশগুলোর ঐ একই সমস্যা। আজই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করলে যুদ্ধ জয় করতে অকারণে লোকক্ষয় হবে অনেক বেশী, প্রাচ্যের দুঃখ-দুর্দ্দশাও বৃদ্ধি পাবে বহুগুণ। "এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য"

...গুলির প্রভাব থেকে প্রাচ্যকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হলে প্রত্যেক দেশকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

পরাধীন আফ্রিকার সমস্যা

আফ্রিকা আর একটি প্রচুর সম্পৎশালী মহাদেশ যার পনর কোটি অধিবাসী ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। আজ আমেরিকার পুঁজিপতিদের অনেকে মনে করেন যে আফ্রিকায় এবার তাঁরাও তাঁদের স্বতন্ত্র ধারায় ঔপনিবেশিক শোষণ চালাবেন। বিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মানী অনবরত সেই চেষ্টা করে এসেছে এবং যুদ্ধের সেটি একটি কারণ। আফ্রিকায় প্রাকৃতিক সম্পদ আছে প্রচুর। শুধু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের জন্যই সেই সম্পদ বিশ্বমানবের এবং আফ্রিকা-বাসীর কাজে লাগছে না। প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হয়ে চলেছে। আমেরিকা আজ ভাবছে কি করে আফ্রিকায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে পথে বসাবে। আমেরিকাকে পাত্তা দেবে না বলে ব্রিটেন আফ্রিকার কোন সমস্যা সমাধানের জন্য (যেমন লেভাণ্ট সমস্যা) আমেরিকা বা রুশিয়াকে ডাকতে চাইছে না। যা বোঝাপড়া করার তা তারা নিজেদের দু'জনের মধ্যেই করতে চায় (দু'জন অর্থাৎ ব্রিটেন ও ফ্রান্স)।

আফ্রিকার সম্পদকে কাজে লাগাতে হলে আজ আফ্রিকা-বাসীকে সুসভ্য করতে হবে, তাদের রাজনৈতিক চেতনা লাভে সাহায্য করতে হবে, তাদের অর্থনৈতিক জীবনের উন্নতি করতে হবে। সেজন্য যুদ্ধের পরে আফ্রিকায় শিল্প প্রসারের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হবে। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে আফ্রিকার উন্নতির দায়িত্ব নিতে হবে। আমেরিকার সমরশিল্পকে শান্তিকালীন শিল্প হিসাবে চীনের এবং আফ্রিকার উন্নতির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আফ্রিকার শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে আমেরিকা শুধু সাহায্যই করবে, শিল্পোন্নতির ওজুহাতে শোষণ করবে না। সে সাহায্য করায় তার নিজের ঘরেও যথেষ্ট অর্থাগম হবে কিন্তু তা শোষিত অর্থ নয়। মার্কিন মালের বিরাট্ বাজার হবে আফ্রিকা, কিন্তু সে বাজার ঔপনিবেশিক বাজার নয়। সে বাজার হওয়া চাই স্বাধীন আফ্রিকার বাজার, যে বাজার আফ্রিকাবাসীর জীবনযাত্রার উন্নতি করবে এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেবে। সাম্যের ভিত্তিতে চলবে দুটি মহাদেশের সহযোগিতা। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইচ্ছা করলে এতে সহায়তা করতে পারে। জাতীয় গঠনের কর্ম্মসূচীতে আফ্রিকাবাসীদের যোগদানে কোন রকম বাধা থাকবে না, কারণ তারা যোগ দিলে তবেই দেশের সত্যিকারের উন্নতি হবে। সেজন্য তাদের স্বায়ত্তশাসন এবং স্বরাজ দিতে হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার না পেলে কোন দেশের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করা সম্ভব নয়। আফ্রিকা স্বাধীন হলে আফ্রিকা দখলের জন্য কেউ আর মাথা ঘামাবে না। সিরিয়া, লেবানন ইত্যাদি মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর সম্পর্কেও এই নীতি অবলম্বন করতে হবে।

সাম্য ও মৈত্রীর পথে বিশ্বের অগ্রগতি

সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্বাধীন হলে পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্যবিনিময় এবং পারস্পরিক সাহায্যের মধ্যে দিয়ে চলবে জাতীয় উন্নতির দিকে এগিয়ে। এইভাবে শিল্প ও উৎপাদন-প্রথার উন্নতি হয়ে চলবে পুঁজিতান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে। বিশ্ব-শ্রমিকসংঘ ও বিশ্বকৃষকশ্রেণী ক্রমশঃ কর্ম্মনিপুণ হয়ে উঠবে আধুনিক যুগের চাহিদামত। কিছু কিছু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা পেয়ে তারা ক্রমশঃ সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের শক্তিশালী করে তুলবে। আজ যুদ্ধের পরে প্রত্যেক দেশে যদি সর্ব্বদলীয় শাসনতন্ত্র গঠন করা সম্ভব হয় (যেমন হয়েছে যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া ও পোলাণ্ডে) তাতে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী নিজেদের জন্য অনেকগুলি অধিকার আদায় করে নিতে পারবে এবং সংঘবদ্ধ হইতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের হার চলবে বেড়ে যান্ত্রিক উপায়ে। বৈজ্ঞানিক সমবায় কৃষির প্রবর্ত্তন হবে দেশে দেশে। সব দেশ অবশ্য সমান তালে পা ফেলে চলতে পারবে না। কিন্তু যে যে দেশে যখন অপ্রতিহত অগ্রগতির ফলে শ্রমিকসংঘ নিজেদের হাতে শাসনভার নেবার মত ক্ষমতা সংগ্রহ করতে পারবে, সেই সেই দেশে তখন পুঁজিতন্ত্রের স্থানে হবে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। জনসাধারণ করবে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ। এই ভাবে একদিন সমগ্র বিশ্বে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

আলোচনা

"জাতি জন্মগত কিনা"

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২-এর প্রবাসীতে প্রকাশিত "প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অমরবন্ধু রায় চৌধুরী মহাশয় লিখিয়াছেন, "মনুসংহিতার শ্লোকগুলি এবং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যাহা বলিয়াছেন ("চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ") তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে গুণ ও কর্ম হিসাবেই চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল।" কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলি আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে জন্ম অনুসারে বর্ণের নির্দেশ হইবে ইহা মনুসংহিতা এবং গীতার উদ্দেশ্য।

মনুসংহিতার কোন্ শ্লোকে গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্দেশের কথা আছে তাহা লেখক মহাশয় উল্লেখ করেন নাই। কিরূপে জাতি নির্দেশ হইবে তাহা মনুসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে—

চাতুর্বর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্তএব হি। মনু ১০।৫

অর্থাৎ—

তুল্যবর্ণের এবং অক্ষতযোনি পত্নীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয় সে পিতামাতার জাতি প্রাপ্ত হয়। মনু ২।৩৬ শ্লোকে বলিয়াছেন যে অষ্টম বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইবে, একাদশ বৎসর বয়সে ক্ষত্রিয়ের, এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে বৈশ্যের উপনয়ন হইবে। বলা বাহুল্য, ৮ বৎসর বয়সে কোনও বালকের গুণ ও কর্ম বিচার করিয়া জাতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই নিয়ম হইতে বুঝা যায় যে জন্ম অনুসারে জাতি নির্দেশ হইবে। মনু ২।৩০, ৩১, ৩২ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে জন্মের পর হইতে দশম বা দ্বাদশ দিনে নামকরণ হইবে, ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক শব্দ দ্বারা নামকরণ হইবে এবং নামের পর শর্মা এই শব্দ যোগ হইবে, ইত্যাদি। ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে জন্ম অনুসারেই জাতি নির্দেশ করিতে হইবে। কারণ জন্মের পর ১০।১২ দিনের মধ্যে কাহারও গুণ ও কর্ম বিচার করা সম্ভব নয়।

মনুসংহিতা ২।১৬৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করিয়া অন্যত্র শ্রম করে সে জীবিত অবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। (১) ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে মনু গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে পূর্বোল্লিখিত ১০।৫, ২।৩৬ এবং ২।৩০ শ্লোকের সহিত বিরোধ হয়। মনুসংহিতার বিভিন্ন শ্লোকের মধ্যে পরস্পর বিরোধ না হয় এ ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। ২।১৬৮ শ্লোকের যদি এরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে দ্বিজের পক্ষে বেদ পাঠ না করা অতিশয় নিন্দনীয় তাহা হইলে অপর শ্লোকগুলির সহিত বিরোধ হয় না। ২।১৬৮ শ্লোকের আক্ষরিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সুসঙ্গত নহে। যে বেদ পাঠ করিল না সে না হয় শূদ্র হইল কিন্তু তাহার বংশের সকলে কেন শূদ্র হইবে? বংশের মধ্যে কেহ কেহ ত বেদ পাঠ করিতে পারে? ২।১৫৭ শ্লোকে (২) হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বেদ পাঠ না করিলেও ব্রাহ্মণই থাকে, যদিও ব্রাহ্মণের গুণ থাকে না, যথা কাষ্ঠময় হস্তী।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "চাতুর্বর্ণ্যংময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" ৪।১৩। রায় চৌধুরী মহাশয় বলিয়াছেন যে ইহা হইতে বুঝা যায় যে গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ বিভাগ করাই ভগবানের উদ্দেশ্য। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ইহা স্থির করিতে হইবে যে গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি বিভাগ করা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে, জন্ম অনুসারে জাতি বিভাগ করাই ভগবানের উদ্দেশ্য।

গুণ ও কর্ম অনুসারে জাতি নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। কোনও ব্যক্তির গুণ ব্রাহ্মণের ন্যায় কিন্তু কর্ম ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, বা গুণ বৈশ্যের ন্যায় কিন্তু কর্ম ব্রাহ্মণের ন্যায় হইতে পারে, এই সকল ক্ষেত্রে কি ভাবে জাতি নির্ণয় করা হইবে? একই ব্যক্তির গুণ ও কর্ম একাধিক বার পরিবর্তন হইতে পারে, প্রত্যেক বার পরিবর্তন হইলে নূতন করিয়া জাতি নির্ণয় করিতে হইবে, তাহাতে অব্যবস্থা হইবে। একটি ব্যক্তির প্রকৃত গুণাবলি কিরূপ তাহা অনেক সময় স্থির করা যায় না, কেহ বলেন লোকটি ভাল, কেহ বলেন মন্দ, ক্ষমা, দয়া, সংযম অল্প বিস্তর অনেকেরই থাকে, ঠিক কতখানি থাকিলে ব্রাহ্মণ হইবে? গীতায় অর্জুন বলিয়াছেন, "আমি যুদ্ধ করিব না, ভিক্ষা করিয়া খাইব।" ভগবান বলিলেন "তাহা হইলে তোমার পাপ হইবে।" যদি গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণ নির্ণয় করা হয় তাহা হইলে ভগবানের উত্তর সঙ্গত হয় না, যদি জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ণয় করা হয় তাহা হইলে উত্তর সঙ্গত হয়। অর্জুনের ব্রাহ্মণোচিত গুণ (শম, দম, তপঃ, শৌচ প্রভৃতি) যথেষ্ট ছিল, তিনি যদি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার গুণ ও কর্ম উভয়ই ব্রাহ্মণের ন্যায় হইত (কারণ ভিক্ষা ব্রাহ্মণের অন্যতম জীবিকা), সুতরাং অর্জুনকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হইত, কিন্তু ভগবান তাহা করিলেন না, বলিলেন অর্জুনের পাপ হইবে। যদি জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্ণয় হয় তাহা হইলেই ভগবানের কথা যুক্তিযুক্ত হয়। অর্জুন ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে অতএব সে ক্ষত্রিয়, এজন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা ও ব্রাহ্মণের জীবিকা গ্রহণ করা তাহার পাপ। ভগবান গীতার ১৮।৪২-৪৪ শ্লোকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি জাতির কর্তব্যের উল্লেখ করিয়া ৪৫ শ্লোকে বলিয়াছেন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্ম করিলে সিদ্ধি লাভ

---

(১) যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবন্নেব শূদ্রত্বমাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ। মনু ২।১৬৮

(২) যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি। মনু ২।১৫৭

করিতে পারে (৩)। যদি কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ নির্দেশ করা হয় তাহা হইলে সকলেই নিজ কর্ম করিবে, নিজ কর্ম করিলে শ্রেয়ঃ হইবে ইহা বলার কোনও সার্থকতা থাকে না। যুধিষ্ঠির ও ভীম উভয়ের গুণের মধ্যে অনেক পার্থক্য, কিন্তু উভয়েই ক্ষত্রিয়। জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ হইলেই ইহা সঙ্গত হয়, গুণ অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ হইলে ইহা সঙ্গত হয় না। পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্য যুদ্ধ করিতেন, ইহা ক্ষত্রিয়ের কাজ, কিন্তু তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই, ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মণবংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অশ্বত্থামার গুণ ও কর্ম্ম কিছুই ব্রাহ্মণের ন্যায় ছিল না। তিনি এত নিষ্ঠুর ছিলেন যে রাত্রে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত পাণ্ডবপুত্রদিগকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম ছিল ক্ষত্রিয়ের। তথাপি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছিল, অবশ্য মন্দ ব্রাহ্মণ।

গীতা ১৬।২৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত—শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। স্মৃতির মধ্যে মনুসংহিতা একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মনুসংহিতা গীতার অনেক পূর্ববর্ত্তী। সুতরাং ভগবান যখন শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়াছেন, তখন তিনি মনুর বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতে পারেন না। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে মনু স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে জন্ম অনুসারে বর্ণ হইবে। বেদও বলিয়াছেন যে জন্ম অনুসারে বর্ণ হয় (৪)।

সুতরাং যদি "গুণকর্ম বিভাগশঃ" বলিয়া গীতায় গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বর্ণ নির্দ্দেশ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, সে ব্যবস্থা বেদ ও মনুসংহিতার বিরোধী, অতএব শাস্ত্রবিরোধী হইবে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা দিতে পারেন না। কারণ তিনি বলিয়াছেন যে শাস্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

তাহা হইলে "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ" ইহার অর্থ কি? এখানে কর্ম্ম শব্দের অর্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১৮ অধ্যায়ের ৪১ হইতে ৪৮ শ্লোকে এই অর্থেই কর্ম্ম শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিরূপ বিভাগ করা হইয়াছে সেই "কর্ম্ম বিভাগ" ১৮।৪২-৪৪ শ্লোকে উল্লেখ করা হইয়াছে। গুণ অনুসারে এই কর্ম্ম বিভাগ হইয়াছে। গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম অনুসারে সত্ত্ব, রজ ও তম ত্রিবিধগুণের তারতম্য হয়, জন্মের অব্যবহিত পূর্বে যাহার যেরূপ গুণ থাকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক তাহার তদনুরূপ জাতিতে জন্ম নির্দিষ্ট হয়, জাতি অনুসারে কর্ম্ম। ইহাই "গুণকর্ম্ম বিভাগে"র অর্থ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলিয়াছেন "কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈঃ গুণৈঃ" (১৮-৪১)।

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, পরে কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তপস্যার অলৌকিক শক্তি, ইহাতে দেহের উপাদান পরিবর্ত্তন করা সম্ভব।

সুতরাং জন্ম অনুসারে বর্ণ নির্দেশ করাই বেদ, গীতা, মনুসংহিতা প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য। বাল্য হইতেই প্রত্যেকের জাতি অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে, বংশানুক্রমিক গুণাবলির প্রভাবে পিতৃপুরুষগণের গুণাবলি সন্তানে বিদ্যমান থাকা সম্ভব। এইভাবে জন্ম ও শিক্ষার প্রভাবে প্রত্যেক জাতির বিশেষত্ব উৎকর্ষ লাভ করিবে, প্রত্যেক জাতি অপর জাতির সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজনীয় বুঝিয়া পরস্পর ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইবে। জন্মগত জাতি বিভাগ দ্বারা এইভাবে সমগ্র জাতির ঐক্যবন্ধন এবং উৎকর্ষ সাধিত হয়।

---

(৩) স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতো সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
গীতা ১৮।৪৫

(৪) রমণীয় চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেস্তে ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয় যোনিং বা বৈশ্য যোনিং বা কপূয় চরণা কপূয়াং যোনিমাপদ্যেস্তে শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা (ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৫-১০-৭)। যাহারা উত্তম কর্ম্ম করে তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যোনি প্রাপ্ত হয়, যাহারা মন্দ কর্ম্ম করে তাহারা কুকুর, শূকর বা চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হয়।

হিন্দু আইনের সংস্কার প্রচেষ্টা

শ্রীরেণু দাসগুপ্তা, এম্-এ

হিন্দু আইনের সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে আইনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহা লইয়া সীমাহীন বাগ্‌বিতণ্ডা ইতিমধ্যে বহু বার বহু ভাবে হইয়া গিয়াছে। সমাজের বিবিধ স্তরের বিবিধ ব্যক্তি সপক্ষে কিংবা বিপক্ষে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বিলের বিরোধিতা যাঁহারা করিয়াছেন এক দল নারী তাঁহাদের অন্যতম। হিন্দুসমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কোন একটি বিশিষ্ট ও শিক্ষিত অংশের নারীরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া এই বিলের সংস্কারসমূহ লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহাদেরই একজন হিসাবে এই সম্বন্ধে ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিতেছি।

হিন্দুসমাজে যখনই কোন সংস্কারের প্রয়াস হইয়াছে এক দল লোক তখনই উহাতে বাধা দিয়াছেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আইন সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার জ্ঞান নাই। কোন একটি মোকদ্দমায় আইন-সংক্রান্ত স্বাভাবিক বুদ্ধিজাত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আমার আইনজ্ঞ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আইনের জটিল প্রশ্নের সহজ সমাধান করিয়া দিয়া তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে "হিন্দু আইনে হিন্দু পুরুষের অধিকার-সংকোচক কোন ব্যবস্থাই নাই" অর্থাৎ সব কিছু করিবার, সব কিছু পাইবার ও ইচ্ছামত চলিবার যে অধিকার, হিন্দু আইন ও শাস্ত্র পুরুষকে সেই অধিকারে বাধা দেয় না। ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত বাহির করা যায় যে হিন্দু আইনে পুরুষের অধিকার-সংকোচক কোনই ব্যবস্থা নাই এবং হিন্দু আইনে নারীদের অধিকার-ব্যবস্থাপক কোনই বিধি নাই। আইন সম্বন্ধে সহজাত এই ধারণায় ভুলপ্রমাদ থাকিলে ভরসা করি আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। যাহা হউক, সম্ভবতঃ ঐ কারণেই দেখা গিয়াছে হিন্দু সমাজে যখনই সংস্কারের প্রচেষ্টা হইয়াছে তখনই হয় উহাতে পুরুষের অধিকার-সংকোচের ব্যবস্থার ভীতি রহিয়াছে অথবা নারীদের অধিকারসূচক বিধি উহাতে রহিয়াছে। এই দুইটির যে-কোন একটি হইলেই হিন্দুধর্ম্মের রসাতলে পতন অনিবার্য্য। সুতরাং বাধা দেওয়াই সঙ্গত। সতীদাহের ন্যায় অমানুষিক নারীহত্যার প্রতিরোধ-ব্যবস্থাপক আইন প্রণয়নকালেও দেশব্যাপী কঠোর প্রতিবাদ, রাজা রামমোহনের প্রাণনাশের চেষ্টা ও বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল ইত্যাদি অপচেষ্টার কাহিনী ইতিহাসে জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু আইনে সব সময় হিন্দু নারীর বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারও এক সময় স্বীকৃত হয় নাই এবং বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারটুকুও দিতে দেশবাসী কুণ্ঠা বোধ করিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ আইন প্রণয়ন প্রচেষ্টায় হিন্দু সমাজ দ্বিতীয় বার রসাতলে গিয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বিরোধিতা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবননাশের চেষ্টা, আইন প্রণয়ন হইলে নারীরা তাহাদের স্বামীদিগকে হত্যা করিয়া পুনর্ব্বিবাহ করিবে এই আশঙ্কা ইত্যাদি কাহিনীও ঐতিহাসিক সত্য। যাহাদের বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ছিল না তাহাদের পুনর্ব্বিবাহের অধিকার চাওয়া নিদারুণ অপরাধ। তবে একথা সত্য আইন পাসই হইয়াছিল মাত্র এবং নারীরা কেবলমাত্র একটি অধিকারই পাইয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে উহা আজও বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে সমাজের বহু অংশে বাল্য বিবাহ প্রায় উঠিয়াই যাইতেছিল। কিন্তু সংস্কারের মনোবৃত্তি লইয়া আইন করিয়া শারদা আইন পাস করিয়া বাল্য বিবাহ রোধের চেষ্টাও প্রতিপদে বাধা পাইয়াছে। দলে দলে সদ্যজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া দুগ্ধপোষ্য বালক-বালিকাদের বিবাহ সেকালে দেখিয়াছিলাম এবং শুনিয়াছিলাম। এই আইন হিন্দু সমাজকে রসাতলে অগ্রসর করাইবার তৃতীয় ধাপ।

প্রস্তাবিত হিন্দু আইন ইহার চতুর্থ ধাপ। হিন্দু নারীরা ইতিপূর্ব্বেই সব সময় ও সব অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ইচ্ছা হইলে পুনর্ব্বিবাহের অধিকারও পাইয়াছেন, বাল্যবিবাহের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন—এখন যদি আবার পিতার সম্পত্তিতে হাত বাড়াইতে চান কিংবা অবাঞ্ছিত বিবাহ হইতে মুক্তি লাভের উপায়ের অধিকারী হইতে চান, এবং অন্যান্য অধিকারও চান, তবে বাস্তবিকই তাঁহারা বাড়াবাড়ি করিতেছেন বলিতে হইবে। সুতরাং এই ব্যবস্থাকে বাধা দেওয়াই সঙ্গত। যাঁহারা এই গুরুভার গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদিগকে মোটামুটি কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাঁহাদের মধ্যে একদল নারী রহিয়াছেন তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নারীদলের মধ্যে আর একদল আছেন যাঁহারা হিন্দুসমাজে নারীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার চিত্র পুঁথিতে আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন এবং প্রশংসার অধিকারিণী হইয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ উহার প্রতিকারের ব্যবস্থায় কায়মনোবাক্যে বাধা দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইহা ছাড়া উচ্চশিক্ষিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু লোকও ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। আর এক দল ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন যাঁহারা আহারে, বিহারে, বসনে-ভূষণে ও ভাষণে আগাগোড়া "সাহেব"। দেখা গেল এই সব তথাকথিত সাহেব "মন না রাঙায়ে কি ভুল করিয়ে কাপড় রাঙায়ে" সাহেব হইয়াছেন। কারণ সংস্কারবিরোধী আন্দোলনে ইঁহারা একেবারে খাঁটি বাঙালী।

প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের সমুদয় জটিলতা যাঁহারা আইনজ্ঞ নহেন তাঁহাদের বুঝিবার কথা নহে। এই আইনের দাবিসমূহ আমরা মোটামুটি যাহা বুঝিয়াছি তাহা এইরূপ:—(ক) নারীরা পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন। (খ) বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসম্মত হইবে ও পুরুষের এক পত্নী বর্ত্তমানে বিবাহ চলিবে না। (গ) অসবর্ণ বিবাহ ও স্বগোত্র বিবাহ। প্রত্যেকটি পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

(ক) নারীকে পিতৃসম্পত্তির অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে নানা যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে ভাইবোনের প্রীতির সম্বন্ধ লোপ পাইবে, সম্পত্তি নানা অংশে বিভক্ত হইয়া যাইবে ইত্যাদি বিবিধ অসুবিধার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। বিরুদ্ধ-

নারীরা বিবাহিতা অবিবাহিতা কোন কন্তাকেই সম্পত্তির অধিকার দিতে অসম্মত। সম্পত্তির অটুটত্ব রক্ষাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে Primogeniture প্রথা অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ-পুত্রেরই মাত্র সম্পত্তিতে অধিকার এই যুক্তি যাঁহারা যাহারা দেখাইয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য। সকল পুত্রের মধ্যে সম্পত্তি বিভক্ত হইতে পারিলে সকল সন্তানের মধ্যে বিভাগ করিতেই কেবল অসুবিধা ইহা সত্যই অযৌক্তিক। কেহ কেহ কেবলমাত্র অবিবাহিতা কন্তাই সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন‘এই যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন নারী দুই দিক হইতে সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন ইহা হইতে পারে না। নারীরা দুই দিক হইতে সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে পুরুষও যে পরোক্ষ ভাবে উপকৃত না হইবেন তাহা নহে। তাঁহারা পিতৃসম্পত্তি তো পাইবেনই অধিকন্তু স্ত্রীর মারফৎ শ্বশুরের সম্পত্তির সুবিধার ভাগী হইবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারের জন্ত যে বিল উত্থাপিত হইয়াছিল নানাবিধ যুক্তির অবতারণায় সেই বিলও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, আশা করি তাহা সকলেরই স্মরণ আছে। নারীরা পিতৃসম্পত্তিরও অধিকারিণী হইতে পারেন না, স্বামীর সম্পত্তিতেও তাঁহাদের অধিকারে বাধা—এই সকল যুক্তি বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। যদি সম্পত্তির অটুটত্ব রক্ষাই কাম্য হয় এবং ভ্রাতা-ভগিনীর প্রীতি-সম্বন্ধের হানি না করিবারই যদি অভিপ্রায় তবে আইনে অবিবাহিতা অথবা চিরকুমারী ভগিনীর পিতৃসম্পত্তিতে ভাইয়ের সমান অধিকার এবং বিবাহিতা নারীর স্বামীর ও শ্বশুরের সম্পত্তিতে অন্তান্ত ওয়ারিশদের ন্তায় তুল্য অধিকারের ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়। অন্তথায় পিতৃসম্পত্তিতে কন্তার যে অধিকার দাবি করা হইয়াছে তাহা যথার্থই যুক্তিসঙ্গত।

(খ) বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে প্রচলিত। বহু পূর্ব্বে কতকগুলি অবস্থায় নারীদের পুনর্ব্বিবাহের প্রথা হিন্দুশাস্ত্রসম্মতই ছিল। সেই প্রথা হিন্দুসমাজ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। এক সময়ে যাহা শাস্ত্রসম্মত ছিল সেই প্রথাকে পুনরায় চালু করিবার চেষ্টা অসঙ্গত নহে। অধিকন্তু সমাজে বর্ত্তমানে হিন্দু নারীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা না থাকায়, বিবাহ-বিচ্ছেদ কিংবা পুনর্ব্বিবাহ একেবারেই ঘটে নাই এমন নহে। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে বিবাহিতা হিন্দুনারী ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া শুদ্ধি অন্তে হিন্দু হইয়া পুনর্ব্বিবাহ করিয়াছেন এইরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে। কায়দা করিয়া এইরূপ প্রণালীতে বিবাহ-বিচ্ছেদ না করিয়া হিন্দু সমাজেও আইনের সাহায্যে ইহার প্রবর্ত্তন দোষের নহে। “নষ্টে ক্লীবে প্রব্রজিতে” ইত্যাদি অবস্থায় এইরূপ বিবাহের ব্যবস্থা হিন্দু সমাজে বহু পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। আধুনিক শিক্ষায়, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে, আন্তর্জ্জাতিক ভাববিনিময়বশতঃ এইরূপ প্রয়োজনীয়তাকে বিংশ শতাব্দীতে অস্বীকার করিলে সমাজ উহা সকল ক্ষেত্রেই মানিয়া লইবে না। তাহা ছাড়া এই আইন বিধিবদ্ধ হইলেই ঘরে ঘরে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই। যে

সকল সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে সেই সব সমাজের দিকে তাকাইলেই ইহার সদুত্তর মিলিবে। এই আইন পাস হইলে নারীরা একটি অধিকার পাইবেন মাত্র। বিধবা-বিবাহ আইন পাস হওয়ায় নারীরা যতটুকু অধিকার পাইয়াছেন সেইরূপ অধিকার-দানের ব্যবস্থাই ইহা দ্বারা হইবে। যে সমাজে নানা গুণসম্পন্না কুমারী-কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রাণান্তকর সেই সমাজে বিবাহ-বিচ্ছিন্না নারীর বিবাহ সহজ-সাধ্য হইবে না। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসম্মত হইলে "পুরুষের অধিকার সংকোচের ব্যবস্থা" ও "নারীদের অধিকার সূচক ব্যবস্থা"র যে প্রবর্ত্তন হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পুরুষের পুনর্ব্বিবাহে অধিকার হিন্দু সমাজের গ্লানি, দুর্দ্দশা ও অগৌরবের পরিচায়ক। কত পরিবার ইহা দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে, কত ব্যথা-দুঃখের কাহিনী এই কারণে উদ্ভূত হইয়াছে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাহা ধারণা করিতে পারিবেন। অকারণে পত্নীত্যাগের উদাহরণ এদেশে বিরল নহে। অথবা যে-সকল কারণে এই সকল বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলেও গ্লানি বোধ হয়। বধূর পিতার বরপক্ষের দাবি মিটাইবার অক্ষমতা, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর খেয়াল, বধূর রূপহীনতা ইত্যাদি কারণগুলিও এইরূপ বিবাহের হেতু হইয়াছে। স্বামী-পরিত্যক্তা নারীরা পদে পদে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছেন। পুরুষের এই অবাধ অধিকারকে আইন দ্বারা ব্যাহত করিবার চেষ্টায় কেহ বাধা না দিলেই শোভন হইত। কেহ কেহ এইরূপ যুক্তিও দেখাইয়াছেন যেহেতু পুরুষের এই রূপ বিবাহাধিকারকে ব্যাহত করা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না, সুতরাং এইরূপ বিবাহ প্রয়োজন হইলে প্রথমা পত্নী অথবা আদালতের সম্মতি লইয়া বিবাহের অধিকার থাকা উচিত। আমাদের হিন্দু সাধ্বী নারীরা স্বামী পুনরায় বিবাহ করিতে চাহিলে সব সময় বাধা দিবেন তাহা মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। কোন গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের তিন পত্নী ছিলেন। সেই ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর তাঁহার তিন পত্নীর যুগপৎ আর্ত্তনাদে প্রতিবেশীরা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সমবেতা সহানুভূতি-সম্পন্না প্রতিবেশিনীদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রথমা পত্নী বিলাপ করিতে করিতে স্বামীর অশেষ গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, এমন উৎকৃষ্ট স্বামী সচরাচর দেখা যায় না ; যখন তাঁহার যাহা প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাঁহার নিকট অর্থাৎ প্রথমা পত্নীর নিকট আব্দার করিয়া চাহিয়াছেন। এক বার স্বামীর ঘোড়া কিনিবার শখ হইল। পত্নীর নিকটই আবেদন পেশ হইল ; আর এক বার স্বামীর বিবাহের আকাঙ্ক্ষা হইল ; তখনও স্ত্রীর নিকটই আব্দার জানাইলেন ; সুতরাং এইরূপ স্বামীবিহনে দিনাতিপাত তাঁহার দুঃসাধ্য···ইত্যাদি। পত্নীর মত লইয়া পুনর্বিবাহ করিতে হইলে সেই মত পাইতে যে, সব সময়ই পুরুষের অধিক অসুবিধা হইয়াছে বা হইবে উপরিউক্ত ঘটনা হইতে তাহা মনে হয় না। এদেশে এইরূপ সাধ্বী পতিপরায়ণা নারীর অস্তিত্ব নাই তাহা নহে। সুতরাং প্রথমা পত্নীর মত লইয়া বিবাহ করিবার যুক্তি সমর্থনীয় নহে। দ্বিতীয়তঃ আদালতের মত লইবার কথা যাহা বলা হইয়াছে সেই সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, স্বামী আদালতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীরা আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবেন না। আদালতে যাওয়া সুখকর কিংবা প্রীতি-কর ব্যাপার নহে। এই সকল ব্যাপারে আদালতে গিয়া নিজে-দের দাবি লইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করা আমাদের সমাজে গৌরব-জনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সসন্তানা নারী আইনতঃ স্বামীর নিকট হইতে খোরপোষ পাইতে অধিকারিণী। আমাদের দেশে বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যেখানে এইরূপ পত্নীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীরা গ্রহণ করেন নাই ; এমন কি তাহাদের খোঁজ পর্য্যন্ত লন নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে আদালতের সহায়তায় ঐ প্রকার স্বামীদের নিকট ভরণপোষণ আদায়ের সম্ভাবনা থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা ইহাকে অগৌরবজনক মনে করেন এবং এই সুবিধা গ্রহণ করেন না। আদালতের সহায়তায় আরও বিবিধ অসুবিধা থাকিতে পারে। সুতরাং আদালতের অনুমতি লইয়া পুনর্ব্বিবাহের যুক্তিও খাটে না।

কেহ কেহ এইরূপ যুক্তিও দেখাইয়াছেন আজকাল এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনর্ব্বিবাহ সমাজ হইতে প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। সুতরাং ইহার জন্য আর আইনের প্রয়োজন নাই। দৃশ্যতঃ ইহা উঠিয়া গেলেও হিন্দুসমাজে বহু পরিবারে অনুসন্ধান করিলেই এইরূপ ঘটনার অস্তিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে মিলিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারিণী মহিলারাও সপত্নীক পুরুষের সহিত স্বেচ্ছায় বিবাহিতা হইয়াছেন এরূপ ঘটনাও নিতান্ত বিরল নয়। পরদ্রব্য গ্রহণ স্বাভাবিক নীতিজ্ঞানে দূষণীয় বলিয়াই সকলে জানেন। কিন্তু পরস্বামী গ্রহণে এই শ্রেণীর মহিলাদের অরুচি দেখা যায় নাই। আমাদের মনে হয় হিন্দু গৃহের প্রতি পরিবারে অনুসন্ধান করিয়া এইরূপ স্বামী পরি-ত্যক্তাদের সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা নারীহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে হওয়া উচিত। এই সকল নারী সুখে কিংবা দুর্দ্দশায় কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করেন তাহারও অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ নারীদের মধ্যে সসন্তানা কত জন আছেন তাহারও হিসাব হওয়া প্রয়োজন। আইন দুষ্কার্য্যকে শাসন করে। যাহারা বিবাহিতা পত্নীদিগকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছে, স্ত্রীর শালীনতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই, সমাজ হইতে উহার জন্য কোনরূপ শাস্তি লাভ করে নাই, এইরূপ পুরুষদের আয় বা সম্পত্তির যে অংশ ঐ কারণে ব্যয়িত হইতে পারিত, উহা স্ত্রীরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যাঁহারা বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত হইলে হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য হারাইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে পুরুষ কিংবা নারী কাহারও স্বামী কিংবা স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনর্ব্বিবাহ করা চলিবে না এই ব্যবস্থার দাবি করিলে তাহা শোভন হইত। শুনিয়াছি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে কোন অবস্থাতেই স্ত্রী বর্ত্তমানে স্বামীর অথবা স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকিলেও, পুন-র্ব্বিবাহের অধিকার নাই। অন্তত এই ব্যবস্থার দাবি করিলেও নিরপেক্ষতা ও স্বার্থশূন্যতা, ও প্রাচীন হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষার অজুহাতের পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু এই ব্যবস্থাও

পুরুষের অধিকার-সংকোচক ও নারীদের অধিকার-বর্দ্ধক। সুতরাং ইহাও চলিতে পারে না।

(গ) অসবর্ণ বিবাহ ও স্বগোত্র বিবাহ ব্যাপকভাবে হিন্দু সমাজে প্রচলিত না থাকিলেও একেবারে চলে না তাহা ঠিক নহে। বাংলা দেশের চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ জেলার কতকাংশে এবং শ্রীহট্টে উচ্চশ্রেণীর বর্ণ হিন্দুর মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। জনশ্রুতি এই যে, এই কয়েকটি জেলায় এইরূপ অসবর্ণ বিবাহ হাইকোর্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত। উল্লিখিত জেলাগুলির কোন কোনটিতে স্বগোত্রে বিবাহেরও প্রচলন আছে। মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অংশে মামাতো, পিসতুতো ভাইবোন অর্থাৎ ইংরেজীতে cousin বলিতে যাহা বুঝা যায় সেইরূপ রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ-প্রথা উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দুর মধ্যে প্রচলিত আছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-গণ এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান কারলেই সঠিক জানিতে পারিবেন। উল্লিখিত জেলাগুলিতে স্বগোত্র বিবাহে ও অসবর্ণ বিবাহের ফল মন্দ হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। ঐ সকল জেলার ও সমাজের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ নানা দিক দিয়া দেশের ও দশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কয়েকটি জেলাতে এইরূপ বিবাহের প্রচলন থাকিতে পারিলে ব্যাপকভাবে আইনের সহায়তায় স্বগোত্র ও অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে যুক্তি টিকিতে পারে না। বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজে পাত্রদের বাজার-দর যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে বিবাহের বাধাসমূহ যত ভাবে দূরীভূত হয় সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল।

হিন্দু পুরুষেরা নানাদিক দিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা স্ত্রী কন্যা ও ভগিনীকে রক্ষা করিবার যোগ্যতা অনেক ক্ষেত্রে দেখাইতে পারেন নাই। পুরুষের অযোগ্যতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এমন কি বিবাহের দায়িত্বটুকুও আজকাল অনেক সময় নিতে ইঁহারা পরাঙ্মুখতা দেখাইয়াছেন। পণপ্রথা কিছুকাল গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আবার ঐ সকল প্রথা মাথা গজাইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে অযোগ্য পুরুষের বিবাহের জন্য শিক্ষয়িত্রী অথবা লেডি-ডাক্তার পাত্রীর বিজ্ঞাপনও বাহির হইতে দেখা যায়। অন্য দিকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে একদল উচ্চশিক্ষিতা নারীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে উপার্জ্জনশীলা নারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগে চাকুরির সুযোগ পাওয়াতে নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়িতেছে। কিন্তু নারীদের উপার্জ্জনশীলতা পুরুষকে অপদার্থ-তার পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। উপার্জ্জনশীলা নারীর উপার্জ্জনের সুযোগ গ্রহণ করিতে পুরুষ-আত্মীয়দের কোন প্রকার সংকোচ অনেক পরিবারে উঠিয়া গিয়াছে। এই অবস্থার চরম দেখা যায় বিবাহিতা সসন্তানা পত্নীকে দিয়া চাকুরি করাইবার প্রবৃত্তিতে। এই শ্রেণীর পুরুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক দল নিজেদের উপার্জ্জনে সংসার চালাইতে অক্ষম হওয়ায় স্ত্রীর উপার্জ্জনে উপকৃত হইতেছেন।

আর এক দল নিজেরা যথেষ্ট উপার্জ্জন করিলেও স্ত্রীর উপার্জ্জন-লব্ধ অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে না পারায় স্ত্রীদের চাকুরিতে বাধা দিতেছেন না। শেষোক্ত দল পরোক্ষ ভাবে সমাজের অকল্যাণ করিতেছেন, নিজেদের যোগ্যতাহীনতাও প্রমাণিত করিতেছেন। যাহা হউক, এই সকল ঘটনা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে নারীরা তাঁহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থের উপস্বত্ব স্বামী, ভ্রাতা এবং অন্যান্য পুরুষ আত্মীয়দিগকে উপভোগ করিতে দিতে কুণ্ঠিত নহেন। আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারা কোন কোন ক্ষেত্রে উপহাসের পাত্রী হইয়াছেন। কিন্তু পরিবারের জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ এই সকল নারীরা প্রয়োজন হইলে যে ভাবে করিতে পারেন ও করিয়াছেন প্রয়োজন ঘটিলে পুরুষ তাহা পারেন নাই। নারীদের উপার্জ্জনের অর্থ গ্রহণ করিতে পরিবারের বাধা নাই। কিন্তু বাধা আসিয়া উপস্থিত হয় নারীকে সম্পত্তির অধিকারের এতটুকু অংশ দান করিতে। নারীর উপার্জ্জনের অর্থ গ্রহণ করায় হিন্দুসমাজ বৈশিষ্ট্য হারায় নাই, বৈশিষ্ট্য হারাইবার ভীতির উদ্রেক হয় তাহাদিগকে অধিকারদানের প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেই।

প্রস্তাবিত হিন্দু আইন সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিতে মহাত্মা গান্ধী অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ। নারী-প্রগতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী কি মত পোষণ করেন তাহা নিখিল-ভারত নারী-সংঘের আমেদাবাদে ১৯৩৬ সনের ২৩শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একাদশ অধিবেশনে তাঁহার নিম্নের উক্তি হইতে উপলব্ধি করা যায়:

"I have grown old giving messages. Still if you need one from me I can only say that until women establish their womanhood the progress of India in all directions is impossible. When women whom we call "Abala" become "sabala," all those who are helpless will become powerful."

সংস্কার-আইনগুলিকে ব্যাহত করিবার চেষ্টা দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিপন্থী। এই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ততদিন প্রকৃতই অসম্ভব, যতদিন না নারীরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে। অবলা নারীকে সবলা করিতে হইলে নারীকে দিতে হইবে স্বাধীনতা, দিতে হইবে অধিকার। নারীর এই 'সবল'ত্ব কেবল নারীকেই শক্তিশালিনী করিবে না—সকল অসহায়ের মধ্যেই শক্তি সঞ্চার করিবে।

সমাধান

নবকুমার পদ্মাবতীকে চিনিতে পারিল না কেন? াপনারা হয়ত বলিবেন—

থম—পথে নবকুমার দস্যুদের লইয়াই ব্যস্ত ছিল; শিকারের দিকে দৃষ্টি চুরি করিবার আদৌ সময় হয় নাই।

াতীয়—বহু দিনের হারান ধনকে পথে খুঁজিয়া পাইবার আশা কি কেহ করিয়া থাকে!

তীয়—অধুনা নবকুমার নব-জীবনের স্বপ্নে বিভোর—কপালকুণ্ডলাই তাহার ধ্যান, রূপ ইত্যাদি।

তুর্থ—পদ্মাবতী স্বামীকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন।

ঞ্চম—স্বয়ং কবি বাদ সাধিয়াছেন, সরাইখানায় পঁহুছিতেই 'প্রদীপ নিভিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে'।

অতঃপর স্বীকার করিতেই হইবে নবকুমারের পদ্মাতীকে না চিনিবার যথার্থ কারণ ছিল।

কিন্তু সেদিন প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকে পথের বুকের উপর খামুখি দাঁড়াইয়া বিশালাক্ষী কেন যে আমাকে চিনিতে ারিল না—আজও এই ধাঁধার মীমাংসা আমি করিতে ারি নাই। লোকে বলে আঙুল ফুলিয়া কখনও কলা াছ হয় না; অথচ বিশালাক্ষী তাহার উল্টাটাই প্রমাণ রিয়া দিয়া আমাকে বোকা প্রতিপন্ন করিয়া দিল। থাটি খুলিয়া বলি। আসলে তাহার নাম নলিনী; হু দিন সহপাঠী ছিলাম—বোধ হয় ৮।১০ বৎসর ইবে। তাহার চেহারার সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ডাগর ানা টানা চোখ দুইটি। এক দিন কি দুষ্টামি যে াথায় খেলিয়া গেল তাহার নামকরণ করিলাম বশালাক্ষী; অতঃপর ঐ নামেই সে আমাদের মহলে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এত যে বন্ধু ছলাম—উক্ত ঘটনার পর সে আর আমার কাছেই ঘঁষিত না। একদা হঠাৎ দুপুরের ছুটিতে পিছন দক হইতে চিমটি কাটিয়া বলিল—নন্দন, বড্ড ক্ষিধে পয়েছে, মুড়কি খাওয়াবি? হাঁ দেখ, তোর দেয়া নামটি ার পছন্দ হয়েছে। ওঁর বলিতে বিশালাক্ষী কাহাকে বুঝাইত, কেবলমাত্র আমিই তাহা জানিতাম। আমি একটু হাসিলাম।

তারপর বহুদিন বিদেশে কাটিয়াছে। ৫।৬ বছরের ব্যবধানে সেদিন একেবারে দুজনে মুখামুখি দাঁড়াইয়া। যতই বলি, আমি তোর কৈশোরের বন্ধু চঞ্চল, সে কিছুতেই আমাকে চিনিবে না। কেবল বলে তা কেমন করে হবে, সে কি হয় ইত্যাদি। মহা মুস্কিলে পড়িলাম দেখিতেছি। আমি যে আমি নাও হইতে পারি এমন প্রশ্ন ভুলেও কখনও মনে জাগে নাই। রোজ কতবার এই মুখ আয়নায় দেখিতেছি, কখনও তো নিজেকে ভুল করি নাই—এমন কি অঘটন ঘটিল! হঠাৎ বুদ্ধি খুলিয়া গেল—পিছন ফিরিয়া মাথায় মস্ত কাটা দাগটি দেখাইয়া দিয়া বলিলাম—"দেখতো চেয়ে, চিনতে পারো কি না?" এবার অব্যর্থ সন্ধান। বিশালাক্ষী আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"নন্দন, তুই! এত সুন্দর, এত মোটা-সোটা কি করে হলি? গম্ভীর স্বরে বলিলাম—মন্ত্রবল—দুঃখ দারিদ্র্যের নির্ম্মম নিষ্পেষণে অসহায় দরিদ্রের একমাত্র সম্বল। তা যাক্, তোর কি খবর? সে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া গেল; কি আর খবর ভাই, ওঁর শরীর বড্ড খারাপ। ওঁর মানে—চন্দনার—চন্দনাকে তুই···দেখিলাম তাহার মুখে রক্তিম আভা খেলিয়া গেল—অধরের কোণে সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। ওঁর কি হয়েছে? বিশালাক্ষী নীরব—একটু যেন সঙ্কোচ আর দ্বিধা। অনুমান বোধ হয় মিথ্যা হইল না। বলিলাম, "দেখ, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করিস্, বাইরের দিকে কি একটুও নজর রাখবিনে? আমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলি না—কি করে এই স্বাস্থ্য হলো? এর কারণ **'ভাইনো-মল্ট'**। এটা মনে রাখিস যে দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর অথবা দারুণ দুশ্চিন্তাবশতঃ উৎপন্ন সকল প্রকার দুর্ব্বলতা, অবসাদ, ক্লান্তি দূর করে দ্রুত স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়ে আনতে পারে এর মত অব্যর্থ টনিক আর দেখা যায় না। তা ছাড়া মায়েদের পক্ষে **'ভাইনো-মল্ট'** অমৃত তুল্য। নাঃ—আর রাস্তায় নয়, চল চন্দনাকে দেখে আসি।"

বিজ্ঞাপন

পুস্তক-পরিচয়

গান্ধীজীর সহিত এক সপ্তাহ—লুই ফিসার। অনুবাদক শ্রীবিমলকুমার বসু ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—দি গ্লোব লাইব্রেরী ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখক ও সাংবাদিক লুই ফিসার ১৯৪২ সালের জুন মাসের এক সপ্তাহ সেবাগ্রামে গান্ধীজীর সঙ্গে ছিলেন। সেই এক সপ্তাহের বিবরণ তাঁহার ইংরেজীতে লেখা পুস্তকের দরুন এখন পাশ্চাত্ত্য জগতে জ্ঞাত এবং খ্যাত। বস্তুত এরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ অথচ সরস বিবরণ অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক তাঁহার ব্যবহারিক জ্ঞানের চোখ দিয়া যে জিনিষটা দেখিয়াছেন সেটা যে তাঁহার সুনিপুণ লেখনীতে এত ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ লেখার বিষয়বস্তু যেমন অসাধারণ, লেখকের রচনাভঙ্গীও তেমনি চিত্তাকর্ষক।

সমালোচ্য পুস্তকটি ইংরেজী মূলের অনুবাদ। বিদেশী ভাষার ভাব বাংলায় হুবহু বজায় রাখা দুরূহ কাজ। তর্জ্জমা বেশ ভালই হইয়াছে।

ক. চ.

তোমাদের বন্ধু লেনিন—অনুবাদক শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—পূরবী পাবলিশার্স ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১২০, মূল্য দুই টাকা।

এই গ্রন্থখানি এ. কোনোনেভের লিখিত "লেনিন সম্পর্কীয় গল্প" নামক পুস্তকের অনুবাদ। লেনিনের নাম, কেবল রুশদেশে নহে পৃথিবীর সকল দেশের সর্বহারাগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণ করিয়া থাকে। অথচ সোভিয়েট বিপ্লব সফল হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লেনিনকে দেশ-বিদেশে পলাতক হইয়া থাকিতে হইয়াছিল, বহুরূপীর মত তাহাকে অনেক সাজে সাজিতে হইয়াছিল। কিন্তু সকল অবস্থার মধ্যে খাঁটি দরদী লেনিন ছিলেন অপরিবর্ত্তনীয়। শিশুদের এরূপ বন্ধু খুবই কম দেখা যায়। যেখানেই ছদ্মবেশী লেনিনের আস্তানা পড়িত সেই স্থানেই শিশুদের আনাগোনা সুরু হইত। এই মহাপুরুষ দরদ ও শিশুর মন লইয়া শিশুদের সঙ্গে মিশিতেন ও তাহাদের ভালবাসা পাইতেন। যখনই ছদ্মবেশী লেনিন আত্মরক্ষার জন্য কোন আশ্রয় ত্যাগ করিতেন তখনই সেস্থানে শিশু, কৃষক ও দুঃখীদের প্রাণে বন্ধু-বিচ্ছেদব্যথা অনুভূত হইত। এই অনুবাদ-গ্রন্থের ছোট ছোট গল্পের মধ্যে খাঁটি 'মানুষ' লেনিনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ লেনিন রুশিয়ার কর্ণধার বা রাষ্ট্রনায়ক নহেন, নিতান্ত সাধারণ, সরল মনা এবং দরদী মানুষ মাত্র। সকলেই তাঁহাকে আপনার ভাবিয়া ভালবাসে। বালক-বালিকারা এই গ্রন্থে কতকগুলি সত্য গল্পের ভিতর দিয়া লেনিনের প্রকৃত পরিচয় পাইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষা-ব্যবস্থা—ডিয়ানা লেভিন। শ্রীঅনিলকুমার সিংহ অনূদিত—ইণ্টার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১৮৮, মূল্য আড়াই টাকা।

এই পুস্তক ডিয়ানা লেভিনের *Children in Soveit Russia*'র অনুবাদ। রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) পর হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্র যে নূতন ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রগতির পথে চলিয়াছে, তাহা গোড়ায় পৃথিবীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করিলেও, সে দেশের সর্ব্বতোমুখী ক্রমোন্নতি আজ সমগ্র বিশ্বের

বিস্ময়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রুশ জাতি নূতন ভিতে নূতন সভ্যতার সৌধ নির্ম্মাণ করিতেছে। সভ্যতার গঠনে এখানে ধনীর হাত নাই, কৃষক শ্রমিক ইহার নির্ম্মাতা। সোভিয়েট জানে যে এত বড় পরিবর্ত্তন কেবলমাত্র উপর হইতে সম্ভব নহে, তাই সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার বনিয়াদ সে এরূপ করিয়া বদলাইয়াছে যাহাতে শিশুমনের উপর সাম্যবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। অথচ এই শিক্ষা খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে বেত্রদণ্ডের বিধান নাই, প্রত্যেক স্কুলই যেন এক একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, ছেলেমেয়েরাই সেখানে কর্ত্তা। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী বন্ধু ভাবে শিক্ষা দেন মাত্র। ছাত্রের পক্ষে সরল ভাবে শিক্ষকগণের শিক্ষা-পদ্ধতির, নিজেদের সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদির আলোচনা মোটেই অস্বাভাবিক বা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয় না। কোন শিশুর কোন বিশেষ শিক্ষার দিকে ঝোঁক থাকিলে তাহার জন্য ঐরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। পিতা-মাতা শিশুর শিক্ষায় বা চরিত্র-গঠনে অবহেলা করিলে সোভিয়েট রাষ্ট্র তাহাকে ক্ষমা করে না। সোভিয়েট শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিশুকে ভবিষ্যতের সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কর্ম্মক্ষম করিয়া তোলা। এই গ্রন্থের সমস্তই লেখকের নিজ অভিজ্ঞতা-লব্ধ, এজন্য খুবই চিত্তাকর্ষক। শিক্ষাব্রতীগণের মধ্যে এরূপ পুস্তকের প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

আমাদের পরিচয়—শ্রীসুধীরকুমার দাসগুপ্ত, এম-এ। বীণা লাইব্রেরী, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান ও তাৎপর্যনির্দেশ এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগ, বেদান্তদর্শন ও শ্রীশঙ্করাচার্য, শক্তিধর্ম ও তন্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীগৌরাঙ্গ, ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন রায়, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ—এই সকল বিষয়ের অনুরাগমুখর ও সাধারণের মনোজ্ঞ পরিচয় ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য কলাবিদ্যাদি জাগতিক ব্যাপারেও প্রাচীন ভারতের কৃতিত্ব ও গৌরব কম নহে। তবে তাহার আলোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে। গ্রন্থের বিষয় ব্যাপক একজনের পক্ষে সকল বিষয়ের পারদর্শিতা সম্ভবপর নহে। তাই, বিশেষজ্ঞের কাছে খুঁটিনাটি ব্যাপারে ইহার কোন কোন স্থলে কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়িতে পারে। তথাপি সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন—অনেক নূতন জিনিষ জানিতে পারিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

রাজা সীতারাম রায়—শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার। যশোহর। মূল্য দেড় টাকা।

বিশেষত্বহীন ঐতিহাসিক নাটক। কাঞ্চনের কথাবার্ত্তায় আনন্দমঠের 'শান্তি'র ছায়া আছে। অনেক স্থলে পাত্রপাত্রীর কথাবার্ত্তা সুদীর্ঘ বক্তৃতা-মাত্র।

সীতা—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

> "মানুষ করেছে অপমান।
> তাহারা ধরার মেয়ে পাঠায়ে দিয়েছে দূর বনে,—
> বিশ্বের যজ্ঞের লাগি
> মানুষের সাথী আজ নিষ্প্রাণ স্বর্ণের সীতা।"

সোনার লোভে মানুষ প্রকৃতিকে বনবাসে পাঠাইয়াছে, তাই তাহার জীবনে আজ এত অশান্তি। অপমানিতা ধরণীর কন্যা বিদায় লইয়াছেন,



মানুষের রাজ্যে রহিয়াছে "ধক্‌ধক জ্বলে ওঠা স্বর্ণের চির-অভিশাপ।" রূপক অর্থের আভাসে অভিনব রূপে দেখা দিয়াছে সীতা কাহিনী। ভাষা ও ছন্দের উপর কবির অনায়াস অধিকার। কোথাও দ্রুত, কোথাও ধীর মাত্রাবৃত্ত অমিত্রাক্ষরা কাহিনীর গতির সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছে। নগরীর কারায় বসিয়া শুনি মাটির মেয়ের ডাক: "শোন শোন যুবরাজ, ঋষিদের লোকালয় ছাড়ায়ে, মোরা যাব পাহাড়ী অরণ্যে" আমাদেরও চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে।

স্মৃতি ও চিন্তা: শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১১ রোলাণ্ড রোড, কলিকাতা।

আপন জীবনস্মৃতি বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক পুরানো কালের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার বাল্য জীবন, ছাত্রাবস্থা, বিলাত যাত্রা; সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ; মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার সহিত বিবাহ; বঙ্কিমচন্দ্র, পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির সহিত পরিচয় এবং আরও অনেক কথা। পুরানো স্মৃতির একটি মধুর কোমল সৌরভ আছে। সহজ সাবলীল ভাষার মধ্য দিয়া সেই সৌরভ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পুরুষ প্রকৃতি: শ্রীসুবোধকুমার দাস।

মলাটে লেখা আছে—'নরনারীর মনস্তত্ত্বমূলক সামাজিক নাটক'। কিন্তু মনস্তত্ত্ব বা নাটক—কোন দিক দিয়াই রচনার সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মাদাম কুরী—শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৩, হাজরা লেন, বালিগঞ্জ। পৃঃ ১১১; দাম—দুই টাকা।

পুস্তকখানি রেডিয়াম আবিষ্কর্ত্রী বিশ্ববিশ্রুত মহিলা-বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী। প্রতিভার সহিত ঐকান্তিক আগ্রহের যোগ হইলে মানুষ যে কিভাবে সকল রকমের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারে, মাদাম কুরীর জীবন তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতি সাধারণ অবস্থা হইতে নানা রকমের বিঘ্ন-বিপত্তির মধ্য দিয়া এই বিশ্ব-বরেণ্যা মহিলা কিরূপে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাহা সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে বর্ণনাভঙ্গীকে সরস করিতে গিয়া স্থানে স্থানে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে জীবন-কাহিনীতে তাহা না থাকিলেই ভাল হইত।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অপরাজেয়—বোরিস গোরবাটোভ। অনুবাদক অশোক গুহ। পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

সাময়িক ভাবে জার্ম্মান-অধিকৃত উক্রাইনের একটি শ্রমিক পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া রুশ লেখক এই বিখ্যাত গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। অপরাজেয় তাহারই ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ। মূল গ্রন্থের সহিত আমাদের পরিচয় নাই, কিন্তু বঙ্গানুবাদখানি অতি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহার ভাষা জড়তাহীন ও সুমিষ্ট। শত্রুর নিদারুণ নিপীড়ন ও প্রতিকূল পরিবেষ্টনী যে উক্রাইনবাসিগণকে অবনত করিতে পারে নাই, তাহারা স্বাধীনতা উদ্ধারে প্রভূত ত্যাগস্বীকার ও শত্রুর বিরুদ্ধে যে কিরূপ সুকঠোর সংগ্রাম করিয়াছে গ্রন্থখানিতে সেই কাহিনীই লিখিত। উপন্যাসখানির রচনা-কৌশলও অভিনব।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ— শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার। প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যের মত তাঁহার ব্যক্তিত্বও বিরাট্। সাহিত্য-সাধনার সহিত কবির জীবনের সাধনা একান্তভাবে জড়াইয়া আছে। শেষজীবনে যখন রবীন্দ্র-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হইয়াছে, তখন অনেকে তাঁহার জীবনের মূল প্রেরণার কথা ভুলিতে বসিয়াছিল। বিশ্বপ্রেম জাতীয়তার পরিপন্থী নহে। যে যুগ এবং যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত হইয়াছিল সেই দেশ-কালের মধ্য দিয়া দেশ-প্রেমের পরিপূর্ণ ধারা উচ্ছল আবেগে প্রবহমান ছিল। এই জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার কথা বাদ দিলে কবিকে ভালরূপে বুঝা যাইবে না। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সেই পরিচয় পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থে আটটি অধ্যায় আছে। 'কৈশোরের স্বপ্নে' তিনি দেখাইয়াছেন, যে পরিবারে কবি জন্মগ্রহণ করেন সেই পরিবারে পূর্ব্ব হইতে স্বদেশী ও জাতীয় ভাব কিরূপ প্রবল ছিল। পারিবারিক আবহাওয়া, হিন্দুমেলার উদ্দীপনা ও রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবের মধ্যে তাঁহার শৈশব কাটিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে তাঁহার বাল্য ও প্রথম যৌবন অতিক্রান্ত হইয়াছে। 'যৌবনের সাধনা'য় দেখানো হইয়াছে, দেশের বাস্তব সমস্যার সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য কি কঠোর সাধনা তিনি করিয়াছেন। আবেদন-নিবেদনের নীতির উপর কবির কোন দিনই আস্থা ছিল না। আত্মশক্তির উদ্বোধন করিতে তিনি জাতিকে দৃপ্তকণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন। ১৯০০ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দকে লেখক 'স্বদেশী যুগের উষা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সময় রবীন্দ্র-নাথ সম্পাদিত নবপর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব হয়। এই অধ্যায়ে 'ডন সোসাইটি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পরিচয় আছে। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের দিনে রবীন্দ্রনাথ নবসূর্য্যের মত নবমহিমায় উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। সেই গৌরবময় কাহিনীর পূর্ণ পরিচয় চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। সেদিনে যে জাতীয়-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। গঠন-মূলক স্বদেশসেবায় রবীন্দ্রনাথ যে যুগের কত অগ্রগামী ছিলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথ দেশ কত পরে গ্রহণ করিল, গ্রন্থকার ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। "জাতীয় স্বাধীনতার জন্য কবির তপস্যার দান অসামান্য।" পঞ্জাবের অনাচারের পর উপাধি-পরিত্যাগকালীন বড়-লাটের নিকট রবীন্দ্রনাথের পত্র, তাঁহার শেষ জন্মদিনের বাণী—'সভ্যতা-সঙ্কট' প্রভৃতির আলোচনা উপসংহারে আছে। 'পরিশিষ্টে' স্বদেশী যুগের বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নহে জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। "জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ" কবির উদ্দেশে রচিত দেশজননীর চরণে গ্রন্থকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি। 'রবিবাসরে'র অধিবেশনে প্রফুল্লকুমার যখন এই বিষয়টি লইয়া বক্তৃতা করেন তখনই তাহা বহু সাহিত্যিকের আনন্দ বিধান করিয়াছিল। আজ গ্রন্থকার ইহলোকে বর্ত্তমান নাই। প্রকাশক নিবেদন করিতেছেন, "গ্রন্থকার তাঁহার জীবিতকালেই গ্রন্থখানির পাণ্ডু-লিপি সমাপ্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।...রবীন্দ্র জন্মদিনে গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প গ্রন্থকারের ছিল।" সেই পুণ্য দিনে প্রকাশক গ্রন্থখানি দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ রবীন্দ্র-স্মৃতিভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে। প্রফুল্লকুমার শুধু খ্যাতনামা সম্পাদক ও সাংবাদিক ছিলেন না, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। এই গ্রন্থখানি পাঠকের চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ, কৌতূহলকে চরিতার্থ এবং অন্তরকে নন্দিত করিবে।

বাসন্তিকা—কবি বসন্তকুমারের শ্রেষ্ঠ-কবিতার সঞ্চয়ন। শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর সম্পাদিত। দীপালি গ্রন্থশালা, ১২৩।১ আপার সার-কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

এই সঞ্চয়ন-গ্রন্থে বসন্তকুমারের একশ আটচল্লিশটি কবিতা আছে। 'অনুবন্ধে' সম্পাদক কবির কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। যে কাব্য পাঠকের-চিত্তে অনুভূতির সঞ্চার করিতে পারে সেই কাব্য সার্থক। এই কাব্য-সংগ্রহের অনেকগুলি কবিতা পাঠকের মনের তন্ত্রীতে সাড়া জাগাইবে। প্রথম কবিতায় কবি বলিতেছেন,

বিশ্ব মাঝে ভূত-সৃষ্টি জীব-সৃষ্টি যথা
মনোমাঝে তেমনই রচনার ব্যথা।

এই 'আমার লেখা' কবিতাটিতেই আছে,

আমার সন্তান যদি হতে নাহি পারে
সবার মনের মত, তুষিতে সবারে,
তাই ব্যর্থ হবে সে কি ?
হে বন্ধু, এ তব বড় বাড়াবাড়ি দেখি !

'দ্বিজেন্দ্রলাল' কবিতায় বসন্তকুমার বলিতেছেন,

কাব্য অনুভূতি মাত্র—কবিচিত্ত বিমল দর্পণ,
ফলিত অরূপ রূপ, মানবের কারণে অর্পণ
তুমি সেই কবি ওগো বিধাতার মানস মুকুর,
সত্যলোক পান্থ আজি—কে জানে সে কতই সুদূর ?

'শরৎচন্দ্রে' বলিতেছেন,

যে ব্যথা গাঁথিলে তুমি কথামাল্যে অক্ষরে অক্ষরে,
সে ব্যথা যে আমাদেরি, তাই তুমি এত প্রিয়তম।

'রাণী' কবিতাটি পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত একটি করুণ কাহিনী—মর্ম্মস্পর্শী। 'শীতের রাতে' কবিতায় শেষ দুটি পংক্তি এই,

বছর বছর আসবে ফাগুন বরমাল্য করে,
আমার মনেই ফুটবে না ফুল, ফাগুন গেছে মরে।

দেশভক্তির কবিতাগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ। 'অগ্রহায়ণে' পল্লীর একটি সুন্দর চিত্র আছে। 'শুল্কদায়িকা' কবিতাটিতে পতিতার মর্ম্মবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। 'মানুষ' কাব্যটি পঁচিশটি সনেটের সমষ্টি।

একার তপস্যা নহে এ তপস্যাখানি
নিখিল মানবে নিতে হবে সাথে টানি।

নির্ব্বাচিত-কবিতা-সংগ্রহের একটি সুবিধা এই, ইহাতে সব ভাল কবিতাগুলি একসঙ্গে পাওয়া যায় এবং কবির কাব্যের ক্রমপরিণতি সহজে বুঝা যায়। কবিতা আনন্দবিধায়িনী। বসন্তকুমারের এই কাব্য সঞ্চয়ন পাঠকের চিত্তবিনোদন করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নবযৌবন—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ; ১৮, বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২॥০।

কয়েকটি গল্প একত্র করিয়া এই 'নবযৌবন' বইখানি, কিন্তু বইটির 'নবযৌবন' নামের সার্থকতা কি বুঝিলাম না ; মলাটের উপর নব-যৌবনান্বিতা একটি নারীর চিত্র ছাপিবার জন্য অথবা ঐ নামে পাঠককে আকৃষ্ট করিবার আকাঙ্ক্ষায় নামটি কল্পিত—কে জানে।

কয়েকটি গল্প ভালই লাগিল। লেখকের দৃষ্টিতে—মানুষের জীবনের সূক্ষ্ম রেখাগুলি সহজ ভাবেই ধরা পড়িয়াছে এবং তিনি সে রেখা আঁকিতেও পারিয়াছেন ভাল ভাবেই। কিন্তু কয়েকটি গল্প পড়িয়া মনে হইল, লেখকের অতিদ্রুত লেখনী পরিচালনার কালে রসভঙ্গ হইয়াছে। সামান্য অবহিত হইলে তিনি নিজেই এ ত্রুটি ধরিতে পারিতেন।

ঘুড়ি—শ্রীদেবদাস ঘোষ। বোস প্রেস : মজঃফরপুর। মূল্য ৩৲ টাকা।

তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় ভাল কাগজে ছাপা উপন্যাস, কিন্তু অনেকগুলি পাত্রপাত্রীকে আনিয়া লেখক গল্পের প্লট তেমন জমাইতে পারেন নাই এবং চরিত্রচিত্রণের দিক দিয়াও বইখানি সার্থক হয় নাই। ভাষায় গতি আছে, কিন্তু স্থানে-অস্থানে উপমার বাহুল্য এবং 'র' স্থানে 'ড়' প্রয়োগ পাঠকের হাস্যোদ্রেক করে—যেমন "ঝুরি ঝুরি সাড়।" "...পাছায় চাপদাড়ী" ইত্যাদি উপমা অসৌন্দর্য্যবোধের পরিচায়ক।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

হৃদয় দিয়ে হৃদি—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। কমলা পাব্‌লিশিং হাউস, ৮।১ এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা।

পল্লীগ্রামের এক নিরাশ্রয়, দরিদ্র তরুণীর দুঃখ-বেদনা, প্রণয়-বিরহ, এবং জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে কেন্দ্র করিয়া এই বিয়োগান্ত উপন্যাসখানি রচিত। বিষয়-বস্তুটি পুরাতন এবং অতি সাধারণ। কিন্তু কুশলী কথা-শিল্পীর নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী এই গতানুগতিক কাহিনীটির উপরেও অভিনব আলোক সম্পাত করিয়াছে। গল্প জমাইবার কৌশলটি লেখক বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। "যেমন ক'রে আলোর আঙুল বাড়িয়ে দিনদেব পদ্মিনীকে স্পর্শ করেন।" ইত্যাদি উপমাগুলিও বিশেষ উপভোগ্য।

ছেলেদের বাবর—শ্রীবাণী গুপ্ত এম-এ, বি-টি। প্রকাশক—শ্রীললিতমোহন গুপ্ত, স্বত্বাধিকারী ভারত ফোটো টাইপ ষ্টুডিও, ৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

ইতিপূর্ব্বে লেখিকা 'ছেলেদের জাহাঙ্গীর' নামক পুস্তকখানি লিখিয়া ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 'ছেলেদের বাবর' তাঁহার পরিকল্পিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের জীবন বৈচিত্র্যময়। মাত্র বৎসর বার বয়সে পিতৃহীন হইয়া তিনি তুর্কীস্থানের একটি রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তারপর নানা অবস্থা-বিপর্য্যয় সত্ত্বেও তাঁহার জীবন ক্রমশঃ সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। তাঁহার সেই সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের কাহিনী তিনি আত্ম-চরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'ছেলেদের বাবর' রচনায় উক্ত আত্মজীবনীর ইংরেজী অনুবাদই লেখিকার প্রধান উপজীব্য হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় স্যার যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন—"এসিয়া দেশের সাহিত্যে বাবরের আত্ম-জীবনী এক অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া গণ্য।" এই অমূল্য গ্রন্থ হইতে আহৃত তথ্যসম্ভার লেখিকা শুধু ছেলেমেয়েদেরই নয়, বয়স্ক এবং রসজ্ঞ পাঠকদের পক্ষেও উপভোগ্য করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার রচনা বর্ণাঢ্য, বর্ণনাভঙ্গী কথা-সাহিত্যের উপযোগী। সেইজন্যই ইতিহাসের কঙ্কালে তিনি প্রাণসঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। মোগল-পদ্ধতিতে অঙ্কিত বহু চিত্র সংযোগে পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বাংলা ভাষার সংস্কার—আবুল হাসানাৎ। দি ষ্ট্যাণ্ডার্ড লাইব্রেরী, বি, ঢাকা। মূল্য সাত সিকা।

আবুল হাসানাৎ সাহেবের লেখক-পরিচিতি আছে এবং মাতৃভাষার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান। সুতরাং বাংলা ভাষার সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রণিধানযোগ্য। বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি সুচিন্তিত এবং অনেকাংশে গ্রহণীয়ও বটে। কিন্তু অক্ষর-সমস্যা সমাধানের যে-পন্থা তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা কতদূর কার্য্যকরী হইবে তাহা বলা যায় না। "পরিশেশে আমার শনিরবন্ধ অনুরোধ আমার দেশবাশি আমার পরশ্তাবিত শংশকারপ্রনালি জেন পরমতশহিশ্নু হইয়া বিচার করেন।" মাতৃভাষার এই বিকৃত রূপ দেখিয়া 'দেশবাশি' তাঁহার "শনিরবন্ধ অনুরোধ" রক্ষা করিতে রাজী হইবেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতার দিনে এই ভাবে যুক্তাক্ষর ভাঙিয়া, প্রচুর কাগজ খরচ করিয়া পুস্তক ছাপিতে প্রকাশকগণও উৎসাহ বোধ করিবেন বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সাহসীর জয়যাত্রা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। প্রকাশক—এস্ কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। পৃ. ১৭৭। মূল্য ১॥০।

যে সকল ক্ষণজন্মা ব্যক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নবযুগের সূচনা করিয়াছেন, লোকোত্তর প্রতিভাবলে স্ব স্ব জাতিকে জয়যাত্রার পথে আগাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের কথা গ্রন্থকার এই পুস্তকে সুখবোধ্য ভাষায় প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এই যে, রাজনীতিঘটিত জটিল ব্যাপারগুলি সুকুমারমতি কিশোরগণও গল্পের মত আগ্রহের সহিত পড়িয়া বর্ত্তমান জগতের প্রগতিশীল-পণের সহিত পরিচিত হইতে পারে। ইহাতে সান-ইয়াৎ সেন ও চিয়াং কাই শেক্, লেনিন, ট্রট্স্কি ও ষ্টালিন, হিটলার ও মুসোলিনী, কামাল আতাতুর্ক ও ডি ভ্যালেরা, মহাত্মা গান্ধী ও জবাহরলাল প্রভৃতি মহাপুরুষ-গণের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ছাপা, ছবি, বাঁধাই ও কাগজের তুলনায় বইখানির মূল্য যথেষ্ট সুলভ বলিতে হইবে। বইখানির চতুর্থ সংস্করণ হইয়াছে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত, এম-এ। ভারতী ভবন, ১১ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

লুইগি পিরাণ্ডেলো, ক্যারেল ক্যাপেক, আলফঁস দদে, গী দ্য মোপাসা পল দ্য মুসে, ইভান বুনিন, ভিসেন্ত ব্লাসকো ইবানেজ প্রভৃতি পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বাংলা ভাষার মারফৎ আজকাল যে কয়জন লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিগূঢ় প্রাণস্পন্দন ও রসবৈচিত্র্য বাঙালী পাঠকসমাজের নিকট পরিবেশনের ভার লইয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর পর্য্যায়ে পড়েন। তাঁহার ভাষা স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, প্রকাশভঙ্গী অকুণ্ঠ ও বেগবান, মূল গল্পের ভাবধারা ও রসপরিবেশনের সম্পূর্ণ উপযোগী। প্রত্যেক গল্পের মুখবন্ধে লেখক ও তাঁহাদের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় গল্পগুলি পড়িবার জন্য পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবে। গ্রন্থকারের নিকট নিবেদন, তিনি যেন বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার হইতে এইরূপ আরও বহু গল্প অনুবাদ করিয়া বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেন।

আগে শেখার বই—শ্রীনীরদবিহারী ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থকার c/o কৃষ্ণকিশোর পাল, ১০এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—সাধ্যমত দান।

এই গ্রন্থখানি কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সাহায্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে একটি নূতন জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। গ্রন্থকার শিশুদিগকে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেখানোকেই লেখাপড়ার প্রধান অঙ্গ মনে করেন না, নৈতিক, স্বাস্থ্যবিষয়ক ও ভবিষ্যৎ জীবনে কার্য্যকরী ব্যবহারিক নিয়মগুলির শিক্ষাদানও প্রাথমিক শিক্ষার অত্যাবশ্যক নীতি মনে করেন। কর্ম্মের অভ্যাসগুলি ও বর্ণপরিচয় প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয় কয়েক স্থানে গদ্যাংশ ব্যতীত আগাগোড়া ছড়ার সাহায্যে (যদিও সেগুলি যথেষ্ট মার্জ্জিত নহে) শিশুদিগকে শেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। তাঁহার প্রদর্শিত শিক্ষা-প্রণালী গ্রামের পাঠশালাগুলিতে প্রবর্ত্তিত হইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

দেশ-বিদেশের কথা

পণ্ডিত ৺কাশীপতি স্মৃতিভূষণ

ভট্টপল্লীর মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত কাশীপতি স্মৃতিভূষণ বিগত ১৩ই আষাঢ় ৮৪



পণ্ডিত ৺কাশীপতি স্মৃতিভূষণ

বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পণ্ডিত মহাশয় স্বীয় অন্নদা চতুষ্পাঠীতে বহু ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতেন। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল।

মহামায়া দেবী

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বৃদ্ধা জননী মহামায়া দেবী বিগত ২২শে জুন আশী বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। উপবিষ্ট অবস্থায়ই হঠাৎ তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। তিনি শিক্ষিতা, ধর্ম্মপরায়ণা ও দানশীলা মহিলা ছিলেন। শ্বশুর অক্ষয়কুমার দত্তের বিরাট্ গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

মহামায়া দেবী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্র উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শেষ বয়স পর্য্যন্তও তিনি ভগবদ্গীতা, পুত্রের গ্রন্থসমূহ ও প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকা নিয়মিত ভাবে পাঠ করিতেন। একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল অপরিসীম। সত্যেন্দ্রনাথেরও মাতৃভক্তির তুলনা ছিল না। তিনি বলিতেন—"মা নেই আমি আছি, এ অবস্থা আমি কল্পনা করতে পারি না।"

কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১৫ই আষাঢ় কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লোকান্তর গমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত তিনি Industry নামক মাসিক পত্রিকাখানি সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সম্পাদন-কৌশল এবং পরিচালনা-দক্ষতায় Industryকে তিনি শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক পত্রিকা-গুলির শীর্ষস্থানে উন্নীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাঁহাদের প্রচেষ্টায় বাংলায় সাংবাদিক সঙ্ঘ (Indian Journalistic Association) গড়িয়া উঠিয়াছিল কিশোরীমোহন তাঁহাদের অন্যতম। বহুকাল তিনি উক্ত সঙ্ঘের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিশোরীমোহন ইংরেজী ভাষায় এক জন সুলেখক ছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের ভূমিকাসম্বলিত তাঁহার *Foundation of a Successful Career* নামক পুস্তকখানি সুলিখিত এবং বিস্তৃত অধ্যয়ন ও সুগভীর চিন্তাপ্রসূত।

অবিনাশচন্দ্র সরকার

গত ২১শে আষাঢ়, বিশিষ্ট ছাপাখানা-ব্যবসায়ী অবিনাশচন্দ্র সরকার পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ৺হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। অতি অল্প বয়স হইতেই অবিনাশচন্দ্র প্রেস-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি ব্রাহ্ম-মিশন প্রেসে সামান্য কর্ম্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন। ক্রমশঃ নিজের চেষ্টায় ও কর্ম্মকুশলতায় তিনি ঐ প্রেসের ম্যানেজারের পদলাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরে প্রবাসী প্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে "ক্লাসিক প্রেস" নামে একটি স্বতন্ত্র প্রেস স্থাপিত করেন। সমাজসেবায়ও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল।

শম্ভুনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ 'আগড়পাড়া কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শম্ভুনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (চাঁদুবাবু) গত ৯ই মে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁর অভাবে দেশ একটি খাঁটি নীরব কর্ম্মীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইল।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

সমগ্র ভারতবর্ষে যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসার জন্য যতগুলি চিকিৎসালয় আছে তন্মধ্যে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালই বৃহত্তম। বাংলাদেশে যক্ষ্মা রোগীদের অবস্থান এবং চিকিৎসার ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ১২৫ বিঘা পরিমাণ জমির উপর হাসপাতালটি অবস্থিত এবং ইহাতে তিনশত রোগীর স্থানসঙ্কুলানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাংলাদেশে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যার তুলনায় এই ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কার্য্যকে সম্প্রসারিত করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। আরও পঁয়তাল্লিশ বিঘা জমির জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছে এবং 'বেডে'র সংখ্যা আরও দুই শত বৃদ্ধি করার কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কর্ত্তৃপক্ষের সমগ্র পরি-কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লাট-পত্নী মিসেস কেসী যখন এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন তখন বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানির মিঃ আর পি সাহা ২,৫০,০০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ময়মনসিংহের মহারাজকুমারগণ একটি অস্ত্র-চিকিৎসা বিভাগ খুলিবার জন্য এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, সলিসিটর চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের নিকট হইতে ২৫,০০০ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। সকলেরই সাধ্যমত অর্থসাহায্য করিয়া এই কল্যাণ-প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা উচিত। টাকাকড়ি নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

ডাক্তার কে এস রায়
৬ এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা।

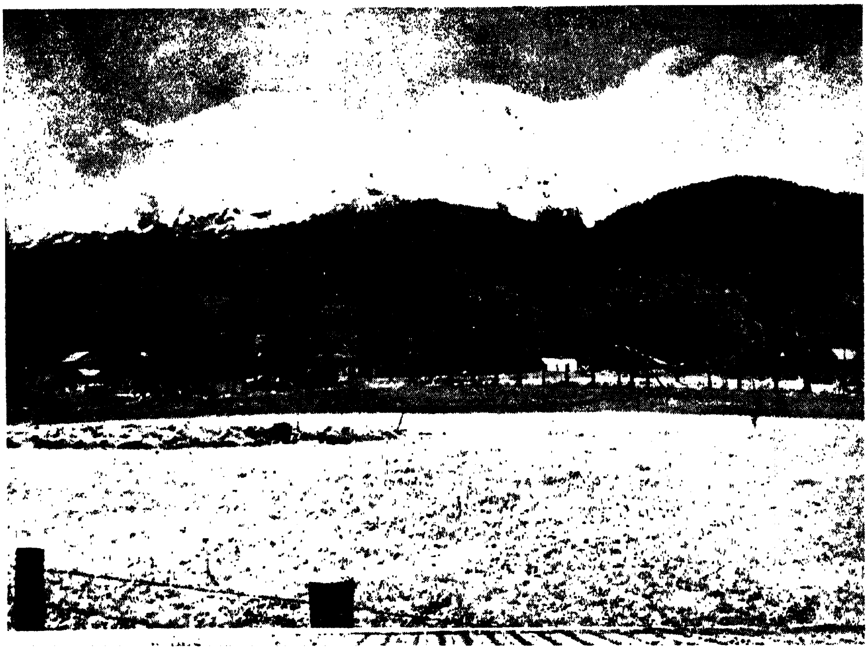
১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



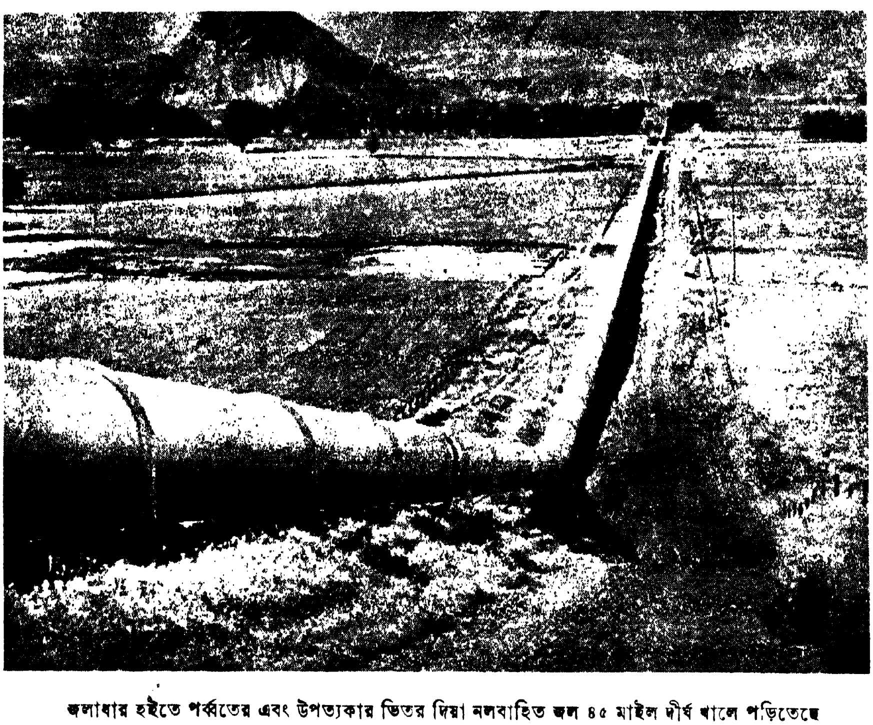
মধু'র পশারা

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]



পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে তুষারমণ্ডিত যাষ্টা পর্ব্বত। এখানকার তুষার গলিত জলে হাজার হাজার একর জমির সেচ হয়



জলাধার হইতে পর্ব্বতের এবং উপত্যকার ভিতর দিয়া নলবাহিত জল ৪৫ মাইল দীর্ঘ খালে পড়িতেছে

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৫২

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

যুদ্ধবিরতি

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শক্তিবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল যে সামর্থ্য ও ক্ষমতার পরীক্ষা তাহার দ্বিতীয় পর্ব আঠার দিন কম ছয় বৎসরে শেষ হইল। পৃথিবীর লোক আবার ক্ষণকালের জন্য নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইতেও পারে। জাপানের পতন এত দ্রুত হইবে তাহা মিত্রপক্ষের রণনায়কগণও অনুমান করিতে পারেন নাই, কেননা যে ধারায় যুদ্ধের গতি চলিতেছিল তাহাতে জাপানী সেনা মরণপণ লড়াই করিয়া পিছু হটিতে হটিতেও অতি দৃঢ়ভাবে বাধা দানের চেষ্টা সমানে করিয়া যাইতেছিল। জাপানের উচ্চতম সমর-পরিষদও শেষ পর্যন্ত লড়িবার সঙ্কল্পই প্রচার করিতেছিল। সে সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া পড়িল দুইটি অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনার অতর্কিত উপস্থিতির ফলে। উহার প্রথম প্রলয়োপম ধ্বংসশক্তিযুক্ত আণবিক বোমার ক্ষেপণ এবং দ্বিতীয় রুশরাষ্ট্রের বিজ্ঞপ্তিকালের অংশমাত্র পার হইবার পূর্বেই যুদ্ধে যোগদান। এই দুইয়ের সহযোগে যে অবস্থার সৃষ্টি হইল তাহাতে জাপানের ন্যায় দুর্ধর্ষ জাতিকেও অস্ত্রত্যাগে বাধ্য করে। সম্মিলিত জাতিদল এখন সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিল এবং তাহাদের শত্রুপক্ষ অক্ষশক্তিদলের ক্ষমতার ধ্বংস সম্পূর্ণ হইল। বলা বাহুল্য, এই জয়লাভ এবং জগতে শান্তি স্থাপন, অর্থাৎ সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, একই কথা নহে। যত দিন যুদ্ধ চলে তত দিন বিবাদী পক্ষদ্বয় চিরস্থায়ী শান্তির কল্পনা জগৎময় প্রচার করে, যুদ্ধের পরবর্তী মুহূর্তেই তাহা ভুলিয়া যাওয়াই পাশ্চাত্ত্য দেশের চিরন্তন প্রথা। বর্তমান ক্ষেত্রে ঐ রীতির ব্যতিক্রম হইবে কি না তাহা দেখিবার সময় এইবার আসিয়া পড়িয়াছে। সান ফ্রান্সিস্কোর বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য শক্তিবাদের ধারা অটুট ছিল এবং সে ধারায় জগতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের আশা মরীচিকা মাত্র। প্রথম জগদ্ব্যাপি মহাযুদ্ধের পর শক্তিবাদের প্রভাব প্রখরতর হইয়া উঠে যাহার ফলে পৃথিবীময় স্থানে স্থানে ছোটবড় যুদ্ধ বিশ বৎসর চলিবার পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠে। এবারকার যুদ্ধের ফল কিছু অন্যরূপ হইয়াছে এবং মার্কিন দেশে ও ব্রিটেনে উচ্চতম সমরপরিচালকদ্বয়ের কার্যক্রমের উপরও সহসা যবনিকা পতন ঘটিয়াছে—এক জনের মৃত্যুর ফলে ও অন্য জনের দল তাহার স্বদেশবাসীর অনাস্থার দরুন পরাজিত হওয়ার ফলে। সুতরাং হয়ত বা এই যুদ্ধের পরে শক্তিবাদের ধারায় কিছু ইতর-বিশেষ ঘটিতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইউরোপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং এশিয়ার মহাদেশখণ্ডে চরম শক্তিসম্পন্ন হইয়া যায়, আফ্রিকায় কিছু বালি ও প্রস্তরপূর্ণ মরুময়স্থান ভিন্ন অন্য সকল অংশই তাহাদের করায়ত্ত হয়। জার্মানীর শক্তির ধ্বংসসাধন এইবারের মত সম্পূর্ণ হয়, উপরন্তু রুশের পতনও প্রায় ব্যাপক ভাবেই ঘটে। মার্কিন দেশ যুদ্ধের ব্যয়ভারের বিরাট অংশ স্কন্ধে লইয়া মনোমালিন্যের ফলে "গোসাঘরে খিল" দিয়া শক্তিচক্র হইতে প্রস্থান করায়, পাশ্চাত্ত্য ইউরোপের শক্তিদ্বয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সসাগরা বসুন্ধরার প্রাচীন জনপদগুলির বাঁটোয়ারার ব্যবস্থায় মনোযোগ করেন। ইটালী লড়িতে গিয়া খোঁড়া হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার জন্য আফ্রিকার মরুভূমিরূপ শুকনো আঁটির ব্যবস্থা হয় এবং জাপান লড়াইয়ে বিশেষ কিছু করে নাই, সুতরাং তাহাকে প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ—অর্থাৎ জলে-ভাসা ছোবড়া—লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে বলা হয়। ফলে পৃথিবীতে "সম্পদ্-হীন" এবং "সম্পদ্‌যুক্ত" নামে দুইটি পক্ষের সৃষ্টি হয় যাহাদের মন-কষাকষির ফলে এই অতি ভয়ানক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের "পেটেণ্ট" নাম ছিল "জগতে যুদ্ধব্যাপার শেষ করার যুদ্ধ" এবং সমস্ত জগৎ ঐ নামের এবং প্রেসিডেণ্ট উইলসনের "চতুর্দশ প্রকরণ"রূপ শান্তি, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মূল মন্ত্রের মূল্য ষোল আনা হিসাবেই গ্রহণ করিয়া পরে দেখে উহার সবটাই মেকি। সাম্রাজ্যবাদীর দল উচ্চকণ্ঠে "স্বাধীনতার জয়" "সাম্যের জয়" "শান্তির জয়" প্রচার করিতে করিতে একের পর এক দুর্বল স্বাধীন জাতির উপর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন, জগদ্ব্যাপী বৈষম্যের সৃষ্টি এবং পৃথিবী হইতে শান্তির বহিষ্কারের ব্যাপক অভিযান আরম্ভ করে। বাহুবলে যে স্বৈরাচার তাহারা জগতের সকল নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ও দুর্বল জনসাধারণের উপর চালাইতে থাকে, অর্থবলে এবং লিখিত ও কথিত মিথ্যার জগদ্ব্যাপী প্রচারের দ্বারা সেইরূপ

পৈশাচিক ব্যবহারকেই তাহারা ন্যায়সঙ্গত ও নীতিযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করে। কিছুকাল পরে অক্ষশক্তিও ইহুদী, আবিসিনিয়াবাসী, গণতন্ত্রবাদী স্পানিয়ার্ড এবং স্বাধীন চীনার উপর চরম নৃশংসতা ও বর্বরতার ক্ষমাহীনতা প্রদর্শন করিবার জন্য মিথ্যা প্রচার আরম্ভ করিলে তাহাদের নিন্দাবাদে যাঁহারা শতমুখ হইয়া উঠেন, যদি বস্তুতঃ তাঁহারা শান্তিবাদী, সাম্যবাদী বা স্বাধীনতাবাদী হইতেন তবে তাঁহাদের অনুসন্ধান করা উচিত ছিল যে অক্ষশক্তি ঐরূপ কার্যধারার নক্সা কোথা হইতে গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জগতে অত্যাচার ও অশান্তি বৃদ্ধির প্রধান কারণই ছিল বিজেতৃবর্গের মধ্যে প্রবলতমদিগের কপটাচরণ এবং মুখে যে আদর্শ প্রচারিত হয় কার্যতঃ তাহাকে পদদলন, ইহা এবারকার বিজেতৃগণ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে এই যুদ্ধের ফলও অনুরূপ হইবেই ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

এবারকার মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের মহাদেশ অঞ্চলে রুশ চরম শক্তিশালী, ফ্রান্স ক্ষীণবল, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্ন এবং অন্তঃকলহে বিভক্ত। বস্তুতপক্ষে সুপ্রসিদ্ধ "আন্তর্জাতিক শক্তি সামঞ্জস্যের" এখন বিষম টলটলায়মান অবস্থা। ব্রিটেন এবার সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত যদিও সৈন্যনাশের হিসাবে তাহার লোকশান গতবার অপেক্ষা অনেক কম। এশিয়ায় চীন অন্তঃকলহের সম্মুখীন এবং রুশ রাষ্ট্রের শক্তিকক্ষার নিকটস্থিত। জাপানের পতনে তাহার এক দিকের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে সত্য, কিন্তু অন্য দিকে অতি প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় এখন সে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে পরমুখাপেক্ষী। সুতরাং রোগের উপশম হইলেও তাহার সুস্থ ও সবল অবস্থা বহু দূরের এবং বহু দিনের কথা। সৈন্যবলে এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পত্তি ও সঙ্গতির নাশে রুশের ক্ষতি সম্মিলিত জাতিবর্গের মধ্যে সকলের অধিক কিন্তু অন্য দিকে তাহার ভবিষ্য সমৃদ্ধির আকর ও আহরণের ব্যবস্থা সকল জাতি অপেক্ষা গরিষ্ঠ। মার্কিন দেশের খরচের অঙ্কের তুলনা একমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানে পাওয়া সম্ভব এবং তাহার ফলে সে দেশের অর্থনৈতিক আভ্যন্তরীণ ভবিষ্যৎ এখন সমস্যায় পরিপূর্ণ। অন্য দিকে কোনও প্রকার লাভের বিশেষ সম্ভাবনা এখনও দেখা যায় নাই এবং আশা করা যায় যে বিজয়মদগর্বিত হইয়া মার্কিন দেশের রাষ্ট্রনৈতিক পদস্খলন হইবে না। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্য জাতির মধ্যে এক মাত্র মার্কিন জাতিই যাহা কিছু পরহিতচেষ্টা দেখাইয়াছে, যদিও ভারতে তাহার নিদর্শন বিশেষ কিছুই আসে নাই, এবং এই যুদ্ধের ফলে যদি তাহারও স্বভাব পরিবর্তন ঘটে তবে 'আধুনিক' সভ্য জগতের আশা-ভরসা খুবই ম্লান।

মোটের উপর এবার সমস্ত জগৎই একপ্রকার দেউলিয়া এবং বিজেতা ও বিজিত সকলেই শ্রান্ত, ক্লিষ্ট, কোন না কোন প্রকারে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ চিন্তাকুল। সহজভাবে দেখিলে এমত অবস্থায় সকলেরই মনে শান্তি ও সাম্যের কথা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, বিশেষতঃ যখন "লঙ্কাভাগে"র কোনও সোজা পথ না থাকে। কিন্তু পরস্বলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী অর্থপিশাচদিগের পথ চিরদিনই সঙ্কীর্ণ ও বক্র এবং এই মহাযুদ্ধে তাহারা যে লোপ পাইয়াছে তাহা নহে। যদি ব্রিটিশ শ্রমিক দল, মার্কিন প্রজাতন্ত্রবাদী ও রুশ সাম্যবাদী তাহাদের আদর্শ উজ্জ্বল রাখে তবে জগতে শান্তি স্থায়ী হইতে পারে। কলিযুগ অবসানের কোনও নিদর্শন যদিও ভারতের মত পঙ্কিকাগ্রস্ত দেশেও দেখা যায় নাই তবুও আশা রাখিতে দোষ নাই, কেননা আশাই জীবনের প্রধান অবলম্বন।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবী ও ভারতবর্ষ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবীর প্রাচীন জনপদগুলির প্রায় সকল অংশই যুদ্ধদেবতার তাণ্ডবলীলার ফলে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থার হিসাবনিকাশে কতকগুলি বৈচিত্র্য দেখা যায় যাহা প্রণিধানযোগ্য। অন্যদেশের লোকও যুদ্ধের দরুন অসীম দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে, চীন এবং রুশ রাষ্ট্রে লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে এদেশের অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক অনুপাতে এবং বিত্তসম্পত্তি নষ্ট ও লুণ্ঠিত হইয়াছে শত শত গুণ অধিক পরিমাণে। ব্রিটেনে সম্পত্তির ধ্বংস হইয়াছে বিষমভাবে, জনসাধারণের মৃত্যু এদেশের তুলনায় সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু ঐ সকল দেশেই মৃত্যু ও সম্পত্তির ধ্বংস ঘটিয়াছে শত্রুপক্ষের কার্যজনিত কারণে এবং সাধারণ ভাবে সকল দুঃখকষ্ট শ্রেণীনির্বিশেষে আপামরসাধারণ সমানভাবে ভোগ করিয়াছে, কেবল মাত্র চীনদেশে এ বিষয়ে অল্প পার্থক্য ছিল। শত্রুপক্ষের আক্রমণ বা তাহার আনুষঙ্গিক কারণে এদেশের জনসাধারণের যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে তাহা অতি সামান্য, এবং সাধারণ লোকও মরিয়াছে ঐ কারণে কয়েক সহস্র মাত্র। দেশের শাসকবর্গের অবহেলা, উপেক্ষা এবং অকর্মণ্যতার ফলে এদেশবাসী যেভাবে না খাইয়া মরিয়াছে এবং যে নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে তাহা বর্ণনার অতীত। ফ্রান্স শত্রুর অধিকৃত হইয়াও এই দুঃখকষ্টের এক শতাংশও ভোগ করে নাই।

আসন্ন যুদ্ধজয়ের মুখেই বিজয়ী দলের এক পক্ষ তাহার সহকারীর প্রতি অবিচার, অবমাননা এবং বঞ্চনা করে এরূপ দৃষ্টান্ত এই অতি কলুষিত জগৎ-সংসারেও বিরল। আফ্রিকা হইতে শত্রুবিতাড়নের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদলের স্থান অতি উচ্চে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার সৈন্য অপেক্ষা কৃতিত্বে বহু ঊর্ধ্বে। কিন্তু শত্রু আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত হইতে না হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদল ভারতীয়দিগের জন্য ভেদাত্মক অন্যায় আইন প্রণয়ন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার যে চরম পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা ইতিহাসে অল্পই পাওয়া যায়।

ভারতের এই দুর্দশা, তাহার প্রতি এই অবিচার, ইহার মূল কারণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের অভাব। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ভারতের স্থান বিজেতৃবর্গের মধ্যে না বিজিতগণের মধ্যে তাহা নির্ণয়ের একমাত্র উপায় ইহার সঠিক নির্ধারণ করা যে এই মহাযুদ্ধের ফলে আমরা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পথে আদৌ অগ্রসর হইয়াছি কিনা, এবং যদি তাহা হইয়া থাকি তাহা হইলে সেটা কতদূর। এ বিষয়েও আমাদের অবহিত হওয়া উচিত যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেভাবে আমাদের উপর মেকি চালানো হইয়াছিল এবারও তাহা না হয়। স্বার্থান্বেষী নীচমনা সুবিধাবাদী সকল দেশেই থাকে, আমাদের দেশে বিদেশী শাসকদিগের কৃপায় সেরূপ অনেকে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দিনকে রাত করা কিছুই অসাধ্য নয়, মেকি চালাইবা

মাত্রই তাহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিবে আমরা খাঁটি সোনা পাইলাম। সেই সময় আমাদের আত্মপরীক্ষা ও বিচারের সময়, তখন স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, আমরা পৌরুষের অভাবে, ধৈর্যের অভাবে স্বাধীনতার দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ পথ ছাড়িয়া সুবিধাবাদের সহজ পথে আত্মপ্রবঞ্চনা করিতে চলিয়াছি কিনা।

সান ফ্রান্সিস্কো বৈঠকে পরাধীন দেশ

সান ফ্রান্সিস্কোর বৈঠকে পাশ্চাত্য শক্তিবাদের ধারা অটুট ছিল এ কথা এখন বিশ্ববিদিত। ঐ অধিবেশন সম্পর্কে মার্কিন ওয়ার্লওভার প্রেস নামক সংবাদপ্রেরক প্রতিষ্ঠান কিছু খবর দেয়, তাহার সারমর্ম এইরূপ :

"সান ফ্রান্সিস্কোর বিলাসভবন ফেয়ারমাউন্ট হোটেলে সৈনিকরক্ষীযুক্ত তালাবন্ধ দরজার আড়ালে পরাধীন অঞ্চলগুলি সম্পর্কে সুদীর্ঘ, এবং কখনও বা গরম গরম, তর্কবিতর্ক চলে। যথা প্রচলিত রীতিতে এক গুরুগম্ভীর শব্দ পরিপূর্ণ চুক্তি স্থির হয় যাহা অনুমোদন করে তিন বৃহৎ শক্তি এবং সেই সঙ্গে ফ্রান্স ও হলাণ্ডের মত কয়েকটি উপনিবেশযুক্ত দেশ।

"সোভিয়েটের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে প্রায় বোমাবিস্ফোরণের মত কাণ্ডের সৃষ্টি করেন। এক লম্বা ক্লান্তিকর অধিবেশনে কমাণ্ডার স্টাশেন এমন ভাবে শব্দবিন্যাসের চেষ্টা করিতেছিলেন যাহাতে লণ্ডনের "বিশ্বস্ত সাম্রাজ্যরক্ষক" লর্ড ক্রানবোর্ন এবং মার্কিন সিনেটর কোনালি দুজনেই খুশী থাকেন। সে সময়ে সোভিয়েটের প্রতিনিধি এ সোবোলেভ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলেন যে, তাঁহার গবর্মেণ্ট এবিষয়ে কোন দ্বৈতভাব চাহেন না, হয় এই অধিবেশন সমস্ত বিদেশী শাসিত দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতাদানের প্রতিশ্রুতি দিবে, নহিলে এইরূপ অবাস্তব ঔপপত্তিক যুক্তিতর্কে সময় নষ্ট করা বৃথা।

"একথা শুনিয়া লর্ড ক্রানবোর্নের হিক্কা আরম্ভ হইয়া দম আটকাইবার উপক্রম হয় এবং ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক বিশেষজ্ঞ, পল এমিল নাগিয়ে হতভম্ব হইয়া তাঁহার কাগজপত্র নাড়িতে থাকেন, কিন্তু রুশ প্রতিনিধি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত স্টেটিনিয়াস, ইডেন, মলোটোভ একজোট হইয়া এই সমস্যা পূরণে বসিলেন। অনুবাদকের দল আনাইয়া 'স্বাধীনতা' বনাম 'স্বায়ত্তশাসন'—এই দুই শব্দের অতি সূক্ষ্ম অর্থ ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিতি ব্যাখ্যা শুনান হয় কিন্তু রুশ বৈদেশিক কমিশার মহাশয়ের তাহাতে কিছুই মতান্তর হইল না। শেষ পর্যন্ত চুক্তিতে 'স্বাধীনতা' শব্দ রাখা হইল কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ এক শব্দবিন্যাস করা হইল যে কার্যতঃ স্বাধীনতা শব্দকে অর্থহীন করা হইল।"

এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃত রূপ একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্যে পাওয়া যায়, "শয়তান যখন রোগাক্রান্ত হয় তখন সে সন্ন্যাস গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করে, রোগমুক্ত হইলে শয়তান আরও প্রবলভাবে অধর্মাচরণ করে।" সান ফ্রান্সিস্কোর বৈঠকে ঐ প্রবাদের যথার্থতা প্রমাণিতই হইয়াছিল।

সান ফ্রান্সিস্কো এবং ত্রিমূর্তির পৃথিবী শাসন

বস্তুতপক্ষে সান ফ্রান্সিস্কোতে জগতে শান্তি, মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা আদৌ হয় নাই, হইয়াছে মাত্র সসাগরা বসুন্ধরার রাজচ্ছত্রের অধিকার দান মার্কিন, রুশ এবং ব্রিটেন এই ত্রিমূর্তিকে। পৃথিবীর অন্য সকল দেশ, জাতি বা রাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা এখন এই তিন শক্তি। অন্য সকল রাষ্ট্রই এই ব্যবস্থায় হয় সম্পূর্ণ পরাধীন নয় সামন্ত রাষ্ট্র মাত্র। উক্ত 'ওয়ার্লডওভার প্রেসে'র সংবাদে বুঝা যায় যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ দূর করার কোনও সুচিন্তিত ব্যবস্থা ওখানে হয় নাই, হইয়াছে মাত্র পৃথিবীর সমগ্র যুদ্ধশক্তি ঐ তিন বৃহৎ দেশের হাতে দেওয়া।

ইহার মধ্যে মার্কিন প্রভাব-যুক্ত গোষ্ঠীই অর্থনীতির ক্ষেত্রে এবং কতকটা অন্য দিকেও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইবে। উত্তর-আমেরিকা তো ইহাতে আছেই, কেননা কানাডা সাম্রাজ্য হিসাবে ব্রিটেনের সহিত যুক্ত হইলেও রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে মার্কিন দেশের সহিত ক্রমেই নিকটতর সম্বন্ধযুক্ত হইতেছে। উপরন্তু বিশটি লাটিন আমেরিকান রাষ্ট্র, প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশ ইহার ভিতর আসিবে। চীন মার্কিন প্রভাবমার্গেই থাকিবে যদিও সোভিয়েট রুশ সেখানে প্রভাব বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত।

ব্রিটেনের সাম্রাজ্য অটুট থাকিবে যদিও গোলমাল মিটাইয়া স্বাধীনতাদানের জন্য ধুমধাম করিয়া অধিবেশন, গোল বা চৌকা বৈঠক ইত্যাদির উদ্যোগ-আয়োজন চলিতে থাকিবে, ইহাই ওয়ার্লড ওভার প্রেসের সংবাদদাতার খবর। ব্রিটেনের সঙ্গে থাকিবে অনেকগুলি ছোট বড় ইউরোপীয় জাতি।

ভূমি অধিকার সম্পর্কে বৃহত্তম প্রভাব কক্ষ হইবে সোভিয়েট রুশের। সোভিয়েটের নিজস্ব ৮০ লক্ষ বর্গ মাইল অধিক ভূমি ছাড়াও ফিনল্যাণ্ড, বল্টিক অঞ্চল, পোল্যাণ্ড, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার অধিকাংশ, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রীস বাদে বলকান অঞ্চল ইহার প্রভাবমার্গে থাকিবেই এবং সম্ভবতঃ মাঞ্চুরিয়া এবং কোরিয়ার অংশও আসিবে। এই সমষ্টি অতি দৃঢ়বদ্ধ ভাবে চলিবে যদিও সকলে কমিউনিষ্ট পন্থা নাও লইতে পারে।

ফ্রান্সের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রূপ। সেও এই 'প্রভাবকক্ষ' গঠনে চাল চালিতে গিয়াছিল কিন্তু ফলে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী হইয়াছে। হতাশ হইয়া দ্য গল ও তাঁহার বৈদেশিক মন্ত্রী জর্জ বিদল সোভিয়েট রুশের দিকে ফেরেন। কিন্তু মস্কো দেহমনপ্রাণের সম্পূর্ণ সমর্পণ ভিন্ন কোন কথাই শুনিতে অসম্মত। ইতিপূর্বেও ইয়াল্টা এবং সিরিয়ার ব্যাপারে সোভিয়েট তাহাকে দাগা দেওয়ায় ফ্রান্স মার্কিনের গোষ্ঠিতে যাইতে চাহে কিন্তু মার্কিন এখন ইউরোপীয় কূটরাষ্ট্রনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ। সুতরাং বাকী রহিল ব্রিটেন।

বলা বাহুল্য, এই বজ্রআঁটুনী তত দিনই যত দিন ত্রিমূর্তি এই পরস্পরের সহিত সত্যই মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে। সে বন্ধন ছিঁড়িলেই আবার যুদ্ধের অগ্ন্যুৎপাত হইবে, কেননা ইতিমধ্যেই ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী প্রেস আণবিক বোমার দ্বারা সোভিয়েটকে হুমকি দেওয়া আরম্ভ করিয়াছে। এই আণবিক বোমা পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম পরিণতি এবং ইহার দ্বারাই সেই কার্য শেষ হইবে যাহা বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারের সহিত আরম্ভ হইয়াছিল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত

আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ (ওয়াশিংটন, ১৮ই জুলাই), মার্কিণ কংগ্রেসের ইলিনয় হইতে নির্বাচিত রিপাবলিকান সদস্য মিঃ এভারেট এম. ডার্কসেন প্রতিনিধি পরিষদে বলেন যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারিগণ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনর্গঠন ব্যবস্থায় ত্রুটিবিচ্যুতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। তিনি এই দাবি করেন যে, কংগ্রেসের সদস্যদিগকে লইয়া গঠিত একটি কমিটির সাহায্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেরও অনুরূপ তদন্তের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তদুপরি তিনি ইহাও বলেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য ও পুনর্গঠন ব্যবস্থানুযায়ী যে-সব মাল সরবরাহ করা হয় তাহার বিলি-ব্যবস্থা কিরূপে হইয়া থাকে তাহা জানা দরকার, কারণ কায়রো, বারি, ইটালি ও অন্যান্য স্থানে চোরাবাজারসমূহে ঐরূপ বহু মালের আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট ভারতীয় রাজস্ব হইতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ৮ কোটি টাকা পাওয়াইয়া দিয়াছেন। ইহারা ভারতবর্ষকে কোন প্রকার সাহায্য করে নাই। এই টাকাটা দেশে থাকিলে এবং যে-কোন প্রদেশের স্থায়ী উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইলে যথেষ্ট উপকার হইত।

মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসি

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত মহেন্দ্র চৌধুরীর প্রাণ রক্ষার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বিহার গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ফাঁসি দিয়াছেন।

সিমলা সম্মেলনে লর্ড ওয়াভেল অনুরোধ করিয়াছিলেন পূর্বের তিক্ততা সকলে যেন ভুলিয়া যান, পরস্পর পরস্পরকে যেন ক্ষমা করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, সীমান্তে লালকোর্ত্তাবাহিনীর উপর বেপরোয়া গুলি, লবণ সত্যাগ্রহে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিসের লাঠি তুলিয়া যাওয়া শক্ত, উপরন্তু গত আন্দোলনে ভারতব্যাপী পুলিস ও মিলিটারীর তাণ্ডব, আকাশ হইতে নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের উপর মেশিন-গান চালনা, মেদিনীপুর এবং অষ্টি-চিমুরে নারীর উপর পুলিস ও মিলিটারীর পাশবিক লাঞ্ছনা এ সকল অভিযোগের যথাযথ তদন্ত এবং সুবিচার না হওয়া পর্যন্ত এদেশের লোকের মন হইতে খেদ ও বিদ্বেষ লোপ পাইতে পারে না। তথাপি লর্ড ওয়াভেলের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করিয়া দেশ গবর্মেণ্টকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পুনর্বার প্রথম আঘাত তাঁহারাই হানিলেন।

৯ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে বক্তৃতা দেন তাহাতে প্রথমেই তিনি মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের মনোভাবের সত্যই কিছু পরিবর্তন হইয়াছে মনে করিয়া কংগ্রেস পূর্বস্মৃতি ভুলিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসিতে বুঝা গেল কর্তৃপক্ষের সেই পুরাতন মনোবৃত্তি আজও পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। শ্রমিক গবর্মেণ্ট গঠনের পর ইহাই প্রথম রাজনৈতিক ফাঁসি এবং তাঁহারা ইহার দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না।

প্রাণদণ্ডের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিতে চাই না। শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে লর্ড ওয়াভেল প্রথমেই যে মৈত্রীর কথা বলিয়াছিলেন, এই শোচনীয় ঘটনার সহিত তাহার সামঞ্জস্য রহিল না।

মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসির পর গান্ধীজীর বিবৃতি

মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসির পর গান্ধীজী এসম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শান্ত ও সংযত এই বিবৃতিতে ব্রিটিশ বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে তীব্র কশাঘাত রহিয়াছে, এ দেশের শাসকবৃন্দকে তাহা সচেতন করিতে পারিবে কি না জানি না। বিবৃতিটি নিম্নে দেওয়া গেল :

"মহেন্দ্র চৌধুরীকে ফাঁসিমঞ্চ হইতে বাঁচাইবার জন্য আমার ন্যায় যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি জানি তাঁহারা এই ফাঁসির সংবাদে মর্মাহত হইয়াছেন। এরূপ মর্মন্তুদ ঘটনা আরও অনেক ঘটিবে। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, এরূপ প্রত্যেকটি ঘটনা হইতেই যেন আমরা নূতন শিক্ষা গ্রহণ করি।

"দেখা যাক এই ফাঁসি হইতে আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ সরকার পক্ষের কথা এই: যে ডাকাতির অভিযোগে ফাঁসি হইয়াছে তাঁহারা উহাকে রাজনৈতিক ডাকাতি বলেন না। সব ডাকাতি রাজনৈতিক কার্য নয় ইহা নিশ্চিত। অনেক পেশাদার দস্যু রাজনৈতিক আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। দেশীই হউক আর বিদেশীই হউক কোন গবর্মেণ্ট এরূপ অপরাধের শাস্তি না দিয়া পারে না। কর্তৃপক্ষের ধারণা মহেন্দ্র চৌধুরী এরূপ ডাকাতিতে জড়িত ছিল এবং এইজন্য তাঁহারা উহার প্রতি আইনানুসারে চরম দণ্ডের বিধান হইতে দিয়াছেন।

"এবার দেশবাসীর কথা। তাহারা জানে মহেন্দ্র চৌধুরী ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক। রাজনৈতিক বা পেশাদার কোন ডাকাতিতেই যোগদানের ইচ্ছা তাহার ছিল না। সে আত্মগোপন করিয়াছিল। সন্দেহজনক সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাহার বিচার ও দণ্ড হইয়াছে। সাক্ষ্য প্রমাণ অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা না করা এবং উহার বলে দণ্ডদান বিচারকদের মর্জির উপর নির্ভর করে; অনেক সময় তাঁহারা অভিযুক্তের প্রতি বিরূপ মনোভাব লইয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হন।

"দেশবাসীর এই ধারণা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে আমি বলিব এই ফাঁসি নরহত্যার নামান্তর এবং ইহা আরও জঘন্য এই জন্য যে ন্যায় বিচারের নামে এই হত্যা করা হইয়াছে।

"সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একদল আইনজ্ঞ ব্যতীত আর কে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিতে পারে? নথিভুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ এবং নিম্ন ও উচ্চ আদালতের রায় হইতেই তাঁহাদিগকে উহা করিতে হইবে।

"ভাবপ্রবণতার স্রোতে আমরা যেন ভাসিয়া না যাই, মহেন্দ্র চৌধুরী আর ইহজগতে নাই এই সত্যও যেন না ভুলি। জনমতের প্রতি গবর্মেণ্টের যদি বিন্দুমাত্র মর্য্যাদাবোধ থাকে, নিছক

পশুবলই যদি তাঁহাদের একমাত্র সম্বল না হয়, তবে তাঁহারা আর সকলের ন্যায় সমান আগ্রহের সহিত সত্য উদ্ধারের জন্য জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিবেন।"

ন্যায় বিচারের প্রধান কথাই এই যে, লোকে যেন উহা সুবিচার বলিয়া মনে করিতে পারে। কিছুদিন আগে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও বলিয়াছিলেন বিচার শুধু করিলেই হইল না, রায় এমন হওয়া চাই যেন প্রতি লোকে ন্যায় বিচার হইয়াছে মনে করে। বলা বাহুল্য, এ দেশে ন্যায় বিচারের এই নীতি সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। প্রধান বিচারপতি পোলার্ডের যে মামলা উপলক্ষে উপরোক্ত উক্তি করিয়াছিলেন লোকে তাহাকে ন্যায় বিচার বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। ইহার পর আরও দুইটি মামলায় ব্রিটিশ ন্যায় বিচার সম্বন্ধে দেশবাসীর ধারণা আরও শিথিল হইয়াছে। হাওড়ায় যে গোরা সৈনিক রিভলবার দেখাইয়া ঘরে ঢুকিয়া এক রুগ্না তরুণীর উপর পাশবিক অত্যাচারের অপরাধে জেলা জজ কর্তৃক দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, হাইকোর্টের ইংরেজ বিচারপতি তাহার প্রায় অর্ধেক কমাইয়া দিয়াছেন। অথচ যে অবস্থায় এই জঘন্য ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে লোকে প্রথম দণ্ডকেই লঘু বলিয়া মনে করিয়াছে।

কয়েক দিন আগে কলিকাতার ইংরেজ প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এক মামলায় জাতি বিচারের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। একটি নৌ-সৈনিক একদল শ্রমিককে রিভলবার তুলিয়া ভয় দেখাইতেছিল। হঠাৎ রিভলবার হইতে গুলি বাহির হয় এবং দুই ব্যক্তি আহত হয়। তন্মধ্যে একজন মারা যায়। মৃত ব্যক্তির বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এই অপরাধের জন্য ৪০০৲ টাকা জরিমানা করেন এবং আদেশ দেন জরিমানার টাকা আদায় হইলে ৩০০৲ টাকা মৃত যুবকের পিতাকে দেওয়া হইবে। রায়ে তিনি বলিয়াছেন, নাবিকটির কোন অসদভিপ্রায় ছিল না, রিভলবার হইতে যে গুলি বাহির হইতে পারে তাহা সে মনে করে নাই।

অপরাধী যেখানে ইংরেজ সেখানে বিচারকদের, বিশেষতঃ ইংরেজ বিচারকদের, অসামান্য করুণা তাহাদের প্রতি বর্ষিত হয়, অপরাধী যেখানে ভারতীয় এবং অপরাধ যেখানে রাজনৈতিক, সেখানে তাঁহারা দণ্ডদানে যমরাজকে অনুকরণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করেন—ইহা আজ সর্ব্বজনবিদিত অভিজ্ঞতা। অস্তি-চিমুরের রাজনৈতিক উত্তেজনায় একজন সরকারী কর্মচারী নিহত হইয়াছিল বলিয়া ১৫ জনের প্রাণদণ্ড বিধানে ন্যায় বিচারকেরা কুণ্ঠিত হন নাই। তাহার মধ্যে এখনও সাত জন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে অনিশ্চিতভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে।

রংপুরের পল্লীতে পুলিসের নিদারুণ অত্যাচারের অভিযোগ

গত ২৯শে জুলাই রংপুর জেলার লালমণিরহাট থানার অন্তর্গত বৈদ্যের বাজার গ্রামে পুলিসের এক নির্মম অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কুড়িগ্রামের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত হরিদাস লাহিড়ী এ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন হইলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিতেছি না। ৮ই আগষ্ট তাঁহার বিবৃতিটি ইউনাইটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে এবং সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। গবর্মেণ্টের কোন প্রতিবাদ আমাদের আজও চোখে পড়ে নাই। ঘটনার বিবরণ বিবৃতি হইতেই পাওয়া যাইবে। নিম্নে উহা দেওয়া গেল:

> প্রত্যেকটি অত্যাচারিত গৃহ আমি পরিদর্শন করিয়াছি। দরিদ্র এবং নিতান্ত সরল গ্রামবাসীদের বহু কষ্টে সঞ্চিত সামগ্রীর যে গুরুতর ক্ষতি করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। ২৩শে জুলাই বিকালে গুজব রটিল যে, ঐ দিন রাত্রিতে পুলিস গ্রাম আক্রমণ করিবে। এই খবর পাইয়াই গ্রামের শতকরা ৯৫ জন লোক ঘরে তালাচাবি লাগাইয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া প্রাণের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। প্রত্যাশিত আক্রমণ কিন্তু ২৯শে জুলাই আরম্ভ হয়। দলে দলে বিভক্ত সশস্ত্র পুলিস কোনরূপ বাছবিচার না করিয়া প্রত্যেক গৃহে হানা দেয় এবং প্রত্যেক গৃহের সমস্ত দ্রব্যাদি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। তালাচাবি দেওয়া গৃহের দরজা তাহারা ভাঙিয়া ফেলে; * * * গ্রামবাসীদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু ধান ও চাউল প্রভৃতি জিনিষগুলি তাহারা উঠানে বৃষ্টির মধ্যে ছড়াইয়া দেয়।
>
> আমি গণেশ বর্মণ, বিরজা বর্মণ, বসন্ত রায়, যতীন রায়, দ্বারিকানাথ বর্মণ এবং গন্ধর্ব বর্মণের গৃহ পরিদর্শন করিয়াছি। * * * প্রকৃতপক্ষে গণেশ বর্মণের সংসারে এখন আর কিছুই নাই; সে একজন পথের ভিখারী মাত্র। পুলিসরা তাহার কুপটি পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে। বসন্ত রায়ের গৃহে ঢুকিয়া অত্যাচারীরা তাহার হারমোনিয়াম এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে। বহু বাসনপত্র তাহারা ভাঙিয়া ফেলে। একটি পকেট ঘড়িও তাহার গৃহে পাওয়া যাইতেছে না। গন্ধর্বনারায়ণের পুত্র একজন শিক্ষক। স্কুলের একটি গ্লোব এবং অন্যান্য স্কুল সংক্রান্ত জিনিষপত্র তাঁহার গৃহে ছিল। সে সমস্তই ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে। বিরজার গৃহে রিলিফ কেন্দ্র অবস্থিত। রিলিফ সংক্রান্ত অনেক দ্রব্যাদিও নষ্ট করা হইয়াছে।
>
> দুঃখের কাহিনীর ইহাই সব নয়। আমন ধানের বীজগুলিও নষ্ট করিয়া ফেলার ফলে কৃষকদের সম্মুখে এক মহা দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। অক্টোবরের মধ্যে বিপদ নিশ্চিত রূপেই আসিবে।
>
> গ্রামবাসীরা দারোগাকে অপদস্থ করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মূলে কোন সত্যতা নাই। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন—এই খবরও সত্য নহে। বস্তুতঃ তাঁহাদের কেহই এখনও ঘটনাস্থলে আসেন নাই।

বাংলার লাট মিঃ কেসি কলিকাতার বাজার বস্তি প্রভৃতি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। এই অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচরও হইয়াছে কি না আমরা জানি না। তিনি শুধু কলিকাতার লাট নহেন, সমগ্র বাংলার

শাসন-শৃঙ্খলার ভার তাঁহার উপর ইহা তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। এই ঘটনার বিষয়ে আপাততঃ যতটুকু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় উহার সূত্রপাত এই : এক বিধবা নাপিতানীর আত্মহত্যার চেষ্টা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে গত ২৩শে জুলাই তারিখে লালমণিরহাট থানার বড় দারোগাকে নাকি মারপিট করা হয়। ঐ দিনই সন্ধ্যায় গুজব রটে যে, পুলিস খুব শীঘ্রই গ্রামে সদলবলে ঢুকিয়া গ্রামবাসীদিগকে নির্য্যাতন করিবে। সেই রাত্রিতেই শতকরা ৯৫ জন গ্রামবাসী ঘরবাড়ী তালাবদ্ধ করিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যাদিসহ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ২৯শে তারিখে পুলিস হানা দেয়।

সর জন হার্বার্টের আমলে মেদিনীপুরে আইন রক্ষার নামে যে গুণ্ডারাজের স্থাপনা করা হয় এই ঘটনায় আমরা তাহারই পরিণতি দেখিতেছি। মেদিনীপুরে পুলিস গুণ্ডামির উৎসাহ ও প্রশ্রয়-দাতা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদোন্নতি হইয়াছে, সর জন হার্বার্ট তাঁহার আচরণ সম্পর্কে কোন তদন্ত পর্য্যন্ত হইতে দেন নাই। মিঃ কেসি এই ব্যাপারে কোন পথ অনুসরণ করিয়া চলিবেন তাহার নির্দ্দেশ এখনও আসে নাই। ২৯শে জুলাইয়ের ঘটনার প্রাথমিক তদন্তের ব্যবস্থা ১২ই আগষ্ট পর্য্যন্ত হয় নাই ইহাই আমরা দেখিতে পাইতেছি।

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও জলপথ ব্যবস্থা

শ্রীযুক্ত গগনবিহারীলাল মেহ্‌টা কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে ভারতের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও যুদ্ধোত্তরকালে জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে যুদ্ধের পর ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা নিতান্ত দরকার—শ্রীযুক্ত মেহ্‌টা বিশেষ ভাবে এই বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, নৌসংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জ্জাতিক পরিকল্পনা রচিত হইতেছে তাহাতে যুদ্ধোত্তর কালে ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। ব্রহ্মদেশ, আফ্রিকা, ইরাক, ইরাণ, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলে তাহাতে ভারতীয় জাহাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সমস্ত দেশের সহিত জাহাজের মাল আদান প্রদানের ব্যবসা বর্ত্তমানে সম্পূর্ণরূপে শ্বেতাঙ্গ কোম্পানীগুলির করায়ত্ত। ভারতের উপকূলস্থ শহরগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যও প্রধানতঃ উহাদেরই হাতে। ভারতীয় জাহাজ-কোম্পানীগুলি ইহার সামান্য ভাগই পাইয়া থাকে। ইহাদের অন্যায় ও অসম প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি ভারতীয় কোম্পানীগুলির নাই। গবর্মেণ্ট ইহার কোন প্রতিকার তো করেনই নাই বরং ভারত-শাসন আইনে বিভিন্ন ধারা সংযোগ করিয়া এই অসাধু প্রতিযোগিতাকে আইনসঙ্গত ও চিরস্থায়ী করিবারই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভারতের উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর হাতে আনিবার জন্য বহু বৎসর যাবৎ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু বিলাতী জাহাজ কোম্পানীর বাধায় তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই।

শুধু উপকূল বা বহির্বাণিজ্য নয়, ভারতের নদীপথের জাহাজ চলাচলও প্রধানত ইংরেজ কোম্পানীর হাতে। রেলপথ ও জলপথের মধ্যে কোন যোগসূত্র নাই। ভারত-শাসন আইনে রেলপথ কেন্দ্রীয়-সরকারের হাতে, জলপথ প্রাদেশিক সরকারের নেতৃত্বাধীন। শ্রীযুত মেহ্‌টা বলেন আভ্যন্তরীণ জলপথগুলিকেও কেন্দ্রীয়-সরকারের পরিচালনাধীনে আনা প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, রেল, ষ্টীমার, মোটর এবং এরোপ্লেন, যানবাহনের এই চারিটি উপায়ই কেন্দ্রীয়-সরকারের হাতে থাকা উচিত এবং এমন ভাবে এগুলি পরিচালিত হওয়া দরকার যাহাতে ইহাদের মধ্যে কোনটি একচেটিয়া ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়া যাত্রী-সাধারণের ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি করিতে না পারে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতা থাকা দরকার। বর্ত্তমান ভারত-সরকার রেল-পথকে সর্ব্বপ্রধান করিয়া ব্রিটিশ স্বার্থসাধনের যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার অবসান হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বাংলায় দুগ্ধাভাবের একটি কারণ

বাংলায় দুগ্ধাভাবের কারণ এবং সরকারী গুদামে দুধের অপচয় সম্বন্ধে মেদিনীপুরের শ্রীমতী উষা চক্রবর্ত্তীর একখানি পত্র দৈনিক কৃষকে (২৪শে শ্রাবণ) প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন :

"শিশুর ও রোগীর প্রয়োজনীয় খাদ্য দুধের অভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় পূর্ব্বে দুধের অভাব বিশেষ ছিল না। বিশেষ করিয়া কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল প্রভৃতি এলাকায় দুধ খুবই সস্তা ছিল। ১৯৪২ সালে সাইক্লোন হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। খাদ্যাভাবে গো-মড়কে বহু দুগ্ধবতী গাভী মারা গেল। ফলে জেলায় বেশ দুধের অভাব দেখা দিল। এখন গাভী ও মহিষ যাহাও বা আছে, খড়, খইল, লবণ ইত্যাদির দাম অত্যন্ত বেশী হওয়ায় খাদ্যাভাবে তাহারা পূর্ব্বের মত দুধ দেয় না। খাদ্যাভাবে গাভী ও মহিষের প্রজনন-শক্তিও কমিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বড়লাট লিনলিথগো সাহেব দুধের দুরবস্থা দেখিয়া ভাল গাভী প্রজননের জন্য ভাল ষাঁড় আমদানী করিবেন বলিয়া বহু গ্রামে দেশী ছোট ষাঁড়গুলিকে অস্বাভাবিক উপায়ে শক্তিহীন করিয়া দিবার আদেশ দেন। কিন্তু আর ভাল ষাঁড় আমদানী করা হয় নাই। গো বংশ বৃদ্ধি না পাওয়ার তাহাও একটি কারণ।"

লর্ড লিনলিথগোর বড়লাটত্বে প্রজনন ষণ্ড লইয়া যখন হৈ-চৈ চলিতেছিল সেই সময়ে বাংলা-সরকারের কৃষি-বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে গ্রামের ষণ্ডকুলের প্রজনন-শক্তি হ্রাসের কৃতিত্বের বিবরণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই অতি উৎসাহের ফল কি হইয়াছে উপরোক্ত পত্র তাহার প্রমাণ। মানুষের খাদ্য সম্বন্ধে যে গবর্মেণ্টের আগ্রহের লেশমাত্র নাই, গবাদি পশুর জন্য তাহাদের মাথা না ঘামানোই স্বাভাবিক। লর্ড লিনলিথগোর আমলে এ দেশে গবাদি পশুর ধ্বংসের সূচনা, সর জন হার্বার্টের লাটগিরিতে তাহার চূড়ান্ত পরিণতি।

ভিন্ন প্রদেশ হইতে গাভী আনাইয়া দুগ্ধ সরবরাহ বাড়াইবার কথা হইয়াছিল। তাহার কি ফল হইয়াছে, কৃষি-বিভাগের

বর্তমান ডিরেক্টরের নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটিতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সরকারের খরচে অর্থাৎ গৌরী সেনের টাকায় বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"যুক্ত প্রদেশের সরকার নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক সুপারিশ-কৃত ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রত্যেক মাসে ১০০০ করিয়া দুগ্ধবতী গো-মহিষাদি পশু রপ্তানী করিতে অনুমতি দিয়াছেন। কেবল মাত্র প্রকৃত দুগ্ধ উৎপাদনকারী—যাহাদের এইরূপ আমদানী করা গো-মহিষাদি পশু যত দিন পর্যন্ত শাবক উৎপাদনে সক্ষম তত দিন পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং যাহারা এই মর্মে অঙ্গীকার পত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া দিবেন যে, তাঁহারা এইরূপ আমদানী করা গো-মহিষাদি পশু নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করিবেন না—তাঁহাদিগকে আম-দানী করার পারমিট দানের জন্য সুপারিশ করা হইবে। ইহা পূর্বেই বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তির চাহিদা না থাকায় বঙ্গদেশের জন্য নির্দিষ্ট সমস্ত পশু বঙ্গদেশে আসিতেছে না। নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রকৃত দুগ্ধ উৎপাদন-কারিগণ হইতে পুনরায় এইরূপ সুপারিশের জন্য আবেদন-পত্র আহ্বান করা হইতেছে। যাহারা গো-মহিষাদি পশুর ব্যবসা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের জন্য পারমিট সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে না। এন এম খান, ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার, বেঙ্গল।"

জুলাই মাসের বেতার বক্তৃতায় লাটসাহেব বলিয়াছিলেন যে, বরফের অভাবে কলিকাতায় মাছের আমদানী কম হয় বলিয়া লোকে বলে, অথচ মৎস্যজীবীরা বরফ পাইলেও তাহা লইতে আসে না। ইহার প্রতিবাদ হইলে লাটসাহেব আশ্বাস দেন তিনি ভাল করিয়া সন্ধান লইবেন। লোকে জানে বরফ পাওয়া যায় না, পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও উহা কণ্ট্রোলের কণ্টক-জালে এমন ভাবে জড়িত যে সাধারণ লোকে উহার প্রতি হাত বাড়াইতে সাহস পায় না। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের উক্তিও আমরা সমান অসত্য বলিয়া মনে করি। গাভী আম-দানীর লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত কেহ করে না, ইহার তাৎপর্য এই নয় যে, দেশে গাভীর অভাব নাই, অথবা গাভী আমদানীর ইচ্ছা বা আগ্রহ কাহারও নাই। আসল ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, পারমিটের কণ্টকজাল ভেদ করিবার জন্য আগাইয়া আসিবার বুকের পাটা ব্ল্যাক মার্কেটের ওস্তাদ লোক ছাড়া আর কাহারও নাই। রোলাণ্ড কমিটিও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এই পারমিট-দাতাদের ঘুষের মাত্রা সমগ্র গবর্মেণ্টের কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সক্রিয় অথবা আপাত উদাসীন পক্ষপুটাশ্রয়ে পুষ্ট ও বর্ধিত পারমিটদাতা কর্তা-দের অত্যাচার কমিয়াছে—ইহা মনে করিবার মত কারণ আমরা এখনও পাই নাই।

ইঁহাদেরই এক মুরুব্বী খাঁ সাহেব স্বনামধন্য পুরুষ। ইঁহার অত্যাচার, মিথ্যাবাদিতা ও অপদার্থতার প্রকাশ্য পরিচয় যত মিলিতেছে, ততই ইঁহার পদোন্নতি ঘটিতেছে। দেশের লোক ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে যে খোদ লাটসাহেবরাই ইঁহার বড় মুরুব্বী। পারমিট দাতাদের অতিক্রম করিয়া ইঁহার নিকট সরাসরি আবেদন করিবার সাহস কাহারও আছে কিনা জানি না। তবে সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ইঁহার নিকট প্রতিকার প্রার্থনা কেবলমাত্র সময়ের অপব্যয়।

সরকারী গুদামে দুগ্ধ অপচয়

উপরোক্ত পত্রখানিতে শ্রীমতী চক্রবর্তী সরকারী গুদামে দুধের অপচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"গত দুর্ভিক্ষের বৎসর হইতে জেলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এই জেলার বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে শিশু ও রোগীদের জন্য দুগ্ধকেন্দ্র খুলিয়া বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন স্থানে ৩০টা দুগ্ধ কেন্দ্রে প্রতিদিন প্রায় চারি হাজার শিশু ও রোগীকে দুধ দেওয়া হয়, কিন্তু অভাবের তুলনায় উহা অতি অল্প। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রেডক্রস সোসাইটি হইতে দুধ পায়। কিছু দিন হইতে যত দুধ পাওয়া যাইতেছে তাহার বেশীর ভাগই পচা। গত চারি মাসে যত দুধ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে পচা দুধের পরিমাণ ছিল—গুঁড়া দুধ ৩৭৫০ পাউণ্ড, কৌটার দুধ ২৪০ পাউণ্ড, পিপার দুধ ১৩০ মণ, এইগুলি ফেরত লইয়া ভাল দুধ চাওয়ায় জানা গেল, বর্তমানে গুদামে ৬৫০টি টিনে ১৬২৫০ পাউণ্ড এবং ১৭টি পিপায় ২২১ মণ গুঁড়া দুধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মোট ১২৫৬৩২০ জন শিশুকে এক পোয়া হিসাবে দুধ দেওয়া যাইত, অবিলম্বে ভাল দুধ পাওয়া না গেলে দুগ্ধ-কেন্দ্রগুলি বন্ধ হইয়া যাইবে, এই অবস্থায় এখানে খুবই দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হইয়াছে।

শুনা যায় ভাল ভাবে পরিচালনার জন্য বাংলা-সরকার রেডক্রসের কাজ নিজের হাতে লইয়াছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যখন দেশে হাজার হাজার শিশু আজ রুগ্ন দুর্বল হইয়া মৃত্যুপথযাত্রী, তখন সরকারী গুদামে সরকারী অবহেলায় শত শত মণ দুধ নষ্ট হইয়া যাইতেছে।"

মিঃ কেসীর খাস গবর্মেণ্ট পঞ্জাব হইতে আমদানী দুগ্ধ-বিশারদকে দেড় হাজার মাইল দূরে বোম্বাই পাঠাইয়াছিলেন দুগ্ধ রেশনিং শিখিবার জন্য। কলিকাতার এক-শ মাইলের মধ্যে সরকারী গুদামে মজুত দুধের যে কি অবস্থা ঘটিতেছে তাহা দেখিবার অবসর তাঁহাদের নাই।

বাংলায় বস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ

যুগান্তর (২৭শে শ্রাবণ) বাংলায় বস্ত্র-সরবরাহ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কারসাজির বিস্তৃত হিসাব দিয়াছেন। বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য কর্তৃপক্ষ এ যাবৎ বলিয়াছেন যে, বাংলায় বস্ত্রের স্বাভাবিক চাহিদা ছিল মাথাপিছু সাড়ে এগারো গজ, উহা হইতে মাত্র দেড় গজ অর্থাৎ শতকরা ১৩ ভাগ কমাইয়া ১০ গজ বরাদ্দ করায় জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা ঘটা উচিত নহে। 'যুগান্তর' যে হিসাব দিতেছেন তাহাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধের পূর্বে বাংলায় মাথাপিছু বার্ষিক পৌনে সতের গজ কাপড় বিক্রয় হইত। সরকারী হিসাবে রহস্যজনক উপায়ে উহার এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়া স্বাভাবিক চাহিদার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ স্বীকার করা হইয়াছে এবং কাগজপত্রে মাথাপিছু দশ গজ বরাদ্দ দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে ছয় গজের বেশী দেওয়া হইতেছে না। অর্থাৎ স্বাভাবিক ও অপরিহার্য প্রয়োজনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ এখন দেওয়া হইতেছে। গত তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও দেখা যায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে মাথাপিছু ১৬·৯ গজ কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের

তুলনায় বাংলায় কাপড়ের চাহিদা কম নয়, ভিন্ন প্রদেশবাসীর পোষাকের কথা মনে করিলেই তাহা বুঝা যায়। বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজবাসী অপেক্ষা বাঙালী বেশী কাপড় ব্যবহার করে ইহা নিশ্চিত। সারা ভারতীয় গড়পড়তা হইতে বাংলার চাহিদা কম হইবার কোন কারণ নাই।

যুগান্তরের হিসাব এই :

বাংলায় বস্ত্র-সরবরাহের পরিমাণ

(ক) ভারতীয় মাল :—

	১৯৩৭-৩৮ আমদানী লক্ষ গজ	১৯৩৮-৩৯ আমদানী লক্ষ গজ	১৯৩৯-৪০ আমদানী লক্ষ গজ
১। বাংলায় উৎপাদন :—			
(ক) ধুতি শাড়ী ও থান	১৬,৬৬	২০,৬২	১৯,০০
(খ) বড় বড় কারখানায় হোসিয়ারী মালসহ অন্যান্য জিনিষ	১,৪০	১,৪৬	১,৭৪
(গ) ছোট কারখানায় হোসিয়ারী মাল	২,৫১	২,৬০	৩,১১
(ঘ) তাঁতের কাপড়	১৫,৪০	১৫,৪০	১৫,৪০
মোট বাংলায় উৎপাদন—	৩৫,৯৭	৪০,০৮	৩৯,২৫
২। ভিন্ন প্রদেশ হইতে আমদানী : (মাত্র ধুতি, শাড়ী ও থান)			
(ক) রেলে ও ষ্টীমারে	২৯,৪৮	২৫,৮১	৩৩,৪৭
(খ) উপকূলবাহী জাহাজে	২১,৯৩	২২,৫৬	১৪,৮৫
মোট আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	৫১,৪১	৪৮,৩৭	৪৮,৩২
মোট ভারতীয় মাল	৮৭,৩৮	৮৮,৪৫	৮৭,৫৭
(খ) বিদেশজাত মাল :—			
১। বহির্বাণিজ্য দ্বারা প্রাপ্ত :—			
(ক) ধুতি, শাড়ী ও থান	১৫,১৬	২৪,১৪	২৩,১৩
(খ) টুকরা কাপড় ও অন্যান্য মাল (নিট রপ্তানি)	—৩,১৩	—২৭	—৫৩
মোট বহির্বাণিজ্য	১২,০৩	২৩,৮৭	২২,৬০
২। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে রপ্তানি :—			
(ক) রেলে ও ষ্টীমারে	—৫,৯০	—৮,৮৪	—৭,৯৪
(খ) উপকূলবাহী জাহাজে	—২	—৩	—১
মোট আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	—৫,৯২	—৮,৮৭	—৭,৯৫
মোট বিদেশী মাল	৬,১১	১৫,০০	১৪,৬৫
সর্বসাকুল্যে দেশী ও বিদেশী মাল	৯৩,৪৯	১০৩,৪৫	১০২,২২
লোকসংখ্যা (কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ এবং আদমসুমারির হিসাবে বার্ষিক সংখ্যা বৃদ্ধি যোগ করিয়া জন	৫,৮৩	৫,৯৪	৬,০৪
মাথাপিছু বস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ	১৬ ০২ গজ	১৭·৪২ গজ	১৬·৯১ গজ

অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তিন বৎসরে বস্ত্র ক্রয়ের পরিমাণ মাথা-পিছু বার্ষিক (১৬·৭৮) পৌনে সতর গজ।

বস্ত্র দুর্ভিক্ষ

বাংলার বস্ত্রবণ্টন সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। বস্ত্রাভাবে মেয়েরা আত্মহত্যা করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়া লাটসাহেব নিশ্চিন্ত আছেন। তাঁহার অধীনস্থ বিপুল গোয়েন্দা বাহিনীর সাহায্যে গবর্ণর নিশ্চয়ই এই সব সংবাদের সত্যাসত্য যাচাই করিতে পারিতেন। দুর্ভিক্ষ আসন্ন বার বার ইহা জানানো সত্ত্বেও সর জন হার্বার্ট উহা বিশ্বাস করেন নাই, কারণ বিশ্বাস করিলে পরিশ্রম করিতে হইত। ভারত-সরকারের টেক্সটাইল কমিশনার ভেল্লোডী সাহেব বলিয়াছেন বাংলার কাপড়ের কিছুটা অভাব হইতেছে বটে তবে ইহাকে দুর্ভিক্ষ বলা যায় না। দুর্ভিক্ষের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের কোন এক বড় কর্তা বলিয়াছিলেন ব্যাপারটা লইয়া বড় বেশী মাতামাতি (over-dramatisation) হইতেছে।

বস্ত্র সরবরাহের প্রধান দায়িত্ব যাঁহার, সেই সর আকবর হায়দরী সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সর আকবর ঝুনা সিভিলিয়ান, খাস আমলাতান্ত্রিক চালে তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া গেলেন তাহার ফল যাহা হইবে বাঙালী তাহা মর্মে মর্মে জানে। রেশনিং প্রভৃতি সর্ববিধ সরকারী কার্যে যাঁহাদের সহযোগ অকুণ্ঠ এবং উৎসাহ অসীম, বিশেষতঃ কাপড়ের কমিটি গঠনে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহশীল, সেই কমিটনিষ্ঠ নেতাদের এখন বক্তব্য এই যে "হায়দারীর সঙ্গে চোরাবাজার সমর্থকদের যোগাযোগ ঘটিয়াছে।" কাপড়ের ব্যাপার সম্বন্ধে গোড়া হইতেই ইঁহারা গবর্ণমেন্টের সহযোগিতা করিয়াছেন, ব্যাপারটির ভিতরের খবর জানিবার সুযোগ ইঁহাদের আছে। কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানাইয়াছেন যে বাংলার বস্ত্র সংগ্রহ এবং বণ্টনের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকার একটি এসোসিয়েশন গঠন করিবেন। ইহার পূর্বে বাংলার লাট বলিয়াছিলেন যে একটি সিণ্ডিকেট গঠন করিয়া বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা হইবে। সিণ্ডিকেট বা এসোসিয়েশন গঠনের মারপ্যাঁচ কেন চলিতেছে জনসাধারণ তাহা বুঝিতে অক্ষম। সাধারণ লোকের ধারণা গবর্মেণ্ট দুইটির একটি কাজ করিতে পারিতেন। (১) মিল হইতে সমস্ত কাপড় এবং বাহিরের আমদানী কাপড় গবর্মেণ্ট চাউল, চিনি, লবণের ন্যায় গ্রহণ করিয়া সোজাসুজি রেশনের দোকানের মারফৎ বিক্রয় করিতে পারিতেন। ইহাতে কাপড়ের দোকানগুলির ক্ষতি হইত বটে, কিন্তু দেশবাসীর লাভ হইত। এই সব নরপিশাচ দোকানদার গত পূজার সময় হইতে

ক্রেতাদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে ইহারা চোর জুয়াচোর এবং গবর্মেণ্ট ভিন্ন আর কাহারও সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারে না।

(২) কাপড়ের ব্ল্যাকমার্কেটিং বন্ধ করিবার মত সৎ ও সুদক্ষ পুলিস দল গবর্মেণ্টের হাতে থাকিলে স্বাভাবিক ব্যবসার পথেই কাপড় বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া যাইত। কিন্তু ইহা অসম্ভব। কারণ সৎ ও সুদক্ষ কর্মচারী গবর্মেণ্টের কোন বিভাগেই আজকাল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ঘুষ চুরি ও লুঠ ছাড়া গবর্মেণ্ট আর সবই কনট্রোল করিতে পারিয়াছেন।

বস্ত্র সরবরাহের নগণ্যতা

যুগান্তর লিখিতেছেন যে, সরকারী তথ্য হইতে বুঝা যায় বর্তমানে বাংলায় মাথাপিছু দশ গজ কাপড় সরবরাহ করা হইতেছে। তন্মধ্যে এখানকার হাতের তাঁত হইতে ২৷৷০ গজ, মিল হইতে ২৷৷০ গজ এবং ১৫০০ গজ হিসাবে গাঁট ধরিয়া অবশিষ্ট ৫ গজ বাহির হইতে আসে। গাঁটকে গজে পরিণত করিবার এই হিসাব ভুল, ব্যবসায়ীরা বার বার ইহা বলিয়াছেন। লীগওয়ালা মন্ত্রিসভা অপসারিত হইবার প্রাক্কালে মিঃ সুরাবর্দীও বলিয়াছিলেন যে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানেন গড়ে প্রতি গাঁটে মাত্র ১২০০ গজ কাপড় থাকে। প্রতি গাঁটে ১৪৫০ হইতে ১৫৫০ গজ কাপড় প্যাক করিবার আদেশ দিয়া কেন্দ্রীয় টেক্সটাইল ডিরেক্টোরেটও উক্ত হিসাব পরোক্ষ ভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

চোরাকারবার ও সুতার অভাবে তাঁতে উৎপাদনও অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ গজ তাঁতের কাপড় উৎপাদনের জন্য যে পরিমাণ সুতা বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাতে উহার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ বয়ন করা সম্ভব। এই বরাদ্দ সুতার সবটা তাঁতিরা পায়ও না। ইহার একটা মোটা অংশ যে-সব মিলে সুতা উৎপাদনের ব্যবস্থা নাই তাহারা কিনিয়া লয়। কাজেই সরকার কর্তৃক প্রচারিত মাথাপিছু আড়াই গজের স্থলে বড় জোর পৌনে দুই গজ কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। তাঁতের কাপড়ের ভীষণ চড়া দামের কথাও মনে রাখিতে হইবে, শতকরা ৯৫ জন লোকই ইহা ক্রয় করিতে অক্ষম। কলিকাতার দোকানগুলির দিকে তাকাইলেও দেখা যায় যেখানে মিলের কাপড়ের চিহ্নমাত্র নাই সেখানে তাঁতের কাপড় প্রচুর রহিয়াছে।

যুদ্ধের প্রয়োজনে বাংলায় লোকসংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে ইহারা ইহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র অন্য স্থান হইতে সংগ্রহ করিত। এখন ইহাদের ক্রয়-কেন্দ্র বাংলা দেশ। তাহা ছাড়া রেড ক্রশ হাসপাতাল প্রভৃতির জন্য যে কাপড় দরকার তাহাও বাংলার নাগরিকদের বরাদ্দের মধ্যেই ধরা হয়। এই সব দিক হিসাব করিলে দেখা যায় এখন মাথাপিছু মাত্র সাড়ে পাঁচ গজ মিলের কাপড় সরবরাহ হইতেছে। ইহাও খাতায় পত্রে, প্রকৃতপক্ষে কত কাপড় বাংলায় গত দুই বৎসরে পৌঁছিয়াছে তাহা এখনও রহস্যাবৃত। বাংলার মিলে উৎপন্ন কাপড়েরও সবটা বাঙালী পায় না, ইহার উপরও সরকারী ও আধা-সরকারী ভাগ আছে।

মিঃ টুলি নিজেও বলিয়াছেন 'মাথাপিছু ছয় গজের কম' বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই সামান্য ও অনিশ্চিত ছয় গজের কম বস্ত্র দ্বারা অবশ্য প্রয়োজনীয় ১৬ গজের কাজ জনসাধারণ কি ভাবে চালাইবে, যুগান্তরের এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর গবর্মেণ্ট দিবেন এত নির্বোধ তাঁহাদিগকে আশা করি কেহই মনে করিবেন না। সরকারী হিসাবে স্বাভাবিক চাহিদার পরিমাণ শতকরা ৩২ ভাগ কম করিয়াও বর্তমানে মোট সরবরাহের পরিমাণ তিন ভাগের এক ভাগ বাড়াইয়া দেখান হইয়াছে—হিসাবের এই "ভুল" যুগান্তরের বাণিজ্য-সম্পাদকের নিকট দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়া মনে হইয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ রাজনীতির মূল তত্ত্ব যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট কিন্তু ইহা মোটেই রহস্যজনক মনে হইবে না। সংখ্যাতত্ত্ব এমন একটি জিনিস যাহা দ্বারা যে কোন হিসাব 'প্রমাণ' করা যায়। বাংলা দেশে ভাত কাপড়ের হিসাব হইতে সুরু করিয়া দুর্ভিক্ষে ও রোগে মানুষ মরার হিসাব পর্যন্ত সংখ্যাতত্ত্ব সরকারী প্রয়োজনে সরকারী নীতির মর্যাদা রক্ষা করিয়াই সর্বত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালে মেজর-জেনারেল উডের বাড়তি চাউলের হিসাব আশা করি এত শীঘ্র সকলে ভুলিয়া যান নাই। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যে সামান্য চাউল উদ্বৃত্ত ছিল কোম্পানী তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কোম্পানীর প্রেতাত্মা অধিকৃত লীগ গবর্মেণ্ট সিপাহী ও সমর সাহায্যরত শ্রমিককুলের জন্য অতিরিক্ত চাউল মজুত করিয়া দুর্ভিক্ষের প্রথম তীব্রতা ডাকিয়া আনিয়াছিলেন সিভিলিয়ান উডহেড সাহেবই তাঁহার রিপোর্টে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কাপড়ের বেলাতেও ভিন্ন ব্যবস্থা হইবার কথা নয়, হয়ও নাই। কিছুদিন আগে বাংলা-সরকার বিজ্ঞাপন দিয়া কৃতিত্ব জাহির করিয়াছেন যে ৩০।৩২টি ওয়ার্ড কমিটি ৪৷৫ মাসে কাপড়ের যতগুলি কুপন বিলি করিয়াছে, কারখানা প্রভৃতির মালিকেরা তাহার অর্ধেক সময়ে উহার দ্বিগুণ কুপন লোককে দিয়াছে। আসল কথা এই যে, ওয়ার্ড কমিটিগুলি সাধারণ লোকের জন্য যত কুপন পাইয়াছে, সমর-প্রচেষ্টায় রত ব্যক্তিরা পাইয়াছে তাহার দ্বিগুণ। দেওয়া না দেওয়া এখানে পাওয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এই সামান্য কথাটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি বাঙালীর আছে।

বস্ত্র বণ্টন এসোসিয়েশন সম্বন্ধে কমিউনিস্ট নেতার উক্তি

১ই আগষ্টের 'জনযুদ্ধে' বস্ত্র-বণ্টন এসোসিয়েশনের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন তাহার মূল বক্তব্য নিম্নে দেওয়া হইল। কাপড়ের কমিটি গঠন ব্যাপারে ইনি প্রথম হইতেই সরকারকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত লিখিতেছেন :

"বড়বাজারে যে সমস্ত ব্যবসায়ীর ঘরে অধুনা বিখ্যাত খানাতল্লাসের সময় প্রচুর কাপড় পাওয়া গিয়াছিল, আবার তাঁহাদের হাতেই কাপড়ের স্টক ও বণ্টনের ভার ফিরাইয়া দিবার জন্য বাংলা-সরকার সিণ্ডিকেটের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদে তাঁহারা যখন দো-মনা করিতেছিলেন, তখন সম্ভবত বস্ত্রপতিদের অনুরোধে

সর আকবর হায়দরী ও তাঁহার বস্ত্র-ব্যবসায়ী সাঙ্গোপাঙ্গেরা কলিকাতায় আসিয়া সেই সিণ্ডিকেট পরিকল্পনাটিকে সামান্য পালিশ করিয়া ও এসোসিয়েশন নাম দিয়া বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপাইয়া গেলেন।

"গত ৩০শে জুলাই সর আকবর হায়দরী, টেক্সটাইল কমিশনার মিঃ ভেলোড়ী এবং সেণ্ট্রাল টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ থেকার্সে এবং অন্যতম সভ্য মিঃ কস্তুর-ভাই লালভাই কলিকাতায় পদার্পণ করেন। এই সম্পর্কে 'মর্ণিং নিউজ' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হইয়াছে :

বড়বাজারের মজুতদাররা কঠিন লোক। তাঁহারা দিল্লী, বোম্বাই এবং আমেদাবাদ হইতে শক্তিসমাবেশ করিলেন এবং বাংলা দেশ অপেক্ষা বড় চাঁইদের কাজে লাগাইলেন। ফল দেখুন। যাদুকরের স্পর্শে বিষধর 'সিণ্ডিকেট' কেমন নিরীহ 'এসোসিয়েশন' ঘুঘুতে পরিণত হইল। (৬-৮-৪৫)

"মিঃ থেকার্সে বোম্বাই, সোলাপুর প্রভৃতি এলাকার ৯টি কাপড়ের কলের সহিত সংশ্লিষ্ট। বিখ্যাত কলওয়ালা মিঃ লালভাইয়ের কয়েকটি কাপড়ের কলের পক্ষ হইতে বাংলায় যাঁহাকে এজেণ্ট নিযুক্ত করা হইয়াছে তিনি হইলেন "সিণ্ডিকেট স্কীমে"র প্রধান পাণ্ডা মিঃ ভোজনগরওয়ালা। এই অবস্থায় ইঁহাদের কলিকাতায় পদার্পণের তাৎপর্য বুঝিতে খুব বেশী কষ্ট হয় না।"

বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের আনন্দ

কাপড়ের কারবারীরা ইহাতে খুশী হইবারই কথা। তাঁহাদের আতঙ্ক সম্বন্ধে শ্রীযুত গুপ্ত লিখিতেছেন :

"কলিকাতায় ইঁহারা যেভাবে কাপড়ের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন, তাহা আরও রহস্যজনক। কলওয়ালা 'অতিথি'-দ্বয় আশ্রয় লইয়াছিলেন বিড়লা-ভবনে। তাঁহারা চারজনই বিভিন্ন বণিক-সমিতি এবং বড় বড় বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের সহিত একাধিক বৈঠক করিলেন, বহুবিধ চায়ের মজলিস ও খানাপিনায় আপ্যায়িত হইলেন। সাংবাদিক সম্মেলনের ঘোষণায় ব্যবসায়ী মহল এতই পুলকিত হইয়াছিলেন যে, ঠিক তাহার পরেই বাংলার বিখ্যাত কলওয়ালা ও বস্ত্র-ব্যবসায়ী মিঃ এম. এল. শা 'ক্যালকাটা ক্লাবে' এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন। সেই ক্লাবে দেখা যায়, সিণ্ডিকেটের পাণ্ডারা এবং বস্ত্র-ব্যবসায়ের প্রত্যেকটি চাঁই সেখানে উপস্থিত—দিল্লী ও বোম্বাইয়ের 'অতিথি'দিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য।

"কলিকাতার জনপ্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহারা বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ৩১শে জুলাই কলিকাতার খুচরা ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের নিকট একটি ডেপুটেশন প্রেরিত হয়। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল তাহাতে উপস্থিত থাকেন। তিনি গবর্ন্মেণ্টকে সরাসরি বস্ত্র সংগ্রহের পরামর্শ দিলে সর আকবর চটিয়া গিয়া মন্তব্য করেন: সরকারী ব্যবস্থার উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না।

"কলিকাতায় ইঁহাদের ষড়যন্ত্র আরও পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়ে আর একটি ঘটনায়। সেণ্ট্রাল টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের অন্যতম সদস্য মিঃ এস. এস. মিরাজকর ট্রেড টউনিয়ন কংগ্রেসের কাজে ঐ সময় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কলিকাতায় বিভিন্ন শ্রেণীর জন-প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বস্ত্র-সংকট সম্পর্কে আলোচনা করেন। সর আকবর কলিকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহাকে তাঁহার কাজে সাহায্য করিতে চাহেন। কিন্তু সর আকবর খানাপিনায় এতই ব্যস্ত ছিলেন যে কয়দিনের মধ্যেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার সময় করিয়া উঠিতে পারেন না। আসল কথা, তাঁহাকে মোকাবিলা করিবার মত সাহস তাঁহার হয় না। যাঁহারা গত তিন মাসে কলিকাতায় ৮ লক্ষ ইউনিট কাপড় বিলি করিলেন সেই ওয়ার্ড কমিটি প্রতিনিধিদেরও কোন পরামর্শই গ্রহণ করা হইল না।

"ইহার প্রত্যাশিত ফল দেখা গেল, সর হায়দরীর ঘোষণায়। যে 'সিণ্ডিকেটের পরিকল্পনাকে বঙ্গীয় সিভিল সাপ্লাই এডভাইসরী বোর্ড' একবাক্যে নিন্দা করিয়াছেন, ওয়ার্ড কমিটির প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সম্মেলনে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহাকেই নাম বদলাইয়া চালু করা হইল।"

শ্রীযুত গুপ্ত জানাইতেছেন যে সর আকবর যাঁহাদিগকে কলিকাতায় "বিশেষ সম্মানিত" ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এসোসিয়েশনের গবর্ণিং বডিতে স্থান দিয়াছেন, সেই সব ভদ্রলোকের অধিকাংশকে প্রস্তাবিত সিণ্ডিকেটেও স্থান দেওয়া হইয়াছিল। পার্থক্য শুধু এই যে, সিণ্ডিকেটে বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমান ব্যবসায়ীর স্থান না হওয়ায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সর আকবর তাঁহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন। গবর্ণিং বডিতে যাঁহাদিগকে লওয়া হইয়াছে তাঁহাদের নাম—সর বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা, সর এ এইচ গজনবী, মিঃ বি এম বিড়লা, মিঃ আর, এল, নোপানী, মিঃ এম, এ, ইস্পাহানী, ডাঃ এন, এন লাহা, সর আদমজী হাজী দাউদ এবং মিঃ জে, কে, মিত্র। বড়বাজারের অলিতে-গলিতে যেদিন লুকান কাপড় বাহির হইল, তাহার আগের দিনও এই বিড়লা-গজনবী-গোয়েঙ্কা প্রভৃতি বিবৃতি দিয়া বলিয়াছিলেন : গবর্ন্মেণ্ট কাপড় আটক করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই লোকে কণ্ট্রোল দরে কাপড় পাইতেছে না। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছিলেন যে মার্চ মাসের আগে যে সমস্ত কাপড় আসিয়াছে তাহা তাঁহারা কণ্ট্রোল দরে বিক্রয় করিতে পারেন না অর্থাৎ চোরাবাজারের পরোক্ষ সমর্থন ইঁহারা করিয়াছেন। ইঁহাদের সহিত ইস্পাহানীর যোগাযোগে অবস্থার কি উন্নতি হইবে তাহা দেশবাসী জানে।

প্রস্তাবিত এসোসিয়েশনের রূপ

প্রস্তাবিত এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রীযুত গুপ্ত লিখিয়াছেন :

"যে ২৫ জন সভ্যকে লইয়া কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হইবে, তাহার মধ্যে এই আটজন ভদ্রলোক ছাড়াও থাকিবেন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স (শ্বেতাঙ্গ বণিক সভা), ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এবং মুসলিম চেম্বার অব কমার্স, প্রত্যেকের দুইজন করিয়া বস্ত্র-ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, এসোসিয়েশনের সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত আট জন প্রতিনিধি (কলিকাতার পাইকারী বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা যেখানে এসোসিয়েশনের সাধারণ সভ্য, সেখানে

অধিকাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি যে মাড়োয়ারী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই) এবং সরকারী মনোনীত তিনজন সভ্য। এ হেন কার্য-নির্বাহক কমিটির কাজ হইবে পাইকার এবং কোটা হোল্ডার বাছাই করা, যাহারা নিজেদের টাকায় এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বস্ত্র সংগ্রহ করিবে, গুদামের ব্যবস্থা করিবে এবং এসোসিয়েশনের নির্দেশ অনুসারে বণ্টন করিবে। এই কমিটি সেই পুরানো দাগীদেরই আবার বস্ত্র-ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"অবশ্য টুলী সাহেবকে প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করিয়া সর আকবর মনে করিতেছেন, গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে কণ্ট্রোলের কোন ত্রুটি হইবে না। কে যে কাহাকে কণ্ট্রোল করে ইতিপূর্বে বস্ত্র ডিরেক্টর মিঃ জোন্সের আমলে আমরা তাহা দেখিয়াছি। ২০ হাজার জনতার সভায় মিঃ জোন্সের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্তের দাবি হইয়াছিল। মিঃ জোন্সকে সরানো হইয়াছে সত্য কিন্তু আজও কোন তদন্ত হয় নাই। মিঃ টুলী সম্পর্কেও কংগ্রেস-নেতা ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল একাধিক জনসভায় নানারূপ অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এবং প্রকাশ্য তদন্ত দাবি করিয়াছেন। সম্ভবতঃ সেই দায়িত্ব এড়াইবার জন্যই সর আকবর তাঁহার বক্তৃতায় প্রথমেই বলেন: আমরা কাহারও দোষ অনুসন্ধান করিতে আসি নাই। বস্ত্র দপ্তরে ডেপুটি ডিরেক্টর, এডিশন্যাল ডিরেক্টর এবং এডমিনিষ্ট্রেটর প্রভৃতি বড় বড় পদে এমন কি পুলিস বিভাগ হইতেও শ্বেতাঙ্গ আমদানী করিয়া লাটসাহেব কেসি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, শ্বেতাঙ্গরা দুর্নীতির উর্ধ্বে। এই অবস্থায় সর আকবর তাহাদের অবিশ্বাস করিবেন কোন্ সাহসে? মিঃ জোন্সের স্থানে মিঃ টুলী যেখানে বড়কর্তা, যেখানে সর আকবরের কথামতই 'এক ছত্রতলে' সমস্ত ব্যবসায়ী সমবেত হইয়া কাপড়ের উপর তদারকের ভার পাইল, সেখানে বস্ত্র সমস্যার সমাধানে আমাদিগকে ছয় মাস আগেকার 'স্বাভাবিক বাণিজ্যের পথে'ই লইয়া যাইবে। তবে, অবস্থার মধ্যে পার্থক্য শুধু এইটুকু যে, তখন বাংলার আইন সভা চালু ছিল, দেশবাসীর কথা সেখানে বলিবার সুযোগ ছিল, বস্ত্রচোর এবং মিঃ জোন্সের দল কিছুটা সন্ত্রস্ত থাকিত, কিন্তু এখন কেসি সাহেবের ৯৩-তন্ত্রে সে কণ্টকও দূর হইয়াছে। বস্ত্রচোর এবং আমলারাও সম্ভবতঃ এমন স্বর্গরাজ্য কল্পনা করিতে পারে নাই।

বাংলার বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সর আকবর এবং তাঁহার বন্ধুরা একটি কথাও বলেন নাই। কারণ সে আলোচনা তাঁহাদের এক্তেওায় ছিল না। তবে তাঁহারা আশ্বাস দিয়াছেন যে, রেশনিং সন্নিকট! গবর্মেণ্ট রেশনিং-এর কথা যখন বলেন, তখন শুধু কলিকাতার কথাই চিন্তা করেন। সংবাদ লইয়া জানা গেল, সম্প্রতি মফস্বল জেলায় যে বস্ত্র পাঠান হইতেছে, তাহার মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগের বেশী ধুতি শাড়ী নাই। হাণ্ডলিং এজেন্টদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন কলিকাতার রেশনিং-এর জন্য ধুতি শাড়ী 'রিজার্ভ' রাখেন।

ষ্টকের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয় বলিয়া জানা গিয়াছে। ছয় জন হাণ্ডলিং এজেন্টের নিকটে যে মাল আছে তাহা ২০ হাজার গাঁটের বেশী নয়। তাহা হইতে কলিকাতার রেশনিং-এর প্রথম মাসের জন্য ৭৯০০ গাঁট পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। আরও ১০,৫০০ গাঁট রিজার্ভ রাখা হইবে। সুতরাং মফস্বল জেলাগুলি হইতে যদি আরও মর্মন্তুদ খবর আসিতে থাকে তাহাতে কিছুই করিবার থাকিবে না। মিঃ ভেল্লোড়ীর অতিরিক্ত বস্ত্রের প্রতিশ্রুতি যে কার্যে পরিণত করা হয় নাই, ষ্টকের বর্তমান অবস্থা হইতেই তাহা অনুমান করা যায়। তাই সর আকবরের প্রতিশ্রুতির উপর কেহ আর ভরসা করিবেন না।

মফঃস্বলে কাপড়ের অভাব

কলিকাতার সংবাদপত্রগুলিতে মফস্বলের যে সামান্য সংবাদ প্রকাশিত হয় তাহা হইতেই কাপড়ের অভাবে গ্রামাঞ্চলের দুরবস্থা অনুমান করা যায়। ফরিদপুরে বস্ত্রাভাবে মধ্যবিত্ত লোকদের লজ্জা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের প্রতি রাত্রিতে তিন-চার বাড়ীতে সিঁদ কাটিয়া চোরেরা পরিধেয় বস্ত্র চুরি করিতেছে। ধোপাবাড়ী হইতে কাপড় ও মশারি চুরি হইতেছে। বহরমপুর শহরে বস্ত্র রেশনিং প্রবর্তনের পর প্রায় চারি মাস অতিবাহিত হইতে চলিল কিন্তু এযাবৎ সেখানে যে কাপড়ের কুপন পাঠান হইয়াছে তাহাতে মাথাপিছু মাত্র দেড় গজ কাপড়ের কুপন বিলি করা সম্ভব হইয়াছে। পটুয়াখালীর তাঁতিরা সম্মিলিত ভাবে দাবি করিয়াছে যে, তাহাদিগকে মাসে অন্ততঃ ৪ বাণ্ডিল সুতা দেওয়া হউক এবং যাহাতে সমবায় সমিতির মারফৎ তাঁতের কাপড় বিক্রয় হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হউক। স্থানীয় মহকুমা হাকিমের নিকট তাঁতিদের প্রতিনিধিরা যথারীতি দাবি জানাইয়াছে এবং প্রতিকারের আশ্বাস পাইয়াছে। সুতা পায় নাই।

পটুয়াখালীতে স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য মাত্র দুই গাঁট বস্ত্র মঞ্জুর হইয়াছে। বয়স্কা মেয়েদের কাপড়ের অভাবে স্কুলে যাওয়া অসম্ভব হইয়াছে। বস্ত্র রেশনিং এমন ভাবে হইয়াছে যে পটুয়াখালির দশ হাজার লোকের মধ্যে ৮।৯০ জনের বেশী কাপড় পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

দিনাজপুরের সংবাদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য (কৃষক ২২শে শ্রাবণ)। উহা এই: "ব্যববসায়ী মহলে প্রকাশ, বহু পরিমাণে নূতন কাপড় ও শাড়ীর গাঁট দীর্ঘকাল যাবৎ গুদামজাত করা হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষের শৈথিল্যের জন্য উহা বণ্টন না করায় অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। এরূপ অনুমান করা হইতেছে, এইগুলি পূজার বাজারে ছাড়া হইবে; তখন সুতা বলিতে কিছুই থাকিবে না। ইহাও জানা গিয়াছে, যে পরিমাণ চালান আসিয়াছে তাহাতে শহরবাসীর আপাততঃ প্রয়োজন অনেকাংশে মিটিত।"

ইহাই সব নয়। গ্রামের ব্যাপক দুরবস্থার ইহা সামান্য পরিচয় মাত্র।

বাংলায় কৃষকের অবস্থা

দৈনিক 'কৃষকে' (৮ই শ্রাবণ) 'কৃষক ও ধানপাট' শিরোনামায় মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর যে সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, দেশের প্রকৃত অবস্থা যাঁহারা জানিতে চান তাঁহাদিগকে উহা পড়িতে অনুরোধ করি।

বর্ত্তমানে ধান ও পাটের যে দর মিলিতেছে এবং কৃষকের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যে দরে কিনিতে হইতেছে তাহাতে বাঙালী কৃষকের পক্ষে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে পা বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। ধান ও পাট ছাড়া অন্ত প্রায় প্রত্যেকটি জিনিস চাষীকে বাজার হইতে কিনিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হয়। তাহাদের ক্রেতব্য সাধারণ জিনিসের মধ্যে কেরোসিন, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, লবণ, কাপড়, মাছ-মাংস প্রভৃতি প্রধান তরি-তরকারিও অনেককে ক্রয় করিতে হয়। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এই সকল জিনিসের দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে। কোন কোন জিনিসের দর অবশ্য একটা স্তরে আসিয়া থামিয়াছে, কিন্তু উহা কোন ক্ষেত্রেই যুদ্ধের পূর্ব্বেকার দরের চতুর্গুণের কম নয়। গবর্মেণ্ট ইহার প্রতিকারের দুইটি উপায় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার কোন ফল হয় নাই। এ সম্বন্ধে লেখকের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:

"গবর্মেণ্ট এর প্রতিকারের দুটি উপায় করেছিলেন। প্রথমতঃ, তাঁরা কৃষকদের অসহ্য ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্তে ধান-চাউলের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, সরকারী বাঁধা দাম বাজারে স্বাভাবিক নিম্নগামিতার ধাক্কায় টিকে না। গবর্মেণ্ট বলেছিলেন ব্যাপার এই রকম দাঁড়ালে তাঁরা ধান-চাউল কিনে বাজার দর তাঁদের নির্দ্দিষ্ট মানে স্থির রাখবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এই বর্ষার সময়ে সে রকমের চেষ্টা তাঁদের পক্ষে কতটুকু সম্ভব সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তা ছাড়া সরকারী প্রয়োজনের চাইতে খুব বেশী ধান-চাউল না কেনাও একটা সরকারী নীতি। অথচ যে পরিমাণে ধান-চাউল তাঁরা ইতিপূর্ব্বেই কিনেছেন, তাকেই তাঁরা অতিরিক্ত মনে করছেন। তা নইলে বাংলা থেকে ধান চাউল কিছু পরিমাণে অন্যত্র চালান দেওয়ার কথা এ সময় তাঁরা চিন্তা করতে পারতেন না।

"দ্বিতীয়তঃ, কতক-বা কণ্ট্রোল দরে আংশিক রেশন ব্যবস্থা পল্লী-অঞ্চলে চালু ক'রে আর কতক-বা জিনিসপাতির দাম বেঁধে দিয়ে পাড়াগাঁয়ে কৃষকদের রক্ষা করবার ইচ্ছা গবর্মেণ্ট করেছিলেন। কিন্তু একথা আজ গোপন করে লাভ নেই যে, আংশিক রেশন ব্যবস্থা চাষীদের সাংসারিক প্রয়োজনের এক-দশমাংশও মেটানোর জন্ত যথেষ্ট নয়। কাজেই চাষীরা সংসারের তাগিদে অন্য স্থান থেকে, মানে চোরাবাজার থেকে জিনিসপাতি কিনতে বাধ্য হচ্ছে। যে-সব জিনিষ পাড়াগাঁয়ে রেশন ব্যবস্থায় দেওয়া হচ্ছে না, সেগুলোরও সরকারী নিয়ন্ত্রিত দর বাজারে চলছে না। অর্থাৎ সেগুলোও বিকাচ্ছে চোরা-বাজারী দরে। এবং চোরাবাজারী দর বলতে যে সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রিত দামের তিন গুণ থেকে ছ-সাত গুণ পর্য্যন্ত বুঝায়, এ কথা জনসাধারণ তো জানেই, অসংখ্য সরকারী কর্মচারীও, এমন কি যারা চোরাবাজার দমন করবার জন্তে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরাও জানেন। বাংলার যে কোনো পল্লী-অঞ্চলে গেলেই এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হয় যে, এখানে-সেখানে ছ-দশ জন মুনাফাখোর ও চোরাবাজারী আইনের খপ্পরে পড়তে বাধ্য হলেও মোটের ওপর দেশের ভেতর চোরাবাজার অদম্য গতিতে চলে যাচ্ছে। সুতরাং অজ্ঞ, মূর্খ, শক্তিহীন চাষীদের তার কাঁদিতে গলা না গলিয়ে উপায়ান্তর নেই।"

একখানা দশ হাত কাপড়ের দাম চোরাবাজারে চার-পাঁচ মাস আগেও ছিল ৫৲ টাকা হইতে ৭৲ টাকার ভিতর, এখন তাহার দাম ১২৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা।

চোরাবাজার দমনের জন্ত গবর্মেণ্ট খবরের কাগজে বহু অর্থ ব্যয়ে সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে কৃষকদের মনোভাব বর্ণনা করিয়া মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লিখিতেছেন, "মূল্যবৃদ্ধির কথা পল্লী-অঞ্চলের অসংখ্য কর্মচারীও অবগত আছেন; কিন্তু তাঁহাদের শক্তি বা সঙ্কল্প এ ব্যাপারে সাফল্যের সঙ্গে হস্তক্ষেপ করতে অপ্রচুর প্রমাণিত হয়েছে। গবর্মেণ্ট কাগজে কলমে এটা অস্বীকার করতে পারেন; কিন্তু তাঁদের পক্ষ থেকে যে জনসাধারণকে চোরাবাজার দমনে সহায়তা করতে উৎসাহ দেবার জন্ত আজ পর্যন্ত রাশি রাশি টাকার বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে প্রচার করা হচ্ছে এর থেকে কি এ কথাই প্রমাণিত হয় না যে গবর্মেণ্ট চোরাবাজারের ব্যাপক কারবার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন? আমাদের বক্তব্য এই যে এক দিকে চোরাবাজারের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য, অন্য দিকে চাষীদের বিক্রেয় ধান চাউলের মূল্যের ক্রমহ্রস্বমান হার, এই দুয়ের ভেতর পড়ে টানা হেঁচড়ায় তাদের প্রাণ বেরো বেরো হয়েছে।"

পাটের দর ও বাংলার চাষী

পাটের দর বাংলার চাষীর পক্ষে কি ভীষণ ক্ষতিকর হইয়া উঠিয়াছে—মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা বুঝা যাইবে:

"শুধু ধান-চাউলের দরই নয়, পাটের বাজারের অবস্থাও উৎপাদক চাষীদের স্বার্থের দিক দিয়ে ভীষণ সঙ্কটসঙ্কুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন মুল্লুকের বাঁধা দরের অন্যায় দাবির সামনে নতি স্বীকার ক'রে এ দেশী চটকলওয়ালাদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে দর নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থার সাহায্যে গবর্মেণ্ট ব্যাপার যা ক'রে তুলেছেন তাতে গাঁয়ের উৎপাদক পাট-চাষী মণকরা ৯ টাকা থেকে ১০ টাকার চাইতে বেশী দাম কোন ক্রমেই পাবে না, বরং তার চাইতে কমই পাবে। কম পাবে বলছি এই জন্তে যে প্রথমতঃ, গবর্মেণ্ট পাটের মফস্বলের মূল্য যা বেঁধে দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছেন তার খবর নিরক্ষর চাষীদের জানাতে তেমন কেউ নেই এদেশে। দ্বিতীয়তঃ, চটকলওয়ালার নীচে পাটের কারবারে ব্যবসায়ী ও ব্যাপারীদের যে তিন-চারটি স্তর রয়েছে, তারা প্রত্যেকে যথেষ্ট লাভ রেখে পাটচাষীদের দাম দিতে চাইবে। তৃতীয়তঃ, এই নিম্ন দাম প্রত্যাখ্যান করে নিয়ন্ত্রিত মূল্য পাওয়ার আশায় পাট ধ'রে রাখার শক্তি শতকরা কমসেকম ৮০।৮৫ জন চাষীরই নেই। আর সরকারী নিয়ন্ত্রিত দর পেলেও যে কৃষকদের পাটচাষের খরচা আজকার বাজারে পোষাবে না, সেটাও স্মরণ রাখা দরকার।

"বস্তুতঃ যে দরে আজ জন মজুর খাটিয়ে চাষীদের ধান পাটের চাষ তুলতে হচ্ছে, পাড়াগাঁর অবস্থা যাঁরা নিজেরা চোখের সামনে দেখছেন, তাঁরা তাকে ভয়ানক মনে না ক'রে পারবেন না। বাংলার অনেকস্থানে আজ জনমজুরদের দৈনিক মজুরী চোদ্দ আনা থেকে দেড় টাকা এবং লাঙল-মজুরের মজুরী দৈনিক দু' টাকা থেকে তিন টাকা পর্য্যন্ত দিতে হচ্ছে। এটা কঠোর বাস্তব সত্য; বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন এতে নেই। কাজেই

যে কোনো লোক সামান্ত ধারাপাতের আঁক পেতেই বলতে পারবেন যে, ফসল তুলতে গিয়ে সাধারণ ও নিম্ন অবস্থার চাষীদের শুধু যে একদম ফতুর হতে হবে তা নয়, দস্তুর মতো ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তে হবে।"

আমেরিকান গবর্মেণ্ট পাটের উচ্চতম দর বাঁধিয়া দিয়াছেন এবং ভারত-সরকার ও লীগওয়ালা বাংলা-সরকার তাহাই নত মস্তকে মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে মোটামুটি এই যে, বাঁধা দর হইতে শ্বেতাঙ্গ কলওয়ালারা তাঁহাদের মোটা লাভ রাখিবেন, তার পর মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী দালাল, ফড়িয়া প্রভৃতি যে যাহার ভাগ আদায় করিবেন, ইঁহাদের সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে সেইটুকু শুধু জুটিবে চাষীর ভাগে। পাট উৎপাদনের ব্যয় সম্বন্ধে ওয়াজেদ আলী সাহেব যে হিসাব দিয়াছেন তাহার সহিত আর একটি যোগ করা দরকার, পাটচাষের লাইসেন্স-দাতাদের ঘুষ। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের নামে লীগওয়ালা মন্ত্রীরা গ্রামে গ্রামে যে বাহিনীটির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের প্রধান কাজ হইয়াছে এই যে পাটচাষের ব্যয়ের আর একটা দফা বাড়িয়াছে।

দুর্ভিক্ষের ধাক্কায় বেশীর ভাগ চাষীর জমি হাতছাড়া হইয়াছে। গবর্মেণ্ট তাহাদের জমি ফেরত পাওয়ার জন্য একটা সাময়িক আইন করিয়াছিলেন কিন্তু টাকার অভাবে অনেকেই তাহার সুযোগ লইতে পারে নাই। যাহারা সে সুযোগ লইতে গিয়াছে, জমি-ক্রেতারা খাজনা প্রাপকদের সঙ্গে যোগসাজসে বাকি খাজনার দায়ে জমি নিলামে ক্রোক করিয়া তাহাদেরও অধিকাংশকে বঞ্চিত করিয়াছে। বাঙালী কৃষক আজ প্রকৃত সর্বহারায় পরিণত হইয়া নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাংলায় ৯৩-এর শাসন

নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা ভোটে হারিবার পর হইতে বাংলায় ৯৩-এর গবর্নরী শাসন বর্তমান রহিয়াছে। বিরোধী দল নিয়মতান্ত্রিক রীতি অনুসারে লাটসাহেবকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। যথারীতি বিলাতে তার প্রেরণ এবং সভাসমিতি করিয়া ৯৩-এর শাসন অবসানের দাবি ঘোষণা চলিতেছে যদিও ফল কিছুই হয় নাই।

৯৩-এর শাসনের পক্ষে বা বিপক্ষে আমরা কিছু বলিতে চাই না। দেশের মঙ্গলামঙ্গলের দিক হইতে প্রগতিশীল হক-মন্ত্রিদল বা প্রতিক্রিয়াশীল নাজিম-মন্ত্রিদল কেহই বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। হক সাহেবের প্রধান মন্ত্রিত্ব কালেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের হুকুমে বাংলা হইতে চাউল রপ্তানি হইয়াছে, তিনি তাহা রোধ করিতে পারেন নাই। আসন্ন দুর্ভিক্ষের সংবাদ তিনি রাখেন নাই, উহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করেন নাই। দুর্ভিক্ষের পূর্বে ব্যবস্থা-পরিষদে খাদ্য সমস্যা লইয়া যে বিতর্ক হয় তাহাতে তাঁহারাও আমলাতান্ত্রিক কায়দায় সরকারী সংখ্যাতত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া আশ্বাস বাণীই লোককে শুনাইয়াছিলেন। নিজেরাও সাবধান হন নাই, লোককেও সাবধান করেন নাই। নাজিম-মন্ত্রিদলের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য শুধু এই যে দুর্ভিক্ষের মৃত্যুলীলার মাঝে লুঠের সিংহদ্বার তাঁহাদিগের দ্বারা উন্মুক্ত হয় নাই। নাজিম-মন্ত্রিদল মানুষের প্রাণের বিনিময়ে কণ্ট্রোলের আড়ালে অবাধ বাণিজ্য চলিতে দিয়াছেন।

দুই দলের কে ভাল কে মন্দ তাহার বিচার নিরর্থক। ব্যবস্থা-পরিষদের বর্তমান সদস্যেরা দেখাইয়াছেন ভোটেরও ব্ল্যাক মার্কেট আছে। আজকাল গ্রামে এক জোড়া হালের বলদ কিনিতে যে টাকা লাগে, ভোট ক্রয়ে বোধ হয় তত টাকারও দরকার হয় না।

আমরা চাই অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন হউক। ৯৩ ধারা বজায় থাকুক বা না থাকুক, নির্বাচনে যেন বিলম্ব না হয়। যে মন্ত্রিদল এবং ব্যবস্থা-পরিষদের যে প্রতিনিধিদল বাংলার অর্ধকোটি লোকের মৃত্যুর এবং ছয় কোটি লোকের অসীম লাঞ্ছনার কারণ, তাঁহাদের কার্যকলাপ সমালোচনার সুযোগ দেশবাসীকে অবিলম্বে দেওয়া হউক। কংগ্রেসের উপর কার্যতঃ কোন নিষেধাজ্ঞা আর নাই, সুতরাং নির্বাচনে তাঁহাদের আপত্তি করিবার সঙ্গত হেতু নাই। নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, সুতরাং অযথা বিলম্বের কোন প্রয়োজন নাই। দেশবাসী এই দলকেই আবার পরিষদে পাঠায় কি না যত শীঘ্র সম্ভব তাহা যাচাই হওয়া দরকার।

বাংলা হইতে চাউল রপ্তানির প্রস্তাব

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পরও বাংলা-সরকার বিদেশে চাউল রপ্তানির যে সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক বিরাট্ জনসভা হয়। সৈয়দ নৌশের আলি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জাতি, ধর্ম ও দল নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ দলে দলে তাহাদের আসন্ন সঙ্কটের কথা গভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সহিত স্মরণ করিয়া এই সভায় যোগদান করে। চাউল রপ্তানি বন্ধ করিবার দাবি জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৩ সালের সাম্প্রদায়িকতাবাদী মন্ত্রিমণ্ডলীর কুশাসন, দুর্নীতি এবং অযোগ্যতার ফলে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারী যেভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না ঘটিতে পারে সেই সম্বন্ধে বাংলার জনমত জাগ্রত করিবার জন্য নেতৃবৃন্দ আবেদন জানান। মৌলবী ফজলুল হক, মৌলবী শামসুদ্দীন আমেদ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সৈয়দ নৌশের আলি, মৌলবী আহমদ আলি, মিঃ জে. সি. গুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। মৌলবী ফজলুল হকের বক্তৃতার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমরা এখানে এক বিষম বিপদের আসন্ন সম্ভাবনা দেখিয়া প্রতিবাদ করিতে সমবেত হইয়াছি। যাঁহারা বড় বড় নবাব ও টাকার গদির উপর বসিয়া আছেন তাঁহারা চাউলের পরিবর্তে পেস্তা বাদাম খান। কিন্তু আমাদিগকে চাউল খাইয়া জীবনযাপন করিতে হয়, তাই আমরা চাউল রপ্তানির সংবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি। পূর্বে চাউলের দর পাঁচ-ছয় টাকার বেশী হইলেই লোকে আতঙ্কিত হইত, বুঝি-বা অন্নাভাব দেখা দেয়। আজ আমরা ১৬৷০ মণ চাউল খরিদ করিতেছি যাহার মধ্যে অর্ধেক পোকা ও বাকিটা কাঁকর—এই চাউল খাইয়া ব্যাধির প্রকোপে বহু লোক প্রাণ-

তাহার শতাংশের একাংশ প্রয়োগ করিলেই হাজার তিনেক ছাত্রছাত্রীর বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাইত ইহা সকলেই বিশ্বাস করিবেন। দেশের প্রয়োজনকে বর্তমান গবর্মেণ্ট কখনও নিজের প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না বলিয়াই এই দুরবস্থা।

পরলোকে সর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

ভারত-সরকারের শাসন-পরিষদের ভূতপূর্ব আইনসদস্য সর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার গত ২৭শে শ্রাবণ ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সামান্য আইনজীবীরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন এবং ১৯২৯ সালে বাংলার এডভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারত-সরকারের আইনসদস্যের পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে এবং জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে যোগদান করেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন। গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহার সর্বপ্রধান কৃতিত্ব বাংলার জন্য পাটশুল্কের অংশ আদায়। পূর্বে বাংলার পাট শুল্কের সবটাই ভারত-সরকার লইতেন। সর নৃপেন্দ্রনাথের চেষ্টায় বাংলা-সরকার নূতন ভারত-শাসন আইনে এই শুল্কের শতকরা ১২½ ভাগের অধিকারী হইয়াছেন এবং ইহাতে বাংলার রাজস্ব বৎসরে কয়েক কোটি টাকা বাড়িয়াছে। ভারতীয় কোম্পানী আইন এবং বীমা আইন সংশোধনও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়। কোম্পানী আইন সংশোধনের সময় তিনি ম্যানেজিং এজেণ্টদের ক্ষমতা খর্ব করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদে বিশেষতঃ ইহাতে ব্রিটিশ বণিকস্বার্থ ক্ষুন্ন হয় বলিয়া ভারত-সরকারের পূর্ণ সাহায্য পান নাই। তবে ম্যানেজিং এজেণ্টস প্রথার অনেকগুলি দোষ তিনি দূর করিতে পারিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি সুস্থ ছিলেন না, কিন্তু এত শীঘ্র তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন তাহা কেহ ভাবেন নাই। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি হিন্দুস্থান নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেছিলেন। উহাতে তাঁহার জীবনস্মৃতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ ভারতহিতৈষী হর্ণিম্যান

ভারতীয় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মিঃ বেঞ্জামিন হর্ণিম্যান যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন এবং ভারতের জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিয়া তিনি যে নির্ভীকতা ও আদর্শানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার গুণমুগ্ধ ভারতবাসিগণ গত ২৬শে জুলাই বোম্বাইয়ে তাঁহার সাংবাদিক জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই মহাপ্রাণ ভারতহিতৈষীর সংবাদিক জীবনের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

২১ বৎসর বয়সে হর্ণিম্যানের সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয়। ১৮৯৪ সালে তিনি পোর্টসমাউথের 'সাদার্ণ ডেলী মেলের' রিপোর্টার নিযুক্ত হন। তিন বৎসর পরেই তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ১৯০০ সালে তিনি লণ্ডনের 'মর্ণিং লীডার' পত্রে যোগদান করেন। তিনি উহার সহকারী সম্পাদক হন। ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে লণ্ডনের 'ডেলী এক্সপ্রেস', 'ডেলী ক্রনিকেল' এবং 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে'ও যোগ দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে তাঁহাকে আমরা প্রথম দেখি ১৯০৬ সালে কলিকাতার ষ্টেটসম্যানের বার্তাসম্পাদক পদে। পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সময় তিনি নির্ভীকভাবে সরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়া দিয়া কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। ১৯১৩ সালে সর ফিরোজ শা মেহ্‌টার আহ্বানে বোম্বাই গিয়া তিনি 'বম্বে ক্রনিকেল' প্রতিষ্ঠা করেন।

হর্ণিম্যানের ভারতসেবা শুধু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সক্রিয়ভাবে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিয়াছেন। বোম্বাইয়ে তিনি হোমরুল আন্দোলনে যোগ দেন। পঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের পর যে কয়জন ইংরেজ ডায়ারী শাসনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন হর্ণিম্যান তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার লিখিত *Amritsar and our Duty to India* এবং *Agony of Amritsar* পুস্তক দুইখানি ভারতের জাতীয় ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

১৯১৯ সাল পর্যন্ত তিনি 'বম্বে ক্রনিকেল' চালান। তারপর বোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড লয়েড ভারতরক্ষা আইনে তাঁহাকে নির্বাসিত করেন। ১৯২৬ সালে তিনি পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসেন। ১৯৩৩ সালে তিনি 'বম্বে সেন্টিনেল' প্রকাশ করেন এবং অদ্যাবধি উহার সম্পাদনা করিতেছেন।

সরকারী বে-সরকারী সর্ববিধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছেন এবং তার জন্য বহুবার বিপদেও পড়িয়াছেন। বোম্বাইয়ে জুয়াখেলা বন্ধ করিবার জন্য এক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি এক মামলায় জড়াইয়া পড়েন কিন্তু বিচারে সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন। মামলায় তিনি নিজেই আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। বিচারক তাঁহাকে সসম্মানে মুক্তি দিয়া পুলিসের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। কিছুদিন পূর্বে এলাহাবাদ হাইকোর্ট আদালত অবমাননার অভিযোগে তাঁহার উপর শমন জারী করিলে তিনি উহা মানিতে অস্বীকার করেন। বোম্বাই হাইকোর্ট সাব্যস্ত করে যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ঐ সমন তাঁহারা জারী করিতে পারেন না। এই মামলায় হর্ণিম্যান যে আইনজ্ঞানের পরিচয় দেন বিচক্ষণ ব্যবহারজীবিগণও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

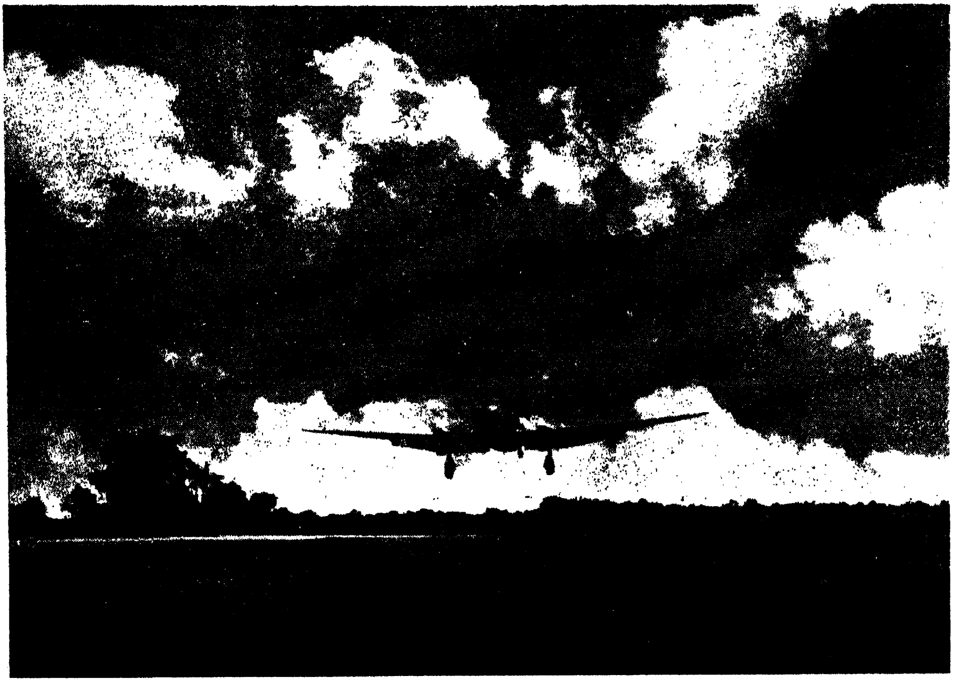
ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দাবিকে তিনি সমগ্র জীবন দিয়া সমর্থন করিয়াছেন। জনস্বার্থের জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি অতি বড় পদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও লেখনী ধারণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। স্বৈরাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই তাঁহার ধর্ম। ইহার জন্য কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বোম্বাইয়ে উইলিংডন স্মৃতি-সভার আয়োজনের তিনি বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রচারের কণ্টকাকীর্ণ পথে পদক্ষেপ কম সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় নহে। তাঁহার অকৃত্রিম ও নিষ্কলঙ্ক সাধনা ভারতবাসীকে নব প্রেরণা, নব আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাহাদের স্মৃতিপটে হর্ণিম্যানের নাম সতত জাগ্রত থাকিবে।



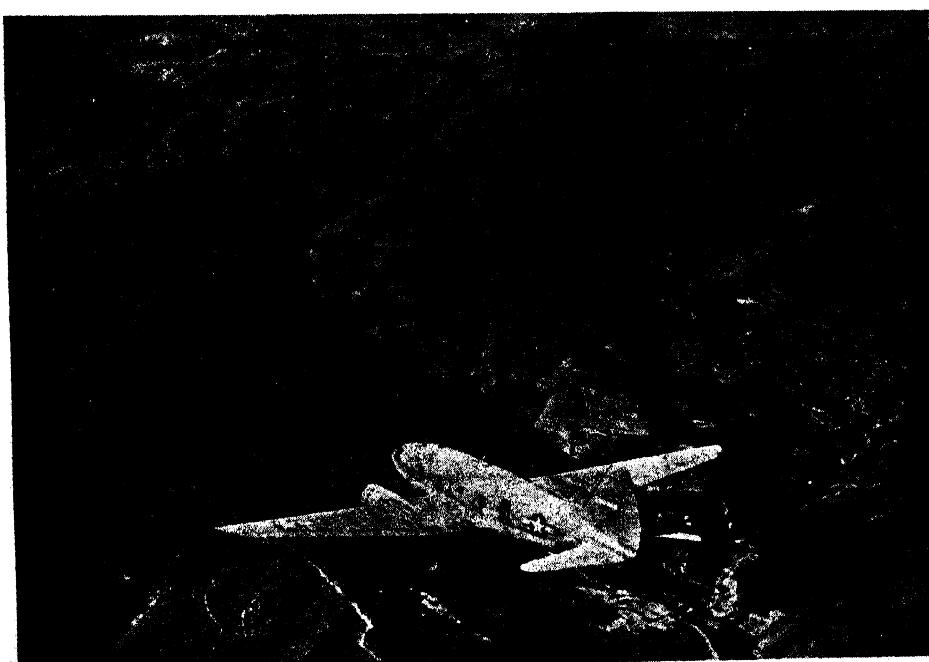
মেরিয়ানা দ্বীপাবলীতে জাপান আক্রমণোদ্যত মার্কিন 'সুপার ফরট্রেস' বাহিনী



[illegible] নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে গমন করিতেছে



চীন হইতে আগত ইন্দো-চীন বাহিনীর সুবৃহৎ মার্কিন সি-৪৬ দুই ইঞ্জিনবিশিষ্ট বিমান



উত্তর-ব্রহ্মের কুড়ি হাজার ফুট উচ্চ হিমালয়-পৃষ্ঠের উপরিভাগ দিয়া গমন রত ইন্দো-চীন বাহিনীর মার্কিন

ফানুস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দু-পাশের বড় রাস্তাকে গলিটা সংযুক্ত করিয়াছে। মাঝারি গলি। সরীসৃপের মত বাঁকিয়াও বিত্তশালীদের বাড়িগুলির সৌষ্ঠব বজায় রাখিতে পারে নাই। সৌধশ্রেণীর সঙ্গে লুকোচুরি-খেলাটা তাহার জমিয়াছে ভাল। সরকারী কৃপাপূর্ণ গ্যাসের বাতিতে তাহার অষ্টাবক্রাকৃতি দেহ সম্পূর্ণ যে উদ্ভাসিত হয় না সে একপক্ষে ভালই। সরকারী নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া উদাসীন শ্রমকাতর ঝি-চাকর কিংবা গৃহবাসীর দল পথের বাঁকে বাঁকে আবর্জ্জনার ক্ষুদ্র স্তূপ প্রত্যহ জমা করিয়া রাখে, আলো-আঁধারি ছায়ায় উহা খুব প্রকট বোধ হয় না। দিনের বেলার কথা স্বতন্ত্র। সৌন্দর্য্যাভিমানী কোন ব্যক্তি পথ অতিক্রমকালে অন্যের কর্ত্তব্যচ্যুতিকে তীব্র ভাবেই হয়ত আক্রমণ করেন; নাগরিক জীবনের কর্ত্তব্যের কথাও কেহ বা সখেদে স্মরণ করাইয়া দেন—কেহ কেহ নিজেদের জাতি, ধর্ম্ম ও পরাধীনতা পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া আত্ম-বিস্মৃতিকে এই উপলক্ষ্যে ধিক্কৃত করেন। কিন্তু আজকাল গলির জঞ্জাল লইয়া এই অভিযোগের অবসরও একটা ঘটে না। জঞ্জালের চেয়ে বড় জিনিস গলিটার সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া বিরাজ করিতেছে। বলিলে তাহারা কথা শোনে না, চীৎকার করিলে চুপ করিয়া থাকে, এবং ধমক দিলে সানুনাসিক হৃদয়-ভেদী স্বরে ধমকের প্রতিধ্বনি তোলে। তেরশো পঞ্চাশের মাঝামাঝি এই এক উৎপাত পঙ্গপাল-আক্রান্ত শস্যক্ষেত্রের মত শহরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে। দু-পাশের বড় রাস্তায়ও যে তাহারা নাই তাহা নহে। তবে ট্রাম বাসের সংঘর্ষ বাঁচাইয়া উদাসীন রাস্তা হইতে গৃহস্থের প্রাঙ্গণ-সান্নিধ্যে আসিয়া বাঁচিয়া থাকিবার দুরাশাতেই হয়ত বা গলির মধ্যে ভিড় জমাইয়াছে। পথের ধারে দুর্গন্ধযুক্ত চিংড়ীর খোলা—মাছের আঁশপিত্ত ও পচা আনাজপাতি ছাড়া আর বড় কিছু জমিতে পায় না। কুকুর ও কাকেরা গলি ছাড়িয়াছে। উত্যক্ত হইয়া গৃহস্থেরা পর্য্যন্ত সদর দরজা বন্ধ করিয়াছেন। তবু কাজ আছে—আপিস আছে—বাজার হাট—শহরের প্রমোদশালা ও নানা প্রকারের প্রমোদ-সূচিতে দিন রাত্রির প্রত্যেকটি ক্ষণ ভারাক্রান্ত। দুয়ার খোলা রাখিতেই হয়—এবং গৃহস্থও সতর্ক থাকেন। চোর ইহারা নহে, গৃহস্থের সতর্কতা কিন্তু বাড়িয়াই চলে। অভাব নষ্ট করে নীতিকে—আঘাত দেয় ধর্ম্মের মর্ম্মমূলে। এত সতর্কতা সত্ত্বেও পর পর কয়েকটি দুর্ঘটনা যে না হইয়াছে তাহা নয়। কিন্তু দুর্ঘটনা—শুধু মাত্র দুর্ঘটনাই। তাহাকে লইয়া খানিকটা হৈ-চৈ হয়ই, স্থায়ী কোন চিহ্ন তাহার থাকে না বলিয়াই রক্ষা। কর্ত্তারা এই অনাচার দূর করিবার জন্য বারকয়েক প্রবল চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু দুর্ভিক্ষ-জলতরঙ্গ রোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত। বেত মারিয়া গায়ে জল ঢালিয়া—গালি দিয়া নিজেরাই ক্লান্ত হইয়া—সংস্কার আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন শাসন ও সতর্কতার বেগ অন্তর্মুখী হইয়াছে। সদর দরজা যথাসাধ্য বন্ধ করিয়া এই উৎপাত এড়াইয়া যাইবার চেষ্টাই দেখা যাইতেছে।

অনুপমদের দরজা দিন রাত বন্ধ থাকে না। বন্ধ রাখিবার উপায় নাই বলিয়াই থাকে না।

কার্ত্তিকের সকাল। শরৎ ঋতুর পূর্ণ যৌবন। মন আগাইয়া চলিলেও—ঋতুরা আজকাল কিছু বিলম্বে দেখা দেন। আষাঢ় মাসে আর বর্ষা নামে না, এবং বর্ষা নামে না বলিয়াই মেঘদূত রচনার সাহস কোন কবির নাই। কিন্তু এবারের মেঘদূত কাব্য বর্ষার প্রারম্ভে নহে—শেষেই যেন জমিতেছে বেশি। আকাশের জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া মানুষ চোখের জল ফেলিতেছে। কিন্তু চোখের জলই বা কোথায়? ক্ষুধার উত্তাপে সব বাষ্প হইয়া মেঘের গায়েই গিয়া হয়ত বা জমিতেছে। বর্ষাটা এবার আবহাওয়া রিপোর্টে ইঙ্গিতে বাড়িয়াছে, এক ঋতু ছাড়াইয়া অন্য ঋতুতেও সম্প্রসারিত হইয়াছে। যাহা হউক, শরতের সুপ্রসন্ন নীল আকাশ দেখা যায়, কাশের শোভা ও শিউলীর গন্ধ বাস্তবে না অনুভূত হইলেও—বাতাসে বিষণ্ণ বর্ষার মনমরা ভাব আর নাই, শুধু আবর্জ্জনার মত ভাসিয়া-আসা এই নোংরা ভিখারী(?)গুলার জন্যই কবি-বন্দনীয় শরৎ—প্রসন্ন হাসি হাসিয়া—শহরের মানুষকে হাসাইতে পারিতেছে না। কাল রাত্রিতে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টি হইলেই গলিটার দুর্গন্ধ কিছু পরিমাণে কমিয়া যায়। আজ সকালে উন্নত নীল আকাশের রংটা গাঢ় এবং বাতাস বেশ স্বচ্ছ বোধ হইতেছে।

শিস্ দিতে দিতে অনুপম পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

সামনের বাড়ির জানালার আধখোলা খড়খড়ির ফাঁক দিয়া একখানি চুড়ি-অলঙ্কৃত শ্যামলী-হাত প্রকাশিত হইয়া ঈষৎ আন্দোলিত হইল।

—অনুদা—লক্ষীটি—একবার শোন না।

অনুপম সে দিকে চাহিল। অতি পুরাতন চুণবালি-খসা বাড়ি। এক কালে সে বাড়ির আভিজাত্য হয়ত ছিল—আজ পথের দুঃখী দলের মতই তার দেহসজ্জা। পাশের প্রকাণ্ড চারতলা লালরঙের বাড়িটার ছায়ায় বসিয়া খানিক বিশ্রাম করিয়া লইতেছে। ও বাড়িতে উৎসব উপলক্ষে যখন আলোকের বন্যা নামে, এ বাড়িটাকে তখন সৌন্দর্য্যধ্বংসী উপদ্রবকারী অনার্য্যের মতই বোধ হয়। বাড়িটার রোয়াক পথ হইতে খানিকটা উঁচু এবং দ্বিতলের অগ্রসরী বারান্দা—সেই রোয়াকে আচ্ছাদন রচনা করিয়া—বায়ুবেগহীন বর্ষণে পথিককে অনেকখানি আশ্বাস দিয়া থাকে। রোয়াকের ধার ভাঙিয়াছে—খোয়া উঠিয়াছে—তবু কাল রাত্রির দুর্য্যোগভীত নিরাশ্রয়ের দল ঠাসাঠাসি করিয়া উহারই অঙ্কে ঠাঁই লইয়াছে।

অনুপম পথের ধারে দাঁড়াইয়া কহিল,—ওখান থেকেই বল।

—না লক্ষীটি, একবার সরে এস জানালার কাছে।

অনুপম তরুণীর অনুরোধ রক্ষা করিবার চেষ্টায় বলিল,—এই, জেরা হট্‌ যাও।

কিন্তু আশ্রয়হীনেরা সে জাতীয় ভিখারী নহে। বাংলা তাহারা ভাল রকমেই জানে। তখনও তাহাদের অধিকাংশই অকাতরে ঘুমাইতেছে। কচি কয়েকটা ছেলে জাগিয়া ঘ্যান ঘ্যান করিতেছে। মায়ের স্তনে খাদ্য নাই, পৃথিবীর ভাণ্ডারে শস্য ফুরাইয়াছে, এবং ভগবানের ও মানুষের মনেও দয়াবৃত্তি বড় ক্ষীণ,—এই সব অভিযোগ আশ্রয়হারারা প্রতিনিয়তই করিয়া থাকে, শিশুরাও অস্ফুট কান্নার দ্বারা তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। একটি মেয়ে জাগিয়া ছিল, কোলের ছেলেটিকে বুকের কাছে টানিয়া নিজেও খানিকটা সঙ্কুচিত হইয়া অনুপমকে একটু জায়গা দিল।

জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিয়া অনুপম বলিল, কি?

তরুণীর হাতের মুঠা ঈষৎ আলগা হইল।—কহিল, এই পয়সা ক'টা ধর—আজ আসবার সময় তাই এনো।

—কি?

—বাঃ রে—কাল বললাম না!…চুলের কাঁটা।

—ওসব আজকাল পাওয়া যায় না। তাচ্ছিল্যভরে অনুপম জবাব দিল।

না—যায় না—

তরুণী অভিমানের সুর টানিতেই অনুপম তাড়াতাড়ি বলিল,—ক' বচ্ছর যুদ্ধ চলছে সে হিসাব আছে? আচ্ছা—আচ্ছা দে। না পাওয়া গেলে কিন্তু—

খুচরা কয়েকটি আনি হস্তান্তরিত হইবার কালে অল্প শব্দ করিল। আশ্রয়হীনা মেয়েটি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া নড়িয়া বসিল। একটি ডবল পয়সা আঙুলের ফাঁকে গলিয়া তাদের সম্মুখে খসিয়া পড়িল। আকাশ হইতে খসিয়া পড়া নক্ষত্রের মত সেটা চকচকে। আশ্রয়হীনা মেয়েটির লুব্ধ দৃষ্টি তার জ্যোতি-কণায় জ্বলিয়া উঠিল।

পয়সা কুড়াইয়া অনুপম নামিয়া গেল—তরুণীও জানালা বন্ধ করিয়া দিল। আশ্রয়হীনা কোলের ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া নীরবে হয়ত সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

দু-তিনখানা বাড়ির পরে প্রকাণ্ড গেটওয়ালা এক ঠাকুর-বাড়ি। কোন পরম ভক্তিমতী মহিলা এটির প্রতিষ্ঠাত্রী। দেব-দেব জগন্নাথ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি সুপ্রশস্ত দরদালান-সমন্বিত মন্দিরে সদাহাস্যমুখে বিরাজমান। কোন স্থায়ী আয় হইতে বিগ্রহ-সেবা ও মন্দির-সংস্কার ও বারোমাসের সমস্ত পার্ব্বণগুলি রাজসিক সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। মধুরকান্তি সেবাইতের সদাপ্রসন্ন মুখে দেব-মহিমার জ্যোতি, মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ শান-বাঁধানো এবং সুপরিচ্ছন্ন দেবতার বেশ-বাসে স্বর্গীয় সম্পদের প্রকাশ। আগে ঠাকুরের ভোগরাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মন্দিরের দুয়ার অবারিত ছিল—এখন মাঝে একটা কোলাপসিবিল গেটের সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের কদর্য্য লোভ হইতে দেবতাকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য কিনা বুঝা যায় না, তবে শুচিতা রক্ষার জন্য তো বটেই। পাপের কলুষ দেব-দুয়ারে আসিয়াও লাগিয়াছে।—আশ্রয়হারারা হিন্দু হইলে কি হইবে—পাপপুণ্য বোধের অতীত।

গেটের দু-পাশের নাতিপ্রশস্ত রোয়াকেও মোংরা গৃহহারার দল। উপরে আচ্ছাদন আছে—কাজেই দ্বারবানের নিষেধ সত্ত্বেও কাল রাত্রির বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেখানে ভিড় জমাইয়াছে। ভিড় জমিলে একলা দারোয়ানের সাধ্য কি তাহা সরায়। এবং ভিড় জমিলেই রোয়াক পবিত্র থাকা অসম্ভব। অত সকালে ঠাকুরবাড়ির দরজা খোলে না, কার্ত্তিক মাসের ভোরে একবার মঙ্গল আরত্রিকের ঘণ্টাধ্বনি মাত্র শোনা যায়। পুরোহিত ভিতরেই বাস করেন।

কোথায় চলেছ হে—অনুপম?

অনুপম পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেবমন্দিরের কর্ত্তা এক জন রাজমিস্ত্রির সঙ্গে দেবমন্দিরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অনুপম যুক্তকর ললাটে তুলিতেই তিনি সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া রোয়াকের পানে ফিরিয়া সরোষে বলিলেন—দেখেছ আক্কেল! এই জন্মের এই ফল—পরজন্মের কথা ভাবিস নে! তোরা হিন্দু ন'স? পরে তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া কহিলেন—নাব, নাব বলছি সব রোয়াক থেকে। পাপে মরবি ভুগে!

অনুপম ঈষৎ হাসিয়া বলিল—শাস্তির আর বাকিই বা কি —দত্ত মশায়!

—বাকী!—অনেক বাকী। এক জন্ম তো এমনি গেল—পরের জন্মও, দাঁড়াও বার করছি তোমাদের আরাম করে রোয়াকে শোওয়া! দেবতার মন্দির—মোংরা করতে একটু ভয় হয় না!

অনুপম বলিল—ভয় সত্যিই ওদের নেই। কাল তো মিত্তির মশায় দোতলা থেকে ময়লা জল ঢেলে দিলেন—আজও দেখুন গে—তাঁর রোয়াকেই ভিড় বেশি।

দত্ত মহাশয় মিস্ত্রির পানে চাহিয়া কহিলেন—বুঝলে রাজু—বাইরের রোয়াকের দুধারেই পেরেক পুঁতে দিতে হবে। দেড় ইকি পেরেক—অর্দ্ধেকটা পোঁতা থাকবে। কত-গুলি চাই—

মিস্ত্রি বিনীত ভাবে কহিল,—আজ্ঞে সের পাঁচেকের কম কি হবে?

—পাঁচ সের! পাঁচ সেরের দাম জান আজকাল!—

—তাহ'লে ভাঙা কাঁচ বরং বসিয়ে দিন।

—না না, পাকা বন্দোবস্ত করাই ভাল—না হয় দশ-বিশ টাকা গেলই। স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভাবে তিনি অনুপমের পানে চাহিলেন।

অনুপম উত্তর না দিয়া হাসিল।

—লঙ্গরখানা খুলচেন নাকি!

—লঙ্গরখানা! ক'হাতা খিচুড়ি খাইয়ে নাম কিনতে চাই না আমরা। পুণ্যির চেয়ে ওতে পাপই জমে।

—সবাই কি আর পুণ্যির জন্য করচেন!

—না হয় দয়া তো? তা সত্যি বলতে কি—এত অত্যাচারে দয়াধর্ম্ম বজায় রাখাও মুশকিল! বাড়িতে মুষ্টিভিক্ষা বন্ধ করে দিয়েছি। তাতের কেন—আগে আগে দেওয়া হ'ত। দেখা গেল—বাড়ি থেকে বেরুনো দুষ্কর, দুর্গন্ধে টেঁকাও যায় না।

এখন ড্রেনে ঢালছি। আত্মপ্রসাদে তিনি টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কর্তার গলার স্বরে দুয়ার খুলিল। সৌম্যদর্শন পুরোহিত এবং তার পিছনে তুন্দিল-তনু পশ্চিমা দ্বারবান বাহির হইলেন। দ্বারবান বাবুকে আভূমি সেলাম করিল—পুরোহিত কৃতার্থ-মন্যের মত যে বিনীত হাসিটি হাসিলেন তাহাও সেলামের রূপান্তর।

মন্দির-স্বামী বলিলেন—ওদের নামিয়ে দাও রামভজন। মিস্ত্রি লাগবে।

দ্বারবান বীর বিক্রমে অগ্রসর হইল।

কোলাপ্‌সিবিল গেটের ফাঁক দিয়া দেবতার সুচারুমূর্তি দেখা যাইতেছে। মঙ্গল আরতির ধূপ-ধুনার গন্ধে বায়ুস্তরে দেবমহিমা লাগিয়া আছে। উজ্জ্বল বিজলী বাতির আলো দেবতার সুমসৃণ মুখে পড়িয়া অধরের অভয় হাস্যটিকে প্রদীপ্ততর করিয়াছে। মন্দির-স্বামী হাত জোড় করিয়া দুই চক্ষু বন্ধ করিলেন।

গলিটা শেষ হইয়া অনুপম বড় রাস্তায় পড়িল। ট্রামের ইস্পাত-লাইন চক্ চক্ করিতেছে। জলে ও নব-প্রকাশিত সূর্য্যের আলোয় ইস্পাতের লাইনও যেন দেবতার হাসির মতই দ্যুতিমান। ঘর্ঘর নাদে অদূরে ট্রাম আসিতেছে। পাশের বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত কসাইখানা খুলিয়াছে। দু'টি সুপুষ্ট খাসির উন্মোচিত চর্ম্ম—চর্ব্বিপুষ্ট সুগোল দেহ শিকের আশ্রয়ে দোদুল্যমান। কর্ত্তিত গর্দ্দানটা লাল টকটকে, এখনও টপ টপ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে এবং বিদীর্ণ বক্ষে হৃদ্‌পিণ্ড ফুস্ ফুস্ প্রভৃতি ঝুলিয়া আছে। নীচের সুমসৃণ শ্বেত পাথরখানি তাজা রক্তে লাল। তবু মানুষ শিহরিয়া উঠিয়া—দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি সেইখানটা পার হইয়া যাইবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না। সলোভ দৃষ্টিতে নিহত ছাগের পানে চাহিয়া—ভিতরে অবস্থিত কালী মূর্ত্তিকে একটা প্রণামও করিতেছে। প্রণামে একটু দেরি হইতেছে—কিংবা ছাগমাংসে প্রীতিবশতঃ দৃষ্টি ভক্তিগদগদ হইয়া উঠিতেছে—সে জানা খুব কঠিন নহে—রক্ত মানুষকে সব সময়ে আতঙ্কগ্রস্ত করে না।

পাশের দোকানে গরম জিলাপী ও কচুরি ভাজা হইতেছে। ক্রেতার সংখ্যাও বেলা বাড়ার সঙ্গে বাড়িতেছে। ওপাশের ফুটপাতে গৃহহারারা নিতান্ত উদাসীন চোখে কসাইখানা, খাবারের দোকান ও ট্রামের যাওয়া-আসা দেখিতেছে। অভ্যাসবশতঃ হাত বাড়াইয়া আছে ও মুখে ভিক্ষার বুলি আওড়াইতেছে কিন্তু দু'টিতেই বিশ্বাস বা আবেগ নাই। ছোট কষ্ট মানুষকে চঞ্চল করে—বড় কষ্টে সে পাষাণ—এ প্রবাদ বাক্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

এস্‌প্ল্যানেডের ট্রাম আসিয়া পড়িল। অনুপম লাফ দিয়া ফার্ষ্ট ক্লাস ট্রামে উঠিল।

—গুডমর্ণিং।

—হ্যালো—বিনয়। কোথায় ?

—হাজরা রোড।

—মশাই দয়া করে লেডিজ সিটটা—

মাপ করবেন,—অনুপম পাশের সিটে সরিয়া বসিল। হেনা-গন্ধে ট্রামের কামরা উতলা হইয়া উঠিল। নিখুঁত প্রসাধিতা একটি মেয়ে নরম এক স্তবক ফুলের মত অনুপমের পরিত্যক্ত সিটে গিয়া বসিল। দু-গাছি সরু প্লেন বালা—হাতে শোভিত ভ্যানিটি ব্যাগ—গলায় সরু চিক্‌চিকে এক গাছি চেন হার। কানে স্বস্তিকা দুল—আর সবটা দেখা অশোভন বলিয়া অনুপম নিশ্বাসের সঙ্গে হেনা-সুরভিকে গভীর ভাবে টানিয়া লইল। হেনার গন্ধ উগ্র হইলেও মেয়েটি নিশ্চয়ই গন্ধের প্রতীক নহে। তবে নরম ধাতের প্যান্‌পেনে মেয়ে অনুপম দু-চক্ষে দেখিতে পারে না। উগ্রতার মধ্যে যে শক্তির আস্বাদ করা যায়—তাহাতে সান্ত্বনা অনেকখানি। কিন্তু মেয়েটি হয়তো ততটা উগ্র নহে। নহিলে ভদ্রলোককে উঠাইয়া নিজেদের মার্কা-মারা সিটে বসিবার আগ্রহ ওর দেখা গেল কেন ?

বিনয় বলিল, যাচ্ছিস তো হাজরা রোডে ?

—আজ্ঞে।

—বাঃরে, মঞ্জুলিকাকে আজ ট্রায়াল দেওয়া হবে।

—ক'টার সময় ?

—বিকেল বেলায়।

—বৈকালে আমার এন্‌গেজমেণ্ট আছে।

—কোথায়—বিনতা রায়ের বাড়ি ?

বন্ধুর বক্র উক্তি অনুপমের মনে আনন্দ সঞ্চার করিল। মাথা হেলাইয়া সে হাসিল।

—ওরা নাকি ফিল্‌মে নাম্‌বার ব্যবস্থা করছে ?

—না তো।

বিনয় হাসিয়া বলিল, না হলে জগৎজোড়া খ্যাতি আসবে কি করে।

অনুপম হাসিল না, গম্ভীর ভাবে কহিল, ওরা খ্যাতির কাঙাল নয়।

—তা বটে—খ্যাতিটা সহজলভ্য হলে কাঙালপনার অর্থ থাকে না।

অনুপম কোন উত্তর দিল না। তরুণী একদৃষ্টে বাহিরের পানে চাহিয়া আছে। ট্রামের মধ্যে যে জগৎটা সঙ্কীর্ণ হইয়া গুটাইয়া আছে—সে সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন।

বিনয়ই বলিল, আচ্ছা অনুপম—আজকাল কোথায় লিখছিস ?

অনুপম তাহার পানে ফিরিয়া স্মিতহাস্যে কহিল, বল দেখি।

—সব কাগজ তো পড়ি না—

—তাহলে জেনে কাজ নেই।

—না না, শুনেছি নতুন লেখকদের মধ্যে তোর নাম আছে, মানে সবাই প্রশংসা করেন।

—তাই নাকি !

তাহার বিদ্রূপ-রঞ্জিত কণ্ঠে বিনয় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, দিস ত তোর একখানা বই—পড়ে দেখব।

অনুপম হাসিয়া বলিল, বই বেরুবার সৌভাগ্য হয়নি ত।

—তাহলে যে কাগজে বেরয় তাই দিস্ একখানা।

অনুপম মনে মনে ক্রুদ্ধ হইল। এমন আগ্রহশীল পাঠককে

কোন উত্তর দিতে গেলে কথার উষ্ণতাকে রোধ করা অসম্ভব। অনুপম একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে তাহাদের কথোপকথনের মুহূর্তে মেয়েটি একবার পিছন ফিরিয়া অনুপমকে দেখিয়া লইয়াছে। অপাঙ্গ দৃষ্টি। অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজনে মাঠের এদিকে চাহিতে গিয়া সহসা অনুপমকে দেখিয়া ফেলিয়াছে যেন। কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আর কি। আজকালকার অসংখ্য লোককে এমনই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে অনেকে দেখিয়া থাকেন। মেয়েটির বঙ্কিম ওষ্ঠে এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কৃপা কিংবা উপেক্ষা মিশ্রিত হাসি।

অনুপম আলস্য ভাঙিবার ভঙ্গিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—একি—উঠলি যে ?

—নামব।

—বালিগঞ্জ যাবি না ?

—না। বলিয়া অগ্রসর হইল।

বিনয় তাহার জামার প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আসচিস তো ?

—দেখি।

ট্রাম চলিয়া গেলে—অনুপম বুঝিল মেয়েটিও তাহার পিছনে নামিয়াছে। হেনা-গন্ধ এখনও নাকে লাগিয়া আছে। কিন্তু পিছন না চাহিয়া সে চলিতে লাগিল।

—সার—শুনচেন ?

অনুপম পিছন ফিরিতেই—মেয়েটি দু-হাত কপালে ঠেকাইয়া কহিল, বকুলবাগান রোডটা কোন্ দিকে বলতে পারেন ?

—ক'টা স্টপেজ আগে নেমেছেন। পূর্ণ থিয়েটারের কাছে নামলেই—

—তাহলে পরের ট্রামের জন্য অপেক্ষা করি।

অনুপম মনে মনে বলিল, তা ছাড়া আর উপায় কি—যখন এইটুকু হাঁটতে পারবেন না।

পায়ে হাঁটিতে অনুপমেরই কি ইচ্ছা করে!

তরুণী পরের ট্রামে উঠিয়া অদৃশ্য হইল।—অনুপম একটা রিকৃসওয়ালাকে ডাকিয়া কহিল, পদ্মপুকুর যাবি ?

রিকৃসওয়ালাটা খুব আগ্রহভরে তাহার পানে চাহিল না—ঘাড়টা ঈষৎ কাত করিল।

—কত নিবি ?

—দু-টাকা।

—দু-টাকা! ঈষৎ চমকাইয়া অনুপম তাহার পানে চাহিয়া নির্বাক্ হইয়া রহিল।

রিকৃসওয়ালার মুখে ধূর্ত্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল—সে অন্য দিকে চাহিয়া গুন্ গুন্ করিয়া হালি ফিলমের একটা গান ধরিল।

অনুপমের চোখমুখ গরম হইয়া উঠিল—আর কোন দিকে না চাহিয়া সে হাঁটিয়াই চলিল।

বন্ধুর বাড়ি পদ্মপুকুরের শেষ প্রান্তে। খুব বেশি দূর নহে—তবু অনুপমের অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতেছে। যুদ্ধের বাজারে সর্ব্বত্র অর্থের প্রতিযোগিতা। প্রাক্-যুদ্ধ সমাজের গতিধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে।

সমীর বলিল, এতটা পাম্‌চুয়ালিটি অবশ্য আশা করি নি। আমরা ত ভেবেছিলাম—

—আসব না ?

—না না, ছুটির দিনে—বন্ধুবান্ধবের বাড়ি না-আসা কিংবা সিনেমায় না যাওয়াটা মস্ত অপরাধ বলেই মনে হয়।

—কেন ? শুনি ত লোকের অনেক দুঃখ—

সমীর হাসিল, দুঃখ চিরকাল সুখের সঙ্গে পাল্লা দিতে ভালবাসে। একটা বেড়েছে বলে আর একটাই বা কমবে কেন ?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—কাজ নেই বুঝে—চা খাও আগে।

চা এবং চায়ের আনুষঙ্গিক আর সেই সব লইয়া সুমিত্রা ঘরে ঢুকিল। এত সকালে বাড়ির মধ্যে কে আর বেশবাসে বিশেষ দৃষ্টি রাখে—তবু সুমিত্রাকে অমনোযোগী বলা চলে না। নিভাঁজ প্লেন শাড়ীটা ও ক্রীমের ছোঁওয়া-লাগা মুখখানি, এবং অযত্ন-সজ্জিত এলো-খোঁপাটা ওর চলনের সুষমায় দিব্য মানাইয়াছে। কানের দুল মুখের ঈষৎ হাসির মতই অর্থসৌষ্ঠবে সুকুমার।

—দেখুন ত—চপটা কেমন হ'ল। তাড়াতাড়ি ভেজে আনলুম ত।

সমীর বলিল, তোমার হাতে চপ কোন্ দিনই বা উৎরায়!

—তোমাকে বলা হয়নি। সুমিত্রা গম্ভীর হইল না।

—তাহলে আমি খেতেও পাব না—

—বলুন না ?

—চেহারা ত ভালই বোধ হচ্ছে। তবে এত সকালে এগুলো নাই করতেন।

—বাঃ রে, কাল যে সোমবার—মাংস পাওয়া যাবে নাকি! ছুটির দিনে একটু মাংস-টাংস না হলে—

অনুপম হাসিতে হাসিতে বলিল, খাওয়ার ব্যবস্থাটা তাহলে গুরুতরই হচ্ছে।

—গুরুতর হবার যো কি! অগ্নিমূল্যের মাছ তরি-তরকারির চেয়ে মাংসটা ভাল। আপনি ত ভালওবাসেন।

—বাসি। কলেজ ষ্ট্রীটের বাঙালীর পাঁঠার দোকান মনে হইল। সকালের সূর্য্যের রংও লাল টক্‌টকে—তাই সূর্য্যোদয়ের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

চা পান করিতে করিতে সমীর বলিল, আজকের প্রোগ্রামটা কিন্তু দীর্ঘ—এবং অবিচ্ছিন্ন।

—শুনি ?

—চা পান শেষ হলে মনোনীতদের বাড়ি একবার যেতে হবে। সেখানে ছোটখাটো একটা জলসা আছে।

—সকাল বেলা!

—তা ছাড়া সময়ে কুলোয় না যে। বেলা এগারোটায় সিনেমা। সেখান থেকে ফিরে মধ্যাহ্নভোজন। তারপর হাজরা রোডে একবার যেতে হবে।

—ডাদের ট্রায়াল আছে বুঝি ?

—ভালের হাঁড়াল। সুমিত্রা হাসিয়া উঠিল।

অনুপম অপ্রতিভ স্বরে কহিল, তাই যেন শুনলাম। সুমিত্রা কহিল, ভুল শুনেছেন, মঞ্জুলিকার নাম শোনেন নি?

সমীর হাসিয়া উঠিল, বাস্তবিক আজকাল সমাজে মিশিস কি করে! উত্তর-পূর্ব্ব-মধ্য-কলিকাতায় যাঁর খ্যাতি—

সুমিত্রা কহিল, একটা চ্যারিটি শোয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তারই মহলা আর কি।

—চ্যারিটি কিসের?

হোপলেস। হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গিতে সমীর চেয়ারের হাতলে মাথা এলাইয়া দিল।

—ডেষ্টিটিউটদের জন্য। সারা কলকাতার পথে যারা নিরাশ্রয় হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে—

অনুপম কহিল, হ্যাঁ—ওদের জন্য একটা কিছু করা দরকার।

একটা কিছু? সুমিত্রা প্রশ্নের মধ্য দিয়াই বুঝি মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া উঠিল।

অনুপম তাড়াতাড়ি কহিল, আই মীন সকলকারই একটা-না-একটা কিছু করা উচিত।

সুমিত্রা বলিল, তাই বলুন। একটু হাসিয়া বলিল, তবু সে কতটুকু! আমার তো এক একবার মনে হয়—আজই যদি ওদের দুঃখ দূর করতে পারতাম! ভাবাবেগে সুমিত্রার মুখখানি করুণ দেখাইল।

অনুপম বলিল, কম বেশি সে চেষ্টা সবাই করছেন না কি?

সমীর বলিল, করছেন বই কি। যার ফলে শহরে ওদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

সুমিত্রা রোষকটাক্ষে সমীরের পানে চাহিয়া কহিল, তুমি চাও ওরা শহরে না আসে?

চাই-ই তো। তুমিও চাও—অনুপমও চায়—সবাই চায়।

সুমিত্রা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, নিজের সঙ্গে আর পাঁচ জনকে জড়াও কেন?

জড়াই সাধে! সমীর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। সুমিত্রা রাগ করিয়া জানালার কাছে সরিয়া গেল—অনুপম ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

সমীর বলিল, আমি চাই ওরা শহরে ঢুকে শহরের হাওয়া খারাপ করে না দেয়—তোমরা চাও অন্না পেটে ওরা মরে পড়ুক। উদ্দেশ্য তো একই।

অনুপম বলিল, ওদের বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা উচিত।

উচিত মানি—কিন্তু নিজেদের বেঁচে থাকবার চেষ্টা তার চেয়ে বেশি উচিত। বেশ ত, শহরের বাইরে ওদের আস্তানা করে দাও থাকবার। যত ইচ্ছে চালাও লঙ্গরখানা। শহরের লোককে বিপদে ফেলবার চেষ্টা সস্তা দয়ার মধ্যে নাই বা দেখালে।

অনুপম বলিল, তোমার বিরাগের হেতু?

নিজেকে জিজ্ঞাসা কর—উত্তর পাবে।

সুমিত্রা জানালা হইতে সরিয়া আসিয়া কহিল, দাদার বিরাগের হেতু আমি জানি। ওদের চীৎকারে রাত্রিতে ওঁর ঘুম হয় না।

আর খেতে বসে খেতেও পারি না। ওদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে আমাদের সব রকমের রুচিকে ওরা নিষ্ঠুরের মত আঘাত করছে দিনরাত।

সে দোষ যেন ওদেরই! সুমিত্রার কণ্ঠে শ্লেষের রেশ।

তাই কি বলেছি। তোমরা বলে থাক এ দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি—এই ক্ষুধার্ত্ত চীৎকার তার অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু মানুষ যখন সৃষ্টি করলে মানুষে কেন বাধা দিতে পারলে না।

অনুপম বলিল, যাঁরা সৃষ্টি করেন তাঁদের ক্ষমতা প্রবল বলে। বিধি-বিধানের তেমন সুপ্রয়োগ হয় না বলেও হয়ত বাধা দেওয়া কঠিন।

না তা নয়। যুদ্ধ আমরা চাইনি—তবু তার আঁচ আমাদের সইতে হচ্ছে।

স্বাধীন হলে আমাদের এ দশা ঘটত না।

কোন্ দশা? দুর্ভিক্ষ হয়ত এড়াতে পারতাম, যুদ্ধকে ঠেকাবার উপায় থাকত না। কোন দেশেরই যেমন রইল না। এ তো স্বাধীন—পরাধীনের কথা নয়—এ হ'ল গিয়ে মুনাফা-লোভীর চক্র।

আমরা তাদের বেছে বেছে শাস্তিও তো দিতে পারি। সুমিত্রা কণ্ঠে জোর দিয়া হাসিয়া উঠিল।

পারি না। তারা যে বর্ণচোরা।

তর্ক আর জমিল না—উপর হইতে লাঠি ঠুক্‌ঠুক্ করিতে করিতে সমীরের পিতা নামিয়া আসিলেন। হাতে তাঁহার একখানি অমৃতবাজার।

(ক্রমশঃ)

রোমাঁ রোলাঁর উদ্দেশে

শ্রীগোপাললাল দে

শক্তি শৌর্য্য স্বাধীনতা—জগতের প্রাগ্রসর জাতি
যা-কিছু পাথেয় লয়ে জয়যাত্রা পথে চলে মাতি—
ইহাদের কিছু নাই, তাই ওরা করে তৃণ জ্ঞান,
প্রয়াসেরে পরিহাসে, মহা-মনে করে অপমান।
এদেরই রবীন্দ্র গান্ধী রামকৃষ্ণ বিবেকের বাণী,
কেমনে চিনিলে তুমি সপ্ত সিন্ধু পার হ'তে, জ্ঞানী?
'বিবসন, লজ্জাহীন, কুটীরে গোপনে কাটে দিন,'
তাদের মহত্ত্ব গানে খ্যাতি অর্ঘ কে করে মলিন!

মোহে স্বার্থে নিপীড়নে মহে মহে, বিশ্বচরাচর
আত্মার শরণে শুধু মহতে করিবে মহত্তর;
এ আশা রহস্য সম, সত্য কিন্তু তোমার বিশ্বাস,
সে পুণ্য প্রয়াস-পথে ভারতে পেলে কি পূর্ব্বাভাস?

গুণগ্রাহী বিশ্ববন্ধু সত্যাশ্রয়ী স্রষ্টা জ্ঞানাধার,
স্নেহমুগ্ধ ভারতের, ঋষি রোলাঁ, লহ নমস্কার।

'জনগণে'র রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

আজ বিশ্বব্যাপী জনজাগরণের দিন। জনগণ, দেশের অধিকাংশ লোক, যারা চাষাভুষা কুলিমজুর অর্থাৎ খেটে-খাওয়ার দল,—এদের সঙ্গে আজকের দিনের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের যোগ ভাবে ও কর্মে কোথায় কতটা—এটি একটি সাধারণ কৌতূহলের বিষয়। কবির এই পরিচয় আলোচনার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার, কৃষকরা তাঁর প্রজা, সুতরাং তাদের সঙ্গে স্বভাবতই তাঁর যোগ থাকবার কথা। জনগণের সঙ্গে প্রাথমিক যোগ জমিদারিতে এবং তা এই রায়ত-জমিদার সম্বন্ধে।

খাজানা আদায় এবং বিষয় ব্যবস্থার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর মন মানের বেড়া পেরিয়ে যেত সাধারণের কাছে। তারা জানতও না কখন্ কোন্ মাঠে-ঘাটে অলিতে গলিতে তাঁর সেই মনের আনাগোনা। ছিন্নপত্র, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা, গল্পগুচ্ছ, পঞ্চভূতের ডায়ারী ইত্যাদিতে সেই দরদী কবির সন্ধান মেলে। এককথায় শিলাইদা অঞ্চলের জীবনই তাঁর,—ওরি মধ্যে যতটুকু হয়,—কৃষক বা সাধারণের জীবনের কাছাকাছি জীবন।

অবশ্য আর একবার সেই জন-যোগের প্রবণতা দেখা যায় তাঁর শ্রীনিকেতনের পল্লীসেবাক্ষেত্রে। এখানে আদর্শের তাগিদে তাঁর প্রবর্তিত কর্মের সূত্রে যোগ হয়েছে,—ঠিক কাছাকাছি যাওয়া নয়।

এর পরে একবার কবি গেলেন বিদেশে,—রাশিয়ার সাম্যবাদিগণ তাঁকে নিয়ে দেখালেন তাঁদের নবজীবন গড়ার কাজ। পল্লীকেন্দ্রে ঘুরে তাঁদের সংঘবদ্ধ সুসংস্কৃত জীবনকে জানালেন তিনি অভিনন্দন। রাশিয়ার জনসেবাপ্রণালী এবং দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার আলোচনায় ভরপুর তাঁর "রাশিয়ার চিঠি"।

জন্মেছিলেন ধনীগৃহে। আভিজাত্যের পরিবেশে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন যাপন। বড় বড় বিদ্বান ও গুণীমণ্ডলী পরিবৃত হয়েই কেটেছে তাঁর চিরকাল—বনেদি বিষয়, ভাষা ও তত্ত্বের মধ্যে ছিল তাঁর মানসপরিক্রমণ। তারও ফাঁকে ফাঁকে বিচরণ করতে দেখি কৃষকপাড়ার লোকসংস্কৃতিবাহিত রসসুরধুনীর তীরে তীরে। ছড়া, কবি, বাউল, বৈষ্ণবপদাবলী, টপ্পা, পাঁচালী—এ সকলেও তাঁর অনুরাগ ছিল আন্তরিক; এ সকলের সংগ্রহ, সংকলন, তত্ত্বব্যাখ্যা ও রসপরিবেশনে তাঁর সাহিত্যিক উদ্যম অনেকখানি নিয়োজিত হয়েছে। নিজের অনেক গানের মধ্যে কথায় সুরে রেখে গেছেন লোকসাধারণের সঙ্গে "নাড়ীর টানে"র প্রগাঢ় বেদনা।

এই বেদনা ছিল সাধারণের অভিমুখী; জন্মঅভ্যস্ত আভিজাত্যের গণ্ডীই ছিল কাছে আসবার প্রবল বাধা। মননে থাকলেও অভ্যাসে তিনি সে গণ্ডী ঠেলে চলে আসতে পারেন নি সাধারণের ব্যবহারিক সাধারণ জীবনে। রাশিয়ার সাম্যবাদের প্রতিক্রিয়া তাঁর জীবনেও তোলপাড় যে কিছু না [illegible] এমন নয়—জনগণের বাধা বেধেছিলেন নিজের মধ্যে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে জীবনধারা পরিবর্তনের সংকল্পও একসময়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কার্যত পরিবর্তন হয়নি। জনগণ থেকে দূরে থাকার বেদনা ভিতরে ভিতরে তাঁকে পীড়িত করেছে; সে বেদনা একবার প্রথম দেখা দিয়েছে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়, শেষে দেখা দিল—"ঐকতানে"।

"পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
… … …
জীবনে জীবন যোগ করা
না হোলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।"

ভিতরে প্রবেশ বা 'জীবনে জীবন যোগ করা' বলতে যেভাবে যতটা কাছে থাকার জন্ত তাঁর এই ব্যগ্রতা, ততটা না ঘটলেও, দূরে থাকতে থাকতে তিনি জনগণের জন্ত যতখানি করেছেন, তাঁর সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে এমন দৃষ্টান্তও দুর্লভ। তাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্ত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও বক্তৃতার ব্যবস্থা, লোকশিক্ষার সংস্থান, আর্থিক উন্নতির জন্ত কৃষি, কুটির শিল্প ও সমবায় ধনভাণ্ডার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যের জন্ত স্বাস্থ্যসমিতি, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং কিশোরদের সেবা, শৃঙ্খলা ও খেলাধূলার কাজে সংঘবদ্ধ করার জন্ত ব্রতীদল প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানে তিনি নানা উদ্যোগ করে গেছেন। তাঁর মতে একটি পল্লীকেও যদি একস্থানে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে আদর্শ পল্লী করে গড়ে তোলা যায়, তবে তার থেকেই দেশের বৃহত্তম কল্যাণের সূচনা হবে। তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র শাখাপ্রশাখায় ভারতবিস্তৃত ছিল না। এদিকে তাঁর কর্মপ্রণালী ছিল কেন্দ্রস্থিত করার দিকে, ব্যাপকতার দিকে নয়। তাই তা একটি আন্দোলনের রূপ নিয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি।

শ্রেণীসংগ্রামের সচেতনতা তখনো আসেনি, কিন্তু গানে, বক্তৃতায়, লেখায় স্বদেশীযুগে জাগরণের কথা বলতে গিয়ে, দেখা যায় চাষী-মজুরদের কথাও কবি সেই সঙ্গে গেয়ে চলেছেন। "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন" গানে তথাকথিত সর্বহারাদের প্রতি সম-ব্যথার স্রোতই প্রবাহিত। "দুর্ভাগা দেশ যাদের অপমান" করেছে, সেই "মাটি ভেঙে যারা চাষ করছে, পাথর ভেঙে যারা পথ কাটছে, যারা বারোমাস খাটছে,—রৌদ্রজলে, দু'হাতে ধুলা লাগিয়ে যারা জীবনযাত্রা চালাচ্ছে—সবাই এরা এক শ্রেণী এবং দেবতা গেছেন এদের মধ্যে,—সেইখানেই এদের সঙ্গে মিলে কাজ করলে এ দেবতার পূজা করা হবে," এ কথা বলেছিলেন সেদিন রবীন্দ্রনাথ।

"মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি
মুক্তি কোথায় আছে?
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাধন প'রে

রাখোরে ধ্যান, থাকৃরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক বরে।"

যতটুকু পেরেছেন, প্রিয় অনুষ্ঠান শ্রীনিকেতনে এই 'ঘর্ম ঝরে পড়া'র কর্মযোগেরই তিনি সূত্রপাত করে গেছেন। তবে তা রাজনৈতিক প্রগতির কাজ নয়। তাঁর ধারা গঠনমূলক কাজের। দেশের মুক্তিতে সেটাও যে কতখানি অপরিহার্য তা দেখা যায় মহাত্মাজির ক্ষেত্রেও। তিনি এক দিকে যেমন সাংগ্রামিক অন্য দিকে তেমনি গঠনশীল। আইন-অমান্য আন্দোলনের পরিশেষে দেখা দেয় নিখিল-ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ। রবীন্দ্রনাথ এক দিকে সাংগ্রামিক তাঁর চিন্তায়, তাঁর লেখায়, অন্য দিকে কাজের ক্ষেত্রে গঠনপন্থী। মহাত্মাজির আইন-অমান্য আন্দোলনের মূল পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে প্রথম রবীন্দ্রনাথেরই নাট্যসাহিত্যে। "প্রায়শ্চিত্তে" "মুক্তধারা"র প্রজাদের মধ্যে যে উত্তেজনা তা রাষ্ট্র-অত্যাচারের প্রতিকারে "খাজনাবন্ধ" আন্দোলন নিয়ে। "গোরা"তেও জনগণের কথা আছে। এবং তাতে দেখা যায় তাদের হয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর "গোরা" নেমেছে সংগ্রামে।

শেষদিনগুলিতে এই অখ্যাত নির্বাক মনের জনগণের অস্তিত্বের সত্যতা এবং তাদেরই বাঁচবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস ক্রমে আরো দৃঢ়তর ও উজ্জ্বলতর হয়েছে। "ওরা কাজ করে"—ওরাই চিরকাল টিঁকে আছে, টিঁকে থাকবে, আর-সকলের যে-ই যত প্রবল হোক—

"জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল,
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল,
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।
* * *
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-পরে
ওরা কাজ করে॥"

ওদের এই জীবনীশক্তির প্রতি ভরসার মধ্যেই কবি কৃষক মজুরদের, এই জনগণের প্রতি রেখে গেছেন তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা। কালোপযোগী তাদের জন্য প্রগতিমূলক নূতন ভাবের কর্মক্ষেত্র বা কার্যপদ্ধতি ভাববার কথা তাঁর মনে এসেছিল কি না জানি নে,—নূতন কিছু করার সময় আর হ'ল না। দেশের জনগণের ভয়াবহ দুর্দশার জন্য শাসক সম্প্রদায় তথা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কর্ণধার ইংরেজদের ধিক্কার জানিয়েই তিনি আগামীকালের জন্য এক শঙ্কা এবং সেই সঙ্গেই নূতন যুগে এক মহামানবের আবির্ভাব-আশা রেখে গেলেন তাঁর শেষ ভাষণ "সভ্যতার সংকটে"। কিন্তু এ সময়ও একটা বিষয় লক্ষণীয়। সেই তাঁর জনগণের কাছাকাছি যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন কৃষক-প্রজাদের মধ্যে, দেহ টানবার দিনেও তারাই দেখি এসে পড়েছে কখন্ তাঁর বিদায় অঙ্কের এক পাশে। কবি তখন সব দিক থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এই সময়ে বার্ধক্যজীর্ণ রোগক্লিষ্টদেহেও বিদায় নিতে গেলেন শিলাইদহের জমিদারিতে সুদূর মফঃস্বলের পল্লী অঞ্চলে। বর্ষার জলকাদা বা দূর পথকষ্ট তাঁকে ঠেকাতে পারে নি। সেখানে রায়ত-জমিদারের সেলামি-দরবারের সম্বন্ধ নয়, মানুষের প্রতি মানুষের আত্মিক সম্বন্ধের টানকেই কবির জীবনে জয়যুক্ত হতে দেখি। শান্তি সাম্য পৃথিবীতে কবে আসবে সে ভবিতব্যই জানে, কিন্তু এই আত্মিক প্রীতি-সম্বন্ধের উপরেই হওয়া চাই তার মূল ভিত্তি। ছোটবড়র শ্রেণীভেদ এক ভাবে না এক ভাবে সমাজের বুকে থাকবেই; কিন্তু পরস্পরের সম্বন্ধটি শুদ্ধ হলে সমস্যার সমাধান সকল কালেই সহজ হবে। পাশ্চাত্ত্যের সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষা-নবিশির দিনে বেদনাপ্রবণ আদর্শবাদী এই প্রাচ্য কবির প্রাণ-যোগের বাণীও আমাদের সমভাবেই স্মরণীয়—"মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বাঁধন তাকে···মানতে হবে।"

সর্বপ্রকার '—ইজ্‌ম্' বা '—বার্ষিক প্ল্যান' ইত্যাদি এক দিকে, অন্য দিকে কবির এই প্রাণগত সম্বন্ধ। এই প্রাণের টান ছিল বলেই একদিন জমিদার রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁরই কর্তব্য-পরায়ণ সন্তানশোকাতুর এক নিম্নশ্রেণীর ভৃত্য মানুষের মহান্ মর্যাদায় অমর হয়ে রয়েছে তাঁরই সাহিত্যে। সেখানে সে শুধু একজন ছোটলোক বা কোন একটি চাকরমাত্র হয়ে নেই,—অনেক বড়লোকের বড় ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করে সে হয়ে উঠেছে একজন বিশেষ মানুষ। সাম্যবাদের প্রসারের দিনে এই বিশেষের স্থান সম্বন্ধেই ছিল তাঁর বিশেষ চিন্তা। রাশিয়া ভ্রমণ করে এসে এই আশঙ্কা ও সতর্কবাণীই রেখে গেছেন তিনি ভাবী যুগের সমাজ-ব্যবস্থা লক্ষ্য ক'রে। যে সমাজে ব্যক্তি পায় এই বিশেষত্বের মর্যাদা সেই সমাজই রবীন্দ্রনাথের কাম্য আদর্শ সমাজ।

বণিক বা ধনিক সম্প্রদায় প্রভাবিত কলকারখানায় তৈরি শ্রেণীপ্রধান সভ্যতার চাপে ব্যক্তি দাঁড়ায় একটি সংখ্যা বা ইউনিটের সামিল হয়ে—কলের যুগে মানুষের এই কেজো পরিণতির প্রতিবাদ বিদ্রোহ আকারে দেখা দিয়েছে "রক্ত-করবী"তে।

তার আগে "অচলায়তনে"ও দেখি বিদ্রোহ। সামাজিক পরিবেশ থেকে তার প্রসার। সমাজে আচার-বিচারের বাড়াবাড়ি। মানুষকে,—বিশেষভাবে বৃত্তির দিক থেকে তথাকথিত চাষাভুষো কুলিমজুরদের,—বিশেষত্বহীন করে সাধারণ এক অস্পৃশ্য শ্রেণীতে অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছিল। মানুষের প্রগতিতে এই আর এক দিক থেকে আর-এক রকমের বাধা। রবীন্দ্রনাথ একটি শ্রেণীর বাধার মধ্যে সমস্ত সমাজের অচল অবস্থার দারুণ দুর্গতি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই সমগ্র সমাজেরই প্রগতির জন্য শ্রেণীবিশেষের অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

জনসাধারণের দিক থেকে রাষ্ট্র-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-সুর জেগেছে 'তপতী'তে। অবশেষে 'কালের যাত্রা'য় দেখিয়েছেন এই কালে—"শূদ্রদের জয়।" বলে গেছেন—"ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ,···এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে।" কালের যাত্রায় বিশ্ব-মানবযাত্রীর উদ্দেশে কবির বিশেষ নির্দেশ বিশ্বাস রাখার জন্য "অন্তরের তাল মানের উপর।"

নিজে সুন্দরের উপাসক হয়ে কবি "অস্ত্রের কঠোর" "শাস্ত্রের

কঠোর" উভয়ের পথ বর্জন করেছেন এবং "বাইরের ঠেলা মারার উপর বিশ্বাস" রাখতে না পেরে "অন্তরের তাল মানে"র গানই অন্তরের তাগিদে গেয়ে গেছেন বরাবর। কর্মক্ষেত্রে সাংগ্রামিক হয়ে সংগঠনশীল হওয়ার মূল কারণও মনে হয় তাঁর প্রকৃতিগত বিশিষ্ট সৃষ্টি-প্রেরণার মধ্যেই।

সংগ্রাম হচ্ছে ভাঙার, আর সংগঠন হচ্ছে সৃষ্টি বা গড়ার দিক। ভাঙা ও গড়া এই দুই ধারাই দরকারী। একটি আর একটির পরিপূরক। গড়ার থেকে শক্তি হয় সঞ্চিত, এবং জীর্ণ, অসত্য, অন্যায়কে ভেঙে ফেলে সেখানে সত্য বা ন্যায়-কিছু "হাঁ"এর প্রতিষ্ঠা হয় সম্ভব। নয় শুধু ভেঙে গেলে, ভাঙবারই বা শক্তি জোগাবে কোথা থেকে, তাতে ভাঙা জায়গায় "না"-এরই অর্থাৎ শূন্যেরই বিহারস্থল হয়ে সেটা যে শেষটা নিরর্থক হয়েই থাকে। মহাত্মাজির অসহযোগ আন্দোলনে সংগ্রামের অর্থাৎ ভাঙার দিকটাই ছিল মুখ্য। রবীন্দ্রনাথ সেদিক দিয়ে তাকে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নিজে তখন গড়ে চলেছেন গ্রামোদ্যোগের কাঠামো। শালিসী, ধর্মগোলা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, শিক্ষা, ব্রতী আন্দোলন, সবদিকের কাজের মধ্যেই অসহযোগের পরিপূরক হাঁ-মূলক দিকটা নিয়েই তাঁর কাজ চলেছে অনাড়ম্বরে। সংগ্রামে না হোক সংগঠনের দিকে রবীন্দ্রনাথের কাজ জাতির শ্রেষ্ঠ কাজ, তাঁর প্রতিষ্ঠান জনগণেরই সেবার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

সংগ্রামের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির ভয়ে যে তিনি পশ্চাৎপদ হয়েছেন তা ধরে নিলে তাঁর প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হবে। বস্তুত ঐ পথই তাঁর ছিল না বলে তিনি তা পরিহার করে চলেছেন। কিন্তু যে সৃষ্টিধর্মী অস্তিমূলক আদর্শ-রূপায়ণের পথ তিনি ভিতর থেকে পেয়েছিলেন সে পথে এগিয়ে চলতে সারাজীবনে কোনো দিন ক্লান্ত হন নি, বরং অবিশ্রাম এগিয়ে চলতে গিয়ে অর্থ, মান, স্বাস্থ্য, সংসার, সময় সবই উপেক্ষা করে চলেছেন।

আসলে কবি-তিনি ছিলেন স্রষ্টা। মূলত তাঁর ছিল সৃষ্টির ধর্ম। 'না'-এর পথ নয়, 'হাঁ'-এর পথেই তাঁর চলার প্রবণতা। যে জিনিসটি তিনি চেয়েছেন মানসে তার রূপটি যেমন উদ্‌ভাসিত হয়েছে, বাস্তবে তাকেই রূপায়িত করতে তিনি পেয়েছেন আনন্দ। কোন্‌টা তার বিরুদ্ধ বা বিকৃত সত্তা সেটাকে ভেঙে সারিয়ে বা সরিয়ে দিয়ে কাজ চালাবার ব্যবহারিক হিসেবী বুদ্ধি তাঁকে সংস্কারক বা বিপ্লবীর ভূমিকায় নামাতে পারে নি। প্রচলিত সমাজগত মানুষের বিধ্বস্ত, বিকৃত দুঃখক্লিষ্ট রূপ তাঁকে ব্যথিত করেছে জীবনের সুরু থেকেই; শুভ, সুস্থ, সর্বাঙ্গসুন্দর মানুষের পরিপূর্ণ আদর্শ খুঁজে বেড়িয়েছেন বাস্তবে তার নিতান্ত অভাব বোধ ক'রে। সে দিন পেলেন তা শাস্ত্র ও প্রাচীন-সাহিত্যগত পৌরাণিক ভারতের আদর্শ-মানব—ব্রাহ্মণে। দেখলেন তা গড়া হয়েছে তপোবনে। তখন তপোবনের আদর্শ তাঁকে পেয়ে বসল। দেশের কল্যাণে কোন্ কাজ অনুচিত, কোন্‌টা অসম্ভব, কারো সঙ্গে সেই নিষ্ফল বাদপ্রতিবাদেই একান্তভাবে না মেতে, নিজে যা শ্রেয় মনে করেন, যা তাঁর ধারণায় হওয়া সম্ভব, বাস্তবত শ্রেয়ের সেই 'ইতি' মূলক সার্থক রূপ দেখার আগ্রহেই তিনি তখনকার রাজনৈতিক সক্রিয় জীবন থেকে এলেন সরে; এলেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মানুষ গড়ার কাজে;—সে কাজের পথ তাঁর কাছে হ'ল শিক্ষা। ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করে আদর্শ জীবন ও পরিশুদ্ধ সংস্কৃতি বিস্তারে দেশে সমুন্নত মনঃপ্রকৃতি সৃষ্টির কাজে লাগলেন এসে শান্তিনিকেতনে। পরে কালক্রমে নানা দেশে গিয়ে, নানা সমাজ, নানা চিন্তাধারা, নানা শিক্ষাপ্রণালীর সংযোগে এসে তাঁর প্রাথমিক ব্রাহ্মণিক আদর্শ পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিল বিশ্বমানবে। নর-দেবতায় তার শেষ পরিণতি। "হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে"—এই বলে গানের মধ্যে এক দিন যে ভারততীর্থের দেবতাকে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন, এত দিনে তাঁরই পূজা-মন্দির গড়ে স্বপ্নকে করলেন বাস্তব। সর্বদেশকে স্বদেশের মধ্যে স্বীকার করে তাদের সকলেরই মেলবার নীড় রচনার আয়োজন করলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমে "বিশ্বভারতী" অনুষ্ঠানে।

সবটা ঠিক আদর্শমত না হতে পারে, বা আদর্শেও ত্রুটি থাকা বিচিত্র নয়, কিন্তু কবির মন চেয়েছে,—এই আশ্রমে বিশ্বভারতীর শিক্ষায় যে মানুষ গড়া হবে, সেই আদর্শ মানুষরাই, বা, তাঁর মানুষের ধ্যানগত আদর্শই দেশে দেশে ছড়িয়ে প'ড়ে নূতন এক মানবসমাজের সৃষ্টি করবে,—পুরানো দুর্গতদেরও রূপান্তরিত করবে সেই নূতন মানুষে,—যে শুদ্ধ সুগঠিত সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনচর্চা থেকে দেশের সর্ব প্রকার অকল্যাণ দূর হয়ে গিয়ে সর্বত্র দেখা দিবে দেহে মনে স্বাস্থ্যবান স্বাধীন মহান্ এক সংঘবদ্ধ বিশ্বমানবসমাজের মানুষ।

এই বিশ্বমানবসমাজেই আছে স্বদেশেরও জনগণ। তাদের মুক্তির কাজ এই আদর্শ জীবন ও সংস্কৃতি গড়ার কাজের মধ্যেই আছে মিলিয়ে। তাই শান্তিনিকেতনের এই কাজ তাঁর "দেশের"ও কাজ এবং তা শুধু ভারতের একটি বিশেষ দেশের জনগণের কাজ নয়, সেটি বিশ্বের সমস্ত দেশের সকল জনের কাজ, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে মানুষের কাজ। বিশ্বের জ্ঞানী গুণী উচ্চশ্রেণীই নয়, মূঢ় মূক জনগণও নিশ্চিতই বলতে পারে —রবীন্দ্রনাথ আমাদের, রবীন্দ্রনাথের কাজ আমাদেরও কাজ। সত্যি, যেদিন চারদিক থেকে তারা বলবে, বিশ্বভারতী আমাদের, এর ভাল মন্দ, অভাব-অসুবিধা, আপদ-বিপদ, সুখ-সম্পদ সর্ব দায়িত্বে আছে আমাদের অংশ,—কেন না আমাদের জন্যও কবি একে গড়ে গিয়েছিলেন, সে দিনই সার্থক হবে কবির শান্তিনিকেতন-জীবনের আদি প্রেরণা। সাধারণকে শিক্ষা দিয়ে প্রেরণা জুগিয়ে ভাবতে শিখিয়ে যে পরিমাণে এই দাবি এই কর্তব্যে সচেতন করে সক্রিয় ও দায়িত্বশীল করে তুলতে পারবেন বিশ্বভারতী, অনুষ্ঠানটি সেই পরিমাণেই হবে সার্থক এবং হবেন মৃত্যুহীন গতিতে বিশাল হতে বিশালতর।

বিরাট্ কাজ কবি সুরু করে গেছেন মাত্র; তার সম্পূর্ণতা বহু দূর কাল ব্যাপ্ত ক'রে। শুধু সাহিত্য শিল্প বা আপিসের রুটিন বাঁধা কাজে এক-একজন কৃতি হওয়া নয়,—আচারে-ব্যবহারে চিন্তায়-কথায়, দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্র-আদর্শের ধারাবাহী হওয়া, সর্বমানবিক কাজে কিছু-না-কিছু যোগ রাখা,—শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শে রয়েছে মানুষকে তেমনি ক'রে তৈরি

করার দায়িত্ব। শিল্প সাহিত্যাদির চর্চাও খুবই প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নেই,—কিন্তু অতন্ত্র থেকে এই প্রতিষ্ঠানে আছে যুগের ব্যবহারিক জীবন-গড়ারও কর্তব্য। কারণ শুধু বিদ্যাচর্চা নয়, বিদ্যাকে আশ্রয় করে মুখ্যত জীবন-গড়ার কাজ নিয়েই তো কবি এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। দেশে তাঁর আদর্শরূপ মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে এক-একটি ব্যক্তিজীবনকে পাহারা দেওয়াই ছিল তাঁর সংকল্প। আশ্রমের গোড়াপত্তনের দিনে মনুষ্যত্বে দীন দেশের এই অধিকাংশ দুঃস্থ জনগণের কথাই তো ছিল তাঁর মন জুড়ে—মনুষ্যত্বের দুর্দশা, পরাধীন দেশের অধঃ-পতিত মানুষের অবমাননার জ্বালাই ছিল তাঁর কাজের প্রধানতম প্রবর্তনা,—বলেছিলেন—

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

দেখা দরকার নিছক বিদ্যা বা বৃত্তির সাধনায় তাঁর শিক্ষার ক্ষেত্রে, রবীন্দ্র-সংস্কৃতির যে-কোন সাধনাক্ষেত্রে, এ শান্তি-নিকেতনে বা বাহিরে যেখানেই হোক, এই জনগণের ... ইত্যাদি ম্লান না হয়, সেদিকে কিছুমাত্র ঔদাসীন্য ...) আলোচনা সেটা হবে শোচনীয় আদর্শচ্যুতি। সংস্কৃতি ... যুগী ইত্যাদি দশ একটা শঙ্কাপূর্ণ পরিণতির দিক আছে ... গ্রহেন। সঙ্গীতরত্নাকরে সংক্রামকতায় স্পর্শকাতর রুচিবি...

লোকসমাজ-উপেক্ষা। ...রসপ্রধান গতিরই উল্লেখ করা

কবির নিজের জীবনই ও সচিবের গতি—এক হস্ত নাভিতটে আভিজাত্যের চূড়ায় বসে ... ভাবে অর্থাৎ চিৎ ভাবে; অন্য হস্ত মগ্ন। সেই আভিজাত্য পার্শ্বদেশে রেখে—দেহ নিশ্চল; শুদ্ধ আপনার ইচ্ছায় গড়া অর্থাৎ দোলায়িত না করে গমন। যে সকল তাঁর সাহিত্যানুশীবের অন্তঃসংস্কার পরিমার্জিত এবং মনোবৃত্তি মহৎ, তবু সেই ... সুরুচিবিশিষ্ট—তাহাদের পক্ষেই উপরোক্ত জীবন তিনি স্পৃহাজ্য।

বলেই সরে শ্রমণ, নৈষ্ঠিক ব্রতধারী এবং তপস্বী সাধারণের গতি—

কা—মাত্র চারি হস্ত ব্যবধান পর্য্যন্ত প্রসারিত; দেহ তবে তবাপন্ন। সাম্প্রদায়িক বেশভূষার প্রতি অত্যন্ত সতর্ক, বড়ো ঃ বাহুল্যবর্জ্জিত বেশভূষা। পরিধেয় কষায় রঙের বড়োই প্রথমতঃ সমপাদে স্থিতিপূর্ব্বক "চতুর" মুদ্রাযুক্ত একহস্ত অন্য তে। মুখভাব সৌম্য ও প্রশান্ত। উত্তম মহাব্রতধারী চাইগের পক্ষেই উপরোক্ত গতিক্রম খাটবে। বিভিন্ন সম্প্র-সাধ্য সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য কিন্তু রক্ষা করতে হবে। যেমন—একরূপত" ব্রতধারীদিগের পক্ষে "শকটাস্য স্থিতি" পূর্ব্বক বলদেশ অতিক্রান্তাচারীর" দ্বারা উদ্ধত লয়ে গমন।

অন্ধকারে পথচারীর গতি—পদক্ষেপ অবলম্বন হতে স্খলিত হবার আশঙ্কায় সন্দেহসঙ্কুল; উভয় পার্শ্বে পথসন্ধানরত হস্তদ্বয় সঞ্চরণশীল।

রথারোহীর সহসা অন্ধকারের মধ্যে এলে কিরূপ গতি—দৃষ্টিক্ষেপ ঘূর্ণিত অর্থাৎ দ্রুত। সমপাদ স্থানক। এক হস্তে ধনু অন্য হস্তে "কুরু"; সারথী বল্গা এবং প্রতোদ (প্রেঙ্খণক, ময়ূরচাবুক) হস্তে অগ্রসর হবে।

বিশ্ব... বিমান গতি—পুষ্পকাদি ব্যোমযানে আরোহণকালে ঊর্দ্ধ-

আরব্ধ অসম্পূর্ণ কর্মে। শিক্ষিতেরা তাঁকে সে সকলের মধ্যে পেতে পারেন। কিন্তু আজ তাঁর সঙ্গে জনগণের যোগ-সাধনের উপায় কি? বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথকে সব দিকে বুঝবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি বা রুচি এককথায় মনঃপ্রকৃতির সামর্থ্য জন-গণের নেই। অত বড় কবি-মনীষীর দানে তাই বলেই কি মানুষের এত বড় একটা অংশ থাকবে বঞ্চিত?

জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, বেদনা, উদ্দীপনা প্রকাশ পায় তার গানে। সেদিক থেকে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ জাতির মর্ম-প্রকাশক। দেশজ লোকশিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে গান ...।

এখন কবির বিষয়ে বক্তৃতা বা তাঁর পুথিপত্র প্রচা...

তাঁর গান ও বিশেষ বিশেষ কবিতাগুলি নদী, উন্নতস্থল প্রভৃতিতে শেখাবার ব্যবস্থা করলে দেশজ স্বার্থকে তুলে)। দৃষ্টি অধোগামী। নেবে সহজে। এই ... যারা গাত্র উদ্বাহিত করে, সোপান পংক্তিতে সংস্কৃতি ধরে করবে।

অগ্য ... জলাবতরণে গতি—অল্প জলে বসন ঊর্দ্ধে আকর্ষণপূর্ব্বক চলবে।

বিকলা গতি—চিন্তান্বিত অবস্থায় অর্থাৎ গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন অতি-ময়ে, ভয়ে, আবেগে, ত্বরান্বিত অবস্থায়, বিপৎপাত শ্রবণে, গ্লানিযুক্ত নিদ্রায়, অদ্ভুত দর্শনে, অবশ্য সম্পাদ্য কাজে, শত্রু-অন্বেষণীয় কষ্টকর কাজে, অপরাধীর অনুসরণে, হিংস্র জন্তুর অনুসরণে—এ সকল অবস্থায় অভিজ্ঞ "নট বিকলাগতির" প্রয়োগ করবে।

শৃঙ্গার রস প্রধান গতি—

অপ্রচ্ছন্ন শৃঙ্গার গতিতে—সম্মুখভাগে পথ প্রদর্শিত হয়ে, রঙ্গমঞ্চে নট প্রবেশ করবে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থায় "সূচা-ভিনয়" করবে। মনোরম সুরভিত পুষ্পসার, ধূপ এবং চন্দন দ্বারা অঙ্গ ভূষিত করে, বিচিত্র পুষ্পে সজ্জিত হয়ে, নৃত্য কলাদি দ্বারা পরিশোভিত হয়ে, ললিত পদক্ষেপে, বিলাসযুক্ত সৌষ্ঠব অর্থাৎ "চাতুরাশ্রয়যুক্ত বিলম্বিত লয়ে "অতিক্রান্তস্থিতিতে" রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করবে। হস্তক্রিয়া—কোন মতে—পাদক্ষেপের অনুগামী। আবার অন্য মতে বিপর্য্যয় ক্রমে হস্তপাদের উৎ-ক্ষেপ ও পতন।

প্রচ্ছন্ন অভিনয়ে—(গুপ্ত প্রণয়, অবৈধ প্রণয়ে)

অনুচর বা পরিজন বর্জ্জিত। বেশভূষায় পারিপাট্যের অভাব অর্থাৎ এলোমেলো অসঙ্গতি; একমাত্র সহচর বা দূতী সহায়। নির্ব্বাণ দীপ। অলঙ্কারবাহুল্য বর্জ্জিত। কালোচিত বস্ত্র। অতি ধীরে পদক্ষেপ। নিঃশব্দ শ্লথ গতিতে পদে পদে শঙ্কান্বিত হয়ে কম্পমান দেহে চলবে। কোহল প্রভৃতি আচার্য্যের মতে এরূপ "কামী" বিষয়ক গতিতে "সুতন্ত্র" নামক "ধ্রুবতাল" (উপভঙ্গ বিশেষ) প্রযুক্ত হবে। ঐ উপভঙ্গে প্রস্তাব দ্রুত, লঘু, মিশ্র (১ ৫-৬ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার শেষে বিরাম), "প্রভাবতী" নামক দ্বিপদী ছন্দের অনুসরণে প্রযুক্ত হবে। চন্দ্রালোকে শুক্লবসনে, অবগুণ্ঠিত দেহে, চন্দনসার এবং শ্বেতপুষ্পের পরাগে অঙ্গ অবলিপ্ত হবে; মুক্তাবহুল আভরণ ইত্যাদি থাকবে।

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার গতিও উক্ত প্রকারই হবে। কারণ ব্যক্তি-

াচারীভাব সকলের সহিতই সম্বাদী (সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি আছে) ; মাত্র বিশেষ এই যে, উহা করুণ রসাভিষিক্ত।

রৌদ্র রস প্রধান গতি—

সাধারণতঃ দৈত্য দানব রাক্ষস ইত্যাদি বিষয়ক উদ্ধত প্রকৃতির চরিত্রে রৌদ্র রস প্রযুক্ত হতে পারে। রৌদ্ররসের তিন প্রকার ভেদ কল্পনা করা যেতে পারে : (ক) নেপথ্য রৌদ্র, (খ) অঙ্গ রৌদ্র, (গ) স্বভাবজ রৌদ্র।

(ক) নেপথ্য রৌদ্র—বেশভূষাদি লক্ষণে—রুধিরক্লিন্ন দেহ ; রুধিরাক্ত মুখমণ্ডল এবং পিষিত হস্তাদি ইহার লক্ষণ।

(খ) অঙ্গ রৌদ্র—অনেক বাহু, অনেক মুখ, বহু অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, নানা প্রহরণাকুল, দীর্ঘ স্থূলকায় ইত্যাদি অঙ্গ রৌদ্রের লক্ষণ।

(গ) স্বভাবজ রৌদ্র—রক্ত চক্ষু। পিঙ্গল, রুক্ষ কেশ। কৃষ্ণবর্ণ। কর্কশ, বিকৃত স্বর। রুক্ষ আচরণশীল। ভৎর্সনা ও তিরস্কার-বহুল চরিত্র।

চারতাল অন্তর চরণের উৎক্ষেপ ; দুই তাল অন্তর নিক্ষেপ বা চরণের ভূমিতে স্থাপন। সুতরাং এ গতিকে বিষম গতি বলা যায়। ভিন্নমতে, উপাধ্যায় অভিনবগুপ্ত মতে—তাল শব্দ এখানে ভূমি বা দেশ পরিমাণ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, কালের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে যে পরিমাণ কালে পদ উৎক্ষিপ্ত হবে তদপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ কালে পাতিত হবে।

রৌদ্র প্রকৃতি রসে কোহল প্রমুখ কলাবিদগণ তাল, কলা প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ লক্ষ্য করে নানা প্রকার অর্থ কল্পনা করেছেন। তাঁদের মতে "নর্ত্তনক", "উৎফুল্লক", প্রভৃতি লয় রৌদ্ররসের পরিক্রমে নিযুক্ত হবে। "নর্ত্তনকের" লক্ষণ—তিনটি যতি, শেষের দিকের যতিতে তিনটি অতিদ্রুত লয় দ্বারা বিরাম। প্রয়োগ—বিজয়াভিযানে ; উৎসব প্রভৃতি মত্ত, উন্মত্ত, প্রমত্ত প্রভৃতি ব্যাপারে। তিনটি দ্রুত তালের অন্তে বিরাম পূর্ব্বক, তিনটি যতি হবে দ্বিপদী ছন্দের অনুসরণে—বিজয় উৎসব আরম্ভে, দুঃসাহসিক অভিযানে, অতিরিক্ত হর্ষে, মত্ত-উন্মত্ত-প্রমত্ত গতি বিষয়ে।

"উৎফুল্লকের লক্ষণ"—দুইটি দ্রুত, একটি লঘু এবং ছিন্নক অন্তে বিরাম। সর্ব্বশুদ্ধ চারটি যতি দ্বারা "উৎফুল্লক" হয়। "উৎফুল্লক" বীর রসেও প্রযোজ্য।

"প্রফুল্লক"—কামোন্মাদ ও কামবিলাসের পরিক্রমে। চারটি অন্তঃগুরু-যুক্ত তোটক ছন্দের সহিত অতিরিক্ত আরও একটি অন্তঃগুরু যুক্ত হবে।

বীভৎসরস প্রধান গতি—

বীভৎসরসের স্থান—অপবিত্র ভূমি, শ্মশান, যুদ্ধ বিশ্রান্তির পর রণভূমি ইত্যাদি বীভৎস অভিনয়ের যোগ্য স্থান।

বীভৎসরসে গতিতে কখনও চরণক্ষেপ আসন্ন পতিত (নিকটে পড়া) ; কখনও বা দূরে দূরে নিক্ষেপ এবং "এড়কাক্রীড়িত" পাদচারী দ্বারা অনেক সময় উপর্য্যুপরি চরণক্ষেপ। হস্ত পাদচারী অনুযায়ী।

বীররস প্রধান গতি—

বিস্তৃত পাদক্ষেপ অর্থাৎ "সন্দিত" ও "অপসন্দিত" চারী দ্বারা পদক্ষেপ। "উল্লাসনিকা" তাল—"তোটকের" যে পাদ দুইটি দ্বিপদী মালিনী অর্থাৎ চারটি পদে যে সম্পূর্ণ ছন্দ, তার অর্দ্ধেক। অগ্রগতি খুব দ্রুত 'প্রচারের' দ্বারা। "মল্লঘটী" ত্রস্ত দ্বারা দূরে দূরে পাদক্ষেপ পূর্ব্বক ছেড়কলা অর্থাৎ লঘুপর দ্রুত এই প্রকার অগ্রগতি। এই গতি বেগবহুল। একটি লঘু পাতন এবং তাহার অব্যবহিত পরে দুইটি দ্রুত পাদ এবং এক কলা মাত্র বিরাম। বহুবিধ চারী দ্বারা এই বীর গতি পুষ্ট—যথা "পার্শ্বাক্রান্তা" "দ্রুতাবিদ্ধা" (আবিদ্ধ) "সূচীবিদ্ধ" প্রভৃতি বেগবহুলচারী এবং নানা তালে পূর্ণ। ইহাই সাধারণ ভাবে উত্তম নটদিগের গতি পরিক্রম।

করুণ রস প্রধান গতি—স্থিতপদে (বিলম্বিতে পদক্ষেপ)। দৃষ্টি অশ্রুরুদ্ধ ; দেহ অবসন্ন (ভেঙেপড়া ভাব)। হস্ত উৎক্ষিপ্ত ; এবং পাতিত। সশব্দে রোদন। "অর্দ্ধ্যধিকা চারী" দ্বারা অগ্রসর (তামসিক)। অব্যবহিত কোন অমঙ্গল বা বিপদাদি সংঘটন হবার পূর্ব্বে বা পরে উপরোক্ত গতির প্রয়োগ।

উপরোক্ত গতি ভীরু, কাপুরুষ অথবা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে প্রযোজ্য।

উত্তম নটদিগের পক্ষে গতি ধীর ; সামান্য অশ্রুরেখা নয়নে, দীর্ঘশ্বাস ; উর্দ্ধে শূন্যদৃষ্টি। এ স্থলে সৌষ্ঠবাদির প্রয়োজন নেই। লয় বিলম্বিত—"জঙ্ঘাটিকা লয়।"

মধ্য নটদিগের পক্ষে—নিরুৎসাহ এবং হতাশা। শোক বিহ্বলতা হেতু বিভ্রান্ত বুদ্ধি। ব্যর্থতা বা বন্ধুবিয়োগজনিত শোক হেতু পাদক্ষেপ (অতিরিক্ত উৎক্ষিপ্ত পদ হবে না)।

কঠিন প্রহারে অভিভূত ব্যক্তির গতি—সমস্ত দেহ এবং হস্তপদাদিতে শৈথিল্য এবং অবসাদ। শরীর বিঘূর্ণিত অবস্থায় চূর্ণপদের দ্বারা গতি। "অর্দ্ধ্যধিকা" চারী অপেক্ষা এই পাদক্ষেপে ব্যবধান ঈষৎ অল্প।

শীত অথবা বৃষ্টিদ্বারা পীড়িত স্ত্রী বা নীচ প্রকৃতি নটের পক্ষে গতি—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জড়সড় করে (পিণ্ডাকারে সঙ্কুচিত করে) প্রকম্পন ও হস্তদ্বয় বক্ষস্থলে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় কুব্জভাবে অগ্রসর। দন্ত ও ওষ্ঠ স্ফুরিত। চিবুক প্রকম্পিত।

ভয়ানক রসপ্রধান গতি—

এই গতি স্ত্রী, কাপুরুষ এবং নির্ব্বীর্য্য পুরুষদিগের পক্ষে প্রযোজ্য। চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত অথচ চঞ্চল। শির বিধূত, উভয়পার্শ্বে ভয়চকিত দৃষ্টিতে মুহুর্মুহু অবলোকনশীল। দ্রুত এবং চূর্ণ পদের দ্বারা অগ্রসর। হস্তে "কপোতক" মুদ্রা। কম্পিত দেহ। ওষ্ঠ শুষ্ক। পদে পদে স্খলনশীল।

পুরুষদিগের পক্ষে পাদক্ষেপ "আক্ষিপ্ত" (অর্থাৎ কখনও কাছে কখনও দূরে) এবং "এড়কাক্রীড়িত" চারীদ্বারে উপর্য্যুপরি চরণপাত। হস্তদ্বয় উহার অনুগামী।

নবরসের সব কয়টি রস নিয়েই এমনি করে সম্ভাবনীয় রূপের বিভিন্ন গতির সৃষ্টি ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোন পাত্রে, কি অবস্থায়, কোন গতি প্রযোজ্য নাট্যশাস্ত্রকার তারই সম্ভব মত বিবরণ দিয়ে গেছেন।

এমন রসগতভাবে বিভক্ত করে কিন্তু অভিনয়দর্পণে 'গতির' বিচার হয়নি। প্রাণিজগতের অনুকরণে মূলতঃ সে শাস্ত্রের "গতির"রূপ পরিকল্পিত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের মত লোকচরিত্র খুব অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করে, তার মানসিক

ণস্থা পর্য্যালোচনা করে অভিনয়দর্পণে গতির রূপ সৃষ্টি হয়নি
ং অভিনয়দর্পণে গতির রূপরীতির স্বল্পতার কারণও হয়ত
রাক্ষভাবে কিছুটা তাই। কারণ দৈনন্দিন জীবনের আশে-
শে যে-সব প্রাণী এসে ভীড় করে এবং তাদের ভেতরও যাদের
া মানুষের মনে দোলা দিতে পারে, তাদের সংখ্যা অতি
ল্পই। কাজেই যেখানে মানুষের মনই মুগ্ধ হয় নি, সেখানে,
নুকরণের কোন প্রয়াসই জাগতে পারে না। সেজন্য এত
াণী থাকতেও মাত্র কয়েকটি প্রাণীর অনুকরণ করে বিভিন্ন
তিতে বিভিন্ন রস সৃষ্টির প্রয়াস হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত
দটি প্রধান যথা—হংসী, ময়ূরী, গজলীলা, তুরঙ্গিনী, সিংহী,
জঙ্গী, মণ্ডুকী, বীরা ও মানবী গতি।

হংসীগতি—উভয় হস্তে "কপিত্থ" মুদ্রা ধারণ করে হংসীর
ত যেদিকে চরণপাত সেই দিকেই দেহ পার্শ্বে দুলিয়ে, ধীরে
রে এক এক বিতস্তি অন্তর পাদক্ষেপে যে গমন, তাহাই
হংসীগতি"।

ময়ূরীগতি—উভয় করে "কপিত্থ" মুদ্রা ধারণপূর্ব্বক পদাঙ্গুলি-
মূহের উপর দেহভার স্থাপন করে, পর্য্যায়ক্রমে সহসা এক
ক জানুর চালনা।

মৃগীগতি—উভয় হস্তে "ত্রিপতাকা" মুদ্রা নিয়ে, হরিণের ন্যায়
ল্লম্ফন পূর্ব্বক দ্রুতভাবে দুই পার্শ্বে ও সম্মুখে যে গতি, অভিনয়
র্পণকার তাহাকেই "মৃগীগতি" বলে উল্লেখ করেছেন।

গজলীলাগতি—উভয় হস্ত উভয়পার্শ্বে "পতাকা" মুদ্রায়
াবদ্ধ করে পরিক্রম করবে। তদন্তর সমপাদে যে গতি তাহাই
গজলীলাগতি"।

তুরঙ্গিনীগতি—বাম করে "শিখর" ও দক্ষিণে "পতাকামুদ্রা"
ারণপূর্ব্বক—দক্ষিণ পদ উৎক্ষিপ্ত করে মুহুর্মুহু উলঙ্ঘনপূর্ব্বক
অশ্বের ন্যায় যে গতি তাহাকে "তুরঙ্গিনীগতি" বলা হয়।

সিংহীগতি—ভূমিস্থিত উভয় পদের অগ্রভাগে দেহভার
স্থাপনপূর্ব্বক দু'হাতে "শিখর" মুদ্রা ধারণ করে, বেগে সম্মুখে
উল্লম্ফনপূর্ব্বক অগ্রগতিকে সিংহীগতি বলা হয়।

ভুজঙ্গীগতি—উভয় হস্তে উভয় পার্শ্বে ত্রিপতাকা মুদ্রা ধারণ
পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ যে গতি। উল্লম্ফনপূর্ব্বক সিংহের ন্যায় যে গতি
তাহাকে শাস্ত্রকার ভুজঙ্গীগতি বলে নির্দ্দেশ করেছেন। কিন্তু
ভুজঙ্গী ও সিংহের গতিতে বহু ব্যবধান। একটি চলে মাটিতে
বুকের উপর ভর দিয়ে আঁকা বাঁকা হয়ে; অন্যটি লম্ফ প্রদান
পূর্ব্বক। কাজেই পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ সিংহের মত উল্লম্ফন যুক্তগতি
ভুজঙ্গীর হতেই পারে না। সেজন্যই আমাদের মনে হয় "ভুজঙ্গ"
গতি হবে ত্রিপতাকা মুদ্রা ধারণপূর্ব্বক সর্পের ন্যায় আঁকাবাঁকা
হয়ে ধীরে যে গতি তাহাই "ভুজঙ্গী" গতি। মূল পুস্তকে
"সিংহী ভুজঙ্গী মণ্ডুকী গতির্বীরা চ মানবী" উল্লেখে সিংহের
অব্যবহিত পরেই ভুজঙ্গী নাম উল্লেখে "পূর্ব্ববৎ" বাক্য হতে
সিংহী গতিকেই বুঝায়।

মণ্ডুকীগতি—দুই হস্তে "শিখর" মুদ্রা ধারণ পূর্ব্বক সিংহ-
গতির ন্যায় উল্লম্ফন যুক্ত (কিছুটা সিংহের গতির ন্যায়) ধীর যে
গতি, তাহাকে "মণ্ডুকীগতি" বলা হয়।

বীরাগতি—বাম হস্তে "শিখর" মুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তে
"পতাকা" মুদ্রা ধারণপূর্ব্বক দূর হতে বীরের ন্যায় যে আগমন,
তাহাকে "বীরাগতি" বলে আখ্যাত করা হয়েছে।

মানবী গতি—বারে বারে পাদ মণ্ডলাকারে পরিচালিত
করে বাম হস্ত কটিতে এবং দক্ষিণ হস্তে "কটকামুখ" মুদ্রা ধারণ
পূর্ব্বক যে গমন তাহাকে "মানবী গতি" বলা হয়।

ভারতীয় নৃত্যের "শাস্ত্রীয় গতি"র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এক
প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। অভিনয়দর্পণ, সঙ্গীত-
রত্নাকর, *The Mirror of Gesture* এবং অন্যান্য নৃত্যশাস্ত্র
সম্পর্কে লিখিত পুস্তকাদিতে বর্ণিত গতির পূর্ণ আলোচনা তো
দূরের কথা, একটা প্রবন্ধে শুধু নাট্যশাস্ত্রের গতি অধ্যায়ের পূর্ণ
বিবরণ দেওয়াই সম্ভব নয়। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার নব রসের
বিভিন্ন রসানুযায়ী বিভিন্ন রসপ্রধান গতির উপর অধিক দৃষ্টি
দিয়েছেন বলে তিনি যে প্রাণিজগতের প্রাণীদের বিভিন্ন গতি
সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তা নয়। নাট্যশাস্ত্রে "পন্নগ" গতি,
"অশ্বাক্রান্তা গতি", "নরসিংহ গতি" ইত্যাদির উল্লেখে স্পষ্টই
প্রতীয়মান হয় যে মহর্ষি ভরত প্রাণীজগতের গতিও অনুধাবন
করেছিলেন সে সমস্ত বিস্তৃত আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়—
তারই কিছু আলোচনা করে ও উদাহরণ দিয়ে প্রাচীন ভারতে
নৃত্যে গতির কি স্থান ছিল এবং কতটা উৎকর্ষ লাভ করেছিল
এবং গতির প্রয়োগে কি ভাবে বিভিন্ন রসসৃষ্টি সম্ভব তাই
বোঝাতে চেয়েছি।

বর্ত্তমানে নৃত্যে এবং নৃত্যনাট্যে "গতি"র বৈচিত্র্য অভাব
জনিত যে দৈন্য শিল্পীর রস সৃষ্টির পক্ষে যে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে,
শাস্ত্রীয় গতির চর্চ্চা যদি কিয়ৎ পরিমাণেও এখন সুরু হয় এবং
অভিনীয়মান ঘটনার মূলভাব ও রস সম্পর্কে সচেতন থেকে
শিল্পী যদি শাস্ত্রীয় "গতি"র প্রয়োগ সুরু করেন, তবে তাঁর সৃষ্টি
বহুলাংশেই সার্থকতার সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে। অবশ্য
একথাও সত্যি যে নৃত্যশাস্ত্রে 'গতি'—শুধু গতি কেন, অন্যান্য
রূপরীতি-রূপবন্ধ সম্পর্কেও যে বিধান দেওয়া আছে, মঞ্চে
নৃত্য প্রদর্শনকালে শিল্পী প্রয়োজন মত তার পরিবর্ত্তন ও
পরিবর্দ্ধন করে নিলে তার সৃষ্টি সুন্দরতরই হবে। গতি
অধ্যায় যত দীর্ঘই হোক না কেন, বর্ত্তমানে নৃত্যে, নাট্যে যুগো-
পযোগী এমন অনেক চরিত্রের অবতারণার প্রয়োজন হয়েছে
এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে, শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ
জ্ঞানদ্বারা যা দেহরেখায় ফুটিয়ে তুলতে পুরনো রূপবন্ধ
নূতনভাবে প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করবেন। শিল্পী-
প্রতিভা তাকে রসানুযায়ী পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করে নেবেন—
তাতে কৃতকার্য্য হলেই রসসৃষ্টির পথ সুগম হয়ে আসবে, সে
কথা বলা বাহুল্য।

জনতা

শ্রীগোপাললাল দে

মানুষের মন অতি দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ, বহুলাংশে অজ্ঞেয়, অন্তত পক্ষে অজ্ঞাত। কিন্তু মানুষ চিরদিনই এই দুর্জ্ঞেয় বিচিত্র মনকে জানিবার, বুঝিবার ও চিনিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে চেষ্টা হইয়াছে কখনও তীক্ষ্ণ অববোধ (intuition) অথবা বিস্তৃত অভিজ্ঞতা দ্বারা, আর কখনও বা হইয়াছে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরীক্ষণ ও সমীক্ষণের দ্বারা। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা শেষোক্ত পন্থায় মানব মনকে বুঝিবার চেষ্টা করায় মনস্তত্ত্ব এখন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। প্রথম প্রথম ব্যষ্টিকে কেন্দ্র করিয়াই এই তত্ত্বের আলোচনা চলিত, সুতরাং মনোবিজ্ঞান ব্যষ্টির মানস-ক্ষেত্র ও ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ ছিল। কালক্রমে ইহার সীমা বিস্তৃত হইল। যে কোন 'সাবয়ব সংস্থা' (organism) বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ব্যবহার-ভঙ্গি প্রদর্শন করে, সেই প্রকার সমস্ত সংস্থাই মনোবিজ্ঞানের বিচারের বিষয়ীভূত বলিয়া গণ্য হইল।

বহুজন লইয়া গঠিত হয় 'জনতা'। যুদ্ধ বা শান্তির সময় লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল এই জনতার 'কার্য্যের অনুভূতির ও চিন্তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য' আছে। যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি লইয়া এই জনতা গঠিত সেই সকল ব্যক্তির স্ব-স্ব বিভিন্ন আচরণ-ভঙ্গি হইতে জনতার সমষ্টিগত ব্যবহার অতিশয় পৃথক্ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কাহারও কাহারও মতে জনতার আচরণ-ভঙ্গি প্রায়শঃই স্বভাবতঃ-মান্য চিন্তাধারা ও ব্যবহার রীতির মানের অনেক নিম্নে কাজ করে। সুতরাং জনতার সমষ্টিগত মনন ও ব্যবহার লইয়া পর্য্যালোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

এমন অনেক সময়েই দেখা যায় যে সুশৃঙ্খল সভ্য এবং সামাজিক ব্যক্তি সকল দ্বারা গঠিত জনতা সহসা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া এমন অনেক দুষ্কর্ম করিয়া ফেলিল, যাহা ব্যক্তিগতভাবে করিতে পারা ত দূরের কথা; সুস্থ মানসিক অবস্থায় সে-গুলির কল্পনা করিতেও তাহারা শিহরিয়া উঠিবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ ইত্যাদি জনতার এই মনোগত বৈশিষ্ট্যের পরিণাম। জনতার এইরূপ কয়েক প্রকার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার বর্ত্তমান কালেও দেখা যাইতেছে। বিগত ১৩৪৮, জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাঁহার কথা কিছু উদ্ধৃত করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

"স্পেনের যুদ্ধে মাদ্রিদ শহর ও বার্সিলোনা শহরের উপর মাসের পর মাস শত্রুপক্ষের বোমাবর্ষণ ও গোলাগুলি নিক্ষেপ সত্ত্বেও তথাকার অধিবাসীরা হাজারে হাজারে শহর ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই। ... ... বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডের লণ্ডন ও অন্য কোন কোন শহরের উপর শত্রুপক্ষের ভীষণ বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও সেই সকল স্থান হইতে ভয়ে হাজারে হাজারে লোক পলায় নাই। কিন্তু ঢাকা, আমেদাবাদ প্রভৃতি শহরে আকাশ হইতে একটাও বোমা পড়ে নাই; তাহাদের উপর একটাও কামান দাগা হয় নাই, মেশিন কামানের গুলি-বৃষ্টি একটার উপরও হয় নাই। একমাত্র অস্ত্র যাহা শহরগুলার কতিপয় লোকের শরীর বিদ্ধ করিয়াছিল তাহা কতকগুলো গুণ্ডার ছোরা। তাহাতেই হাজার হাজার লোক (তাহার মধ্যে সমর্থ পুরুষ জাতীয় মানুষও ছিল) শহর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। এরূপ লজ্জাকর ও শোচনীয় ব্যাপার কেন ঘটিল?"

ব্যাপার নিদারুণ এবং কেন ঘটিল এই প্রশ্ন চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলে। দেখা যাক, এই সকল ব্যক্তি জনতা-পর্য্যায়ে পড়ে কিনা। বিপৎপাতের পূর্বে যদিও এই সকল নরনারী নিজ নিজ গৃহে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছিল তথাপি আপৎকালে প্রতিরোধ অথবা পলায়ন এতদুভয়ের যে-কোন একটা মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে জনতার সহিত অল্লাধিক সম্বন্ধযুক্ত হইতে হইয়াছে। বিভিন্ন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও জনতা মনোভাব তাহাদের অন্তরে নিশ্চিত কার্য্য করিয়াছে। সুতরাং জনতা রূপে ইহাদিগকে বিচার করিলে অসঙ্গত হইবে না। শারীরিক এবং মানসিক উভয় প্রকারের সান্নিধ্যই 'জনতা'-মন গঠন করে।

এ দেশীয় জনতার উল্লিখিত দ্বিবিধ ব্যবহারের কথা চিন্তা করিয়া মন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, এবং আত্মপ্রত্যয় একেবারে নষ্ট হইতে বসে। ক্ষণিকের জন্য মনে হয় এত মহাপুরুষের আজীবন সাধনার স্থায়ী ফল হয়ত বা কিছুই হয় নাই এবং জাতির পুনরুজ্জীবনের হয়ত কোন আশাই নাই। এমতাবস্থায় মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া জনতার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়ত নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহাতে এই বিসদৃশ ব্যবহারের মূলীভূত কারণের প্রতিকার সন্ধান কিছু মিলিতে পারে। হয়ত বা প্রতিকার পন্থায় কিছু ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতে পারে।

উদ্ধৃতাংশ হইতে জনতার তিন প্রকারের বিভিন্ন ব্যবহার লক্ষ্য করা যাইবে। এক স্থানের জনতা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের মধ্যেও অবিচলিত, অন্যত্র এক জনতা অকারণে বা সামান্য কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয়া নিরপরাধ প্রতিবেশীর গৃহ, ধনসম্পদ ও জীবননাশের তাণ্ডবলীলায় রত এবং সেই স্থানেরই অপর এক জনতা, অসামরিক এবং নগণ্য অস্ত্রে সজ্জিত আক্রমণকারীর ভয়ে সর্ব্বস্ব ফেলিয়া পলাতক। ব্যবহার-পার্থক্য বিস্ময়কর। জনতার মন কি ভাবে কাজ করে, কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, কে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, ইত্যাদি আলোচনা করিলে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত হইতে পারে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে জনগণের একত্র মিলনেই জনতার উৎপত্তি। ড্রিভার (Drever) সাহেবের মতে জনতা প্রধানতঃ তিন পর্য্যায়ের। (কিয়দংশে শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইবার পরই এই পর্য্যায় গণনা, কেননা আকস্মিক ভাবে মিলিত বিশৃঙ্খল জনতা মনস্তত্ত্বের বিষয়ীভূত নয়।)

জনতা পর্য্যায় (Crowd type)
সমিতি পর্য্যায় (Club type)
সংঘ পর্য্যায় (Community type)

রাজপথে নানা উদ্দেশ্যে নানা জন ঘটনাচক্রে সাময়িক

[ভা]বে মিলিত হয়, স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কথা ভাবে, নিজ কাজ [ক]রিয়া যায়, নিজ গন্তব্য অভিমুখে চলে ; কেহ কাহারও সহিত [কো]ন ভাবে যুক্ত নয়। এই মানুষগুলি খাঁটি বিশৃঙ্খল জনতার [প]র্যায়ে পড়ে। এই জনতার কোন 'একমনতা' নাই, অথবা [ই]হা 'স-মন জনতা' (psychological group) নহে। ঠিক [এ]ই অবস্থায় 'সমবেত মানসিকতা' (collective mental [li]fe) দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এই জনতা কিছুই করিতে পারে [না]। কিন্তু অতি অকস্মাৎ এবং অনায়াসে এই বিশৃঙ্খল জনতা [এ]কটি 'সমবেতমন' পাইতে পারে। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক[ডু]গালের একটি বর্ণনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলেই বিষয়টি [স্প]ষ্ট হইয়া উঠিবে।

"ম্যানসন হাউসের মোড়ে প্রতি কাজের দিনের দুপুরবেলায় [শ]ত সহস্র ব্যক্তির ভীষণ ভিড় জমে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদের [প্র]ত্যেকেই নিজ নিজ ধান্দায় ব্যস্ত, নিজ উদ্দেশ্য অনুসরণ [ক]রিতেছে ; পাশে যাঁহারা আছে তাহাদের প্রতি ইহাদের [কি]ছুমাত্র লক্ষ্য নাই, অথবা অত্যল্পই আছে। কিন্তু সেই পথ[চা]রী জনতার মধ্য দিয়া একটা দমকলের গাড়ী অথবা 'লর্ড [মে]য়রের রাজকীয় যান' আসিয়া পড়ুক, মুহূর্ত মধ্যে ভিড়টি [কি]য়দংশে 'সম-মনোভাব সম্পন্ন জনতা'র ভাব ধারণ করে। [স]মস্ত চক্ষু দমকল বা মেয়রের গাড়ীর উপর পতিত হয়, সকলের [ম]নোযোগ একই লক্ষ্যে আকৃষ্ট হয় ; সকলেই কিয়দংশে একই প্রকার আবেগ (emotion) একই প্রকার মনোভাব উপলব্ধি করে এবং কতকাংশে চতুষ্পার্শ্বস্থিত জনগণের মনন (mental process) দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সকলের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা সাময়িক ভাবে স্তব্ধ হইয়া গিয়া বিশৃঙ্খল জনতা এখন কিয়দংশে স-মন-জনতার শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বহু ব্যষ্টি মন কিয়দংশে সমষ্টি মনে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেকে সমবেত ভাবে কিছু বুঝিতেছে, কিছু অনুভব করিতেছে এবং কিছু করিতেছে (অথবা করার প্রবণতা impulse to action অনুভব করিতেছে)। ব্যক্তিগত বুঝা, অনুভব করা ও কাজ করা হইতে এই সমবেত মনন অল্লাধিক পৃথক্ ধরণের। ('মনন' বলিতে knowing, feeling and doing বুঝাইবে।) এই 'সমবেত মনন' ব্যক্তিগত মননসমূহের সমষ্টি নহে, অথবা তাহাদের গড়পড়তাও নহে। ইহা নূতন সৃষ্টি, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত। সময়ে সময়ে এই 'সমবেতমন' জনতার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা তদন্তর্গত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর স্তরে কাজ করিতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ জনতার মন তদন্তর্গত ব্যক্তিগণের মানসিকতার অনেক নিম্নেই কাজ করিয়া থাকে। ব্যষ্টি-সমষ্টির মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র মনন অপরের স্বতন্ত্র মননকে অভিভূত করিয়া দিয়াছে, প্রত্যেকের মননের মধ্যে যেখানে সমতা আছে তাহা মিলিত হইয়াছে এবং সংখ্যানুপাতে শক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে কোনও সাধারণ লক্ষ্যে আকৃষ্ট হইয়া পূর্বোক্তভাবে জনতা-মন গঠিত হইয়া এই ভাবে বর্দ্ধিত ও কার্য্যকরী হয়। জনতার মনকে গণিতের ভাষায় সকলের মনের 'গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক'-এর সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই মনন প্রথম পর্য্যায়ে সাময়িক, সকলেই জানে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই সমতা ভাঙিয়া যাইবে এবং যে যার কাজে চলিয়া যাইবে। এই পর্য্যায়ের জনতার কোন পূর্বস্মৃতি বা কোন কিছুর প্রতি স্থায়ী প্রীতিরস (sentiment) নাই। কোন বিশেষ সাধারণ উদ্দেশ্য নাই। ইহা একান্ত সাময়িকভাবেই সৃষ্ট। বিশেষ অবস্থায় রাজপথবাহী ভিড়, মেলায় ও সভায় সমবেত ভিড়, ফুটবলের মাঠের ভিড়, সিনেমা, সার্কাসের ভিড় প্রভৃতি জনতা পর্য্যায়ে পড়ে। ম্যাডাম্‌স্ সাহেবের ভাষায় 'বিলয়ন ও প্রতিরোধ' (fusion and arrest) জনতা-মন সৃষ্টির মূলে অবস্থিত। সামাজের (unity) সহিত সামাজের বিলয়ন এবং বিভিন্নতার দ্বারা বিভিন্নতার প্রতিরোধ। যত অস্ফুট এবং অস্থায়ীই হোক এ ক্ষেত্রে বিভিন্নতার মধ্যে সমতা (unity in diversity) আছে। ইহাই হইল জনতা-পর্য্যায়ের লোকসমষ্টি।

এখন কি ভাবে এই জনতা সমিতিভাব প্রাপ্ত হয় তাহা দেখা যাক। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া মিলিত না হইলে অনেক স্থলেই দেখা যায় যে দুই-তিন বা ততোধিক জনের মনের চিন্তাধারা এবং কথোপকথন ক্রমেই নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িতেছে। দুই-তিন জন লোক অথবা অগঠিত চরিত্র বালক অকারণে একত্র মিলিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাহাদের কথাবার্ত্তা অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—এমন প্রায়ই দেখা যায়। শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত জনগণেরও অসতর্ক মুহূর্তে যে এমন কিয়দংশে ঘটে না, তাহা বলা চলে না।

অনেক সময় আবার এমনও দেখা যায় যে, হয়ত রাম শ্যাম দুইজনের মধ্যে কথাবার্ত্তা সুরু হইয়াছে নিতান্ত তুচ্ছ কিম্বা অশ্লীল বিষয় লইয়া, হঠাৎ তৃতীয় ব্যক্তির আগমনে আলাপের মোড় ফিরিয়া গেল। অতি অল্প সময়ে এবং অতি অল্প আয়াসে ইহাদের মনন এবং বাক্যালাপ বহু উর্দ্ধস্তরে উঠিয়া পড়িল। অকস্মাৎ এত পরিবর্ত্তন সম্ভব হইল কি করিয়া ? যে শক্তির দ্বারা সম্ভব হইল পণ্ডিতগণ তাহাকে এক কথায় নেতৃত্ব (leadership) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তৃতীয় ব্যক্তি উচ্চতর জ্ঞান ও নেতৃত্ব শক্তি লইয়া আসায় প্রথমোক্ত দুইজনের মননের মোড় ফিরিয়া গেল।

প্রায়ই দেখা যায় খেলাধূলা, অভিনয়, কাব্যসাহিত্য, ধর্মতত্ত্বপ্রভৃতির প্রতি প্রীতিরস পোষণ করিতে অল্লাধিক উচ্চস্তরের বুদ্ধি ও মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়। সেইজন্ত খেলোয়াড়, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, ধার্মিক প্রভৃতির অল্লাধিক স্বাভাবিক নেতৃত্ব থাকেই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিত হইলে তাহাদের মধ্যে এক নূতন শক্তি কাজ করে। নেতৃত্বের অভাবে এবং সাধারণ উদ্দেশ্যের অভাবে এই শক্তি মানুষের মনের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকেই জাগ্রত করে, কারণ প্রতি 'সহজ-প্রবৃত্তিই' (instinct) আদিতে অমার্জ্জিত ও নিকৃষ্ট। সেগুলি সদাজাগ্রত থাকায় তাহারাই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কের ভাব প্রাপ্ত হয়। কুকার্য্যে উৎসাহদাতা ও কুমন্ত্রী কুচক্রী মিলিলে এই অবস্থায় জনতা এমন অপকর্ম্ম নাই যাহা করিতে পারে না। সে অবস্থায় জনতার আর ভয় থাকে না, আসিয়া পড়ে একটা বিরাট শক্তিমদমত্ততা। পণ্ডিতবর 'লে বঁ'র মতে

জনতা তখন সংখ্যাধিক্য হেতু একটা 'অজেয় শক্তির ভাব' অনুভব করে, 'সেই অজেয়তা বোধ' মনের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে ক্রীড়াপুত্তলির মত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে থাকে। ব্যষ্টি একক থাকিলে, শিক্ষায়, সংস্কারে, শাস্তির ভয়ে, শক্তির ন্যূনতায় সেই প্রবৃত্তিগুলিকে নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দমন করিত। জনতার মধ্যে থাকায় প্রতিরোধ (arrest) নিয়মে সাময়িক ভাবে ব্যষ্টি-ইচ্ছা (individual will) নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং অপকর্ম্মে মতি এবং গতি রোধ করিতে আর কেহ নাই।

এই সময়ে ইঙ্গিত (suggestion) জনতার মনে খুব প্রবল শক্তিতে কাজ করে। নেতৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি নির্দেশ দিলে ত রক্ষা নাই, যদি কেহ কোন প্রকার উদ্দেশ্য না রাখিয়াও বাক্যে ব্যবহারে বিশেষ কোন ভাব বা কার্য্যপ্রবণতা প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাহা হইলেও তাহা জনতার মনে বিচ্ছুরিত হইতে বিলম্ব হয় না। বাগ্মিতার দ্বারা যে কি আশ্চর্য্য ফল হয়, 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের মার্কএন্টনির বাগ্মিতা তাহার উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত। জনতার মধ্যে কতকগুলি লোক যদি অকারণে কোনদিকে ছুটিতে থাকে, কারণ না জানিয়াও সকল লোক তখন সেই দিকে ছুটিতে থাকিবে। জনতার মধ্যে একজন যদি সুযোগ বুঝিয়া ব্যক্তিগত লোভে কোন দোকানের একটা জিনিষে হাত দেয়, তখনই হয় ত দেখাদেখি সংঘবদ্ধ লুঠতরাজ আরম্ভ হইয়া যাইবে। পলায়মান অল্পসংখ্যক লোকের আকারে প্রকারে যদি ভীতিবিহ্বলতার ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে কারণ না থাকা সত্ত্বেও জনতার প্রত্যেকে এক অজ্ঞাত ভয় অনুভব করিবে। আমেরিকান পণ্ডিত জেমস বলিয়াছেন, "আমরা ভয় পাই বলিয়া পলাই না, পলাই বলিয়াই ভয় পাই। দুঃখ বোধ করি বলিয়া কাঁদি না, কাঁদি বলিয়াই দুঃখ বোধ করি।" আক্ষরিক ভাবে ইহা সত্য না হইলেও ইহার মধ্যে মূল্যবান তত্ত্ব নিহিত আছে। যদিও আমরা সাধারণত কোন ভাব অনুভব না করিয়াই তদনুরূপ কার্য্যে রত হই, তথাপি ইহাও সত্য যে প্রথমে ভাব অনুভব না করিয়া যদি সেই ভাবানুরূপ কার্য্যই করি তাহা হইলে তাহার ফলেও স্বতঃই তদ্ভাবের অনুভূতি আসিয়া পড়িবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দুঃখ অনুভব না করিয়াও কান্নার বাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলির অনুকরণ করিলে নিজ হইতে মনে দুঃখানুভূতি আসিয়া পড়িবে।

এখন পলায়মান জনতার অনুসরণ করা যাক। জনতা গড্ডালিকাবৎ পলাইতে পলাইতে যদি দেখে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক ব্যক্তি অথবা সাধারণ কয়েকজন ব্যক্তি (কিছু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলেই ভাল হয়) সম্মুখ দিক হইতে সাহস ও প্রতিরোধের ভাব লইয়া আগাইয়া আসিতেছে—অমনি তাহাদের ভীতিবিহ্বলতা আপনা হইতেই টুটিয়া যাইবে, পলায়নের গতি মন্থর হইবে, প্রতিরোধকারীর ব্যক্তিত্ব প্রবল হইলে বা সংখ্যাধিক্য থাকিলে জনতা আবার রুখিয়া দাঁড়াইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না। জীবের স্নায়ুতন্ত্রী এরূপভাবে গঠিত যে অপর জীবের সহজ প্রবৃত্তিগত ব্যবহার (instinctive behaviour) দেখিলেই তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবণতা প্রাপ্ত হইবে। ম্যাক্‌ডুগাল সাহেব ইহাকে 'আদিম অচেষ্ট সহানুভূতি' (primitive passive sympathy) বলিয়াছেন। জীবের সহিত জীবের এই আদিম সহানুভূতি কবিরাও তাঁহাদের সহজ সত্য দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন। কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইহাকে 'আদিম সহানুভূতি' (primal sympathy) বলিয়াছেন। নিখিল মনের প্রকৃতির সহিত মানব মনের যে একটি নিবিড় যোগসূত্র রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় নিবন্ধে, পত্রে তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। উভয় সহানুভূতি একই ধর্ম্মী কিনা পণ্ডিতেরা তাহার আলোচনা করিবেন, আমরা এখন পূর্ব্ব কথায় ফিরিয়া যাই।

এই ভাবের বিশ্লেষণে 'জেমস্ ল্যাঙ থিওরি' খুব কাজে লাগিবে। সহানুভূতির ফলে জনতা কিছু সাহসের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সময় ও সংখ্যাধিক্য হেতু তাহা বাড়িতেও থাকিবে। এই অবস্থায় নেতার প্রচুর সম্ভ্রম, ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত সম্মোহন শক্তি থাকিলে জনতাকে পুনরায় সংহত করিয়া তিনি তাহাদিগকে নির্ভীক, বিপদে অবিচলিত করিয়া তুলিতে পারিবেন। কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতিতেই যদি ইহা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই নেতা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কার্য্যপদ্ধতি স্থির থাকিলে, শিক্ষা ও পটুতা থাকিলে, উচ্চতর শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা থাকিলে যে-কোন অবস্থাতে জনতাকে যে কত দূর সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করান যায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। এতদ্ভিন্ন যুগ যুগ ব্যাপী ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা, সাহসশৌর্য্য ও স্বাধীনতা থাকায় ইউরোপীয় জনতার নিকট হইতে স্বভাবতঃই উচ্চ স্তরের 'সংঘ মননতা' (group mind) আশা করা যায়।

আর একবার রাম শ্যামদের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক্। যদি উচ্চতর জ্ঞান ও নেতৃত্বশক্তি সম্পন্ন তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদের দলে অতঃপর প্রায়ই আসিয়া জুটে, তাহা হইলে ক্রমে খেলাধুলা, অভিনয়, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদির আলোচনা প্রায়ই চলিতে থাকায় এই সকল বিষয়ের প্রতি ব্যষ্টি এবং সমষ্টি মনে একটি স্থায়ী প্রীতিরস (sentiment) জন্মিতে থাকিবে। ক্রমে নেতার ব্যক্তিত্ব বা রুচির তারতম্য অনুসারে দলটি একটি খেলার ক্লাব, অভিনয় সমিতি, সাহিত্য-সভা, রাজনীতি চর্চ্চা, সমাজসেবা অথবা ধর্ম্মালোচনার সভায় পরিণত হইতে পারে। অথবা ঐ একই সমিতির বিভিন্ন কার্য্যক্রম রূপে পূর্ব্বোক্ত সকলগুলিই থাকিতে পারে। দলটি এখন একটি স্থায়ী ভাব ধারণ করিয়াছে, শৃঙ্খলা পাইয়াছে, ঘন ঘন মিলিতেছে। নানা কার্য্যে সদস্যগণ একে অপরের উপর নির্ভর করিতেছে। দলের একটি বা কয়েকটি সাধারণ স্বার্থ, সাধারণ প্রীতিভাব এবং সাধারণ আদর্শ হইয়াছে। এগুলির জন্য এখন সমিতি বহু দিন টিকিবে, বহু কার্য্য এবং গুরু দায়িত্ব বহন করিতে পারিবে। জনতা এখন সমিতি পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কালক্রমে দলের কিছু কিছু পূর্ব্ব স্মৃতি ও পূর্ব্ব গৌরবের বিষয় হইবে এবং সমিতির স্বকীয়তাবোধ, সম্মান ও শৃঙ্খলা স্বতঃই বাড়িবে। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে কোনও দল প্রথমতঃ নাট্যাভিনয়, সাহিত্যালোচনা বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়া পরে স্থায়ী সমিতিভাব প্রাপ্ত হইয়া বহু প্রকার সৎকার্য্যের ভার লইয়া সমাজের

প্রচুর সেবা করে। দৈনিক কাগজে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলিবে। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যে লোকনৃত্যকে প্রথমতঃ অবলম্বন করিয়া ক্রমে বিবিধ উদ্দেশ্য ও নিয়ম শৃঙ্খলা দিয়া ব্রতচারী সমিতি গঠন করিতে প্রয়াসী ছিলেন, তাহা এই দিক দিয়া বিচার করিলে মনোবিজ্ঞান সম্মত। লোকনৃত্যকে সজীব রাখিবার ইহা বিজ্ঞানসম্মত পন্থা।

সমিতি অবস্থার পূর্ণ পরিণতিই সংঘ অবস্থা। সংঘ-পর্য্যায়ে জনতাকে তুলিতে হইলে কেবল সাধারণ স্বার্থ, প্রীতি-ভাব বা আকর্ষণ এবং আদর্শ থাকিলেই চলিবে না, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে থাকিতে হইবে একটা বিরাট্ সার্ব্বজনীনতা, একটা পূর্ব্বাপর ভাব এবং একটি সনাতনত্ব। আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে এত সর্ব্বতোমুখী, সর্বগ্রাহী এবং বিশ্বজনীন প্রকৃতির হইতে হইবে যে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল নরনারী তাহাদের মধ্যে পাইবে নিজ নিজ বিভিন্ন ধর্ম্ম, রুচি ও শক্তির সকল প্রকারের চরম বিকাশের পূর্ণ সুযোগ। যখন কোন বিশেষ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ স্থানে সকল নরনারী এই বিপুল উদার সংঘ ভাবে মিলিত হয় তখন তাহারা একটি সুসভ্য, সুসংহত, শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়। সংঘ ভাবের ভিতর দিয়াই জাতি নিজ অখণ্ড আত্মার সন্ধান পায়। সংঘ ভাবের ভিতর দিয়া আত্মার বিকাশ হইলেই জাতীয়তা সম্পূর্ণ হইল। এই জাতীয় আত্মার স্বরূপ কি এবং কি ভাবে বিকাশ করা যায় তাহার বিশদ আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়, তবে এ কথা সত্য যে সংহত জাতি বৃহত্তর সংঘ ব্যতীত আর কিছুই নয়, জাতি গঠনে সংঘ ভাব অপরিহার্য্য। বৌদ্ধগণ এই সংঘকে বুদ্ধ ও ধর্ম্মের সমপর্য্যায়ে স্থান দিয়াছিলেন। প্রাচীনকাল হইতেই মহামানবগণ এই সংঘ ভাবের মূল্য বুঝিয়াছিলেন। ইসলাম এক বিরাট্ সংহতি। সংঘ ভাবই জাতিকে পৃথকভাবে ও সম্মিলিতভাবে আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ করে এবং নিজ সুমহান আদর্শ, নিজ 'সত্য শিব সুন্দরে'র পথে দ্রুত চালনা করিয়া লইয়া যায়।

উপসংহারে আর একটি কথা না বলিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। নেতাদের আদেশ উপদেশ মন্ত্রণা ব্যতীত আর তিনটি বিষয় জনতার মনে অধিকতর শক্তিশালী ভাবে কাজ করে। সে তিনটি এই :

১। সহানুভূতি—অনুভূতির অনুসরণ।

২। ইঙ্গিত—চিন্তার অনুসরণ।

৩। অনুকরণ—কার্য্যের অনুসরণ।

পার্সি নান্ এই তিনটিকে একত্রে 'মিমেসিস' অধ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন (Mimesis—Sir T. Percy Nunn)। (শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সমাজ সংগঠনে মিমেসিসের বিপুল কার্য্যকারিতা আছে। তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে।) দূর হইতে একজন মহামানব অথবা কতিপয় মহান্ নেতার পক্ষে সকল এবং পরিপূর্ণ ভাবে 'মিমেসিসের' প্রভাব বিস্তার করা কার্য্যতঃ সম্ভব মনে হয় না। সুতরাং সংঘ ভাবে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে এমন বহু নেতার প্রয়োজন যাঁহাদের কায়িক ও মানসিক সান্নিধ্য জনতা প্রতিনিয়ত লাভ করিতে সমর্থ হইবে, যাঁহারা জনতাকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিবেন।

পথে

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সারা পথখানি এনু মোরা এক সাথে,
দ্বাদশীর চাঁদ তখন আকাশে মাতে।
আঁখি দু'টি করি নীচু
সে আসে আমার পিছু,
মূক-বাণী কভু ডাকে তারে ইসারাতে,
সারা পথখানি এনু মোরা এক সাথে।

চারিদিকে শুধু ঘন বন-কুহেলিকা,
তারি মাঝে কাঁপে একটি পথের শিখা,
সেই পথখানি দোঁহে
এলাম জানি কি মোহে।
সেই আভাখানি নয়নে তাহার লিখা,
চারিদিকে শুধু ঘন বন-কুহেলিকা।

বাণী নাহি ছিল, শুধু চলি পাশাপাশি,
জ্যোৎস্না-কিরণে মুখ উঠে তার ভাসি,
কথা কাঁদে হায় মনে
মুখর কাঁকণ সনে,—
বলা হয় নাকো—কত তারে ভালবাসি,
বাণী নাহি ছিল, শুধু চলি পাশাপাশি।

হাতে ছিল মোর গাঁথা একখানি মালা,
দিই নাই যদি ফিরাইয়া দেয় বালা।
শুধু চেনা এক মুখ
ভ'রেছিল মোর বুক,
সারা পথখানি তাই আঁখি-জল-ঢালা।
হাতে ছিল মোর গাঁথা একখানি মালা।

চাঁদ ঢাকে মেঘে, পথ হ'য়ে যায় শেষ,
প্রাণে রয় তবু হারানো গানের রেশ,
কিছু নাই, ম্লান ছবি।
তবু সচকিতে লভি
উড়ে-পড়া তার একটি সে কালো কেশ,
চাঁদ ঢাকে মেঘে, পথ হ'য়ে যায় শেষ।

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ, এম-এ

পৃথিবীর যে-কোন সভ্য স্বাধীন দেশের সহিত তুলনা করিলে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা সহজেই নজরে পড়িবে। আদর্শহীন, উদ্দেশ্যহীন অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারায় গড়াইয়া চলিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা আইন (১৯৩০), সংশোধিত পাঠ্যতালিকা (১৯৩৮), প্রাথমিক শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে সরকারী কমীটির সুপারিশ (১৯৩৯) প্রভৃতি দ্বারা সামান্য অদলবদল, জোড়াতালি দিয়া প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার সাধনের চেষ্টা হইয়াছে। জীর্ণ ঘুণধরা মূল কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়া নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রাণবান শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাপকতর ক্ষেত্রে গড়িয়া তোলা ব্যতীত দেশের আর্থিক উন্নতি, সামাজিক সংস্কার ও রাষ্ট্রিক চেতনা-সঞ্চার অসম্ভব। ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের গোড়াতে যে ত্রুটি হইয়াছিল আজ পর্যন্ত তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। উচ্চ সৌধ গড়িতে হইলে তার মূলাভিত্তি দৃঢ় হওয়া চাই; দেশে স্থায়ী শিক্ষাসৌধ গড়িতেও প্রাথমিক শিক্ষার বনিয়াদ শক্ত হওয়া দরকার। কিন্তু এই সত্যটি ব্রিটিশ আমলের প্রথম যুগে উপেক্ষিত হইয়াছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া না দিয়া উচ্চশ্রেণীর এক দলকে নব শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইল। উদ্দেশ্য এই হইল যে, উপরের স্তর হইতে চুয়াইয়া শিক্ষা বা অর্জিত জ্ঞান নিম্নস্তরে অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর জনগণমধ্যে প্রসারিত হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার প্রসারকল্পে চেষ্টা চলিল; ফলে প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত হইয়া ক্ষীণভিত্তি উল্টা-পিরামিড (inverted pyramid) ধরনের অস্বাভাবিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল। এই ব্যবস্থা দেশের কল্যাণপ্রদ হয় নাই। জনগণের এক বিশাল অংশ—যাহারা দেশের প্রাণস্বরূপ, জাতীয় সম্পদের স্রষ্টা ও জাতীয় জীবনের শক্তিকেন্দ্র—তাহারা শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ রিক্ত হইতে লাগিল। প্রায় দুই শতাব্দীকাল ব্রিটিশের স্নেহচ্ছায়ায় অখণ্ড শান্তির স্বর্গে বাস করিয়া আমরা ম্যালেরিয়াক্রান্ত শূন্যরক্ত, ক্ষীণ-জীবনীশক্তি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ভারতীয় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান (standard) অতি শোচনীয়। বাসের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, চিকিৎসা, খাদ্য, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যবহার বিষয়ে তাহারা বন্য পশুর স্তর হইতে বেশী উন্নত হইতে পারে নাই।* লোকসংখ্যা বৃদ্ধিই এরূপ দারিদ্র্যের কারণ নয়; কৃষি ও শিল্পসম্পদের যথোপযুক্ত সম্প্রসারণের অভাবই ইহার প্রধান কারণ। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করান নয়; মনের প্রসারতা সম্পাদন, মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত স্বাভাবিক শক্তির বিকাশসাধন, সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তাহার কর্মজীবন উপার্জনক্ষম করিয়া তোলাতেই শিক্ষার সার্থকতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী এরূপ কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় নাই। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা দেশের জীবনধারার সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া কেরাণীকুল সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষা আপামর সাধারণের কোন উপকারেই আসে নাই।

মানুষকে উপার্জনক্ষম করা শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য না হইলেও অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কেননা, সাংসারিক, সামাজিক মানুষের পক্ষে উপার্জনক্ষমতা বাদ দিলে শিক্ষার কোন প্রকৃত মূল্য থাকে না। কারণ সংসার প্রতিপালন, সন্তানের শিক্ষাব্যবস্থা, অবসর-বিনোদন ও সমাজ-সেবার জন্য অর্থের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। চাকুরীই অর্থ উপার্জনের একমাত্র উপায় নয়। প্রকৃত পক্ষে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাধীন ব্যবসা প্রভৃতিই অর্থোপার্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা। বর্তমানের প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য কত দূর সাধিত হইতেছে তাহাই আমরা বিচার করিব।

পাঠকাল ও পাঠ্যবিষয়বস্তু

বর্তমানে চার-শ্রেণীবিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত চার বৎসর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠান্তে ছাত্র যদি মধ্য অথবা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস না করে, তবে তাহার জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষ কোন কাজে আসে না। চার বৎসরের শিক্ষায় ছাত্রের চিত্তক্ষেত্র এরূপ সরস ও উর্বর হয় না যাহাতে কর্মজীবনে সে ঐ অধীত বিদ্যার প্রয়োগ করিতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা অন্ততঃপক্ষে আট বৎসরের কম হইলে বালকের মানসিক শক্তির স্ফুরণ, চিত্তবৃত্তিগঠন ও কর্মজীবনে সাফল্যের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করিয়া তোলা সম্ভবপর নয়। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা ৭।৮ বৎসরের জন্য আবশ্যিক করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াই ঐ সব দেশে জাতীয় শক্তির বিকাশ, আর্থিক উন্নতি ও রাষ্ট্রিক আদর্শ সফল করিবার উদ্যম চলিতেছে। প্রত্যেকটি শিশু দেশের এক একটি সম্পদ। উপযুক্ত শিক্ষাদ্বারা তাহার সুপ্ত মানসিক শক্তিকে পূর্ণতা দিতে পারিলে তাহা দেশ এবং সমাজের কল্যাণেই নিয়োজিত হইবে। কে বলিতে পারে আজকের শিশুদের মধ্য হইতে নূতন করিয়া রামমোহন, বিদ্যাসাগর, আশুতোষের উদ্ভব হইবে কি না?

জাপানে এবং পাশ্চাত্যের সভ্য দেশসমূহে সমাজের সর্বস্তরের স্ত্রীপুরুষের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা ন্যূনতম প্রয়োজন বলিয়া পরিগণিত হয়। সাত বা আট বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষাকালে তাহাদের নিজেদের অভিরুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কোন না কোন অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া তাহারা কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হয়। ঐ বিদ্যা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা বা নীরস বৃত্তিশিক্ষা নয়; উভয়ের সংমিশ্রণে ভাব ও কর্মের সমন্বয়ে তাহা দেশের উপযোগী করিয়া রচিত। দেশের ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব,

---

* *The Economic Background* (Oxford Pamphlets on Indian Affairs) p. 13.

তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আকাঙ্ক্ষা, তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সে যেমন সচেতন হয় তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এবং তাহাদের রীতিনীতি সম্বন্ধেও মোটামুটি জ্ঞান লাভ করে। স্বদেশ ও স্বজাতির সেবার জন্য দেশবাসীকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলাই সেখানে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত।

বাঙালী শিশু চার বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষায় যে সামান্য পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করে, তাহার পরবর্তী জীবনে প্রায় সে-সকলই কর্পূরের মত উবিয়া যায়; যদি বা কিছু থাকে তাহাকে জ্ঞান বলা চলে না। (মহাত্মাজী ইহাকে বলিয়াছেন "a smattering of something which is anything but education)। চার বৎসরের মধ্যে যাতে হাতে-খড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের ভূগোল, ইতিহাস, কৃষিবাণিজ্য হইতে স্থায়ী কার্যকরী শিক্ষা পর্যন্ত আয়ত্ত করান বাংলার দুর্গত প্রাথমিক শিক্ষকদের ত কথাই নাই কোন দেশের শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব নয়। পাঠ্যতালিকা ও বিষয়বস্তু সন্নিবেশও তাই অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্পূর্ণ। ভারতের নদনদী, পাহাড়-পর্বত, প্রধান শহর বন্দরগুলির নাম ও অবস্থান, বাংলার কোন্ জেলায় কি শস্য উৎপন্ন হয় তাহার তালিকা ও ভৌগোলিক সংজ্ঞা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণার বেশী প্রাথমিক শিক্ষার্থীর নিকট আশা করা যায় না। কেন চা দার্জিলিঙে জন্মে, দিনাজপুরে জন্মে না; বাংলায় পাট জন্মে, সিন্ধুপ্রদেশে জন্মে না কেন, ভারতীয়েরা কতক কৃষ্ণ বর্ণ, ইউরোপীয়গণ শ্বেতাঙ্গ কেন—প্রভৃতি 'কেন'র প্রশ্ন তুলিবার সুযোগ তাহাদের নাই। ফলে জাগ্রত-কৌতূহল নিবৃত্তি দ্বারা স্বদেশ ও বহির্বিশ্বের সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করিতে না পারায় তাহাদের মনের সংকীর্ণতা ঘোচে না। নৈসর্গিক কার্যকারণ সম্বন্ধেও তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যায়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাস

বাংলা সাহিত্যের মধ্যে কিছু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী জুড়িয়া দিয়া ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ বিচ্ছিন্ন কাহিনী বা ঘটনা হইতে ছাত্রদের মনে দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ধারণা হইতে পারে না। পরন্তু রাজরাজড়ার, বিশেষ করিয়া মুসলমান সুলতানের সহিত হিন্দুরাজার যুদ্ধবিবাদের কাহিনী পড়িয়া সরল শিশুদের মনে এ বিশ্বাস হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয় যে, হিন্দুর সহিত মুসলমানের বিরোধ চিরন্তন, পূর্বেও ঘটিয়াছে চিরদিনই ঘটিবে। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস যদি ধারাবাহিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া না যায় তবে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস, মানুষের জয়যাত্রার কাহিনী শিক্ষা দিতে আপত্তি কি?—কেমন করিয়া গুহাবাসী আদিম মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখিল, কৃষি উদ্ভাবন করিল, পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিতে শিক্ষা করিল, গুহা ছাড়িয়া গ্রামশহর গড়িল, গৃহ নির্মাণ করিয়া ক্রমে সভ্যতার পথে আগাইয়া চলিল? ইহা হইতে ছাত্রগণ বুঝিতে পারিবে পরস্পরের সহায়তায় ও সহযোগিতায় মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে; কলহ বিদ্বেষ অগ্র-গতির সহায়ক নহে। অন্য দেশের তুলনায় নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাহারা আত্মোন্নতির জন্য পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইতে পারিবে।

সাহিত্য পাঠ

ব্যবসায়ে অপটু বলিয়া বাঙালীর দুর্নাম চিরদিনের। ইদানীং প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের ব্যবসা করিয়া বহু পুস্তকপ্রকাশক ও গ্রন্থকার এই দুর্নাম ঘুচাইবার জন্য যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকই অপাঠ্য। অধিকাংশের ভাষা শিশুদের পক্ষে দুষ্পাচ্য, বিষয়বস্তুও সরস এবং উপভোগ্য নয়। অনেক লেখকই ভুলিয়া যান যে ছোটদের জন্য লেখা বড় সহজ নয়। শিশুদের জন্য সহজ করিয়া কোন বিষয়ে লিখিতে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হইলে তাঁহার মত ভাব ও ভাষার যাদুকরও বলিয়াছিলেন,

সহজ ক'রে বলতে আমায় কহ যে,
সহজ ক'রে যায় না কহা সহজে।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া শিশুর কল্পনালোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিশুমনের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন অথচ সাংসারিক ব্যাপারে পরমবিজ্ঞ ব্যক্তির সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। কিসে তাহাদের কৌতূহল জাগ্রত হয়, কিরূপে ধীরে ধীরে তাহাদের পারিপার্শ্বিক জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতে বাড়াইতে জগতের বৃহত্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়, কিরূপে শিশুর ভাবপ্রবণ চিরচঞ্চল মন জানা হইতে অজানায়, বাস্তব হইতে স্বপ্নলোকে উড়িয়া বেড়ায় ইহা যাহার জানা নাই—সোনার কাঠির যাদু যাহার করায়ত্ত নয় তাহার পক্ষে শিশু-মনের খোরাক যোগান বিড়ম্বনা মাত্র। স্বাস্থ্যবান যুবকের পক্ষে যে খাদ্য আয়ুবর্ধক, দুগ্ধপোষ্য শিশুর পক্ষে তাহাই প্রাণঘাতী।

জীবনের সহিত শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। প্রকৃতপক্ষে জীবন কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া গড়িবার জন্যই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। কাজেই দেশভেদে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়াই শিক্ষা-ব্যবস্থা রচিত হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহে এই ভাবেই প্রাথমিক শিক্ষাধারা গঠিত। শিক্ষার্থী এবং তাহার পারিপার্শ্বিককে কেন্দ্র করিয়াই সেখানে শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছে। জার্মানীর শিক্ষারীতি আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন শিক্ষাবিদ্ বলিয়াছেন:

"The materials of instruction or curriculum must be derived from those aspects of life with which the pupils at each stage of development are familiar (Heimatkunde, *Knowledge of the Environment*), and which furnish the real and concrete relations between school and life outside."

—বালকের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু তাহার পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্র হইতেই আহরণ করিতে হইবে যাহাতে সে স্কুলের ভিতর দিয়া বাস্তব জীবনের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পায়। কর্মজীবনের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা এবং তাহা সমাধানের জন্য তাহাকে প্রস্তুত করা শিক্ষার এক প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্যা শুধু ব্যক্তিগতভাবে অর্থোপার্জনের

যুদ্ধোত্তর ভারতে বিমান-চলাচল-ব্যবস্থা

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

যুদ্ধান্তে শান্তির পর সমগ্র বিশ্বে যে ব্যাপক বিমান-চলাচলের প্রসার হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যুদ্ধের সময় বিমান সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যন্ত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে, শান্তিকালেও ইহা নিশ্চয়ই প্রধান শক্তিরূপে গণ্য হইবে। দূরবর্তী স্থানে যাত্রী ও মালবহনে যে বিমানশক্তি এই জীবন-মরণ যুদ্ধে অগ্রগতির সহায়ক হইয়াছে তাহা ভবিষ্যতে বাণিজ্য-দ্রব্যাদি বহনেও বিশেষ সাহায্য করিবে। বর্তমানে যে-সব জাতি স্ব-স্ব দেশে যে সামরিক বিমান-বৃদ্ধির পরিকল্পনা করিতেছেন, তাঁহাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন যে কেবলমাত্র ব্যবসায় বৃদ্ধির জন্য নয়, প্রকৃষ্টরূপে নিরাপত্তারক্ষার জন্যও বিমানপথের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতীতে যেরূপ সমুদ্রে অর্ণবযান প্রয়োজন হইয়াছিল বর্তমানে সেইরূপ আকাশে ব্যোমযানের প্রয়োজন হইয়াছে।

ভারতে যানবাহন চলাচলের জন্য রেলপথ, রাজপথ, জলপথ ইত্যাদি অত্যল্প। এরূপ বৃহৎ দেশে প্রয়োজন হিসাবে ঐ সকলের অল্পতা বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে। যদি আমরা ভারতকে অল্প পরিমাণেও শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করিতে চাই তবে আমাদিগকে সেকেলে গো-শকটগুলি উঠাইয়া দিয়া সুদীর্ঘ রাজপথ, রেলপথ নির্মাণ করিতে হইবে। আধুনিক প্রথায় সমুদ্রপথ ও নদীপথগুলির বিস্তার সাধন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে; সর্বোপরি আমাদিগকে বর্তমান যানবাহন-চলাচল-ব্যবস্থা ও বিমান-পথ-প্রসারের ব্যবস্থায় সচেষ্ট হইতে হইবে। ভারত ও চীন এই দুইটি অতি বিস্তীর্ণ অনুন্নত দেশ; সুতরাং এই দুইটি দেশেই বিমান দুইটি জাতির অগ্রগতিতে সহায়করূপে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিবে। আজ আমাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে যে সুদীর্ঘ ও বিরক্তিকর সময় অতিবাহিত করিতে হয়, বিমানে সেস্থলে অতি অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যাইতে পারা যাইবে। অদূর ভবিষ্যতে এক প্রান্ত হইতে দূরবর্তী অপর প্রান্তে অথবা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে মাত্র ৪ ঘণ্টা সময় লাগিবে। সুতরাং বর্তমান যানবাহনে চলাচলে ঐরূপ ভ্রমণে অতিকষ্টে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে হয়। অতঃপর ব্যোমযান স্থানীয় দূরত্ব হ্রাস করিয়া বিভিন্ন প্রদেশকে সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সান্নিধ্যে আনয়ন করিবে।

এইরূপ বিতর্ক প্রায়ই শুনা যায় যে, ভারতীয় জনসাধারণ ব্যয়বহুল বিমান ভ্রমণে সঙ্গতি-সম্পন্ন নহে। অনেকের ধারণা, যুদ্ধান্তে শান্তি-প্রতিষ্ঠার সাত-আট বৎসরের মধ্যে বিমান-ভ্রমণ মধ্যবিত্তের সাধ্যায়ত্তে আনা সম্ভবপর হইবে; বহু বিমান-ব্যবসায়ীও ভারতে বিমান-চলাচলের সহায়তা করিবে। যুদ্ধের পূর্বে বিমান তৈরি ও তার আনুষঙ্গিক খরচ—চালাইবার খরচ, গ্যাসলিনের দাম, বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ এবং চালকের বেতনাদি—খুব বেশী ছিল। ইহা তখন নির্মাণ-সৌষ্ঠবে ও মাল-বহন কার্যে উপযুক্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। অতঃপর বিমান-চলাচলের ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে: উক্ত প্রণালীকে সহজ ও সুগম করিতে হইলে ভারতের মধ্যে সমস্ত শিল্পপ্রধান শহরের (কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, সিংহল) সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন, সমগ্র ভারতে কতকগুলি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট কেন্দ্র স্থাপন, এবং তথা হইতে ছোট ছোট পরিপোষক কেন্দ্রের সহিত যোগ রাখিয়া সকল দিকে গমনাগমনের পথ প্রসারিত করিতে হইবে। সমস্ত বিমান-পরিচালক কোম্পানীকে একযোগে বিমান-ঘাঁটি তৈরি করিতে হইবে। উহাতে সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের বেতার-যন্ত্র স্থাপন করিয়া প্রয়োজনবোধে সরকারী সাহায্যে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই পথে কোন্ কোন্ ধরনের বিমান-চালনার ব্যয় স্বল্প হইবে এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের ধারণা, সুদীর্ঘ পথে ডি-সি-৩, ২১টি আসনযুক্ত এবং অনতিদীর্ঘ পথে ৬-১০-আসনযুক্ত দ্রুতগামী বিমানই সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে। ক্ষুদ্রাকৃতি বিমানগুলি যাত্রীসমেত মাল-বহন করিলে পূর্বের মত বারংবার যাতায়াত আবশ্যক হইবে না। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মত দুইটি বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থানের মধ্যে যাতায়াতে যাত্রীসংখ্যা খুব বেশী হইবে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ২১-আসনযুক্ত বিমান ব্যবহারই স্বল্পব্যয়সাধ্য হইবে। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমেরিকা সম্ভবতঃ ৫০।৬০ জন যাত্রীবাহী ডি-লুক্স বিমান ব্যবহার করিবে এবং উহা ঘণ্টায় ২৭৫ মাইল গতিবিশিষ্ট ডি-সি-৪ ধরণের হইবে। সাগরের উপর দিয়া দেশের দূরবর্তী স্থানে গমনাগমনের জন্যও কনস্টলেশন ধরণের বিমান ব্যবহৃত হইবে। যুদ্ধশেষে অর্থাৎ শান্তি স্থাপনের দশ বৎসর পরে ৪ ইঞ্জিনবিশিষ্ট ৬২½ টন মালবহন-ক্ষম একশত যাত্রীবাহী বিমান ঘণ্টায় ২৭৫ মাইল গতিবিশিষ্ট হইবে। ঐ ধরণের ৩৫ টন মালবাহী বিমানও ৩০০০ হইতে ৩৫০০ মাইল পর্যন্ত যাতায়াতে ব্যবহৃত হইবে।

সম্ভবতঃ ২৫-৩০ টন চার ইঞ্জিনযুক্ত বিমান মালবহনের কার্যে লাগিবে। অধিক সময় ভ্রমণের জন্য উন্নত ধরণের বৃহৎ আকৃতির বিমানে দূরবর্তী স্থানের যাত্রিগণ শয়ন-প্রকোষ্ঠ, পোষাক-পরিধান গৃহ, প্রসাধন গৃহ, ক্রীড়াস্থান, পানশালা, ভ্রমণস্থান, টেলিফোন ও টেলিভিশন যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ পাইবে। কিন্তু এরূপ আড়ম্বরবিশিষ্ট অলীক পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে বেশী সময় লাগিবে না। যুদ্ধের পর উপরি উক্ত অতি দ্রুতগামী, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ, বিশেষ কার্যকরী ও স্বল্পব্যয়সাধ্য বিমান ভারতের পক্ষে নিশ্চয়ই সহজলভ্য হইবে।

ভারতবর্ষকে উপযুক্তরূপে সেবা করিতে হইলে ছোট-বড় উভয় আকারের ১৫০টি বিমানযুক্ত একটি বিমানবহরের প্রয়োজন। এই সমস্ত বিমান যদি বিলাতে অল্পমূল্যে তৈরি করান যায় তবে যে-সব প্রতিষ্ঠান উহা তৈরি করাইবে তাহারাও লাভবান হইবে। একটি কর্মরত বিমানের স্থায়িত্ব ১৫০০০ ঘণ্টা অথবা পাঁচ বৎসর। কোন কোন প্রতিষ্ঠান

তাহাদের বিমান সর্বদা চালিত রাখিয়া ২০,০০০ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করিয়াছে। ভারতে আকাশপথে চলাচল বৃদ্ধির সহিত বিমানেরও চাহিদা বাড়িবে এবং কর্মক্ষেত্রের প্রসারের সহিত প্রয়োজনেরও আধিক্য দেখা দিবে। এ দেশে আকাশ-পথে চলাচলে যে বিমানের প্রয়োজন তাহার জন্য ইংলণ্ড এবং আমেরিকার মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নাই। প্রথমোক্ত স্থানে বিমান প্রস্তুতের খরচ কম, সুতরাং উহার উপর নির্ভরতার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু আমাদের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিত হইয়া যদি একটি কারখানা স্থাপনা করিতে পারে তাহা হইলে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হইবে। এই সব প্রতিষ্ঠানের ৬-১০-আসনযুক্ত বিমান ও উহার নক্সা তৈরি-করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বড় বড় বিমান তৈরি করা ভারতে সম্ভবপর হইবে না। উহা যে বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হইবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অতঃপর যে-সব কারখানা তৈরি হইবে সেগুলি বিমানবহরের প্রয়োজন মিটাই-বার জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। বর্তমান যুদ্ধে ইহা সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে যে বিমানবহর যুদ্ধের একটি প্রধান অঙ্গ, এমন কি উহা দেশরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য সশস্ত্র বাহিনীরও প্রধান সহায়। বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হউক বা না হউক, আশা করি প্রত্যেক জাতিই তাহার বিমানবহরকে শক্তিশালী করিবার জন্য যথাসর্বস্ব ব্যয় করিবে। বর্তমান যুদ্ধে 'রবট' বিমান বিপজ্জনক অবস্থা আনয়নের সম্ভাবনা দেখাইয়াছে। বিমান-বিজ্ঞানে অধিকতর উন্নতি সাধিত হইলে দূরগামী রকেট-চালিত চালকহীন বিমান এবং অতি দ্রুতগামী জেট-প্রোপেলড্ বিমান উদ্ভাবনে পৃথিবীর যে কোন দূরবর্তী স্থানে কোন ভবিষ্যৎ যুদ্ধে ভয়াবহ ক্ষতি ও ধ্বংস ঘটিতে পারে। আজকাল জগতে যেরূপ বিভিন্ন শাসনতন্ত্র প্রচলিত ও পরিকল্পিত হইতেছে, ভারতেও সেইরূপ শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের প্রস্তাবনা চলিতেছে, ফলতঃ উহা যেরূপ হউক না কেন, ভারতকে বাঁচাইতে হইলে তাহারও একটি সুসজ্জিত ও শক্তিশালী বিমানবহর পরিপোষণ করা উচিত। বিদেশী বিমানবহর, তাহার সাজ-সরঞ্জাম ও সরবরাহের উপর নির্ভর করা কোন জাতিরই বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। যুদ্ধরত সৈনিকদলের পিছনে একদল বিজ্ঞানবিদ্ থাকা দরকার। গোলা-বারুদের কারখানাগুলি যেমন সশস্ত্র সৈনিকদের অস্ত্র যোগাইবে সেইরূপ বৈজ্ঞানিক দলের কারখানাও ভারতীয় বৈমানিকদিগকে বিমানশক্তি সরবরাহ করিবে। এখন ভারতবর্ষে প্রাথমিক কার্যারম্ভের জন্য বিমানের নক্সা-পরিকল্পনা, বিমান তৈরি ও বৈমানিক দলগঠনের উপযুক্ত লোক ভারতীয়দের মধ্যে পাওয়া যাইবে। অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায় উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞকে বেতন দিয়া বিদেশ হইতে আনিতে হইবে। আমাদের দেশের ছাত্রেরা যখন বুঝিতে পারিবে যে বিমান-ক্ষেত্রে তাহাদের জন্য একটি শি- সুযোগ আসিতেছে তখন তাহাদের মধ্যে অধিকতর ছাত্রগণ তাহা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইবে। ভ- দিগকেও কার্যক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে পারা য- বহুসংখ্যক যুবক যুদ্ধশিল্পে শিক্ষিত হইতেছে এই শিল্পে নিয়োজিত করা যাইবে।

আকাশ-পথে চলাচলে যে-সব খরচ হয় তাহার মধ্যে জ্বালানী দ্রব্য, তেল, লোকজনের বেতন, আকস্মিক দুর্ঘটনা-জনিত ক্ষতি এবং বীমার প্রিমিয়াম—এই কয়টিই প্রধান। আমেরিকার বিমান-ব্যয়-হিসাব অনুসারে ইহা সব খরচের শতকরা ২৮ ভাগ। ইউরোপ ও আমেরিকার লোকজনের বেতন অপেক্ষা ভারতে বেতন কম হওয়া সত্ত্বেও এখানে গ্যাসলিনের খরচ বেশী বলিয়া এই খরচ প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ হইবে। উল্লিখিত দফার খরচের পরই ঘাঁটি ইত্যাদি প্রস্তুত খরচ, উড়াইবার খরচ এবং লোকজনের ভদ্রোচিত বেতন ধরিলেও আমেরিকা ও ব্রিটেন অপেক্ষা আমাদের দেশে অনেক কম হইবে এবং উহার পরিমাণ খুব কমই রাখা যাইবে। কিন্তু যাত্রী এবং মাল বহিবার ভাড়া যথেষ্ট হ্রাস করিবার পক্ষে গ্যাসলিন খরচই প্রধান অন্তরায়। কি হারে ভাড়া ধার্য করিলে সফলতার সহিত বিমান চালনা করা যাইতে পারে তাহা এখন বিবেচনা করা যাউক। ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলে মনে হয় যে বর্তমানে প্রতি মাইলে গড়ে ১১ পয়সা খরচ ধরা যাইতে পারে। এই হারে ভাড়া ধার্য করিলে কেবল যে কোম্পানীর লাভ হইবে তাহা নয়, যাহারা রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়িবার সামর্থ্য রাখে তাহারাও ইহা ব্যবহারে লাগাইতে পারিবে। অল্পদূর বিমানভ্রমণের ভাড়া রেলের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া অপেক্ষা কিছু বেশী হইবে—খুব বেশী নহে। উদাহরণ-স্বরূপ কলিকাতা হইতে বোম্বাই ভ্রমণের খরচ ধরা যাউক। প্রথম শ্রেণীর রেলের ভাড়া ১৫০৲, ইহা ছাড়া খাওয়া ইত্যাদি খরচ লইয়া ১৭৫৲ বা ঐরূপ। বিমান-ভ্রমণে আরাম ও ক্ষিপ্রতার জন্য ঐ টাকা যে-কেহ ব্যয় করিতে সম্মত হইবে। কলিকাতা হইতে ঢাকা পর্যন্ত স্বল্প পথ ভ্রমণে কত খরচ পড়ে এখন দেখা যাউক: এই দুইটি স্থানের আকাশ-পথে দূরত্ব ১৫০ মাইল। মাইল প্রতি ১১ পয়সা হিসাবে ধরিলে ভাড়া ২৫৸৵০। যদিও ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলের ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশী তাহা হইলেও ইহা নিশ্চিত যে রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক হইবে। ১২,০০০ ফুট উচ্চে ঘণ্টায় ২২০ মাইল বেগে যাইতে পারে এরূপ ৪০০ অশ্ব-শক্তির দুই-ইঞ্জিনযুক্ত ৬-১০-আসনবিশিষ্ট প্রত্যেকটি বিমান অল্প দূরবর্তী পথে ব্যবহৃত হইবে। ন্যূনকল্পে ধরা যাউক, একবার উঠা-নামায় ও ১৫০ মাইল যাওয়ায় এক ঘণ্টা লাগে। ঐরূপ বিমানে একবার ভ্রমণের খরচ নিম্নে দেওয়া গেল:

জ্বালানী দ্রব্য ও তেল	৭২৲
চালাইবার লোকজনের খরচ, ক্ষয়-ক্ষতি ও অন্যান্য খরচ	৫২৲
	১২৪৲

দিকে
তাহারে প্রণাম করি ৬
উন্নত শক্তির পারে। সে বাঁধন দেওয়া হয় নাই)
দেশের গৌরবধ্বজা তুলে ধরে, তার পদধূলি ০—১২৪৲
ভক্তিভরে তুলে লই। মন্দিরের গন্ধ পুষ্প মধ্যে—ধরিয়া
সেখানে দেবতা নাই দুর্গতের কুটিরে সে রহে।

কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, এলাহাবাদ এবং মাদ্রাজ—এই পাঁচটি কেন্দ্র হইতে চালিত করা হইবে। উহারা ফল, শাক-সব্জী ইত্যাদি মালপত্র ও যাত্রী বহন করিবে। প্রয়োজন-বোধে ঐগুলি এম্বুলেন্স হিসাবেও ব্যবহৃত হইবে এবং যে-সব স্থানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে রোগীদিগকে সেই সেই স্থানে লইয়া যাইবে আর রাশিয়ার ব্যবস্থানুযায়ী বন্যাবিধ্বস্ত স্থানে আহার্য সরবরাহ করিবে। বিমান-ভ্রমণ-ব্যয় কমাইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধ্যায়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হইতে পারে: (১) ভারতে গ্যাসলিন তৈরি; ১৫০খানি বিমানের জন্য ন্যূনপক্ষে গড়ে বৎসরে ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্যালন গ্যাসলিন দরকার হয়। আবশ্যক গ্যাসলিন উৎপাদনেই ভারতে একটি নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিবে। এদেশে গ্যাসলিন উৎপাদন যদি সহজসাধ্য হয় তবে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সস্তাদরে সে উহা অন্যান্য দেশকেও সরবরাহ করিতে পারিবে। এইরূপে গ্যাসলিনের দাম কমাইতে পারিলে সস্তায় বিমান-ভ্রমণের প্রধান অন্তরায় দূরীভূত হইবে। (২) ভারতে বিমান-তৈরি। বিমান-ঘাঁটির আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহের প্রয়োজন এত বেশী হইবে যে, উহার জন্য একটি শিল্পাগার পরিচালিত হইবে। বিদেশ হইতে বিমান আমদানী করিতে যে খরচ পড়ে প্রথমাবস্থায় তাহা অপেক্ষা কম খরচে উহা তৈরি করা সম্ভব হইবে না। ক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যে বিমান-তৈরির খরচ যথেষ্ট কমান সম্ভব হইবে। বর্তমান এলুমিনিয়ম শিল্পালয়গুলি বিমান-তৈরির উপাদান সরবরাহ করিতে পারিবে। যে 'ব্লু-প্রিন্ট' বিদেশ হইতে আমদানি করা হয় তাহাও এদেশে তৈরি বাঞ্ছনীয়, সেই সঙ্গেই এ দেশের কর্মিগণকে অপেক্ষাকৃত ভাল ও আধুনিক ধরণের ভারতীয় অবস্থার উপযুক্ত বিমান-তৈরি পরিকল্পনায় নিয়োজিত করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্তমানে এদেশে বিমান-তৈরির উপযুক্ত এমন সব লোক পাওয়া যাইবে যাহারা যথাযোগ্য সুযোগ পাইলে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদেশী-বিশেষজ্ঞদের সহিত তুলনীয় হইতে পারিবে। এইরূপ শিল্পালয় থাকা বা রাখার বিশেষত্ব এই যে, বিমানের অতিরিক্ত অংশগুলি খুব অল্পদামে এই দেশেই পাওয়া যাইবে। (৩) বর্তমানে যুদ্ধের চাপে বিমানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে যুদ্ধোত্তরকালে উহা অপেক্ষা দ্রুতগামী ও উন্নত ধরণের ইঞ্জিনের শক্তিপ্রভাবে দীর্ঘকাল শূন্যে উড়িয়া বহু দূরবর্তী স্থানে পাড়ি দিতে পারিবে। অল্প জ্বালানী খরচায় উৎকৃষ্ট ইঞ্জিন সহজ-লভ্য হইবে। ইহার পরিপোষণ এবং চালনার খরচও কম লাগিবে। (৪) ভারতীয় বিমান-কোম্পানীগুলির একযোগে কেন্দ্রীয় বিমানবিদ্যালয় স্থাপন কঠিন নহে। অনেকের সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা সাত-আট বৎসরের মধ্যে বিমানী-বিমানসংশ্লিষ্টদের সাধ্যায়ত্তে আনা সম্ভবপর হইবে; বহু ব্যবসায়ীও ভারতে বিমান-চলাচলের সহায়তা করিবে। যুদ্ধের পূর্বে বিমান তৈরি ও তার আনুষঙ্গিক খরচ—চালাইবার খরচ, গ্যাসলিনের দাম, বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ এবং চালকের বেতনাদি—খুব বেশী ছিল। ইহা তখন নির্মাণ-সৌষ্ঠবে ও মাল-বহন কার্যে উপযুক্ত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। অতঃপর বিমান-চলাচলের ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে: উক্ত

বিমান-চলাচলের নিরাপত্তা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লোকের মনে এখনও বিশেষ আতঙ্ক আছে যে, বিমান-ভ্রমণ অতিশয় বিপজ্জনক। এক সময়ে এইরূপই ছিল বটে, কিন্তু বর্তমানে উহাতে দুইটি ইঞ্জিন, এবং অতি উন্নত ধরনের বেতার সংযুক্ত হওয়ায়, অবতরণের যান্ত্রিক সুযোগ, উপযুক্ত রক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক নিরাপদ বন্দর থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। এখানে একটিমাত্র দৃষ্টান্তই বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে—বর্তমান যুদ্ধের চারি বৎসর পূর্বে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৪৩ কোটি মাইল উড়িতে বারটি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। যদি এখনকার মত বেতার-ব্যবস্থা ও অন্যান্য উন্নত প্রণালীর নিরাপত্তা-ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে এই বারটির মধ্যে অন্ততঃ ছয়টি পরিহার করা যাইত। যে দুইটি দুর্ঘটনা চালকের ভুলে হইয়াছিল তাহা চালক ও সহচালকের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে নিবারণ করা যাইত। মাত্র একটি দুর্ঘটনা গঠন-প্রণালীর দোষে ঘটিয়াছিল। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জলপথে ও আকাশপথে চলাচলের পক্ষে সুবিধাজনক যে সমস্ত উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আধুনিক বিমান-বন্দরে বর্তমানে যেরূপ বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ-ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে বিমান-ভ্রমণ এখন আর মোটরগাড়ী, রেল ও অর্ণবপোতে ভ্রমণ অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক নহে।

ভারতে বিমান-শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে ভারতীয়দের জন্য বিমান-চালনা-পদ্ধতি শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমানে আমরা শূন্যে স্বাধীনতা বিষয়ে নানা কথা শুনিতেছি, কিন্তু ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে, জগতের সমস্ত জাতির সম্মতিক্রমে সমগ্র বায়ুমণ্ডলকে আন্তর্জাতিক বিমান-ক্ষেত্রে পরিণত করা। কার্যতঃ ইহার প্রকৃত অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, যে-কোন জাতির বিমান অপর সকল দেশের জল, স্থল, বন্দর ও বিমান-বন্দরের উপর দিয়া চলাচল করিবে। আজ পর্যন্ত সমস্ত দেশ তাহাদের নিজ নিজ বায়ুমণ্ডলে আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই নীতি অনুসারে কোন জাতি তাহার নিজ দেশের উপর দিয়া অপর জাতিকে যাইতে দেয় না বা তাহার বন্দরগুলি ব্যবহার করিতে দেয় না। আর্থিক লাভ অথবা পরস্পরের সম্মতিক্রমে পরবর্তী কালে এই নীতির ব্যত্যয়ও ঘটিয়াছে। আমাদের স্বকীয় বিমানশিল্পের অনুকূল চুক্তি সম্পাদিত হইলে আকাশপথে স্বাধীনতা স্বার্থহানিকর হইবে না। ভারতের উপর দিয়া অপর বন্দরে যাইবার সময় বৈদেশিক বিমানগুলিকে কেবল জ্বালানী গ্রহণ ও মেরামতের জন্য এখানে নামিতে দেওয়া হইবে। উহাদিগকে ভারতের এক স্থান হইতে অন্য স্থানের যাত্রী বা মাল লইতে দেওয়া হইবে না। ভারত হইতে আমেরিকা, ব্রিটেন, চীন, রাশিয়া বা অন্যান্য দেশে মাল ও যাত্রী আধাআধি হারে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে। বড় উড্ডয়ন ও বেতার-সুযোগ সকলেই সমভাবে গ্রহণ প্রয়োজন। ঐবে। আন্তর্জাতিক বিমান-নিয়ন্ত্রণ-সংঘ গঠনে করান যায় তবে ... বাধা দিতে হইবে, কারণ ঐরূপ শক্তি-তাহারাও লাভবান হইলে তাহার স্বার্থ-সংঘাতে ছোট ছোট ১৫০০০ ঘণ্টা অথবা ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে। যে-সমস্ত

জাতি-সমন্বয়ে ঐ সকল বিমান-পথ প্রস্তুত হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ভার সেই সব জাতির উপর ন্যস্ত থাকিবে। পরস্পরের সম্মতিক্রমে ও সুবিধানুযায়ী আন্তর্জাতিক বিমানপথের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক বিমান-সংঘ কেবলমাত্র নিরাপত্তা-ব্যবস্থা, সাজসরঞ্জাম, যৌসংশ্লিষ্ট-ব্যবস্থা, আবহাওয়া-ব্যবস্থা, ভাড়ার হার ইত্যাদির সাম্যবিধায়ক পরামর্শ সমিতি-রূপে থাকিতে পারে। আমাদের এই ঘরোয়া বিষয়টিতে ভারত-সরকারের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে; তাঁহার উচিত—

১। ভারতে সমস্ত আকাশপথে ডাকচলাচল ও বিমান বন্দরের সুযোগ-সুবিধা সকলকে দেওয়া; (২) কোন কোম্পানীর সার্বভৌম অধিকার স্থাপনে বাধা দেওয়া; (৩) অসাধু প্রতিযোগিতায় বাধা দিয়া সৎ প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দেওয়া —সুতরাং ভারত যেন যথাযোগ্য বিমান-চলাচল-প্রথা প্রবর্তন করিতে পারে; (৪) বিদেশীদের তৈরি সব বিমান বন্দর নিজেরা লইয়া উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করা এবং আধুনিক সুবিধাদায়ক আরও কতকগুলি বন্দর তৈরি করা; (৫) বিমান-বিশেষজ্ঞ-সংঘ গঠন করিতে হইবে। তাঁহারা বিমান-বন্দর, ব্যবসায়-নিয়ন্ত্রণ, বিমান সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি এবং উহার নিরাপত্তা-বিষয়ক নানাবিধ উন্নতিসাধনে গবেষণা করিবেন। আমরা এখন বিমান-শিল্প গঠন ও নির্মাণ বিষয়ে বিরাট্ উন্নতির পরিকল্পনা করিতেছি। ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই শিল্প আমাদের দেশে সমৃদ্ধি লাভ করিবে। বিমান মানবজাতিকে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ ও বিভিন্ন জাতির সহিত আলাপ-আলোচনার সুবিধা করিয়া দিবে। ভবিষ্যতে যদি এই শিল্পের ভিত্তি নিরাপত্তা ও মিতব্যয়িতার উপর স্থাপিত হয় তবে বিমান-ভ্রমণ আমাদের দেশেও যথেষ্ট জনপ্রিয় হইবে এবং দেশের হাজার হাজার যুবক এই কার্যে নিয়োজিত হইতে পারিবে।*

* গত মার্চের (১৯৪৫) মডার্ণ রিভিয়ু-এ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কে. কে. রায়-লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে।

সর্ব্বহারার বন্দনা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শৌর্য্যের বন্দনা-গানে ইতিহাস পরিপূর্ণোদর,
জ্ঞান-যুদ্ধে স্তুতি করি' স্তবস্তোত্র হ'ল বহুতর,
আমি আজ তাহা করিব না।
ব্যর্থকাম ধরাতলে,
ধরণী কর্দ্দম হ'ল অবিশ্রাম শ্রম স্বেদ জলে।
উদয়াস্ত দিনমান অবমান আর অবসাদ
পাণ্ডুর বদনে যার—রসনার বিগত সুস্বাদ
তিক্ত কটু লাগে ধরা। চন্দনের ভারবাহী পশু,
আঁধার জীবনে আলো নাহি দিল ভাগ্য বিভাবসু।
দ্বারে দ্বারে করাঘাত করি কারো খোলে নাই দ্বার,
যে উৎসন্ন নিরন্নেরে অন্নপূর্ণা দিল না আহার
তাহারে বন্দনা করি।
ধনী যার কেড়ে নিল ধন,
রাজারে রাজস্ব দিয়া পথে বাহিরিল অকিঞ্চন,
কাচে ও কাঞ্চনে যার একাকার, অভাবের হেতু
বিমুখ যাহারে সবে, মুখ তার যেন ধূমকেতু,
যাত্রাপথে অমঙ্গল, কুত্রাপি যে আশ্রয় না পায়—
তাদেরে বন্দনা করি সর্ব্বহারা ভগিনী ভ্রাতায়।
যে মুমূর্ষু ধর্ম্ম চাহি' মৃত্যু হতে চৌর্য্যে করে ভয়,
ডান হাতে মাগে ভিক্ষা বাম হাতে কারে না বঞ্চয়,
বঞ্চিত সবার কাছে, তবু কারে মন্দ নাহি কহে,
কৃতকর্ম্মে কলে ফল দার্শনিকসম তৃপ্ত রহে,
বিনা পাপে প্রায়শ্চিত্ত করে যারা পদলগ্ন থাকি,
ভোজবাজি সম তায় ছলনায় ভুলাইয়া রাখি'
ধনী বিপ্র ভূমিপতি সুপ্রসন্নচিত্তে করে ভোগ
বিত্তে বলে বলীয়ান দুর্ব্বলেরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ
করিয়া শাস্ত্রের যোগে।
পূর্ব্ব জন্মে কৃত বহু পাপ
তাহারি দুষ্কৃতি বশে দুরদৃষ্ট দেয় দুঃখ তাপ,
যাহা জন্ম-জন্মান্তরে বিপ্র পাদোদকে প্রক্ষালিয়া
আশীর্নির্মাল্য লভি' সুনির্ম্মল হয় জন্ম নিয়া
পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে, তবে তার সমুদ্ধার হয়,
হয় তো বা মিলে মুক্তি। তা নহিলে নহে পাপক্ষয়
অস্পৃশ্য শবর-দেহে।
আমি কহি বিপরীত রীতি।—
ভাবগ্রাহী ভগবান, স্তবগান করে শাস্ত্রস্মৃতি,
শাসনে করুণা যাঁর, করুণায় ন্যায়,
নিরপেক্ষ এক নীতি সকল জনায়।
চণ্ডাল ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হয় তাই তপস্যার বলে,
ব্রাহ্মণ শ্বপচাধম—চাপা পড়ে পিতৃপুণ্যতলে
আপন যোগ্যতা বিনা। পঙ্কিল পল্বলে জন্ম নিয়া,
তণ্ডুল লবণ তৈল কাষ্ঠাভাবে দন্তে চিবাইয়া
যাহার দিবস কাটে, রাত্রি কাটে মূর্চ্ছিতের মত,
তাহারে প্রণাম করি সে যদি না মাথা করে নত
উদ্ধত শক্তির পায়ে। সে যদি বলিষ্ঠ বাহু তুলি'
দেশের গৌরবধ্বজা তুলে ধরে, তার পদধূলি
ভক্তিভরে তুলে লই। মন্দিরের গন্ধ পুষ্প নহে—
সেখানে দেবতা নাই দুর্গতের কুটিরে সে রহে।

শব-সাধন

শ্রীবিহঙ্গবালা দাসী

—ধাঃ।

—কেন রে?

—এদের বাড়ীর চেঁচামেচির জ্বালায় পড়াশোনা ত কিছু হবার যো নাই বাপু।

ভবতারা ডাল সাঁতলাতে সাঁতলাতে বললে, সত্যি বাছা, দিনরাত্ত যেন পাড়া তোলপাড় করে তুলেছে।

অমর জিজ্ঞেস করলে, কে গা?

—ওই প্রিয়র মা।

পিসীমা দুর্গামণি রান্নাঘরের দ্বারের কাছে বসে শাক বাছছিল, ভাইপোর মুখের পানে চেয়ে বললে, তা কি করবে বল, তোমার মায়ের রূপে গুণে মনের মত বৌটি হয়েছে তাই তুমি কোকিল-রাগিনী ভাঁজছো। সকলের ত তা নয়।

অমরের প্রসন্ন হাস্যময় মুখখানা হেঁট হয়ে পড়ল।

ভবতারা ভাজায় নুন-হলুদ মাখতে মাখতে বললে, তা চোখে তখন কি হয়েছিল? কালো বৌ যদি বরদাস্ত করতে না-ই পারবে ভাল দেখেশুনে নিয়ে এলেই হ'ত, কপালের মাঝখানে চোখ দুটো তবে কিসের জন্তে শুনি?

—সে দুটোতে তখন রূপচাঁদের ঘোর লেগেছিল, বুঝলে।

ভবতারা মুখখানাকে ফিরিয়ে বললে, কপাল আর কি, দরকার নেই বুঝে। চোখে দেখে যাকে নিয়ে আসব তার আবার অত ব্যাখ্যানা কেন? কার তাতে পৌরুষটা বাড়ছে?

দুর্গামণি ভাজের দিকে চেয়ে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, আপনার বেলায় আঁটিসাঁটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি, না? ওই রকম অবস্থায় পড়লে দেখতুম গো বৌ, কে কত পাড়া ঠাণ্ডা রাখতো।

ভবতারা পিছন ফিরে এই স্পষ্টবাদিনী ননদিনীর পানে চেয়ে হেসে বললে, বাবারে, ঠাকুরঝি আমাদের যেন কি, বুড়ো হয়ে মরতে চললুম এখনও আমার সঙ্গে খুনসুটি করতে ছাড়লে না। একেই বলে ননদ-নাড়া।

—শুনলি রে অমু, তোর মার কথা? ওই যে—উচিত কথা বলতে গেলেই বন্ধু বিগড়ে যায়। রাধুর বিয়ের সময় তুমি কি করেছিলে মনে আছে?

—মাগো, ঠাকুরঝির এত কথাও মনে থাকে! তা বলে অমনি করেছিলুম ঠাকুরঝি?

—অমনি না হোক ওরই কাছাকাছি ত? যাই হোক্ গে, আহা বিয়ে দিয়ে কত কষ্ট ক'রে ঘরে বৌ তুললে এদিকে ছেলেও বৌ দেখে ঘর ছাড়লে। সৌখিন ছেলে—পছন্দ হ'ল না। ঘরের বৌ ফেলবার নয়। যত তাকে দেখছে ততই কই মাছের মত ধড় ফড় ক'রে মরছে। আমাদেরও এক সময়ে বৌ-কাল গেছে, রূপেও যে বিদ্যেধরী ছিলুম তাও নয়, অদৃষ্টে নেই ভোগ করতে পাইনি, কই বাপু তাদের কাছে সুখ্যাতি বই এত ব্যাখ্যানা শুনিনি কোন দিন।—ব'লে দুর্গামণি একটি নিঃশ্বাস চেপে ফেললে।

ভবতারা বললে, কি সব দিনকালই পড়ল ঠাকুরঝি! এই যে আমাদের একএকটি বিদ্যেদিগ্‌গজ ধনুদ্ধর—ভাল আছে ত আছে? তারপর?

অমর হেসে বললে, কেন ধনুর্দ্ধর কি করলে তোমায়?

—কর নি, করলে আর রক্ষে করবে কে? ওই যে প্রিয় তোদেরই সঙ্গে ত পড়ত, এখন এমন গোল্লায় গেল গা। মা বাপ কত আশা ক'রে যে ছেলে মানুষ করে ছেলেরা তা বুঝবে না, যারা মা বাপ হয়েছে তারাই বুঝবে। তখন তাদের সব আশায় ছাই পড়ল। পোড়া বৌটাও বড় অলক্ষুণে। সাধে কি প্রিয়র মা চেঁচিয়ে মরে? রূপ ত নেই, একটু লক্ষণও কি থাকতে নেই?

দুর্গামণি একটু হেসে বললে, ও যে ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো হয়ে পড়েছে গো। আহা বাছারে! শুধু গুণও দোষ।

২

অমর কলেজ থেকে এসে যার জন্যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করে রইল, কই তার আসার ত নামগন্ধ নাই। দেখে বেশ একটু চ'টে ম'টে উঠে হতাশভাবে বিছানায় সটান চিত হয়ে পড়ল, মনে মনে বললে, আচ্ছা, আচ্ছা।

খানিক পরে তার ছোট বোন নীলি চা এনে হাজির। যাক্ যেটুকু আশা ছিল সেটুকুও ধূলিসাৎ হয়ে গেল, আর ভেতরে ভেতরে তার ব্রহ্মাণ্ডদেবও বড় ঠাণ্ডা রইল না।

—অ বড়দা, তোমার চা এনিছি যে।

বড়দা নিরুত্তর। নীলির ডাকের ওপরে ডাক,—অ বড়দা, বড়দা, ওগো বড়দা, বাবারে বাবা কলেজ থেকে এসে বুড়ো ছেলে ঘুমোতে বসল।

ভগিনীর প্রিয়সম্ভাষণে বড়দার বোধ হয় এইবারে ঘুম ভাঙ্গল, সে বললে, কি বলছিস্ কি, কি?

—চা খাবে না?

—না।

—কেন?

—চা খাওয়া ছেড়ে দিলুম।

—নীলি আশ্চর্য্য-নয়নে দাদার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে বললে, ইস্ তা আর হতে হয় না গো, তুমি আবার চা ছেড়ে দেবে, হয়েছে আর কি!

বড়দা বীরপুরুষের মত চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে বললে, কেন রে পোড়ারমুখী, আমি কি মানুষ নই, না কি মনে করেছিস?

নীলি ঠোঁট উলটে বললে, ইঃ ভারি ত মানুষ। হ্যাঁ বড়দা, তুমি যে আমার চতুর্দ্দোলা তৈরি করে দেবে বলেছিলে, কবে দেবে দাদা, বল না?

—সে একদিন দোব তখন, এখন জ্বালাতন করিসনি বাবু, পালা।

দাদার মন তখন কোন চতুরঙ্গ-দোলায় দোদুল্যমান নীলি ত তা জানে না, তাই সে আবেদন করলে, কবে? কাল যে আমার ছেলের বিয়ে হবে।

দাদা চোখ বুজেই উত্তর দিলে, ছুটির সময়।

—ছুটির সময় তুমি রোজ বল ত, কত ছুটি ফুরিয়ে গেল। বাবারে আমার হাত যে গেল, ধর না বাবু চা-টা।

দাদার চা নেবার মত কোন লক্ষণই প্রকাশ পেলে না, দেখে দুষ্টু নীলি দাদার মুখের পানে চেয়ে কি ভেবে কে জানে হেসে বললে, ওঃ তবে বুঝি বৌদিকে ডেকে দোব, দাঁড়াও দিচ্ছি।—ব'লে সটান সে দ্বারের কাছে এগিয়ে গিয়ে সপ্তমে স্বর চড়িয়ে হাঁক দিলে, ও—বৌদি—বড়দা—।

অমর এক লাফে তড়াক করে বিছানার উপর উঠে ব'সে ভগিনীকে সামলে নিয়ে বললে, এই—এই, ওরে পোড়ারমুখী, থাম্। মা টা কেউ ওখানে থাকে ত—। কে তোকে ডাকতে বললে রে বাঁদরী?

—তবে তুমি কি বলছ?

—বলব আবার কি? কিচ্ছু বলি নি।

—কিচ্ছু বলনি বৈকি?

অমর সোজা হয়ে ব'সে জজের মত গম্ভীর গলায় ভগিনীকে জেরা করলে, কি বলিছি বল্? বল্ কি বলিছি?

আসামী ভগ্নীটি হটিবার পাত্রী নয়। ভারি সেয়ানা, চোখ দুটিতে তার দুষ্টামি মাখানো, সে চোখ পিটপিট করতে করতে ভারি গলায় সমান উত্তর দিলে, বলনি, বলবে বলবে করছিলে ত?

জজ সাহেবের চোখে মুখে একটি চাপা হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল, কিন্তু সে মুখে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য এনে হাস্যস্ফুরিত অধর দাঁতে চেপে ভগিনীর মুখের প্রতি কটমট ক'রে চেয়ে বললে, বলব বলব কচ্ছিলুম, আঃ ম'ল রে।

নির্ভীক আসামী তথাপি বিচলিত হ'ল না, সে বিচারকের রক্তচক্ষুর দিকে চেয়ে অম্লান মুখে গজ গজ করতে করতে উত্তর দিলে, না কচ্ছিলে না? আবার আঃ ম'ল বলা হচ্ছে। চা-টা যে এদিকে জুড়িয়ে গঙ্গাজল হয়ে গেল। কখন খাবে? খালি ঝগড়া করতেই পারে ছেলে!

—আমি ঝগড়া করছি না তুই ঝগড়া করছিস রে চুলোমুখী। ব'লে টিপি টিপি হাসতে হাসতে জজ ভ্রাতা তখন আসামীর হুকুমই তামিল করলে, এক চুমুকে গঙ্গাজল সদৃশ চাটুকু নিঃশেষ ক'রে আদরমাখা স্বরে রায় দিলে, হয়েছে ত? যাও দূর হও।

নীলি দরজার বাইরে পা দিতেই অমর পুনরায় ডাকলে, এই নীলি, শোন্ শোন্।

নীলি ফিরল,—কি?

কাউকে কিছু বলিস টলিসনি যেন।

—আচ্ছা গো আচ্ছা। ব'লে নীলি মহা গিন্নীর মত মুখখানাকে ক'রে ভারিক্কি চালে পা ফেলে ফেলে চ'লে গেল।

৩

আল্‌সেতে বুক রেখে মুখ বাড়িয়ে অণিমা ডাকলে, বৌ?

পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে শোভনা উত্তর দিলে, কেন দিদি?

—আজ তোমায় অত বকছিল কেন বৌ?

—বকা আর কবে কম থাকে দিদি? ওতে আমার কিছু লাগে না, অভ্যেস হয়ে গেছে দিদি। একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস শোভনা চুপে চুপে চেপে ফেললে।

—আজ কিন্তু মাত্রাটা বড় বেশী বাড়াবাড়ি, সেই সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে।

শোভনার শীর্ণ ঠোঁটে একটু ব্যথার হাসি ফুটে উঠল, আমার ওই আরম্ভই থেকে যায়, শেষ আর হয় না দিদি।

—তা সত্যি রে, শেষ হয় না-ই বটে। আহা! মানুষ এত নিষ্ঠুর কি ক'রে হয়ে যায়? একটু ক্ষমা করতে, একটু দয়া করতে পর্য্যন্ত ভুলে যায়।

—আমি কি কারো ক্ষমার-দয়ার যোগ্য দিদি?

—দয়ারও কি যোগ্য অযোগ্য আছে রে পাগল?

বেচারী শোভনার খুব ছোটবেলাতেই মা মারা যায়। জেঠাই কাকীদের অবহেলাতে মানুষ, অবহেলাতে অভ্যস্ত। তাই ক্লান্ত স্বরে বললে, আছে দিদি, নইলে আমায় এ পর্য্যন্ত কেউ কখনও ভুলেও দয়া করে না কেন? এক তুমি ছাড়া।

অণিমা সস্নেহ স্বরে বললে, আমি কি তোকে শুধু দয়া করি ভাই? ভালবাসিনি কি?

—বাস দিদি, খুব ভালবাস, এত ভালবাসা কেউ কখন আমায় বাসেনি।

শোভনার দুই চোখ ছল্‌ছল্ ক'রে উঠল।

—বৌ?

—কেন দিদি।

—একবার তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না?

—না দিদি।

—সে কিরে?

—আমি এই গঞ্জনার হাত থেকে নিস্তার পেলে ব'তে যাই।

—শুধু এই চাস্, এইটুকু? আর কিছু না?

—আর তোমার কাছে একএকবার দাঁড়াতে।

আতপ-তাপে তাপিতা দগ্ধহৃদয়া এই তরুণী—অণিমার স্নেহ-তরুর ছায়ায় ব'সে যেন একটু জুড়াতে চায়।

অণিমা স্নিগ্ধ সহানুভূতি-ভরা কোমল স্বরে তার সমস্ত ব্যথার ক্ষতে প্রলেপ বুলিয়ে বললে, বলিস্ কি বৌ? আমি তোকে কি সুখ দিতে পারি বোন? তুই এত অল্পে সন্তুষ্ট হ'তে চাস্ কি ক'রে ভাই?

—সেইটুকুই বা পাচ্ছি কোথা দিদি?

—আ ম'রে যাই রে? ভালবাসার ভিখারিণী এত অল্পে সন্তুষ্ট তুই?—অণিমার মুখ নিবিড় ব্যথায় ম্লান হয়ে উঠল।

ওরে হতভাগিনী, নারীর সর্ব্বস্ব ধন যে স্বামী তাকে চাইবার মত এতটুকু জোর এতটুকু ভরসা তোর নাই?

অণিমা বিগলিত-স্বরে বললে, প্রিয়কে তোর দেখতে ইচ্ছে করে না?

শোভনা মনে মনে বললে, জল দেখে কি তেষ্টা যায় দিদি? মুখে বললে, না।

—না কিরে?

—যাকে পাব না তাকে দেখে কি হবে?

এ কি উপেক্ষা, না অভিমান?

—এটা তোর মনের কথা না মুখের কথা বৌ?

শোভনা অবসন্ন ভাবে একটু হেসে বললে, আমার কষ্টও নেই সুখও নেই, সব একাকার হয়ে গেছে দিদি। ইচ্ছা অনিচ্ছা কাকে বলে সে ত অনেক দিনই ভুলে গেছি। আর আমি নিজে কি করছি, কি করতে হবে তারও ঠিক রাখতে পারিনি। এ কি দিদি, কেন এ-রকম হয়? বলতে পার?

অণিমা একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, তোর হিসেবে দিদি তোর সবজান্তা, না রে? যা কিছু তোর দিদিকে জেনে ফেলতে হবে এবার থেকে দেখছি।

—আচ্ছা দিদি তোমার মত যদি সবাই হ'ত তা হ'লে—

—তা হ'লে কিরে?

—তা হ'লে বেশ হ'ত।

শোভনার চোখের কোলে ক্লান্তির কালিমা কে যেন লেপে দিয়েছে। সারা মুখখানা ভ'রে এমন একটি করুণ ভাব ফুটে আছে যা দেখলে অতি বড় পাষাণেরও দয়া না হয়ে পারে না। একটি বিরাট অবহেলার বেদনা যেন তার সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে বার হয়ে আসছিল। তাই সে একটু জুড়াতে চায়।

—বৌ।

—কি দিদি?

—প্রিয় যদি এসে আমার মত তোকে ভালবাসে!

শোভনার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল, হায়রে তাকি কি হয়!

—হয় না?

—না।

—কিন্তু বৌ, স্বামীকে উপেক্ষা করতে নাই।

—কি দিয়ে তার সম্বর্দ্ধনা করব? ব'লে দাও আমাকে, শিখিয়ে দাও তুমি।

—ভালবেসে, যত্ন দিয়ে, সেবা দিয়ে, শ্রদ্ধা ক'রে বোন।

—হয় না যে দিদি, হয় না।

—হবে বোন হবে।—অণিমা এবার একটু ক্ষুব্ধস্বরে বললে, আমার কাছেও লুকুবে তুমি?

—যা নিবে গেছে তা উস্কে তুলে কি হবে দিদি?

—আলো হবে, অন্ধকারে যে পথ ভুল করেছে সে পথ খুঁজে পাবে।

৪

চাবির গোছা বাঁধা বাসন্তী রঙের আঁচলটা পিঠের উপর ঝনাক করে ফেলে স্বামীর বুকে একটি মধুর হিল্লোল তুলে বসন্ত-রাণীর মত অণিমা গৃহপ্রবেশ করতেই অমর বলে উঠল, উঃ ব্যাপার কি? ভাবি যে—! কোথায় ছিলে বলত এতক্ষণ?

অণিমা একটু হেসে বললে, খুব দূরে নয়, কাছাকাছি কোথাও।

অমর পত্নীর হাস্যময় মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা ত বুঝলুম, কিন্তু কার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ জমানো হচ্ছিল বল দিকিনি? লোকটা কে?

—আহা!

—আহা নয় গো যাকে পেয়ে আমার মত এক জন নগণ্যকে বেমালুম ভুলে বসে থাক। তার উপর আমার কিন্তু ভারি হিংসে হচ্ছে। না না, সত্যি সত্যি জিজ্ঞেস করছি অমন তন্ময় হয়ে কার সঙ্গে কথা কইছিলে?

—তুমি কি ক'রে জানলে যে আমি কারো সঙ্গে কথা কইছিলুম?

অমর সহাস্য মুখে বললে, ওগো সুন্দরী, তুমি ত পুরুষ হয়ে জন্মাও নি, তা কি করে জানবে বল যে প্রিয়ার সন্ধানে পতিকে তার কত গোয়েন্দাগিরি ক'রে ফিরতে হয়? এখন শুনি তোমার সঙ্গিনীটি কে?

—ওই ত ও-বাড়ীর প্রিয়র বৌ। আহা বেচারী—

স্বামী পরিহাস করে বললে, সব বেচারীর ওপরই মনোযোগ আছে—আমি বেচারী ছাড়া।

অণিমা স্বামীর মুখের উপর মুহূর্ত্তের জন্যে একবার মাত্র তার বড় বড় চোখ দুটি তুলে তৎক্ষণাৎ নামিয়ে নিলে।

অণিমা সুন্দরী। লেখাপড়াও জানে মন্দ নয়। বেথুন কলেজে পড়েছিল, বুদ্ধিশুদ্ধিও বেশ। এতে অমরের গর্ব্বের সীমা পরি-সীমা নাই। বিয়ের কিস্তিতে সেই নাকি আজকালকার বাজারে মাৎ করেছিল, বন্ধুমহলে শোনা যায়। অণিমা একে সুন্দরী তায় বিদুষী। আবার সকলকার সঙ্গে সে এমন মানিয়ে চলতে পারে যাতে গুরুজনদের মুখে অণিমার সুখ্যাতি ধরে না, অথচ বাড়াবাড়িরও বাহুল্য নাই। অমর যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনটি, বরং তার চেয়ে বেশি ত কম নয়। অনেক মেয়ে দেখাদেখি ক'রে সৌন্দর্য্যপ্রিয় অমর অণিমাকেই মনোনীত করেছিল।

অণিমা কেন যে তার মুখের পানে মুহূর্ত্তের জন্যে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে, তার ভিতর যে কি লুকানো ছিল মুগ্ধ প্রেমিক যুবক তা বুঝলে না। সুধু সেই আনতনয়নার চোখ দুটির উপর ধীরে ধীরে দুটি প্রণয়-চুম্বন মুদ্রিত ক'রে দিলে। তারপর প্রিয়ার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য একদৃষ্টে দু'চোখ ভ'রে কিছুক্ষণ ধ'রে পান ক'রে বললে, অণিমা—

—কি?

—কথা কইছ না যে?

—কি কথা কইব?

অমর হেসে বললে, কি কইবে? যা হয়। তুমি যে কথা কইবে তাই আমার ভাল লাগবে।

এবার অণিমা হাসলে। সে হাসি বড় মধুর। মধুর কলসীতে প'ড়ে মধু খেয়ে খেয়ে মধুতে মাখামাখি হয়ে মক্ষিকা যেমন ভাবে নাকাল হয়, অনিমার মুখে চোখে ঠিক তেমনি মধুমাখা নাকাল হওয়ার হাসি ফুটে উঠল। সে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বললে, পাগল!

৫

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রাবণ মাস। কিছুক্ষণ আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টিধোয়া গাছপালার উপর পড়ন্ত রোদের সোনার আলো তখনও ঝিকমিক করে খেলা করছিল।

বড় বড় বাড়ীগুলার কার্ণিশে ব'সে দু'একটি ভিজে কাক পাখনা ঝাড়া দিচ্ছিল। মেঘের অবগুণ্ঠন ভেদ ক'রে আকাশের শেষ সীমায় অস্তোন্মুখ রবি তার লাল চোখ রাঙিয়ে দিগন্তের প্রান্তে আস্তে আস্তে ঢুলে পড়ল।

অমর সান্ধ্য ভ্রমণে বার হবে বলে ইতস্তত করছিল, কিন্তু পথের দিকে চেয়ে সে ইচ্ছা স্থগিত রাখলে। ঘরের ছাদে আনমনাভাবে পায়চারি করতে করতে সহসা পাশের বাড়ীর প্রিয়দের ছাদে তার দৃষ্টি পড়ল। দেখলে একটি শ্যামবর্ণা শীর্ণকায়া তরুণী—গলায় আঁচল জড়ানো, হাতে প্রদীপ—নত হয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে তুলসী-তলায় প্রণাম করলে। তার পর? তারপর দুই চোখে ধারা নামল। অজস্রভাবে, নীরবে, নিঃশব্দে সে ধারা ঝ'রে পড়তে লাগল, কিছুতেই থামে না। অমর এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সেই দিকে। এক মিনিট দু মিনিট ক'রে আধ ঘণ্টা কেটে গেল—তবুও যে কান্না থামে না। কে এ? অরণ্যে রোদন কেন তার? কার জন্যে? প্রিয়-বিরহে পতিপ্রাণা সাধ্বী সীতা অশোক বনে কি এমনই ক'রে কেঁদেছিল? এত আকুল, এত করুণ?

প্রিয়র মা আকাশ বিদীর্ণ ক'রে নীচে থেকে চীৎকার শব্দে হাঁক পাড়লে, হ্যাগা সরি, আমাদের সে লক্ষ্মী ঠাকরুণ গেলেন কোথা?

বৌ সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে বললে, এই যে মা।

শাশুড়ী বৌয়ের পানে চেয়ে সুর আরও এক পর্দায় চড়িয়ে বলে উঠল, আঃ মরি! দেখ দেখ! দেখ একবার বেটির চেহারার ছিরিখানা দেখ! বেটি যেন শেওড়া গাছ থেকে নেমে এলেন। চুলগুলো আঁচড়াও না লক্ষ্মী ঠাকরুণ! একটু সিঁদুর ছোঁয়াও না! অলক্ষ্মী বেটি!

মেয়ে সরলা মাকে ধমক দিয়ে বলে, সারা দিন চেঁচালে কি হবে? তাকে কি রেখেছে গা—চোখে ধুলোপড়া দিয়ে দিয়েছে।

মা মেয়ের মুখের পানে চেয়ে ব'লে ওঠে, অ্যাঁ! ধুলোপড়া! অ্যাঁ! বলিস কি সরি!

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ধুলোপড়া। লোকের মুখে শুনতে পাই সে ছুঁড়ী নাকি নুরজাহান বাই।

মেয়ের মুখপানে কেমন এক রকম ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে বলে, অ্যাঁ!—যেন বুঝে উঠতে পারে না।

—নুরজাহান বাই গো!

মা আবার বলে, অ্যাঁ!

—অ্যাঁ অ্যাঁ করলে কি হবে? তারা সব গুনি যে গো গুণীন। সর্বনাশীরা গুণে বশ ক'রে রাখে।

প্রিয়র মা হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, কি হবে মা, বাছা কি আমার আর ঘরবাসী হবে না?

বৌ শাশুড়ীর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, মা চুপ করুন।

শাশুড়ী ব'লে ওঠে, স'রে যা রাক্ষসী, স'রে যা। তোকে দেখলে আরও আমার জ্বালা বাড়ে। আমার বুক-জোড়া রাস্তা-আলো-করা ছেলে—

সরি বলে, দেখ মা, আমার ননদ সেদিন বলছিল রাস্তা পূজো করতে। সে বোধ হয় রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। আসতে ইচ্ছে করছে—

মা আকুল হয়ে কেঁদে বলে, অ্যাঁ, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না, চোখে ধুলো পড়া দিয়েছে ব'লে? তার আমার আসবার ইচ্ছে আছে তা হ'লে? মাকে ভুলে সে কি আমার থাকতে পারে রে?

পথভ্রষ্ট সন্তানের মা পথের দিকে চেয়ে করজোড়ে আকুলস্বরে প্রার্থনা করে, হে মা পথ, বাছা আমার পথ ভুল ক'রে বিপথে গেছে সুপথে এনে দাও। আমি বুক চিরে রক্ত দোব, আমার বুকের ধন বুকে এনে দাও, আমার দুখিনীর বাছাকে—।

পরদিন পথের পূজো দিলে ষোড়শোপচারে। পথ বিপথগামী পুত্রকে—কই সুপথে এনে দিলে কি?

পাড়ার লোক বলে, মাগির জ্বালায় কান ঝালাপালা হয়ে গেল, আহা বৌটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে গো।

অমর স্তব্ধ। আজ কোলাহল তার কর্ণপটহের জ্বালা উদ্রেক করলে না, অধ্যয়নে ব্যাঘাতও ঘটল না, শুধু তার চোখের সামনে একটি মাতৃহৃদয়ের মর্মন্তুদ বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠল। আর—আর ওই বিফল-রোদনা উপেক্ষিতা, যে স্ফুলিঙ্গ-কণা হয়ে ওদের সুখের সংসারে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়েছে, আজিকার এই বিষণ্ণ ম্লান শান্ত সন্ধ্যার মত বেদনাতুরা ওই মেয়েটি, সহিষ্ণুতার ও যে একখানি জীবন্ত ছবি। বড় করুণ।

৬

অমর অমায়িক কণ্ঠে বললে, তুমি নিজেকে এমন করে নষ্ট করলে প্রিয়! তোমায় দেখলে যে আমাদের কষ্ট হয়।

—কি করব ভাই? তোমরা আমাকে দেখ আর কষ্ট কর, কিন্তু নষ্টোদ্ধার করতে চেষ্টা কোরো না, পণ্ডশ্রম হবে।

—শ্রম কখনও পণ্ড হয় না প্রিয়, সে একদিন সার্থক হবেই।

প্রিয় হেসে বললে, মিছে কথা।

—বিশ্বাসও হারিয়েছ প্রিয়?

প্রিয় হেসে বললে, শুধু বিশ্বাস? একেবারে নিঃস্ব সর্ব্বস্বান্ত আমি।

—তাই বুঝি ডাকাতি করতে বেরিয়েছ?

—ডাকাতি ত ভাল অমর, তাতে ত তবু একটা ভাল জিনিষ আছে—বীরত্ব। কিন্তু আমি যে ছিঁচকে চোর।

অমর একদৃষ্টে প্রিয়র মুখের দিকে চেয়ে রইল, সে চাহনি তার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখবার চেষ্টা করলে।

—চেয়ে রইলে যে অমর? আমায় ছেড়ে দাও। জান ত চোরের সঙ্গে থাকলে চোর হয়। তোমার সুনামে কলঙ্ক হবে। আমায় ছাড়।

অমর মাথা নেড়ে জানালে, না, তোমায় ছাড়বার জন্যে ত ধরি নি, ছাড়ব না।

—ছাড়বে না?

—না।

—অন্যায় খেয়াল।

—কিছু অন্যায় নয়, ফেরাব তোমাকে?

—অমর, অনেক অনেক নীচুতে নেমে গেছি। পারবে না।

—তবু হারব না।

—অন্যায় জেদ।

—তার অনুরোধ।

—না, আমি চললুম।

অমর তার হাত ধ'রে বললে, চলবে কোথায়?

প্রিয় মনে মনে বললে, জাহান্নমে, জান না কি?

প্রিয় দেখলে যথার্থই এ নাছোড়বান্দা। মহা মুশ্‌কিল ত। কিন্তু চরিত্রবান্ উদারপ্রাণ অমর, আর তার কাছে আমি?

—কি হে হ'ল কি? উত্তর দাও!

—প্রশ্ন হোক্?

—কাকে ঠকাচ্ছ?

—নিজেকে।

—সেটা ত বুঝতে পারছ?

—পারছি বৈকি।

—তার সঙ্গে আরও কে কে জড়িত আছে সেটা জান ত?

প্রিয় এবার তাচ্ছিল্যভাবে বললে, থাক্‌গে।

অমর আবার তার মুখপানে চেয়ে বললে, এত উপেক্ষা কাকে করছ প্রিয়?

প্রিয় অম্লানমুখে বললে, যারা আমাকে পতনের পথে এগিয়ে দিয়েছে। ভাসিয়েছে।

—গুরুজন যে তাঁরা। তাঁরা তোমার কাছে অনেক দাবী রাখে, অনেক কিছু প্রত্যাশা করে।

—সেই জন্তেই ত তাদের পায়ে জীবন বলি দিচ্ছি। কিন্তু চরিত্রহীন সন্তানের কাছে দাবী?

—হেঁয়ালি ছেড়ে দাও প্রিয়।

—বড় অস্পষ্ট হ'ল? আরও স্পষ্ট?

—কি বলছ তুমি?

—অপ্রিয় হলেও সত্য বলছি।

অমর ক্ষুব্ধস্বরে বললে, মা বাপ কখনও সন্তানের অহিত করতে পারে না।

প্রিয় কেমন যেন একরকমভাবে একটু হেসে বললে, না তা পারে না। কিন্তু এটা কোন্ দেশ সেটা ত তোমার মনে আছে? তা হলেই ভেবে দেখ। যাদের হিতাহিতজ্ঞান ব'লে নিজেদের মধ্যেই কোন একটা বালাই নাই সন্তানের কি হিত করতে পারে?

অমর স্তব্ধ হয়ে রইল। প্রিয় বলে কি? তার কথার ভিতর কি যেন রহস্য লুকানো। প্রিয় খানিকটা বুঝতে পারছে কিন্তু স্রোতের মুখে গা ঢেলে দিয়েছে স্বেচ্ছায়।

—প্রিয়?

—আর নয় বন্ধু, মাপ কর। আমায় ছেড়ে দাও ভাই, কেঁদে বাঁচি।

—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে প্রিয়।

—কিছু না।

—তবু বলবে কিছু না। কত টাকা দাও তাকে?

প্রিয়র মাথা নুয়ে পড়ল,—দু'শো।

অমর চমকে উঠল, ওঃ, এই অর্থসমস্যার দিনে এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে—এত টাকা কার পায়ে ঢালছ? সে নরকে তুমি কি পেয়েছ? ছি ছি এতদূর! একটা ঘৃণিতা—

—না না, তাকে দোষ দিও না, দোষী আমি, আমিই ঘৃণিত।

অমর হেসে বললে, এত দরদ! কিন্তু যাকে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে গ্রহণ করেছ তার কাছে কি জবাব দেবে?

—সেটা ত কখন কল্পনা করে দেখিনি।

—ক'রে দেখ না একবার। যদি কখনও উত্তর দিতে হয় কি বলবে?

—বলব সুন্দরের পূজা করেছি।

—সত্য আর শিবকে ছেড়ে দিয়ে? সংসারে তুমি মঙ্গল চাও না? সত্যকে অস্বীকার ক'রে মঙ্গলকে মিথ্যে দিয়ে ঢেকে ফেলতে চাও?

প্রিয় অবসন্নভাবে উত্তর দিলে, বিবেক ঘুমিয়ে আছে, সাড়া পাবে না অমর।

—নিশ্চয় পাব। সে ত মরে নি, সে বেঁচে আছে।

—না আর পারি না। ক্রস্‌এগজামিন আর কতক্ষণ চলবে অমর?

অমর উত্তর দিলে না। সে ভাবতে লাগল, প্রিয় স্পষ্টবাদী, কোন কথা তার মুখে আটকাচ্ছে না, পরিষ্কার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার মনের ভিতর অনুতাপের একটা গোপন ব্যথা হুলের মত বিঁধে আছে, তার যন্ত্রণা সে ঢাকতেও পারছে না বার করতেও বাধছে, সে ফুটতেও পারছে না লুকোতেও পারছে না, দোটানায় প'ড়ে গেছে। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কি অভিমান তার বুকের ভিতর গুমরে মরছে, দরদী না পেলে সে তা প্রকাশ করবে না। আমার আন্তরিকতায় এখনও তার আস্থা জন্মায় নি। ভাবছে শুধু একটা কৌতূহল। না বন্ধু, কৌতূহল নয়। প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমায় ফেরাব, তোমার জন্ত নয়—সেই মূর্ত্তিমতী ব্যর্থতা সেই বিষাদ প্রতিমার মুখে হাসি ফোটাব, সেই সাশ্রুনয়নার স্নিগ্ধ শীতল চোখের জলে তোমার পঙ্কিল প্রাণকে ধুইয়ে মুছিয়ে পবিত্র ক'রে তুলতে চেষ্টা করব। পারব না কি?

৭

অমরের ডায়েরি

আমরা মানুষ মোহের দাস। মোহের ঘোরে অন্ধ হয়ে থাকি। অনন্তের মাঝে তাই অন্ত খুঁজে পাই না। সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়, তার আর মীমাংসা হয় না। কিন্তু তা পারলে সেকি আনন্দ! সে আনন্দের আস্বাদ যে পেয়েছে সেই বোঝে। যে পায় নি সে কেমন করে বুঝবে? সে জিনিস অনুভবের।

নারী নারী-হৃদয়ের ব্যথা বোঝে। পরদুঃখকাতরা অণিমা তার অনুভূতি দিয়ে যা বোধ করতে পেরেছিল, আমরা পুরুষ বহির্জগতে বিচরণ করি, নারী-হৃদয়ের সেই গোপন ব্যথা কেমন ক'রে অনুভব করব?

শোভনাকে আরও দু-এক দিন দেখতে পেয়েছিলাম। বেশে তার পারিপাট্য নাই; তৈলহীন অযত্নরক্ষিত রুক্ষ কেশ; বসন মলিন, দৃষ্টি উদাসীন, জীবনে যেন ঘোর বিতৃষ্ণা। কার—কার

তরে? কার জন্য তার এ কঠোর তপস্যা? ওরে অবোধ, এ যে শব-সাধনা। চৈতন্যহীন শবের কি কখনও সাড়া পাওয়া যায়?

আমি যা ভেবেছিলাম তাই ঘটল। এত অত্যাচার সইবে কেন? হতভাগা প্রিয়টা শেষে যে নিজেকে হত্যা করতে বসল। এ কি নিদারুণ অন্যায় অভিমান তার!

রোগ সাংঘাতিক। বেচারা বুঝি এ যাত্রায় পরিত্রাণ পেলে না। যাক—মরুক গে সে। মরণেই তার মঙ্গল হবে। কিন্তু মন বোঝে না কেন? ওই যে সেবানিরতা মমতার প্রাণময়ী প্রতিমা অন্যাসক্ত নিষ্ঠুর পতির পদতলে ব'সে মনে প্রাণে তার মঙ্গল কামনা করছে, ওই ওরই জন্তে কি? ওরে মূঢ়, এ কি তোর আত্মবিসর্জ্জন, শ্মশান মাঝে এ কি ঘোর শব-সাধনা! সে ওকে বাঁচাতে চায়। আর? সে ত আর কিছু চায় না। কখনও কিছু সে চায় নি পায়ও নি, পাবার বুঝি প্রত্যাশাও রাখে না। সে শুধু তার এয়োতি রক্ষা করতে চায়।—

না কাল ডাক্তার বোসের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা হয় একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তিনি ত খুবই আশ্বাস দিয়ে গেছেন।

৮

—হাঁরে অমু, তোর কি দশা হচ্ছে বল দিকিনি?

—কেন মা?

—কেন মা কিরে? এমনি ছেলে বটে। দড়ি হয়ে গেলি যে, শরীরটার দিকে কি একবার চেয়ে দেখতে নেই?

অমর নিজের শরীরটার দিকে একবার চেয়ে বললে, সেটা ত মা আমি কখনও দেখি নি, তুমিই দেখ।—ব'লে মায়ের মুখের পানে চেয়ে হাসতে লাগল।

ছেলের হাসি দেখে ভবতারাও হেসে বললে, ওই হাসতেই শিখেছ খালি। আমি ছোটগুলোকে দেখব, না তোকে দেখব রে?

—তুমি কেন মনে কর না মা, আমি ছোটই আছি।

মা সহাস্য মুখে বললে, তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে বল্? চিরদিন ছেলেমানুষই রইলি, জ্ঞানবুদ্ধি আর কোন কালে হ'ল না। ওই দেখতেই অত বড়টা হয়েছ।

অমর অন্যমনস্ক ভাবে বললে, বড় না হওয়াই ভাল, অজ্ঞান যারা তারা বেশ আছে, কোন ভাবনা-চিন্তা নাই।

—তা বড় হয়েও তোমার মাথায় চার-চালের ভার পড়ে নি বাছা। তা যাই হোক্‌গে, প্রিয়টা এ যাত্রায় খুব বেঁচে গেল। আহা মায়ের বাছা—যেমনই হোক। আর ওই বৌ ছুঁড়ি জন্মের মত বয়ে যেত। হ্যাঁ জানিস্ রে, প্রিয়র মা তোকে যে কত আশীর্ব্বাদ করছিল, বলে—প্রিয়কে এ যাত্রায় দিদি তোমার অমুই বাঁচিয়ে তুললে।

নীলি ঝড়ের মত উড়ে এসে বললে, ও বড়দা তোমায় কে ডাকছে।

—কে ডাকে রে?

—সেই যে গো যার একটু একটু দাড়ি আছে।

—দাড়ি ত কত লোকেরই থাকেরে হতভাগী।

—সেই যে গো রোগা মতন, ফরসা-পানা, কে জানে বাপু আমি অত দেখিনি ভাল ক'রে।

—তাই বল্!

ভবতারা বলে উঠল, যেই আসুক্ গে, বলগে যা তো নীলি দাদা বাড়ী নেই। ভাল এক হয়েছে—

নীলিও ঝড়ের আগে দৌড়য় দেখে অমর হাঁ হাঁ ক'রে ব'লে উঠলো, ওরে না না, আমি যাচ্ছি, বোধ হয় রমেশ এসেছে।

—রাত দিন ডাকাডাকি। কি হয় রে তোদের? ওদেরও কি কোন কাজকর্ম্ম নাই?

—কাজই ত হচ্ছে গো।

—কি কাজ হচ্ছে শুনি?

—আমাদের একটা ইয়ে—সভা হচ্ছে কিনা।

—ওই হুজুগ নিয়ে হন্নেমুখি হয়ে বেড়াচ্ছ। কি ছেলেই হয়েছ! যেটাকে ধরবি সেটাকে ত আর সহজে কিছুতে ছাড়বি নে। এই যে কি সভা হ'ল—এই নিয়ে মাথা পটকে বেড়াও। এক ত প্রিয়র অসুখ নিয়ে আহার-নিদ্রে ত্যাগ ক'রে শরীরটাকে দড়ি করেছ।

—একটা অমূল্য প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে যদি তোমার ছেলে একটু রোগাই হয়, সেটা কি মা তোমার কাছে গর্ব্বের কথা নয়?

—পরের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ যে ধুক্‌ধুক্ করছে রে বাঁদর। সে পড়লে তখন তাকে বাঁচাবে কে?

—পরের প্রাণ বাঁচানোর আশীর্ব্বাদ মা।

মায়ের চোখ ছলছলিয়ে এল।

৯

—ওঃ, কে, প্রিয় যে। তারপর এখন বেশ সেরেছ ত?

—আর লজ্জা দাও কেন ভাই? তুমিই ত সারিয়ে তুলেছ বন্ধু।

—যাক্ আর কোন অত্যাচার টত্যাচার ক'রে—

প্রিয় তার কাতর দুই চোখে শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি ভ'রে অমরের মুখের পানে তুলে ধ'রে বললে, না, আর না, যে জিনিষ দেখতে না পেয়ে সারা সংসার আমি শুধু অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়েছি, আলো ধ'রে তুমি আমায় প্রকৃত বন্ধুর মত ভাল ক'রে তা চিনিয়ে দিয়েছ!

কথাটা আরও স্পষ্ট ক'রে শোনবার জন্তে কৌতূহল প্রকাশ ক'রে ব্যগ্রকণ্ঠে অমর বললে, সে জিনিষ কি প্রিয়?

—তার নাম পবিত্রতা।

আনন্দ অমরের দুই চোখে অশ্রু হয়ে উথলে পড়বার উপক্রম করলে। সার্থকতাপূর্ণ প্রগাঢ় স্বরে সে বললে, শোভনাকে তুমি সুখে রেখো প্রিয়। আর অবহেলা কোরো না।

—না, আর—আর নয়, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম। মনে মনে বললে, জান না কি বন্ধু, অবহেলা যে আর করবার জো-ই নাই, রোদের ঝাঁঝে যার চোখ খ'রে যায় নীল চশমা যে তার চাই-ই চাই, তা না হলে যে তার এক দণ্ড চলবেই না।

প্রিয়র নত সলজ্জ দু-নয়নে পত্নীপ্রীতির পূত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল।

প্রিয় চ'লে যাবার পর অমর পরিতৃপ্ত সুখে নিঃশ্বাস ফেলে চোখ

বুকে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে কল্পনায় সে দেখতে পেলে একটি তরুণীকে। সে শোভনা। একখানি লালপেড়ে কাপড় পরা, ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা জল্ জল্ করছে, স্মিত বদন, তার সেই ভীত নয়ন দুটিতে একটি স্নিগ্ধ বিমল আনন্দ যেন মূর্ত্তি ধরে ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে। পূজার অনাঘ্রাত নির্ম্মল পুষ্পটি অনাদৃতভাবে এক পাশে পড়ে ছিল, আজ দেবতার পায়ে গিয়ে তা যেন সার্থকতায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর সে নিজেও ভাবলে, তার সঙ্গে আমিও বড় সুখী। আমি তার বেদনার অশ্রু মুছিয়ে তার সজল নয়নে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলেছি। পরকে সুখী করলে এত সুখ জন্মে, আগে কে জানত? আমি বড় সুখী।

অণিমা কখন ধীরে ধীরে এসে তার পাশে বসেছিল অমর তা টের পায়নি, সহসা পত্নীকে হাতের কাছে পেয়ে সস্নেহে আবেগ ভরে টেনে নিলে।

অণিমাও আজ কোন বাধা দিলে না। কেন দিলে না? আজ তার মুখে, কই সে নাকাল হওয়ার হাসি? আজ সে পরিতৃপ্তিভরা প্রসন্নমুখে স্বামীর সেই বিশাল বুকে গভীর সুখে লুটিয়ে পড়ল।

ঔষধের ব্যবহার এবং অপব্যবহার

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান সভ্যতার মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। যাহা কল্পনার বিষয়ীভূত বা কল্পনারও অতীত ছিল বিজ্ঞান তাহাকে বাস্তব রূপ প্রদান করিয়াছে। তথাপি কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত কথা জানা হইয়াছে বিজ্ঞান এমন কোন দাবি করে না বা করিতে পারে না। যাহা হউক, বিজ্ঞানের এই অসামান্য সাফল্য এবং প্রভাব দর্শনে জনসাধারণ যে ইহার প্রতি অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হইয়া উঠিবে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। ইহার ফলে, বিজ্ঞানের সহিত সম্পর্ক আছে এরূপ যাবতীয় বিষয়কেই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে অনেকেই কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন না। এইরূপ বিশ্বাসের দরুণ ব্যবহারিক জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে সুবিধা বা অসুবিধা যাহাই ঘটুক না কেন অন্তত: চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক-ক্ষেত্রে মহা অনিষ্ট সংসাধিত হইয়া থাকে। রোগ-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মানুষ মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ হইতে আরম্ভ করিয়া কবিরাজী, হেকিমী, য়্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি যে কোন কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই ইতস্তত: করে না; কিন্তু প্রকৃত শান্তি খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কাজেই বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে চিকিৎসা-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে জনসাধারণ তাহারই উপর ভরসা করে বেশী। কিন্তু বিজ্ঞানের অধুনাতন অগ্রগতির ফলে দেখা গিয়াছে, চিকিৎসাশাস্ত্রানুমোদিত যে সকল ঔষধ এতকাল অব্যর্থ রোগ-নাশক বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছিল তাহাদের অধিকাংশই যে কেবল অকেজো তাহাই নয়, পরিণামে ইহারা বিবিধ জটিলতার সৃষ্টি করিয়া দেহযন্ত্রকে বিকল করিয়া ফেলে। এই সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমত অবলম্বনে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত চিন্তাশীল এবং সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ডা: অলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌স (Dr. Oliver Wendell Holmes) বলিয়াছিলেন—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমগ্র materia medica যদি সমুদ্রজলে ডুবাইয়া দেওয়া হয় তবে সমুদ্র-জলের অবস্থা খারাপ হইতে পারে; কিন্তু মানুষের পক্ষে তাহাতে উপকার ছাড়া অপকার হইবে না। কিছুকাল পূর্ব্বে স্যর উইলিয়ম অসলার (Sir William Osler) বলিয়াছিলেন—ঔষধের অসারতা সম্বন্ধে যিনি যত বেশী জানেন তিনিই তত ভাল চিকিৎসক। কিন্তু সে যাহাই বলুক, অভিজ্ঞতার ফলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এক দিকে যেমন ঔষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিতেছেন অপর দিকে অজ্ঞতার ফলে ইহার ব্যবহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। এস্থলে প্রচলিত সাধারণ ভেষজ বা খনিজ ঔষধের কথাই বলা হইতেছে, নির্দ্দিষ্ট ফলপ্রদ বিশেষ বিশেষ ঔষধের কথা নহে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়; কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে অনুরূপ অনেক ক্ষেত্রে ঔষধরূপে অপর কোন নির্দ্দোষ পদার্থ প্রয়োগ করিয়াও একই রকমের সুফল লাভ হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে ঔষধের ক্রিয়া হইয়া থাকে—রোগীর অজ্ঞাতসারে তাহার নিজের মনের দ্বারা। যাহাকে আমরা 'faith cure' বলি তাহাও তো একরকমের 'cure' নিশ্চয়ই। রুগ্ন অবস্থা হইতে নীরোগ অবস্থা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়; ঔষধের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষ প্রয়োগে আরোগ্য লাভের পর রোগী যদি তাহাকে ঔষধেরই অব্যর্থ ফল বলিয়া মনে করে তাহাতে কিছু যায় আসে না। কাজেই কোন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এ ব্যাপারটাকে মোটেই উপেক্ষা করিতে পারেন না; রোগ প্রতীকারের জন্য তাহাকে যে কোনও সুবিধাজনক উপায় বা সুযোগ গ্রহণ করিতে হয়—ঔষধ সম্বন্ধে কোন গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

অতি প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ঔষধসমূহ স্বাদে, গন্ধে রোগীর পক্ষে যেমন ছিল ভয়াবহ আবার তেমনই ছিল দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ঔষধ প্রস্তুতকারকেরা বিস্বাদ অথবা দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধকে কোন সুস্বাদু পদার্থের আবরণ দিয়া মুখরোচক করিবার জন্য দস্তুরমত প্রতিযোগিতা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে রোগীরা অনেক ঔষধই বন্‌বন্, চকোলেট বা বিস্কুটের মত অনায়াসে উদরস্থ করিতে পারে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, নেহাৎ বিপন্ন না হইলে তখনকার দিনে সহজে কেহ ঔষধ গলাধ:করণ করিত না, আর এখন কিন্তু সর্দ্দি, কাশির মত অতি সামান্য কারণেই লোকে যখন তখন ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে—এমন কি চিকিৎসকের পরামর্শেরও অপেক্ষা রাখে না।

যখন দেহযন্ত্রের কল-কৌশল, রোগের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ঔষধ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ছিল অপরিসীম তখন হইতেই ঔষধ সেবনের

প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ভল্টেয়ার তাঁহার সময়কার ডাক্তার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন—গুণাগুণ এবং কার্য্যকারিতা সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা নাই—এমন সকল ঔষধ ডাক্তার রোগীর মুখে ঢালিয়া দেন, যাহার শরীর-যন্ত্রের ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধেও তাঁহারা কিছুই জানেন না। যাহা হউক, অতীতের সেই অনভিজ্ঞতা এবং অনিপুণ কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইতেই ক্রমশঃ ঔষধের গুণাগুণ নিরূপণ এবং প্রয়োগের যথাবিহিত ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহারই ফলে বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির কারণ নির্ণয় এবং শরীর-বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যসমূহ জানিবার পথ সুগম হইয়াছে।

রোগোৎপত্তির প্রকৃত কারণ তখনকার দিনে জানা ছিল না। কেহ জ্বর অথবা শারীরিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছে—কি কারণে দেহের তাপ বৃদ্ধি পাইল বা শারীরিক যন্ত্রণা ঘটিল তাহা না জানায় শারীরিক লক্ষণগুলিকেই রোগ বলিয়া ধরা হইত, অর্থাৎ ব্যাপারটা ছিল এইরূপ যেন কম্পন, যন্ত্রণা বা গাত্রতাপ বাড়াইয়া শরীরটা বিশৃঙ্খলার পরিচয় দিতেছে। যে-কোনও রকমে এই লক্ষণগুলি দূর করিতে পারিলেই রোগ দূর হইবে ভাবিয়া শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত রোগীর উপর যে-কোনও রকম ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইত। সে যুগে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি বিকশিত হয় নাই; কাজেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ঔষধের গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য তখনকার দিনে মাথা ঘামাইবার কারণ ছিল না। খারাপ আবহাওয়াটা যেমন আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক; কিন্তু আমরা তাহার কারণও বুঝি না বা প্রতীকারও করিতে পারি না, অথচ ইহার প্রভাবমুক্ত হইবার জন্য যে-কোন সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করিয়া থাকি, তখনকার দিনের ডাক্তারী বিদ্যাটা সেরূপ অজ্ঞতার চরম নিদর্শন হইলেও জনসাধারণের পক্ষে ছিল অপরিহার্য্য। কারণ ব্যাধিগ্রস্ত লোকের ইহা ছাড়া সান্ত্বনা লাভের অন্য কোন উপায়ই জানা ছিল না।

যে যুগে লোক রোগের লক্ষণকেই রোগ বলিয়া মনে করিত সেই যুগে মানুষ ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিল যে, বনে জঙ্গলে বা অন্যত্র এমন অনেক গাছ-পালা বা অন্যান্য জিনিষ পাওয়া যায়, যাহা সেবনে শরীরে নানা প্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই সকল লক্ষণের সহিত কোন রোগের লক্ষণ মিলিয়া গেলেই তাহা সেই রোগ প্রতীকারের ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও অনেক ঔষধ এই রীতি অনুসারেই ব্যবহৃত হইত। আফিং একটি অতি প্রাচীন প্রচলিত ঔষধ। আফিং বীজাধারের নির্য্যাস ব্যথা বেদনা প্রশমনে বা নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, আফিং বা আফিং হইতে উৎপাদিত কোন ঔষধই আজ পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে কোন রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হয় নাই। এইরূপ আধুনিক-কালে প্রচলিত fox-glove বা digitalis একটি সুপরিচিত ঔষধ, কিন্তু ইহাও আজ পর্য্যন্ত কোন রোগাক্রান্ত হৃদ-পটভূমিকাময় করিতে সমর্থ হয় নাই। ডিজিট্যালিজের প্রবহমান ও দ্রুত স্পন্দন কমাইতে পারে মাত্র, অসুস্থ dangerous নিরাময় করিতে পারে না। এই কারণেই কোনদিকে তা তাঁর

আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতিতে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

উদ্ভিদ-দেহ হইতে ঔষধরূপে ব্যবহৃত যে সকল সক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায় তাহা উদ্ভিদের প্রয়োজনেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহা মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীদের ব্যথা-বেদনা বা রোগ-যন্ত্রণা প্রশমিত করিবে কেন—এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রাণী অথবা বিভিন্ন জাতীয় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহাদের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্তই বৃক্ষদেহে প্রধানতঃ নানা প্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদিত হয়। কাহারও গন্ধ উগ্র, কাহারও গন্ধ মধুর, কাহারও স্বাদ তিক্ত কাহারও বা কষায়। অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষীর পক্ষে ইহা অপ্রীতিকর বলিয়া তাহারা ইহাদিগকে এড়াইয়া চলে। কাজেই উদ্ভিদ দেহের প্রয়োজনে উৎপন্ন পদার্থ প্রাণী-দেহের রোগ নিরাময় করিবে—ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা শক্ত। তাছাড়া রোগ-নাশক ঔষধ আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলে উৎপন্ন প্রায় সকল রকমের উদ্ভিদকে মানুষ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার সন্ধান মিলে নাই। অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি ভেষজের কিছু কিছু কার্য্যকারিতা দেখা গিয়াছে; কিন্তু তাহারও কারণ সুস্পষ্ট। উদ্ভিদ-দেহে বিশেষ কোন কোন জীবাণু বা দূষিত পদার্থ ধ্বংসের জন্য যে সকল সক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা মনুষ্য-দেহ উৎপন্ন অনুরূপ অনিষ্টকারী পদার্থ বা জীবাণুগুলিকেও যে ধ্বংস করিতে পারিবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু মানুষের একটি গুরুতর রোগ দেখা যায়—উদ্ভিজ্জাত পদার্থ যাহাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরাময় করিতে পারে। ইহা যেন একটা আকস্মিক রাসায়নিক ঘটনার মত। এক জাতীয় উদ্ভিদ তাহার নিজের প্রয়োজনে কুইনাইন নামে এক প্রকার সক্রিয় প্রতিষেধক পদার্থ—alkaloid উৎপন্ন করে। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত মনুষ্যশরীরে প্রয়োগ করিলে দেখা যায়—ইহা ম্যালেরিয়ার বীজাণু বৃদ্ধি পাইবার প্রয়োজনীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং তাহার ফলে রোগের প্রভাব মন্দীভূত হইতে থাকে। কুইনাইনের মত একটা উদ্ভিজ্জাত সক্রিয় পদার্থের মনুষ্য-রোগ দূরীকরণে এই বিশেষত্ব যেন একটা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ব্যাপার। তবে বিশেষ কোন এক একটি লক্ষণ বা শারীর-ক্রিয়ার কথা ধরিলে কতকগুলি উদ্ভিদের সক্রিয়-নির্য্যাসের এক একরকমের কার্য্যকারী ক্ষমতা লক্ষিত হয় বটে। এই হিসাবে morphine, strychnine, atropine প্রভৃতি পদার্থসমূহ অনবরত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারা কোন কোন লক্ষণ বা শারীর-প্রক্রিয়াকে সাময়িক ভাবে অনেকটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে বটে; কিন্তু কোন রোগ নিরাময় করিতে পারে না।

তাছাড়া রোগ-নিদান সম্পর্কিত বিবিধ গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন রকমের এক-কৌষিক পরভোজী উদ্ভিদ-অণু মনুষ্যদেহে নানাপ্রকার রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। এই সকল উদ্ভিদ-অণু মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত পরিবেশে অতিক্রত সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে। তাহাদের দেহ-নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থের দরুণ এবং অন্যান্য কারণে শরীর রোগাক্রান্ত

হইয়া পড়ে। উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ যেখানে রোগোৎপত্তির কারণ সেখানে উদ্ভিজ্জাত পদার্থের রোগ-নাশক ক্ষমতায় সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন—খুঁজিতে খুঁজিতে ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক কুইনাইনের মত নিউমোনিয়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ-প্রতিষেধক ঔষধের সন্ধান পাওয়াও বিচিত্র নহে। বৈজ্ঞানিক গবেষকেরাও অবশ্য এরূপ কোন সহজলভ্য অথচ আশুফলপ্রদ পদার্থের সন্ধানে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, কুইনাইনের মত পদার্থের কথা বাদ দিলে ভৈষজ্য-জাত অন্যান্য যে সকল ঔষধ উৎপাদিত হইয়াছে তাহার কোন-কোনটা কোন গতিকে কদাচিৎ কার্য্যকরী হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।

খনিজ বা অজৈব পদার্থ সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপারই ঘটিতে দেখা যায়। লৌহ, গন্ধক, পারদ, আর্সেনিক প্রভৃতি পদার্থগুলির বিবিধ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং বরাবরই থাকিবে—এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। রক্তাল্পতায় লৌহ, উপদংশে পারদ, চর্ম্মরোগে গন্ধকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না; তথাপি কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ঔষধরূপে খনিজ পদার্থের ব্যবহার পরিত্যক্ত হইতে চলিয়াছে। রসাঞ্জন বা Antimony নামক চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপরিচিত পদার্থের কথাই ধরা যাউক। চিকিৎসকেরা অনেককাল হইতেই এই পদার্থটির বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিক রোগনাশক পদার্থরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অন্যান্য ঔষধের মত রোগ বিনাশে ইহার ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা হৃৎস্পন্দন ও অন্যান্য অপরিহার্য্য শারীরিক প্রক্রিয়ায় অবসাদ আনয়ন করে মাত্র এবং খুব সম্ভব রোগের সর্ব্বাবস্থায় ইহা দ্বারা উপকার ছাড়া অপকারই হইয়া থাকে বেশী।

রোগবিনাশে ভেষজ এবং খনিজ পদার্থের অসারতা প্রতিপন্ন হইলেও রোগ প্রতীকারের কোন ঔষধ নাই এমন কথা যেন কেহ না ভাবেন। প্রাণিদেহের প্রয়োজনে শরীরের মধ্যে স্বাভাবিক উপায়ে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই কি অন্য রুগ্ন শরীরে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না? অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এক সময়ে কিন্তু এই ভাবেই তথাকথিত রোগ-নাশক নূতন নূতন ঔষধ প্রস্তুত হইত। ঘুরিতে ঘুরিতে হয়তো কেহ এমন একটা গাছ দেখিতে পাইল যাহার আকৃতি-প্রকৃতি অন্যান্য সাধারণ গাছ অপেক্ষা অনেকটা অদ্ভুত ধরণের। হয়তো বা তাহার পাতাগুলি দেখিতে প্রাণিদেহের অঙ্গবিশেষের মত। এইরূপ সাদৃশ্য দেখিয়াই সেই পাতার কাথ বা নির্য্যাস প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য বা অন্য কোন প্রাণীর সেই অঙ্গবিশেষের অসুস্থতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হইত। ইহা হইতেই ক্রমশঃ মনুষ্য-শরীরের অঙ্গ বিশেষের অসুস্থতা দূর করিবার জন্য অপর প্রাণীর অনুরূপ অঙ্গবিশেষের নির্য্যাস প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার ফলে রোগ নিরাময়ে কোন সাফল্য লাভ না ঘটিলেও বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কিন্তু কিছু সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত উপায়ে ইহা হইতেই কতকগুলি deficiency disease-এর প্রতীকার সম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উদ্ভিদের সক্রিয় পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়—তাহাদের নিজের প্রয়োজনে। ইহাতে প্রাণিদেহের অসুস্থাবস্থা বিদূরিত হইবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না; তবে এই হিসাবে প্রাণি-দেহোৎপন্ন পদারাসায়ণিক পদার্থসমূহ অপর প্রাণী দেহের রোগ নিরাময়ে সাফল্য লাভ করিবারই কথা। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণিদেহ হইতে এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ পৃথক্ করা সম্ভব হইয়াছে যাহা প্রয়োগে সেই সেই পদার্থের অভাব-জনিত রোগের অব্যর্থ প্রতীকার সম্ভব। সময়ে সময়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের cretinism এবং বয়স্কদের myxœdema নামক রোগ জন্মিতে দেখা যায়। এই সকল রোগে চেহারার অস্বাভাবিক বিকৃতি ঘটে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ কোনও কোনও রাসায়নিক পদার্থের অভাবে এ সকল রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাদিগকে athyrea বলা হয়। 'থাইরয়েড' নামক গ্রন্থিনিঃসৃত রসের অভাব বা স্বল্পতা হেতুই cretinism বা myxœdema আত্মপ্রকাশ করে। অতএব এই জাতীয় পদার্থের অভাব দূর করিতে পারিলেই ত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসা উচিত। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে—কোন সুস্থ জীব-জন্তুর 'থাইরয়েড' গ্রন্থি বাহির করিয়া এই সকল রোগীকে সেবন করাইলে বা অন্যভাবে প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর বুদ্ধিবৃত্তি ও চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া তাহারা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কাজেই এই ধরণের পদার্থকেই প্রকৃত প্রস্তাবে অমোঘ ঔষধরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যে সকল অভিনব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অন্ততঃ দুইটিকে যুগান্তকারী আবিষ্কার বলা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে 'হরমোন' জাতীয় পদার্থের অভাবজনিত রোগে অপর প্রাণিদেহ হইতে সংগৃহীত Endocrine গ্রন্থির রস প্রয়োগ, অপরটি হইতেছে Antitoxin প্রয়োগে চিকিৎসা। 'থাইরয়েড'-গ্রন্থি-নিঃসৃত রসের অভাবজনিত Cretinism প্রভৃতি রোগে 'থাইরয়েড' গ্রন্থির নির্য্যাস বা 'থাইরক্সিন' প্রয়োগ করিলে যেমন দেহ মনের স্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশ পায়— Antitoxin-এর ব্যাপারটাও প্রায় সেইরূপ অর্থাৎ ইহাও প্রাণীদেহ হইতে উৎপাদিত হয় এবং অব্যর্থরূপে জীবাণু ধ্বংস করে। ডিপথেরিয়া জীবাণুর দেহ-নিঃসৃত বিষাক্ত রস যদি সুস্থ সবল ঘোড়ার দেহে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহার রক্তের শ্বেতকণিকা বা অপর কোন পদার্থ হইতে দেহস্থিত রক্তের মধ্যেই উক্ত বিষ প্রতিষেধক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইতে থাকে—ইহাই Antitoxin নামে পরিচিত। এই antitoxin উৎপাদিত হইয়া ডিপথেরিয়া toxin-এর প্রভাব ব্যাহত করিয়া দেয়। Toxin-এর বিষ-ক্রিয়া নষ্ট হইবার পরেও যথেষ্ট পরিমাণ antitoxin [illegible] —এমন থাকিয়া যায়। ডিপথেরিয়া আক্রান্ত মনুষ্য-শিশুর অবস্থা [illegible] ঘোড়ার অবস্থার মতই হইয়া থাকে। দেহে জীবাণ[illegible] সঙ্গে সঙ্গেই antitoxin উৎপন্ন হইতে থাকে; [illegible]ও, প্রকৃতি এবং toxin-এর সহিত পাল্লা দিবার মত যথেষ্ট প[illegible]তেই ঔষধ সেবনের

চেয়েছেন চতুর্দ্দিকে প্রসারিত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও জীবনের প্রাচুর্য্য। এরই মধ্যে তিনি আহ্বান করেছেন তাঁদের যাঁরা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগে এই সৌন্দর্য্য ও প্রাচুর্য্যকে আরও মহত্তর করে তুলবে। যুদ্ধক্ষেত্রের অপচয় ব্যক্তিমানবের ট্রাজিডি নয়—কারণ যুদ্ধশেষে আছে :

Great rest and fullness after death.
All the bright company of heaven
Hold him in their high comradeship,
The Dog-star and the Sisters Seven
Orion's belt and sworded hip.

এখানে লক্ষ্য করা যাবে যে কবি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী। গোষ্ঠীমানুষকে অবলম্বন করে তাঁর চিন্তাধারা প্রবাহিত নয়। তাই তাঁর কাছে মৃত্যুভয়াল নয়—রাত্রির স্নেহের মত মৃত্যু নেমে এসে মানুষকে আলিঙ্গন করে।

চার্লস মোরলির মধ্যেও পূর্ব্বোক্ত পরিচয় পাওয়া যাবে। আত্মত্যাগ ও আদর্শবাদ তাঁকেও অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর মৃত্যু আকস্মিক—১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন পর্যন্ত ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে বা গ্যাস আক্রমণে যুদ্ধের বিভীষিকা ভয়াল হয়ে ওঠে নি। অনেকটা হয়ত এজন্যও প্রধানতঃ মোরলে তাঁর কবি-প্রকৃতির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য—শ্যাওলা-ধরা দালান, সবুজ মাঠ, সুগন্ধি ফুল ও পাখীর গান উপভোগ করেছেন। এমন কি তিনি বুঝতে চেয়েছেন :

The rooks are cawing all day.
Perhaps no man, until he dies
Will understand what they say.

বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা, গীতিমূলক, আখ্যায়িকামূলক প্রভৃতি নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন যাতে তাঁর কবিমন স্থিতধী হতে পারে। সৈনিক কবিগণের মধ্যে যাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উইলফ্রেড ওয়েন ও সিগফ্রিড স্যাসুন। এঁরা যুদ্ধ ও যুদ্ধের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন ও অ্যানটি-রোমান্টিক। যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি, তার অপচয়ী মৃত্যুর পরিবেশে এদের মনে হতাশা ও তীব্র বিদ্রূপের সঞ্চার হয়েছে। ওয়েন ও অন্যান্য কবিগণ এই যুদ্ধের সৃষ্ট এক অস্পষ্ট অথচ অনিবার্য্য ঐতিহাসিক প্রশ্নের সম্মুখে উপনীত হয়েছেন।

Watching, we hear the mad knats tugging on the wire
Like twitching agonies of men among its Grambles,
Northward incessantly the flickering gunnery rumbles
Far off life a dull rumour of some other war
What are we doing here?

সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত বিরোধ আজ প্রকটিত। দূর পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে শ্রেণী-সংগ্রাম নূতনতর আদর্শ সংস্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এ প্রশ্ন অস্পষ্টরূপে কবির মনে উদিত হয়েছে—'like a dull rumour of some other war.' তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছে কি করছি আমরা এখানে? এর উত্তর, যা লেখা ইতিহাসের পটভূমিকায়, তা তার কাছে প্রাণময় রূপ ধারণ করে নি। সম্মুখে প্রবহমান ইতিহাসের ধারা—'all sway forward on the dangerous flood of History,' এ ধারার গতি ও পরিণতি কোনদিকে তা তাঁর কাছে অস্পষ্ট। স্যাসুনের ক্ষেত্রেও তাই। যুদ্ধের নৈরাশ্য, অপচয় ও অপরিণত সম্ভাব্য পূর্ণতার কথা স্মরণ করে তাঁরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রচারিত স্বাজাতিকতার গৌরব ও যুদ্ধের তথাকথিত মহত্ত্বকে বিদ্রূপ করে বলেছেন যে এগুলি এক বিরাট্ মিথ্যা। স্যাসুন বা ওয়েন দেখেছেন যুদ্ধের বাহ্যিক কারণ, কিন্তু যুদ্ধের পশ্চাতে আছে যে সামাজিক পটভূমিকা, যা অর্থনৈতিক বিরোধের ভিত্তিতে গড়া তাকে তাঁরা বিশ্লেষণ করেন নি। শুধু তাঁরা নন—ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদীরাও ইতিহাসের বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে যুদ্ধপূর্ব্ব বা যুদ্ধোত্তর সমাজ-ব্যবস্থাকে বিচার করেন নি। কিন্তু বিরোধের পূর্ব্বাভাস ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেকারদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে ও ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ডক্ ধর্ম্মঘটে স্পষ্ট হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণী এই সময়ে এক নির্দিষ্ট শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ফেবিয়ানরা এই আদর্শ থেকে দূরে রইলেন। এনজেলস এই সময়ে এঁদের সম্বন্ধে লেখেন 'fear of the revoluton is their fundamental principle!' ওয়েনের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে তাঁর সংবেদনশীল মন। এই মন নিয়েই তিনি যুদ্ধকে দেখেছেন, যুদ্ধের অপচয়ে তিনি তীব্র বেদনাবোধ করেছেন। এই বেদনাবোধই তাঁর কবি-মানসকে জাগ্রত করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি চেষ্টা করেছেন যুদ্ধ ও তার ক্ষয়ক্ষতিকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখতে। অবশ্য সর্ব্বত্র এ দৃষ্টিভঙ্গী তিনি রাখতে পারেন নি যেমন পারেন নি স্যাসুন বা যুদ্ধোত্তর যুগেও টি. এস. এলিয়ট। আকস্মিক বিপ্লবে উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তবে বেদনাময় চৈতন্য ও শান্ত নিরাসক্ত দৃষ্টির জন্য ওয়েনের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। যুদ্ধোত্তর যুগে যে ব্যক্তিগত চিত্তবিকার ব্যাপক হয়েছিল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। ওয়েনের 'ইনসেনসিবিলিটি' নামক কবিতার শেষ স্তবকে পড়ি :

By choice they made themselves immune
To pity and whatever mourns in man
Before the last sea and the hapless stars;
Whatever mourns when many leave these shores;
Whatever shares
The eternal reciprocity of tears.

লক্ষ্য করা যাবে এই সংযত আবেগের পিছনে রয়েছে কি শান্ত মন। 'ষ্ট্রেঞ্জ মিটিং' নামক কবিতায় স্বপ্নের মধ্যে তিনি দেখছেন যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে তিনি গিয়েছেন এক টানেলে। সেখানে দেখা হ'ল এক জর্মান সৈনিকের সঙ্গে। সৈনিক পরিচয় দিলে যে গতকল্য তারই আঘাতে তাকে মরতে হয়েছিল। সংযত ভাষণের মধ্যে, বাক্যার্থের অতীত ব্যাঞ্জনার মধ্যে এই কবিতায় যুদ্ধের রূপ বর্ণিত হয়েছে।

'Strange friend' I said 'here is no cause to mourn'.
'None' said the other 'save the undone years
The hopelessness.'

তারপর যুদ্ধোত্তর যুগের রূপ। জাতিসমূহ প্রগতি ও সংস্কৃতির বহতা ধারা থেকে পেছনে পড়ছে। ধর্ম্ম আজ অনাদৃত; স্বাধীনতা ও সাম্যের পরিবর্ত্তে জাতিসমূহ স্ব-স্ব লৌকিক সংস্কারকে বড় করে দেখছে ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অন্তরালে আশ্রয় নিচ্ছে কিন্তু সে আশ্রয় নিরাপদ নিশ্চিন্ততার নয়। সুতরাং কবি থাকেন সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে :

I would have go up and wash them from sweet wells
Even with Truths that lie too deep for taint.

'একস্পোজার' নামক কবিতাতেও অনুরূপ আবেগের গভীরতা অনুভব করি। লক্ষ্য করি সংযত আবেগ। এই আবেগকে বলা যেতে পারে জীবনকে অব্যবহিত ভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করবার প্রয়াস :

To-night, His frost will fasten on this mud and us,
Shrivelling many hands, puckering foreheads crisp.
The burying party, picks and shovels in their shaking grasp
Pause over half known faces. All their eyes are ice,
But nothing happens.

আইজাক রোজেনবার্গের কবিতায় লক্ষ্য করা যাবে যে তাঁর 'আইডিয়া' সংহত নয় কারণ ট্রেঞ্চ-জীবনে যে দুঃখ ও তিক্ততা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল তাকে অতিক্রম করে তাঁর মন কোন বাস্তব অভিজ্ঞতাকে রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে উপভোগ করতে পারেনি।

The air is loud with death
The dark cloud spurts with fire,
The explosions ceaseless are
. . . .
The drowning soul was sunk too deep
For human tenderness.

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রোজেনবার্গ লিখেছিলেন যে কবিতা হবে স্বচ্ছ চিন্তাধারার সাবলীল প্রকাশ সে চিন্তা যত সূক্ষ্ম বা নৈর্ব্যক্তিক হোক না কেন। অথচ তাঁর নিজের কবিতায় যে চিন্তা ও প্রকাশের অস্বচ্ছতা ধরা পড়ে তার কারণ তিনি রূপকাশ্রয়ে বাস্তবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই রূপক বা প্রতীক সর্ব্বত্র ভাবময় চিত্ররূপ সৃষ্টি করতে পারে নি। প্রতীকচিত্র ও ভাবের সঙ্গে বস্তুচিত্রের সম্বন্ধ সর্বত্র অবিচ্ছেদ্য নয়।

Babel cities' smoky tops
Pressed upon your growth
Weavy gyves, what were you
But a world in the brain's ways
Or the sleep of Circe' swine.

এই উদ্ধৃত প্রতীকচিত্রের মধ্যে সম্বন্ধ অস্পষ্ট। রোজেনবার্গের মতে তাঁর 'অ্যামাজনস্' বা 'ডটরস্ অফ ওয়ার' শ্রেষ্ঠ কবিতা। কিন্তু এখানে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য বা বিক্ষিপ্ত ভাবসম্পদ থাকা সত্ত্বেও কবিতার সমগ্র সৌন্দর্য্য রসোত্তীর্ণ নয়। মৃত্যু-সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও তাঁর প্রকৃতি-প্রীতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। রণক্লান্ত সৈনিকেরা মৃত্যুর পথ দিয়ে (Bleak poison blasted track) এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ

But hark ; joy-joy strange joy
Lo ! Heights of night ringing with unseen larks
Music showering on our upturned listening faces.

কবির কল্পনার সজীবতা প্রাণচাঞ্চল্যে স্পন্দমান। কাব্য-নীতি ও কবিতা নিয়ে তার বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে তিনি চেষ্টা করেছেন আবেগময় প্রকাশভঙ্গী লাভ করতে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁর সাফল্য নির্দ্ধারিত হবে। রোজেনবার্গের প্রকৃতি-বন্দনা ও প্রতীকচিত্রের মধ্যে এটা লক্ষণীয় যে তিনি রোমান্টিকদের মত বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে ঝুঁকেছিলেন ও তাঁর উপলব্ধ গভীর অনুভূতিকে ভাষায় রূপ দিয়ে নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

সৈনিক কবিদিগের মধ্যে অন্যতম সিগফ্রিড স্যাসুন। তাঁর যুদ্ধপূর্ব্বকালের গীতিকবিতাগুলি জর্জিয়ান রীতিতে লিখিত। কিন্তু যুদ্ধে যোগদান করে যুদ্ধের নৃশংসতা ও রক্তস্রোত দেখে তাঁর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'ল। 'কাউন্টার এটাক' ও 'পিকচার শো' নামক কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতাকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে যে রোমান্টিক আদর্শবাদ প্রচলিত ছিল তার যশোগাথা ও সৌন্দর্য্যকে তিনি নির্মম ভাবে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর বিদ্রূপের তিক্ততা কঠোরতর হয়েছে কারণ ট্রেঞ্চ-জীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ ছিল ও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নেই, তিনি জানতেন।

White faces peered, puffing a point of red
Candles and braziers, glinted through the chinks
And curtain-flaps of dug-outs ; then the gloom
Swallowed his sense of sight ; he stooped and swore
Because a sagging wire had caught his neck.

শেষ ছত্র দুটির মধ্যে যুদ্ধের ভয়াল রূপ পরিস্ফুট। স্বল্প-পরিসরে রূপসৃষ্টি সার্থক হয়েছে। এজন্য হয়ত তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন মুক্ত আত্মাদের যাঁরা মরণ-যজ্ঞ হতে বিমুক্ত।

Numberless they stood
Halfway toward heaven, that men might mark
The grandeur of their ghostlihood
Burning divinely on the dark.

রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে সাহিত্যের ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখেছেন যে পৃথিবীর নানা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও কবির বীণা বিশ্বব্যাপী সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজবে, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। কিন্তু এই যে সুর—যে সবকিছু চলেছে আনন্দ লোকের দিকে—তা বিপর্য্যস্ত হ'ল মহাযুদ্ধে। সাম্প্রতিক যে বিপর্য্যয় তা অতিক্রম করে কোন নিত্যতাকে উপলব্ধি করা সে দিন সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগেও সে অবস্থা বর্ত্তমান ছিল। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা প্রচলিত বিশ্বাস ও নীতিবোধ ও সমাজ-স্থিতিকে দীর্ণ করে দিলে। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগের উদ্ভত অবিশ্বাস আকস্মিক বিপ্লবজনিত হতে পারে কিন্তু পূর্ব্বযুগীয় বাস্তব ভিত্তিকে গ্রহণ আর সহজ ছিল না কারণ নূতন দৃষ্টি দিয়ে বস্তুবিশ্বকে প্রত্যক্ষ করা অপরিহার্য্য হয়েছিল। অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ আরও বিভক্ত হয়ে পড়েছে। নূতনতর পরিবেশে উৎপাদন শক্তি ও সম্পর্ক স্থাপন একান্ত প্রয়োজনীয়। ফিউডাল যুগের শ্রেষ্ঠ দান মানবিক সম্পর্ক—ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যে প্রশ্ন যুদ্ধোত্তর যুগে সুস্পষ্ট হ'ল তা হচ্ছে নূতন ভিত্তিতে যৌথ জীবনযাত্রা পুনর্গঠনের আত্যন্তিকতা। সমাজজীবনে উপস্থাপিত নূতন প্রশ্নে এলিয়ট প্রভৃতি কবি ট্রাডিশন্যাল লাইফকে গ্রহণ করতে উন্মুখ। বিচ্ছিন্ন মানুষ চার্চের সংগঠনশক্তির আশ্রয়ে গিয়ে শক্তি লাভ করতে পারে—এই হচ্ছে এলিয়টের বিশ্বাস। গোষ্ঠীজীবনের অপরিহার্য্যতার কথা বুদ্ধি দিয়ে মেনে নিলেও অডেন মনের দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী—শুধুমাত্র ডে লুইস ও স্পেণ্ডার নব আদর্শে অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বস্তুবিশ্বকে তদ্গতচিত্তে নিরীক্ষণ করাকে আধুনিকতা বলেছেন। এই আধুনিকতা পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিদ্বয়ে লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ তাঁদের কবি-মানস সুস্পষ্ট। ডে লুইস বলছেন 'কনফ্লিক্ট' নামক কবিতায় নূতন আদর্শের প্রয়োজনীয়তার কথা, কারণ

For where we used to build and love
Is no man's land and only ghosts can live
Between two fires.

দ্বিতীয়তঃ দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তন্ময়তার কথা স্পেণ্ডারের 'দি পোয়েট এ্যাণ্ড লাইফে' বলা হয়েছে। নূতন আদর্শের অর্থ নূতন মানসিক সম্পদ ও নূতন অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজ গঠন করা। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের আদর্শ নিত্য। এ নিত্যতা আনন্দরূপকে প্রকাশ করতে চায়—যে আনন্দ দুঃখকে অতিক্রম করে বিরাজিত। যা না থাকলে কোহ্যে বান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কিন্তু এই যে আনন্দরূপ আজ তা মেঘগ্রস্ত; কিন্তু রূপের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তার উপলব্ধি সামাজিক পরিবেশের পুনঃসংস্থাপনের উপর নির্ভর করে। এখানে কবির সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করা যাবে না। সাধারণ মানুষকে নূতন জীবনযাত্রার আদর্শে অনুপ্রাণিত করবেন। এ দায়িত্ব কবিকে গ্রহণ করতে হবে। কর্মীর দায়িত্ব কবির নয়, এ কথা কবিগুরু বললেও, কবির সামাজিক অস্তিত্ব তথা তাঁর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাকে খর্ব করা হয়।

এ যুদ্ধেও আমরা কয়েকজন সৈনিক কবির সঙ্গে পরিচিত হই। যুদ্ধের ফলে কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। রিচার্ড স্পেণ্ডার ও সিডনি কীজ্ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বৎসরাধিক পূর্বে বিমান দুর্ঘটনায় ব্রহ্মদেশে এলুন লিউইসের মৃত্যু হয়েছে। জন পাড্নি জীবিতদের মধ্যে অন্যতম। এই সব সৈনিক কবির কবিতা পূর্বসূরীগণের মত—ব্রুক বা ওয়েন—স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রসাদগুণ বিশিষ্ট নয়। কিন্তু এঁদের অভিজ্ঞতা ব্যাপক, বিশ্বব্যাপী রণাঙ্গন এঁদের পরিচিত। বহু বিচিত্র দেশ ও জাতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এঁদের কবিতা বিচিত্র। আর বিচিত্র এঁদের সূক্ষ্ম অনুভূতি যা মনস্তত্ত্বের জটিলতায়, আদর্শবাদের সংঘাতে বেদনাময়। 'ডেড এয়ারম্যান' নামক কবিতায় পাড্নির কবিত্ব-শক্তি স্বীকৃত হয়েছে। যারা বৈমানিক, যারা দেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য দেশবাসীর কোন উদ্বেগ নেই, কোন আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নেই:

A sorry world bereft of simple tongue
Had not a word of honour, saved its smile
For the philosopher and wished the young
The idiot happiness, the decent pile.

যুদ্ধের এই মারণ-যজ্ঞেও দেশবাসী অন্যবিধ লাভজনক কার্যে ব্যাপৃত:

To fix the brokers in the market, some
Dared to consider now the prices lied,
And bought insurance for the doom to come
Yet none had simple speech for simple dead.

সুতরাং এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলবে—

So Honour may be said
To be the decent shroud to serve the dead.

বহু দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ে কবির অভিজ্ঞতা ব্যাপক। এই ব্যাপকতাকে তিনি হৃদয়ের রক্তে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারেন নি। 'Emotion recollected in tranquillity'—কাব্য সৃষ্টির এই ধর্ম তাঁর মধ্যে সক্রিয় নয়। কর্মস্রোতের আবর্তের মধ্যে জড়িত হয়ে কোন নিরাসক্ত দৃষ্টি লাভ করা কবির পক্ষে সম্ভব নয়। 'টেন সামারস্' নামক কাব্য গ্রন্থে তিনি তাঁর বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন—কোথাও বা তা হৃদয়ের স্বাক্ষর পেয়েছে, কোথাও শুধু বা চিত্রধর্মী। আশা করা যায় যুদ্ধশেষে তিনি ও তাঁর সহকর্মী কবিগণ স্থির দৃষ্টি লাভ করে সার্থক কাব্য সৃষ্টির পথে এগিয়ে যাবেন।

কবি-বিরহ

শ্রীআর্যকুমার সেন

চৈত্রের শেষ। শীতাবসানে যে মৃদুমন্দ মলয়পবন বহিতেছিল, তাহার উষ্ণতা বর্ধিত হইতে হইতে ক্রমশঃ অগ্নিরূপ ধারণ করিতেছে। আর অল্প কিছুদিন পরেই বসন্তের অবসান, বর্ষের অবসান, এবং অমিতবিক্রম বৈশাখের আবির্ভাব।

উজ্জয়িনীর রাজপথ ধূলিধূসর, ধূলিপটলে আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন। রাজপথ জনহীন, বিপণিসমূহ রুদ্ধদ্বার। নাগরিকগণ অর্গলবদ্ধ গৃহে শ্রান্তমধ্যাহ্ন নিদ্রাসুখে অতিবাহিত করিতেছে।

রাজপ্রাসাদের বাহিরে শূলহস্ত বর্মাবৃত ও ঘর্মাক্তকলেবর দ্বারিদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে ললাটদেশ হইতে স্বেদ মোচন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিতেছে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে অন্ধকারপ্রায় কক্ষে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ক্ষণে ক্ষণে কিঙ্করীর হস্ত হইতে শীতল পানীয় গ্রহণ করিয়া নিঃশেষ করিতেছেন। দ্বারদেশে স্থূল কার্পাসবস্ত্রনির্মিত যবনিকা লম্বিত। যবনী প্রতিহারী কিয়ৎক্ষণ অন্তর তাহাতে বারিসিঞ্চন করিতেছে। তথাপি মহারাজের স্বেদবারির বিরাম নাই।

মহারাজ পালঙ্কোপরি অর্ধশয়ান, তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী তাম্বূলহস্তে এবং অপরা কিঙ্করী শীতল পানীয় হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে চামরহস্তা দুই সুন্দরী মহারাজকে ব্যজন করিতেছে। অপেক্ষাকৃত নিম্ন একটি আসনে গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ এক ব্রাহ্মণ যুবক উপবিষ্ট। যুবকের কুঞ্চিত কেশদাম সযত্ন প্রসাধিত, বাহুদেশে স্বর্ণ অঙ্গদ, ললাটে শ্বেতচন্দন।

কেহ কথা কহিতেছিলেন না। মহারাজের চক্ষু অর্ধনিমীলিত, পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকের সন্দেহ হইতেছিল মহারাজ অর্ধশয়ান অবস্থাতেই নিদ্রামগ্ন। কিন্তু সহসা মহারাজ কহিলেন, "সখে কালিদাস!"

"আদেশ করুন।"

"তুমি যে আজ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, ব্যাপার কি?"

"মহারাজের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত করিতে বাসনা নাই।"

অপ্রতিভকণ্ঠে মহারাজ কহিলেন, "না না, কে বলিল আমি নিদ্রিত? তবে আজ বড়ই গ্রীষ্মাধিক্য হইয়াছে।"

কালিদাস কহিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম।"

ঈদৃশ বাক্যালাপ ভারতের শ্রেষ্ঠ যুগের শ্রেষ্ঠ নৃপতি বিক্রমাদিত্য ও কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের কদাচ যোগ্য নহে। সম্ভবতঃ অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই মহারাজ পুনরপি কথা

কহিলেন। বলিলেন, "সখে কালিদাস, মহিষী রুষ্টা হইয়া কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়াছেন।"

"ও।"

"আর কিছু বলিবার মত সন্ধান করিয়া পাইলে না?"

"মহারাজ, মহিষীই ত একমাত্র অন্তঃপুরিকা নহেন।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে মহারাজ কহিলেন, "আঃ! ও সব পুরাতন রসিকতার জন্য বররুচি-শঙ্কু-ঘটকর্পর আছেন। তুমি নূতন কিছু বল। তুমি এ অবস্থায় কি কর? তোমার ত পত্ন্যন্তর নাই।"

"আমার এরূপ অবস্থার উদ্ভব বড় একটা হয় না মহারাজ।"

বিস্মিত বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "বল কি বয়স্য! আমি ত শুনিয়াছিলাম কবিপত্নী নাকি কবির উপর সর্বদাই খড়্গহস্তা, তাম্বুল হইতে সুধার স্খলন হইলেই খাণ্ডবদাহন?"

রুষ্টকণ্ঠে কালিদাস কহিলেন, "মহারাজ, পরসুখদ্বেষী জনগণ যাহা বলে তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। আমার পত্নীর নাম বিলাসবতী, বেত্রবতী নহে।"

অপ্রতিভস্বরে বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "সখে, আমাকে ভুল বুঝিও না। আমি শুনিয়াছিলাম তুমি তোমার পত্নীকে যতখানি ভালবাস, প্রায় সেইরূপই ভয় কর। কথাটা তাহা হইলে সত্য নহে?"

কবি দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না। আমার প্রিয়া কেবল আমার গৃহিণী নহেন, তিনি আমার সখী ও সচিব। প্রিয়শিষ্যাও বলিতে পারিতাম, তবে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিবার মত বিদ্যা সম্ভবতঃ আমার নাই।"

কবিপত্নীর বিদ্যার খ্যাতি মহারাজের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি সহাস্যে কহিলেন, "বন্ধু তুমিই সুখী। আমার ন্যায় তোমার পত্নী কথায় কথায় ক্রোধাগারে গমন করেন না। কিন্তু এত সুখ সত্ত্বেও আজ তোমাকে নিতান্তই বিমর্ষ দেখিতেছি। সে কি শুদ্ধ গ্রীষ্মের প্রকোপে?"

কবি ক্ষণকাল মৌন রহিলেন। পরে কহিলেন, "মহারাজ, সম্প্রতি বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি।"

সবিস্ময়ে মহারাজ কহিলেন, "সে কি? কবিপ্রিয়া কি পিত্রালয়ে নাকি?"

"কবিপ্রিয়া উজ্জয়িনীতে কবির গৃহেই উপস্থিত আছেন।"

"তবে? পত্নী নিকটে আছেন, অতএব নিদারুণ বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, দূরে গেলে ক্লেশের উপশম হইত? পলান্ন পঞ্চব্যঞ্জন ও দধি মিষ্টান্ন সহযোগে আহার সমাধা হইয়াছে বলিয়া ক্ষুধার অবধি নাই, অনাহারে থাকিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত? কালিদাস, আমি কবি নহি, সামান্য সৈনিক এবং রাজা মাত্র। কথাটা বুঝাইয়া বল দেখি?"

কবি কথা কহিলেন না। সহসা উত্তেজিতভাবে অর্ধোত্থিত হইয়া মহারাজ কহিলেন, "বুঝিয়াছি! বিরহ পত্নীর জন্য নহে, অপর কোনও—"

বাধা দিয়া কবি কহিলেন, "না মহারাজ, বিরহ পত্নীর জন্যই, অপর কোনও রমণীর জন্য নহে।"

হতাশ হইয়া রাজা স্তব্ধ হইলেন। তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী ও কিঙ্করীত্রয় হাস্যগোপন করিল।

বহুক্ষণ উভয়ে মৌন রহিলেন। অবশেষে রাজা কহিলেন, "কবি, তোমার ঋতুসংহার কাব্যে বসন্ত ও গ্রীষ্ম বর্ণনায় অনেক কিছুই লিখিয়াছ, শুধু অকালগ্রীষ্মে মহিষীর সহিত কলহ হইলে কি উপায়ে কাল যাপন করিতে হয় তাহা লিখ নাই। বসন্তের অবসান হইতে না হইতেই যেরূপ গ্রীষ্মের প্রকোপ দেখিতেছি, পূর্ণ গ্রীষ্ম আসিলে না জানি কি হইবে। উপস্থিত তোমার কাব্যরস নিশ্চয় স্ফূর্তি পাইতেছে না, এ দারুণ উত্তাপে কাব্যলক্ষ্মী অবশ্যই শুষ্ক হইয়া অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছেন?"

শিরশ্চালনা করিয়া কবি কহিলেন, "না মহারাজ, আমি একটি নূতন কাব্যের বিষয় চিন্তা করিতেছি, দুই-এক দিবসের মধ্যেই লিখিতে আরম্ভ করিব।"

বিস্মিত রাজা কহিলেন, "এই গ্রীষ্মে কাব্য? বিষয় সম্ভবতঃ রৌদ্ররস?"

"না মহারাজ, বিষয় বর্ষাগমে বিরহযন্ত্রণা।"

মহারাজ উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "কালিদাস, তুমি কবি না হইয়া বিদূষক হইলে মানাইত ভাল। যেহেতু চৈত্র এখনও শেষ হয় নাই, সেই হেতু কাব্যের কাল বর্ষাগম। প্রিয়া নিকটেই আছেন, পিত্রালয়ে গমন করেন নাই, অতএব কাব্যের বিষয় বিরহ। এখন অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ প্রায়, বন্দিগণকে আহ্বান করি, বীণাযন্ত্রে ভৈরবী আলাপ করুক।"

কালিদাস কথা কহিলেন না, মৃদুহাস্য করিলেন মাত্র।

সন্ধ্যাবন্দনাদি অন্তে কবি তাঁহার গৃহশীর্ষে উন্মুক্ত স্থানে রচিত শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। প্রাচীরপার্শ্বে দণ্ডায়মানা বিলাসবতী স্বামীর আগমনশব্দে নিকটে আসিলেন।

মৃদুদীপালোকে কালিদাস ক্ষণকাল মুগ্ধনেত্রে প্রিয়ার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সারা উজ্জয়িনী মহানগরীতে এত রূপ আর কোন্ রমণীর আছে? কবি বহুতরা রাজকন্যা দেখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্যের ভুবনবিদিতা সুন্দরী মহিষীকে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের রূপ তাঁহার প্রেয়সীর স্নিগ্ধ কোমল বল্লরীর ন্যায় রূপের কাছে কিছুই নহে। প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় আনন, চম্পকপুষ্পের ন্যায় গাত্রবর্ণ, মরালনিন্দিত গতিভঙ্গী। কাব্যের নায়িকা হইবার ন্যায় সকল গুণই বর্তমান। এ রমণী কি দারিদ্র্যব্রত কালিদাসের জন্য?

পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কবিপ্রিয়া কহিলেন কি ভাবিতেছ?

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কবি কহিলেন কি ভাবিতেছি? ভাবিতেছিলাম—কথা শেষ না করিয়া কবি প্রেয়সীর শিথিলনীবী কটিতট বেষ্টন করিয়া তাঁহার বিম্বাধরে প্রগাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিলেন। আবেশে কবিপ্রিয়ার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল।

পরক্ষণেই প্রিয়তমের বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বিলাসবতী কহিলেন, বিশ্বাস করিলাম না। আমি ত নিকটেই রহিয়াছি, আমার কথা ভাবিয়া অত অন্যমনস্ক উদাসভাবের কি কারণ থাকিতে পারে? তুমি নিশ্চয় অপর কোনও মৃগাক্ষী মায়াবিনীর বিষয়ে চিন্তা করিতেছ। কে সে? তাহার বয়স কত? কত সুন্দরী সে?

কবির সম্বন্ধে জনশ্রুতির অন্ত ছিল। একে কালিদাস রূপবান্ যুবক, তাহার উপর দেশের শ্রেষ্ঠ কবি এবং রাজার প্রিয় বন্ধু। যখন যে কোনও রমণীর সহিত কবি বাক্যালাপ

অথবা দৃষ্টিবিনিময় করিয়াছেন, সে কুলনারীই হউক অথবা পণ্যস্ত্রীই হউক শত্রুগণ সেই রমণীর সহিত তাঁহার নাম জড়িত করিয়া কুৎসা রটনা করিয়াছে। বিলাসবতীর কর্ণেও সেই কুৎসার অনেক অংশ আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিন্তু স্বামীর প্রতি তাঁহার অপার বিশ্বাস, তিনি সে সকল কথায় কোনও দিন কর্ণপাত করেন নাই। তথাপি কবিকে মধ্যে মধ্যে কপট সন্দেহ করার লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

কবি মুখ তুলিলেন। প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছিল, তথাপি তারকালোকে বিলাসবতী স্বামীর নয়নদ্বয় দেখিতে পাইয়া লজ্জিতা হইলেন।

সপ্রেমে প্রিয়ার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজিতে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে কবি কহিলেন, "প্রিয়ে, একটি কাব্যকথা শুনিবে?"

প্রিয়তমের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বিলাসবতী কহিলেন, "শুনিব"

কবি কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

কিঞ্চিদধিক পঞ্চবর্ষ পূর্বের কথা। এক বিদুষী রাজদুহিতার রূপগুণের খ্যাতি ভারতের দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বহু রূপবান্ তেজস্বী রাজপুত্র, বহু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, তাঁহার পাণিগ্রহণের আশায় রাজগৃহে আসিয়া বিচারে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। অবশেষে ঘটনাচক্রে বিপ্রলব্ধা রাজকন্যা এক মূর্খ কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের কণ্ঠে মাল্যদান করিলেন। বাসরকক্ষে কন্যা আবিষ্কার করিলেন তাঁহার নবপরিণীত পতি অক্ষরজ্ঞানহীন। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই অবমানিত ব্রাহ্মণযুবক একাকী রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করিল।

(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কবিপ্রিয়া কহিলেন, "আর্যপুত্র—" কবি বাধা দিয়া কহিলেন, "ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আমার কাব্যকথা শেষ হয় নাই।")

কবি বলিয়া চলিলেন কেমন করিয়া মূর্খ নিরক্ষর ব্রাহ্মণ যুবক সরস্বতীর বর লাভ করিয়া কাব্যসৃষ্টিতে অধিকারী হইল। কেমন করিয়া রাজকন্যার সহিত তাঁহার পুনর্মিলন হইল, সেই-সকল কাহিনী।

কাহিনী সমাপ্তির পর প্রিয়া কহিলেন, "তোমার সেই রাজকন্যা ত নিকটেই রহিয়াছে, তবে কাহার কথা চিন্তা করিতেছ?"

স্বপ্নময়ী দৃষ্টি তারকাখচিত আকাশের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া কবি কহিলেন, "প্রিয়ে, সেই মূর্খ ব্রাহ্মণ যুবক অবমাননার মুহূর্তে রাজকন্যাকে ভালবাসিয়াছিল। দীর্ঘদিবসের বিচ্ছেদ তাহার প্রেম প্রগাঢ়তর করিয়াছিল। বিরহের বেদনার মধ্যে সে মিলনের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।"

সন্দিগ্ধকণ্ঠে কবিপ্রিয়া কহিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও বল দেখি?"

"কি বলিতে চাই? বিশেষ কিছুই নহে—

ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।

দিনাবসানে—"

বাধা দিয়া প্রিয়া কহিলেন, "কই, দূরে ত' যাই নাই।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কবি মৌন হইলেন।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। সহসা কবি ডাকিলেন, "প্রিয়ে।" নিদ্রাগতা পত্নীর নিকট হইতে কোনও উত্তর আসিল না। নত হইয়া ক্ষণকালের জন্য প্রিয়ার অধর স্পর্শ করিয়া তারকার আলোকে কবি প্রেয়সীর মুখকমলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

কবির নিদ্রাগম হইল না। অস্পষ্ট তন্দ্রার ঘোরে কয়েক বৎসর পূর্বের কথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বাসরকক্ষে রাজকন্যার অপরূপ রূপযৌবন, তাহার অব্যবহিত পরেই তিক্ত অভিজ্ঞতা, দিনের পর দিন দেশভ্রমণ, তাহার পরে আবার মিলন। পরম লজ্জা ও ক্ষোভ লইয়া কালিদাস পত্নীগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন মিলন ঘটিল তখন তিনি বিজয়গর্বে সমুন্নত শির, বিক্রমাদিত্যের সভাকবি, নবরত্নের মধ্যমণি। কিন্তু এই দীর্ঘদিবসের ব্যবধানের মধ্যে একটি মুহূর্তের জন্যও প্রিয়ার চিন্তা তাঁহার অন্তর হইতে দূরে যায় নাই। কিন্তু সেদিনকার সেই মিলনরজনী আজ কোথায়? প্রিয়া ত তেমনি তরুণী, তেমনি রূপবতী, প্রেমময়ী রহিয়াছেন, তাঁহার নিজের প্রেমেরও ত' কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই! তবে কিসের অভাব? কিসের অসন্তোষ?

নীলকৃষ্ণ আকাশের গায়ে কোটি নক্ষত্র জ্বলিতেছে। কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। সারা উজ্জয়িনী নিদ্রিতা, শুধু দূরে কোনও বিলাসী নাগরিকের প্রমোদগৃহ হইতে নারী-কণ্ঠে সুমধুর গীতধ্বনি আসিতেছে। বসন্ত নিঃশেষপ্রায়।

মধ্যরাত্রিতে কবি সহসা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অতি সন্তর্পণে কক্ষাভ্যন্তরে গমন করিয়া দীপ প্রজ্বালিত করিলেন। তৎপরে তালপত্র, লেখনী, ও মসী সংগ্রহ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ—

কবির লেখনী বিরামবিহীন ভাবে তালপত্রের উপর অক্ষর বিন্যাস করিয়া চলিল।

প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া কবিপত্নী পতিকে পার্শ্বে না দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে কক্ষে আগমন করিলেন। কবির বাহিরের পৃথিবীর দিকে কোনও লক্ষ্য নাই, অনবরত লেখনী তালপত্রের উপর লিখিয়া চলিয়াছে, একপার্শ্বে লিখিত তালপত্রের স্তূপ। কবিপ্রিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তাহার পরে নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। রচনার সময়ে কবি কক্ষে কাহারও উপস্থিতি সহ্য করিতে পারেন না, এমন কি বিলাসবতীর উপস্থিতিও নহে।

সেদিন অনুপস্থিত কবির সংবাদ গ্রহণার্থে দূত বারে বারে আসিয়া ফিরিয়া গেল। কবি কাব্যরচনায় নিমগ্ন, স্বয়ং অবন্তীশ্বরের আহ্বানেও কর্ণপাত করিবার সময় তাঁহার নাই। বিষণ্ণচিত্তে মহারাজ রাজকার্যসমাপনান্তে শঙ্কু, বররুচি প্রভৃতি অবশিষ্ট অষ্টরত্নের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। অসময়ে সভাভঙ্গ হইল।

মধ্যাহ্নের কয়েক দণ্ড পূর্বে রন্ধননিরতা প্রিয়ার নিকটে আসিয়া কবি কহিলেন, "বেলা অনেক হইয়াছে, না? কিছু বুঝিতে পারি নাই।"

কবিপত্নী সংক্ষেপে কহিলেন, "স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া আহার কর। তাহার পরে শুনিব কি লিখিলে।"

কিন্তু আহার সমাপ্ত করিয়া কবি পুনরায় লিখিতে বসিলেন। সন্ধ্যার প্রাকালে স্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া পুনরায় রচনা আরম্ভ করিলেন। কবির এহেন অবস্থা দেখিয়া কবিপত্নী কিঞ্চিৎ বিস্মিতা হইলেন, কারণ এতটা আত্মহারা ভাব তিনি পূর্বে কোনও দিন লক্ষ্য করেন নাই।

গভীর রজনীতে কবিপত্নী পুনরায় নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কবি কয়েকছত্র করিয়া লিখিতেছেন, এবং অনুচ্চ-স্বরে আবৃত্তি করিতেছেন। সহসা কবি পাঠ করিলেন,—

"তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ম্
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।—"

বিলাসবতী আর থাকিতে পারিলেন না। ঈর্ষ্যাপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "কে সে? কাহার জন্য এত বিরহোচ্ছ্বাস?"

কালিদাস চমকিয়া চাহিলেন। ক্ষণেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "তাঁহার নাম বিলাসবতী।"

"ইস্।"

"না প্রেয়সী। সে সত্যই বিলাসবতী।"

সজোরে শিরঃসঞ্চালন করিয়া কবিপ্রিয়া কক্ষত্যাগ করিলেন।

প্রভাতে কালিদাস কহিলেন, "প্রিয়ে, আমার কাব্যরচনা সমাপ্ত হইয়াছে।"

নিরুৎসুক কণ্ঠে কবিপত্নী কহিলেন, "উত্তম। মালিনীকে শুনাইয়া আইস।"

গম্ভীরমুখে কবি কহিলেন, "সে ত শুনিবেই, তাহার পূর্বে তুমি শুনিয়া লও।"

কাব্যের নাম মেঘদূত। কুবেরের নিকট গুরুতর অপরাধে অপরাধী এক যক্ষ শাস্তিস্বরূপ বর্ষকাল রামগিরি আশ্রমে নির্বাসন ভোগ করিতেছে। প্রিয়াবিরহে কাতর যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে গগনসমারূঢ় মেঘকে ডাকিয়া কহিতেছে, "ওগো, আমার সংবাদ অলকাবাসিনী আমার বিরহিনী পত্নীর নিকট বহন করিয়া লইয়া যাও।"

কালিদাস পাঠ করিয়া চলিলেন। রামগিরি হইতে অলকাপুরী বহু দূর পথে মেঘ যে সকল জনপদ গ্রাম নগরী অতিক্রম করিয়া যাইবে, তাহাদের অপূর্ব বর্ণনা। বিলাসবতী স্তব্ধ মুগ্ধ হইয়া শুনিলেন।

কিন্তু তাহার পরে আসিল উত্তরমেঘ। অলকাপুরীতে উপনীত হইয়া মেঘ কি দেখিবে সেই সব কথা। সে অপূর্ব দেশে জরামৃত্যু নাই, প্রণয়কলহ ভিন্ন অপর কোনও কারণে বিচ্ছেদ নাই, যৌবন ভিন্ন বয়স নাই। সেখানে রমণীগণ ভুবন-মোহিনী সুন্দরী। সেখানে পথে পথে অভিসারিকা সুন্দরী-গণের অলকচ্যুত মন্দারপুষ্প, পত্রচ্ছেদ, কর্ণস্খলিত কনককমল ও স্তনপরিসরছিন্ন মুক্তাহার তাহাদের নৈশাভিসারের পথ বলিয়া দেয়। সম্ভোগনিশান্তে প্রিয়তমের শিথিল বাহুবন্ধনের মধ্যে অবস্থিতা যুবতীর সুরতগ্লানি চন্দ্রকান্তমণিক্ষরিত জলকণার দ্বারা নিবারিত হয়। অপূর্ব সুখের সে দেশ।

কিন্তু হায়, সে দেশেই বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া রাত্রির পর রাত্রি শূন্যশয্যায় যাপন করিতেছে, বিরহবিশীর্ণা রুক্ষকেশা হতভাগিনীর দিবস কাটিতেছে দেহলীতে রক্ষিত পুষ্পশ্রেণী দ্বারা দিন গণনা করিয়া।

পরম সুখের দেশে পরম দুঃখিনী যক্ষপ্রিয়ার বর্ণনা শুনিয়া কবিপ্রিয়া অশ্রুবিসর্জন করিলেন। তাঁহার নিজের দীর্ঘবিরহের কথা তাঁহার মনে পড়িল, যে বিরহের আরম্ভ বাসর-রজনীতে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, মহাকাল দয়া করিয়াছেন, তাঁহার জীবনে কোনও দিন যক্ষপ্রিয়ার ন্যায় বেদনা আসিবে না।

কাব্য শেষ হইল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে কবি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাঁহার ললাটে চন্দন, বক্ষে নবলব্ধ রাজোপহার মুক্তাহার। কবি সার্থকশ্রম তবু কোথায় যেন অভাব, কোথায় যেন অসন্তোষ। তাঁহার সেই অদৃশ্য বেদনা কে বুঝিবে?

নিশীথে বিলাসবতী কহিলেন, "প্রিয়তম, তোমার যক্ষের বিরহবেদনার অবসান ঘটিয়াছে?"

বিষণ্ণ মুখে কালিদাস কহিলেন, "না প্রিয়ে, হতভাগ্য এখনও বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে।"

"তবে উপায়?"

সহসা যেন কোন্ আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কবি কহিলেন "উপায় পাইয়াছি।"

"কি?"

"প্রিয়ে, তুমি মাসদ্বয়ের জন্য পিত্রালয়ে গমন কর।"

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বিলাসবতী কহিলেন, "কেন?"

"প্রিয়ে, বিরহ শুধু বিচ্ছেদের ফলে হয় না। মিলনেও বিরহযন্ত্রণা আছে। তুমি বৎসরাধিককাল আমার নিকটে রহিয়াছ, আমি বিচ্ছেদমিলনের আনন্দ অনুভব করিবার সুযোগ পাই নাই। প্রিয়াকে প্রতিনিয়ত নিকটে পাইবার ফলে যে নিদারুণ বিরহ তাহারই যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি। তুমি মাস-দ্বয়ের জন্য দূরে থাকিলে আমি মিলনরূপ বিরহ হইতে অব্যাহতি পাইয়া বিরহমিলনের আনন্দ পাইব। তাহার পরে বিচ্ছেদান্তে মিলন ত আছেই।

কালিদাস সাগ্রহে পত্নীর মুখের দিকে চাহিলেন।

ক্ষীণস্বরে বিলাসবতী কহিলেন, "উত্তম, তাহাই হইবে।"

আনন্দিত কবি প্রিয়ার মুখচুম্বন করিয়া পার্শ্বপরিবর্তনপূর্বক শয়ন করিলেন এবং অচিরেই নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। শুধু কবিপ্রিয়া বিনিদ্র নয়ন আকাশের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি ত বিদুষী হইলেও কবি নহেন, এই দুই মাসের বিরহরূপ মিলনের অসহনীয় আনন্দ তাঁহার কেমন করিয়া কাটিবে।

বাংলাভাষার একখানি অধুনালুপ্ত মহাকাব্য

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, এম্-এ, কাব্যতীর্থ

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা দেশে এমন কয়েকজন প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাঁহারা প্রতীচীর ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়া মাতৃভাষার অভাবনীয় উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। যাঁহারা এইভাবে মাতৃভাষার কল্যাণে বা বঙ্গবাণীর সেবায় আপন প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, শ্রীমধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের অগ্রণী, শুধু অগ্রণী নহেন, এই যুগল পুরুষদ্বয়ই বাংলা-সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক। বাংলা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একটি যুগ নন, তিনি যুগ-স্রষ্টাও বটেন, কিন্তু মধুসূদনকে এক হিসাবে যুগস্রষ্টা না বলিয়া শুধু একটি যুগ বলাই সঙ্গত। কেননা, মধুসূদন যেমন কাব্য-সাধনায় কোন প্রাক্তন বঙ্গীয় কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই, তেমনই পরবর্ত্তী কালে বাংলার কোন কবি মধুসূদনের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া বাণী-সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা মধুসূদনের প্রতিভার অনন্যসাধারণত্বেরই নিদর্শন। কিন্তু আজ আমরা এমন একজন কবির সম্বন্ধে আলোচনা করিব, যিনি এই দুরূহ-পথে বিচরণ করিতে ভীত হন নাই এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে দুই খানি মহাকাব্য রচনা করিয়া কবিযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা 'হেলেনা কাব্য' ও 'ভারতমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কবি আনন্দচন্দ্র মিত্রের কথা বলিতেছি।

'হেলেনা কাব্য' কবি আনন্দচন্দ্রের রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। মহাকবি হোমারের 'ইলিয়াদ' (Iliad) কাব্যের আখ্যান-বস্তু অবলম্বনে এই মহাকাব্যখানি রচিত হইয়াছে। কাব্যখানি ত্রয়োদশ সর্গে বিভক্ত এবং আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এই কাব্যখানি প্রকাশিত হইলে বাংলার কাব্যামোদী পাঠকসমাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বান্ধব, এডুকেশন গেজেট, ভারত সংস্কারক, ভারত মিহির প্রভৃতি সাময়িক পত্রে কাব্যখানি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। আমরা আজ এই মহাকাব্যখানি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে কবি আনন্দচন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্য-হইতেই কাব্য ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কাব্যসমূহ তিনি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন [illegible]বং শিক্ষকতা কার্য্যকে জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করেন। [illegible]ডুকেশন গেজেটে'র সমালোচনা হইতে জানা যায়, কবি [illegible]ন্দচন্দ্র 'শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া এবং দুইখানি উৎকৃষ্ট [illegible]দক ও সাপ্তাহিক পত্রের প্রধান লেখকের কার্য্য নির্ব্বাহ [illegible]য়াও তিন মাস মধ্যে এই কাব্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন'। ইহা [illegible]য়ই তাঁহার অসাধারণ কবিপ্রতিভার পরিচায়ক।

'হেলেনা কাব্যের' টীকাকার শ্রীনাথ বাবু সংক্ষেপে ইলিয়াদ [illegible]ব্যের আখ্যানবস্তু এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:

'ইদানীন্তন এশিয়া মাইনর নামক প্রদেশে পুরাকালে [illegible]ম নামে এক প্রভূত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। প্রায়াম [illegible] প্রবল প্রতাপান্বিত এক নরপতি সেই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। প্রায়াম রাজের প্যারিস নামে এক রূপগুণসম্পন্ন পুত্র ছিল। ঘটনাসূত্রে প্যারিস য়ুনানী দেশের স্পার্টা রাজ্যের রাজধানীতে কতককাল অবস্থিতি করে এবং স্পার্টারাজ মানিলুসের রূপবতী পত্নী হেলেনাকে লইয়া স্বদেশে পলায়ন করে। এই জাতীয় কলঙ্কে উদ্বেজিত হইয়া, য়ুনানী দেশের রাজন্য ও বীর পুরুষগণ বৈরনির্যাতন মানসে ইলিয়ম রাজ্য আক্রমণ করেন। বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও প্রায়াম রাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হেক্টরের বলবীর্য্য-প্রভাবে তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হেক্টর সংগ্রামে নিহত হইলে, তাঁহারা ইলিয়ম রাজ্যের রাজধানী ট্রয়নগর অবরোধ করেন। সমাগত রাজন্যবর্গ মধ্যে ইথাকা রাজ্যের অধিপতি মহাবুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহারই কুটবুদ্ধি প্রভাবে ট্রয়নগর শত্রুদিগের হস্তগত এবং ভস্মীভূত হয়।'

হেলেনা কাব্যের প্রারম্ভে কবি আনন্দচন্দ্র কবিগুরু হোমারের প্রশস্তি গান করিয়াছেন।

"কি কাজ বাজায়ে আর সুষুপ্ত ভারতে
তূরী ভেরী পাঞ্চজন্য আশার ছলনে!
আর কি জাগিবে কেহ, আর কি গাইবে
বীরগাথা, বীররসে ভাসিবে উল্লাসে!
কিংবা মৃতপ্রাণ আমি বিহীনশকতি
কি গুণে গাইব হায়! বীরকীর্ত্তিভরা
সে মহাসুর সঙ্গীত? গাইলেন যাহা
সুরচিত্তসুখকর বীণাযন্ত্র করে,
হেলেনার অন্ধ কবি দৈববলে বলী!
উঠিত জলদপথে যার প্রতিধ্বনি
অমৃত লহরীসম অম্বর পুরিয়া
আবেশে কাঁপিত বিশ্ব, নব রসে মাতি
বরষিত পুষ্পাসার সুরকুলাঙ্গনা।'

তারপর, কবি আনন্দচন্দ্র শ্রীমধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'দেবী কবিতেশ্বরী' ও 'ভবজন মনোলোভা প্রিয়ংবদা কল্পনা'র আবাহন করিয়াছেন। অতঃপর সংক্ষেপে বিষয় বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন।

কাব্যের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই ইলিয়মে অধীশ্বর প্রায়াম রত্নসিংহাসনে নীরবে সমাসীন রহিয়াছেন তাঁহার বিশাল সভায় কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না এমন সময় রাজদূত সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলে[illegible] 'আজ আমাদের ভাগ্যদোষে গ্রীকগণ অরাতির বেশে এই পুণ্য ভূমি ইলিয়মে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আজ লাঞ্ছিত অপমানিত তাই আমাদের অন্তরে প্রতিহিংসার অনল জ্বলি[illegible] উঠিয়াছে।' রাজাকে সম্বোধন করিয়া দূত বলিতেছেন,

তেজবীর্য্য প্রবাহিত যার
হৃদয়কন্দর তলে, কেমনে সে সহে
অপমান? ধিক্ ধিক্ শত ধিক তারে
নিস্পন্দ নিশ্চল যেই পরপদাঘাতে।

নহে ক্রুদ্ধ মৃগরাজ পাষাণ-চাপনে,
স্থিরচিত্ত ; হেরি হরি শার্দ্দূল-ভ্রুকুটি,
ধরাধরদেহ রোষে নখরে বিদারে।
প্রশান্ত, কুঞ্চিত ফণী শিশিরসম্পাতে,
উগারে অনলশিখা পুচ্ছ পরশনে।'

এইরূপ অনেক স্থানেই আমরা কবির লিপি-কুশলতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই। কবি অলঙ্কারের প্রয়োগে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তাই কাব্যখানি কোথাও অলঙ্কারের অপপ্রয়োগে বা বাহুল্যে দুষ্ট বা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই। 'ইন্দুমুখী ইন্দিরার ইন্দীবর আঁখি' প্রভৃতি বহু ছত্রে অনুপ্রাসের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

হেলেনা কাব্যের বহু স্থানে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা বলিতে পারি, কাব্যের তৃতীয় সর্গে ইলিয়মের অধীশ্বর প্রায়ামের বিলাপ অনেকটা রাবণের বিলাপের অনুরূপ। ইলিয়মের বীরপুত্র হেক্টরের চরিত্রও অনেকটা মেঘনাদের আদর্শে পরিকল্পিত। তথাপি, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইহাতে কাব্যখানির সৌন্দর্য্য-হানি হয় নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের প্রতি সারণের প্রবোধ বাক্য সকলেই পাঠ করিয়াছেন। হেলেনা কাব্যে ইলিয়ম-অধীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রী বলিতেছেন,

'সুখ দুঃখ চক্রসম ফিরে
এ ব্রহ্মাণ্ডে ; সুশোভিত কত শত তারা
প্রদোষে আকাশভালে, ক'টি মাত্র রহে
নিশান্তে ? বসন্তে শোভে কানন সুন্দর,
থাকে কি সৌন্দর্য্য তার নিদাঘ দাহনে ?'

মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গে মায়াদেবী নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণকে কপট-সমরে সাহায্য করিতেছেন এবং তাঁহাকে সর্ব-প্রকার বিঘ্ন-বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। 'হেলেনা কাব্যে'র ষষ্ঠ সর্গেও ত্রিদশ-ঈশ্বরী বামদেবী (ট্রয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) মায়াদেবীকে স্মরণ করিলে মায়াদেবী তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে মায়াদেবী হিন্দু পুরাণের আদর্শে কল্পিত হইয়াছে। কবি এখানে কাব্যের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন,

'বয়সে নাহিক সীমা, মায়া সে রূপসী
তথাপি ষোড়শীসমা ! দেখিয়াছে ধনী
ক্ষণিক বুদ্বুদসম সহসা মিশিতে
কত যে প্রলয়সৃষ্টি কালসিন্ধু জলে
কত শত শত বার ; খেলিছে আবার
সদ্যোজাত শিশু সহ, সাজি মায়াবিনী
কোমল বালিকারূপে, খল খল হাসি !'

বামদেবীর প্রতি মায়াদেবীর উক্তির মধ্যেও উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ও তত্ত্ব-দৃষ্টি একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

'অহোরাত্র কালের চর্ব্বণে
চূর্ণিত এ চরাচর নশ্বর সংসারে।
মন্ত্রবশে যাদুকর ভুলায় যেমতি
দর্শকে, তেমতি দেবী, ভুলাই মানবে ;
সাজাই প্রত্যহ ধরা ; ধূলিমুষ্টি দিয়া
রচি কত রত্নরাশি ; সিঞ্চিলে কাননে
মৃখামৃত ; বনস্থলী হাসে ফুল ফলে ;
একটি রতন দেখি, বসাই পূরবে,
তেঁই সে নূতন ভানু জ্বলসে গগনে।
ছায়াবাজি এ সংসার দেবের নয়নে,
প্রকৃত পদার্থভ্রমে মানব নেহারে !
পতিপ্রেম, পুত্রশোক, সংলাপ-বিলাপ
সকলি আমার খেলা দেবের প্রসাদে।'

কাব্যের অন্যান্য স্থানেও এই তত্ত্ব-দৃষ্টির পরিচয় আছে,

'বলিহারি বিধাতারে, নিশার স্বপন
জীবলীলা, তাহে পুনঃ স্বপ্নের রচনা' !

—(সপ্তম স

কবি বলিতেছেন,—আমাদের এই জীবনটাই একটা বি স্বপ্ন, আবার এই স্বপ্নের মধ্যেও আমাদের মন কত স্ব জাল রচনা করে—ঘুমন্ত অবস্থায়ও আমাদের মন সময় স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করে এবং বিচিত্র সুখ দুঃখ অনুভব করে

কবি প্রায়ামের পুত্র হেক্টরকে যেমন মেঘনাদের আ চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনি হেক্টর-পত্নীকে বীরাঙ্গনা প্রমী আদর্শে অঙ্কিত করিয়াছেন। কাব্যের নবম সর্গে হিরণ বধ বা হেক্টর-বধের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। হেক্টর-ব পর ইন্দুমুখী বা এ্যাণ্ড্রোম্যাকি স্বয়ং সংগ্রামে যাত্রা করিয়াছে এখানে অবশ্য প্রমীলার সঙ্গে ইন্দুমুখীর পার্থক্য আ মেঘনাদের মৃত্যুর পর প্রমীলা পৃথিবীর মত সর্ব্বংসহা মূ আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছেন। মেঘনাদের চি প্রাণ-বিসর্জ্জন কালেও তাঁহার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। কবি আনন্দচন্দ্রের 'হেলেনা কাব্যে' দেখিতে পাই, হেক্টর-ব পর ইন্দুমুখী বীরাঙ্গনাগণের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন।

'আঁধার যামিনীযোগে, সমর-প্রাঙ্গণে
চলিলা ত্রিদশাঙ্গনা, বিদ্যুল্লতা যেন
শত শত প্রবাহিত প্রদোষ গগনে !
প্রকাণ্ড মশাল ধরি শত বরাঙ্গিণী
ধায় আগে, উজলিল উল্কারাশি যথা
দিগঙ্গনাদল করে ! ঘুরায় কেহবা
আস্ফালি ত্রিশূল-অসি ; রোপিয়াছে কেহ
চক্রাকারে শরজাল কবরী-মাঝারে
দীপ্তিমান ; বেণীমূলে বাঁধিয়া কেহবা
ভীম ধনু, ভীমা রামা মত্ত বীররসে !'

অবশ্য, ইন্দুমুখীও যে পরে পতির চিতায় আত্ম দিয়াছিলেন, কবি পরবর্ত্তী সর্গে সে কথা কৌশলে আমা বলিয়াছেন।

কাব্যের দশম সর্গে দেখিতে পাই, বিশ্বাসঘাতিনী ে তীব্র অনুতাপের অনলে দগ্ধ হইতেছেন। কবি এই আমাদিগকে নীতিকথা শুনাইয়াছেন—

'অলঙ্ঘ্য বিধির বিধি ; মত্ত পাপাচারে
যে জন, তাহার প্রাণ অবশ্য দহিবে
অনুতাপানলে শেষে।'

একাদশ সর্গে কবি একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়া-ন। হিরণ্যক (হেক্টর) ও অকিলিস (Achilles) উভয়েই শ্রেষ্ঠ; তাঁহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া নিহত য়াছেন ও স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রাম-স্পৃহা তখনও মিটে নাই। তাই তাঁহারাও বৈজয়ন্ত-মেও দেবতার আশীর্ব্বাদে নরদেহ ধারণ করিয়া পরস্পরকে গ্রামে আহ্বান করিলেন, আর তাঁহাদের রণ-কৌশল দেখিয়া রবৃন্দ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। তাঁহারা দেবরাজের শীর্ব্বাদে সৈনিকের পদ প্রাপ্ত হইলেন,—সেই সুরসৈনিক-র হস্তে দেবদুর্গরক্ষার ভার অর্পিত হইল।

কাব্যের শেষ সর্গে আমরা দেখিতে পাই হেলেনার রূপের লে ট্রয়নগর ভস্মীভূত হইয়াছে, আর যাঁহারা ট্রয়নগর ক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রীকগণের পক্ষেও শ্রেষ্ঠ বীরগণ ত হইয়াছেন। কবি পুনরায় আমাদিগকে নীতিকথা াইতেছেন—

'ধিক রে মন্মথ তোরে! শত ধিক তারে
তোর অনুচর যেবা! কিংবা তোর শরে
বিদ্ধ যেবা; বুদ্ধিশুদ্ধি দেয় জলাঞ্জলি
তোর পদে, পরে পদে ভুজঙ্গের বেড়ি;
পাসরি যথার্থ তত্ত্ব মত্ত পাপাচারে,
অবোধ, পতঙ্গসম প্রবেশে অনলে।'

'হেলেনা কাব্যে' এইরূপ কবি-প্রতিভার প্রচুর নিদর্শন আছে, তথাপি মনে হয়, কাব্যের বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচনে কবি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। কবি যদি বৈদেশিক মহাকাব্য হইতে বিষয়-বস্তু গ্রহণ না করিয়া ভারতীয় মহাকাব্য বা পুরাণ হইতে আখ্যান-বস্তু সংগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এই মহাকাব্যখানি এত অল্পকালের মধ্যে বিস্মৃতি সলিলে ডুবিয়া যাইত না। কবি অবশ্য বৈদেশিক আখ্যান-বস্তুকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া কাব্যখানিকে বঙ্গীয় পাঠকগণের মনঃপূত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, বৈদেশিক নামগুলিকে পর্য্যন্ত যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া দেশীয় কাল্পনিক নাম সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, যথা 'ট্রয়ের' স্থানে 'ত্রিদশ', 'হেক্টরের' স্থানে 'হিরণ্যক', 'এ্যাণ্ড্র্যোম্যাকি'র স্থানে 'ইন্দুমুখী' প্রভৃতি। তথাপি এ কথা বলিতে হয় যে, 'হেলেনা কাব্য' আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিলেও আমাদের হৃদয়ের মর্ম্মমূলকে গভীর ভাবে আলোড়িত করে না। কবি আনন্দচন্দ্র যদি মধুসূদন বা হেমচন্দ্র অথবা নবীনচন্দ্রের মত কাব্যের বিষয়-বস্তুর জন্য আমাদের দেশের কোন প্রাক্তন সুরি বা কবির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, তবে কাব্যখানি অধিকতর উপাদেয় হইত, সন্দেহ নাই। তথাপি, এই মহাকাব্যখানি যাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মনীষী ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করিবেন যে,—'যে সকল আধুনিক কাব্য বাংলা ভাষার কণ্ঠমালার আভরণ-স্বরূপ গ্রথিত হইতেছে, এখানি নিশ্চয়ই তন্মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য।'

'এলকহল'

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

রিট বা মদ অতি আদিকাল হইতে হিন্দুরা ব্যবহার করিয়া সিতেছেন। বেদে ইহার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ উঁহারা য ও ঔষধ হিসাবে অতি সংযতভাবে ইহা ব্যবহার রতেন। অন্যান্য রূপ ব্যবহার ছিল কি না বলা কঠিন। স্কৃত প্রণালীতে ইহা তৈয়ার হইত, বর্ত্তমান রসায়ন সম্মত ন সুষ্ঠু প্রণালী ইহার পিছনে ছিল কি না সন্দেহ। সে যাহা ক, বর্ত্তমানে মদের স্থান কোথায় আমাদেরও ভাবিবার াজন হইয়াছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় মদকে গর দোসর বলা যায়। এত বড় অত্যাবশ্যক তরল পদার্থ কমই আছে। যুদ্ধের বাজারে একমাত্র আমেরিকাতে গত রে ৬৪০,০০০,০০০ গ্যালন মদ প্রস্তুত হইয়াছে। পান য়া আনন্দসাগরে হাবুডুবু খাইবার জন্য নিশ্চয়ই এই সুরা-উঁহারা তৈয়ার করেন নাই। বৈজ্ঞানিক মতলবের নাই। সহস্র ব্যাপারে ইহাকে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা াছে।

স্পিরিট বলিতে আমরা ইথাইল এলকহলকে (Ethyl hol) বুঝিয়া থাকি। ইহারই একটি নাম শিল্প এলকহল dustrial alcohol)। কেহ কেহ ইহাকে ইথানল hanol) বলেন। বাজারে পানীয় হিসাবে যে সমস্ত ওয়া যায় সে সকলই ইহার এক একটি সংস্করণ। ম, হুইস্কি, শেরি প্রভৃতি ইহাদের নাম।

আজকাল ঔষধ হিসাবে ইহার বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। যত সব টিনচার, নির্য্যাস, নার্ভ টনিক-এর প্রধান অবলম্বন এই এলকহল। এসেন্স, ভার্নিশ, গার্গল প্রভৃতিতেও ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে।

যুদ্ধের ক্ষুধা মিটাইতে ইহার চাহিদা যে কি বিরাট্ তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। প্রত্যেকটি যুদ্ধরত জাতির প্রাণ যেন ঐ এলকহলেই রহিয়াছে। ইহা দ্বারা রবার, গোলা-বারুদ, অবেদন পদার্থ (anaesthetics), বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি অনেকগুলি যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারী হয়। দুই বৎসর পূর্ব্বেও কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই যে ভারে ভারে মদ রবারের সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করিবে। প্রত্যেকটি সামরিক জাতি সিন্‌থেটিক রবার প্রস্তুতির জন্য প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছেন। একমাত্র আমেরিকা ১৯৪৪ সনে ৩৩০,০০০,০০০ গ্যালন এলকহল হইতে ৮২৫,০০০,০০০ পাউণ্ড রবার প্রস্তুত করিয়াছে। উক্ত রবার হইতে অন্ততঃপক্ষে ৮০০,০০০টি উড়ন্ত কেল্লা, অথবা ৪০০,০০০টি ট্যাঙ্ক, অথবা ৭২০,০০০,০০০টি মোটর গাড়ীর টায়ার, টিউব তৈয়ার হইয়াছে। বর্ত্তমানে রবার তৈয়ার করিবার যতগুলি সিন্‌থেটিক প্রণালী আছে তন্মধ্যে এলকহল দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা সত্বর রবার প্রস্তুত হয়।

যুদ্ধের জন্য এলকহলের দ্বিতীয় ব্যবহার নাইট্রো-সেলুলোজকে (nitro cellulose) জলমুক্ত করা। ইহা একটি বিস্ফোরক

পদার্থ—যুদ্ধের একটি প্রাণশক্তি। যতক্ষণ ইহাতে জল থাকে ততক্ষণ ইহার বিস্ফোরণ-ক্ষমতা লুপ্ত থাকে—একমাত্র এলকহলই সুষ্ঠুভাবে ঐ জলকে দুরীভূত করিতে পারে। ১০০ টন ধূমহীন চূর্ণ বা নাইট্রো-সেলুলুজকে তৈয়ার করিতে ৮০ টন এলকহল-ইথার দরকার হয়। এক গ্যালন এলকহল দ্বারা যে চূর্ণ তৈয়ার হয় তাহা দ্বারা একটি পদাতিক সৈন্যের এক বৎসরের বারুদ মিলিয়া থাকে। মার্কারী ফুলমিনেট (Mercury fulminate) নামক অপর একটি বারুদও এলকহলের সাহায্যে তৈয়ার হয়। মাষ্টার্ড গ্যাস নামক বিষাক্ত গ্যাসটী ইহারই একটি চরম পরিণতি। বিষাক্ত গ্যাসাস্ত্ররূপে ইহার যথেষ্ট বাহাদুরি আছে।

এতদ্ব্যতীত যুদ্ধোপকরণ হিসাবে আরও কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ এলকহল হইতে প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধের চাহিদা মিটাইয়া থাকে, যেমন—ক্লোরোফরম, সেলুলুজ প্লাসটিক, ফটোগ্রাফ ফিল্‌ম্‌, পেণ্ট, ভার্ণিশ, রঞ্জক, ঔষধ, সাবান, কালি ইত্যাদি। অবশ্য উহারা অসামরিক ব্যাপারেও নিত্য-ব্যবহার্য্য। এলকহলের আর একটা গুণ এই যে, ইহা দরকার মত পেট্রোলের স্থানও দখল করিতে পারে, অথবা পেট্রোলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ব্যবহৃত হয়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকায় এলকহল মাতগুড় হইতে বেশী প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমানে গমই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। ভুট্টা, চাউল, আলু ইত্যাদি হইতেও ইহার প্রস্তুতি চলিতেছে। সাধারণ তৈয়ার প্রণালী এই :—গম, চাউল, বা আলুকে প্রথমতঃ বাছাই, পরিষ্কার ও অতি ক্ষুদ্রাকারে চূর্ণ করা হয়। এই চূর্ণকে প্রকাণ্ড পাত্রে গ্রহণ করিয়া চাপ ও তাপ সংযোগে ১৫০° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। তৎপর জল-মিশ্রণান্তে ডায়াস্টেজ (Diastase) ও মল্টেজ (Maltase) নামক দুইটা এনজাইন-এর সহায়তায় চাউল প্রভৃতির শ্বেতসারকে গ্লুকোজে পরিবর্ত্তিত করা হয়। এই প্রস্তুত পদার্থকে 'ম্যাস' (Mash) বলে। ম্যাসকে তখন লম্বা নল দ্বারা অপর পাত্রে চালিত করিয়া ইষ্ট (Yeast) নামক এক প্রকার অতি নিম্নস্তরের জীবাণু দ্বারা মিশ্রিত করা হয়। ইষ্ট ক্রমশঃ গ্লুকোজকে এলকহলে পরিণত করে।

এই ইষ্টের সাহায্যে গ্লুকোজ হইতে মদ তৈয়ারীকে বলে ফারমেণ্টেশন। সাধারণতঃ ফার্মেণ্টেশনের সময় তাপমান থাকে ২৫°-৩০° ডিগ্রি। ইহা দুই তিন দিন ব্যাপিয়া চলিয়া থাকে এবং শেষে আমরা পাই শতকরা ৭-৯. ভাগ মদ। অবশেষে ইহা চুয়াইয়া শতকরা ৯৫ ভাগ মদ প্রস্তুত হয়।

উল্লিখিত প্রথাটি সাধারণতঃ সর্ব্বত্র অবলম্বিত হয় এবং বর্ত্তমানে আমাদের দেশেও ঐ প্রণালীতেই প্রত্যেক ডিষ্টিলারীতে মাতগুড় হইতে মদ প্রস্তুত হয়। অবশ্য মাতগুড় উপকরণ হইলে ডায়াষ্টেজ ও মল্টেজের ক্রিয়াটি বাদ পড়ে।

বর্ত্তমানে সিন্‌থেটিক এলকহল প্রস্তুতির প্রণালীও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোল গ্যাস অথবা পেট্রোলিয়াম গ্যাস এ প্রণালীর জননী। একমাত্র আমেরিকাতেই উক্ত প্রণালীতে ৬০-৭০ মিলিয়ান গ্যালন সুরা তৈয়ার হইতেছে। রাসায়নিকের দিক দিয়া একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে কোল গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামে অবস্থিত ইথিলিন (Ethylene) ও এসিটিলিন (Acetylene) গ্যাসদ্বয়ই নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া এলকহল-রূপ ধারণ করে। দেখা গিয়াছে, যে-কোন গাছগাছড়া হইতে মদ তৈয়ার সম্ভব হইতে পারে, মাতগুড়ের অভাবে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই খড় কুটা ও অন্যান্য সেলুলুজ পদার্থকে এলকহলে পরিণত করা হইবে। এই সেদিন পর্য্যন্তও অবশ্য এই প্রণালী ততটা লাভজনক হয় নাই। কারণ এলকহলের পরিমাণ কাঠের তুলনায় অত্যন্ত কম হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানায় ১ টন কাঠ হইতে মাত্র ২০ গ্যালন মদ পাইয়াছে। বর্ত্তমানে আমেরিকায় জার্ম্মানীর আবিষ্কৃত একটি প্রণালী অবলম্বন দ্বারা উহা দ্বিগুণে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

সস্তায় এলকহল তৈয়ারী করিবার আমেরিকায় আর একটি নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। কাগজ প্রস্তুতিতে কাঠমণ্ড তৈয়ার করিয়া যে পরিত্যক্ত তরল পদার্থ থাকে তাহাতে প্রচুর সেলুলুজ পাওয়া যায়। এই অকেজো সেলুলুজ এখন শর্করা ও সুরাকারে পরিণত হইয়া দুনিয়ার চাহিদা মিটাইবার আর একটি সুন্দর পথ প্রস্তুত করিয়াছে। প্রতি টন মণ্ড হইতে উহারা ১৮ গ্যালন মদ পাইয়া থাকে।

শেষগান

শ্রীউষারাণী দেবী

(*When I am dead my dearest*—C. G. Rossetti)

যবে মরণের ঘন আঁধারের মাঝে
হবে মোর অবসান,
আমারে স্মরিয়া ওগো প্রিয়তম,
গেয়ো না দুখের গান।
ঝরা-গোলাপের ফুলডালি দিয়ে,
সমাধি-শিয়র দিও না সাজিয়ে,
শুষ্ক ছায়ায় শেষযাত্রায়—
করিব না অভিমান।

ধরণীর বুকে ঝরিয়া ঝরিয়া
পড়িবে শিশির-জল,
কোমল গালিচা বিছাইয়া দিবে
সবুজ দূর্ব্বাদল।
যদি সাধ জাগে রেখো মোরে মনে,
ভুলো—যদি চায় প্রাণ।
দিগন্তকোলে ঘনাইবে ছায়া,
বাদলধারার ছন্দের মায়া,
অনুভবহারা বাজিবে না কানে
করুণ পাপিয়া তান,
গোধূলির মাঝে জীবনের সাঁঝে
ভুলিব প্রেমের গান।

হিন্দী গেঁয়ো-কবি

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

কিছু কাল পূর্ব্বে আমি একবার কার্য্যোপলক্ষে যুক্তপ্রদেশে গিয়েছিলুম। মির্জ্জাপুরের হিন্দোলা উৎসব দেখে ও কাজরী গান শুনে বাস্তবিকই আনন্দিত হলুম। তার পরে রায় বেরেলী ও উনাউ জেলার কয়েকটা গাঁয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল।

সেখানে দেখলুম প্রায় প্রত্যেক সমৃদ্ধ গ্রামে একজন বা ততোধিক গেঁয়ো-কবি আছেন। তাঁদের কাজ হ'ল মুখে মুখে নানা ধরণের কবিতা রচনা ক'রে সকলকে শুনিয়ে আনন্দ দেওয়া, তার বদলে তাঁরা কিছু অর্থ ও অন্যান্য প্রকারের উপঢৌকনও পেয়ে থাকেন।

বলা বাহুল্য, গেঁয়ো-কবিদের রচিত কবিতা ভাষা ও শব্দ-সম্পদে খুব সমৃদ্ধ না হলেও তা আধুনিক রুচি-বিরোধী নয় এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-রসিকদের নিকটেও তা সমাদৃত হবে এরূপ আশা করা যেতে পারে।

কবিতা এঁরা রচনা করেন বেশীর ভাগ দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা, জননায়কের পরলোক-প্রয়াণ, অথবা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বিলাসী ব্যক্তিদের নিয়ে; এবং তা ছাড়া বিগত ও বর্ত্তমান যুগের আচার-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি নিয়েও এঁরা বিস্তর কবিতা মুখে মুখে রচনা করেন।

একজন কবি দুশো থেকে পাঁচশো বা তারও বেশী কবিতা আবৃত্তি ক'রে যেতে পারেন এবং যে কবি যত বেশী কবিতা আওড়াতে পারেন তাঁর প্রশংসা ও পুরস্কার লাভও তত বেশী হয়ে থাকে।

জননায়ক মোতীলাল নেহরুর পরলোকগমন নিয়ে রচিত একটি কবিতা একজন কবি আমাকে শোনালেন। সেটি এই—

> ফুঁক ইস্ লালা কো না ফুঁকো দুখিয়োঁ কা তন,
> সুখসে হমারী গোদ হি মেঁ ইসে সোনে দো;
> তড়প রহা থা করণ কো স্বতন্ত্র মুঝে,
> আজ ইস্‌কী স্বতন্ত্রতা মে তড়প না হোনে দো;
> পয়ঁতিশ করোড় দুখিয়োঁ কি অশ্রুধারা বীচ
> ভারতকে সীনে কে টুটেলে দাগ্ বোনে দো;
> ছেঁড়ো মৎ কোই জরা দের হমে
> আজ মোতীলালকে জনাজে পর রোনে দো।

ভারত-মাতা বলছেন, আমার এই ছেলের মৃতদেহ আমার এই কোলেই পড়ে থাক্, আমার অঙ্কেই সে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাক, তার শব আর দাহ ক'রো না। যার আত্মা দেশকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন করতে সর্ব্বদা সতৃষ্ণ হয়ে রয়েছে, যার চিত্তের একমাত্র কাম্য ছিল দেশে স্বতন্ত্রতা আনয়ন করা, তাকে আজ স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাকতে দাও। পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর অশ্রুধারায় আমার বক্ষের ক্ষত আজ ধুয়ে যাক। আজ আমাকে বারণ ক'রো না—আমাকে মোতীলালের শবের পাশে বসে প্রাণভরে কাঁদতে দাও।

মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের সাড়া ওদেশে গ্রামে গ্রামে কি উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল তা নিম্নলিখিত কবিতাটি থেকে কতকটা উপলব্ধি করা যায়। মা ছেলেকে সত্যাগ্রহ করতে পাঠাচ্ছেন—

> যদি যাতে হো সত্যাগ্রহমেঁ,
> তো বিপত্তি সে ঘবড়ানা নহী,
> প্রিয় মোহকে ফন্দন মেঁ ফঁসকর,
> পগ পিছে জরা ভী হটানা নহীঁ,
> সুখ কালিক তাত্ লগাকরকে,
> নিজ মাতাকা দুধ লজানা নহীঁ,
> সরিতা বহা ত্যাগ কি দেনে রহী,
> বিন্ জিন্দে স্বরাজ্য ঘর আনা নহী।

যদি একান্তই সত্যাগ্রহে যোগদান করতে যাচ্ছ তবে বিপত্তি দেখে আতঙ্কিত হ'য়ো না; মহা বিপৎপাতেও যেন তোমার সঙ্কল্প অটল থাকে। প্রিয়জনের ও সংসারের মোহমায়া যেন তোমাকে বিচলিত না করে এবং সংগ্রামে না পিছিয়ে দেয়। আমি তোমাকে স্তন্যদুগ্ধ খাইয়ে মানুষ করেছি—তার অবমাননা যেন না হয়। সর্ব্বস্বত্যাগী হতে হবে—ত্যাগের নদী যেন বয়ে যায় আর স্বরাজ না নিয়ে যেন বাড়ীতে ফিরে এস না।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন দেশে নেতাদের মধ্যে দলাদলি, ঐক্যের অভাব ও কলহপ্রিয়তা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্ষুণ্নমন হয়ে এক বাণী প্রচার করেন তখন তা সমস্ত ভারতবর্ষকে আলোড়িত ও সচকিত করেছিল। যুক্তপ্রদেশের ক্ষুদ্র গ্রামে বসে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল—

> বাঢ়ে চহুঁ ওঁর হৈঁয় অনর্থ ঘনঘোর অতি,
> স্বারথ কে মারগ মেঁ ওঁর বঢ় জানে দো,
> অত্যাচার, অনাচার, দুরাচার হোনে দো,
> পাপ ঘট ইনকে আখো সে ভর জানে দো।
> কহত রবীন্দ্রনাথ করিকয় অহিংসাব্রত,
> শান্তি উপদেশ বিশ্ব বীচ্ সরসানে দো,
> করি কুরওয়ান জান বেশ পর সুজান মান
> শান্ রহে হাঁথ সে স্বতন্ত্রতা ন জানে দো।

দেশের চারদিকে অত্যাচার, অনাচার ও দুরাচারে ভরে গিয়েছে। দেশের সেবা না করে স্বার্থ সেবায় সবাই নিমগ্ন—পাপের ঘট পূর্ণ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, একমাত্র অহিংসা ব্রতই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে এবং অহিংসাব্রত উত্থিত শান্তির বাণী যেন আমরা বিশ্বের দরবারে বয়ে নিয়ে যাই। যাতে আমাদের দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকে তারই প্রাণপণ চেষ্টা থেকে যেন আমরা বিরত না হই।

ধূসর সেই দিনগুলি

অনুবাদক : শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

[কারেল কাপেক একজন চেক সাংবাদিক ও নাট্যকার। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। গত প্রথম মহাসমরের সময় তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত নাটক 'রসাম্‌স ইউনিভার্সাল রোবট্‌স' বের হয়। এই অংশটি তাঁর "Those Grey Days"-এর অনুবাদ।]

* * *

প্রভাত দীপ আর সন্ধ্যা দীপের মধ্যেকার সময়টুকু চ'লে যায় কি অসম্ভব দ্রুতবেগে! তুমি হয়ত যাচ্ছ তোমার কাজে বস্‌তে, অমনি ডাক পড়ল নৈশ ভোজনের। তার পর রাত্রি নাম্‌ল, আর এলোমেলো স্বপ্নগুলি একটু গুছিয়ে নেবার আগেই গেল মিলিয়ে। আবার গত কালের মত সংক্ষিপ্ত, একঘেয়ে আর একটা দিন আরম্ভ করতে হবে। তাই তুমি জ্বালিয়ে দিলে সকালের আলো। চিঠিপত্রের গোড়ায় একটা নতুন তারিখ বসাতে অভ্যাস হয়ে যাবার আগেই সে এসে পড়ে। নববর্ষের প্রভাত আর নববর্ষের সন্ধ্যার মধ্যে সময় হু-হু ক'রে কেটে যায়!

জানি না কি ক'রে তা সম্ভব হ'ল, কিন্তু আমাদের ছেলেবেলার দিনগুলো ছিল আরও বড়বড়। হ্যাঁ, তার আর কোনো সন্দেহ নেই। বোধ হয় যুদ্ধের সময় যখন আমরা সব রকমে ঠক্‌তাম, তখন দিনগুলোও আমাদের ফাঁকি দিয়ে থাকবে। কিম্বা হয়তো পৃথিবীটা আরও দ্রুতবেগে ঘুরছে, আর ঘড়িগুলো বাজছে আরও তাড়াতাড়ি। কিন্তু এটা ঠিক, যে, দিন ছোট হলেও আগে সন্ধ্যাবেলা যেমন শ্রান্ত হতাম, এখনও ঠিক তেমনি শ্রান্তই হই। হ্যাঁ, এটুকু আমি বেশ ভাল ভাবেই জানি যে দিনগুলো তখন ছিল আরও বড়। কেন! আমি যখন আরও ছোট ছিলাম, মনে হ'ত সেগুলি যেন অনন্ত। মনে হ'ত, তারা যেন এক একটা বিশাল হ্রদ, যার তীরগুলো এখনও রয়েছে অনাবিষ্কৃত। দিনের প্রারম্ভে পুরো পালে যেন তার ওপরে দিতাম পাড়ি, তারপর আর ঘণ্টামিনিটগুলোর হিসাব করা অসাধ্য হ'ত, এতই মহিমামণ্ডিত হ'য়ে পড়ত তারা। প্রত্যেকটি দিন ছিল এক একটা সমুদ্রযাত্রা, এক একটা বিজয় অভিযান, অনুভূতি, দুঃসাহস ও কর্মময় এক একটা জীবনের তুল্য! ইলিয়ম-এর মত সুদূর বিক্ষিপ্ত, এক একটা বৎসরের মত সুদীর্ঘ, চল্লিশ দস্যুর গুহার মত রত্নরাজিখচিত ও অফুরন্ত। আজ সে দিনের সুখ-দুঃখ আমি বুঝতে পারি, কিন্তু বুঝতে পারি না, কি ক'রে অত সুখ-দুঃখের সময় থাকত। আজ যদি আমি আবার তীরধনুক নিয়ে শিকারে বের হই, বেশ জানি, বের হতে না বের হতেই সূর্য চলে আসবে মধ্যগগনে। কিন্তু সেকালে প্রাতরাশ আর মধ্যাহ্ন ভোজনের মধ্যেই অন্তত তীর দিয়ে একটা জানালা ভাঙার, কালোজাম ধ্বংস করার, শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাতাহাতি করবার, গাছের ডগায় ব'সে ব'সে 'সিক্রেট আই-ল্যাণ্ডস্' পড়বার, অন্যের হাতে সু-অঙ্কিত কয়েক ঘা কিল চড় উপভোগ করবার, দেশলাইয়ের বাক্সের মধ্যে উইচিংড়ি পুরে রাখবার, নিষিদ্ধ জায়গায় স্নানের, কাঁটাতারের বেড়া ডিঙোবার, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের দিনকাল কেমন চলছে দেখবার, আর সব ওপরে কুকর্ম, দুঃসাহস আর নব নব আবিষ্কারপূর্ণ অভিযানের সময় থাকত। নাঃ, সময় যে তখন এর দশগুণ বেশি ছিল, তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের ক্ষেত্র আর নির্বুদ্ধিতা বেড়ে চলল। তখন এক একটা দিনের কাজ হ'ল অফুরন্ত এবং অপরিমেয়। অধ্যাপকদের পদপ্রান্তে ব'সে তাঁদের হৃদয় থেকে জ্ঞান শোষণ, কাব্য রচনা, স্বপ্ন দেখা, আড্ডা দিয়ে বেড়ানো, নৃত্যগীত, 'কিউরিয়সিটি শপ'-গুলোর জানালার মধ্যে দিয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকা, পাগলের মত এলোমেলো বই পড়া এবং আরো বহু উপায়ে সময় নষ্ট করা— এত সব কাজের পক্ষে একটা দিন পর্যাপ্ত হ'ত কি ক'রে? এ ধাঁধার সমাধান দিতে গিয়ে দেখি আমার পরিবর্তন হয় নি, সময়ই কোনোরকমে সঙ্কুচিত হয়ে গেছে।

ঐ দেখ, গোধূলির রথে নামছে সন্ধ্যা। সময় হ'ল সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালবার। দিন ফুরিয়ে গেল—কোথায় গেল, ভগবান জানেন। এ দিনটা আমাদের নতুন কিছুই দেয় নি, নতুন কিছুই নিয়ে আসে নি এ। বিন্দুমাত্র দৈর্ঘ্য নেই এর। দু-একটা কাজ করতাম, কোথাও যেতাম, একটু আমোদ-প্রমোদ করতাম, কিন্তু যে ভাবেই হোক্, তার আর সময় হ'ল না।

দেখ, দিনটা হু-হু ক'রে কেটে গেল, টেবিলের ওপর এই প্রবন্ধটা ছাড়া আমাকে দিয়ে গেল না আর কিছুই। এক একটা বৎসরও চলে যায় এমনি করেই, রেখে যায় না কিছুই— কিন্তু না, দাঁড়াও। দিনটা ছোট বটে, কিন্তু তবুও কিছু না কিছু কাজ তুমি কর। বছরগুলোও স্বল্পায়ু, কিন্তু তবুও কিছু কাজ তোমার হয় তার মধ্যে। তোমার আয়ু কমে আসতে থাকে, কিন্তু তোমার কীর্তি যায় বেড়ে। হয়ত সে কীর্তি খুব বড় কিছু নয়, তবু তাইতেই তোমার জীবনকে ক'রে দেয় সঙ্কুচিত।

তোমার মনে হতে পারে, বৃথা কালক্ষয় করছ। দুঃখ ক'রো না তাই নিয়ে। হয়ত সে অপব্যয় নয়, নানা কাজের মধ্যে সময়টাকে হয়ত দিয়েছ তুমি বিতরণ ক'রে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জলসেচব্যবস্থা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কোন দেশ সুজলা সুফলা হয়, আবার কোন দেশ তৃষিত মরুভূমিতে পরিণত হয় ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু ইদানীং বিজ্ঞানের সাহায্যে মরু প্রদেশকে কিরূপে সুজলা সুফলা করা হইতেছে সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভাগ, অর্থাৎ সমগ্র দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে জল একটি আজব জিনিস



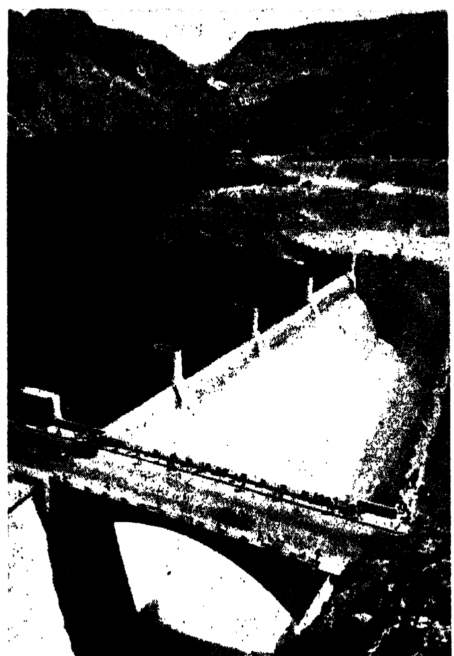
কৃষকগণ ভূমিকর্ষণ কালে কতটা জল পাইবে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নিউ মেক্সিকোতে 'রেঞ্জার'গণ তুষার পরিমাপ করিতেছে



জল আটকাইয়া রাখিবার জন্য বাঁধ নির্মিত হইতেছে



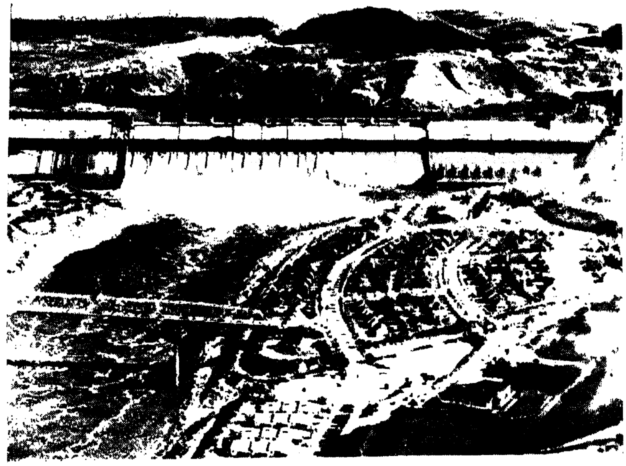
কোলোরাডো নদীর উপরিস্থিত প্রাচীন কালের গ্রীক মন্দির সদৃশ এই বাঁধের বিভিন্ন ফটক দিয়া নানা স্থানে জল সরবরাহ করা হইতেছে



এই বিরাট্ বাঁধের অভ্যন্তরস্থ জল-নিকাশের পথ দিয়া লস এঞ্জেলেস শহরে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে

বলিয়া বিবেচিত হইত। বাস্তবিক পক্ষে, এই দিক্‌কার সতরটি রাষ্ট্রে বারিপাত এতই কম হয় যে, দশ বৎসরের মধ্যেও একবার একটি ভাল ফসল উৎপাদনের পক্ষে তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়।

কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা কি নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছে, না আমাদের মত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া দিন গণিতেছে। ইহা কিন্তু মোটেই নয়। সেখানকার ভূমিকর্ষক, ভূমির মালিক, ইঞ্জিনীয়ার সকলেই একযোগে এই অতি সামান্য বৃষ্টির জল এবং পাহাড়-পর্ব্বত হইতে বরফ গলিয়া যা'কিছু সামান্য জল নিম্নাঞ্চলে আপতিত হয়—সবই হাজার হাজার হ্রদ ও দীর্ঘিকা খনন করিয়া তাহাতে পুরিয়া রাখে। তাহারা অজস্র খাল কাটিয়া ও পরিখা খনন করিয়া নিজ নিজ জমিতে জল লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এইরূপে মরুপ্রদেশ ও অনুর্ব্বর ভূমি সুজলা সুফলা করিয়া লইয়াছে।



প্রস্তুতি কালে বাঁধের একটি দৃশ্য। নিকটে ইঞ্জিনীয়ার, শ্রমিক এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে লইয়া এক নূতন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।



ক্যালিফর্ণিয়ার দ্রাক্ষাক্ষেত্রের একটি দৃশ্য। কৃষকগণ ছোট ছোট বাঁধ তৈরি করিয়া জল ধরিয়া রাখিতেছে। ইহার দরুন জল বাহিরে না গিয়া সমগ্র ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িতে পারে।

ওয়াশিংটন আতা, ক্যালিফর্ণিয়া লেবু ও তজ্জাতীয় ফল এবং ইম্পিরিয়াল ভ্যালীর শাক্‌সজী আজ আমেরিকার সর্ব্বত্র পরিচিত। এমন সব অঞ্চলে এগুলি জন্মিতেছে যেখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূমির উন্নতি করা না হইলে এবং কৃষির উন্নত পদ্ধতিগুলি অবলম্বিত না হইলে কখনই সম্ভবপর হইত না।

পশ্চিমাঞ্চলের জলসিক্ত জমিতে তৃণগুল্মাদিও বর্ত্তমানে প্রচুর জন্মিতেছে। গো-মহিষাদির খাদ্যরূপে এই সব ব্যবহৃত হওয়ায় ইহারা সবল সুস্থ হইতেছে এবং উত্তরোত্তর ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। দুধ ও মাংসের এখন আর অভাব নাই। তের কোটি আমেরিকাবাসীর খাদ্য সরবরাহের একটি সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে।

কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া একটি বিরাট্ মরুপ্রায় অঞ্চলের এইরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটানো হইয়াছে সে সম্বন্ধে মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগিবে। পতিত ভূমি উদ্ধারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যুরো বা বিভাগ আছে। এই বিভাগের আগ্রহাতিশয্যে ঐ সব অঞ্চলে বড় বড় জলাশয় খনন, খাল কাটা, বাঁধ নির্ম্মাণ,জলনিয়ামক যন্ত্রাদি স্থাপন সম্ভব হইয়াছে। দেশের ইঞ্জিনীয়ারগণ এ সকল করিয়া দিয়াছেন। এ অঞ্চলে স্থিত বাঁধসমূহের মধ্যে বোল্‌ডার, কৌলী এবং

আমেরিকাবাসীদের চেষ্টায় দুই কোটি একর জমি জলবিধৌত হইয়া একটি বিরাট্ উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ফলমূল, শাক্‌সজী, আতা, আলু প্রভৃতি নানাবিধ কৃষিজাত সেখানে উৎপন্ন হইতেছে এবং যে-যে অঞ্চলে যে-যে জিনিস বেশী উৎপন্ন হইতেছে সেই সেই অঞ্চলের নামে তাহা পরিচিত হইতেছে। কোলোরাডো তরমুজ ও ইক্ষু, ইডাহো আলু,

যাঁহা বাঁধ খুব বৃহৎ। এত বড় বাঁধ এখন পর্য্যন্ত আর কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। বর্ত্তমানে পনরটি রাষ্ট্রে জল ও শক্তি সরবরাহের জন্য কমপক্ষে ষাটটি সরকারী প্রতিষ্ঠান কার্য্য করিতেছে। পশ্চিম-আমেরিকার জল-সেচের সুবন্দোবস্ত হেতু যে দুই কোটি একর জমি এইরূপ উর্ব্বর হইয়া শস্য ও ফল উৎপাদন করিতেছে। ইহা যুদ্ধরত আমেরিকার খাদ্য সরবরাহের পক্ষে যে কতখানি সহায় হইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

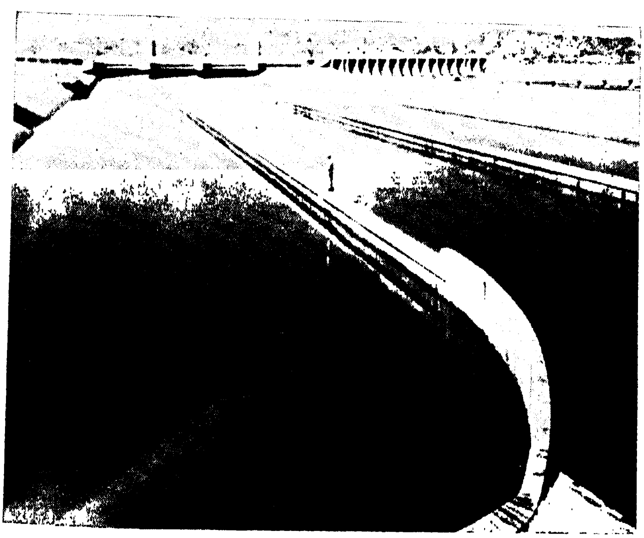
কিন্তু এখানকার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। এখনও এমন বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে যেখানে জলসেচের সুব্যবস্থা হইলে প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হইতে পারে। এখনও দুই কোটি ষাট লক্ষ একর জমিতে এইরূপ জলসেচের ব্যবস্থা হইতে বাকি। জলসেচ-বিজ্ঞান এখনও শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে নাই। কিন্তু গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উহা যেরূপ দ্রুত উন্নতি করিয়াছে তাহাতে যুদ্ধপরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন দেশে ইহা অবলম্বনে খাদ্য ও অন্যবিধ সমস্যা মিটিয়া যাইবে এরূপ সম্ভাবনা প্রচুর রহিয়াছে। তখন ইহার আবশ্যকতা আরও বেশী করিয়াই অনুভূত হইবে।



কোলোরাডো ষ্টেটে জলসেচের সুব্যবস্থার ফলে মরুপ্রায় অঞ্চল সুজলা ও শস্য শ্যামলা হইয়াছে

যুদ্ধ হয় কেন? খাদ্যাভাব বিদূরিত হইলে যুদ্ধের কারণ অনেকাংশে বিলুপ্ত করা যায়। জলসেচব্যবস্থা অবলম্বনে জগতে স্থায়ী শান্তির পত্তন হইতে পারে। প্রত্যেকের মুখে দুটি অন্ন পৌঁছাইয়া দিতে হইলে ইহা অবলম্বন করিতেই হইবে। নান্যঃ পন্থাঃ।

—



ক্যালিফর্ণিয়ার ইম্পিরিয়াল ভ্যালির শস্যক্ষেত্রে এই প্রকার খাল দিয়া জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে

যুদ্ধ কি অপরিহার্য ?

নূরল আলম চৌধুরী

মানুষের পক্ষে যুদ্ধ অপরিহার্য কিনা বিচার করার পূর্বে আমাদের দেখতে হবে যুদ্ধ বলতে আমরা বস্তুত কি বুঝি। কারণ কোন একটা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই তার সমাধান করার চেষ্টা না করে তার মূল সূত্র, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং চিন্তাধারা সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করা সমস্ত দিক থেকেই সঙ্গত।

কিন্তু এখানেই বলে রাখা আবশ্যক যে জীবজগতে যুদ্ধ একটা সাধারণ নীতি নহে। বরঞ্চ যুদ্ধ জীবজগতে খুবই একটা বিরল ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। শুধু বিবাদ অথবা তা থেকে রক্তপাত হলেই যে তাকে যুদ্ধ আখ্যা দিতে হবে তার কোন কারণ নেই। একই জাতি বা শ্রেণীর (species) দুই অথবা ততোধিক দলের মধ্যে সুশৃঙ্খল এবং সুনির্দিষ্ট কোন বিবাদের সূচনা হলেই আমরা তাকে বলি যুদ্ধ। একই শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিগত ঝগড়া এবং তা থেকে রক্তপাত অথবা মৃত্যুও যদি ঘটে তবুও তাকে যুদ্ধ বলা যায় না। পল্লীগ্রামে জমির স্বত্ব নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া এবং তা থেকে রক্তপাত এমন কি মৃত্যুও হয়। এ ঘটনাকে কেউই যুদ্ধ বলবে না। এক টুকরো মাংস নিয়ে যখন পাঁচ-সাতটা কুকুরে ঝগড়া বাধে তখন সেটাকে কুকুরে কুকুরে যুদ্ধ বেধেছে বলা যায় না। প্রাণিজগতের দুটো জাতি বা শ্রেণীর মধ্যে বিবাদ এবং তা থেকে রক্তপাত হলেও সেই বিবাদকে যুদ্ধের পর্যায়ে আনা যায় না। এক শ্রেণীর জীব অন্য শ্রেণীর জীবকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সমষ্টিগত এবং সুশৃঙ্খলভাবে তাড়া করলেও সেটা যুদ্ধ নয়, আবার একদল নেকড়ে বাঘ যখন একদল মেষ অথবা একদল হরিণকে তাড়া করে তখন সে ঘটনাকেও যুদ্ধ বলা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে প্রাণিজগতে দুটো জীবই আছে যাদের মধ্যেই কেবলমাত্র যুদ্ধ জিনিসটা দেখা যায়। এদের একটি হচ্ছে মানুষ এবং অন্যটি হ'ল পিঁপড়ে। কিন্তু পিঁপড়েদের মধ্যেও আবার দুটো শ্রেণী আছে। শস্যসংগ্রহকারী পিঁপড়ে, শুষ্ক মরুভূমিপ্রায় অঞ্চলেই যাদের বাসস্থান এবং যেখানে এক কণা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে কঠোর শ্রম স্বীকার করতে হয়, শুধু এ সমস্ত পিঁপড়ের মধ্যেই যুদ্ধ বাধে, কাজেই সময় থাকতেই এরা ঘাস ও অন্যান্য শস্যের বীজসমূহ সংগ্রহ করতে থাকে এবং শুষ্ক ঋতুতে ব্যবহারের জন্য মাটির নীচে এদের শস্যভাণ্ডারে জমা করে রাখে। এই শস্যভাণ্ডারই পিঁপড়েদের মধ্যে যুদ্ধের মূল কারণ, কিন্তু এ সমস্ত জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁরা বলেন যে পিঁপড়েদের যুদ্ধ মানুষের যুদ্ধের মত এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। এঁদের মতে পিঁপড়েদের যুদ্ধ ছয়-সাত সপ্তাহের বেশী স্থায়ী হয়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মনুষ্যজাতির পক্ষে যা পিঁপড়েদের পক্ষেও তাই। যুদ্ধ প্রকৃতির একটা নীতি

বা সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা নহে; বরঞ্চ একে প্রাণিজগতের একটা বিরল ঘটনা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

যারা যুদ্ধের পক্ষপাতী তাদের মতে জগতে বেঁচে থাকতে হলে যে যুদ্ধ করতে হয় তাতেই লাভ হয় জীবনের চরম উন্নতি ও সফলতা। বেঁচে থাকার এ যুদ্ধ পৃথিবীতে অতি সাধারণ এবং স্বাভাবিক। আর এরই ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় ডারউইন তারই নাম দিয়েছেন "Natural selection" এবং এর সর্বশেষ ফলে দাঁড়ায় 'survival of the fittest।' যুদ্ধ জিনিসটা এ ভিন্ন আর কিছুই নয় এবং বিভিন্ন জাতি তার নিজ নিজ স্বার্থ বা জাতীয় পুষ্টিসাধনের জন্যই যুদ্ধে লিপ্ত হয়; যুদ্ধের পক্ষপাতীগণ আরো বলেন যে যুদ্ধের অবর্তমানে মানুষের পুরুষোচিত সদ্‌গুণসমূহ নষ্ট হয়ে যায় এবং যুদ্ধ ভিন্ন কোন জাতিই জগতে উন্নতি বা সফলতা লাভ করতে পারে না।

যাক, এটা সহজেই বুঝা যায় যে, যুদ্ধ একই জাতির দুটো দলের মধ্যে একটা বিশিষ্ট রকমের প্রতিযোগিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জীবন-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাই এর নাম দিয়েছেন, "Intra-specific competition"। কিন্তু একটু চিন্তা করলে সহজেই দেখা যায় যে, এই Intra-specific competition বা অপর কথায় যুদ্ধ জাতির পক্ষে কখনই মঙ্গলজনক নহে। যুদ্ধ জিনিসটা জাতির পক্ষে কেবলমাত্র অনাবশ্যকই নহে বরং ভয়ানক ক্ষতিকর। ইহা মনুষ্যজাতির ক্রমোন্নতির পথে একটা অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু এটা আমাদের অস্বীকার করলে চলবে না যে, যুদ্ধ সাধারণত ক্ষতিকর বটে, আবার অবস্থাভেদে মঙ্গলজনকও হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যাঁরা বলেন যে যুদ্ধ অত্যাবশ্যক এবং এ ভিন্ন জাতির উন্নতি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয় আমার বিশ্বাস তাঁরা একমাত্র ভুল ধারণারই প্রশ্রয় দেন। যে সমস্ত জাতি আজও বর্ব্বরতার সীমা অতিক্রম করতে পারে নি তাদিগকে মানুষের পুরুষোচিত গুণসমূহ সম্বন্ধে সজাগ করতে হলে যুদ্ধ অতিমাত্রায় সাহায্য করে এবং সদ্যজাগ্রত এই পুরুষোচিত গুণসমূহ জাতির উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ ভিন্ন যে সমস্ত জাতি অতিরিক্ত লোকসংখ্যার জন্য নানা ভাবে কষ্টভোগ করতে বাধ্য হয়েছে সে সমস্ত জাতির পক্ষেও যুদ্ধ মঙ্গলজনক হতে পারে। কারণ যুদ্ধে বহুলোকের প্রাণ দিতে হয় বলে লোকসংখ্যার চাপ কতকটা কমে আসা স্বাভাবিক। পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলেও দেখা যায় যে, ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ জাতির সাধারণ উন্নতির পথে তেমন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না।

কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধ যার ফলে সাধারণ নাগরিকদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, যার ফলে তাদিগকে নানা কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করে প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করতে হয় এবং যার ফলে এমন কি সমস্ত দেশ পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যায় এবং জাতির উন্নতির পক্ষে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে সেরূপ যুদ্ধ কাহারও কাম্য হতে পারে না। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে ইতিহাসের 'Thirty years war' বা ত্রিশ-বর্ষব্যাপী যুদ্ধ। বর্তমান যুদ্ধেও জার্মানীর আচরণে তাহা আরও পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তারা পোল্যাণ্ডে এবং গ্রীসে যে হত্যার তাণ্ডবলীলা সৃষ্টি করেছিল, বর্বরতায় যে

যে ভাবে সমস্ত নগরী ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল, ইউক্রেনের মত প্রকাণ্ড অঞ্চলের ধনসম্পত্তি যে ভাবে নষ্ট করে তা দেখে পৃথিবীতে বোধ হয় এমন কোন মানুষ নেই যিনি ভাবতে পারেন যে এ যুদ্ধ মানবজাতির কোন মঙ্গলসাধন করতে পারে। এরূপ যুদ্ধ যত দীর্ঘকালস্থায়ী হয় মানুষের শক্তি ও সামর্থ্য সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের জন্য তত বেশী উন্নসিত হয়ে ওঠে এবং যত বেশী সংখ্যক দেশ যুদ্ধে যোগদান করে মানবজাতির উন্নতির আশা ততই বেশী পিছিয়ে যায়, আর তার ভবিষ্যৎও ততই অন্ধকারময় হয়ে পড়ে।

এখন আমরা বিচার করতে পারি যুদ্ধ অপরিহার্য কিনা। যাঁরা যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে মনে করেন তাঁদের মতে এটা মনুষ্যপ্রকৃতির একটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ স্ফুরণ বা বেগ। তাঁদের ধারণায় এটা সহজেই মনে হয় যে মনুষ্যপ্রকৃতির পরিবর্তন বুঝি অসম্ভব।

কিন্তু জীবন-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন, যুদ্ধ মনুষ্যপ্রকৃতির একটা অপরিহার্য ঘটনা হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ অবস্থাভেদেই হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কখনো যুদ্ধ হয়েছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে যুগের যে সমস্ত পাথরের অস্ত্রের চিহ্ন পাওয়া যায়, সেগুলি প্রধানতঃ পশু শিকারের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু তা ভিন্নও মাটিতে গর্ত করতে পশু চর্ম মসৃণ করবার কার্যে এগুলির ব্যবহার দেখা যেত। কিন্তু সে সময় মনুষ্যজগতের বিভিন্ন দলের মধ্যে যদি যুদ্ধ ঘটেও থাকে তবে এটা নিশ্চয়ই মনে করতে হবে যে, সেগুলি খুবই সাধারণ বা অনুল্লেখযোগ্য এবং খুবই কদাচিৎ ঘটে থাকবে। সুব্যবস্থিত এবং সুশৃঙ্খল যুদ্ধ দেখা যায় সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক পিঁপড়ের মত মানুষের মধ্যেও যে যুদ্ধ বাধে তার মূল কারণও বহুদিনের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি। এমনও দেখা যায় যে, মানুষ যখন শহরে বসবাস ক'রে ধনসম্পত্তি উপার্জন করতে শিখল তখনো যুদ্ধ অপরিহার্য ছিল বলে মনে হয় না। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৩০০০ বৎসর পূর্বেকার প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় যুদ্ধের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এ ভিন্ন প্রাচীন চীন-ইতিহাসে এবং পেরুর ইন্‌কা-সভ্যতার যুগে কোন যুদ্ধ হয়েছিল বলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মানবপ্রকৃতির দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন যুদ্ধপ্রবৃত্তি নেই। কিন্তু এটা আমাদের অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মানুষের হৃদয়ে প্রাধান্য লাভের প্রবৃত্তি খুব প্রবল; যদিচ এ প্রবৃত্তিও মানুষের অন্যান্য প্রবৃত্তির মতই পরিবর্তনশীল এবং সহজেই বিভিন্ন ছাঁচে গড়ে তোলা যায়। আমরা এ প্রবৃত্তিকে সহজেই প্রতিযোগিতাশীল খেলা-ধুলোর দিকে ধাবিত করতে পারি। ইতিহাসে দেখা যায় যে ফিলিপাইন দেশের কোন কোন জাতি মানুষ শীকারের প্রবৃত্তির পরিবর্তন করবার জন্য ফুটবল খেলতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্রতিযোগিতাশীল খেলাধুলো ভিন্নও মানুষ তার শক্তিকে পাহাড়-পর্বতের সু-উচ্চ চূড়া লঙ্ঘন করে জয়ের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে, জঙ্গল খুঁড়ে প্রাচীন কীর্তিকলাপের আবিষ্কার করে

অথবা গবেষণায় সাহায্যে নূতন নূতন থিওরী বা চিন্তাধারা মনুষ্যজগতের সম্মুখে তুলে ধরে তার প্রাধান্য লাভের প্রবৃত্তি বা শক্তিকে অন্য পথে ধাবিত করতে পারে। মানুষের প্রবৃত্তিকে যদি একবার এরূপ ভাবে প্রকৃতি জয়ের আনন্দ উপভোগ করান যায় তখন সে ঐ জয়ের নেশায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে তার মনের কোণে পার্থিব যুদ্ধজয়ের আশা ঘুণাক্ষরেও প্রবেশ করবার অবসর পায় না। তখন তার মন সুদূরপ্রসারী প্রকৃতি-জয়ের ভাবনাতেই বিভোর। আর সে তাতেই মাতাল হয়ে জয়ের টীকা একটি একটি করে কপালে পরতে আরম্ভ করে।

ধর্মের দিক থেকেও মানুষে মানুষে এরূপ যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমার মনে হয় না, তবে পৃথিবীতে যাতে যুদ্ধ বলে কোন কিছু না থাকে তার চেষ্টা করতে হলে প্রথমেই আবশ্যক একটা সত্যিকারের আন্তর্জাতিক শক্তি। কিন্তু এরূপ একটা শক্তির আবিষ্কার বা সৃষ্টি করা সহজ ব্যাপার নয়—এটা স্বীকার করতেই হবে। এর পরেই আবশ্যক নৈতিক শক্তির আবিষ্কার করে যুদ্ধের অভাব পূরণ করা। একেই উইলিয়ম জেমস্ "moral equivalent for war" বলেছিলেন। কিন্তু আজ প্রত্যেক শক্তিশালী জাতির মধ্যে অপর জাতির উপর প্রাধান্য বা কর্তৃত্বলাভের যে অন্যায় আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় তাকে জাতির মন থেকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়াও এর সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক। কিন্তু এটা মনোগত সমস্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আজ আমরা ফ্রয়েডের চিন্তাধারা এবং নব্য মনোবিজ্ঞার সাহায্যে সহজেই বুঝতে পারি কি করে মানুষের সহজাগ্রত দুষ্প্রবৃত্তিগুলিকে নষ্ট করে মনোজগতের গভীর অন্ধকার কোণে দাবিয়ে রাখা যায়। কিন্তু এরূপ অন্ধকার কারাগৃহে প্রবৃত্তিগুলিকে বেশী দিন ওভাবে নিস্তেজ করে রাখা কষ্টকর। সময় ও সুযোগ পেলেই ওগুলি মানুষের অজ্ঞাতসারে পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। তখন সেগুলি আরও দ্বিগুণ উৎসাহে পৃথিবীকে হত্যা ও ধ্বংসের লীলাক্ষেত্রে পরিণত করবার জন্য উল্লসিত হয়ে ওঠে।

সুতরাং পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি দিতে হলে মানুষের ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে ধ্বংসের দিক থেকে ফিরিয়ে মানুষেরই প্রয়োজনীয় সৃষ্টির উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এটা খুবই কঠিন সমস্যা সন্দেহ নেই, এর জন্য প্রয়োজন আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন করে এমন একটা সাম্যভাবযুক্ত নূতন কাঠামোর সৃষ্টি করা যেখানে মানুষের জাগরণশীল সুপ্রবৃত্তিগুলির ধ্বংসের কোন ভয় থাকবে না। এর জন্য শিক্ষার দিকে আমাদের নূতন আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং এরই জন্য প্রয়োজন মানুষের শক্তিকে দাবিয়ে রাখার পরিবর্তে প্রতিযোগিতাশীল শারীরিক ও মানসিক খেলাধুলো বা বিপৎসংকুল অথচ আনন্দযুক্ত কোন কার্যের দিকে ধাবিত করা, যাতে এগুলি মনুষ্যজগতের অমঙ্গলজনক কোন কার্য করবার সময় ও সুযোগ আর না পায়। এটা খুবই কঠিন কার্য; কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয় এ স্বীকার করতেই হবে।

প্রাণিজগতে শুধু দুটো জীবই আছে যাদের মধ্যে যুদ্ধ জিনিসটি

দেখা যায় এবং মানুষ তার মধ্যে একটি এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু এ মানুষই পৃথিবীতে সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করে আছে। শুধু তাই নয় ; এ মানুষই একমাত্র প্রাণী যার কঠিন তপস্যার ফলে পৃথিবী আদিম বর্বরতার যুগ থেকে আজ নব্য সভ্যতার কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীকে নব নব আবিষ্কার ও সৃষ্টির দ্বারা সাজিয়ে তুলতে পারে আজ একমাত্র মানুষই। সুতরাং যুদ্ধ কেবলমাত্র মনুষ্য-জগতেরই সমস্যা নয়, এর প্রচলন থাকা বা না থাকার ওপরই নির্ভর করে পৃথিবীর ক্রমোন্নতি, যার গতি আজ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে ধীর ভাবে চলে এসেছে। কিন্তু এটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে, যুদ্ধ মানুষের অপরিহার্য নয়, তার প্রাধান্যলাভের প্রবৃত্তি বা শক্তিকে একটু চেষ্টা করলেই অন্য পথে ধাবিত করা যায়। তার রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো এরূপ ভাবে গঠন করা যায় যেখানে যুদ্ধ পরিহার করা খুবই সহজসাধ্য। সমস্ত কিছুই সম্ভবপর ; কিন্তু তার জন্য গভীর চিন্তা ও কঠিন ক্লেশ স্বীকার করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যাতে যুদ্ধ আর ঘটতে না পারে তার উপায় উদ্ভাবন করবার একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করাও আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

মৃত্যুঞ্জয়

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বিশ্বভুবন-সৃষ্টির ঊষাকালে
মৃত্যুর ক্রুর দৃষ্টি নেহারি' শঙ্কায় বিহ্বল
তরুণ দেবতাদল
সরিৎ-সিন্ধু গিরি-বনানীর নিভৃত অন্তরালে
রচি' বিজ্ঞান-নীড়,
জ্ঞান-সমুদ্র মন্থি' করিল শক্তি-আসব পান,—
মৃত্যুর দূর-বিসর্পী অভিযান
ব্যর্থ করিয়া প্রসাদ সেবিল বীতভয় শান্তির।

বড়িশ-হস্ত ধীবরের খর্পর :
গণে পরমাদ গণ্ডুষজল-চারী অসহায় মীন—
দেবতার বুকে মৃত্যু হানিল দেবতারই গড়া শর,
জ্ঞানের অমোঘ আয়ুধে জ্ঞানের মন্দির ভূমি-লীন।

দৃপ্তচরণে ঘুরিছে মৃত্যু নিখিল ভুবনময়—
দিগ্বিজয়ীর রূঢ় ভ্রূকুটির শাসনে বেপথুমান
বিফলমন্ত্র দেবদল নবমন্ত্রের বরাভয়
খুঁজিছে,—কে দিবে শত্রু-শাতন অভিচার-সন্ধান ?

ঊষসীর রাঙা তুলিতে আকাশ-পটে কার এ লিখন !
পূর্বাশা-ভালে উঠিছে ফুটিয়া ওই যে অভয় বাণী—
বাহিরিয়া এল দেবতার দল ছাড়ি' নীড় সুগোপন,
লজ্জা তেয়াগি' শঙ্কার শিরে বজ্রমুষ্টি হানি'।
প্রজ্ঞালব্ধ আয়ুধ-সজ্জা-শায়কের সমারোহ
ছুড়িয়া ফেলিল। রবি-সন্নিভ প্রদীপ্ত মহিমায়
স্বয়ম্প্রকাশ আভরণহীন ত্যক্তজীবনমোহ—
মৃত্যুরে হাসি' জানাল স্বাগত—মুক্ত, নগ্নকায়।

আভূমিলগ্ন-শির
ত্রস্ত মৃত্যু গূঢ় তমোলোকে লুকাইল স্ব শরীর ॥
—(ছান্দোগ্য-উপনিষদ্)

যোগ না বিয়োগ

মাত্র সেদিনের কথা। পৃথিবীজোড়া আজকের যুদ্ধের সাড়া তখনও পড়েনি। অনিল বাস করতো কলকাতার কোন এক পল্লীতে। সংসার তার বড় নয়, আবার একেবারে যে ছোট তাও নয়। স্ত্রী সুধীরা, তিন পুত্র, কনিষ্ঠা কন্যা মীনা ও নিজে—এই ছয়জনই অনিলের পরিবারের লোকসংখ্যা। বড় ছেলে সুমন্ত মাত্র কলেজে ঢুকেছে। দ্বিতীয় সুশান্ত স্কুলে পড়ে। ছোট ছেলেটি বাড়ীতেই থাকে, কন্যার বয়স মাত্র ৬' বছর। তাদের প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য সুঠাম, চেহারা সুন্দর। না হবেই বা কেন? অনিলের অবস্থা নেহাৎ খারাপ নয়। এক মার্কেন্টাইল ফার্মের সে ম্যানেজার। মাসিক বেতন তার কয়েক শত টাকা। মোট কথা তারা বেশ সুখেই ছিল।

কিন্তু এর পরেই বাধে প্রাণঘাতী দেশজোড়া লড়াই। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো গেল উল্টে। মুদ্রা-স্ফীতির সঙ্গে মূল্যস্ফীতি চললো পাল্লা দিয়ে, আর দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী এলো পালা ক'রে।

ছোট বেলা থেকেই অনিলের স্বগ্রামের প্রতি একটা বিশেষ মমতা আছে। বড়, ছোট সকল ছুটিতেই সে বাড়ীতে যায় কেবল মাতা ও ছোট ভাইকে দেখতে নয়; ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান সকল প্রতিবেশীকে দেখতে, তাদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নিতে। সে নিজের উদ্যোগে ও বন্ধুদের সহযোগিতায় গড়ে তুলেছিলো একটি ছোট গ্রন্থাগার। সেটার অগ্রগতির হিসাব লওয়াও তার অন্যতম প্রধান কাজ।

পল্লীর দুর্ভিক্ষ ও রোগের সংবাদ অনিলের নিকট পৌছলো। সে একটা সাহায্য-কেন্দ্র খুলবার বাসনায় ছুটে এল তার গ্রামে। সপ্তাহ মধ্যে সে একটি সাহায্য-কেন্দ্র স্থাপন করলো। বহুলোক দৈনিক সেই কেন্দ্র হতে অন্ন পেতে লাগলো। হঠাৎ একদিন অনিলের দৃষ্টি ফিরলো সেই শ্রেণীর দরিদ্রদের উপর যারা সাহায্য-কেন্দ্রে আসতে পারে না, অথচ যাদের অবস্থা দীন হতেও দীন। এই শ্রেণীর একটি পরিবার অনিলের বাল্যবন্ধু বিমলের। বিমল আজ ৪।৫টি সন্তানের পিতা। তার দুঃখ অনিলকে তাদের ছেলেবেলার বন্ধুত্বের কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে স্মরণ করিয়ে দিল।

অভাব ও অর্দ্ধাহারে বিমলের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা কেহ বা ইনফ্লুয়েঞ্জায়, কেহবা ব্রঙ্কাইটিসে, কেহবা অন্য কোন-না-কোন কারণে ভুগছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় এই যে, বিমল নিজেই শয্যাশায়ী, আজ তার ১৫।২০ দিন জ্বর, সর্দ্দি, কাসি, হাঁপানি, বুকে ব্যথা। গোটা পরিবারের যে মাথা তাকেই বাঁচানো অনিল কর্ত্তব্য বলে স্থির করলো। তাহলে এই দুর্ভিক্ষের দিনেও বিমল সেরে উঠে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীর মুখে অন্ন দিতে পারবে।

সাহায্য-কেন্দ্রের ভার সাময়িকভাবে বন্ধুদের উপর দিয়ে বিমলকে নিয়ে অনিল কলকাতায় এলো। তাকে নিজের বাসায় রেখে ডাক্তারের প্রথম নির্দ্দেশমত **'পেট্রোমালসন'** খাওয়াতে আরম্ভ করলো। দেখতে দেখতে বিমল সুস্থ হতে লাগলো। সর্দ্দি, কাসি, হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিসের সব লক্ষণই তার দূরে গেল। ১৫।২০ দিনের মধ্যেই বিমল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে গেল।

দেশে ফিরে সে প্রথমেই তার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের **'পেট্রোমালসন'** সেবনের ব্যবস্থা দিলে। অনতিবিলম্বে তারাও সবাই সুস্থ ও রোগমুক্ত হলো। সেই দিন থেকেই বিমল নিঃসঙ্কোচে সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করলো অনিলের ন্যায় ঔষধটিও অকৃত্রিম বন্ধু। সে আজ **'পেট্রোমালসনে'র** উচ্চ প্রশংসা করতেও লজ্জিত নয়। বলা বাহুল্য, উহাই আজ অনিল ও বিমলের এবং বিমলের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মধ্যে একাধিক বিয়োগ ও বিচ্ছেদের স্থলে যোগ ও মিলন সম্ভব করলো। অন্যথায় অনিলের আরব্ধ সেবাকার্য্যের একটি শোচনীয় পরিণতি হোত, আর তার নিজের কাছেই একটা মর্ম্মন্তুদ স্মৃতি-কাহিনী হিসাবে জীবিত থাকতো।

পুস্তক-পরিচয়

শ্রীমা—শ্রীআশুতোষ মিত্র। সন্তোষকুমার ঘোষ প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—দি শ্যামবাজার ইলেকট্রিক এম্পোরিয়াম, ১৩৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ২২২। মূল্য আড়াই টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তজননী শ্রীমার সেবকরূপে গ্রন্থকার তের বৎসর কাটাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেই সময়ে সযত্নে লিখিত 'নোট' হইতে একত্র করিয়া পুণ্যজীবনীর উপাদানরূপে প্রকাশিত পুস্তক। অনেকগুলি উপাখ্যান ভারি সুন্দর লাগিল। আবার দুই একটি অংশ মনে হইল, বাদ দেওয়া উচিত ছিল। সত্যের জয় হউক; কিন্তু সকল সত্যই সর্বদা প্রকাশনীয় নহে, কোন্ কথা প্রকাশ্য তাহা বিচারের বিষয়।

একস্থানে সংবাদে ভুল আছে; পৃ. ১° ১ বলা হইয়াছে, রামেশ্বরের "অনতিদূরে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত 'শৃঙ্গে'র বা শৃঙ্গগিরি মঠ।" ৺শৃঙ্গেরী কিন্তু মহীশূর রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে, রামেশ্বর হইতে অতিদূরে।

অতি সম্প্রতি উদ্বোধনে 'অরবিন্দ শ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন কি না,' এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে; এই পুস্তকে সে বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও লেখা আছে 'শুনা যায়, শ্রীঅরবিন্দ একদিন শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসেন' (১৩১ পৃঃ)। ইহা 'প্রণাম করিতে আসিয়াছিলেন' এই কথারই পোষক।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

দন্তরুচি—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীরমেশ ঘোষাল, ৩৫ বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বইখানি ছাব্বিশটি ছোট গল্পের সমষ্টি। খ্যাতনামা লেখক একটু নূতন ধরণে গল্পগুলি লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণতঃ ছোট গল্প আকারে যে খুব ছোট হয় তাহা নয়। "দন্তরুচি"র লেখার বিশেষত্ব এই, প্রতি গল্প আয়তনে দুই তিন পৃষ্ঠার অধিক নহে। অথচ তাহাতে গল্পের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। 'অপরিচিতা,' 'ধীরে রজনি,' 'কুতুবশীর্ষে,' 'মৎস্যন্যায়,' 'শুক্লা একাদশী', প্রভৃতি গল্পগুলিতে চমৎকারিত্ব আছে। 'দন্তরুচি,' 'নাইট ক্লাব,' 'শ্রেষ্ঠ বিসর্জ্জন' প্রভৃতি গল্প উদ্ভট হইলেও পাঠকের মনে কৌতুকরসের সঞ্চার করে। লেখক "দন্তরুচি"তে যে ধরণের গল্প রচনা করিয়াছেন, আকস্মিকতা এই ধরণের গল্পের প্রাণ। যে-সব গল্পের মধ্যে এই বিস্ময়টুকু অতি সহজেই ফুটিয়া উঠিয়াছে পাঠকের মনে সেইগুলি বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়া যায়। "দন্তরুচি" চিত্তে আনন্দ বিধান করিবে।

ভারতের মুক্তিসাধক—শ্রীগোপাল ভৌমিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বার আনা।

রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতবর্ষকে যাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, ভারতের রাষ্ট্রচেতনায় যাঁহারা প্রেরণা দিয়াছেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁহারা নেতা,—তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত বইখানিতে প্রদত্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, লোকমান্য তিলক, পণ্ডিত মতিলাল-নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রায়, মহাত্মা গান্ধী,

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও সীমান্ত গান্ধী—এই কয়জন দেশনেতার জীবনচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচিন্তা এই সব রাষ্ট্রনেতার মধ্য দিয়া কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও লেখক দেখাইয়াছেন। বইখানি সুলিখিত। এই রেখা-চিত্রগুলি পাঠকের মনে প্রেরণা দান করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নিঃসহ যৌবন—শ্রীনবগোপাল দাস। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা।

উপন্যাসের আরম্ভটি এইরূপ। সুবিনয় আর তপতীর মধ্যে ছিল ভালবাসা। কিন্তু সুবিনয়ের পিতার সম্পূর্ণ অমতে সে বিবাহ ঘটিল না। ঘটনাচক্রে সুবিনয়ের বিবাহ হইল আর একটি মেয়ে—রেবার সঙ্গে। সেই সংবাদ সুবিনয়ের বন্ধু অসীমের মারফৎ তপতী জানিতে পারিল। তারপর তপতী, সুবিনয়, অসীম ও রেবাকে ঘিরিয়া গল্পের গতি আরম্ভ হইয়াছে। ভীরু সুবিনয়ের দ্বৈত জীবন, অকুণ্ঠ তপতীর তেজস্বিতা, অসীমের গোপন ভালবাসা ইত্যাদি যে সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছে—আলোচ্য উপন্যাসটির তাহাই প্রাণশক্তি। এই পশ্চিমমুখী ইঙ্গবঙ্গ সমাজঘেঁষা সমস্যায় রূপটি সাধারণ বাঙালী পরিবারের সমাজ-বন্ধনের মধ্যে খুঁজিয়া মেলে না। এই জাতীয় সমস্যায় নূতন এক সমাজ সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সুতরাং সেই আলোকেই তাহার বিচার সম্ভব। কিন্তু হৃদয়াবেগসম্মুখ যে মহান্-ত্যাগের দ্বারা উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে—তাহা সম্পূর্ণ দৈব সৃষ্ট। গল্প শেষ হইলে স্বামী ও সন্তান বঞ্চিত মেয়েটির জন্য করুণ একটি সুর মনের কোণে লাগিয়া থাকে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রূপ হইতে রূপে—শ্রীশিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রকাশক—রসচক্র সাহিত্য-সংসদ, ২১-এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, দক্ষিণ কলিকাতা। দাম আড়াই টাকা।

একখানি উপন্যাস। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "সাহিত্য রস-সৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য।" কিন্তু সাহিত্যরস অপেক্ষা গ্রন্থখানিতে "সাম্প্রদায়িক অর্থনীতিক সমস্যা ও ধর্ম্মদ্বন্দ্বজাত ঘটনাবলীর" আলোচনাই প্রচুর ও প্রকট। সেজন্য সাহিত্যরসপিপাসু সাধারণ পাঠকের চিত্ত অতৃপ্ত থাকিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। তবে গ্রন্থখানিতে যে নূতন সুরের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা অধিকাংশ উপন্যাসেই দুর্লভ। গ্রন্থকার আমাদের জাতীয় জীবনের কয়েকটি প্রধান সমস্যা, বিশেষ করিয়া হিন্দু মুসলমান বিরোধ ও অর্থনীতিক সমস্যা বেশ উদারতা ও সাহসের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা মর্য্যাদাসম্পন্ন ও সুমিষ্ট।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

দিগন্ত—নিশিকান্ত। দি কাল্‌চার পাবলিশর্স। ৬৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কবি নিশিকান্ত বাঙালী কাব্যরসিকের সুপরিচিত। তাঁহার এই নূতন কবিতাগ্রন্থও পূর্বতন 'অলকানন্দা'রই মত প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল মনে হয়, ইঁহার রচনা আরও পরিণত এবং রসঘন। বর্ত্তমান যুগের

অসংবদ্ধ প্রলাপ এবং ক্লেদাক্ত ভাব হইতে বহু—বহু ঊর্দ্ধে ধ্বনিয়া চলিয়াছে কবির সুর, তাঁহার কল্পনা-বিহঙ্গ পাখা মেলিয়াছে উদার উন্মুক্ত আকাশে, নির্ম্মল চিক্কণ রৌদ্রে। আধ্যাত্মিকতার প্রতি আধুনিকের বিরাগ, কিন্তু নিশিকান্তের কাব্য প্রেরণা লাভ করিয়াছে উদার আধ্যাত্মিকতা হইতেই। তাই প্রাত্যহিক তুচ্ছতা এবং বিবর্ণতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পাঠকের মন অসীমের স্পর্শ অনুভব করে তাঁহার কাব্যে। আত্মার গভীরতম আকুতি ও উপলব্ধিকে বর্জন করিয়া এ কালের কাব্য অস্থি-কঙ্কালে সত্য সন্ধান করিতেছে। পারিপার্শ্বিক কারণে এ অবস্থা স্বভাবতঃ আসিয়া থাকিলেও ইহা জীবনের স্বাস্থ্য ও পূর্ণতার লক্ষণ নহে। বাহিরের দৈন্য ঘুচিলে একদিন এই অন্তরের দৈন্যে আমরা লজ্জাবোধ করিব। হয়ত সেইদিন সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যা[illegible]রের দিন আসিবে। ভাল কবিতা হুজুগ সৃষ্টি না করিয়াও স্বচ্ছন্দে ততদিন টিকিয়া থাকিবে।

"পঙ্কহীন বাসনায় দাও তব তুঙ্গ অভীপ্সার
সৌরসুধা আকাঙ্ক্ষার প্রগতির সুতীব্র চেতনা;
নিষ্প্রাণে জড়ের পুঞ্জে সঞ্চারিয়া বিচ্ছেদ-বেদনা
অতন্দ্র আকুল করো স্বর্গ আর আঁধার ধরার
মিলন লীলার লাগি।"

এই সৌরসুধা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ হউক আমাদের অন্তর।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লেনিন—শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক—গণবাণী পাবলিশিং হাউস, পি ৩১-এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১১১, মূল্য এক টাকা।

এযুগের সাম্যবাদ বা কমুনিজমকে বুঝিতে হইলে লেনিনের জীবন ও তাঁহার মতবাদ বুঝার প্রয়োজন আছে। সোভিয়েট বিপ্লবের পূর্ব্বে সাম্যবাদ কেবল মাত্র একটি কাল্পনিক মত হিসাবেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ ছিল, রুশ বিপ্লব ইহাকে বাস্তবতায় পরিণত করিয়াছে। অবশ্য এই মতবাদ বাস্তবতার পথে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই আদর্শবাদকে যাহারা বাস্তবতায় রূপ দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ভ্লাদিমার ইলিয়ানভ আইভানোভিচ ইলিচ বা লেনিন শ্রেষ্ঠতম। লেনিনের গভীর রাষ্ট্রীয় জ্ঞান ও দূরদর্শিতাই রুশজাতিকে জার্ম্মান আক্রমণ এবং পরবর্ত্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সম্মিলিত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। বিপ্লব বিরোধী স্বদেশীয়গণের নিকট হইতে লেনিন কম বাধা পান নাই। কিন্তু সর্ব্বশেষে তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছিল। তিনি গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লেনিনের মতবাদ ও কর্ম্মপদ্ধতির সহিত অনেকেই একমত হইবে এরূপ আশা না করা গেলেও, স্বীকার করিতেই হইবে যে মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে লেনিন ও সোভিয়েট বীরগণের অবদান অতুলনীয়। বর্ত্তমান গ্রন্থ ষোল আনা লেনিনপন্থী কর্ত্তৃক লিখিত হইলেও বিরুদ্ধ-মতাবলম্বিগণ এই পুস্তক হইতে সাম্যবাদ ও লেনিন সম্বন্ধে অনেক খাঁটি কথা জানিতে পারিবেন।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৭০, মূল্য ৷৷০

এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার ৩৬ সংখ্যক পুস্তক। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ধনবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। বিদেশীয় ভাষায় এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলা ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হয় নাই যদিও মাঝে মাঝে এই বিষয়ে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি বাহির হইয়া থাকে। লেখক আপেক্ষিক লাভ, জিনিষ চলাচল, মূলধন চলাচল, ও উহার ফলাফল, মুদ্রাবিনিময় হার, শুল্ক ও শুল্কনীতির কলা কৌশল, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক সমস্যা ও সর্ব্বশেষে যুদ্ধোত্তর সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ জটিল অর্থনৈতিক বিষয়ের সরল আলোচনা করিয়া লেখক পাঠক সাধারণের এবং বিশেষভাবে ছাত্র সমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞের দ্বারা লিখিত এরূপ পুস্তক প্রকাশ ও অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিশ্বভারতী দেশের একটি বহুদিনের অভাব দূর করিতেছেন। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

লেনিনের বক্তৃতা—শ্রীশুভেন্দু ঘোষ অনূদিত ও সম্পাদিত, প্রকাশক—সমবায় পাবলিশার্স, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮০। মূল্য ১৷০ আনা।

লেনিনের মত একজন শক্তিমান নেতা বর্ত্তমান কালে আর কোনো

দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি মহা-মানবের অন্যতম এবং সোভিয়েট রুশিয়ার সৃষ্টিকর্ত্তা। অবশ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহার সহায়ক হইয়াছিল। নেতা মাত্রেরই অন্যতম অস্ত্র বাগ্মিতা। লেনিনও ছিলেন বড় রকমের একজন বাগ্মী। তবে তাঁহার বক্তৃতায় বাগাড়ম্বর মোটেই থাকিত না, থাকিত সহজ, সরল তেজস্বী ভাষার প্রাণস্পর্শী বজ্রনির্ঘোষ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁহার সোভিয়েট সংগঠন, দেশের শান্তি, ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ, চাষীদের হাতে জমি ফিরাইয়া দেওয়া প্রভৃতি ১০টি বক্তৃতা স্থান পাইয়াছে। অনুবাদের ভাষা সরল হইয়াছে। বাংলা ভাষায় যে নূতন মার্ক্সীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে তাহার সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে চান তাঁহাদের এই পুস্তক পাঠ করা উচিত।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

জমিদার রবীন্দ্রনাথের জীবনের কয়েকটি ঘটনা এই গ্রন্থে গল্পের আকারে বর্ণিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা, অভিজাত রবীন্দ্রনাথ কল্পনা জগতের মানুষ ছিলেন, তাঁহার কবিতা বাস্তব জগতের স্পর্শলেশহীন ভাববিলাসীর সৃষ্টি। তাঁহারা 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' পড়িয়া বিস্মিত হইবেন যে, সহজ মানুষ ও পল্লীর মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কত মহৎ, কত বড় ছিলেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ প্রজাগণের সঙ্গে কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন, প্রজাগণের সুখ দুঃখ কিরূপ অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করিতেন, প্রজার মান রক্ষার জন্য কিরূপ আগ্রহশীল ছিলেন, পদ্মাবক্ষে বোটে চড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাংলার কত পল্লীর দৃশ্য ও নরনারীর চরিত্র তিনি কি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতেন। এই সকল পড়িতে পড়িতে মনে হইবে যে, বিধাতা রবীন্দ্রনাথকে আদর্শপুরুষ করিয়া গড়িয়াছিলেন। 'লালন ফকিরের সহিত মোলাকাৎ' অধ্যায়ে দুই মরমী কবির মিলনের ছবি অপূর্ব ফুটিয়াছে। কয়েকখানি ফটো ও নন্দলাল বসু-অঙ্কিত কয়েকখানি স্কেচ বইখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। মলাটের রঙীন ছবিখানি সুন্দর।

জাতির বরণীয় যাঁরা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস্, কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

পৃথিবীর সকল দেশেই যাঁরা জাতির বরণীয় সেই মহাপুরুষগণই দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের শৈশব ও কৈশোর কিরূপ পারিবারিক আব্‌হাওয়ার মধ্যে কাটিয়াছিল, বিশেষতঃ মাতাপিতার প্রভাব তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবন ও চরিত্র গঠনে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। দেখা যায়, তাঁহাদের পিতামাতা অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ নরনারীর মতই ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল যাহা ঐ সকল স্বনামধন্য মনীষীর মধ্যে অনুক্রামিত হইয়া তাঁহাদিগকে মনুষ্য-জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরবে ভূষিত করিয়াছে। এই গ্রন্থে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ্জ ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনি, লেনিন চিয়াং-কাইশেক প্রভৃতির সঙ্গে শিবাজী, মহাত্মা গান্ধী ও বাংলার বিদ্যাসাগর, গুরুদাস ও আশুতোষের পিতামাতার প্রসঙ্গ ও প্রভাব আলোচিত হইয়াছে। সরস রচনার গুণে বইখানি সুখপাঠ্য ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। কয়েকজন মনীষীর মাতাপিতার ফোটো গ্রন্থের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। এখানি দ্বিতীয় সংস্করণ। এবারে লেনিনের মাতার ছবি নূতন দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন

ভারতের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ

ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হস্তরেখাবিদ্ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, তন্ত্র ও যোগাদি শাস্ত্রে অসাধারণ শক্তিশালী আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন **রাজ-জ্যোতিষী, জ্যোতিষ-শিরোমণি যোগবিদ্যাবিভূষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষার্ণব সামুদ্রিকরত্ন, এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)**; প্রেসিডেণ্ট—বিশ্ববিখ্যাত অল-ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী।



এই অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন যোগী কেবল দেখিবামাত্র মানব-জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। ইঁহার তান্ত্রিক ক্রিয়া ও অসাধারণ জ্যোতিষিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ ও রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, স্বাধীন রাজ্যের নরপতি এবং দেশীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ভারতের বাহিরের, যথা—**ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর** প্রভৃতি দেশের মনীষিবৃন্দকে যেরূপভাবে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে ভূরিভূরি স্বহস্তলিখিত প্রশংসাকারীদের পত্রাদি হেড অফিসে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতের মধ্যে ইনিই একমাত্র জ্যোতিবিদ—যাঁহার গণনাশক্তি উপলব্ধি করিয়া আঠার জন স্বাধীনরাজ্যের নরপতি উচ্চ সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।

ইঁহার জ্যোতিষ এবং তন্ত্রে অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক পণ্ডিত ও অধ্যাপকমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতীয় পণ্ডিত-মহামণ্ডলের সভায় একমাত্র ইঁহাকেই **"জ্যোতিষশিরোমণি"** উপাধি দানে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির অব্যর্থ শক্তি-প্রয়োগে ডাক্তার, কবিরাজ পরিত্যক্ত যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়, জটিল মোকদ্দমায় জয়লাভ, সর্বপ্রকার আপদুদ্ধার, বংশ নাশ হইতে রক্ষা, দুরদৃষ্টের প্রতিকার, সাংসারিক জীবনে সর্ব্বপ্রকার অশান্তির হাত হইতে রক্ষা প্রভৃতিতে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন। অতএব সর্ব্বপ্রকারে হতাশ ব্যক্তি পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিতে ভুলিবেন না।

কয়েকজন সর্ব্বজনবিদিত দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত দেওয়া হইল:

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড় বলেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের অলৌকিক ক্ষমতায়—মুগ্ধ ও বিস্মিত।" হার্ হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট বলেন—"তান্ত্রিক ক্রিয়া ও কবচাদির প্রত্যক্ষ শক্তিতে চমৎকৃত হইয়াছি। সত্যই তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্রের অলৌকিক গণনাশক্তি ও প্রতিভা কেবলমাত্র স্বনামধন্য পিতার উপযুক্ত পুত্রতেই সম্ভব।" সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে। ইনি অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" উড়িষ্যার মাননীয় এডভোকেট জেনারেল মিঃ বি, কে, রায় বলেন—"তিনি অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি—ইঁহার গণনাশক্তিতে আমি পুনঃ পুনঃ বিস্মিত।" বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কত বলেন—"পণ্ডিতজীর গণনা ও তান্ত্রিকশক্তি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত, ইনি দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।" কেউনঝড় হাইকোর্টের মাননীয় জজ রায়সাহেব শ্রীসূর্যমণি দাস বলেন—"তিনি আমার মৃতপ্রায় পুত্রের জীবন দান করিয়াছেন—জীবনে এরূপ দৈবশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নাই।" ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য মহাকবি শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন—"শ্রীমান রমেশচন্দ্র বয়সে নবীন হইলেও দৈবশক্তিসম্পন্ন যোগী। ইঁহার জ্যোতিষ ও তন্ত্রে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা।" উড়িষ্যার কংগ্রেসনেত্রী ও এসেম্বলীর মেম্বার মাননীয়া শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বলেন—"আমার জীবনে এইরূপ বিদ্বান দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষী দেখি নাই।" বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের মাননীয় বিচারপতি স্যার সি. মাধবম্ নায়ার কে-টি বলেন—"পণ্ডিতজীর বহু গণনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সত্যই তিনি একজন বড় জ্যোতিষী।" চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল বলেন—"আপনার তিনটি প্রশ্নের উত্তরই আশ্চর্য্যজনকভাবে বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে।" জাপানের অসাকা সহর হইতে মিঃ জে, এ, লরেন্স বলেন—"আপনার দৈবশক্তিসম্পন্ন কবচে আমার সাংসারিক জীবন শান্তিময় হইয়াছে—পূজার জন্য ৭৫৲ পাঠাইলাম।"

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ, উপকার না হইলে মূল্য ফেরৎ, গ্যারাণ্টি পত্র দেওয়া হয়।

ধনদা কবচ—ধনপতি কুবের ইঁহার উপাসক, ধারণে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও রাজতুল্য ঐশ্বর্য, মান, যশঃ, প্রতিষ্ঠা, সুপুত্র ও শ্রী লাভ করেন। (তন্ত্রোক্ত) মূল্য ৭।৵৹। অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ও সত্বর ফলপ্রদ কল্পবৃক্ষতুল্য বৃহৎ কবচ ২৯।৶৹, প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য। **বগলামুখী কবচ**—শত্রুদিগকে বশীভূত ও পরাজয় এবং যে কোন মামলা মোকদ্দমায় সুফললাভ, আকস্মিক সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ও উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট রাখিয়া কর্ম্মোন্নতিলাভে ব্রহ্মাস্ত্র। মূল্য ৯৵৹, শক্তিশালী বৃহৎ ৩৪৵৹ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়লাভ করিয়াছেন)। **বশীকরণ কবচ** ধারণে অভীষ্টজন বশীভূত ও স্বকার্য সাধনযোগ্য হয়। (শিববাক্য) মূল্য ১১।৹, শক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক বৃহৎ ৩৪৵৹। ইহা ছাড়াও বহু আছে।

অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিকেল এণ্ড এষ্ট্রোনমিকেল সোসাইটী (রেজিঃ)

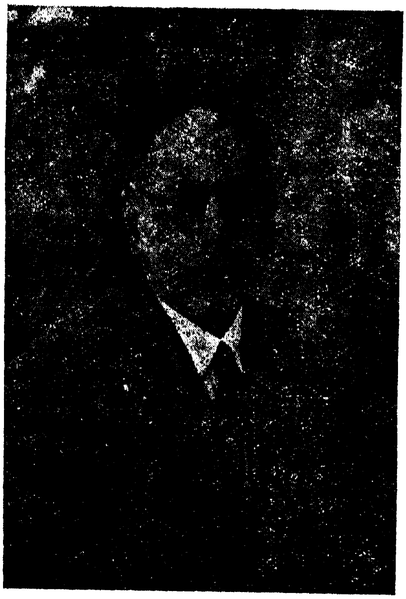
(ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নির্ভরশীল জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক ক্রিয়াদির প্রতিষ্ঠান)

হেড অফিস:—১০৫ (প্র) গ্রে ষ্ট্রীট, **"বসন্ত নিবাস"** (শ্রীশ্রীনবগ্রহ ও কালী মন্দির) কলিকাতা। ফোন: বি, বি, ৩৬৮৫
সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ৮॥৹টা হইতে ১১॥৹টা। **ব্রাঞ্চ অফিস**—৪৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, (ওয়েলিংটন স্কোয়ার), কলিকাতা
ফোন: কলিঃ ৫৭৪২। সময়—বৈকাল ৫।৹টা হইতে ৭।৹। লণ্ডন অফিস:—মিঃ এম, এ, কার্টিস, ৭-এ, ওয়েষ্টওয়ে, রেইন্স পার্ক, লণ্ডন

দেশ-বিদেশের কথা

তক্ষশীলা যাদুঘর-তত্ত্বাবধায়কের পরলোকগমন

তক্ষশীলা যাদুঘরের 'কিউরেটর' বা তত্ত্বাবধায়ক এম্. এন্. দত্তগুপ্ত মহাশয় বিগত ১২ই জুলাই পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ময়মনসিংহে ১৮৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তেইশ বৎসর বয়সে, ১৯১৪ সালে,



এম্. এন্. দত্তগুপ্ত

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগে শিল্পীরূপে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কৃতিত্ব প্রদর্শন দ্বারা তিনি ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করিতে থাকেন এবং সর্ব্বশেষে পঞ্জাবের তক্ষশীলা যাদুঘরের সর্ব্বপ্রথম কিউরেটর পদে নিযুক্ত হন। নিজ ব্যবহারে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এবং দেশী-বিদেশী অন্যান্য লোকেরও তিনি বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। পঞ্জাব-প্রবাসী বাঙালীদের নিকট তাঁহার দ্বার মুক্ত ছিল। তিনি সদাশয় ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন।

মার্কিন বিমানবাহিনী

বিগত ১লা আগষ্ট মার্কিন বিমান-বাহিনীর আটত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। একজন ক্যাপ্টেন এবং দুই জন সহকারী লইয়া প্রথম এই বাহিনী গঠিত হয়, আর বর্ত্তমানে ইহাতে তেইশ লক্ষ লোক নিয়োজিত। বিমানশক্তিতে মার্কিন জাতি জগতে অদ্বিতীয়। বিমান-বাহিনী গঠিত হইবার দুই বৎসর পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট রাইট-ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে প্রথম বিমান ক্রয় করা হয়। সাড়ে তিন শত পাউণ্ডের অনধিক ওজন বিশিষ্ট মাত্র দুইজন লোক লইয়া এই বিমানখানি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল যাইতে পারিত। এই প্রথম যুদ্ধ বিমানখানিতে একটিও কামান ছিল না। প্রথম দিন পরীক্ষা কালে ইহা ঘণ্টায় ৪৭·৯ মাইল গতিতে চলিয়াছিল। মেরিল্যাণ্ডের কলেজ পার্কে জঙ্গীবিমানের প্রথম ঘাঁটি নির্ম্মাণ করা হয়। পৃথিবীতে এ স্থানই জঙ্গীবিমানের প্রথম ঘাঁটি। ১৯১১ সালের মার্চ্চ মাসে কংগ্রেস বিমানবাহিনীর জন্য এক শত পঁচিশ হাজার পাউণ্ডের বরাদ্দ করেন। ১৯১৩ সালে এই বাহিনীতে তেইশ জন অফিসার, একানব্বই জন বিমান সেনা এবং সতরখানা বিমান ছিল। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন প্রথম মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন ইহার বিমান-বাহিনীতে মাত্র পঁয়ষট্টি জন অফিসার, এক হাজার সাতাশী জন বিমান-সেনা এবং পঞ্চান্নখানা বিমান ছিল। ইহার একখানিও কিন্তু কামানবাহী ছিল না। যাহা হউক, এই যুদ্ধেই মার্কিন বিমান-বাহিনী কতকটা কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইল, এবং সন্দিগ্ধচেতারা ইহার কার্য্যকারিতায় আস্থা স্থাপন করিল। শুধু বিমান দ্বারা কোন দেশ বা যুদ্ধ জয় করা সম্ভব না হইলেও এই নূতন উপায় যে ইহাতে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে সে বিষয়ে লোকের আর সন্দেহ রহিল না। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যবর্ত্তী কালে, কতকটা শান্তির সময়েই মার্কিন বিমান-বাহিনীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। জাপান কর্ত্তৃক পার্ল্‌বন্দর আক্রান্ত হইলে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হয়। তখন তাহার উড়ন্ত কেল্লা নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছিল এবং 'সুপারফোর্ট্রেসে'র পরিকল্পনা চলিতেছিল।

এই দ্বিতীয় মহাসমরে মার্কিন বিমানবাহিনী খুবই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। পর্য্যবেক্ষণকারী বিমান, জঙ্গীবিমান প্রভৃতি শত্রুর ঘাঁটি নির্ণয় করিয়া তাহা আক্রমণে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু মার্কিন বিমানবাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য্য হইল সমরাঙ্গনে যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ। হিমালয়ের সু-উচ্চ পৃষ্ঠদেশ দিয়া ভারতবর্ষ হইতে চীনে মার্কিন বিমানে করিয়া যুদ্ধোপকরণ অহরহ প্রেরিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কিন্তু এ কার্য্য অসম্ভব বিবেচিত হইত।

১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



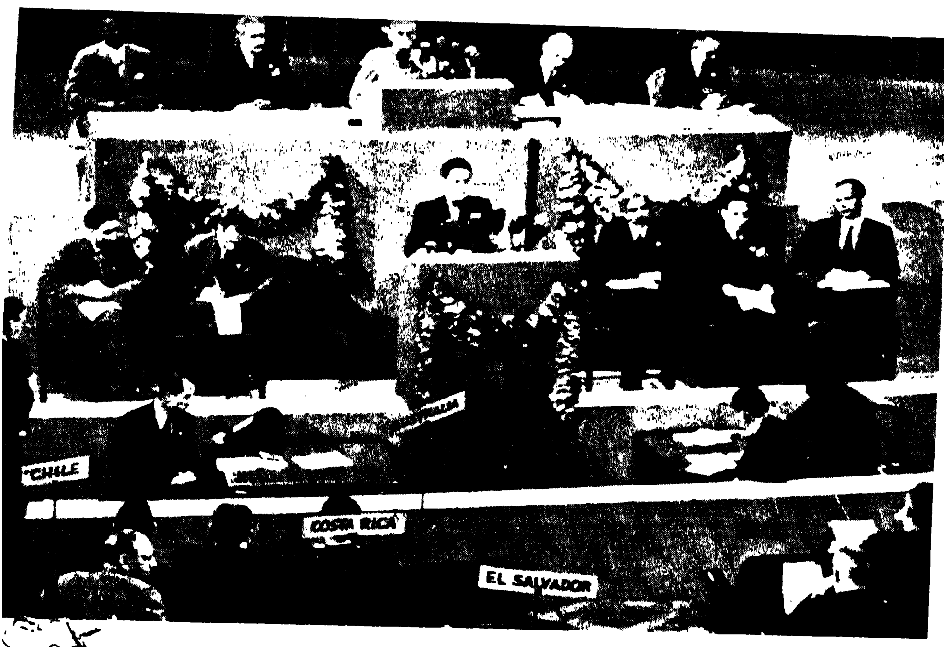
হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা-রত আকবর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা]

শ্রীতিলক বন্দ্যোপাধ্যায়



পটসডামে ত্রিশক্তি-সম্মেলনের একটি অধিবেশন



সম্মিলিত রাষ্ট্র-সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদানরত চীনের প্রতিনিধি মিস য়ু ই-ফ্যাং। পশ্চাতে (বাম দিক হইতে) সি এল সিম্পসন, রিকার্দো জে আলফারো, ফিল্ড মার্শ্যাল স্মাট্‌স। মি. ফ্যাঙের ডান দিকে সর রামস্বামী মুদালিয়ার, ম্যানুয়েল নোরিজা মরেইলস এবং ম্যাক্স গিডিয়োনস

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৫শ ভাগ
১ম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৫২

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

যুদ্ধোত্তর জগৎ

যুদ্ধবিরতি এখন সম্পূর্ণ, কিন্তু যুদ্ধের আগুনের তপ্ত হলকা এখনও পৃথিবীময় সমানেই বহিতেছে। সম্মিলিত জাতিবর্গের জয়ের ফলে পৃথিবীতে শান্তি-স্বাধীনতার ঢেউ সারা জগতে বহিয়া যাইবে এই সুখস্বপ্ন যাঁহারা এতদিন দেখিতেছিলেন তাঁহাদের মোহবিমুক্তির সময় আসিয়াছে কিনা জানি না। মাঠের উপর এখন যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে জয়মদে মত্ত ইংরেজী ভাষাভাষীদিগের উদ্দাম উচ্ছ্বাস একদিকে এবং অন্যদিকে সমস্ত পৃথিবী "করতলগত আমলকবৎ" হওয়ায় ন্যায়, ধর্ম আদি জলাঞ্জলি দিয়া "স্বার্থই পরমার্থ" এই তত্ত্বের প্রচারের চেষ্টা ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছুই লক্ষ্য করার নাই। জগতের যে সকল জাতি বিজিত শত্রুপক্ষের অধীন ছিল তাঁহাদের কিভাবে কতটা স্বাধীনতা দেওয়া হইবে সে বিষয়ে কোনও বিশেষ বিচার এখনও হয় নাই, তবে কোরিয়া দেশ সম্পর্কে যাহা শুনা যাইতেছে তাহাতে শাসকের টুপী বদল ভিন্ন অন্য কিছুই হইবে এরূপ কোন কথাই উঠে নাই। যাহারা বিজেতৃবর্গের কঠোর শাসনে এতদিন নিষ্পেষিত হইতেছিল তাহাদের অবস্থা কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। "চতুঃপ্রকার স্বাধীনতা" নামক মার্কিনী গঞ্জিকার ধূমের তীব্র গন্ধও হাওয়ায় মিলাইয়া গিয়াছে, এখন বাকী আছে মাত্র ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞদিগের উক্ত মাদক দ্রব্য চতুষ্টয়ের অপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতার পালা।

এখন কাগজে পড়া যাইতেছে যুদ্ধে দুষ্কৃতির দরুন অপরাধী যাহারা তাহাদের বিচারের ব্যবস্থা হইতেছে। বলা বাহুল্য, ইহা ইতিহাসের আদিম ও মধ্যযুগের প্রথমভাগের বিজেতাদিগের প্রথা ও পন্থার রূপান্তর মাত্র। যদি সত্য সত্যই বিচারের ব্যবস্থা হইত তবে তাহা যুদ্ধের উষ্মা ও অনাচারের প্রবাহ শেষ হইবার পর উপযুক্ত বিচারকবর্গের সম্মুখে বিজেতা ও বিজিত দুই পক্ষেরই অভিযোগের শুনানী হইত। ন্যায়-বিচার সভ্যতার অতি বড় চরম আদর্শ বস্তু, তাহার ব্যবহার অভিজ্ঞ, ধীর স্থির ব্যক্তিগণই করিতে পারেন, এবং সুবিচার তখনই হইতে পারে যখন বিচারকের মনে হিংসা-দ্বেষের লেশমাত্র থাকে না। বিজিতবর্গের অসংখ্য দুষ্কৃতি দুরাচারের কথা জগৎ শুনিয়াছে, তাহার যে বিচার হওয়া উচিত এবং অপরাধের শাস্তি বিধানও নিতান্তই প্রয়োজন একথাও সর্ববাদিসম্মত কিন্তু বিচার নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত হওয়া প্রয়োজন এবং সকল অপরাধীর সমান বিচার হওয়া উচিত, সে যে কোন পক্ষেরই হউক না কেন। এবং বিচারকবর্গের প্রতিহিংসাপরায়ণ না হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে বিচারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুই শোনা যায় নাই তবে পাশ্চাত্ত্য "সভ্যতা" যে ভাবে মধ্যযুগের দিকে ফিরিয়া চলিতেছে তাহাতে ঐ বিচার মহাযুদ্ধেরই এক পর্ব হইবে ইহা অসম্ভব নহে এবং সে পর্বের নাম "মুসাক্কার পর্ব"।

সুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে এ দেশে শোকোচ্ছ্বাস উঠিয়াছে দেখিয়া এক মার্কিনী সংবাদপ্রেরক খবর পাঠাইয়াছেন যে তাঁহার দেশে ইহাতে অনেকে রুষ্ট হইয়া জানিতে চাহিয়াছেন যে সুভাষ যুদ্ধকালে যে কার্যপন্থা লইয়াছিলেন সেজন্য তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁহার দুষ্কৃতির বিচার হইবে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের প্রশ্ন এই যে, সে অপরাধের বিচার করিবে কে? যদি সত্য সত্যই সুভাষ মহাপ্রয়াণ করিয়া থাকেন তবে তিনি মানুষের বিচারের অতীত এবং ইতিহাসের বিচার তাঁহার স্বপক্ষে যাইবে ইহাই ভারতবাসীর বিশ্বাস। কেন-না, ইতিহাস বিচার করে কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের বিষয়, কর্মপন্থার নহে; কর্মপন্থা ভুল হইলে তাহার পরিণতিতে কর্মকর্ত্তার বুদ্ধির বিভ্রমই প্রদর্শিত হয়। এ বিষয়ে বিচারের সময় আসিবে আরও কয়েক বৎসর পরে এবং তত দিনে মার্কিন দেশবাসী এবং অন্য দেশবাসীরও বিচারবুদ্ধির দ্বার ও জানালা খুলিয়া গিয়া জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিবে। আমরা জানি না সুভাষ জীবিত কি মৃত, যদিও তাঁহার মৃত্যুসংবাদে সংশয় করিবার যথেষ্টই কারণ দেখা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে বিচার করা এখন বৃথা।

এই মহাযুদ্ধের উদ্দেশ্য কি তাহা এশিয়াবাসী এত দিনে অল্পে অল্পে বুঝিতেছে, যুদ্ধকালে মিত্রপক্ষ যে সকল ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা যদি যথার্থই সত্য হইত তবে যুদ্ধে দুষ্কৃতির বিষয়ে এত উচ্চ কণ্ঠে কেহই কথা বলিতে পারিত না। এই

মহাযুদ্ধের আরম্ভ হয় চীন দেশে ১৯৩৭ সালে, একথা এখন সকলেই স্বীকার করিবে। এবং সেই ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই আট বৎসরের যুদ্ধে কোনও দুষ্কৃতি—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—করে নাই এমন কোন দেশ বা জাতি যদি থাকে তবে যেন সুভাষের বিচার সে দেশের বিচারকেই করে, অর্থাৎ বাইবেলের কথায়, যে নিষ্পাপ সেই যেন প্রথম প্রস্তর নিক্ষেপ করে। লক্ষ লক্ষ চীন নরনারীর নৃশংস হত্যার অপরাধে প্রধান অপরাধী জাপান সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই হত্যার অস্ত্র-নির্মাণের মালমশলা টাকার লোভে জোগাইয়াছিল কোন্ দেশ এবং সৈন্ত ও মাল-সরবরাহের জন্ত আট লক্ষ টন জাহাজ ভাড়া দিয়াছিলই বা কোন্ দেশ? ফিন্‌ল্যাণ্ডের উপর অকারণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলই বা কোন্ দেশ, বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ অসহায় নরনারীকে "যুদ্ধের কারণে সাহায্য অসম্ভব" বলিয়া মৃত্যুর পথে চালান দেয় বা কোন্ দেশ? স্বাধীন চীনের শাসক-বর্গের শত দোষত্রুটির কথায় ইংরেজী ও মার্কিনী কাগজ ভরিয়া উঠিয়াছিল কয়দিন পূর্বে তাহা কি সত্য? যদি সত্য হয় তবে অপরাধের বিচার করিবে কে? সর্বশেষে হিরোশিমায় লক্ষাধিক অসামরিক আবালবৃদ্ধবনিতাকে পৈশাচিক ভাবে পোড়াইয়া মারার আদেশ দেওয়াটা সুকৃতি না দুষ্কৃতি?

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে মৌলানা আজাদের অভিমত

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নের চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী সমাধান কিরূপে করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শ্রীনগর হইতে প্রদত্ত (২০ আগষ্ট) এক বিবৃতিতে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া তিনি উহাতে পর্য্যাপ্ত আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কংগ্রেসই এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃত পথ নির্দেশ করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে মৌলানা সাহেবের বিবৃতির অংশটি নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষ হইলে গণপরিষদ গঠন করা হইবে। যুদ্ধ এখন শেষ হইয়া গিয়াছে। গণপরিষদ গঠন করিতে বিলম্ব করার অজুহাত হিসাবে একমাত্র কারণ দেখান যাইতে পারে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের অভাব। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা আর কোন বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কারণ এই সমস্যার সমাধানের একটি পন্থা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সভা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। মুসলিম লীগের ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবি হইতে যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, কংগ্রেস ভারতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনগণের কল্যাণ এবং সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সমস্যাটির কথা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। যে কোন অঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই আত্মনিয়ন্ত্রণ সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের সকলের ইচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া চাই এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অন্ত কোন দলকে বাধ্য করা চলিবে না।

"আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে স্বীকার করিয়া লওয়ার চরম সীমা পর্যন্ত কংগ্রেস গিয়াছেন। এমন কি দেশের সাধারণ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে বিভক্ত করার নীতিকেও কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছেন। কংগ্রেস এইরূপ করিয়াছেন একান্তভাবে এই আশা পোষণ করিয়া যে, সমস্যা-গুলিকে সংস্কারহীনভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এরূপ কতকগুলি ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে যাহার ফলে প্রত্যেকেই স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতীয় রাষ্ট্র গঠনে সহযোগিতা করিতে পারিবে। স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশেরই প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু রাষ্ট্রের কোন অংশ যদি অন্ত রূপ ইচ্ছা করে তাহা হইলে উহাকে উহার নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে সমস্ত দায়িত্ব লইতে হইবে। গণপরিষদে এইরূপ অঞ্চলের প্রতিনিধিরা নিজেদের দাবি-দাওয়া উপস্থাপিত করিতে পারিবেন এবং এ সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্ত তাঁহাদের ভোটের উপর নির্ভর করিয়া করা হইবে।"

পূর্ণ সহযোগিতা ও স্বাধীন ভারতের ভিত্তি

অতঃপর এই সমস্যার আলোচনা-প্রসঙ্গে মৌলানা সাহেব বলেন, কংগ্রেসের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে কেবলমাত্র ভারতের সকল সম্প্রদায় এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশের পূর্ণ সহযোগিতা এবং শুভ ইচ্ছার উপর ভিত্তি করিয়াই স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব, কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা বাধ্য-বাধকতার দ্বারা উহা সম্ভব নহে। উপরন্তু কংগ্রেস ইহাও জানাইয়াছেন যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অংশ নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী যাহাতে কার্য করিতে পারে তাহার জন্ত তাহাদের যথাসম্ভব স্বাধীনতা থাকা উচিত। এই স্বাধীনতা কেবলমাত্র তাহাদের সাধারণ কল্যাণের জন্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলি স্বাধীন দেশের মধ্যেও এরূপ বিধি-নিষেধ অনেক সময় থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন দেশই বর্তমান যুগে আর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। ভারত বিভাগ সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব বলেন,

"আমার দিক হইতে আমি এইরূপ বলিতে পারি যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া যত্নের সহিত চিন্তা করিয়া আমি আজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতকে বিভক্ত করা একেবারেই অসম্ভব এবং উহা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের নিজেদেরই স্বার্থের পরিপন্থী হইবে। কিন্তু ভারতের এক দল মুসল-মানের মনে নানারূপ সন্দেহ রহিয়াছে। এই সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে সেইদিন যেদিন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, তাহাদেরই উপর তাহাদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।"

ইতিহাসের শিক্ষা উপেক্ষা না করিয়া তাহা কাজে লাগাই-বার চেষ্টাই সর্বথা বাঞ্ছনীয়। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের ইংরেজ বাসিন্দারা যখন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া পৃথক রাষ্ট্র গঠনের জন্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন তখন বলপূর্বক তাহাদিগকে যুক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ধরিয়া না রাখিলে ইংরেজের নিজেরই আজ কি অবস্থা হইত তাহা বিবেচনা করা উচিত। অন্ততঃ

...রিকার শক্তিশালী আমেরিকার অভ্যুদয় আমরা দেখিতাম ইহা নিশ্চিত। আত্মঘাতী দাবির সর্বনাশা পরিণাম লিঙ্কন ...চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন তাই উহা রোধ করিবার জন্য ...নি বলপ্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আজ আমেরিকা ...হার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দান ...রিলে একজনও বাহিরে যাইবার কথা তুলিবে না ইহা ...বালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে যে সোভিয়েট রাশিয়ার ...ষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরা হয় সেখানেও ...মরা পাকিস্থানী সমস্যা সমাধানের সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা ...ধুনিক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সে-দিন ষ্টালিন রাশিয়ার ...ন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহকে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দিয়াছেন ...ই কথাটাই বড় করিয়া আমাদের শোনান হয়। গোড়ার ...থাটা কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিতেও চাহি না, জোর ...লায় উহা আমাদিগকে বলাও হয় না। সোভিয়েট রাষ্ট্র-...ঠনের প্রথম দিকে এই ষ্টালিনই এক ও অখণ্ড সোভিয়েট ...শিয়া গঠনের জন্য শ্বেত রুশিয়া, ইউক্রেন প্রভৃতি স্থানের ...ধিবাসীদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে দ্বিধা করেন নাই, ...সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই একীকরণের সময় সহস্র সহস্র লোক ...রকারী বন্দুকের গুলিতে মরিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক উহারই ...ত্যক্ষ ফল—দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ষ্টালিনকে পৃথিবীর ...লাকে দস্যু, হত্যাকারী, নরপিশাচ প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত ...রিয়াছে—তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করেন নাই। যুক্তি ও ভাল ...থায় যেখানে কাজ হয় নাই তিনি সেখানে বৃহত্তর স্বার্থের ও ...দেশের কল্যাণের জন্য বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণেও ...ণ্ঠিত হন নাই। ইহারই ফল আজিকার এক অখণ্ড ও অসীম ...ক্তিশালী সোভিয়েট রাশিয়া। এক ও অখণ্ড শক্তিশালী ...ষ্ট্রের অধীনে মাইনরিটি আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ বজায় রাখিবার ...যোগ লাভ করিলে সে আর বাহির হইতে চাহিবে না, ...আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া তাহারই সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ...প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে মাইনরিটি যদি তাহার ধর্ম ভাষা ও ...সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার সুযোগ পায়, অখণ্ড রাষ্ট্রের বুদ্ধি ও ...শক্তির উপর যদি তাহার আস্থা থাকে, তবে সে কেন বাহিরে ...যাইবার দাবি তুলিবে?

মাইনরিটি সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসের কর্তব্য

মাইনরিটি সমস্যা সমাধানে অথবা ভারত বিভাগের প্রশ্ন সম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্তব্য কি? সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে কংগ্রেস আজ পর্যন্ত বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পর হইতে যে দোলায়মান চিন্তা ও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান তোষণ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে তাহার ফল ভাল হয় নাই। ইহাতে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের সন্দেহ নিরসন সম্ভব হয় নাই বরং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ইহাদ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণই হইয়াছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্নার মুসলিম লীগ "অত্যাচারে"র যে-সব কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহার একটিও তিনি প্রমাণ করিতে পারেন নাই, অধিকন্তু লোকে কংগ্রেসকেই অহেতুক মুসলিম তোষণের জন্য দোষ দিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পাকিস্থান সম্বন্ধে কংগ্রেসের দৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাব অবলম্বনের সময় আসিয়াছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ পদদলিত করিয়া এক দল লোক ভ্রান্তপথে পদক্ষেপ করিয়া নিজেরাও ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে, দেশকে সর্বনাশের অতল গহ্বরে টানিয়া লইতেছে ইহা বুঝিয়া তাহাকে বাধা না দেওয়া শুধু অন্যায় নয় বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি ইহা বিশ্বাসঘাতকতা। প্রয়োজন হইলে এখানে কঠোরতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নাই।

পাকিস্থানের সমর্থনে এ দেশে গণতন্ত্রের যে যুক্তি উঠিতেছে তাহাও অপূর্ব। শতকরা ২৫ জন মুসলমান শতকরা ৭৫ জন হিন্দুর অধীনে থাকা সর্বনাশকর বলিয়া মনে করেন কিন্তু শতকরা ৫৫ জনের পায়ের নীচে শতকরা ৪৬ জনকে পিষিয়া মারিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। মাইনরিটি হিসাবে তাঁহারা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলিয়াছেন কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘটাইবেন তাঁহারা যেখানে আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ সক্ষম মেজরিটি সেখানে।

সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ইংরেজ এই অপূর্ব "যুক্তি" মানিয়া লইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান লোক বা জাতি ইহা স্বীকার করিতে পারিবে না। তার উপর এ দেশে গণতন্ত্রেরও একটা নূতন ব্যাখ্যা সুরু হইয়াছে। গণতান্ত্রিক সকল দেশেই আমরা দেখি দেশের সকল প্রতিনিধি একত্র হইয়া আলোচনার সুযোগ লাভ করেন কিন্তু কাজ হয় মেজরিটির অভিমতে। সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দাবিও কেহ তোলে না, যে মাইনরিটি কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার পর তাহারা উহার বিরুদ্ধাচরণ করে না, মানিয়াই লয়। এদেশে ভারতশাসন আইনের মাকাল ফলের অন্তরালে যে নব-গণতন্ত্র ইংরেজ আমদানী করিয়াছে তাহাতে দেখিতেছি যত গণতন্ত্র সব মাইনরিটির বেলায়, মাইনরিটিকে খুশী না করিয়া মেজরিটির হাত-পা নাড়িবারও উপায় নাই। যে-কোন এক দল—তা সে যতই স্বার্থান্বেষী ও অপদার্থ লোক লইয়াই গঠিত হউক না কেন—ইচ্ছা করিলেই বৃহত্তর স্বার্থকে অনায়াসে আটকাইয়া রাখিতে পারে। ইহারই চূড়ান্ত পরিণতি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দাবি। আব্রাহাম লিঙ্কন যখন আমেরিকার ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে চাহিয়াছিলেন তখন এই ক্রীতদাসদের এক দল আবেদনপত্র পাঠাইয়া জানিতে চাহিয়াছিল কোন্ আইনের বলে এবং কোন্ অধিকারে রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন তাহাদিগকে মুক্তি দান করিতেছেন। এ দেশেও এরূপ ক্রীতদাসের অভাব নাই, পদে পদে তাহা দেখা গিয়াছে।

ইংলণ্ডে পাকিস্থান বিরোধী সভা

বার্মিংহামে পাকিস্থান বিরোধী ভারতীয় মুসলমানদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভাপতি চৌধুরী আকবর খাঁ ঘোষণা করেন, "আমরা হিন্দু ও শিখ হইতে পৃথক নহি। কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা দাবি করে বলিয়া আমরা কংগ্রেসের সহিত একমতাবলম্বী ভারতীয়।" শ্রমিক সমিতির নেতৃবর্গও এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। বার্মিংহাম ভারতীয় সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ জান মহম্মদ, বাংলার পক্ষ হইতে মহম্মদ আব্বাস,

ভারতীয় নাবিকদের পক্ষ হইতে সুরত আলি, লিভারপুলের ভারতীয়দের পক্ষ হইতে জাফর ইকবাল কুরেসী, ব্রাডফোর্ড হইতে গোলাম সারসামাস এবং গ্লাসগো, মাঞ্চেষ্টার, উলভার হ্যামটন ও কভেন্ট্রি ফেডারেশনের পক্ষ হইতে ফজলুল হোসেন সভায় যোগদান করেন। সিমলায় মিঃ জিন্নার আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া জান মহম্মদ বলেন যে মিঃ জিন্না যেরূপ কাজ করিয়াছেন তাহার জন্যই ইংরেজরা জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষের তথাকথিত অনৈক্যের কথা প্রচার করিতে পারে।

মিঃ কুরেসী বলেন যে, মিঃ জিন্না এবং তাঁহার অনুচরবর্গ দেশের সেবা করিতেছেন না; তাঁহারা বরং কোন প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া কাজ করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে, মিঃ জিন্নার পিছনে যে শক্তি রহিয়াছে সে শক্তি হইল ব্রিটিশ রাজ, ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণ নহে। পাকিস্থান হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের পক্ষেই অধিকতর ক্ষতিকর।

এই সভায় পাকিস্থানের বিরোধিতা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে:— (১) সম্মিলিত ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাধীনতা অর্পণ করিতে হইবে। (২) ভূমি সমস্যার আমূল সংস্কার করিতে হইবে। (৩) নিয়োগকালীন বেতনের হার বাড়াইতে হইবে। (৪) কয়লার খনিতে নারী শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা রদ করিতে হইবে এবং (৫) খাদ্যদ্রব্য এবং বস্ত্র দুর্ভিক্ষের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সভার পরের দিন চৌধুরী আকবর খাঁ আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন:

"আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হইবে; এমন কি যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সমস্ত প্রদেশেও মুসলিম লীগ পরাজিত হইবে। কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হইবে। কংগ্রেসকে যদি ছিন্নভিন্ন এবং নিগৃহীত করা না হইত এবং মুসলিম লীগ ও হিন্দুসভার মত কংগ্রেসকেও যদি বিনা বাধায় কাজ করিতে দেওয়া হইত তাহা হইলে কংগ্রেস নিঃসংশয়ে মুসলমান ভোটারদের শতকরা ৯৯টি ভোটই লাভ করিতে পারিত।"

কেম্ব্রিজবাসী চৌধুরী রহমত আলি নামক এক ব্যক্তি ১৯৩৩ সাল হইতে পাকিস্থানের প্রচার কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। সচিত্র পুস্তিকা মারফৎ তিনি পৃথিবীব্যাপী প্রচারকার্য করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বশেষ পুস্তিকায় দেখা যায় তিনি আর পাকিস্থানে সন্তুষ্ট নহেন, সমগ্র ভারতবর্ষকে মুসলমান শাসনাধীন করিয়া তিনি দেশের নাম বদলাইয়া উহাদের "দীনিয়ায়" পরিণত করিতে চান। এই কার্য সাধনের প্রথম ধারা অনুসারে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ পাকিস্থানগুলিকে তিনি ভারত বিজয়ের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে চান। ইঁহার এই উদ্ভট কল্পনা মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোকের মনের মত হইলেও বুদ্ধিমান কোন লোককেই উহা প্রভাবিত করিতে পারে নাই। রহমত আলির এই প্রচার কার্য ইংলণ্ড প্রবাসী সব মুসলমানকে দলে টানা তো দূরের কথা, তাহাদের একটা প্রকাণ্ড বড় ও প্রভাবশালী অংশই প্রকাশ্যেই পাকিস্থানের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আগামী সাধারণ নির্বাচন

শীঘ্রই কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সমস্ত ব্যবস্থা-পরিষদে সাধারণ নির্বাচন হইবে। অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন হওয়া উচিত ইহাতে দ্বিমত হয়ত কাহারও নাই, কিন্তু নির্বাচক তালিকা যেরূপ অশোভন দ্রুততার সহিত তৈয়ারি হইতেছে এবং উহা সম্পূর্ণ ও নির্ভুল করিবার চেষ্টা যেভাবে ব্যাহত করা হইতেছে তাহাতে নির্বাচনের সার্থকতা সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সংশয় জাগিয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে গত নির্বাচন হইয়াছে ১৯৩৪ সালে। এই এগার বৎসরের পুরানো নির্বাচক তালিকা অবলম্বন করিয়াই ভারত-সরকার নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতেছেন। তালিকা সংশোধনের কোন সুযোগমাত্র কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। ইহার ফল হইবে এই যে, গত এগার বৎসরে যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের নাম তালিকায় থাকিয়া যাইবে এবং এই সময়ের মধ্যে যাহারা ভোট দানের অধিকার অর্জন করিয়াছে তাহারা বাদ পড়িবে। মৃত ব্যক্তিদের নামে ভোট দেওয়ার সুযোগ এই ভাবে দিয়া গবর্মেণ্ট প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার পথ প্রথম হইতেই উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেন। প্রাদেশিক তালিকাগুলিতেও প্রায় এই একই ব্যাপার ঘটিতেছে। এখানেও তালিকা সংশোধনের ও নূতন ভোটারদের নাম দাখিল করিবার জন্য খুব অল্প সময় দেওয়া হইয়াছে। যথেষ্ট পরিমাণ ফরম ছাপা না হওয়ায় অনেকেই উহা পায় নাই বলিয়া নাম দাখিল করিতে পারে নাই, এই অভিযোগও হইয়াছে। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিবার পর প্রদেশগুলিতে আমলাতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির যে নমুনা দেখা গিয়াছে তাহাতে ইহারা নির্বাচনে কংগ্রেসের ও মুসলিম লীগবিরোধী মুসলমান দলগুলির বিরুদ্ধে সর্ববিধ অসাধুতা অবলম্বনে প্রশ্রয় দান করিবে এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হইতেছে। ইতিমধ্যেই যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-বিরোধী কুখ্যাত গবর্ণর সম্বন্ধে কর্মতৎপরতার অভিযোগ প্রকাশ্যেই উঠিয়াছে। লাটসাহেব উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সরকারের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দ্বিবিধ কর্মতৎপরতার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা এই প্রতিবাদে হয়ত আস্থা স্থাপন করিতে পারিবেন না। বাংলা দেশের প্রথম নির্বাচনে নবাব ফারোক্কীর নির্বাচনের ইতিহাস ও তৎসংক্রান্ত মামলার কথা হয়ত এত শীঘ্র সকলে ভুলিয়া যান নাই। এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও মুসলিম লীগের পক্ষে সরকারের অপ্রকাশ্য সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হইলেও লোকে বিশ্বাস করিবে না।

নির্বাচনে কোন দল বা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতিহত ক্ষমতা বজায় রাখিতে হইলে নির্বাচক মণ্ডলী যত ছোট হয় ততই সুবিধা। ভারতবর্ষে নির্বাচক মণ্ডলী যত দূর সম্ভব ছোট করিয়া রাখিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সতত আগ্রহশীল। জনমত অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিলে ভোটাধিকার সামান্য একটু সম্প্রসারিত হয় এই মাত্র। কংগ্রেস বহু বার দাবি করিয়াছে

অবিলম্বে দেশে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তিত করা হউক। দেশের জনসাধারণের একমাত্র বিশ্বাসভাজন প্রতিষ্ঠান রূপে কংগ্রেস দেশের সেবা করিয়াছে, ত্যাগ ও জনসেবায় কংগ্রেসের সুদৃঢ় ভিত্তি, কংগ্রেস তাই কোন সময়েই ব্যাপকতম ভোটাধিকারে ভয় পায় নাই, বরং উহাই বারবার দাবি করিয়াছে—এখনও করিতেছে। এবারও কংগ্রেস-সভাপতি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতারা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এই নির্বাচনেই প্রবর্তন করা ঠিক বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এই দাবি স্বীকার করিবার সাহস ব্রিটেনের বর্তমান শ্রমিক গবর্মেণ্টেরও আছে বলিয়া মনে করা কঠিন।

ভারতে প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার জন্য আগ্রহশীল সাম্রাজ্যবাদী গবর্মেণ্ট নির্বাচনের পথে সাধ্যানুসারে বাধা সৃষ্টি করিবে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই কায়েমী স্বার্থবাদীরা গণজাগরণের পথে এই ভাবেই বাধা দিয়া আসিয়াছে। সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করিতে যখন তাহারা বাধ্য হইয়াছে তখন নানা ভাবে উহার প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি তাহারা করে নাই। ইউরোপের বহু দেশের সাধারণ নির্বাচন ও গণভোটের ইতিহাসে ইহার সাক্ষ্য মিলিবে। ব্রিটেনের গত সাধারণ নির্বাচনেও ইহা ঘটিয়াছে। এ দেশেও ইহা ঘটিবার সকল সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে। ইহা সত্ত্বেও নির্বাচন যেন বন্ধ না থাকে।

সাতারা জেলায় পুলিস শাসন

বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় একদল সন্ত্রাসবাদী লোক ভারতে ব্রিটিশ শাসন অচল করিবার উদ্দেশ্যে পাল্টা গবর্মেণ্ট গঠন করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেছে এবং পুলিস কর্মচারীদের আক্রমণ করিতেছে এই কারণ দেখাইয়া গবর্মেণ্ট সেখানে সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করিয়া যে পুলিস-শাসন স্থাপন করিয়াছেন তাহা লইয়া আন্দোলন সুরু হইয়াছে। ১৯৪২ সাল হইতে এই আন্দোলন চলিতেছে ইহাই গবর্মেণ্টের অভিযোগ এবং এজন্য প্রায় দুই হাজার লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে, পুলিসের গুলিতে তের জন প্রাণ দিয়াছে, জেলে মারা গিয়াছে ছয় জন এবং চৌত্রিশটি গ্রামের উপর ৩৭০০০ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছে। ইহার পরও জরিমানার ভার বাড়িতেছে, দুই ব্যক্তির উপর যথাক্রমে ২০ হাজার ও ১০ হাজার টাকা হিসাবে জরিমানা ধার্য হইয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বর্তমান রীতি অনুসারে মুসলমান, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়, সিভিক গার্ড, এ আর পি, প্রাক্তন ও বর্তমান সেনাদল এবং যাহারা পুলিসকে সাহায্য করিয়াছে তাহাদিগকে পাইকারী জরিমানা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে ইহা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি সাতারায় সাতারা জেলা কংগ্রেস কমিটির যে সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়। সাতারার বর্তমান অবস্থার জন্য সরকারকে এবং পুলিসের আতঙ্কজনক ব্যবহার ও নিপীড়নকে দায়ী করিয়া সভায় একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কমিটি মনে করেন যে সরকার যদি অতিরিক্ত পুলিস ও সৈন্যবাহিনী তুলিয়া লন, পাইকারী জরিমানা ধার্য্য ও আদায় বন্ধ করিয়া দেন, জনসাধারণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিগণকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের সম্মতি ও সহযোগিতা লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন এবং জনগণের পৌর স্বাধীনতা ফিরাইয়া দেন তাহা হইলে বর্তমান অবস্থার উন্নতি হইতে পারে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সাতারা জেলার ঘটনাবলী সম্বন্ধে বোম্বাই সরকার বিশেষ প্রচারকার্য সুরু করিয়াছেন এবং এ দেশের ফিরিঙ্গী সংবাদপত্রগুলি উহা সমর্থন করিতেছে। সাতারার ঘটনার সূত্রপাত কোথা হইতে হইয়াছে তাহার বিবরণ দিয়া কংগ্রেস কমিটির উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে ১৯৪২ সালের পূর্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া ডাকাত ও ফেরারী আসামীরা প্রকাশ্যে ও ব্যাপক ভাবে সাতারা জেলার কোন কোন অঞ্চলে বলপ্রয়োগপূর্বক সমাজের অকল্যাণকর কাজ করিতে আরম্ভ করে; পুলিসকে উহাতে নিষ্ক্রিয় থাকিতে দেখিয়া লোকে ভাবে যে উহাতে পুলিসের পরোক্ষ সমর্থন আছে। ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইবার পর গবর্মেণ্ট সমগ্র দেশে যে দমননীতি সুরু করেন সাতারা জেলাও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই। শান্তিপূর্ণ কৃষক ও কংগ্রেসকর্মীদের উপর পুলিস সেখানে গুলিবর্ষণ করে। পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়া কড়ায়-গণ্ডায় উহা আদায় করা হয়। সরকারের এই সকল কার্যের ফলে জেলার সর্বত্র আতঙ্কের সঞ্চার হয় এবং সর্বত্র রীতিমত অরাজকতা দেখা দেয়। কংগ্রেসকর্মীরা আত্মগোপন করিয়া এইরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসের সহিত সংগ্রাম করিবার চেষ্টা করেন এবং সমগ্র জেলায় ন্যায় ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন। এই অবস্থার মধ্যে সর্বত্র কংগ্রেসের অহিংসা নীতি রক্ষিত হয় নাই ইহা কংগ্রেস কমিটি স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু এজন্য তাঁহারা সরকারকেই দায়ী করিয়াছেন। কংগ্রেসকর্মীদের এই চেষ্টাকেই গবর্মেণ্ট সম্ভবতঃ পাল্টা গবর্মেণ্ট গঠনের চেষ্টা বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

পুলিসের অতি উৎসাহ প্রভৃত জুলুম সাতারার অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ হইতে ইহাই বুঝা যায়। শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও দেও এক বিবৃতি-প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে সাতারা জেলায় এখনও পুলিস রাজ চলিয়াছে। প্রতিদিন বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হইতেছে, সেবাদল প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইতেছে। পাইকারী জরিমানা ধার্য করিয়া ন্যায় বিচারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়াই উহা আদায় করা হইতেছে, বোম্বাই পুলিসের দেড় হাজার সশস্ত্র অফিসার ও পুলিস দিবারাত্র সাতারায় টহল দিতেছে। গত তিন বৎসরে পুলিসের নির্মম শাসন যাহা করিতে পারে নাই, কংগ্রেস নেতারা অনায়াসে অল্প দিনের মধ্যেই তাহা করিতে পারেন, সাতারায় শান্তি ও শৃঙ্খলা তাঁহারা ফিরাইয়া আনিতে পারেন ইহা অনেকেরই ধারণা। গবর্মেণ্ট এখনও কংগ্রেসকে সে সুযোগ দেন নাই, এখনও তাঁহারা সাতারা জেলায় উগ্র পুলিস শাসনের ষ্টীম-রোলার চালাইয়া শান্তি স্থাপনের বৃথা চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন।

বৈদ্যের বাজারের ঘটনা সম্পর্কে সরকারী ও বে-সরকারী বক্তব্য

রংপুর জেলায় বৈদ্যের বাজার গ্রামে পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে কংগ্রেসকর্মী হরিদাস লাহিড়ীর বিবৃতি প্রকাশের পর উত্তর-বঙ্গের কংগ্রেস, লীগ ও কৃষক সভার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এক বিবৃতি দিয়াছেন। ইঁহাদের নাম ও পরিচয় এই: শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য), কাজী এমদাদুল হক (বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য), মৌলভী পুনিরউদ্দীন আমেদ (কুড়িগ্রাম মহকুমা মুস্লিম লীগ), শ্রীহরিদাস লাহিড়ী (সম্পাদক, কুড়িগ্রাম মহকুমা কংগ্রেস), মৌলভী নজির হোসেন খোন্দকার (সম্পাদক, মহকুমা মুস্লিম লীগ), শ্রীসুশীলকুমার সেন (সহকারী সম্পাদক, মহকুমা কৃষক সমিতি)। বিবৃতিটির কতকাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :

> গত ২৯।৭।৪৫ তারিখে লালমণিরহাট থানার অন্তর্গত বৈদ্যের বাজার গ্রামের জনসাধারণের উপর পুলিসের যথেচ্ছ অত্যাচারের একটি সংবাদ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে কংগ্রেসনেতা শ্রীযুক্ত হরিদাস লাহিড়ী ঘটনাস্থলে গিয়া তথ্য সংগ্রহ ও পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের কাছে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি আবেদন আসিয়াছে। তাহাতে ঘটনার বিবরণ এইরূপ—
>
> পূর্বোক্ত তারিখে সকালবেলা ঐ গ্রামে প্রায় ৩০ জন পুলিস আসে, তাহাদের মধ্যে কতক সশস্ত্র পুলিসও ছিল। গ্রামে প্রবেশ করার পর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় পুলিস প্রকাশ করে যে, গত ২৩।৭।৪৫ তারিখে রাজারহাটের রাস্তায় কতকগুলি লোক লালমণিরহাট থানার দারোগাকে প্রহার করিয়াছে। সেই উপলক্ষেই তাহারা আসিয়াছে। রাজারহাট এই গ্রাম হইতে দুই মাইল দূর। তাহারা গ্রামে প্রায় ১২।১৪টি বাড়িতে হানা দেয়। এইরূপ পুলিস অভিযানের আশঙ্কায় গ্রামবাসী ভীত হইয়া ছেলেমেয়েসহ পূর্বেই বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যায়।
>
> পুলিসদলগুলি প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়া সাধারণভাবে (১) ঘরের দরজা ভাঙিয়া দেয়, (২) ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া দেয়, (৩) ধান, চাউল, সরিষা, গম, কলাই প্রভৃতি ছড়াইয়া ফেলে, (৪) থালা, বাসন, হাঁড়ি, কড়াই খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, (৫) বাক্স, সিন্দুক ভাঙিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া (১) গণেশ বৈরাগী নামক একজন দরিদ্র অধিবাসীর জিনিসপত্র সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া কিছুই রাখে নাই। তাহার খাইবার সংস্থান ও বাসনপত্র বলিতে কিছুই নাই। তাহার একটি কাঠের বাক্স ভাঙিয়া অপূরণীয় ক্ষতি করিয়াছে। কিছু রূপার জিনিস ছিল, ভাঙিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। প্রায় কিছুই পাওয়া যায় নাই। ৬৯টি টাকাও পাওয়া যায় নাই। এই বাড়িতে ১টি ম্যালেরিয়া রিলিফ কেন্দ্র ছিল। তাহার প্রায় ২০০ মেপাক্রিন ফেলিয়া দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার ১টিন ননী ও কিছু সরিষার তেল ও ধান, চাউল একেবারে নষ্ট করিয়াছে। (২) প্রেমানন্দের বাড়ীতে ১টি সাইকেলের স্পোকগুলি সম্পূর্ণ ভাঙিয়া দিয়াছে। (৩) দ্বারিকা বর্মণের বাড়ীতে প্রায় ২০০ টাকা পাওয়া যাইতেছে না। (৪) ধরণী বর্মণের বাড়ীতে দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের ১টিন পাউডার দুগ্ধ ছিল, সেই টিন কাটিয়া সমস্ত দুগ্ধ নষ্ট করিয়াছে। (৫) বসন্ত রায়ের বাড়ীতে সাধারণের যাত্রার দলের হারমনিয়াম, ঢাক, ঢোল, খোল প্রভৃতি ও সাজসজ্জা ছিল ইহা সম্পূর্ণ নষ্ট করা হইয়াছে। (৬) প্রত্যেক বাড়ীর গরু ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলে গ্রামের আমন বিছন চারা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। আবাদ ও সারা বৎসরের খোরাকের সম্ভাবনা নষ্ট হইয়াছে। দরিদ্র গ্রামবাসীর ক্ষতির পরিমাণ খুব কম করিয়া ধরিলেও ২,০০০৲ দুই হাজার টাকার কম হইবে না। ইহা ছাড়া সম্বৎসরের খোরাক গিয়াছে। এই সমস্ত অনাচার কয়েকটি গ্রামের বিশিষ্ট ডাক্তার শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়কে ধরিয়া লইয়া তাঁহার সম্মুখেই অনুষ্ঠিত হয়। গণেশ বৈরাগীর বাড়ীর দৃশ্য তাঁহার সম্মুখেই হয়। ভয়ে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গ্রামের লোক গ্রামে ফিরিয়া আসে নাই। কয়েকদিন পর্যন্ত ফ্রি প্রাইমারী স্কুল ও পাঙ্গা হাই স্কুল প্রায় বন্ধ ছিল। দুইটি অসুস্থ বৃদ্ধা মহিলা নিরাশ্রয়ে মারা গিয়াছে।

এ সম্বন্ধে সরকারী বিবৃতিতে জানান হইয়াছে রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত বৈদ্যের বাজার গ্রামে পুলিসের অত্যাচারের সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে গবর্মেণ্ট দেখিয়াছেন। সরকারের মতে "সত্য" ঘটনা এই যে, "গত ২৮শে জুলাই এক দল পুলিস কয়েকজন লোকের সন্ধানে উক্ত গ্রামে প্রবেশ করে। ২৩শে জুলাই ঐ কয়েকজন লোক এক দল পুলিসকে প্রহার করিয়াছিল বলিয়াই পুলিস তাহাদের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। পুলিস দল গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখে বহুসংখ্যক সন্ত্রাস্ত গ্রামবাসী গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছে। পুলিস খানাতল্লাসীর পরে কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করে। গত ৩১শে জুলাই রংপুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে সকল গৃহে পুলিস হানা দিয়াছে সে সব গৃহ পরিদর্শন করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত অত্যাচার ও ক্ষতির বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন যে ইচ্ছাপূর্বক ক্ষতির প্রমাণ প্রদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি সন্ত্রাস সৃষ্টি ও স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষকে ছোট করিবার জন্য উক্ত সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রেরণ করিয়াছিল। পুলিসের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনীত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বর্তমানে গ্রামে ত্রাসের কোন চিহ্নই নাই। তবে দুর্বৃত্তগণ গ্রেপ্তার হইতে রেহাই পাইবার জন্য অবশ্য সশঙ্ক চিত্তে রহিয়াছে।

উপরোক্ত দুইটি বিবৃতিই একই দিনে ৬ই ভাদ্র তারিখে কলিকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

কুচবিহার ও বৈদ্যের বাজারে সৈন্য ও পুলিসের অত্যাচার

রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের নামে গবর্মেণ্ট পুলিসকে স্বেচ্ছাচারিতায় ও জনসাধারণের উপর নির্মম ব্যবহারের যে ঢালা হুকুম কয়েক বৎসর হইতে, বিশেষতঃ আইন অমান্য

আন্দোলনের সুরু হইতে দিয়া আসিতেছেন তাহার পরিণাম বিষময় হইতে বাধ্য। এ দেশের পুলিস চিরকালই নিজেকে জনসাধারণের প্রভু বলিয়া মনে করে, দেশবাসীর উপর লাঠি চালনাই তাহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলিয়া ভাবে। গত ১৫ বৎসর যাবৎ পুলিসকে যেভাবে দেশবাসীর উপর ভদ্র অভদ্র নির্বিচারে লাঠি চালাইতে দেওয়া হইয়াছে, গ্রামবাসীর ঘর পোড়াইয়া তাহার সম্পত্তি নষ্ট করিয়া এমন কি নারীর উপর লাঞ্ছনা করিয়াও যেভাবে তাহারা রেহাই পাইয়াছে তাহাতে ক্ষমতা-গর্বে তাহাদের মাথা গরম হওয়া মোটেই আশ্চর্য নহে। সৈন্য ও পুলিসের বিরুদ্ধে অতি মারাত্মক অভিযোগ পর্যন্ত চাপা দিয়া গবর্মেণ্ট উহাদিগকে প্রকারান্তরে জনসাধারণের উপর অত্যাচার করার ঢালা হুকুমই দিয়া রাখিয়াছেন।

রংপুর জেলার বৈন্তের বাজার গ্রামের ঘটনার কথা আমরা গত সংখ্যা 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছি। উপরে এ সম্বন্ধে কংগ্রেস, লীগ ও কৃষক সভার স্থানীয় নেতৃবর্গের বিবৃতি ও সরকারী ইস্তাহারের সারমর্ম দেওয়া হইল। ইঁহাদের প্রকাশ্য অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য গবর্মেণ্ট কোন চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত লাহিড়ীকেও অভিযুক্ত করেন নাই। এই ঘটনা মিথ্যা হইলে গবর্মেণ্টের উচিত ছিল উপযুক্ত তদন্ত করিয়া তাহা সপ্রমাণ করা। কিন্তু বাংলা-সরকার সে পথ মাড়ান নাই। সরকারী প্রেসনোট মারফৎ প্রচারিত সরকারী অভিমতকে লোকে সত্য বা যথার্থ বলিয়া মনে করিতে পারিবে না ইহা বলাই বাহুল্য। 'রাজা কর্ণেন পশ্যতি' —বর্তমান গবর্মেণ্ট এই প্রবাদবাক্য সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। শুধু যে পরের কথা শুনিয়াই তাঁহারা নিজেদের দেখার কাজ সারেন তাহা নয়, অত্যাচার যে করিয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহারই কৈফিয়ৎ শুনিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আজকাল যেন রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ক্ষমতামত্ততা সংক্রামক ব্যাধি। বৈদ্যের বাজারের অনতিদূরে কুচবিহার রাজ্যেও অনুরূপ এক ঘটনা ঘটিয়াছে। রাজ্যের একদল সৈন্য কুচবিহার কলেজে অনধিকার প্রবেশ করিয়া ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের অনেককে আহত করিয়াছে। বৈন্তের বাজার ঘটনার মূলে ছিল দারোগার প্রতি জনকয়েক গ্রামবাসীর খারাপ ব্যবহার, ইহার জন্য সমগ্র গ্রামটি পুলিসের কোপে পড়িয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। কুচবিহারের ঘটনার মূল সাইকেল আরোহী কয়েকটি সৈন্যের সহিত জনকয়েক ছাত্রের বচসা। ফলে দল বাঁধিয়া বহু শত সৈন্য কর্তৃক কলেজ চড়াও।

পুলিস ও সৈন্য দলের সব চেয়ে বড় কথা শৃঙ্খলা রক্ষা। ইহাদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকে বলিয়া এই দুই ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। গবর্মেণ্ট এই অতি গুরুতর বিষয়টিকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ইহার ফল শুধু দেশবাসীর পক্ষেই খারাপ হইবে না, ষ্টীল-ফ্রেমে-আঁটা বিদেশী শাসনও একদিন ইহারই ভারে ভাঙিয়া পড়িবে।

ভারতবর্ষে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় সরকারী বাধা

দেশের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি যাহাতে দেশেই প্রস্তুত হইতে পারে তাহার জন্য ঐ সব শিল্পকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দান সভ্য সমাজের রীতি। যন্ত্রপাতি, কাপড়, কাগজ, চিনি, সূতা, রাসায়নিক দ্রব্য, দেশলাই প্রভৃতির কারখানা সকল দেশই নিজের দেশে প্রতিষ্ঠা করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে চায়। স্বাধীন দেশের স্বাধীন গবর্মেণ্ট উহার জন্য সর্ববিধ সুবিধা দেয়। ভারতবর্ষে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা। এখানে বিলাতী কারখানা বাঁচাইবার জন্য ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধনই স্বাভাবিক রীতি। ভারতের বস্ত্র, রেশম ও শর্করা শিল্প ইংরেজ আগমনের পর অসম ও অসাধু বিলাতি প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হইয়াছে। গত যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ভারত-সরকারের বহু বাধা অতিক্রম করিয়া বস্ত্রশিল্প আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইয়াছিল, এই যুদ্ধে তাহার ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা আবার করা হইয়াছে। বর্তমা যুদ্ধে মিলগুলিকে অতিরিক্ত সময় কাজ করাইয়া উহাদের যন্ত্রপাতির প্রায় শেষ করা হইয়াছে। এই সব যন্ত্র বদলাইবা চেষ্টা যেই সুরু হইয়াছে অমনই ভারত-সরকার আবার কর্ম তৎপর হইয়া উহাতে বাধা সৃষ্টি করিতে সুরু করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কি ব্যাপার চলিতেছে তাহা শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদা বিড়লার স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ হইতে জানা যাইবে বিড়লা বলিতেছেন :

"ইংলণ্ডে থাকার সময় আমি ইহা শুনিয়া বিস্মিত হই যে বয়ন-শিল্পের যন্ত্র নির্মাতাদের ভারত-সরকার এই নির্দে দিয়াছেন, তাঁহারা যেন ভারত-সরকারের অনুমতিপত্র ব্যতী কোন ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে কোনরূপ বয়ন-শিল্পের যন্ত্রপাতির প্রাথমিক দর পর্যন্ত না দেন।

"এইরূপ যন্ত্রপাতির আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়ত কোন ক্ষেত্রে হয়ত থাকিতে পারে কিন্তু আমি ভাবিয়া বিস্মি হই যে ভারত-সরকার ব্রিটিশ শিল্পপতিদের এইরূপ নির্দে দিলেন কি করিয়া।

"ইংলণ্ডে বয়ন-শিল্পের যন্ত্রনির্মাতারা কোন কালেই ভারতে সাহায্য করিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না। ভারত-সরকারে এই কার্যকলাপের ফলে তাঁহাদের মনোভাব আরও কঠো হইয়া উঠিল। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইংলণ্ডে অন্যা যন্ত্রপাতির দাম শতকরা ৬০ ভাগ করিয়া বাড়িয়াছে কিন্তু বয়ন শিল্পের যন্ত্রপাতির দাম বাড়িয়াছে শতকরা ১৫০ ভাগ। ভারত সরকার তাহার এই কাজের দ্বারা ইংলণ্ডের যন্ত্রনির্মাতাদে পরোক্ষভাবে এই প্রেরণা দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা ভারতে অভাব সম্বন্ধে আরও বেশী উদাসীন থাকেন। সরকারের এ কাজের ফলে দেশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা ভারতে শিল্পকে উন্নতির দিকে আগাইয়া দিবে না, উপরন্তু ইহার উন্নতি পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইবে।"

যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত লাভের লোভে কাপড়ের মিল মালিকেরা জনসাধারণের প্রতি স্বীয় দায়িত্ব বিস্মৃত হইয় সরকারের সহিত সম্পূর্ণ রূপে যোগদান করিয়া যাহা করিয় ছেন তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের ধ্বংসসাধনের পথই পরিষ্কা হইয়াছে। মিলমালিকেরা নিজেরা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে ইঁহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ত ইহাতে খুব বেশী হইবে না। কিন্তু দেশের বস্ত্র-শিল্পের যে সর্বনাশ ইহাতে হইবে তা

হইতে বহুদিন লাগিবে। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের সর্বনাশ-নের সুযোগ ইঁহারাই গবর্মেণ্টকে দিয়াছেন দেশবাসী ইহা জ ভুলিবে না। বিড়লাজী যাহাতে বিস্মিত হইয়াছেন, বাসী তাহাকেই সাম্রাজ্যবাদী ও সাম্রাজ্যরক্ষায় ব্যগ্র র্মেণ্টের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করে।

কলিকাতায় বাসস্থান সমস্যা

কলিকাতার বাসস্থান সমস্যা সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কার সৈয়দ নৌশের আলি, মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ াপাধ্যায়, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য অধ্যাপক কুমার চক্রবর্তী ও অপর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির করিত একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বিবৃতিতে কলিকাতার নাগরিকগণকে নিম্নলিখিত মৌলিক বিগুলি লইয়া একটি আন্দোলন আরম্ভের অনুরোধ জানান য়াছে:

"(১) সমরকালীন প্রয়োজনে যে সমস্ত বাড়ী দখল করা য়াছে সেগুলি অসামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করিবার জন্য বিলম্বে ফিরাইয়া দিতে হইবে, (২) বস্তী হইতে ভাড়াটিয়া চ্ছেদ সরাসরি ভাবে বন্ধ করিতে হইবে এবং বস্তী উন্নয়নের কটি পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করিতে হইবে, (৩) একটি াগ্য উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশক্রমে ভাড়া-নিয়ন্ত্রণ আদেশ বশ্যই সংশোধন করিতে হইবে, (৪) বড় বড় বাড়ী খল করিয়া তাহা ছাত্রদের হোটেল বোর্ডিঙে পরিণত করিতে ইবে, (৫) প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ভাড়াটিয়াদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য াখিবার জন্য বে-সরকারী ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে হইবে, ৬) নূতন নূতন বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য মালমশলা ছাড়িয়া দিতে হইবে।"

রেন্ট-কণ্ট্রোল আইনে ভাড়াটিয়াদের কতকটা সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও অনেক অসুবিধা রহিয়াছে। ভাড়া বৃদ্ধি সম্বন্ধে আইনে যে ব্যবস্থা আছে তাহা এড়াইবার জন্য বাড়ীওয়ালারা এক নূতন ফন্দী অবলম্বন করিয়াছে। বাড়ী ভাড়া দিবার সময় ইহারা বিব্রত ভাড়াটিয়াকে স্বল্প মূল্যের আসবাবপত্র অত্যধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া এক সঙ্গে অনেকগুলি টাকা আদায় করিয়া লয়। ইহা বে-আইনী সেলামী আদায়েরই একটি পন্থা। আর এক ব্যবস্থা, এক বৎসর বা ছয় মাসের ভাড়া অগ্রিম আদায়। ভাড়াটিয়া শোষণের এই দুই পদ্ধতি এতদিনে বন্ধ হওয়া উচিত ছিল, তবে এখনও সময় আছে, এখনও উহা রোধ করিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বাড়ীওয়ালাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কতকটা প্রতিকারের আয়োজন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সরকারী উপদ্রব নিবারণের কোন বন্দোবস্তই এখনও হয় নাই। এখনও সামান্য কয়েক দিনের নোটিশে বাসিন্দা উচ্ছেদ করিয়া বসতবাটী দখল চলিতেছে। যুদ্ধের সময় গবর্মেণ্ট যথেচ্ছভাবে বাড়ী দখল করিয়াছেন, সকলক্ষেত্রে যে প্রকৃত প্রয়োজনের তাগিদে গবর্মেণ্ট কাজ করেন নাই আদালতে কোন মামলায় তাহারও পরিচয় মিলিয়াছে। কলিকাতায় ১৮০০ বাড়ী দখল করা হইয়াছে, এই বাড়ীগুলি অবিলম্বে ছাড়িয়া দিলে কলিকাতা-বাসীদের অনেক সুবিধা হয়। বাড়ীগুলি ছাড়িয়া দিবার শুভ অভিপ্রায় সরকার প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের চিরাচরিত চালে কাজ চলিলে কত দিনে উহা সাধিত হইবে বলা কঠিন।

কলিকাতার বাসস্থান সমস্যার সহিত শহরতলীর যানবাহন সমস্যার অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রহিয়াছে। শহরতলী হইতে যাতায়াতের ট্রেন ও বাসগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি ও উহাদের গতায়াত নিয়মিত করিয়া দিলে শহরতলীর যে-সব লোক বাধ্য হইয়া শহরে বাস করিতেছে তাহারা সরিয়া যাইতে পারে। বাড়ী তৈরির সরঞ্জাম সহজলভ্য করিয়া দিয়াও গবর্মেণ্ট এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিতে পারেন।

এ ত কলিকাতার অবস্থা। গ্রামের বহু লোক, বিশেষতঃ মধ্যবিত্তশ্রেণী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শহরে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার প্রধান কারণ কাপড়, সরিষার তৈল, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য গ্রামাঞ্চলে আজ-কাল প্রায় দুর্লভ, শহরে তবু অধিক মূল্যে বা তদ্বির তদারক করিলে উহা পাওয়া যায়। তারপর গ্রামে আজকাল নিরাপত্তা বলিয়া কিছু নাই বলিলেই চলে। সরকারের পোষ্যপুত্র পুলিসের সকল অক্ষমতাই আজকাল কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমার্হ, পুলিসের সকল শক্তি শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে সীমাবদ্ধ। দেশের লোক আজকাল চুরি-ডাকাতির প্রতিকারে পুলিসের কোন সহায়তাই পায় না ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ীর ডবল তালা ভাঙিয়া কলিকাতা শহরে চুরি হইয়াছে, থানায় ডায়েরী করিতে গিয়া সর্বাগ্রে শুনিতে হইয়াছে "বাড়ী ছাড়িয়া যান কেন?" কলিকাতার পুলিসেরই যখন এই মনোভাব ও ব্যবহার, মফস্বলের পুলিসের দাপট সম্বন্ধে যাঁহাদের ধারণা নাই তাঁহাদের পক্ষে উহা অনুমান করাও কঠিন। এই ভাবে নানা কারণে লোকে আজ গ্রাম হইতে ছোট শহরে, ছোট শহর হইতে বড় শহরে ভিড় করিতেছে, বাসস্থান সমস্যাও ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার

কর্ণেল ডি. এন. ভাদুড়ীর পত্নী শ্রীমতী হিমাংশুবালা ভাদুড়ী দক্ষিণ-কলিকাতায় অবস্থিত তাঁহার চারিতল বৃহৎ অট্টালিকাটি রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচারকে দান করিয়াছেন। ভবনটির মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা হইবে। দাত্রীর একমাত্র পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১৯৪৩ সালে ইংলণ্ডে মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। অট্টালিকাটির নাম দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী স্মৃতি ভবন রাখা হইবে। ১৯৩৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এই প্রতিষ্ঠান একনিষ্ঠ ভাবে ভারতীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়ের বিরাট্ গ্রন্থাগার হইতে ২৫ হাজার পুস্তক এই ইনষ্টিটিউট পাইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের গ্রন্থাগারটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইঁহাদের গৃহ সমস্যার এই সমাধানে অতঃপর ইঁহাদের পক্ষে পূর্ব পরি-কল্পনানুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক অতিথিশালায় একটি বড় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠার সুবিধা হইবে। সংস্কৃতি, সম্মেলন ও প্রদর্শনীর আয়োজন করাও অনেক সহজ হইবে

বাংলায় আবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

কিছুদিন পূর্বে বাংলা-সরকার বাংলায় মজুত চাউলের একটা বড় অংশ বাহিরে প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ উঠে। বাংলায় আবহাওয়ার যে অবস্থা এবার দেখা যাইতেছে তাহাতে এবারও দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে গবর্ন্মেণ্ট ছাড়া সকলেই এই আশঙ্কা করিতেছেন। গত বারও বাংলার লাট, বাংলার মন্ত্রী এবং সিভিলিয়ান শাসকেরা ছাড়া অন্য সকলেই বুঝিয়াছিলেন দুর্ভিক্ষ আসন্ন, একমাত্র বাংলা-সরকারই প্রাণপণে সকলকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছিলেন যে বাংলায় খাদ্যাভাব ঘটে নাই, দুর্ভিক্ষের কোন আশঙ্কা নাই। গোড়ার দিকে ভারত-সরকারও ইঁহাদেরই মতে সায় দিয়াছিলেন এবং লর্ড লিনলিথগোর মনোনীত খাদ্যসচিব সর মহম্মদ আজিজুল হক জোর গলায় বলিয়াছিলেন সাত দিনের মধ্যে তিনি চাউলের দর নামাইয়া দিবেন। এই ঘোষণার কয়েক দিন পর হইতেই চাউলের দর হু হু করিয়া বাড়িতে আরম্ভ করে। দুর্ভিক্ষের মৃত্যুলীলার মধ্যে রীতিমত লুঠ চলিয়াছে এবং উডহেড কমিশনের হিসাব মত দেড়শো কোটি টাকা যাহাদের পকেটস্থ হইয়াছে, সন্ধান লইলে দেখা যাইবে তাহাদের অধিকাংশই তদানীন্তন বাংলা-সরকারের পোষ্য ব্যক্তি। দুর্ভিক্ষের সময় যে বে-বন্দোবস্ত সর্বত্র দেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে কতটা ইচ্ছাকৃত ও কতটা অনিচ্ছাকৃত তাহার পরিমাণ উপযুক্ত তদন্ত ভিন্ন জানা যাইবে না। এই কাজটা এখনও চাপা দেওয়া রহিয়াছে।

এবারও দেশবাসী আপাত নিরীহ বাকচাতুরীপূর্ণ সরকারী ইস্তাহার প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিবে না। মিঃ কেসি গবর্নর হইয়া আসিয়াই বলিয়াছিলেন দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ তিনি কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না। অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিবার পর আমরা তাঁহার আর কোন কথা শুনি নাই, শুধু এইটুকু জানিয়াছি যে তিনি ব্যক্তিগত কারণে বিলাত যাইতেছেন এবং হয়ত বাংলার লাটগিরি ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিবার অনুমতি তিনি প্রার্থনা করিবেন। অষ্ট্রেলিয়ায় শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচন হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে যোগদান করিতে হইলে তাঁহার পক্ষে অবিলম্বে সেখানে যাওয়া দরকার। ব্রিটিশ মন্ত্রি-সভায় তাঁহার সমর্থকবৃন্দ এখন অপসারিত। নূতন শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি হইবে তাহা সঠিক জানিবার উপর তাঁহার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত যুক্ত থাকা না থাকা নির্ভর করে। এটার সম্বন্ধেও একটা পরিষ্কার কথাবার্তা হওয়া দরকার। দ্বিতীয় দুর্ভিক্ষ ঘটিলে মিঃ কেসির দুই কূল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই অবস্থায় তাঁহার বিলাতযাত্রা সম্পর্কিত সমগ্র ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জ্ঞাতব্য রহিয়া গেল।

গবর্নরের বিলাত যাত্রার কারণ যাহাই হউক, রপ্তানির ব্যাপারে সরকারের ১৬ই আগষ্ট তারিখের ইস্তাহারটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উহাতে বলা হইয়াছে :

বাংলা দেশ হইতে চাউল রপ্তানি সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে যে সমস্ত আলোচনা এবং মন্তব্য করা হইয়াছে, তাহা হইতে চাউল রপ্তানির ব্যাপারে বাংলা-সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত ঘটনা এইরূপ :—

বাংলা-সরকার নিম্নলিখিত পরিমাণ চাউল রপ্তানির ব্যবস্থা করিয়াছেন :

(১)	সৈন্যদলের জন্য	১৫,০০০	টন
(২)	সিংহলে	২৩,০০০	,,
(৩)	মহীশূরে	১৫,০০০	,,
(৪)	কোচিনে	১৪,০০০	,,
(৫)	বিহারে	৯,৫০০	,,
(৬)	যুক্তপ্রদেশে	২০,০০০	,,
	সর্বসমেত মোট	৯৬,৫০০	টন

চাউল রপ্তানি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩০ হাজার টন চাউলের পরিবর্তে অন্য চাউল বাংলাকে দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। যে চাউল রপ্তানি করা হইবে তন্মধ্যে ১৯৪৪ সালে বাংলা দেশের বাহির হইতে প্রাপ্ত চাউল, আউস ধানের চাউল, ভাঙা চাউল এবং সরু চাউল আছে। অবিলম্বে এই চাউলের কোন চাহিদা নাই এবং বেশী দিন ধরিয়া এই চাউল রাখা হইলে নষ্ট হইয়া যাইবে। যে চাউল রপ্তানি করা হইতেছে তাহার স্থলে আসাম হইতে ১০০০০০ টন চাউল বাংলা দেশে আমদানী করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ১২ হাজার টন চাউল পাওয়া গিয়াছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বাকী চাউল পাওয়া যাইবে।

এক সময়ে সেনা বিভাগের জন্য আরও ১৯ হাজার টন এবং সিংহলের জন্য ৫৫ হাজার টন "ভাঙ্গা" এবং "সরু" চাউল রপ্তানি করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের ফসলের পক্ষে আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ হওয়ায় সেনা বিভাগকে যে চাউল দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং সিংহলে যে ৫৫ হাজার টন "সরু" চাউল পাঠাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহার পরিমাণ কমাইয়া ২৫ হাজার টন করা হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণ চাউল রপ্তানি করিবার ব্যবস্থা এবং ইচ্ছা করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ১,২১,৫০০ টন। ইহার স্থলে যে চাউল আমদানী করিবার এবং যে চাউলের পরিবর্তে অন্য চাউল লইবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ ১,৩৪,০০০ টন। কাজেই এই আদান-প্রদানের ফলে গবর্ন্মেণ্টের হাতে বেশ কিছু চাউল উদ্বৃত্ত থাকিবে। ১৯৪৪ সালে এবং ১৯৪৫ সালে বাংলা-সরকার প্রচুর পরিমাণে চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন। এই চাউল গুদামজাত করিয়া রাখা সম্পর্কে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়াছে তন্মধ্যে নিয়মিতভাবে গুদামজাত চাউল উল্টানো-পাল্টানো করিবার ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। চাউলের গুদাম নির্মাণের একটি পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইয়াছে, কিন্তু গুদাম-জাত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল হইলেও যদি নিয়মিতভাবে উল্টানো-পাল্টানো না হয়, তাহা হইলে এই পরিমাণ মজুত চাউলের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ

ব। চাউল রপ্তানি করিবার আর একটি প্রধান কারণ যে, বর্তমানে বাংলা দেশে মজুত চাউলের পরিমাণ এতই। যে নীতিগত কারণে এবং প্রয়োজনের খাতিরে বাংলা শর পক্ষে এই সমস্ত অপেক্ষাকৃত মন্দভাগ্য প্রদেশকে মিক সাহায্য দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

আসন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারণে সরকারের দায়িত্ব

ইস্তাহারের এই অংশে সরকারের প্রধান বক্তব্য এই যে ত চাউলের কতকাংশ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, উহা হিরে পাঠাইয়া নূতন চাউলের দ্বারা ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা দলে ক্ষতি কি? সরকারের বাকচাতুরীপূর্ণ অন্যান্য ইস্তাহারের । ইহারও এই অংশটিকে লোকে বিষকুম্ভ পয়োমুখ বলিয়াই । করিবে। প্রথমতঃ, সরকারের সকল বিভাগে, বিশেষতঃ ভল সাপ্লাই বিভাগে অপদার্থতা, অনাচার ও দুর্নীতির যে চযোগ প্রতিপদে পাওয়া যায় তাঁহাদের কর্মকৌশলে ভাল চল রপ্তানি হইয়া খারাপ চাউলই থাকিয়া যাওয়ার যথেষ্ট াবনা আছে। দ্বিতীয়তঃ, যে পরিমাণ চাউল সরকারের ত আছে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে আমন ধান উঠা পর্যন্ত রকার ফসলের ঘাটতি পূরণের পক্ষে তাহা পর্যাপ্ত কি-তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই বলিয়াই লোকের বিশ্বাস। এবার বৃষ্টিতে বাংলার প্রায় সর্বত্র আউস ধান নষ্ট হইয়াছে, পরে আরম্ভ হইলে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বন্যায় আমন নের ক্ষতি হইয়াছে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের বহু স্থানে াভাবে আমন ধান রোপিত হইতে পারে নাই। স্বাভাবিক পাদনের এক-তৃতীয়াংশ ধান উৎপাদনের অভাবে গত দুর্ভিক্ষ য়াছে। এবার ভারত-সরকারই স্বীকার করিতেছেন এক-র্থাংশ ফসল কম হইবে, দেশবাসীর ধারণা ঘাটতির পরিমাণ চ-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে, অর্দ্ধেক হওয়াও আশ্চর্য নয়। ই অবস্থায় বাংলার বাহিরে চাউল রপ্তানির চেষ্টায় বিপদ ার সম্ভাবনা আছে।

আবার যাহাতে বাংলায় দুর্ভিক্ষ না হয় তাহার জন্য বাংলা-রকারের এখন হইতেই যথেষ্ট সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। াহাদের প্রথম কর্তব্য সমস্ত গ্রামে অবিলম্বে রেশন ব্যবস্থা বর্তন। অশিক্ষিত সম্রাট আলাউদ্দীন খলজী গ্রামে গ্রামে শন করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়াছিলেন, ইংরেজের সুশিক্ষিত র্মচারীদিগের পক্ষে ইহা না পারিবার কারণ নাই। গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডগুলির উপর খবরদারী করিবার জন্য সরকারের ার্কেল অফিসারবাহিনী আছে। গ্রাম্য দলাদলিতে মোড়লী রা ছাড়া ইহাদের বিশেষ কোন কাজও নাই। এই কর্মচারী-র উপর গ্রাম্য রেশন পরিচালনার ভার অবিলম্বে দেওয়া িতে পারে। দুর্ভিক্ষ নিবারণের ইচ্ছা থাকিলে বাংলা দেশের জলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা নিজেরাই তাহার কতখানি করিতে পারেন াহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ১৯১৭ সালে মালদহ জলার জনৈক ইংরেজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফসলের অবস্থা দেখিয়া ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। জেলার প্রত্যেক থানায় য়জন লোক চাউল মজুত করিয়া স্বাভাবিক বেচা-কেনায় ্পর্যয় সৃষ্টি করিতে পারে তাহাদের নামের তালিকা দাখিল করিবার জন্য তিনি প্রথমেই পুলিস সাহেবকে আদেশ দেন। পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট থানার দারোগাদের মারফৎ তালিকা সংগ্রহ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে উহা দাখিল করিলে দেখা গেল সমগ্র জেলায় মাত্র শ-দুয়েক এরূপ লোক আছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার আদেশ দেন এবং দারোগাদের জানাইয়া দেন যাহার এলাকা হইতে মজুতদারীর অভিযোগ আসিবে সেই দারোগাকে দণ্ডিত করা হইবে। ফলে সে বৎসর মালদহে আসন্ন দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়।

ফ্লাউড কমিশন রিপোর্টে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে চাউল মজুত রাখিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৮ জন। গ্রামের দারোগা এবং সার্কেল অফিসার মিলিয়া গ্রামের বা থানার এই কয়টি মাত্র লোকের উপর নজর রাখিতে পারে না ইহা অবিশ্বাস্য। ইহাদিগকে যদি জানাইয়া দেওয়া হয় যে কাহারও এলাকায় ব্ল্যাক মার্কেটিং ধরা পড়িলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত এবং দণ্ডিত করা হইবে তাহা হইলে এক সপ্তাহে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে এটা বুঝা মোটেই শক্ত নহে। ঘাটতি চাউল বিলির ভার সার্কেল অফিসারের উপর অর্পিত হইলে এবং উহার পরিমাণের জন্য তাহাকে দায়ী করিলে অনায়াসে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা যাইতে পারে। যে ৯৬৫০০ টন চাউল খারাপ হইবার ভয়ে গবর্মেণ্ট উহা বাহিরে পাঠাইতে চাহিতেছেন, গ্রামে অবিলম্বে রেশনিং আরম্ভ হইলে অল্প দিনের মধ্যেই উহা বিলি করিয়া দেওয়া যায়। অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস এবং "সুয়োরাণী"র সম্পর্কিত সরকারের প্রিয়পাত্রদিগের "সাতখুন মাফে"র প্রথারও বদল দরকার হইবে।

এজেণ্টের মারফৎ চাউল ক্রয়-বিক্রয়

চাউল ক্রয়-বিক্রয়ে চুরি বন্ধ করা একান্ত দরকার। এজেণ্টদের মারফৎ চাউল ক্রয়ের যে ব্যবস্থা বাংলা-সরকার বজায় রাখিতে চাহিতেছেন উডহেড কমিশনও তাহার নিন্দা করিয়াছেন। সাধারণ দৃষ্টিতেও এই ব্যবস্থার গলদ ধরা পড়ে। ইহাতে লাভের সবটা পায় এজেণ্ট, এবং সম্পূর্ণ ক্ষতি বহন করে দেশবাসী। আসামে সরকারী এজেণ্টদের যে-সব কীর্তি-কাহিনী বে-সরকারী তদন্তে ধরা পড়িয়াছে তাহাতে দেখা যায় গ্রামবাসীরা কখনও ধানের ও চাউলের ন্যায্য দাম পায় নাই। তাহাদের অসহায়তার পূর্ণ সুযোগ এজেণ্টরা গ্রহণ করিয়াছে। এজেন্সি প্রথার সুবিধা এই যে, একজন বড় এজেণ্ট ৫ টাকা দরে চাউল কিনিলে বেনামীতে দশ হাত বদল দেখাইয়া অনায়াসে উহারই দাম ১৫।২০ টাকায় তুলিয়া দিতে পারে। বাংলায় চাউল ক্রয় সম্বন্ধে আসামের ন্যায় বে-সরকারী তদন্ত হইলে এই অবস্থাই ধরা পড়িবে ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ১৯৪২ সাল হইতে সুরু করিয়া আজ পর্যন্ত চাউলের ব্যবসায়ে যত লোক লিপ্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একজনও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না, বরং প্রত্যেকেই নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারিবেন যে স্বনামে ও বেনামে ইহারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে। চাউলের যে-সব ব্যবসায়ী কোন রূপে দিনপাত করিত, এই তিন বৎসরে তাহারা ফাঁপিয়া বড়

লোক হইয়াছে। কলিকাতা শহরে একাধিক বাড়ী ক্রয় করিতে ইহাদের অনেককেই দেখা গিয়াছে। অথচ গ্রামের চাষী ধানের ন্যায্য দাম পায় নাই এবং সমগ্র দেশবাসী মাত্র দুই বৎসরে ১৭ কোটি টাকা লোকসান বহন করিয়াছে। এত বড় চুরির অভিযোগের একটা তদন্ত পর্যন্ত হইল না, যে কোন সভ্য গবর্মেণ্টের পক্ষে ইহা গভীর কলঙ্কের কথা।

স্বদেশী পণ্য ক্রয়

স্বদেশী পণ্যোৎপাদক সঙ্ঘ এবং কমার্সিয়াল মিউজিয়ামের উদ্যোগে স্বদেশী পণ্য ক্রয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করিবার জন্য সম্প্রতি কলিকাতায় একটি জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু ভারতীয় শিল্পপতি এবং সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন, উভয় পক্ষের লোকে বক্তৃতাও করিয়াছেন। বক্তাদের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতী শিল্প বাঁচাইবার জন্য ব্রিটেনের "বিলাতী পণ্য ক্রয়" আন্দোলনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

আমাদের স্বদেশী শিল্পের সম্মুখে ঘোরতর দুর্দিন আসন্ন, ইহা দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ। বিপদের দিনে পুনরায় স্বদেশী পণ্য ক্রয়ের ধুয়া উঠিবে ইহাও স্বাভাবিক। কিন্তু এবার যুদ্ধের বাজারে স্বদেশী পণ্যোৎপাদক স্বদেশী বিশেষত বাঙালী দোকানদারেরা যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এবারকার স্বদেশী ক্রয় আন্দোলনের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া অন্যায় নয়। গত কয়েক বৎসরে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে ক্রেতৃসাধারণকে যে পরিমাণ বেগ পাইতে হইয়াছে তাহা এত শীঘ্র কেহ ভুলিতে পারিবে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রত্যেকটি জিনিষই শেষ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়, চোরাবাজারে এবং অত্যধিক মূল্যের বিনিময়ে। স্বদেশী বিলাতী কোন ভেদাভেদ ইহাতে ছিল না, প্রতিকারের কোন উপায়ও ছিল না। কোন কোন স্বদেশী পণ্যোৎপাদক বলিয়াছেন কাঁচা মাল কয়লা প্রভৃতির অভাবে ও বাজারে মাল পাঠাইবার যানবাহনের অসুবিধার জন্য অনেক সময় মূল্য বৃদ্ধি ও পণ্যের অভাব ঘটিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব অসুবিধা ঘটলেও সমগ্রভাবে স্বদেশী শিল্পের বেলায় ইহা সত্য নহে। গবর্মেণ্টের অতিরিক্ত লাভ কর আদায়ের হিসাব হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে স্বদেশী অধিকাংশ শিল্পই অতিরিক্ত লাভ করিয়াছে। কাপড়ের কলগুলি কি ভাবে শতকরা ২০ টাকা অতিরিক্ত লাভ করিবার জন্য চার গুণ ছয় গুণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে এবং গবর্মেণ্টকে লক্ষ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত লাভ-কর দিয়াছে তাহা আমরা পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে দেখাইয়াছি। নিছক টাকার লোভে স্বদেশী শিল্পপতির দল সরকারের সহিত যোগসাজসে ক্রেতৃসাধারণের গায়ের রক্ত শুষিয়া লইয়াছেন ইহা আজ নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। যে ক্রেতারা এতদিন দেশী বলিয়া ভাল সস্তা বিলাতী কাপড়ের পরিবর্ত্তে মোটা ও কদর্য্য কাপড় বেশী দামে কিনিয়াছে, দেশী কাপড়ওয়ালারা প্রথম সুযোগেই তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এই অত্যাচার লোকে এত শীঘ্র ভুলিয়া না গেলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

শুধু কাপড়ের বেলায় নয়, জুতা, সাবান, তেল, দাঁতের মাজন, গেঞ্জি, ঔষধ প্রভৃতি প্রত্যেকটি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের বেলায়ই ইহা ঘটিয়াছে। স্বদেশী কারখানাওয়ালারা মুহূর্ত্তের জন্যও হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই যে যুদ্ধ অনন্তকাল চলিবে না, যে ক্রেতাদের কায়দায় পাইয়া আজ এই সুযোগে ঠকানো হইতেছে যুদ্ধশেষে হয়ত তাহারা এই ব্যবহার শীঘ্র না ভুলিতেও পারে। বাঙালী দোকানদারদের ব্যবহারও সহজে ভুলিবার নয়। যে মুদি, যে কয়লাওয়ালা বাঙালীকে সাহায্য করুন বলিয়া পাড়ায় ক্রেতাদের নিকট কাঁদুনি গাহিয়াছে যুদ্ধের কয় বৎসরে তাহাদের মেজাজ একেবারে মিলিটারী রূপ ধারণ করিয়াছে। ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, অযথা ক্রেতাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া তাহার সময় নষ্ট করা ইহাই ছিল ইহাদের দৈনন্দিন ব্যবহার।

বিলাতের নিজের শিল্প রক্ষার জন্য স্বদেশী ক্রয় আন্দোলনের দৃষ্টান্ত যাঁহারা দেখাইয়াছেন একটা কথা তাঁহারা বলেন নাই। বিলাতী শিল্প স্বদেশী ক্রয় আন্দোলন যেমন এক দিকে করিয়াছে অন্যদিকে তেমনই জিনিষের উৎকর্ষ বিধান ও মূল্য হ্রাসের চেষ্টা প্রাণপণে করিয়াছে। গোড়া হইতেই বিলাতী শিল্পপতিরা বুঝিয়াছিল যে সংরক্ষণ যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন অনন্তকাল তাহা চলিতে পারে না। শিল্প সংগঠনের প্রথম মুখে সংরক্ষণ অপরিহার্য্য কিন্তু অতি শীঘ্র নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া বিদেশী প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জন করিতে না পারিলে কোন শিল্পই শেষ পর্যন্ত টিকিতে পারিবে না। ভারতীয় শিল্প সংরক্ষণের এই মূল নীতি কোন দিনই উপলব্ধি করে নাই আজ পর্যন্ত স্বদেশী জিনিষের উৎকর্ষ বিধান বা মূল্য হ্রাসের কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টাই আমরা দেখিলাম না। অথচ ভারতবাসী ভারতীয় শিল্পকে যে পরিমাণ সংরক্ষণ দিয়াছে পৃথিবীর কোন দেশের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় তাহা দিয়াছে কি না সন্দেহ। দেশবাসী নিজেরা স্বদেশী বলিয়া অসা[ধারণ] জিনিষ স্বেচ্ছায় বেশী দামে কিনিয়াছে এবং সঙ্ঘবদ্ধ দাবি জানাইয়া ভারত-সরকারকে আইন করিয়া সংরক্ষণ দানে বাধ্য করিয়াছে। কাপড় ও চিনি ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এবং এ[ই] দুইটির মালিকদের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক।

স্বদেশী শিল্পপতিদের দায়িত্ব

যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতার পর ভারতীয় সংরক্ষণ ও স্বদেশী ক্রয়-নীতির প্রয়োগ-প্রণালী বদলাইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। যে শিল্প অল্প সময়ের মধ্যে স্বাবলম্বী হইয়া উৎকৃষ্ট জিনিষ বাজার দরে বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে, কেবলমাত্র তাহাকেই সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া উচিত। বিদেশী যাহাতে অন্যায়ভাবে মূল্য হ্রাস করিয়া স্বদেশী শিল্পের সহিত অসম প্রতিযোগিতা করিতে না পারে শুধু সেই ব্যবস্থা করিয়া দিলেই স্বদেশী শিল্পের পক্ষে যথেষ্ট হওয়া উচিত। অনন্ত কাল সংরক্ষণে এবং স্বদেশী ক্রয়ে ভরসায় ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসায়কে চির-নাবালক করিয়া রাখা দেশের পক্ষে সকল দিক দিয়া ক্ষতিকর হয়, এই যুদ্ধে তাহা ভাল করিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের ভবিষ্যৎ স্বদেশীক্রয় ও সংরক্ষণ নীতি এমন হওয়া উচিত যাহাতে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য স্বাবলম্বী হইতে পারে এবং স্বাবলম্বী

হইতে বাধ্য হয়। জিনিষের উৎকর্ষ বিধানে কারখানাওয়ালাকে বাধ্য করিবার জন্য জনসাধারণ এবং গবর্মেণ্ট উভয়কেই চেষ্টা করিতে হইবে।

সভায় কেহ কেহ বলিয়াছেন স্বদেশী গবর্মেণ্ট দেশে প্রতিষ্ঠিত না হইলে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হইতে পারে না। এটা আমাদের দেশের পক্ষে খাটে না। ভারতবর্ষের কাপড়, লোহা, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, সিমেণ্ট প্রভৃতির কারখানা প্রবল বৈদেশিক, বিশেষতঃ বিলাতী, শিল্পের বাধা অতিক্রম করিয়াই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের প্রধান সহায়তা করিয়াছে ভারতীয় জনসাধারণ, গবর্মেণ্ট যেটুকু করিয়াছে তাহা জনমতের চাপে বাধ্য হইয়াই করিয়াছে, স্বেচ্ছায় নয়। দেশী কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া, দেশী ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া শিল্পের সহায়তা করিতে গিয়া অসংখ্য ভারতীয় মধ্যবিত্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। স্বদেশী যুগের পর বাংলায় স্বদেশী শিল্পের উন্নতি না হইলে সারা ভারতের স্বদেশী শিল্প আজ কোথায় থাকিত তাহা বিবেচনার যোগ্য। অ-বাঙালী ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংলায় স্বদেশীর জীয়ন-কাঠি স্পর্শেই তাহারা প্রাণ পাইয়াছিল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রিন্স দ্বারকানাথ, মতিলাল শীল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাঙালী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ত্যাগ ও শিক্ষা আজ ভুলিয়া গেলে চলিবে না। স্বদেশী যুগে স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে হাত পাকাইবার জন্য নষ্ট করিবার লক্ষ লক্ষ টাকা মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মুক্তহস্তে দান না করিলে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি আজ অনেক পিছাইয়া থাকিত সন্দেহ নাই। *স্বাধীন দেশে এই এক্সপেরিমেণ্টের টাকা দেয় গবর্মেণ্ট, ভারতবর্ষে তাহা যোগাইয়াছেন যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষ এবং বহু মধ্যবিত্ত পরিবার।*

ভারতবর্ষের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দেশবাসীর প্রতি দায়িত্ব অনেক বেশী, অনেক পবিত্র; কিন্তু তাঁহারা এ দায়িত্ব আজ অবধি বিন্দুমাত্র পালন করেন নাই। অন্যায় ও অত্যাচার দীর্ঘ দিন চলে না। এ দেশেও চলিবে না, বিদেশী গবর্মেণ্টের সঙ্গে একযোগেও নয়। দেশবাসী ইহাদের চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে, গণজাগরণের এই লক্ষণ দেখিয়া শিল্পপতির দল আজও সাবধান না হইলে সমগ্র দেশের ক্ষতি অনিবার্য।

অপরিচ্ছন্ন কলিকাতা

"অপরিচ্ছন্ন কলিকাতা" (Filthy Calcutta) এই নাম দিয়া সম্প্রতি ষ্টেটস্‌ম্যান এক সচিত্র পুস্তিকা বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। কলিকাতায় অপরিচ্ছন্নতা, বস্তি, বসন্ত ও কলেরা প্রভৃতি সম্বন্ধে 'ভারত বন্ধু' ষ্টেটস্‌ম্যান যে সব সংবাদ, মন্তব্য ও চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, পুস্তকাটিতে সেগুলি সমস্ত একসঙ্গে করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ উদ্দেশ্য ভিন্ন কোন কাজ করে বলিয়া আমরা অবগত নহি। এ দেশে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারী ষ্টেটস্‌ম্যানের কলিকাতা প্রীতির কারণ অনুমান করাও খুব কঠিন নয়। যে বাঙালী একটা শহর পরিষ্কার রাখিতে পারে না, কলিকাতার ন্যায় শহরে বসন্ত ও কলেরা মহামারী রোধ করিতে পারে না, তাহারা আবার দেশ শাসন করিবে কি?—সমগ্র পুস্তিকাটির ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। কর্পোরেশনের ওকালতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, দেশের স্বার্থের খাতিরে আমরা এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ডাষ্টবিনে আবর্জনা জমিবার কারণ ছিল লরীর অভাব, লরীর সংখ্যা বাড়াইবার পর সেগুলি পরিষ্কার হইতেছে, অন্ততঃ আগের মত আবর্জনা উহাতে আর স্তূপীকৃত হয় না। মিলিটারী লরীর দাপটে রাস্তাগুলির অবস্থা মারাত্মক হইয়াছে, গাড়ী চালান কষ্টসাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপজ্জনকও বটে। সামরিক বিভাগের উচিত ছিল রাস্তা মেরামত করিয়া দেওয়া, কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। ষ্টেটস্‌ম্যানকে ইহা লইয়া ওকালতি করিতে দেখি নাই। ইংরেজের যুদ্ধে ধাবমান মিলিটারী গাড়ী ও লরী যে রাস্তা নষ্ট করিবে দেশের লোক যদি গায়ের রক্ত মাংস দিয়া তাহা মেরামত করিতে অগ্রসর না হয় তাহা হইলে আমরা দোষ দিতে পারি না। এই অবাঞ্ছিত যুদ্ধে ভারতবাসীকে যথেষ্ট রক্ত ও অর্থ বিসর্জন দিতে হইয়াছে, আরও বেশী দিতে আপত্তি করিলে তাহা অন্যায় বলা যায় না। কর্পোরেশন রাস্তা মেরামতে করদাতাদের অর্থ নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক হইলে তাহা অযৌক্তিক নয়।

তারপর কলিকাতার বস্তি। কর্পোরেশন ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের দাবি তুলিবামাত্র লাটসাহেবকে বস্তিতে বস্তিতে ভ্রমণ করাইয়া তাঁহাদের অযোগ্যতার প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইল। লাটসাহেব বস্তির অবস্থা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। ছয় মাসের মধ্যে বস্তির উন্নতির আশ্বাসও দিলেন। কিন্তু তাঁহার খাস শাসনাধীনে প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পরও কিন্তু বস্তির কোন উন্নতি হইল না। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, বস্তি-সমস্যা সমাধানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় শহরতলীর যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি ও শহরের বাসস্থান বৃদ্ধি। গবর্মেণ্ট নিজেদের প্রয়োজনে বহু বড় বাড়ী দখল করিয়াছেন। সে সব বাড়ীর লোক মাঝারি বাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে এবং সর্বশেষে সর্বাপেক্ষা অধিক চাপ পড়িয়াছে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর। ইহাদের অনেকে বস্তি অঞ্চলে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, সাধারণ শ্রমিক মজুরের ভিড় তো আছেই। শহরতলীর যানবাহন সহজলভ্য ও সস্তা হইলে বস্তির বহু লোক গ্রামের বাড়ী হইতে শহরের কর্মস্থলে যাতায়াত করিতে পারিত। শহরতলীর বাস ও ট্রেনের সংখ্যা অসম্ভব ভাবে হ্রাস এবং যাতায়াতের সময় অনিশ্চিত হওয়ায় ইহারা শহরে আসিয়া বস্তি অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া পশুজীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

কলেরা ও বসন্ত লইয়া কর্পোরেশন ও গবর্মেণ্টের মধ্যে যে বাদানুবাদ হইয়াছে এবং ষ্টেটস্‌ম্যান যাহা ফলাও করিয়া ছাপাইয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি এখানে করিতে চাহি না। আমরা শুধু এইটুকু জানিতে চাই জনস্বাস্থ্য বিভাগের যে ডিরেক্টর কলিকাতায় বসন্তের টীকা বীজ ও কলেরার বীজাণু লইয়া মাতামাতি করিয়াছিলেন, তাঁহার খাস দায়িত্বের অধীনে সারা বাংলায় ঐ দুই রোগে লক্ষ লক্ষ লোকের বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু নিবারণের কি চেষ্টা তিনি করিয়াছেন? কলিকাতায় বহু

খতাঙ্গ সৈন্ত ছিল, গ্রামাঞ্চলে বড় একটা ছিল না, ইহাই কি কলিকাতা ও মফস্বলে বৈষম্যের কারণ ?

ফুটপাথে উন্মুক্ত ঝুড়িতে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় পচা ফল বিক্রয় প্রভৃতির ছবি ষ্টেটস্‌ম্যান ছাপিয়াছেন, উহার নিন্দাও করিয়াছেন। আমরাও করি। কিন্তু এইটুকু কি কেহ ভাবিয়া দেখি যে এই সব খাদ্য কাহারা খায়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে উন্মুক্ত ঝুড়িতে যে ফল বিক্রয়ের নিন্দা ষ্টেটস্‌ম্যান সবচেয়ে বেশী পরিমাণে করিয়াছেন তাহার প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র এসপ্ল্যানেড ও ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে, অর্থাৎ আপিস পাড়া। এখানে মধ্যবিত্ত কেরাণী সকালে আটটা নয়টায় খাইয়া আপিসে আসে, সন্ধ্যা ছয়টায় বাড়ী রওনা হয়। মাঝে টিফিন খাওয়ার কোন উপায় ইহাদের অনেকেরই নাই। কেহ কেহ বাড়ী হইতে খাবার আনেন, সকলের সে সুযোগ হয় না। পচা তেল পচা ঘিয়ের খাবার খাওয়ার চেয়ে অনেকেই ফল খাওয়া মন্দের ভাল বলিয়া খোলা ডালার জিনিষ কিনিতে বাধ্য হন। আপিসের বড় সাহেবদের জন্য ফিরপো আছে, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল আছে; কিন্তু ইহাদের কি ব্যবস্থা হইবে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। ষ্টেটস্‌ম্যান কোন দিনও এ কথা বলেন নাই। ভারতবাসীকে নোংরা ও অপদার্থ প্রতিপন্ন করা যাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য, বলিবার কথাও তাঁহাদের নয়। যে দেশে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দরিদ্রের নাগালের বাইরে, সেখানে ফুটপাথের পচা ফল সস্তায় পাইলে খাওয়ার জন্য ক্ষুৎপীড়িত লোকের অভাব হইবারও কথা নয়।

অপরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব

সব চেয়ে বড় কথা এই যে, এই অপরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব বাস্তবিক কার? প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিয়া ভারতবাসীর হাতে ভারতবর্ষের শাসন ভার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, দেশ শাসনের মঙ্গলামঙ্গল এখন ভারতবাসীর নিজের একথা বলিবার সুযোগ মিলিয়াছে তো মাত্র ১৯৩৭ সালের পর। ইহার আগে ইংরেজের খাস রাজত্বে ভারতবর্ষ কি স্বর্গপুরী ছিল? কলিকাতার প্রশ্নই কি দেশের একমাত্র সমস্যা। কলিকাতার বাহিরে কি মানুষ থাকে না? অপরিচ্ছন্নতা আজ আর শুধু কলিকাতার ডাষ্টবিনে বা খাবারের খোলা ডালায় সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের প্রতি কাজে, ব্যবহারে, কথায় ও মনে অপরিচ্ছন্নতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার উৎস ও কেন্দ্র স্বয়ং গবর্মেণ্ট।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে গবর্মেণ্টের আসল অর্থ গত দুর্ভিক্ষে লোকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে, আজও বুঝিতেছে। সিভিলিয়ান ও পুলিস দেশের আসল গবর্মেণ্ট, দেশ শাসন ও শোষণের প্রধান দায়িত্ব ইহাদেরই হাতে সমর্পিত হইয়াছে এবং শাসন-যন্ত্রের এই দুই দিকপাল দল সে দায়িত্ব চূড়ান্ত প্রভুভক্তির সহিত পালন করিয়াছে। ইংরেজ বা ভারতীয়, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান তপশীলী কোন ভেদাভেদ ইহাতে নাই। সকলেই সমান নিষ্ঠার সহিত দেশবাসীর স্বার্থ পদদলিত করিয়া বিদেশীর সেবা করিয়াছে। প্রতিদানে পাইয়াছে ব্যক্তিগত পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি। স্বায়ত্তশাসনের মন্ত্রিদল ইহাদিগকে বাধা দিতে পারে নাই। বাধা দান অসম্ভব বুঝিয়া বুদ্ধিমানের ন্যায় ইহারাও দলে ভিড়িয়া দু'পয়সা করিয়া লইয়াছে। একটা সমগ্র গবর্মেণ্টের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে একেবারে বিনা কারণে চরম অসাধুতার অভিযোগ কখনও উঠে না।

এ দেশে যে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে তাহার মূল মন্ত্র এই যে দেশ-শাসনের ক্ষমতা থাকিবে সিভিলিয়ান ও পুলিসের হাতে ইহাদের উপর মন্ত্রীদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। ইহারা থাকিবে খাস গবর্ণরের অধীন। আবার গবর্ণর চলিবেন ইহাদেরই পরামর্শে। সুতরাং অবস্থাটা মোটামুটি এই: কাগজে পত্রে যাহারা গবর্ণরের অধীন তাহারাই তাঁহার পরামর্শদাতা, অতএব ইহারা অত্যাচার অবিচার উৎকোচ গ্রহণ অসাধুতা প্রভৃতি সুরু করিলে তাহার প্রতিকারের কোন পথ থাকিবে না। গত দুর্ভিক্ষ নিবারণে ইহাদের আন্তরিক চেষ্টা দেখা যায় নাই এইজন্য যে দেশবাসীর প্রতি ইহাদের কোন দায়িত্ব নাই।

বাংলায় প্রকৃত প্রগতিশীল মন্ত্রিদল গঠিত হইলে এই ভাবে কারবার চলিবে না এই আশঙ্কা হয়ত গবর্ণমেণ্টের মনে জাগিয়াছে। দেশের লোক বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে মন্ত্রিত্ব এখানে পুতুল নাচ, দায়িত্ব আছে ক্ষমতা নাই, তবে পোষাইয়া লইবার উপায় আছে ইহাই তাঁহাদের সান্ত্বনা। গবর্ণমেণ্ট ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন নিশ্চয়। তাই দেখি রোলাণ্ড কমিটির অনুসন্ধান এবং কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সিভিলিয়ানদের উপর মন্ত্রীদের যে অতি সামান্য নামমাত্র ক্ষমতা আছে তাহাও হরণ করিবার ব্যাকুল চেষ্টা। সরকারী কর্ম্মচারীদের ঘুষ চুরি ও লুঠ বন্ধ করিবার জন্য রোলান্ড কমিটি যে সব সুপারিশ করিয়াছেন সেগুলি চাপা পড়িয়াছে। প্রধান হইয়া উঠিয়াছে সিভিলিয়ান ও পুলিসকুলকে মন্ত্রীদের হাত হইতে বাঁচাইবার আগ্রহ। আগামী নির্বাচনের পর নূতন মন্ত্রিদল গঠনের আগেই যাহাতে এই কার্য্য সমাধা হয় তাহার জন্য ঝুনা সিভিলিয়ান পোর্টার সাহেবকে ভার দেওয়া হইয়াছে।

এই যে রাজনৈতিক মিথ্যাচার যাহা দিই নাই তাহাই দিয়াছি বলিয়া মানুষকে বুঝাইবার চেষ্টা ইহার ফল ভাল হইতে পারে না, হয়ও নাই। এই জঘন্য মিথ্যা সমগ্র শাসন-যন্ত্রকে কলুষিত করিয়াছে, শাসকবৃন্দের মন অপরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মচারী যেখানে মনে ও ব্যবহারে অসাধু সেখানে সমগ্র শাসনচক্রে তাহার স্বার্থ সংক্রামিত হইবেই। তাই ছোট বড় নানাবিধ সরকারী কর্মচারীকে চুরি ও ঘুষের দায়ে ধরা পড়িতে দেখি। সকল অপকর্ম হইতে সরকারী কর্মচারীদের বাঁচাইবার প্রবল চেষ্টাও ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না।

গবর্মেণ্ট স্বদেশীই হউক আর বিদেশীই হউক, আধুনিক জগতে সে-ই হয় দেশের ও দেশবাসীর প্রাণকেন্দ্র। এ দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার কথা নয়। জাতিবৈষম্য, ধর্মবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, অর্থবৈষম্যের প্রশ্রয়দাতা যেখানে গবর্মেণ্ট সেখানে জাতি ও দেশ কলুষিত হইবেই। কলিকাতার ডাষ্টবিন ও বস্তি লইয়া আলোচনা করিতে গেলে এই মূল সত্য আমাদিগকে উপলব্ধি করিতেই হইবে। হিন্দুতে মুসলমানে ভেদ, হিন্দুতে হিন্দুতে ভেদ, ইংরেজ ও ভারতবাসীতে ভেদ যেখানে অসাধুত,

ও উৎকোচের সাহায্যে বজায় রাখা হয়, সেখানে পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে পারে না। আবহাওয়া যেখানে অপরিচ্ছন্ন মানুষের মন যেখানে কলুষিত সেখানে পথঘাট খানা ডোবা ডাষ্টবিন প্রভৃতি অপরিচ্ছন্ন থাকিবেই। বাংলার ইতিহাস আমরা জানি। বাঙালী অপরিচ্ছন্ন ছিল না। হিন্দু মুসলমানে প্রথম দাঙ্গা বাংলায় ঘটিয়াছে ইংরেজ আমলে, হিন্দু বা মুসলমান রাজত্বে নয়। বাংলার রাজনীতি বাংলার জাতীয় জীবনকে ঘুষ চুরি ও জালিয়াতির কালিমায় পঙ্কিল করিয়াছে, ক্লাইভ ও তাহার অনুচরবৃন্দ, ষ্টেটসম্যান পত্রিকার পরিচালক ও কর্ণধারদের পূর্বগামীরা বাঙালী নয়।

মুসলিম সমাজ ও মুসলিম লীগ

শিক্ষিত ও চিন্তাশীল মুসলমানেরা মুসলিম লীগের কার্যকলাপ দেশের বা মুসলমান সমাজের কল্যাণকর কি না সে সম্বন্ধে আজকাল নিরপেক্ষ সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা ও যুক্তির দ্বারা লীগের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া ইঁহারা দেখাইতেছেন যে লীগ দেশের কোন মঙ্গল ত করেই নাই, মুসলমান সমাজেরও কোন কল্যাণ ইহাদের দ্বারা সাধিত হয় নাই, বরং লীগের নেতৃত্বে মুসলমান সমাজ ধ্বংসের মুখেই ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে। দৈনিক 'কৃষকে' (৯ই ভাদ্র) প্রকাশিত মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলির একটি প্রবন্ধ আমরা এই সম্পর্কে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি। উহার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। লীগের নেতৃত্বে বাংলার মুসলমান জনসাধারণের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এবং আপামর সাধারণ মুসলমানের দারিদ্র্যের বিনিময়ে লীগ নায়কেরা কি ভাবে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করিতেছেন উহা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

ওয়াজেদ আলি সাহেব প্রথমেই ইউনিয়ন, মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক লীগ প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠনপ্রণালী আলোচনা করিয়া বলিতেছেন,

"আমরা যা জানি, তা এই যে প্রাদেশিক ক'জন আপকো-ওয়াস্তে ধামাপন্থী লোক মিলে খাতায় লিখে রেখেছেন একটা প্রাদেশিক লীগ। তাঁদের মোড়লদের সখ মত—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পরিষদী সদস্য ইত্যাদির ভেতর যাঁকে যাঁকে পাওয়া যায়, তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ক'টি লোকের নাম দিয়ে তৈরি করলেন জেলা লীগ। এইভাবে জেলা লীগের দু-একজন মোড়লের খুশী মোতাবেক লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান, এস্ ডি-ও, সি-ও, থানার ও-সি ইত্যাদির ভেতর যাঁকে যাঁকে দলের ভেতর পাওয়া যায় তাঁদের ইচ্ছানুসারে ক'টি লোকের নামে খাড়া করলেন মহকুমা লীগ। এর পর মহকুমার চাঁইদের কারুর কারুর মর্জি মাফিক ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর চেলা-চামুণ্ডাদের বা তাঁদের দ্বারা বাধ্যকৃত ক'টি লোকের নামে একটি কাগজে লিখে বানালেন ইউনিয়ন লীগ, আর সেই কাগজখানায় তালিকা ক'রে রাখলেন ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামগুলোর মুসলিম বাসিন্দাদের, যারা হয়ত জানেই না যে, তাহাদের নাম এই রকম একটা কাগজে লেখা হয়েছে। ত্রৈমাসিক ষাণ্মাসিক বার্ষিক—কোনো রকমের মিটিঙেরই বালাই নেই, কোন প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনার দরকার নেই, (প্রোগ্রামই নেই, তার আবার আলোচনাটা কিসের ?) ; একবার কাগজে-কলমে যাকে কর্তৃত্বের যে পদ দিয়ে যেভাবে রাখা হ'ল, তাই বৎসরের পর বৎসর চলতে লাগল। কোন হৈ চৈ নেই, সাড়া-শব্দ নেই, অথচ লীগের অস্তিত্ব খবরের কাগজে এবং রাজার দরবারে জোর চালু রইল। এই হ'ল বহু বিঘোষিত লীগের সত্তার স্বরূপ। এতে মুসলিমই বা কোথায়, আর ইসলামই বা কোথায় ? তবু তা হ'ল মুসলিম লীগ। মুসলিম থাকল গাঁয়ের মাঠে মাঠে, ইসলামের নীতি রইল কেতাবের পাতায় পাতায় ; তাদেরে রঙ্গা দেখিয়ে চেগে উঠল মুসলিম লীগ, যেমন পাথর ছাড়াই হ'ল পাথর-বাটি, আম ছাড়াই হ'ল আমসত্ত্ব।"

ইহার পর লেখক দেখাইয়াছেন মহকুমা লীগ ইউনিয়ন লীগের অভিমতের ধার ধারে না, জেলা লীগ মহকুমা লীগের মতামতের পরোয়া করে না, প্রাদেশিক লীগ জেলা লীগের মতামত লওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না এবং সর্বভারতীয় লীগ প্রাদেশিক লীগের সিদ্ধান্ত-অসিদ্ধান্তের "থোড়াই কেয়ার করে।"

ওয়াজেদ আলি সাহেবের কথার সারবত্তা বহুবার বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত হইতে আমরাও লক্ষ্য করিয়াছি। সিন্ধুতে, বাংলায় ও আসামে প্রাদেশিক লীগ প্রয়োজন হইলেই কেন্দ্রীয় লীগকে না জানাইয়া বা তাহার প্রকাশ্য নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কাজ করিয়াছে। সমর প্রচেষ্টায় সাহায্য করা হইবে না এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় লীগে গৃহীত হওয়ার পরও বাংলার লীগ ইউরোপীয় দলের সহিত একযোগে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন। যে কারণে সর সুলতান আহমদ ও বেগম শাহ নওয়াজ লীগ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সেই কাজ করিয়াই বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগ তাঁহাদের সর্বভারতীয় নায়কের প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। বড়লাটের শাসন পরিষদে সর সুলতান আমেদ এবং সর আজিজুল হক দুজনেই যোগদান করিয়াছেন, দুজনের প্রতি কেন্দ্রীয় লীগের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। লেখক ঠিকই বলিয়াছেন, "সমগ্র ভারতের মুসলীম সমাজের প্রতিনিধি সেজে ক'টি নাচের পুতুল রাজসভায় খেল দেখাচ্ছে জিন্নাকে মাথায় নিয়ে।"

লীগ ও ইসলামের নীতি

কোরাণে লিখিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল সূত্রগুলি লীগ তো মানেই না, বরং উহার বিপরীত আচরণই করিয়া থাকে ইহাও বিশদ ভাবে মহম্মদ ওয়াজেদ আলি তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—"ইসলাম ধন ও সম্পত্তিকে ধনিক ও ভূমিপতির হস্তে অর্পিত আল্লার ন্যাস মাত্র ভেবে থাকে। এই ন্যাসের যা সুফল, কৃষক, মজুর, অক্ষম বা ক্ষতিগ্রস্ত ভিক্ষার্থী প্রভৃতি সর্বহারার দল তা ধনিক ও ভূমিপতির হাত দিয়েই হোক, বা রাষ্ট্রশক্তির মারফৎই হোক, ভোগ করার অধিকারী। ইসলামের নৈতিক বিধান মানতে হ'লে সর্বহারাদের এই অধিকার অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু

লীগ করছে কি ? লীগ সামন্ততন্ত্র সমর্থন করছে, প্রজার রক্তশোষক জমিদারীর আনুকূল্য করছে, মজুরের শ্রম-ভক্ষক শিল্পপতিদের অধিকার মেনে নিচ্ছে, দরিদ্রের প্রাণঘাতী ধনাধিকার স্বীকার করছে। তাই কৃষক, মজুর ও নিঃস্ব দরিদ্র-দের স্বার্থের চিন্তা সে একটুও করে না, তাদের সম্বন্ধে লীগের কোনো প্ল্যান বা প্রোগ্রামই নেই। লীগ চায়—যেমন চলছে তেমনি চলতে থাক :—রিয়াসতের নবাব নিজামরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকুন, জমিদার বজায় থাকুন, শিল্পপতি রক্ষা পান, ধনিক বড়লোকী করুন, বণিক বাণিজ্য চালিয়ে ফেঁপে উঠুন ; তাতে কৃষক, মজুর বা নিঃস্ব জনসাধারণ বাঁচলো কি মলো, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজনই নেই। ইস্‌লামের কলিজায় এইভাবে ছুরি মেরে লীগ হলো মুসলিম লীগ।”

মুসলমানদের ভালমন্দের প্রতি লীগের দরদের কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। গত দুর্ভিক্ষে বিশেষ ভাবে ইহার পরিচয় মিলিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া ওয়াজেদ আলি সাহেব লিখিতেছেন : “গত সন ১৩৫০ সালের প্রলয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে উডহেড কমিশনের সতর্ক—সুতরাং স্বল্প-হিসাব মতেই বাংলার পনের লক্ষ লোক মারা গেছে। এর ভেতর কমসে-কম দশ লক্ষ লোক যে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, এটা স্বীকার করবেন না, আশা করি এমন কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি বাংলা দেশে বাস করেন না। এই দশ লক্ষ মুসলিমের জীবন রক্ষার জন্য মুসলিম লীগ বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেনি। লীগপতি জিন্নাহ্, দশ লক্ষ মুসলিমের জীবনদীপ নির্বাপিত হ'তে দেখেও তাঁর সুদূর পাহাড়ী বিলাস-ভবন ছেড়ে একটি বারের জন্য বাংলায় পদধূলি দেন নি ; এমন কি, সেই পাহাড়ের চূড়ায় ব'সে ‘আহা’ শব্দটুকুর উচ্চারণ করেন নি। বরং তাঁর চেলা স্যার নাজিম-উদ্দীনের মন্ত্রিসভা, মানে স্যার নাজিম নিজেও বহু ব্যক্তির কাতর ক্রন্দন তাঁদের দরবারের শান্তিভঙ্গ করছে দেখে চরম উপেক্ষার সঙ্গে বলেছিলেন, খোদা ওদেরে মারছে, আমরা করব কি ?

“কিন্তু সত্যি কি খোদাই তাদেরে মেরেছিলেন ? বাংলা দেশ থেকে চাউল অন্যত্র চালান হ'ল ; স্যার নাজিম ও তাঁর মন্ত্রিসভা তা সমর্থন করলেন। বাংলার চাষীর ঘরে ধান-চাউল ছিল না ; তাঁরা মিথ্যে ক'রে বললেন, না হে ঢের চাউল মজুত রয়েছে বড় বড় ব্যবসায়ীরা ধান-চাউল লক্ষ লক্ষ মণ কিনে নিয়ে তা আটক রেখে দর পনের ষোল গুণ বাড়িয়ে দিলেন, তাঁরা এই সব রাক্ষসদের নিজেদের পক্ষপুটের অন্তরালে আশ্রয় দিলেন। নিজেরাও লক্ষ লক্ষ মুমূর্ষু মানুষের মুখের অন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে আনিয়ে প্রায় অর্দ্ধ কোটি টাকা লাভ করলেন। আর ব্যবসায়ীদেরে এত অসম্ভব লাভ করতে দিলেন যে, উডহেড কমিশন ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। কমিশন বলেছে, দুর্ভিক্ষে মৃত পনের লক্ষ লোকের লাসপিছু সর্বনাশা ব্যবসায়ীরা এক এক হাজার টাকা হিসেবে লাভ কুড়িয়েছে। লীগ মন্ত্রিসভা জেনে, শুনে, দেখে, বুঝেও এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। উল্টা তাঁরা নিজেরাই ঝড়ের মুখে আম কুড়াবার চেষ্টা যথাসম্ভব করেছেন। সবার কথা বলি না ; কিন্তু শুনেছি, দুর্ভিক্ষের ডামাডোলে এবং তার পরবর্তী লুটের যুগে লীগ মন্ত্রিসভার কোন কোন মহাপ্রভু এত টাকা জমিয়েছেন যে, তাতে অন্ততঃ দু পুরুষ পর্য্যন্ত তাঁদের নবাবী হালে চলে যাবে। অন্ততঃ দশ লক্ষ মুসলিমের হাড্ডি খেয়ে যাঁরা এই ভাবে রাজত্ব করলেন, তাঁদেরই লীগ হ'ল মুসলিম লীগ।”

ভারতবর্ষে হাসপাতালের অভাব

যুদ্ধের সময়ে যে সকল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যুদ্ধের পর সেগুলি জনসাধারণের প্রয়োজনে ছাড়িয়া দিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে মূল্যবান সরঞ্জামসহ বহুসংখ্যক হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেগুলি কর্তৃপক্ষের আর কোন কাজে লাগিবে না। যদি ঐগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হয় অথবা বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহা গভীর পরিতাপের বিষয় হইবে। জনসাধারণের জন্য হাসপাতালের একান্ত প্রয়োজন, সামান্য যে কতকগুলি হাসপাতাল দেশে আছে প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জনসাধারণের জন্য ঐ হাসপাতালগুলি ছাড়িয়া দেওয়া সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পণ্ডিতজীকে সমর্থন করিয়া নয়া দিল্লী হইতে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে সামরিক হাসপাতালগুলির সাজসরঞ্জামসহ জনসাধারণের প্রয়োজনে ছাড়িয়া দিবার জন্য পণ্ডিত নেহরু সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ মার্কিন কর্তৃপক্ষের, নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহা খুবই সময়োচিত হইয়াছে। বর্তমানে দেশের সর্বত্র হাসপাতালের দারুণ অভাব। হাস-পাতালগুলিতে রোগীর স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না বলিয়া ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে স্বাস্থ্য বিভাগ ও উন্নয়ন কমিটির তরফ হইতে ভারত-সরকারের নিকট এই আবেদন জানানো হইয়া-ছিল যে যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই সামরিক হাসপাতাল-গুলি তাঁহারা যেন জনসাধারণের প্রয়োজনে নিয়োজিত করেন। পণ্ডিত নেহরুর ন্যায় ডাঃ রায়ও ভারতের এবং ব্রিটিশ ও আমেরিকান সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট এজন্য আবেদন জানাইয়াছেন। আবেদনের ফল কি হয় দেশবাসী সাগ্রহে তাহা লক্ষ্য করিবে। সারা ব্রিটিশ ভারতে আপাততঃ ২৯ কোটি লোকের জন্য মোট হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারিতে মিলাইয়া মাত্র ৫৮৮৫টি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে।

সময় পরিবর্তন

যুদ্ধের সময় ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে ঘড়ি এক ঘণ্টা আগাইয়া দিয়া সময় রাখিবার এক নূতন প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল। দিবালোক বাঁচাইবার নামে সময়ের এই নূতন হিসাবে লোকের কোন সুবিধা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না, বরং অসুবিধা হইতেই আমরা দেখিয়াছি। কলিকাতায় কেরানীদের আপিস যাওয়ার সময় ৩৬ মিনিট আগাইয়া গিয়াছে, ফলে সকাল বেলা কাজের জন্য যেটুকু সময় পাওয়া যাইত তাহা নষ্ট হইয়াছে। যাহারা দূর হইতে আফিসে যায় তাহাদিগকে

আধপেটা খাইয়া আপিস করিতে হইয়াছে। দুপুরে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত টিফিনের অভাবে অনেকেরই স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে। সুবিধা ষোল আনা হইয়াছে সাহেবদের। ইঁহারা পূর্বের ন্যায় ১টার সময় খানা খাইতে হোটেলে গিয়াছেন, ৩টায় আপিসে ফিরিয়াছেন। বিকালে ক্লাবের সময়টা ইঁহাদের বেলায় বাড়িয়াছে। বাঙালী কেরানীর ক্লাব নাই, বিকালের 'দিবালোক বাঁচানো' সময় তাহার কোন কাজেই লাগে নাই। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের রীতিমত অসুবিধা হইয়াছে, বিকালে খানিকটা সময় বাড়ায় তাহাদের লাভ বিশেষ কিছু হয় নাই কিন্তু সকালে সময় কমিয়া যাওয়ায় ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছে। বেঙ্গল কমার্স, চেম্বার এই বন্দোবস্ত বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ইহা নিন্দনীয়। সাহেবদের সুবিধার জন্য এই বন্দোবস্ত পাকা করা হইলে গুরুতর অন্যায় হইবে।

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

আচার্য পণ্ডিত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয় প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে গত ১৯শে আগষ্ট দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী (পূর্বের নাম তারাকিশোর চৌধুরী) এবং ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সমসাময়িক ছিলেন। তন্মধ্যে ডাঃ দাস এখনও জীবিত এবং কর্মক্ষম আছেন। ইঁহারা চারিজনেই শ্রীহট্ট জেলা হইতে আসিয়া ব্রাহ্ম আদর্শ গ্রহণ পূর্বক ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয় বার কি তেরো বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে ধর্মভাব ও জ্ঞানসাধনার যে বীজ ছিল, উত্তর কালে তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া বিরাট্ মহীরূহে পরিণত হয়। বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ ভক্তি ও যুক্তির একত্র সমাবেশ তাঁহার জীবনে প্রতিভাত হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের জীবন আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় লিখিয়াছেন, "বিজ্ঞ কিন্তু সন্দেহবাদী অনেক লোক তাঁহার গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া বিশ্বাসী হইয়াছেন ও বিগতসন্দেহ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, জানি।" সুদীর্ঘ ৬০।৬৫ বৎসর ধরিয়া ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি সাধনায় তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন ব্যয়িত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা তিনি পান নাই কিন্তু নিজের চেষ্টাতেই তিনি খ্যাতনামা দার্শনিক রূপে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। তিনি কেশব একাডেমির প্রধান শিক্ষক রূপে বহু ছাত্রের জীবনগঠনে সহায়তা করিয়া তাহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয় চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত পিঠাপুরমের মহারাজা সূর্য রাও তাঁহাকে প্রায় ৪০ বৎসর কাল মাসিক ১০০ টাকা হিসাবে বৃত্তি দান করিয়া বর্তমান ভারতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধন ও প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন।

পরলোকে সরলা দেবী চৌধুরাণী

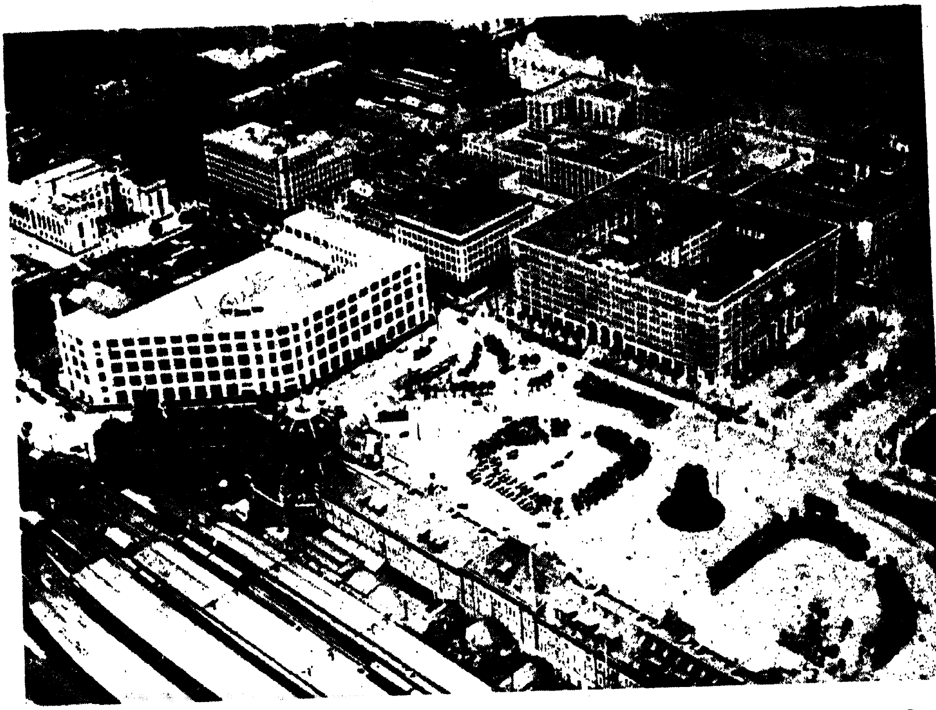
সরলা দেবী চৌধুরাণী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী এবং রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার মাতা এবং কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জানকীনাথ ঘোষাল তাঁহার পিতা। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। পিতার নিকট তিনি পান রাজনৈতিক সাধনা ও দেশপ্রেমে দীক্ষা, এবং মাতার নিকট লাভ করেন সংবাদপত্র পরিচালনা ও সাহিত্য-সাধনার শিক্ষা। শিল্পকলা ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তাঁহার শিশুকাল হইতেই দেখা গিয়াছিল।

কলেজ ত্যাগের পর তিনি ফরাসী ও ফারসী ভাষা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনিই প্রথম কলিকাতায় ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত চর্চার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ভারতী' সম্পাদনাকালে তিনি নানাভাবে মাতাকে সাহায্য করিতেন, পরে নিজেই তিনি 'ভারতী'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন।

আর্যসমাজের নেতা পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার সহিত একযোগে সরলা দেবী উর্দু সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থান' সম্পাদনা করেন। 'হিন্দুস্থানে'র ইংরেজি সংস্করণ বাহির হইলে তিনিই উহার সম্পাদিকা হন। ১৯২৬ সালে তিনি ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভানেত্রীত্ব করেন।

সাহিত্য-জগতেও তিনি উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ প্রবাসী-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মেলনের বীরভূম সম্মেলনে তিনি সভানেত্রীত্ব করেন। তাঁহার রচিত 'নববর্ষের স্বপ্ন', 'শতগান', 'পুজায়ন', 'শিবরাত্রি' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে সরলা দেবী তাঁহার জীবন উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের জাতীয় আন্দোলনে তিনি ও তাঁহার স্বামী উভয়েই যোগদান করেন। ইহার জন্য উভয়কেই অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার ও লাঞ্ছনা বরণ করিতে হয়। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি যোগ দেন। সমাজসেবায়ও তাঁহার দান কম নয়। মাত্র সাতটি বাঙালী বালিকা লইয়া তিনি তাঁহার ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল গঠন করিয়াছিলেন। তিনি বাংলার অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। স্বদেশী যুগের পূর্বেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া তিনি মেয়েদের মধ্যে স্বদেশী জিনিস প্রচলন করেন। যুবকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতিও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। বাংলার যুবকদের আমোদপ্রমোদে জাতীয় ভাব উদ্বোধনের জন্য তিনি বীরাষ্টমী ব্রতের প্রচলন করেন। প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য প্রভৃতি বঙ্গবীরদের স্মৃতিপূজা প্রবর্তন করিয়া তিনি বাংলার যুবকবৃন্দকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রুশ-জাপান যুদ্ধকালে বেঙ্গল এম্বুলেন্স প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন।



যুদ্ধের আগেকার টোকিওর কেন্দ্রস্থল। বাঁ-দিকে রেল-ষ্টেশনের নিকটে জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ আপিস-গৃহ মারুনোচি



টোকিওর একটি ব্যবসায়-কেন্দ্র



ফরমোজার উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থ চিকুনানের রেলপথে একটি ট্রেনের উপর মার্কিন প্যারা-ফ্র্যাগ বোমাসমূহের অবতরণ



প্যারা-ফ্র্যাগ বোমা দ্বারা মার্কিন পঞ্চম বিমানবাহিনীর শোকা নামক স্থানে ফরমোজার প্রধান রেল-পথের উপর আক্রমণ

মনস্তত্ত্ব

(নাটিকা)

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

পাত্র-পাত্রী

রেখা—রজতের ভগ্নী, যুবতী

শীলা—রেখার দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী, যুবতী, গরিব

মুক্তা—ধনীকন্যা, যুবতী

রজত—বৈজয়ন্ত ব্যাঙ্কের বড় অংশীদার, যুবক

সুবর্ণ—বৈজয়ন্ত ব্যাঙ্কের বড় অংশীদার, যুবক

কনক—ধনী সন্তান, যুবক

(রজতের ড্রয়িং-রুম—বসে রেখা, পড়ছে একখানা ইংরেজী নভেল—তার মলাটে আঁকা এক উলঙ্গ নারীমূর্ত্তি, শীলার প্রবেশ)

শীলা। (রেখার পাশে বসে) কি বই পড়ছ রেখাদি ?

রেখা। (বইখানা কোলের উপর উল্টে রেখে—আলস্যে সোফার উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে) বাজে বই, ভেবেছিলাম বইটা ভাল হবে কিন্তু দেখছি রাবিশ (বইখানা একপাশে ফেলে দিলে)।

শীলা। (সেখানা তুলে নিয়ে) এলিস এলমানাক, নামকরা লেখক।

রেখা। এ সব লেখক যে কি করে নাম করে তা বুঝি নে। মনস্তত্ত্ব নিয়ে কারবার অথচ কিছু বোঝে না মনস্তত্ত্বের।

শীলা। কিন্তু আধুনিক লেখক।

রেখা। লেখক আধুনিক কিন্তু লেখা প্রাচীন। আধুনিকদের, বিশেষ করে আধুনিকদের মনের গভীরতা বুঝবার ক্ষমতা লেখকের নেই। নারীর মন এক বিচিত্রলোক—স্বপ্নলোকের চেয়েও তা আশ্চর্য্য ; সেখানে একই সঙ্গে শীত-বসন্ত, আলো-ছায়া, বিরহ-মিলন মিশে আছে।

শীলা। (রেখার মুখের দিকে বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে) রেখাদি, তুমি সত্যিই কবি ; তুমি কেন যে বই লেখ না তা আমি বুঝতে পারি নে।

রেখা। (একটু হেসে) কেউ ছবি আঁকে, আবার কাউকে আঁকা হয় ; তেমনি কেউ লেখে আবার কাউকে লেখা হয়।

শীলা। (উৎসাহের সঙ্গে) কথাটা তুমি ঠিক বলেছ রেখাদি, তুমি লেখক নও, তুমি লেখকের মডেল। তোমার ভিতরে এমন একটা রহস্য রয়েছে, ঐ যে বললে আলো-ছায়ার মেশামেশি ভাব ; ও নিয়ে একখানা ফার্ষ্ট ক্লাস নভেল লেখা যায়।

রেখা। তোমাদের ঐ so-called (তথাকথিত) আধুনিক লেখকেরা আমাকে বুঝতে পারবে না, ওরা এক দিকে চেয়ে থাকে—চার দিকে চেয়ে দেখবার ক্ষমতা ওদের নেই ; সত্যিই ওদের লেখা নভেলগুলোর মেয়েদের মন কি সরল, কি সহজ—পড়লে আমার হাসি পায়।

শীলা। তুমি কি খুবই সরল মনে করো ? আমার মতে কিন্তু খুব সরল নয়, বেশ জটিল।

রেখা। ঐ কি আধুনিকার মন ? আমি স্বীকার করছি ওদের মনে জটিলতা আছে, কিন্তু মনের রহস্য যদি ভেদই হয়ে গেল, জটিলতার জট যদি শেষের অধ্যায়ে খুলেই গেল তাহলে রইল কি ?

শীলা। হুঁ কথাটা ভাববার মত—জটই খুলে গেল তাহলে রইল কি ? তোমার দিকে চাইলে ওটা বুঝতে পারা যায়।

রেখা। তার মানে ?

শীলা। তার মানে তোমার মনের রহস্য আমি আজও ভেদ করতে পারলাম না, তাই তুমি আমাকে এত আকৃষ্ট কর।

রেখা। (একটু হেসে) তাহলে আমার মন তুমি বুঝবার চেষ্টা করেছিলে ?

শীলা। করি নি ! নিশ্চয় করেছি। তোমাকে আমি কত দিক দিয়ে, কত ভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছি অনেক সময় মনে হয়েছে বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আবার দেখেছি সে ধারণা মিথ্যা। তুমি যেন একটা কঠিন ক্রস ওয়ার্ড পাজ্‌ল, এক দিক মেলে কিন্তু আর এক দিকে মেলে না।

রেখা। ক্রস ওয়ার্ড পাজলের সঙ্গে তুলনা করলে কেন শীলা ?

শীলা। যদি শুনতে চাও তাহলে বলি।

রেখা। (সুদূরের দিকে দৃষ্টি মেলে) বলো।

শীলা। ক্রস ওয়ার্ড পাজলের এক দিক দিয়ে হতে হবে সুবর্ণ, আর এক দিক দিয়ে হতে হবে কনক—মেলাই কেমন করে ?

রেখা। মেলাতে পার নি তা হলে ? যে জানে সে মেলাতে পারে, তোমরা জান না।

শীলা। রেখাদি, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বল, তুমি সুবর্ণবাবু আর কনকবাবু দুজনকেই ভালবাস ?

রেখা। যদি বলি ভালবাসি তাহলে কি তুমি দোষের মনে করবে ?

শীলা। দোষের কথাই আসে না, আমি বলছিলাম সেটা কি সম্ভব ?

রেখা। নারীমনের গভীরতার সন্ধান নারীও পেলে না ? তুমি কি নারী নও শীলা, তুমি কি পুরুষ ?

শীলা। আমার উপর অবিচার ক'রো না রেখাদি, ভালবাসা ব্যাপারে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তবে তোমার মত অতলস্পর্শী মন কোথায় পাব আমি !

রেখা। কথাটা বেশ বলেছ শীলা, অতলস্পর্শী। সত্যি শীলা, আমার মনের মায়া আমিও বুঝতে পারি না।

শীলা। তাইত বলছিলাম তুমি মায়াবিনী। কনকবাবু আর সুবর্ণবাবুকে জড়িয়ে তুমি মায়াজাল বুনছ। তাহলে তুমি দুজনকেই ভালবাস রেখাদি ?

রেখা। (মুখে ফুটে উঠল মোনা লিসার হাসি) দুজনকেই ভালবাসি।

শীলা। (খুব আশ্চর্য্য হয়ে) অথচ দুজন দুরকম! তোমার ভিতরটা আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

রেখা। সেখানে কি আছে তা যে আমি নিজেই জানি না।

শীলা। আমি দুজনকেই ভালবাসি। কনককে ভালবাসি তার প্রাণের প্রাচুর্য্যের জন্যে, সুবর্ণকে ভালবাসি তার রসবোধের জন্যে—সুবর্ণ ছবি না আঁকলেও শিল্পী।

শীলা। একজনকে নিয়ে তোমার তৃপ্তি নেই।

রেখা। আমার মনটা ত একমুখী নয় শীলা, সে বহুমুখী। সে জীবনের গতির দিকটা, প্রাচুর্য্যের প্লাবনের দিকটা ভালবাসে, তাই কনক তার প্রিয়।

শীলা। তুমি নিশ্চয়ই কনকবাবুর সব খবর জান?

রেখা। জানি বৈকি শীলা, জানি কনক উচ্ছৃঙ্খল, কনক খেয়ালী কনক মাতাল। কনক যা করে তা চূড়ান্তভাবে করে, ঐ জন্তেই কনককে আমি ভালবাসি। আমার মধ্যেও একজন উচ্ছৃঙ্খল 'আমি' আছে, কনক তারই সঙ্গী।

শীলা। আমার কিন্তু সুবর্ণবাবুকে ভাল লাগে।

রেখা। আমারও ভাল লাগে। সে মানুষটা শিল্পী, সৌন্দর্য্য দেখে সে মুগ্ধ হয়, বর্ণগন্ধের সে সমঝদার। এই যে পার্লি পিঙ্ক শাড়ি আর গোলাপী রঙের ব্লাউজ আমি পরেছি এ সুবর্ণের জন্যে। সে ভালবাসে ছবি—রঙের গোলমাল, রেখার গোলমাল একটু হলে সে ছুটে পালিয়ে যাবে। এই ব্লাউজের অভিনবত্ব কোথায় বুঝতে পেরেছ? এটা এমনভাবে ছাঁটা যাতে বুকের contour-এর সঙ্গে কাঁধের curve-এর মিল হয়। ফ্রেঞ্চ দরজীর সৃষ্টি এটি, অনেক টাকা খরচ হয়েছে, আরো অনেক হলেও আমার আপত্তি ছিল না।

শীলা। রেখাদি, তুমিও একজন আর্টিষ্ট, তোমার মত এমন সুছন্দে সাজসজ্জা করতে আর কেউ পারে না।

রেখা। হয়তো আমিও আর্টিষ্ট তাই সুবর্ণ আমাকে ভালবাসে। সুবর্ণের লাইব্রেরি তুমি দেখনি শীলা, সে একটা স্বপ্নলোক। জাপানী শিল্পী উতামারোকে দিয়ে ফ্রেস্কো আঁকিয়েছে, শ্যাম থেকে কাঠের স্ক্রীন আনিয়েছে, কি চমৎকার তার কারুকার্য্য, পুরনো Chinese vase, রুবেন্সের ওরিজিন্যাল অমূল্য সব সম্পদ। আমি যখন সুবর্ণের লাইব্রেরির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াই তখন আমার ভয় হয় বুঝি আমি সেখানে বেমানান।

শীলা। ওটা তোমার মিথ্যা ভয় তুমি রুবেন্সের আঁকা সুন্দরীদের চেয়ে কম সুন্দরী নও।

রেখা। ঠিক ঐ কথা বলে সুবর্ণ। আমি সেদিন সব সোনালী পোশাকে ওর বাড়ী গিয়েছিলাম, সোনালী শাড়ী, সোনালী ব্লাউজ, সোনালী জুতো, মাঝে মাঝে গাঢ় লালের সামান্য বৈচিত্র্য, সুবর্ণ আমাকে দেখে কি বললে জানো? বললে, গেইন্স বরো তোমাকে দেখলে 'ব্লু বয়' না এঁকে আঁকতেন 'গোল্ডেন গার্ল'।

শীলা। তোমার মত rival না থাকলে আমি সুবর্ণবাবুর প্রেমে পড়তাম রেখাদি।

রেখা। (স্মিত হাস্যে) আমি না হয় সরে দাঁড়াচ্ছি।

শীলা। তুমি সরে দাঁড়ালেও আমি পারব না কারণ আমি আর্টিষ্ট নই, তাছাড়া তোমার অতি সাধারণ শাড়ির মত একখানা শাড়ি কিনতে হলে আমাকে দেউলে হতে হবে।

রেখা। যেমন ফুলের সার্থকতা বর্ণে-গন্ধে, তেমনি আমার সার্থকতা রূপে ও রূপ-সাধনায়।

শীলা। ও কথা তুমি বলতে পার রেখাদি, তোমার রূপও আছে রূপোও আছে।

রেখা। আমি বুঝি না শীলা, বঞ্চিত জীবন মানুষ বহন করে কেমন করে! গরীবের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।

শীলা। জানবার মত কিছু নেই রেখাদি, অনেক ক্ষেত্রে গরীবের মনই নেই, মনস্তত্ত্ব আসবে কোথা থেকে।

রেখা। বলো কি শীলা এরা এত নীচুতে! আমার কি মনে হয় জানো, মানুষ যদি সুন্দরের উপাসনা করত তাহলে পৃথিবীর অনেক অকল্যাণ লোপ পেত। অসুন্দরের আবেষ্টনে আমি এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারি নে, আমার আত্মা পীড়িত হয়।

শীলা। আবেষ্টন বিচার করবার গরীবের অবসর কোথায়?

রেখা। ওরা ভালবাসতে পারে?

শীলা। অতি সাধারণ ভালবাসা, না আছে বৈচিত্র্য না আছে বৈশিষ্ট্য—একঘেয়ে। একজনকেও পুরো মন দিয়ে ভালবাসতে পারে না, আধখানা থাকে পেটের চিন্তায়।

রেখা। অথচ প্রেম কি বিচিত্র! অতীতের কতকগুলো অচল মতবাদ মানুষের মনকে পঙ্গু করে রেখেছিল। আধুনিক কালের ছেলেমেয়েরা সে সব মতবাদকে অস্বীকার করে সজীব হয়ে উঠেছে। ভালবাসা বলতে প্রাচীনেরা যা বুঝত আমরা তা বুঝি না, আমরা একজনকেও ভালবাসতে পারি আবার একাধিককেও ভালবাসতে পারি।

শীলা। সূক্ষ্ম তোমার বিশ্লেষণ রেখাদি—আমি যখন শুনি তখন অবাক হয়ে যাই।

রেখা। (সুদূরের দিকে দৃষ্টি মেলে) সত্যি কথা বলতে কি শীলা, আমার ভালবাসা কনক আর সুবর্ণকে ভালবেসে নিঃশেষ হয়ে যায় নি, যদি আরো কেউ আমাকে নতুনতর আনন্দ দেয় তাহলে তাকেও আমি ভালবাসব।

শীলা। রেখাদি, তুমি আমাদের নবযুগের যুবরাণী।

(মুগ্ধার প্রবেশ)

রেখা। এসো ভাই মুগ্ধা, আজকের দিনটা শুভদিন বলে বলতে হবে, মন যাদের চায় তারা একে একে এসে উপস্থিত হচ্ছে।

মুগ্ধা। (সরু গলায় উচ্চহাস্য করে) তাহলে এস একটা উৎসব করা যাক, একটা গ্র্যাণ্ড উৎসব।

শীলা। মুগ্ধাদির সবই গ্র্যাণ্ড। ছোটখাটো জিনিষে আপনার মন ওঠে না।

মুগ্ধা। ছোটখাটো জিনিষ আমার জন্যে নয়, আমি যা করব তা বড় করে করব, তা না হলে করবই না।

রেখা। তোমার সেই ইটালীয়ান বন্ধুর কাছে নাচ শেখা চলছে তো?

মুগ্ধা। ইটালীয়ান বন্ধু বিদায় নিয়েছেন, এখন এক পোলিশ বন্ধুর কাছে পিয়ানো শিখছি।

শীলা। মুগ্ধাদি, তুমি হাওয়াই-এর Hula Dance (হুলা ড্যান্স) নাচতে পার?

মুগ্ধা। (সরুগলায় উচ্চহাস্য করে) গ্র্যাণ্ড আইডিয়া! এর পরে Hula Dance শিখব রেখা, বুঝেছ। (হুলা ড্যান্সের ভঙ্গীতে

৬ নাচ)

শীলা। Wonderful, Wonderful, তুমি একটা genius মুগ্ধাদি, তুমি ভারতীয় প্যভ্‌লোভা।

(রজতের প্রবেশ)

রজত। কি যেন একটা miss করলাম, বিস্ময়কর একটা কিছু!

শীলা। মুগ্ধাদি, Hula Dance নাচছিলেন রজতদা।

মুগ্ধা। আমার আগামী জন্মদিনে আপনাকে Hula Dance দেখাব।

রজত। নতুনত্ব হবে, তোমার জন্মদিন বছরে একাধিক হলে ভাল হ'ত।

শীলা। আপনার জন্মদিনে একটা নতুন কিছু করতে হবে রজতদা।

রজত। আমার জন্মদিনে যদি নাচ দেখতে চাও তাহলে বাঁদরনাচ দেখতে হবে।

রেখা। তোমার জন্মদিনে আমাকে একখানা মিনার্ভা উপহার দিও, আমি আর বেশী কিছু চাই না, আপাততঃ আমরা একটু কাজে যাচ্ছি, তুমি বসো ভাই মুগ্ধা।

রেখা ও শীলার প্রস্থান)

রজত। (মুগ্ধার দিকে এগিয়ে গিয়ে) আজ কাকে মুগ্ধ করতে বেরিয়েছ মুগ্ধা?

মুগ্ধা। মুগ্ধা যাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে।

রজত। এ তোমার কেমন খেলা! আমাকে ডেকে পাঠালে আমি চলেছি, এমন সময় দেবী স্বয়ং উপস্থিত।

মুগ্ধা। (সোফায় ঝুপ করে বসে পড়ে) তোমার আশায় বসে থাকতে পারলাম না, নিজেই ছুটে এলাম।

রজত। (মুগ্ধার পাশে বসে) আদেশ কর।

মুগ্ধা। আদেশ কে করবে, তুমি না আমি?

রজত। যদি আমাকে আদেশ করবার অধিকার দাও তাহলে আমার অতি কঠিন আদেশ হচ্ছে এই যে মে শেষ হবার আগেই আমাকে বিয়ে করতে হবে, মনে রেখো আজ দশই মে।

মুগ্ধা। (রুজ মাখা ঠোঁট একটুখানি ফাঁক করে হেসে) এই কি আদেশ? যদি বলতে 'আজ রাত বারোটার আগেই আমাকে বিয়ে করতে হবে তাহলে বুঝতাম আদেশ। দেখছি তুমি আদেশ করবার মোটেই উপযুক্ত নও, ওটার ভার আমাকেই নিতে হবে।

রজত। (মুগ্ধার একখানা হাত দুহাতে তুলে নিয়ে) তোমাতে আমাতে এক সুখের নীড় রচনা করব কি বল প্রিয়া।

মুগ্ধা। (রুজ-রঙিন ঠোঁট দুখানা সামান্য একটু উল্টিয়ে) ঐ নীড় কথাটা আমার পছন্দ নয় প্রিয়তম, বল আমরা দুজনে মেলি সুখের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করব।

রজত। তাই হবে রাণী, আমরা প্রেমের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করব, সেখানে দুটি আত্মা নিরিবিলি পরস্পরকে ভালবাসব।

মুগ্ধা। না, নিরিবিলি নয়, এমন সমারোহে আমরা ভালবাসব যাতে সারা পৃথিবী সে খবর জানতে পারে।

রজত। ঠিক বলেছ মুগ্ধা, আমাদের ভালবাসা পৃথিবীর লোক চেয়ে দেখবে। সেই প্রেমের প্রাসাদে আমরা চিরকাল—

মুগ্ধা। (কাঁদ-কাঁদ ভাবে) চিরকাল আমি এক প্রাসাদে থাকতে পারব না।

রজত। তুমিই বল প্রিয়া কিসে তোমার আনন্দ, কি তুমি চাও?

মুগ্ধা। (মুখে হাসি ফুটিয়ে) বিয়ের পরে আমাকে হলিউডে নিয়ে যাবে বল।

রজত। হলিউড! সে তো হাতের কাছে, তুমি যদি নর্থ-পোল বলতে তাহলেও আপত্তি করতাম না।

মুগ্ধা। তামাশা নয় প্রিয়তম, আমি যে হলিউডের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছি।

রজত। তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে।

মুগ্ধা। (গদগদ ভাবে) আমরা Dolores Del Rio, Gory Cooper, Jean Harlow, Clork Gable কে ককটেল পার্টি দেব।

রজত। নিশ্চয় দেব।

মুগ্ধা। (বিগলিত ভাবে) তুমি আমাকে খুব ভালবাস প্রিয়?

রজত। খুব, খুব (মুগ্ধাকে হঠাৎ বুকে জড়িয়ে ধরে) খুব খুব!

মুগ্ধা। (রুজরঞ্জিত ঠোঁট দুটি উঁচু করে) প্রিয়তম—

(রজত জবাব দিল না—মুগ্ধার ঠোঁটে বার-বার চুমো খেতে লাগল)

পটক্ষেপণ

(রজতের ড্রয়িং রুম, আলোয় উজ্জ্বল, কাল সন্ধ্যা। প্রবেশ করলে রেখা, আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে বসল পিয়ানোর সামনে, তার পরে বাজাতে লাগল একটা আধা-বিদেশী আধা-দেশী সুর। একটু পরে প্রবেশ করলো সুবর্ণ, হাতে তার একখানা তৈল-চিত্র; দাঁড়িয়ে সে বাজনা শুনতে লাগল, বাজনা শেষ করে রেখা উঠে ঘুরে দাঁড়াল)

সুবর্ণ। তুমি যে স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছ রেখা।

রেখা। সত্যি নাকি?

সুবর্ণ। রূপ রং শব্দ গন্ধের কি অপূর্ব্ব সম্মিলন, আর তার মাঝখানে তুমি দেবীর মত দাঁড়িয়ে আছ।

রেখা। (ছবির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে) আমিও কল্পনা নাকি?

সুবর্ণ। 'অর্দ্ধেক কল্পনা তুমি অর্দ্ধেক মানবী'।

রেখা। তবু ভাল, সবটা না হলেও আমি অর্দ্ধেক মানবী।

সুবর্ণ। অনেক সময় তুমি রক্তমাংসের তৈরি কিনা সে

বিষয়ে সন্দেহ হয়, মনে হয় তুমি কেবল রেখা আর রং। (ছবিখানা তুলে ধরে) তোমার পোর্ট্রেট আজ নিয়ে এসেছি, দেখ কেমন হয়েছে।

রেখা। (এগিয়ে এসে ছবিখানা দেখে) তোমার মুখেই এর সমালোচনা শুনতে চাই।

সুবর্ণ। (ছবির দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকিয়ে) কি সুন্দর তোমার কোলের উপর হাত রেখে বসার ভঙ্গিটি যেন ইঙ্গ্রেসের পরিকল্পনা, কি আশ্চর্য্য তোমার ঠোঁটের কোণে ঐ আলগা একটু হাসি যাতে মনের রহস্য প্রকাশ পায় আবার পায় না, যেন মোনা লিসার হাসি। টেক্‌নিকের কথা যদি ধরো —তাহলে বলব Unique, Velasquez, Rubens Whistler Delacroix, Degas, Cezanne. Van Gogh-এর সংমিশ্রণ। তুমি জান আর্টিষ্ট কমল ব্যানার্জী চার বছর ইটালীতে ছিলেন, দু'বছর প্যারিসে ছিলেন, ওদেশের অনেক বড়লোকের ছবি উনি এঁকেছেন।

রেখা। তোমার মত শিল্পের সমঝদার যে কথা বলবে সে কথা স্বীকার করে নিতেই হবে।

সুবর্ণ। (ছবিখানা একপাশে সরিয়ে রেখে) আমি তো মূর্খ কম নয়, আসলকে উপেক্ষা করে নকলের প্রশংসা করছি। রেখা, তোমার আসল রূপটি লুকোচুরি খেলে বেড়ায়, তাকে শিল্পীও ধরতে পারবে না।

রেখা। ধরা পড়লেই যে জিনিষের দাম কমে যায়।

সুবর্ণ। না, তা নয়, ধরা দিলেও তুমি ধরা পড়বে না।

রেখা। আমি কি সত্যিই অত অস্পষ্ট!

সুবর্ণ। মানুষ যেমন ভাবে ভোগের বস্তুটিকে আপনার আয়ত্তে রাখবার জন্তে মুঠোর মধ্যে তাকে শক্ত করে চেপে ধরতে চায়, তেমন ভাবে চেপে ধরতে গেলে হয় তুমি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে না হয় আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

রেখা। একটা কথা বলতে পার, মুঠোর মধ্যে ধরতে না পারলে পুরুষ সন্তুষ্ট হয় না কেন?

সুবর্ণ। ওটা পুরুষের ধর্ম্ম! আমারও ঐ ধর্ম্ম, আমার একটা স্থূল হাত আছে সেটা অনেক সময় তোমার দিকে এগিয়ে যায়।

রেখা। (ভয়ের ভান করে) বল কি, তুমিও কি সাধারণ মানুষের মত সাধারণ কাজ করতে পার?

সুবর্ণ। সত্যি কথা যদি শুনতে চাও তাহলে বলব আমিও সাধারণ মানুষের মত একটা সাধারণ কাজ করতে চাই, তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

রেখা। বিয়ে! পুরুষের ঐ এক কথা—বিয়ে! কিন্তু তোমার মুখে ও কথা শুনলে আমার কষ্ট হয় বন্ধু!

সুবর্ণ। বিয়ে করব, ঘর সংসার করব, এর উপরে পুরুষের কল্পনা যায় না।

রেখা। ঘর সংসার! সংসার করে সাধারণ মানুষ। তুমি প্রেমকে করতে চাও বন্দী? তুমি সৌন্দর্য্যের উপাসক, তুমি ত জান প্রেম কি জিনিষ?

সুবর্ণ। প্রেম কি তা কিছু-কিছু জানি বৈ কি কারণ তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু তুমি কি একটুও আমাকে ভালবাস? যে ভালবাসে সে বন্দী হতে আপত্তি করে না।

রেখা। তুমি আমাকে ভুল বুঝ না বন্ধু, তোমাকে আমি ভালবাসি।

সুবর্ণ। তোমাকে কখনও বুঝি, কখনও বুঝি না, তুমি সবার মত নও।

রেখা। সবাই কি ভালবাসতে জানে বন্ধু? ছেলেবেলার সেই খেলাঘরের সহজ ভালবাসা সবাই বাসতে পারে, কিন্তু যৌবনের পরিণত ভালবাসার সন্ধান ক'জন পায়?

(এমন সময় টেলিফোন বেল বেজে উঠল, সুবর্ণ ফোন তুলে নিলে)

সুবর্ণ। হ্যালো, হ্যাঁ, আমি। খুঁজছ! বল, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আসছি। (ফোন রেখে দিয়ে) বৈজয়ন্ত ব্যাঙ্ক থেকে আমাকে ডাকছে।

রেখা। কেমন সময়টি বুঝে ডাক।

সুবর্ণ। ওরা আমাকে বাড়ীতে ডেকে সাড়া পায় নি, এখানে তাই খবর নিচ্ছিল খুব দরকারী কি কথা আছে।

রেখা। ব্যাঙ্কের লোকগুলোকে আজ ফাইন করে দিও।

সুবর্ণ। ফিরে এসে তোমাকে পাব?

রেখা। কেমন করে বলব?

সুবর্ণ। (হেসে) তুমি রেখা কিন্তু সরল নও। (প্রস্থান)

(রেখারও প্রস্থান—একটু পরে রেখা ফিরে এল পোশাক কিছু বদল করে)

রেখা। (বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে) ঠোঁটের লালটা কি কিছু বেশী হয়ে গেছে? তা হোক, কনক এই চায়।

(সবেগে কনকের প্রবেশ)

কনক। একা, রেখাদেবী আজ একা! আজ যে মৌচাক শূন্য!

রেখা। মৌমাছিরা বোধ হয় অন্যত্র মধুর সন্ধান পেয়েছে।

কনক। (নিজের বুকে হাত রেখে) একটি মৌমাছি চাকে এসে পৌঁছেচে, কেউ একে ধরে রাখতে পারল না।

রেখা। উর্ম্মিলাও ধরে রাখতে পারল না?

কনক। না পারল না, কিন্তু অনুমান তোমার ঠিক, আমি ছিলাম উর্ম্মিলার সঙ্গেই।

রেখা। তাকে ছেড়ে আসতে পারলে?

কনক। তাকে ছেড়ে আসতে পারি কিন্তু পুলিসের হাতে পড়লে আজ আর আসতে পারতাম না। কল্পনা কর, কলকাতার রাস্তা দিয়ে রাত আটটায় সময় ঘণ্টায় তিরিশ মাইল!

রেখা। কল্পনার চোখে দেখলুম রাস্তার মাঝখানে একটা রক্তাক্ত পদার্থ পড়ে আছে, লোক জমেছে অনেক, তোমাকে গাড়ী থেকে তারা টেনে বার করেছে—তারপরে কলকাতার জনতা যেমন অতি নিপুণভাবে মর্ম্মস্পর্শী শিক্ষা দেয় তেমনি ভাবে তোমাকে—না—তোমার পরিপাটি পোশাক দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপার ততদূর গড়ায় নি।

কনক। (সশব্দে হেসে) তোমার ঐ রোমাঞ্চকর কল্পনা

আর বাস্তবের মাঝখানে ফাঁক ছিল এক ইঞ্চির একটা ভগ্নাংশ মাত্র। লোকটার হাড় ভাঙল না কিন্তু আমার গাড়ীর মাড-গার্ড ভাঙল।

রেখা। (কনকের সামনে দাঁড়িয়ে তার রঙিন টাইটা পেড়ে) কি দুরন্ত তুমি!

কনক। তুমি কি আমাকে শান্ত শিশুটি হতে বল রেখা? আমি তা পারব না।

রেখা। আমি তোমাকে শান্ত হতে বলি নি, তুমি দুরন্ত বলেই এত ভাল লাগে তোমাকে।

কনক। শুধু ভাল লাগে, তার বেশী নয়?

রেখা। পুরুষ হৃদয় বোঝে না, কেবল মুখের কথায় তার বিশ্বাস।

কনক। বুঝি, হৃদয় বুঝি (হঠাৎ রেখাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে চুমো খাবার চেষ্টা)

রেখা। (কনককে বাধা দিয়ে তার হাতের বেষ্টন থেকে বেরিয়ে এসে) সারা বিকেল মদ খেয়েছ বুঝি?

কনক। কয়েক ফোঁটা খেয়েছি মাত্র। জীবনটাকে আমি পেঁচার মত মুখ করে বসে কাটিয়ে দিতে চাই নে, আমি চাই ছুটতে, ফুর্তি করতে, প্রাণ খুলে হাসতে।

রেখা। আবার কখনো কখনো কাঁদতে।

কনক। লিভারের সেই ব্যথাটা? সেটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব, দেখো।

রেখা। আমারও ইচ্ছে হয় ঠিক অমনি করে ছুটতে, প্রাণ খুলে হাসতে।

কনক। (রেখার হাত ধরে) সত্যি? তাহলে এস দুজনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

রেখা। তেতলার ছাদ থেকে রাস্তায়?

কনক। আরে না, না,—এস আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি আনন্দের স্রোতে।

রেখা। তার পরে ভেসে ভেসে কোথায় গিয়ে উঠব?

কনক। উঠব না তলিয়ে যাব।

রেখা। (আদর করে) 'তুমি বেদুইন, তুমি ঝঞ্ঝা'।

কনক। ঝঞ্ঝায় তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

রেখা। একেবারে ঝরাপাতার মত উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে? দিগ্‌বিদিকের ঠিকানা থাকবে না, পারবে উড়িয়ে নিয়ে যেতে?

কনক। এস আমার সঙ্গে, পারি কিনা দেখতে পাবে।

রেখা। পারবে? কলকাতা থেকে কারাচি, কারাচি থেকে কেপটাউন। কেপটাউন থেকে কিউবা পারবে?

কনক। এক্ষুনি এস, দরজায় আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে।

রেখা। কারাচি?

কনক। না কিরণো

রেখা। এখনও তৃষ্ণা মেটেনি বুঝি?

কনক। তৃষ্ণা কি মেটবার! (হাত ধরে টেনে) এস।

রেখা। না অত কাছে যেতে প্রস্তুত নই।

[রজতের প্রবেশ, কেমন একটা শঙ্কিত ভাব]

রেখা। দাদা, মুন্নার পার্টি থেকে এত শিগগির ফিরে এলে?

কনক। হ্যালো রজত, শরীর ভাল ত? ইউ লুক ইল।

রজত। না বিশেষ কিছু নয় (রেখাকে) একটা কথা আছে, তুমি কি বাইরে যাচ্ছ?

রেখা। না, বাইরে যাচ্ছি নে।

কনক। আমি চললুম, আমার অনেক কাজ বাকি আছে, রাস্তাতে এখনও লোক আছে এবং আমার গাড়ীতে এখনও পেট্রল আছে [প্রস্থান]

রেখা। তোমার সেই পুরনো মাথাধরা বুঝি?

রজত। (বসে পড়ে) পুরনো নয় নতুন—হঠাৎ।

রেখা। (পাশে বসে) কি হয়েছে—খুব খারাপ?

রজত। খুব খারাপ।

রেখা। কোথায়? বুকে?

রজত। না, ৯৯ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

রেখা কি হয়েছে?

রজত। বৈজয়ন্ত ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে।

(রজত তাকাল রেখার দিকে, রেখা তাকাল রজতের দিকে, তারপরে দুজনেই তাকাল নীচের দিকে।

পটক্ষেপণ

[কাল প্রভাত, রজতের ড্রয়িং রুম তেমনই সুসজ্জিত, বসে রজত, চিন্তামগ্ন এমন সময় সুবর্ণের প্রবেশ]

রজত। এস সুবর্ণ, ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার মত হয়েছে।

সুবর্ণ। (পাশে বসে) আমারও সেই অবস্থা।

রজত। কেমন করে হ'ল?

সুবর্ণ। চুরি, ডাইনে বাঁয়ে, উপরে নীচে চুরি।

রজত। আমাদের অবস্থা?

সুবর্ণ। অত্যন্ত অসহায়। ডিরেক্টর দত্ত গতরাত্রে আত্মহত্যা করেছে।

রজত। আমরা কি করব?

সুবর্ণ। আত্মহত্যা করব না।

রজত। কোন বিষয়ের উপরেই আমাদের আর দাবি থাকছে না, বাড়ীটার উপরেও নয়?

সুবর্ণ। না।

রজত। আমরা তাহলে গরিব।

সুবর্ণ। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রজত। তুমি কি করবে?

সুবর্ণ। I am going underground. (আমি ত ডুবতে বসেছি।)

রজত। (একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) কেমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা আসছে।

সুবর্ণ। আসবেই।

রজত। ভারি অদ্ভুত, এই যেমন কি খাব ইত্যাদি।

সুবর্ণ। অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ জিনিষগুলো হঠাৎ কেমন যেন ড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

রজত। এ বাড়ী থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে যেতে বে—তারপরে?

সুবর্ণ। তারপরে একটা চাকরি জোগাড় করে নাও।

রজত। পারব চাকরি করতে? ভয়ানক লজ্জা করবে।

সুবর্ণ। গরিবের দলে ভিড়ে গেলে আর লজ্জা করবে না। এ ক'দিন mass (সাধারণ লোকের)-এর সঙ্গে মিশে আমি অনেক জ্ঞান লাভ করেছি।

রজত। সত্যি নাকি।

সুবর্ণ। ব্যাঙ্কের একটা বাচ্চা কেরানী আমাকে দরদ দেখাতে এসে কি বললে জান?

রজত। কি বললে?

সুবর্ণ। বললে 'দুঃখ করবেন না সুবর্ণবাবু, আপনার বাবা কৈলাস-ব্যাঙ্ক মেরে বড়লোক হয়েছিলেন, আজ আবার সত্য-প্রকাশবাবু আপনার ব্যাঙ্ক মেরে বড়লোক হলেন।' বুঝলে রজত, গরিবদের দৃষ্টিভঙ্গিই অন্য রকম, ওরা চুরি ব্যাপারটা লজ্জার মনে করে, খেটে খেতে লজ্জা পায় না।

রজত। অদ্ভুত।

সুবর্ণ। আমি তাহলে উঠব। (উঠে দাঁড়াল)

রজত। রেখার সঙ্গে দেখা করবে না?

সুবর্ণ। আরে না, না, এই কি দেখা করবার সময়; আমি চললুম, কিছুদিন আমার কোন খবরই পাবে না। (প্রস্থান)

(রজত উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল, রাস্তায় মটর হর্ণের আওয়াজ পাওয়া গেল, তার একটু পরেই প্রবেশ করলে মুগ্ধা)

মুগ্ধা। তাহলে তুমি বাড়ীতেই আছ অথচ ফোন করে তোমার সাড়া পাচ্ছি না, আমি ত ভাবলাম তুমি বুঝি আমাকে ভুলেই গেলে।

(রজত মুগ্ধার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল)

মুগ্ধা। (রজতের সামনে এগিয়ে গিয়ে) আমার প্রিয়ের আজ এ কোন্ নতুন খেলা?

রজত। খেলা নয় মুগ্ধা, আর খেলা নয়।

মুগ্ধা। (মিষ্টি করে হেসে) আর খেলাঘর নয়—এবার সত্যিকার ঘর।

রজত। ঘরও নয়, হয়ত কুটীর।

মুগ্ধা। তাতে আমি আপত্তি করব না। প্রাসাদের নাম কুটীর দিলে মৌলিক হবে। কিন্তু প্রিয়, বল ত আজ তোমার মনটি কোথায়?

রজত। আমার মন যথাস্থানেই আছে।

মুগ্ধা। (রজতের বুকের উপর হাত রেখে) আছে? কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না কেন? সে কি ঘুমিয়ে, না জেগে, না সে দূরে আর কোথাও আর কারো কাছে?

রজত। (বিব্রত ভাবে) মন আমার যথাস্থানেই আছে, কিন্তু মুগ্ধা, আর একটা জিনিষ যথাস্থানে নাই।

মুগ্ধা। I don't care, (আমি কিছু কেয়ার করি না), তোমার মন যদি ঠিক থাকে তাহলে চন্দ্র সূর্য্য স্থানচ্যুত হলেও আমি বিচলিত হব না।

রজত। (আবেগের সঙ্গে) তুমি বিচলিত হবে না মুগ্ধা!

মুগ্ধা। না, প্রিয় না। বলো তোমার কি বলবার আছে।

রজত। একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মুগ্ধা। বুঝেছি, আমার দেওয়া Ticpinটা আবার হারিয়ে ফেলেছ; তা যাক, আমি অভয় দিচ্ছি আমি রাগ করব না।

রজত। এ যে তার চেয়েও বেশী, আমি তোমাকে কেমন করে বলি!

মুগ্ধা। বলো, শুনলে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ব না।

রজত। মুগ্ধা, আমাদের বৈজয়ন্ত ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে।

মুগ্ধা। (দু তিন পা পিছিয়ে গিয়ে, তার পরে আবার হেসে এগিয়ে এসে) উঃ, কি নিষ্ঠুর তামাশা, সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

রজত। (মুগ্ধার কাঁধে হাত রেখে) তামাশা নয় মুগ্ধা, এ সত্য কঠিন সত্য; বৈজয়ন্ত ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে, আমার সম্পদ, আমার বাড়ী, আমার নাম, আমার বলতে যা কিছু আজ তা আর আমার নেই। আমি আজ গরিব।

(মুগ্ধা এক মিনিট রজতের কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সরে দাঁড়াল, তার পরে একখানা শোফায় ঝুপ করে বসে পড়ল, রজত এগিয়ে এল তার দিকে)

রজত। মুগ্ধা।

(মুগ্ধা সাড়া দিলে না)

রজত। প্রিয়া।

মুগ্ধা। তুমি গরিব?

রজত। আমি গরিব তবু আমি তোমাকে ভালবাসি।

মুগ্ধা। তুমি গরিব? এত সম্পদ, এত নাম আজ তোমার কিছুই নেই?

রজত। কিছুই নেই কিন্তু আমার হৃদয় আছে।

মুগ্ধা। (মুখে রুমাল চাপা দিয়ে) ওঃ! আমার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল, আমার স্বপ্ন মিলিয়ে গেল।

রজত। যাক স্বপ্ন, তুমি আমি তো বেঁচে আছি।

মুগ্ধা। আমার প্রাসাদ ভেঙে পড়ল।

রজত। কিন্তু প্রিয়া, আমাদের ভালবাসা অটুট আছে।

মুগ্ধা। হলিউড, হলিউড। সে যে হঠাৎ দূরে, বহুদূরে সরে গেল।

রজত। আমি তো কাছেই আছি মুগ্ধা!

মুগ্ধা। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) না, না, এ আমি বিশ্বাস করি না, একটুও বিশ্বাস করি না!

রজত। এক এক সময় যেন আমারও অবিশ্বাস হয়।

মুগ্ধা। তুমি মিছে কথা বলছ।

রজত। আমি? না, মিছে কথা বলি নি।

মুগ্ধা। (হাইহিলের খট্ খট্ আওয়াজ করে রজতের সামনে গিয়ে) তুমি মিছে কথা বলছ, তোমার চালাকি আমি ধরে ফেলেছি, তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না।

রজত। কি বলছ তুমি মুক্তা ?

মুক্তা। (পিছন ফিরে খট্ খট্ করে কয়েক পা চলে গিয়ে একটা পাক দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে) তোমার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি।

রজত। আমার কোন মতলব নেই।

মুক্তা। তুমি চাও আমাকে সরিয়ে দিতে।

রজত। এ কথা তুমি কেমন করে বললে ?

মুক্তা। হয় তো ব্যাঙ্ক তোমার ফেল হয়েছে—কিন্তু তুমি কি আগে এ খবর জানতে না ? নিশ্চয় জানতে, তুমি আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলে, ব্যাঙ্ক গেলেও যে টাকা যায় না তা আমি জানি।

রজত। সত্যিই মুক্তা, আজ আমার নিজের বলতে কিছু নেই, আমি সত্যিই গরিব।

মুক্তা। (গোটা দুই ঘুরপাক খেয়ে রজতের সামনে এসে) আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না, There is some other girl, তুমি আমাকে চাও না, তুমি আমাকে ভালবাস না।

শীলা। (এমন সময় শীলার প্রবেশ, দরজার সামনে একটু থমকে দাঁড়িয়ে) ব্যাপার কি মুক্তা-দি ? ওঃ! আজ বুঝি তোমার জন্মদিন, রজতদাকে Hula Dance দেখাচ্ছ !

(মুক্তা একবার শীলার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাইহিলের খট্ খট্ আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে গেল)

শীলা। (লজ্জিতভাবে) মুক্তাদি হঠাৎ অমন করে চলে গেলেন কেন রজতদা ?

রজত। (বিব্রতভাবে) জানই তো ও কেমন ছেলেমানুষ, তাছাড়া ওর মনটাও ভাল নেই।

শীলা। মনে হ'লো রাগ করে গেলেন, কিন্তু যাবার ভঙ্গিটি কি সুন্দর, ঠিক যেন Jean Harlow বেরিয়ে গেল।

(রেখার প্রবেশ, বেশের পরিপাট্য নাই, মুখে চিন্তার স্পষ্ট ছাপ, অন্যদিক দিয়ে রজতের প্রস্থান)

শীলা। রেখাদি, তোমার কি অসুখ করেছে ভাই ?

রেখা। (ক্লান্তভাবে বসে পড়ে) পৃথিবীতে ন্যায় বলে কিছু নেই, সত্য বলে কিছু নেই, নির্ভর করবার মত কিছু নেই, বুঝলে শীলা।

শীলা। ও সব চিন্তা অন্য লোকের, তোমার জন্যে নয় রেখাদি, তুমি শিল্পীই থাক, তাত্ত্বিক হয়ে উঠো না।

রেখা। একদল মানুষ আছে যাদের কিছু মাত্র বিশ্বাস ক'রো না শীলা, যারা হিংস্র পশুর মত তোমার দেহের সবটুকু রক্ত শোষণ করে নেবে, যারা সব সময় ওত পেতে বসে আছে, যেই একটু অসতর্ক হয়েছ অমনি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে।

শীলা। (অবাক হয়ে) তোমার মনের আর একটা নতুন দিক যেন দেখতে পাচ্ছি রেখাদি।

রেখা। শীলা, নিঃস্ব জনসমাজ কেমন করে নীরবে এ অত্যাচার সহ্য করে আমি তাই ভাবি, এরা বিদ্রোহ করে না ?

শীলা। চোখ বুঁজে শুনলে মনে হবে যেন কোন শ্রমিক নেতার বক্তৃতা শুনছি ; রেখাদি, আমি জানতাম না নিঃস্বদের জন্যে তোমার এত দরদ, তোমাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

রেখা। উঃ, মানুষ এত অসহায় !

শীলা। (চমকে উঠে) রেখাদি !

রেখা। কি শীলা ?

শীলা। এ যে সোশ্যালিজমের চেয়েও আশ্চর্য্য !

রেখা। আমার মতবাদ ?

শীলা। না রেখাদি, তোমার ঐ নীল রঙের শাড়ী। তুমি যে বলো সকাল বেলা পূরবী রাগিণী যেমন অচল, তেমনি সকাল বেলায় নীল রঙের শাড়িও অচল।

রেখা। এটা সকাল কি বিকেল তাও কি আমার খেয়াল আছে !

শীলা। তোমার আত্মা পীড়িত হচ্ছে না ?

রেখা। আত্মার অবস্থান কোথায় ?

শীলা। (হেসে) আত্মার অবস্থান ব্যাঙ্কে।

রেখা। (সোফায় এলিয়ে পড়ে) আমার কাছে ব্যাঙ্কের নাম করো না শীলা।

শীলা। কিন্তু রেখাদি, হঠাৎ যদি সুবর্ণবাবু বা কনকবাবু এসে পড়েন ?

রেখা। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ওদের একজনকেও দেখতে পাই নি, ওদের অস্তিত্বে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

শীলা। তবু তো তুমি ওদের দুজনকেই ভালবাস।

রেখা। সম্প্রতি ওদের দুজনের স্থান আর একজন এসে দখল করেছে, আমি তারই চিন্তায় বিভোর আছি।

শীলা। ওয়াণ্ডারফুল ! কে সে ভাগ্যবান রেখাদি ?

রেখা। (নিমীলিত নয়নে, অত্যন্ত দরদের সঙ্গে) সে হচ্ছে 'অন্ন'।

শীলা। (অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে) কিন্তু তোমার সেই সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ?

রেখা কোন উত্তর দিল না, তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মোনা লিসার হাসি।

[যবনিকা পতন]

শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্য্যজাতির ভারত আক্রমণ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১

স্বদেশী ও বিদেশীয় পণ্ডিতগণের এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই যে শ্বেতকায় আর্য্যজাতি একদা ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপিত করেন এবং ভারতবর্ষে আর্য্য-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার তাহার ফল। দেশ জয় ও উপনিবেশ স্থাপিত করিবার পরিচিত পন্থা তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। সিন্ধু উপত্যকা তখন কৃষ্ণকায়, বর্ব্বর প্রাক্-দ্রাবিড়ীয় বা দ্রাবিড়েতর আদিম জাতিসমূহের অধিকারে।

"The Aryans really found themselves confronted by the Veddaic people, the Dravidians remaining rather in the second line."—V. Giuffrida-Ruggeri.

ইহারাই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী, ঋগ্বেদের দাস ও দস্যু এবং পরবর্ত্তী বৈদিক সমাজে নিষাদ নামে পরিচিত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রেতর পঞ্চমশ্রেণী বা জাতি।

"The Dasyus or Non-Aryans of Vedic India are the true aborigines; they are the fifth order of Vedic Society."—V. Giuffrida-Ruggeri.

এই সকল কৃষ্ণকায়, বর্ব্বর দস্যু বা নিষাদদিগকে পরাজিত করিয়া শ্বেতকায় আর্য্যজাতি পঞ্জাবে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এজন্য দস্যু ও দাসদিগের সঙ্গে আর্য্যদিগকে কিরূপ কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে শ্বেতকায় আর্য্যজাতি যে আক্রমণকারীরূপে (aggressor) ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ যে ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের সুদীর্ঘ তালিকায় প্রথম উল্লেখযোগ্য আক্রমণ এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মনে কোন সন্দেহ নাই। আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারটিকে বৈদেশিক আক্রমণের সুস্পষ্ট রূপ দিবার প্রেরণা আসিয়াছে বিদেশী বৈদিক পণ্ডিতগণের নিকট হইতে। শাকল্য, শৌনক পরবর্ত্তী কালের সায়ন প্রমুখ ভারতীয় বেদ ব্যাখ্যাতাগণের মনে এ সমস্যার অস্তিত্ব ছিল না এবং সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে ইহার কোনরূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

আর্য্যগণের ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন যে বৈদেশিক আক্রমণের (foreign invasion) পর্য্যায়ে ফেলা হয় তাহার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হইয়া থাকে। একটি প্রমাণ এই যে আর্য্য-সভ্যতা ভারতবর্ষের উত্তর হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে প্রসারিত হইয়াছে। প্রথমে উত্তরে ব্রহ্মাবর্ত্ত; তারপর মধ্যভাগে আর্য্যাবর্ত্ত এবং ইহার বাহির দেশের অবশিষ্ট অংশ ম্লেচ্ছ বা অনার্য্য-অধ্যুষিত দেশ। আর্য্য-সভ্যতা বাহির হইতে না আসিলে প্রাচীনগণ এইভাবে উহার অগ্রগতি নির্দ্দেশ করিতেন না। দ্বিতীয় প্রমাণ—ঋগ্বেদে যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখের ছড়াছড়ি। তৃতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ এই যে, ভারতবর্ষ শ্বেতকায় আর্য্যজাতির স্বদেশ হইতে পারে না। শ্বেতকায় বৈদিক আর্য্যগণ মূল আর্য্যজাতির একটি শাখা মাত্র। মূল আর্য্যজাতির উদ্ভব হয়ত এশিয়া খণ্ডে হইয়াছে* কিন্তু আর্য্যজাতির মূল ও প্রধান শাখা ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) জাতিসমূহ, ইরাণ ও ভারতে ইহার একটি অপ্রধান শাখামাত্র প্রসারিত হইয়াছিল। ইরাণ ও ভারতের এই শাখাটির সঙ্গে ইউরোপীয় প্রধান শাখাটির সংযোগ আবিষ্কৃত হইয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, প্রধানতঃ জার্ম্মান পণ্ডিতগণের ভাষাতত্ত্ব লইয়া গবেষণার ফলে। তারপর ভাষাতত্ত্ববিদেরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন নৃতত্ত্ববিদের ব্যাখ্যা। ভাষার দিক দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমের আর্য্যদলের মধ্যে Satem ভাষাভাষী ও Centum ভাষাভাষী এইরূপ বিভাগ হইয়াছে; কিন্তু নৃতত্ত্ববিদগণ এখনও একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা হউক, শ্বেতকায় আর্য্যজাতির উদ্ভব যখন দক্ষিণ-পশ্চিম সাইবেরিয়ায় হইয়াছিল তখন তাঁহাদের দ্বারা ভারতে উপনিবেশ স্থাপন যে বৈদেশিক আক্রমণ তাহা মানিতে হয়। কিন্তু আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ হইয়াছিল ইহা মানিয়া লইতে হইলে ইহা অপেক্ষা যুক্তিসহ প্রমাণ আবশ্যক। বৈদিক আর্য্যগণের সঙ্গে যুক্ত করা যায় এরূপ কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত দাবি করা হয় নাই। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে যাঁহারা এই মতবাদের সমর্থক তাঁহারা ঋগ্বেদকে ইহার প্রামাণ্য দলিল বলিয়া মনে করেন, কারণ ইহাই আর্য্যজাতির এবং ভারতীয় আর্য্যজাতির প্রথম প্রামাণ্য বিবরণ।

কখন ভারতে এই শ্বেতকায় আর্য্যজাতির আক্রমণ হইয়াছিল সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। ঋগ্বেদের রচনাকাল ও বৈদিক যুগের আরম্ভ-কাল সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত আছে। মরগ্যানের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৬০০ বৎসর, মায়ার্সের মত ঐরূপ,—কেনেডীর মতও ঐরূপ। বৈদিক যুগের আর্য্যগণের ভারত আক্রমণের কাল মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০০—২০০০ ধরা হয়। এ বিষয়ে যে সকল বিভিন্ন মত আছে তাহার মূল্য যাচাই করা অবান্তর ও অনাবশ্যক। এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০ বৎসর কাল ইন্দো-ইউরোপীয় ও ইন্দো-এরিয়ান (Indo-European and Indo-Aryan) গোষ্ঠিভুক্ত কতকগুলি জাতির ইউরোপের ও এশিয়ার নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িবার খানিকটা প্রমাণ বিভিন্ন দেশের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে পাওয়া যায়। এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্রাচীন ইরাক বা মেসোপটেমিয়ার কতকগুলি জাতি, যাহাদের মধ্যে আর্য্যভাষাভাষী একদল লোক ছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অভ্যুদয় এই সময়ের মধ্যে ঘটিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কাশাইত, হিত্তাইত, মিতান্নী প্রভৃতির উল্লেখ

* The northern Kirghiz steppes, south and east of the Ural mountains—A. B. Keith

করা যায়। গ্রীসে আকিয়ান জাতির, মিশরে হিকসসদিগের আক্রমণ এই সময়ের বলিয়া মনে করা হয়। মোট কথা এই সময়টায় পশ্চিম এশিয়ার এক বৃহৎ অংশে, ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী ও ইজিয়ান সাগরের দ্বীপ ও তীরবর্ত্তী অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটা বিপুল চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়, পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন। ইহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতে শ্বেতকায় আর্য্যজাতির আগমনের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। জ্যাকোবি বা তিলকের মত ঋগ্বেদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে যাঁহারা ঋগ্বেদের কাল নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা ঋগ্বেদকে আরও প্রাচীন বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

ভারতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা যে আর্য্য ছিলেন তাহার প্রমাণ,—ঋগ্বেদে আর্য্য শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইরাণে আর্য্য জাতির উপস্থিতি সম্বন্ধে আবেস্তাকে ঐ কারণে প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা হয়।

ইউরোপের আর্য্যসন্তানগণ যে তাঁহারা আর্য্য তাহা জানিবার ৪০০০ হইতে ৪৫০০ বৎসর পুর্ব্বে (যদি ঋগ্বেদের সময় খ্রীঃ পূঃ ২০০০-২৫০০ ধরা যায়) বর্ত্তমানে কৃষ্ণকায় জাতি সমূহ অধ্যুষিত ভারতবর্ষে রচিত (Hille-brandt প্রমুখ পণ্ডিতগণের অভিমত সত্ত্বেও এ বিষয়ে এখন বিশেষ মতদ্বৈধ নাই) ঋগ্বেদের সূক্তকারগণ আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আর্য্য জাতির এই প্রাচীন প্রামাণ্য দলিল ভারতবর্ষীয়দের সম্পত্তি হওয়াতে ইউরোপীয় (রাজনৈতিক) আর্য্যগণের কিছু অসুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অসুবিধা অর্থাৎ দক্ষিণ-পুর্ব্ব এশিয়া খণ্ডের এক কৃষ্ণকায় জাতিকে আর্য্য বলিয়া এবং নিজেদের একগোত্রীয় বলিয়া স্বীকার করিবার গ্লানি দূর করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি হয় নাই তাহা মানিতে হইবে। জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণ খাঁটি আর্য্যজাতির উদ্ভবক্ষেত্র ক্রমশঃ সরাইয়া উত্তর ইউরোপে লইয়া গিয়াছেন। এই ইউরোপীয় আর্য্যজাতি হইতে সেরা আর্য্য নর্ডিক-(Nordic)গণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই নর্ডিকগণ আবার টিউটনিক গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। নর্ডিকগণের পূর্ব্বপুরুষ হিসাবে একটি প্রোটো নর্ডিক জাতি কল্পিত হইয়াছে, ইঁহাদের উদ্ভবক্ষেত্র এশিয়ায় বটে। বৈদিক আর্য্যগণ এই প্রোটো-নর্ডিক জাতির অন্তর্ভুক্ত। রুশিয়ায় একটি নূতন মতবাদ প্রচার হইয়াছে যে আর্য্য নামে একটি ক্ষুদ্র জাতি ককেশস পর্ব্বতের দক্ষিণে বাস করিত। তাহাদের নামের 'আর' হইতে আরমেনিয়া, আরারাত পর্ব্বত ইত্যাদির 'আর' আসিয়াছে। ইহারা জাকেতিক ভাষাভাষী ছিল, ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এদিকে কিন্তু নৃতত্ত্ববিদগণ দক্ষিণ রুশিয়ায় (সাইবেরিয়ায়) উত্তর যেনিসী নদীর তীরবর্ত্তী কতকগুলি অঞ্চলের সমাধিস্তূপ (Kurgan) হইতে বৈদিক আর্য্যগণের করোটির সদৃশ করোটি এবং এই সকল সাইবেরিয়ান আর্য্য যে বৈদিক আর্য্য রাজাদের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন তাহার প্রমাণও আবিষ্কার করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত আর একটি মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এদেশেও উহার সমর্থক দেখা দিয়াছে। এই মতবাদ এইরূপ যে ঋগ্বেদীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে দ্রাবিড়ীয়, ঋগ্বেদীয় সভ্যতা কোনরূপ বৈদেশিক আক্রমণের ফল নহে।*

সে যাহাই হউক ঋগ্বেদকে আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রাচীন প্রামাণ্য দলিল বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে উহা হইতে শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্য্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অনার্য্য, কৃষ্ণকায় বর্ব্বর আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন, এই যে মতবাদ, যাহা মোটামুটি প্রচলিত মতবাদ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার পরিপোষক কতখানি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা পরীক্ষা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২

উন্নত, সভ্যতাগর্ব্বী বৈদেশিক কর্ত্তৃক পররাজ্য আক্রমণ ও অধিকার ও বিজিত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পদ্ধতি কিরূপ হইতে পারে আধুনিক ইতিহাসে তাহার অনেক পরিচয় মিলে। সুতরাং শ্বেতকায়, বৈদেশিক আর্য্যজাতি যখন কৃষ্ণকায়, বর্ব্বর জাতিসমূহের আবাসভুমি ভারতবর্ষে বিজয়ী জাতি রূপে প্রবেশ করেন তাঁহাদের তখনকার অবস্থা ও মনোভাব সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। ধরিয়া লওয়া যায় যে, এই পররাজ্য আক্রমণকারী শ্বেতকায় আর্য্যজাতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য ছিল। অর্থাৎ কৃষ্ণকায়, বর্ব্বর শত্রুদিগের বিরুদ্ধে তাঁহারা united front রক্ষা করিয়া চলিতেন, পররাজ্যে নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা শক্তিক্ষয় করিতেন না। এরূপ করা তাঁহাদের স্বার্থের হানিকর হইত। জাতি হিসাবে তাঁহারা একটি অমিশ্র, শ্বেতকায় জাতি ছিলেন। দেশ জয় এবং আপনাদিগের উন্নত ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রচার করিবার আদর্শে তাঁহারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। যেখান হইতেই তাঁহারা আসুন 'মাতৃভুমি'র উল্লেখ, গৌরব বর্ণনা ও তাহার প্রতি অনুরক্তির প্রকাশ তাঁহাদের নিকট আশা করা যাইতে পারে। কৃষ্ণকায়দিগের দেশে আপনাদের জাতির বিশুদ্ধি রক্ষার দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদকে প্রচলিত ধারণা মতে আক্রমণকারী শ্বেতকায় আর্য্যজাতির প্রামাণ্য ইতিহাস বা আখ্যান বা বিবরণ বলিয়া মানিয়া লইলে যদি তাহাতে এই সকলের বিপরীত ভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে সন্দেহের উদয় হইতে পারে যে, হয়ত ঋগ্বেদ আর্য্যজাতির প্রামাণ্য বিবরণ নয় অথবা শ্বেতকায় আর্য্যজাতির ভারত আক্রমণের কাহিনী কল্পিত। এখন এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ঋগ্বেদের বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য ইহা ঋগ্বেদের বিস্তৃত বিশ্লেষণ নহে।

৩

ঋগ্বেদে উল্লিখিত সমাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—ঋষিকুল, গোষ্ঠি বা কৌমগুলি ও শত্রুপক্ষ। এই শত্রুপক্ষ কে, পরে তাহা দেখা যাইবে। প্রথমেই লক্ষ্য করিতে

* G. Slater—*The Dravidian Elements in Indian Culture.*

হইবে যে সূক্তগুলিতে উত্তম পুরুষের ব্যবহার দেখা যায়। ইহার অর্থ ঋগ্বেদে উল্লিখিত বিষয় বা ব্যাপারগুলি ঋষিকুলভুক্ত সূক্তকারগণের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য কতকগুলি সূক্তে কোন কোন দেবতাকে ও কোন কোন গোষ্ঠি-পতিকে সূক্তকাররূপে দেখা যায়, কতকগুলি সূক্তকারের নাম নাই। এইরূপ সূক্তের সংখ্যা সামান্য। সূক্তকারগণ ঋষিকুলভুক্ত ইহা লক্ষ্য করিতে বলিবার কারণ এই যে, ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা কুশিক, অঙ্গিরা, কণ্ব, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বামদেব, অত্রি, গৃৎসমদ প্রভৃতি ঋষিকুলের এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন ঋষির পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে ইহা মনে রাখিলে সূক্তগুলির বক্তব্য বিষয়ের সমগ্রভাবে বিচার করা সহজ হয়। ঋষিকুলের সহিত গোষ্ঠি বা কৌমগুলির সম্পর্ক কিরূপ পরে তাহার আলোচনা হইবে। ঋষিকুল যখন ঋগ্বেদীয় সূক্তসমূহের রচয়িতা তখন তাহাদিগকে আক্রমণকারী শ্বেতকায় আর্য্যজাতির প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ঋষিকুলের মধ্যে ঐক্যের বিশেষ অভাব দেখা যায়। কুলগুলির পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিবাদের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বশিষ্ঠ ও কুশিককুলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসিদ্ধ। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কুশিকগণ অন্যতম ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠি ভরতবংশীয়। বিশ্বামিত্র বলিতেছেন—

"হে ইন্দ্র, ভরতগণ বশিষ্ঠবংশীয়দিগের প্রতি কেবল শত্রুতাই জানে, একতা জানে না। যুদ্ধে তাহারা বশিষ্ঠ-বংশীয়গণের বিরুদ্ধে অশ্ব প্রেরণ করে, যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে করা হয়, তাহারা উহাদের বিরুদ্ধে ধনুক ধারণ করে।"* (ইম ইন্দ্র ভরতস্য পুত্রা অপপিত্বং চিকিতুর্ন প্রপিত্বং। হিন্বন্ত্যশ্বমরণং ন নিত্যং জ্যাবাজং পরি নয়ন্ত্যাজৌ॥) প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষিদিগকে গালিগালাজ করিবার ব্যাপারে ভরদ্বাজ-কুল সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। অতিযাজ নামক এক ঋষি কোন যজমানের যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া ভরদ্বাজ পুত্র ঋজিশ্বার ক্রোধের উদ্রেক করেন। ঋজিশ্বা বলি-তেছেন,—"আমি যে যজ্ঞ করি তাহার বা আমার প্রবর্ত্তিত যজ্ঞের সমান এবং স্বর্গীয় ও পার্থিব দেবগণের উপযুক্ত যজ্ঞ আর কেহ করিতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না। অতএব সুমহান পর্ব্বতসকল তাঁহার পীড়াবিধান করুক, অতিযাজের ঋত্বিকও নিরতিশয় হীনতা প্রাপ্ত হউক।—হে মরুৎগণ! যে ব্যক্তি আপনাকে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করে এবং অস্মৎকৃত স্তোত্রের নিন্দা করিতে ইচ্ছা করে শক্তিসকল তাহার অনিষ্টকারী হউক এবং স্বর্গ সেই স্তোত্রদ্বেষ্টাকে দগ্ধ করুক। হে সোম।—কি জন্য তোমাকে নিন্দা হইতে আমা-দিগের উদ্ধারকর্ত্তা বলে? কেনই আমরা শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইলে তুমি (নিরপেক্ষভাবে) দর্শন করিতেছ? তুমি স্তোত্র-বিদ্বেষীর প্রতি নিজ আয়ুধ নিক্ষেপ কর।"

(ন তদ্দিবা ন পৃথিব্যানু মন্যে ন যজ্ঞেন নোত শমীভিরাভিঃ। উজ্জন্তু তং সুভ্বঃ পর্বতাসো নি হীয়তামতিযাজস্য যষ্টা॥ অতি বা যো মরুতো মন্যতে নো ব্রহ্ম বা যঃ ক্রিয়মানং নিনিৎসাৎ। তপুষিঃ তস্মৈ বৃজিনানি সন্তু ব্রহ্মদ্বিষমভি তং শোচতু দ্যৌঃ। কিমঙ্গ ত্বা ব্রহ্মণঃ সোম গোপাং কিমঙ্গ ত্বাহুরভিশস্তিপাং নঃ। কিমঙ্গ নঃ পশ্যসি নিদ্যমানান্ ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য॥) এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষির সম্পর্কে ঋজিশ্বা ব্রহ্মদ্বিষ কথাটি ব্যবহার করিতেছেন। ঋগ্বেদের অন্যত্র এই গালিটি কেবল রাক্ষস ও যাতুধান শত্রুদিগের প্রতি প্রয়োগ হইয়াছে। ভরদ্বাজ বলিতেছেন,—"হে বজ্রধর! আমি যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীর লোক অপেক্ষা যে ব্যক্তি আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ করে তাহাকে খর্ব্ব কর। (জনং বজ্রিন্মহিচিন্মন্য-মানমেভ্যো নৃভ্যো রন্ধয়া যেষ্বস্মি।) কণ্বকুলের সর্ব্বসাখ্য ঋষি বলিতেছেন,—"আমি ভিন্ন অন্য কেহ কি স্তোমদ্বারা অশ্বিগণের উপাসনা করিতে পারে?" (কি মন্যে পর্য্যাসতেস্মৎ স্তোমেভি-রশ্বিনা।) সুমিত্র ঋষি বলিতেছেন,—"হে বধ্রি অশ্বের অগ্নি, যাহারা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তুমি তাহাদের সম্মুখীন হও", (অয়মগ্নিবধ্র্যশ্বস্য বৃত্রহা সনকাৎপ্রেদ্ধো নমসোপ বাক্যঃ।) ঋষিকুলের পরস্পরের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বি[illegible] কলহ দেবদেবীর উপরেও আরোপিত হইয়াছে। ইন্দ্র ও [illegible] ইন্দ্র ও উষা, ইন্দ্র ও মরুৎগণের মধ্যে যুদ্ধের ও উষা ও অ[illegible] মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্র[illegible] কিম্বদন্তী হিসাবে এইগুলির উল্লেখ আছে। উষাকে ই[illegible] বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী (অনিন্দ্রা) বলা হইয়াছে। এই অ[illegible] কথাটি সাধারণতঃ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যাহারা যুদ্ধ করিতেছেন [illegible]রূপ গোষ্ঠি বা গোষ্ঠিপতিদিগের সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখা যায়। অদিতি ও উষার মধ্যে দেবগণের মাতৃপদ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা[illegible] আভাস পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের যুদ্ধগুলির বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যুদ্ধের দুই পক্ষ আর্য্য ও অনার্য্য কৃষ্ণকায় শত্রু নয়, অধিকাংশ যুদ্ধ গোষ্ঠি বা কৌমগুলির পরস্পরের মধ্যে ঘটিয়াছিল। ঋষি-কুলও প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি বা গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিখ্যাত দশজন রাজার যুদ্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ত্রিৎসুগোষ্ঠির গোষ্ঠিপতি দিবোদাসের পুত্র সুদাস রাজা এই যুদ্ধের প্রধান পুরুষ। উর্ব্বরা ভূমি ও জলের অধিকার লাভ এই যুদ্ধের হেতু। সপ্তম মণ্ডলে সুদাসে[illegible] মিত্র ও অমিত্রগণের বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে। দেখা যায় [illegible] বৈদিক গোষ্ঠিগুলির অধিকাংশই সুদাসের বিরুদ্ধে ছিল প্রসিদ্ধ বৈদিক গোষ্ঠিগুলির মধ্যে তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু, অনু, মৎস্য, বিকর্ণদ্বয় এবং সম্ভবতঃ যদু সুদাসের বিপক্ষে ছিল। ইহারা ব্যতীত পূর্ব্বদেশীয় গোষ্ঠিগুলির মধ্যে অজ, যক্ষু ও শিগ্রু প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ভেদের নেতৃত্বে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিল। ইহারা ছিল যমুনাতীরবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসী। পরুষ্ণীতীরবর্ত্তী অঞ্চল-বাসী ভলন, অলিন, বিষাণিন, শিব ও পক্থ* গোষ্ঠি স্বপক্ষ

---

* বাঙ্গালা অনুবাদ রমেশচন্দ্র দত্তের।

* ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পরুষ্ণীতীরবাসী পক্থ গোষ্ঠিকে পখতো (Pakhto) জাতির স্থলে অভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। বাজাউর, সোয়াট, বুনের অঞ্চলে প্রচলিত এবং ইউসুফজাই বাদ্দাশ, ওরেকজাই, আফ্রিদী এবং মোমান্দ পাঠানগণের ব্যবহৃত ভাষাকে

বংশীয় চয়মানের পুত্র কবির নেতৃত্বে শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিল। চয়মানের অন্ত পুত্র অভ্যাবর্ত্তী একজন প্রসিদ্ধ নৃপতি এবং তিনিই একমাত্র নৃপতি যাঁহাকে ঋগ্বেদে সম্রাট্ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চয়মানের ভ্রাতা (?) মঙ্গমানের পুত্র দেবক সুদাসের বিপক্ষে ছিলেন। বিকর্ণদ্বয় অসিক্নী ও সিন্ধুতীর অর্থাৎ সিন্ধুসাগর (Sind-Sagar) দোয়াববাসী ছিল। ম্যাকডোনেল ও কীথের মতে কৃবি ও কুরুগোষ্ঠি ইহাদের অন্তর্ভুক্ত।
৫ ঋষিকুলের মধ্যে ভৃগুকুলকেও সুদাসের বিপক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। কবষ ঋষিও (রমাপ্রসাদ চন্দের মতে রাজা) সুদাসের বিপক্ষে ছিলেন। পুরুগোষ্ঠি সম্ভবতঃ কোনপক্ষে যোগদান করে নাই। শত্রুগণের মধ্যে এই সকল গোষ্ঠি ব্যতীত বৃষ্ণ, শ্রুত প্রভৃতি রাজা ছিলেন যাঁহাদের গোষ্ঠির উল্লেখ নাই। এই সকল গোষ্ঠিকে বাদ দিলে দেখা যায় যে মাত্র ভরত ও ভরত-গোষ্ঠিজাত সৃঞ্জয়গন ত্রিৎসুগণের পক্ষে ছিলেন। ত্রিৎসুগণের বিরুদ্ধে অধিকাংশ বৈদিকগোষ্ঠির এই সংঘবদ্ধ আক্রমণ ছাড়া সুশ্রবা রাজার বিরুদ্ধে বিশ জন রাজার সংঘবদ্ধ আক্রমণের উল্লেখ আছে। আক্রমণকারীদিগের গোষ্ঠির উল্লেখ নাই। এই দুইটি যুদ্ধ ব্যতীত সৃঞ্জয় গোষ্ঠির সহিত তুর্ব্বশদিগের, অসিক্নী তীরবাসী গোষ্ঠির সহিত (সম্ভবতঃ কুরু ও কৃবি) পুরুদিগের যুদ্ধ, সম্রাট্ অভ্যাবর্ত্তীর সঙ্গে পরাক্রান্ত বরশিখগণের হরিয়ুপীয়া ও যব্যাবতী নদীর তীরে প্রচণ্ড যুদ্ধ প্রভৃতি বৈদিক গোষ্ঠিগুলির আপনাদিগের মধ্যে দ্বন্দ্বের বহু উল্লেখ আছে।

এই সকল যুদ্ধের বিবরণের তুলনায় দাস বা দস্যু বলিয়া অভিহিত শত্রুদিগের সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ সংক্ষিপ্ত। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা যাইতে পারে। দাস ও দস্যু মানব শত্রু অথবা অ-মানব শত্রু (demonaic or super-human foe) তাহা লইয়া মতভেদ আছে। দাস ও দস্যুকে অপ্রাকৃত শত্রু বলিয়া ধরিলে আর্য্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বী যে ভারতের কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী (Veddaic people) এই মতবাদের ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু দাস ও দস্যুদিগকে যে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করা হইত ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। আর একটি কথা এই যে কখন-কখন দাস ও দস্যুকে পৃথক বলিয়া মনে করা হইত। কিন্তু এত বেশী ক্ষেত্রে তাহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে যে সাধারণ ভাবে দাস ও দস্যু একই শ্রেণীর শত্রুর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। দাস ও দস্যুদিগের মধ্যে বৃত্র, ধুনি, নমুচি, পিপ্রু, শুষ্ম, অর্ব্বুদ, চুমুরি, শম্বর, বদৃদ, বর্চি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বৃত্র, নমুচি, ধুনি, পপ্রু, শুষ্ম, অর্ব্বুদ, চুমুরি প্রভৃতির সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের কাহিনী বিভিন্ন মণ্ডলে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে এই সকল যুদ্ধ-কাহিনী ঋগ্বেদের আমলে বা তাহার বহু পূর্ব্বে পৌরাণিক কাহিনীর পর্য্যায়ে আসিয়া গিয়াছিল। শম্বর, বর্চি ও বদৃদের কাহিনী অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। শম্বর সুদাসের পিতা দিবোদাসের শত্রু। দিবোদাসের আর এক নাম পিজবন। তাঁহাকে কোন কোন স্থানে অতিথিগ্ব বা অতিথিবৎসল এই বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। দিবোদাস কুলিতরের অপত্য শম্বরের অসংখ্য সৈন্ত ও নবনবতিসংখ্যক পুরী ধ্বংস করেন। শম্বর দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং ৪০ বৎসর কাল যুদ্ধ চালাইয়া যান। অবশেষে দুর্গম পর্ব্বতমধ্যে তাঁহার আত্মগোপনের স্থানে শত্রু উপস্থিত হইলে শত্রুর হস্তে বন্দিত্ব এড়াইবার জন্য সম্ভবতঃ পর্ব্বতশিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। শম্বরের মৃত্যুর পরস্পর বিরোধী বর্ণনা হইতে এইরূপ অনুমান করাই সমীচীন মনে হয়। শম্বরের সঙ্গে বর্চী নামক এক দস্যুকে একবার মাত্র যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই দারুণ সংগ্রামে দিবোদাসের যে কেহ মিত্র ছিল তাহার উল্লেখ নাই। এই যুদ্ধকে আর্য্যজাতি বনাম দস্যু-জাতির যুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় কিনা সন্দেহ। আর একটি কথা এই যে নবনবতি সংখ্যক পুরী ও বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি দস্যু বা দাস (এই দুইটি নামেই তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে) শম্বরকে চল্লিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পর পরাজিত করিয়া দিবোদাসের যে কতখানি সুবিধা হইয়াছিল তাহা বুঝা যায় না। তাঁহার পুত্র সুদাসকে দরিদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "ইন্দ্র তখন দরিদ্র সুদাসের দ্বারা এক কার্য্য করাইয়াছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগ দ্বারা হত করাইয়াছিলেন।" সুদাসের কৃতকার্য্যতার মূলে ছিল তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠের উদ্যম। বিচ্ছিন্ন ও দুর্ব্বল ত্রিৎসু ও ভরত গোষ্ঠির মিলন ঘটাইয়া বশিষ্ঠ সুদাসকে শক্তিশালী করেন। এই কাহিনীর সহিত দিবোদাসের শম্বর বিজয়ের কাহিনীর তেমন সঙ্গতি দেখা যায় না। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সুদাসের পুরোহিত বংশ বশিষ্ঠকুলের রচিত সপ্তম মণ্ডলে দিবোদাসের শম্বর-বিজয়ের কাহিনী সম্ভবতঃ একবারের বেশী উল্লিখিত হয় নাই। ষষ্ঠ মণ্ডলে সম্ভবতঃ চার বার, প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলে সম্ভবত দুই বার করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই যুদ্ধকে ঋগ্বেদের পৌরাণিক কাহিনীর পর্য্যায়ে ফেলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বদৃদের (ইহাকে অসুরও বলা হইয়াছে) এক শত পুরী ধ্বংসের উল্লেখ এক বার ও বর্চির সহিত যুদ্ধের উল্লেখ দুই বার আছে। অন্যান্য দাস বা দস্যুর উল্লেখ এক বার বা দুই বারের বেশী দেখা যায় না। যাহা হউক, শম্বর, বর্চি, বদৃদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দস্যুর শক্তি, ঐশ্বর্য্য, বিস্তীর্ণ রাজ্যের উপর আধিপত্য প্রভৃতি বিবেচনা করিলে তাহাদিগকে বর্ব্বর, অসভ্য আদিম অধিবাসীর শ্রেণীভুক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ।

সূক্তকারগণ যাঁহাদিগকে শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে দাস বা দস্যু, রাক্ষস ও যাতুধান, ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠি বা গোষ্ঠিপতি, ঋষি ও আর্য্য আছেন। সূক্তকার ঋষিগণের এতগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর শত্রু থাকিবার কারণ বিশেষ বিবেচনার বিষয় বটে। শত্রুদিগের দীর্ঘ তালিকা দেখিলে আর বলিবার পথ থাকে না যে ঋগ্বেদ রচনার সময় আর্য্যগণ আক্রমণকারীরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এখানে

পখ্‌তো বলা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পাঠানগণের মধ্যে প্রচলিত ভাষাকে পস্‌তো বলা হয়। আফগানগণের ব্যবহৃত ভাষা পস্‌তো বা পসতু। পাঠান কথাটি পখতান বা পখতুন হইতে আসিয়াছে। টলেমীর উল্লিখিত Paktyke (?) জাতিকে পখতো জাতির সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ঋগ্বেদীয় পরুষ্ণীতীরবাসী শিবগোষ্ঠি গ্রীক লেখকগণের রচনা দোয়াববাসী শিবয় (Sibai) জাতিও হইতে পারে কি না তাহাও বিবেচনার বিষয়।

আর্য্যশত্রুর উল্লেখ করা হইয়াছে এইরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। শুনহোত্র ঋষি বলিতেছেন—"হে বীর ইন্দ্র, তুমি কি দস্যু কি আর্য্য উভয়বিধ শত্রুই সংহার করিয়াছ।" (ত্বং তান্ ইন্দ্রোভয়ান্ অমিত্রান্দাসা বৃত্রাণ্যার্যা চ শূর।) বশিষ্ঠ বলিতেছেন—হে নেতা ইন্দ্র ও বরুণ। তোমরা দাস ও আর্য্য শত্রুগণকে মারিয়া ফেল, তোমরা সুদাস রাজার উদ্দেশে রক্ষার সহিত আগমন কর।" (দাসা চ বৃত্রা হত মার্যাণি চ সুদাস মিন্দ্রাবরুণাব সাবতম্)। প্রজাপতির অপত্য সম্বরণ ঋষি বলিতেছেন যে, বিশ্বের দমনকারী ভীষণ ইন্দ্র দাস ও আর্য্য-শত্রুকে ধ্বংস করেন। (ইন্দ্রো বিশ্বস্য দমিতা বিভীষণো যথাবশং নয়তি দাসমার্যঃ।) বামদেব ঋষি বলিতেছেন যে, শত্রুগণের হিংসক ইন্দ্র আর্য্য-শত্রুগণের সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকেন। পুনরায় বলিতেছেন যে, ইন্দ্র সরযূ নদীর তীরে আর্য্য রাজা অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করিয়াছিলেন। (দীর্ঘৈ যদাজিমভ্যর-ব্যদর্যঃ। উত ত্যা সদ্য আর্যা সরযোরিন্দ্র পারতঃ। অর্ণাচিত্র-রথাবধীঃ॥) একটি ঋকে ঋষি বলিতেছেন—"হে মন্যু, তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা যেন দাস ও আর্য্য উভয়ের সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে পারগ হই।" (যস্তে মন্যোবিধদ্বজ্র সায়ক সহ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্ব মানুষক। সাহ্যাম দাসমার্যম ত্বয়া যুজা সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা।) একটি ঋকে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—"হে ইন্দ্র, অনিষ্টকারী নিধনোদ্যত শত্রুদিগের উপর বজ্রপাত কর। দাসজাতীয় হউক বা আর্য্যজাতীয় হউক উহাকে অপ্রকাশরূপে বধ কর।" (অন্তর্যচ্ছ জিঘাংসতো বজ্রমিন্দ্রাভিদাসতঃ। দাসস্য বা মঘবন্নার্যস্য বা সনুতর্যবয়া-বধম্॥)

আর্য্যগণের আপনাদিগের মধ্যে যথেষ্ট কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঋষিগণের নিজেদের মধ্যে কলহ ও শত্রুতার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতিকূলাচারী আত্মীয় ও অনাত্মীয় শত্রুর নিধন করিবার জন্য সূক্তকার ঋষিগণ ইন্দ্রের স্তুতি করিতেছেন। শংযু ঋষি বলিতেছেন, "হে শৌর্য্যশালী মঘবা, তুমি এই সোমপানে হৃষ্ট হইয়া আমাদের আত্মীয় ও অনাত্মীয় সমুদয় প্রতিকূলাচারী শত্রুকে বিনাশ কর।" (এনা মন্দানো জহি শূর শত্রূঞ্জামি মজামিং মঘবন্-মিত্রান্।...)

শ্বেতকায় আর্য্য জাতির উল্লেখ ঋগ্বেদে কিরূপ আছে দেখা যাউক। ঋগ্বেদে কৃষ্ণ, কৃষ্ণযোনী, কৃষ্ণগর্ভা প্রভৃতি শব্দের কয়েকবার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই কথাগুলি কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন ভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে যে Roth, Regnier, Benfey প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে এই কথাগুলির দ্বারা কৃষ্ণকায় জাতি বুঝায় না,—কৃষ্ণমেঘ, dark spirits প্রভৃতি বুঝায়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে দাস বা দস্যুর বিশেষণ হিসাবে এই কথাগুলি ব্যবহারের অবিসম্বাদী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। ঋষিকুলের মধ্যে পজ্র বা অঙ্গিরা কুল ও বশিষ্ঠ কুল শ্বেতকায় ছিলেন এইরূপ অনুমান করা যায়। এক ঋকে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র তাঁহার শ্বেতকায় বন্ধুদিগের সহিত (সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ) পৃথিবী ভাগ করিয়া লইয়াছেন। এখানে বন্ধু বলিতে অঙ্গিরা কুল বুঝাইতেছে। বশিষ্ঠ বলিতেছেন যে শ্বেতবর্ণ, দক্ষিণে চূড়াধারী (শ্বিত্যং চ মা দক্ষিণতঃ কপর্দা) বশিষ্ঠগণ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়েন। গোষ্ঠিগুলির মধ্যে ত্রিৎসুগণকেও শ্বেতবর্ণ ও চূড়াধারী বলা হইয়াছে। এই শ্রুতিতিনেক প্রয়োগ হইতে এইটুকু মাত্র অনুমান করা সম্ভব যে ঋষিকুলের মধ্যে অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ কুল এবং অঙ্গিরা কুলজাত ভরদ্বাজ এবং গোষ্ঠিগুলির মধ্যে ত্রিৎসুগণ এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত ভরত ও সৃঞ্জয় গণ হয়ত শ্বেতকায় ছিলেন। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। ঋষি-কুলের মধ্যে প্রাচীন কণ্ব কুলকে দুই বার শ্যামবর্ণ (শ্যাবঃ) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরুকুৎসের পুত্র প্রসিদ্ধ পুরু গোষ্ঠিপতি ত্রসদস্যুর প্রশস্তিকারক ঋষি তাঁহাকে অর্য, সৎপতি, দানশীল ও শ্যামবর্ণদিগের নেতা (পতি) এই সকল বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। পুরুগোষ্ঠির পুরোহিত ছিলেন কণ্বকুল। লক্ষ্য করিতে হইবে যে বশিষ্ঠ ও ত্রিৎসু এবং কণ্ব ও পুরু এই দুই ক্ষেত্রেই পুরোহিত ও যজমানদিগের গাত্রবর্ণ একপ্রকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পার্থক্য মানিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয় যে ঋষি ও গোষ্ঠিসমূহ এই উভয় দলের মধ্যেই শ্বেতকায় ও শ্যামবর্ণের কুল ও গোষ্ঠি ছিল।

রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যাখ্যামতে ঋষি কুলের মধ্যে দুই বর্ণের কুল থাকিবার কারণ শ্বেতবর্ণ কুলগুলি আদি ঋষি কুল ও শ্যাম-বর্ণের কুলগুলি (কণ্ব ও কুশিক, কিন্তু কুশিক কুলের শ্যামবর্ণের উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই) ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠি হইতে ঋষি কুলে উন্নীত হইয়াছিলেন। ("The founders of these two clans originally belonged to the Yoyamana class") তাঁহার মতে শ্বেতবর্ণের ঋষি কুল, শ্যামবর্ণের যজমান গোষ্ঠি ও কৃষ্ণকায় নিষাদ, ঋগ্বেদীয় সমাজ এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ঋগ্বেদ হইতে এই মতের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্যামবর্ণের গোষ্ঠির মধ্যে তিনি স্বেচ্ছামত পুরু গোষ্ঠি ব্যতীত যদু, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু, অনু ও ভরত গোষ্ঠিকে ফেলিয়াছেন, অন্য গোষ্ঠিগুলির উল্লেখ করেন নাই। শ্বেতবর্ণের ঋষিকুল ও শ্যামবর্ণ যজমান গোষ্ঠি—এই আদি পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার অনুমান-ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করিতে হইয়াছে। তাঁহার মতে সর্ব্বপ্রথম শ্বেতবর্ণ আদি ঋষিকুল উত্তর হইতে (এই উত্তর ঠিক কোথায় তাহা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই) ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।

"The fair and fair-haired invaders who formed the nucleus of the Brahman caste came earlier, direct from the cradle of the Aryan folk in the far north."

তার পরে আসেন কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ যজমান গোষ্ঠি, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া হইতে (সীরিয়া ও মেসোপটেমিয়া)।

এই সকল মতবাদের অবতারণা করিতে হইয়াছে ঋগ্বেদে ঋষিকুল ও গোষ্ঠি বা কৌমগুলির মধ্যে মিশ্র জাতির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য। লক্ষ্য করিতে হইবে যে শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্য্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রচলিত মতবাদের মাত্র অর্দ্ধেক তিনি মানিয়া লইতেছেন। তাঁহার মতে ঋষিকুল ও গোষ্ঠিকুল ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন সময়ে ভারত-বর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন। চন্দের ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে গেলে নূতন যে সকল সমস্যা দেখা দিবে এখানে তাহার উল্লেখ করা অবান্তর। একটি কথা মাত্র বলা যাইতে পারে। ঋষিকুল ও

গোষ্ঠিসমূহের মধ্যে এবং শ্বেতবর্ণের ঋষিকুল ও শ্যামবর্ণের গোষ্ঠিসমূহের মধ্যেও বিবাহের আদানপ্রদানে বাধা ছিল না। অঙ্গিরা কুলের কন্যার সহিত যদুগোষ্ঠির রাজার বিবাহ হইয়াছে দেখা যায়। সূক্তকার কক্ষীবান্ ঋষি দাসী কন্যার গর্ভজাত বলিয়া প্রবাদ আছে। ভৃগুবংশীয় চ্যবন ঋষি শর্য্যাতি রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমদ ঋষি পুরুমিত্র রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বশ ঋষির রাজকন্যা-বিবাহের উল্লেখ আছে। ঋত্বিকগণ যজ্ঞের দক্ষিণা হিসাবেও সালঙ্কারা রাজকন্যা লাভ করিতেন।

ঋগ্বেদে শ্বেতকায় আর্য্যজাতীয় আক্রমণকারিগণের পুরাতন মাতৃভূমির উল্লেখ বা গৌরব প্রকাশের প্রমাণ দেখা যায় না। দূরবর্ত্তী দেশ, গো-সঞ্চাররহিত দেশ (মরুভূমি?), গো-ব্রজ, বনভূমি, পর্ব্বতসঙ্কুল অঞ্চল, সিন্ধুনদীর পশ্চিম শাখাসমূহের, সমুদ্রের, প্রাচীন কাল ও প্রাচীন ঋষিগণের বহু উল্লেখ আছে। মাত্র দুইটি গোষ্ঠি—যদু ও তুর্ব্বশের সম্বন্ধে সম্ভবতঃ দুই বার সমুদ্রের উল্লেখ আছে ও এক বার বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র তাঁহাদিগকে সমুদ্রপার হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে এই সমুদ্র আরব সাগর এবং এই দুই গোষ্ঠি মেসোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিলেন। তুগ্রপুত্র ভুজ্যুর সমুদ্রযাত্রা, অশ্বিদ্বয় কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধারসাধনের কাহিনীর পুনঃপুনঃ উল্লেখ, বণিকের সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ, ঘন ঘন সমুদ্রের উল্লেখ হইতে বৈদিক আর্য্যগণের সমুদ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বুঝা যায়। যদু ও তুর্ব্বশ যে সমুদ্র পারান্ত দেশ হইতে আসিয়াছিলেন ইহা নিশ্চিতরূপে সিদ্ধান্ত করিবার উপযুক্ত প্রমাণ নাই। দেবদেবীর মহিমাকীর্ত্তন, আর্য্যব্রত ও আর্য্যভাবের প্রশংসা, শত্রুদিগের দেবতা, ব্রত ও কর্ম্মের নিন্দা যথেষ্ট আছে। কিন্তু দেখা যায় যে এই শত্রুদলের মধ্যে আর্য্যগণও আছেন এবং আর্য্যশত্রুকেও "অদেব" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে যজ্ঞের। যজ্ঞের অন্যতম উদ্দেশ্য যজমানকে জয়লাভে সহায়তা করিয়া প্রচুর দক্ষিণালাভ। স্তুতির উদ্দেশ্য ধনলাভ, পুত্রলাভ, সভৃত্য বৃহৎ গৃহলাভ, প্রাধান্য ও খ্যাতিলাভ, স্বর্গলাভ ইত্যাদি।

এখন সংক্ষেপে ঋগ্বেদে আর্য্যজাতি বলিতে কাহাদের বুঝাইতেছে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে ঋগ্বেদীয় সূক্তকারগণ আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কোন কোন বৈদিক গোষ্ঠিও যে আর্য্যদলভুক্ত ছিল তাহা মনে করা যাইতে পারে, কারণ আর্য্য যজমানের উল্লেখ আছে। আর্য্যের সহিত দস্যু ও দাসের পার্থক্য নির্দ্দেশ অনেক বার করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে যে সকল প্রশ্ন উঠে তাহার সদুত্তর পাওয়া কঠিন। প্রথমতঃ, সূক্তকার ঋষিকুল যদি সকলেই আর্য্য ছিলেন এবং কোন কোন গোষ্ঠিও যদি আর্য্য ছিল তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় আর্য্য অনার্য্যের প্রভেদ জাতিগত নহে। দ্বিতীয়তঃ, কোন গোষ্ঠিকে পরিষ্কার করিয়া আর্য্য বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই এবং আর্য্যশত্রু বলিতে প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি বা কোন আর্য্যগোষ্ঠি বুঝাইতেছে কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। তৃতীয়তঃ, দস্যু ও দাসগণের সঙ্গে আর্য্যগণের পার্থক্য যে ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে পার্থক্য জাতিগত না হইয়া কৃষ্টিগতও হইতে পারে। দেবভক্ত দানশীল দস্যু-প্রধান ও দাস স্তোতার উল্লেখ আছে।

এখানে এই সকল প্রশ্নের আলোচনা করিবার স্থানাভাব। প্রবন্ধের আরম্ভে যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল—এক শ্বেতকায় বৈদেশিক আর্য্যজাতি ভারত আক্রমণ ও কৃষ্ণকায় বর্ব্বর আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন,—ভারতীয় আর্য্যজাতির প্রথম প্রামাণ্য দলিল ঋগ্বেদ হইতে এই মতের পরিপোষক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদীয় সমাজের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, আর্য্যজাতি গোড়ায় অন্য স্থান হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া থাকিলে ঋগ্বেদের সময়ে উহার স্মৃতি আর কিম্বদন্তী হিসাবেও বর্ত্তমান ছিল না। অপর পক্ষে ঋগ্বেদে আর্য্য পদের যেরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, আর্য্যত্বের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ও আর্য্য ভাব, আর্য্য ব্রত, আর্য্য বর্ণের যেরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা একেবারে অসঙ্গত হইবে না যে, এই আর্য্যকৃষ্টির ও উহার ধারক ও বাহকসমাজের উৎপত্তি-কেন্দ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এই সীমানা অক্সাস (Oxus) নদীর অববাহিকা হইতে গঙ্গা নদীর অববাহিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সম্ভবতঃ হেলমণ্ড (Helmond) নদীর উপত্যকাও এই সীমানার মধ্যে পড়ে।

বজ্রসূচী

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃত সাহিত্যে "বজ্রসূচী" নামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ আছে যাহা পরবর্ত্তী উপনিষদ্-সমূহের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। এই নিবন্ধ পণ্ডিতসমাজে পরিচিত। কিন্তু ঐ একই নামে অনুরূপ আর একখানি বৃহত্তর নিবন্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে, যাহা এখনো পণ্ডিতসমাজেও অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে। উহা প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে এক বার মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাও এদেশে নহে জার্ম্মেনীতে।* সুতরাং উহা সম্ভবতঃ এতদ্দেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বজ্রসূচী উপনিষদের সহিত এই গ্রন্থের এতই সাদৃশ্য যে,

* Cf. A. Weber, ABA. (Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften) May, 1859, pp. 205-64.

ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়—ইহাদের উভয়ের একটি অন্যটিকে দেখিয়া রচিত হইয়াছে।

'জাতির দ্বারা, কুলের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না'—ইহাদের উভয়ের ইহাই বক্তব্য। নানা যুক্তি সহকারে উভয়েই ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে। সর্বশেষে, 'ব্রাহ্মণ কে' তাহার কি লক্ষণ তাহা বলা হইয়াছে।

উভয় গ্রন্থেই প্রথমে নিম্নোক্তরূপ কতকগুলি প্রশ্ন করা হইয়াছে :

"ব্রাহ্মণ কে? আত্মা ব্রাহ্মণ না দেহ ব্রাহ্মণ? জন্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, না কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়? জ্ঞানের দ্বারা, আচারের দ্বারা, না বেদ-বিদ্যার দ্বারা ব্রাহ্মণ্যলাভ হয়?"

বজ্রসূচী উপনিষদে এইরূপ কতগুলি প্রশ্নের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সাহায্যে ও যুক্তিতর্কের দ্বারা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য কোন শাস্ত্র হইতে কোনও বচন প্রমাণস্বরূপ উদ্ধার করা হয় নাই।

কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি, বেদ, মহাভারত ও মানবধর্মাদি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া, তাহার ও নানা যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিজ বক্তব্য বিষয় বিশদভাবে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে।

এইজন্য এই গ্রন্থখানি বৃহত্তর, প্রাঞ্জল ও অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

উপনিষদখানি শঙ্করাচার্যের রচিত বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই গ্রন্থখানি বৌদ্ধাচার্য অশ্বঘোষের (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আমরা এই গ্রন্থের ছয়খানি পুঁথি দেখিয়াছি। এই ছয়খানি পুঁথির তিনখানি ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে এবং তিনখানি ইংলণ্ড হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সবগুলিতেই উহা অশ্বঘোষের রচিত বলিয়া উল্লিখিত।

ডাঃ ওয়েবারের প্রকাশিত সংস্করণের পুঁথিগুলিতেও উহা অশ্বঘোষের রচিত বলিয়াই লিখিত আছে। এই গ্রন্থের চীনা অনুবাদে কিন্তু ইহা বোধিসত্ত্ব ধর্মযশস্ (বা ধর্মকীর্তি)-এর রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এই চীনা অনুবাদ আমরা পড়িয়া দেখিয়াছি। উহা অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ এবং উহার বক্তব্য বিষয়ও কয়েক স্থানে অস্পষ্ট। আমার বন্ধু ডাঃ চু-তা-কু ও আমি বহু চেষ্টা করিয়াও কয়েক স্থানের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। মূল গ্রন্থ হইতে বহু স্থানেই উহার প্রভেদ লক্ষিত হইয়াছে। কয়েক স্থানে মূল পাঠ পরিত্যক্ত এবং নূতন কিছুও যুক্ত হইয়াছে।

উহা এই সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষ্য কিংবা অনুরূপ আর একটি পৃথক গ্রন্থও হইতে পারে :

এরূপ অবস্থায় মূল সংস্কৃত গ্রন্থকে অশ্বঘোষের রচিত বলিয়াই ধরিয়া লইতে পারি। ইহার বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রমাণ আমরা পাইতেছি না।

অন্য দিকে এই গ্রন্থের আভ্যন্তরিক কতকগুলি বিষয় গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। যেমন, সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বেদ, মহাভারত ও মানব ধর্মশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনো শাস্ত্রগ্রন্থের নামোল্লেখ নাই।

প্রথমেই বলা হইয়াছে—বেদ প্রমাণ এবং স্মৃতি প্রমাণ। কোথাও পুরাণের উল্লেখমাত্র নাই।

অথচ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থক প্রমাণ পুরাণের মত আর কোনো শাস্ত্রেই পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, যখন এই গ্রন্থ রচিত হয় তখন বর্তমান পুরাণসমূহ খুব সম্ভব রচিতই হয় নাই, অথবা (কোনো কোনোটি) রচিত হইয়া থাকিলেও তাহা তখন এতই অর্বাচীন ও অপ্রসিদ্ধ ছিল যে, কোনো বিশিষ্ট গ্রন্থকারের গ্রন্থে তাহা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইত না। তাহা না হইলে এই শাস্ত্রজ্ঞ গ্রন্থকার পুরাণোল্লেখিত প্রমাণসমূহের সাহায্য গ্রহণে বিরত হইতেন না।

ডক্টর তাকাকুসু তাঁহার কৃত বজ্রসূচীর জাপানী অনুবাদে এই গ্রন্থকে বজ্রসূচী উপনিষদের ব্যাখ্যা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। একখানি পুঁথির মধ্যেও এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—"অথ বজ্রসূচ্যুপনিষদ্ব্যাখ্যা"।

আমরা কিন্তু ইহাকে ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করি না। সংস্কৃত ব্যাখ্যা-গ্রন্থগুলি যে রীতিতে রচিত—ইহা মোটেই সেইরূপ নহে।

ইহা বজ্রসূচী উপনিষদের অনুরূপ, তাহা অপেক্ষা বৃহৎ এবং অধিকতর প্রাঞ্জল—সেইজন্যই ভ্রমক্রমে ব্যাখ্যা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু সাদৃশ্য, বিস্তৃতি এবং প্রাঞ্জলতাই ব্যাখ্যার একমাত্র লক্ষণ নহে।

গ্রন্থের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা সাধারণত ব্যাখ্যার মধ্যে পাওয়া যায়।

তাহার উপর আরও কিছু লক্ষ্য করিবার আছে :

১। বজ্রসূচী উপনিষদে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় যে কয়টি প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায় তাহার দুই-তিনটি এই গ্রন্থে নাই।

২। উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত ব্রাহ্মণের লক্ষণসমূহ একরূপ নহে।

৩। বজ্রসূচী উপনিষদে আছে—ঋষি বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, গৌতম শশপৃষ্ঠ হইতে এবং অগস্ত্য কলস হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে বিশ্বামিত্র চণ্ডালীর গর্ভে, গৌতম শরগুল্ম হইতে এবং অগস্ত্য অগস্তি পুষ্প হইতে জন্মিয়াছেন বলিয়া লেখা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা কি মূল হইতে এইরূপ তফাৎ হইতে পারে?

আমরা মনে করি, বজ্রসূচী উপনিষদ (উহা শঙ্করার্যের রচিত না হইলেও) এই বৌদ্ধ গ্রন্থের ব্রাহ্মণ্য সংস্করণ। ব্রাহ্মণ জাতির উপর তীব্র আক্রমণ ও তিক্ত সমালোচনাসমূহ বর্জন করিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী বেদান্তী গ্রন্থকার উহাকে নিজ সিদ্ধান্তের সহায়করূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কোথাও কোথাও প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনও করিয়াছেন। যথা—বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়ার সন্তান—চণ্ডালীর নহে।

বজ্রসূচী উপনিষদে শ্রুতিস্মৃতির সহিত পুরাণের উল্লেখ আছে। উহার পরবর্তিতার সপক্ষে ইহাও একটি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

ফানুস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া তিনি বলিলেন, শুনেছ—রেশনিঙের ব্যবস্থা হচ্ছে ? চাল, আটা সব মাথা পিছু বরাদ্দ ।

শুনেছি ।

কিন্তু মাথাপিছু বরাদ্দে মানুষের চলে ? সবাই কিছু সমান খায় না । এক রকম কোয়ালিটির জিনিসও সবাই পছন্দ করে না ।

সে তো সম্ভব নয় ।

ব্যবস্থা করা উচিত । বলিয়া তিনি চেয়ারে আসিয়া বসিলেন । অনুপমের পানে চাহিয়া কহিলেন, অনুপম না ?

আজ্ঞে আমিই ।

অথচ ঘরে ঢুকে সব কেমন আবছা-আবছা বোধ হ'ল। এমন বয়স হয় নি—যাতে দিনের আলোয়—কাছের মানুষ না চিনতে পারি । তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ রেখার কুঞ্চনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ।

সুমিত্রা কহিল, ওভালটীন খেয়েছ তো ।

ওতে আর কিছু ফল হচ্ছে না । চোখের দৃষ্টি ক্রমেই কমে আসছে মনে হয় । হাত পায়েও কেমন ঢিলে-ঢিলে ভাব। এমন করে মানুষ বাঁচতে পারে । এই সব এডলটারেটেড ফুড খেয়ে ।

অনুপম বলিল, আপনার কি পঞ্চাশ পেরিয়েছে ।

পঞ্চাশ ! সে কবে শেষ করে দিয়েছি । যুদ্ধের চলছে এই চার বছর তিন মাস, আমার বয়সও পঞ্চান্ন—

অনুপম মুখে কিছু বলিল না—মনে মনে তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রশংসা করিল । সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতার কথা মনে পড়িল। এখনও পঞ্চাশে পা দেন নাই—অথচ দেহে বা মনে জরার প্রকোপ প্রবল ।

সুমিত্রার পিতা কহিলেন, টম্যাটো আনতে দিও বেশি করে । রোজ দুটো করে ডিম—সপ্তাহে দু-দিন মাংস আর মাখন কিছু । হাঁ হে—Polson আজকাল কি দর যাচ্ছে ?

অনুপম বিপন্নমুখে সমীরের দিকে চাহিল । Polson-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা আছে—কিন্তু বাড়ির মারফৎ নহে । সেখানকার আহার গল্প করিবার মত নহে । মুখে রুচি আনে না বলিয়াই তাহা স্মৃতির চিহ্নে বিন্দুমাত্র দাগ ধরায় না ।

সমীর উত্তর দিল, দু'টাকা দু'আনা-তিন আনা ।

—তাই গোটাকতক আনিয়ে রেখ । বাজারের বাজে ঘি দিয়ে আর তরকারি রেঁধ না ।

সমীর বলিল, আচ্ছা । আমরা এখন উঠছি ।

হাঁ—অনুপমকে খেতে বল এখানেই । মাংস আনিয়েছ ত ? কিছু মাছও আনাও । মিষ্টি খাওয়ার পাট ত একরকম উঠেই গেছে । তাঁহার অভিযোগ-ক্ষুব্ধ মুখখানি সর্ব্বক্ষণ করুণ দেখাইতে লাগিল ।

বাহিরে আসিয়া সমীর বলিল, বাবার ম্যানিয়া হয়েছে ওঁর শক্তি কমে আসছে । দোষ দেন যুদ্ধের—ভেজাল খাবারের ।

—কথাটা মিথ্যা কি ।

সমীর বলিল, বিপ্লবের দিনে সবরকম সুখ-সুবিধা আশা করতে আমরা পারি না । বাবার থিওরি হচ্ছে এই বাজারে টাকার দিকে চাইলে হবে না—স্বাস্থ্যকে বজায় না রাখলে আমরা টিঁকতে পারব না । কাজেই at any cost স্বাস্থ্য বজায় থাক ।

—স্বাস্থ্য ওঁর মোটের ওপর মন্দ নয় ।

—সে কথা বলবার জো কি । সুমিত্রা মৃদু হাসিল । দাদাও কতকটা ওর ধাত পেয়েছেন ।

—মানে ?—

—মানে এই একটু আগে যা বলছিলে । নিজেরা বেঁচে থাকলেই যথেষ্ট ।

সমীর হাসিয়া বলিল, সে ত সত্যই । আমরা যা ত্যাগ করতে পারি না—তা নিয়ে বড়াই করব কোন্ লজ্জায় ?

—কিন্তু যা ত্যাগ করতে পারি—

—তা নিয়েও বড়াই চলে না । ত্যাগটা খাঁটি হয় তখনই যখন—

—থাক গো থাক, শাড়ীটা বদলে আসি ।

সুমিত্রা দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইল ।

সমীর হাসিয়া কহিল, প্রোগ্রামের সবটা শুনে নাও ।

—আরও আছে ?

—নেই ?—সবে ত বেলা পাঁচটাও নয়—বিনতাদের পার্টিতে—অর্থাৎ সাহিত্য মজলিস ।

—তার পর—?

—সময় থাকলে লেক-ভ্রমণ ।

—অনুপম তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, সাবাস ।

সুমিত্রা সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল, সিনেমার টিকিট ক'খানা নিয়েছেন ত ?

অনুপম পকেট হইতে নূতন-কেনা মণিব্যাগটা বাহির করিয়া খুলিল ।—মাইকা-আঁটা খোপে টিকিট কখানা ভাঁজ করা ছিল । একবার নাড়িয়া সে ব্যাগটা বন্ধ করিল । সুমিত্রা ততক্ষণে তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছে । উৎফুল্ল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সেকেণ্ড ক্লাস বুঝি ?

—হাঁ—।

সমীর বলিল, কি দরকার ছিল অত খরচ করবার । ওই টাকাতে দু'খানা বই দেখা হ'ত ।

অনুপম হাসিল ।

সুমিত্রা কহিল, দেখবার সখ থাকলে সাতখানা বই দেখলেও টাকায় কুলোয় । নতুন চাকরি—নতুন মাইনে হাতে এল—অত হিসেব না রাখাই ভাল ।

অনুপমের সমর্থনসূচক হাসিতে শব্দ উঠিল ।

সমীর বলিল, তা ছাড়া থার্ড ক্লাস সীটে গদি নেই। বড্ড ফোটোসি বসতে হয়—ভাল সেন্টের গন্ধ—

সুমিত্রা বলিল, সব সময়ে তোমার ঠাট্টা ভাল লাগে না।

পথে পা দিতেই একটি ভিখারিণী অস্থিসর্ব্বস্ব ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া হাত বাড়াইল, বাবু গো—এই বালকের মুখ চেয়ে কিছু ভিক্ষে দিন।

সমীর তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। সুমিত্রা শুনিয়াও যেন শুনিতে পাইল না। দু' হাতে বায়ুবেগ-বিচলিত শাড়ীটাকে সামলাইয়া পাশ কাটাইল। অনুপম একবার পকেটে হাত দিয়া ব্যাগের অবস্থানটুকু অনুভব করিয়া ইহাদের অনুসরণ করিল।

—যাই বলুন, বড্ড নোংরা ওরা।

—বটে!—সমীর হাসিল।—কত রকম রোগের জার্ম নিয়ে ফেরে তা যদি জানতিস!

সুমিত্রা আকুল কণ্ঠে কহিল, সত্যিই ওদের একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। গবর্ণমেণ্ট কেন দেখছেন না?

—তাঁর ত একটা চোখ নয়—অনেকগুলি।

—তা ওরা কেন লাটসাহেবের বাড়ির কাছে গিয়ে সব জানাক না।

—জানিয়েছিল একদিন। তার পরদিন কাগজখানা বুঝি পড়িস নি?

না। সুমিত্রার মুখে আতঙ্কচিহ্ন পরিস্ফুট। কি হ'ল তার ফল?

—যা হয়। দুঃখের সমুদ্র কি বর্ষার জলে কেঁপে ওঠে রে।

—আপনি কি বলেন—ওদের দুঃখের প্রতীকার হওয়া উচিত নয়?

—হাঁ—না হ'লে সারা শহরে মহামারী হতে পারে। অনুপম জবাব দিল।

—মহামারী! না না, মহামারী হবে কেন।

সুমিত্রার শুষ্ক স্বরে সমীর তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, ভয় পেলি ত?

—দূর—ভয় কেন। ভাবনা মানেই বুঝি ভয়।

—তাহ'লে ওই দেখ।—

সমীরের প্রসারিত আঙুলের নির্দ্দেশ একটি নোংরা ডাষ্টবিনের দিকে। ছেঁড়া ন্যাকড়া কাগজ ছাই, ভাঙ্গা কুলা, শাখা, তরকারির খোসা, চিংড়ির খোলা পচা ও রাত্রির ভুক্তাবশেষ অপচিত তরকারি হইতে একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে। ছাইয়ে ধুলায় মাখামাখি সেই পর্য্যুসিত কদর্য্য অন্ন মুঠা মুঠা করিয়া তুলিতেছে কয়েকজন মেয়ে-ভিখারী। তারপর হাতের মুঠা উঠিতেছে মুখের কাছে—

সভয়ে দুই চক্ষু বন্ধ করিয়া সুমিত্রা পিছাইয়া আসিল। সমীর এবং অনুপমও অতি কষ্টে বমনোদ্রেক দমন করিল।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। কথা যেন এই পরিবেশে মানায় না। তবু নীল আকাশের ভিতর দিয়া শরতের প্রসন্ন প্রভাত আজ দেখা দিয়াছে। সে প্রভাতের মুখে কর্ম্ম-বিরতির আশ্বাস, কিম্বৎ সম্পূর্ণ জীবন-ধারার নদী-বেগ-মুখর কয়েকটি ছোট ঢেউয়ের মর্ম্মর-ধ্বনি।

সামনেই একটা পার্ক। পার্কটা এখনও সম্পূর্ণ ... বলিয়া নানা জাতের ও নানা বয়সের বালক-বৃদ্ধ-যুবক স্ত্রীপুরুষ ভিখারীর আড্ডা। জাতির তথ্য অবশ্য বুঝা দুষ্কর। কঙ্কাল-শীর্ণ দেহ; লোলচর্ম্ম-বন্ধনে অস্থি কখানি কোনমতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট; কোটরগত নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে ক্ষুধার ক্লান্তি এবং গুণ্ডাম্বিতে মৃত্যুর বলিচিহ্ন।

সুতরাং বয়স নির্ণয় করা সুকঠিন। ছিন্ন কন্থা, ভাঙা হাঁড়ি ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁটুলি লইয়া ইহারা বেশ গুছাইয়া আছে। ছেলেগুলা দিনরাত ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে—মায়েরা সন্তানের দোহাই দিয়া চীৎকার করে—পুরুষরা আকাশ পানে চাহিয়া কিসের প্রতীক্ষা করে। হয়ত ভগবানকে নালিশ জানায়—হয়ত মৃত্যুকে দ্রুত আসিবার জন্য মিনতি করে। তাহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায় যাহারা—তাহাদের জগৎই স্বতন্ত্র। সে জগতে গন্ধ আছে—প্রসাধন আছে—উদরপূর্ত্তির তৃপ্তিতে মুখের লাবণ্য শশীকলার মত বৃদ্ধি পায়, এবং স্বপ্ন আছে। রূঢ় বাস্তব ভ্রূকুটি হানিয়া মৃত্যু-শাসনে তাহাদের ক্ষয় করিয়া আনিতেছে না।

পার্কটা ছাড়াইতেই দত্তজার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। মনোনীতদের বাড়ি যাইবার পথে ইঁহার সঙ্গে দেখা হইবেই। পূর্ব্বে ইঁহার অবস্থা যাহাই থাকুক—যুদ্ধের পঞ্চবার্ষিক পদক্ষেপে ইনি শাঁসে-জলে শরতের নারিকেলটি হইয়াছেন। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের জমিতে নূতন ধরণের বাসগৃহ কাঁদিয়াছেন। গৃহ-প্রবেশের সঙ্গে অচিরেই সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের একজন বলিয়া গণ্য হইবেন।

—নমস্কার, কোথায় চলেছেন?

—এই মনোনীতদের ওখানে।

—বেশ—বেশ। আচ্ছা—দেখুন ত আমার বাড়ির ডিজাইনটা ঠিক মেট্রো প্যাটার্ণের হয়েছে কি?

—হুবহু। দেখলে মনে হয় সিনেমা হাউস তৈরি হচ্ছে।

—অবশ্য তা করতে পারলে আজকালকার দিনে—ষ্টাণ্ডিং ইনকাম একটা—, অর্দ্ধব্যক্ত বাসনার মুখে পরিপুষ্ট তৃপ্তিতে তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

—আমরা ভাবি—এই বাজারে বাড়ি তুলবার মেটিরিয়াল যোগাড় করলেন কি করে।

—তা আপনাদের কৃপায় আর ভগবানের আশীর্ব্বাদে কোন কিছুতে আমার আটকায় নি সমীরবাবু। আগে আইনের প্যাঁচকে বড় ভয় পেতাম—হাতে রেস্ত ছিল না কিনা। এখন বুঝেছি—লক্ষ্মীর ক্ষমতায় কি না হয়।

সমীর যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া অগ্রসর হইল।

দত্তজা পিছন হইতে কহিলেন, একটা কথা।—আপনারা ত অনেক খবর রাখেন—বলতে পারেন এই যুদ্ধ কবে শেষ হবে?

—যুদ্ধ! সমীর হাসিয়া কহিল, সে হয়ত আপনার ভগবানও বলতে পারেন না।

দত্তজা কহিলেন, তা বটে—যা ভেঙ্কি লেগেছে। একটু থামিয়া বলিলেন, তা দু-এক বছরে বোধ হয় মিটছে না।

—গতিক দেখে মনে ত হয় না।

—তাই বলুন। পরম স্বস্তিতে তিনি হাসিয়া উঠিলেন।